বিনয় সরকারের বৈঠকে

প্রথম ভাগ

বিনয় সরকারের বৈঠকে

প্রথম ভাগ

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত,
শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন, শ্রীক্ষিতি মুখোপাধ্যায়,
শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল ও শ্রীমন্মথনাথ সরকারের
সঙ্গে কথোপকথন

ছাতিম বুক্‌স্

উৎসর্গ

আমার দেখা দুই মহৎপ্রাণ বঙ্গ-মনীষী
অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
ও
অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত-কে
বিনম্র প্রণাম জানিয়ে স্নেহধন্যের শ্রদ্ধাঞ্জলি

চিন্তানায়ক বিনয় সরকার

১

বিনয় সরকার ছিলেন বাংলার অপরাজেয় যৌবনশক্তির প্রতিমূর্তি ও বিংশ শতাব্দীর এক অনন্য প্রতিভা। তিনি শুধু মালদার নন, সারা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান। ১৮৮৭ সনের ২৬ ডিসেম্বর (অন্য মতে ২২ অক্টোবর) তিনি মালদার মুকদুমপুরে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাষট্টি বছর বয়সে সুদূর আমেরিকার ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (২৪ নভেম্বর, ১৯৪৯)। তিনি শুধু পাণ্ডিত্যে বড় ছিলেন না, চরিত্রে ও মনুষ্যত্বেও ছিলেন অসাধারণ। তিনি যে কত অজস্র ধারায় আমাদের নব নব ঐশ্বর্য দিয়ে গেছেন তার পরিমাপ করা সহজ নয়। তিনি পড়াশুনা যেমন প্রচুর করেছেন. লিখেছেনও প্রচুর। অসংখ্য প্রবন্ধে, পুস্তিকায় ও গ্রন্থে তিনি তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আচার্য ব্রজেন শীলও ছিলেন এ ধরণের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী, কিন্তু প্রতিভার তুলনায় তিনি লিখেছেন বড় কম। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই অভাবটা অনেকাংশে পূরণ করেছেন বিনয় সরকার। মানুষ ও দুনিয়া সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল যেমন গভীর ও ব্যাপক, চিন্তাধারাও তেমন ছিল মৌলিকতায় সমুজ্জ্বল।

২

বিনয়কুমার মৌলিক গবেষণা করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ, বিভিন্ন সংস্কৃতি বা সভ্যতা নিয়ে আর প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সৃষ্টি করেছেন নতুন নতুন চিন্তার ধারা। ইতিহাস, দর্শন, নৃতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, সমাজশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প ইত্যাদি বিচিত্র বিষয়ে তিনি প্রচুর মাথা ঘামিয়েছেন এবং নতুন নতুন মত-পথ খাড়া করেছেন। বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত ছাড়াও ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসামান্য। এর ফলে তিনি ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় অনর্গলি বলতে ও লিখতে পারতেন। তাঁর প্রকাশিত প্রথম পুস্তক 'বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা' (১৯০৭) আর তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত সর্বশেষ গ্রন্থ 'ডোমিনিয়ান ইণ্ডিয়া ইন ওয়ার্ল্ড-পারস্পেক্টিভ্স্' (১৯৪৯)। বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর রচনার পরিমাণ প্রায় বার হাজার মুদ্রিত পৃষ্ঠা, এবং ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলীর পরিমাণও অনুরূপ। তাছাড়া. ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান গবেষণা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর পরিমাণও বিরাট। ১৯১৭ থেকে ১৯৩১ সনের মধ্যেই ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান পত্রিকায় তাঁর ছত্রিশটা গবেষণা-প্রবন্ধ বের হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে আরও অনেকগুলি। এই বিরাট সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এক ঐক্যগ্রথিত জীবন-দর্শন। বস্তুনিষ্ঠ দুনিয়া পর্যালোচনার নিরেট বাস্তব ভিত্তির ওপর বিনয় সরকারী দর্শন প্রতিষ্ঠিত। এ দর্শন দেশি-বিদেশি অন্যান্য দর্শন থেকে স্বতন্ত্র। বিনয়কুমারের চিন্তাধারাকে দার্শনিক পরিভাষায়

বলা হয় 'সরকারবাদ'—ইংরেজীতে 'সরকারিজম্'। বস্তুনিষ্ঠা, দুনিয়ানিষ্ঠা ও অফুরান আশাবাদ এর প্রাণ। এ দর্শনে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের স্বরাজ এক মস্ত বড় জায়গা জুড়ে আছে। সরকারবাদের অভিব্যক্তিতে দেশি ও বিদেশি নতুন ও পুরাতন হরেক রকম চিন্তাধারা এসে হাজির হয়েছে। কিন্তু সেই মতবাদগুলিকে তিনি কোথাও বিনা প্রতিবাদে মেনে নেননি। তিনি মামুলি ও গতানুগতিক চিন্তাস্রোতের বিরুদ্ধে সাঁতার কাটতে ভালবাসতেন, নিঃসঙ্গ অবস্থায়ও প্রয়োজনবোধে তিনি স্বকীয় পথে চলতে পারতেন। চলা-পথে চলা সাধারণ মানুষের অভ্যাস। অ-চলা পথে চলা প্রতিভার লক্ষণ। অপরের চশমা পরে নয়, নিজের চোখ দিয়ে তিনি জীবনকে দেখেছেন এবং তথ্য ও যুক্তি দিয়ে গড়ে তুলেছেন এক শৃঙ্খলানিষ্ঠ চিন্তার গড়ন।

৩

যৌবনের প্রারম্ভে বিনয়কুমার ডন সোসাইটির জনক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা স্বদেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেও তাঁর জীবনের ওপর বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল জবরদস্ত। বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে বিনয় সরকারের চরিত্র, মেজাজ ও ব্যক্তিত্ব কখনও পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। বিবেকানন্দের 'একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামি'র ভেতর তিনি এক নতুন মন্ত্রের সন্ধান পান। বিবেকানন্দের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন দিগ্বিজয়ের দর্শন, সতীশচন্দ্রের নিকট থেকে তিনি পান স্বদেশসেবা ও নিঃস্বার্থ কর্মযোগের দীক্ষা। আচার্য সতীশচন্দ্রের প্রভাব এতই গভীর ছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও বড় সরকারী চাকরির সকল সুযোগ তিনি স্বেচ্ছায় বর্জন করে মামুলি সেবক হিসাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ' অবৈতনিক শিক্ষকরূপে যোগদান করেন (১৯০৬)। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে তাঁর যে গৌরবজনক ভূমিকা তার বিস্তৃত বিবরণ লেখকের (উমা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে লিখিত) 'দি অরিজিনস্ অব দ্য ন্যাশন্যাল এডুকেশন মুভমেণ্ট' গ্রন্থে (১৯৫৭) লিপিবদ্ধ আছে। ১৯০৭ সনে মালদায় যে জাতীয় শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয় তিনি ছিলেন তার প্রাণপুরুষ। "জাতীয় শিক্ষা'র একনিষ্ঠ সেবকরূপে বিনয় সরকারকে না দেখলে তাঁকে অপূর্ণভাবে দেখা হবে। ১৯৪৬ সালে তিনি 'যাদবপুর কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেকনলজি' সম্বন্ধে যে সমাজতাত্ত্বিক বিবরণ লেখেন, তার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে ঐ প্রতিষ্ঠানের জন্য তাঁর গভীর মমত্ব ও আন্তরিক দরদ। বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার সঙ্গে স্বদেশসেবার প্রচণ্ড তাগিদ তাঁর জীবনে ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু কোনো গোঁড়ামির মায়াজাল তাঁর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তিনি পাঁড় বাঙালী হয়েও প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক ছিলেন এবং বিশ্ব-সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনায় তিনি ছিলেন প্রায় অদ্বিতীয়। যাঁরা পাশ্চাত্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারতের গুরুগিরির ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন তিনি ছিলেন সরাসরি তাঁর বিরুদ্ধে। যাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্গত ও অধঃপতিত ভারতকে চিরদিনের জন্য পাশ্চাত্যের গোলাম করে রাখবার যুক্তিজাল বুনতেন তাঁদের ঔপনিবেশিক মনোভাবেরও তিনি ছিলেন কঠোর সমালোচক।

৪

বিনয় সরকারী দর্শনের এক প্রকাণ্ড স্তম্ভ হলো মানবজাতির মূলগত ঐক্য—প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার মনস্তাত্ত্বিক বা জীবন-দর্শনের সাম্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মূলগত আদর্শে, জীবনদৃষ্টিতে পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র,—ম্যাকস্ মিলার থেকে রুডইয়ার্ড কিপলিং পর্যন্ত প্রচারিত মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েই সরকারবাদের এক মস্তবড় অংশের আবির্ভাব। প্রথম দিকে বিনয়কুমার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতি বিষয়ক সুপ্রচলিত মতবাদ মেনে নিয়েছিলেন। সতীশচন্দ্রের ডন সোসাইটিতে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার গড়নে ও প্রকৃতিতে মূলগত ফারাক বর্তমান,—এই মতবাদ সজ্ঞানে প্রচার করা হতো। ভগিনী নিবেদিতাও ডন সোসাইটির সদস্যদের সামনে একই ভাবধারা প্রচার করতেন। ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য পরলোক-চর্চা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা, অতীন্দ্রিয়তা আর পাশ্চাত্য সভ্যতার সারবস্তু সংসারনিষ্ঠা, ভোগবাদ, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা,—এই ছিল সুপ্রচলিত মতবাদ। তখন এদেশে চলছিল স্বদেশী আন্দোলন বা ১৯০৫-এর গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব। ভারতবর্ষ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে চিরদিন জগদ্‌গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত এ ধবনের ভারত-প্রশস্তি বা মতবাদ কাল্পনিক হলেও জাতীয় আন্দোলনের গতিতে একদা অফুরান শক্তি জুগিয়েছিল। বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগসারথীরা ভাবতীয় প্রতিভার আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের ওপর তৎকালে যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, হীনমন্যতা রোগে আক্রান্ত ভারতীয় মেজাজকে চাঙ্গা করার জন্য ঐ মতবাদের যথেষ্ট কার্যকারিতা ছিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই ভাবের ভাবুক ছিলেন। বিনয়কুমার প্রথম প্রথম এঁদের প্রচারিত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিষয়ক মতবাদ স্বীকার করে নিয়েছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই সেই পুরাণো ও সার্বজনিক মত-পথ সজ্ঞানে বর্জন করেন। তাঁর 'হিন্দু সমাজতত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি' (১৯১৪), 'হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম' (১৯১৭), 'যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা' (১৯২২) ইত্যাদি গ্রন্থ এর প্রমাণ।

১৯১১-১৩ সনে বিনয়কুমার এলাহাবাদের পাণিনি অফিসে প্রাচীন ভারত-বিষয়ক গবেষণায় ব্রতী হন। শুক্রাচার্যের নীতিসার যা সাধারণভাবে 'শুক্রনীতি' নামে পরিচিত,—সেই সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদে তিনি মনোযোগী হন। ১৯১৪ সনে 'শুক্রনীতি'র ইংরেজী অনুবাদ বিস্তারিত টীকা-টিপ্পনীসহ এলাহাবাদ থেকে মেজর বামন দাস বসুর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সমাজতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ তলিয়ে মজিয়ে বুঝবার পক্ষে গ্রন্থখানি অত্যন্ত মূল্যবান। বিনয়কুমার সম্পাদিত শুক্রনীতির ইংরেজী অনুবাদ আজও দেশে-বিদেশে পণ্ডিত মহলে প্রামাণিক বলে স্বীকৃত। শুক্রনীতির তর্জমাকালে বিনয়কুমার ভারতীয় সভ্যতার গড়ন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নয়া আলোর সন্ধান পান। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, প্রাচীনকালের হিন্দুজাতি শুধু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতায় মসগুল হয়ে থাকতো না, তারা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকল প্রকার জীবন-চর্চায়ই পারদর্শী ছিল। ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতিগত বিশেষত্ব তার আধ্যাত্মিকতা,—এই মতবাদ বিনয়কুমারের দৃষ্টিতে যুক্তিহীন উক্তি বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি নিজেই বলেছেন, "সেই শুক্রনীতি তর্জমার যুগে (১৯১১-১৩) ফিরে যাচ্ছি। ভারতীয় সংস্কৃতির এক নয়া মূর্তি আমার নজরে জোরের সহিত দেখা দিতে শুরু করেছিল। সে হচ্ছে সমরনিষ্ঠ, সংসারনিষ্ঠ, রাষ্ট্রনিষ্ঠ, হিংসানিষ্ঠ, শক্তিনিষ্ঠ ভারত। তার পাশে নিবেদিতা-প্রচারিত ভারত-মূর্তি অতি-কাল্পনিক, অতি-অলীক, অতি-ভাবনিষ্ঠ, অতি-আদর্শনিষ্ঠ মনে হচ্ছিল। অর্থাৎ হিন্দু-সংস্কৃতি-বিষয়ক নিবেদিতা-

প্রচারিত ব্যাখ্যাগুলোকে আমি ডন সোসাইটির চিন্তাধারা, ব্রহ্মবান্ধবের বাণী, রবীন্দ্র-সাহিত্য ইত্যাদির মতন প্রায় একই দরের ভেবেছি। সবই এক সঙ্গে বর্জনও করেছি। এই সুপরিচিত ধারার প্রভাবে প্রাচ্য-গৌরব উজ্জ্বল আকারে দেখা দেয়। আর বুকটাও বেশ-কিছু ফুলে' উঠে। কিন্তু ব্যাখ্যাগুলা অনেকটা তথ্যহীন ও বস্তুহীন।" কিন্তু তাই বলে "আজ পর্যন্ত এই চারজনের একজনকেও আমার পূজাস্থান হ'তে একচুলও নামাইনি। মত-পথের অমিল থাকা সত্ত্বেও কোনো বীরকে আমি অবীর বিবেচনা করি না। আমি এঁদের সকলেরই চেলা।" ('বিনয় সরকারের বৈঠকে', দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম ভাগ, ১৯৪৪, পৃ ২৯২।)

৫

এর পরবর্তী অধ্যায় হলো হিন্দু সমাজতন্ত্রের বাস্তব বা সাংসারিক ভিত্তি সম্বন্ধে বিনয়কুমারের ব্যাপক গবেষণা। এই গবেষণার ফলস্বরূপ প্রকাশিত হয় তাঁর 'পজিটিভ্ ব্যাক্গ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি' (১৯১৪)। 'পজিটিভ্' শব্দটা ফরাসী দার্শনিক অগাস্ত্ কঁ্যতের মার্কামারা পারিভাষিক। কঁ্যৎ-দর্শনে 'পজিটিভ্' শব্দের অর্থ সংসারনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ বা জাগতিক অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, পারলৌকিক শব্দের ঠিক বিপরীত। বিনয়কুমার প্রণীত 'পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি' গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুজাতির সংসারনিষ্ঠ, বিজ্ঞাননিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ, লড়াইনিষ্ঠ, শক্তিনিষ্ঠ মূর্তি জ্বল্ জ্বল্ করছে। ভারতবর্ষ মূলত ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ও পরলোক-চর্চার দেশ,—দেশি-বিদেশি ভারততত্ত্বজ্ঞদের প্রচারিত এই ইতিহাস-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে উক্ত গ্রন্থখানি এক বিরাট প্রতিবাদ বিশেষ। সংক্ষেপে এই গ্রন্থে বিনয়কুমারের বক্তব্য হলো নিম্নরূপ: "ভারতবর্ষ ততখানি বস্তুনিষ্ঠ, ততখানি যুদ্ধপ্রিয়, ততখানি শক্তিযোগী, ততখানি সাম্রাজ্যবাদী যতখানি ইয়োরোপ। আবার ইয়োরোপ ততখানি নীতিনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক বা ঐ ধরণের আর কিছু যতখানি ভারতবর্ষ। সাধারণত প্রচার করা হয় যে, ভারতবর্ষ অহিংসার দেশ, কিন্তু আমার মতে তার হিংসানীতি জবরজস্ত, এবং যুদ্ধনিষ্ঠা, রাজ্যলিপ্সা ইত্যাদি চিজও অত্যন্ত ভীষণ।" 'পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড' গ্রন্থরচনা বিনয়কুমারের এক যুগ-নির্দেশক কীর্তিস্তম্ভ। গ্রন্থখানি মোট চার খণ্ডে সমাপ্ত। চতুর্থ খণ্ডের নাম 'ইনট্রোডাকশান টু হিন্দু পজিটিভিজ্‌ম্'। ১৯৩৭ সনে প্রকাশিত। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতদের নিকট এই গ্রন্থ বিশেষভাবে সমাদৃত। ভারতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষকদের ভেতর জার্মাণ পণ্ডিত ভিন্টাবনিট্‌স্, যোলি, হিল্লেব্রান্ট ও মায়ার, ফরাসী পণ্ডিত মাসসন্-উর্সেল, সিলভাঁ লেভি ও লুই রেণোঁ, ইংরেজ পণ্ডিত র‍্যাপসন, টমাস ও কীথ এই বইয়ের তথ্য নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করেছেন। বৃটিশ অর্থশাস্ত্রী আলফ্রেড্ মার্শ্যাল ও আমেরিকান দার্শনিক হকিং এই গ্রন্থে ভারতের নতুন মূর্তি অবলোকন করেছেন। এই গ্রন্থের তথ্য মার্কিন সমাজশাস্ত্রী সোরোকিন, বার্নস্ ও বেক্কার কর্তৃক তাঁদের একাধিক গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকশাস্ত্রী স্যার গিলবার্ট মারে এই বই পড়ে লিখেছিলেন যে, 'বইখানি শুধু যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ তা নয়, এর ভেতর এমন অনেক বস্তু আছে যা আমার নিজের গবেষণার উপর নতুন আলোকপাত করতে পারে' 'Not only full of learning but full of points that may throw light on the problems of my own studies.' ঐ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের সমালোচনা প্রসঙ্গে ফরাসী মনীষী মঁসিয় জাঁ আরবেয়ার (যিনি ১৯৩৭ সনে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ানস্'-এ ফ্রান্সের পক্ষ থেকে এক মস্ত বড়

ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং যিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের গ্রন্থাবলী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে পাশ্চাত্য জগতে এবং ভারতের সুধীমহলে সুপরিচিত তিনি) মন্তব্য করেছিলেন, 'পাশ্চাত্যবাসিগণ যদি সমাজ-বিজ্ঞানে বর্তমান ভারতকে সবচেয়ে ভালভাবে বুঝতে চায়, তবে এ বইখানি অপরিহার্য।' ঐ গ্রন্থের ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় অনুবাদের জন্যও তিনি পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট ফরাসী পত্রিকার মারফৎ আবেদন জানান।

৬

বিনয় সরকারী মতবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর 'ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া' বা 'যুবক এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা' গ্রন্থে। বইখানি জার্মাণীর লাইপৎসিগ শহর থেকে বের হয় ১৯২২ সনে। রয়েল সাইজের চার শতাধিক পৃষ্ঠার বই। এই বইয়ের উৎপত্তি ১৯১৭ সনে আমেরিকার ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর একটি বক্তৃতা থেকে। বক্তৃতাটি পরে প্রবন্ধের আকারে শিকাগোর 'ইন্টারন্যাশান্যাল জার্নাল্ অব এথিকস্' পত্রিকায় জুলাই ১৯১৮ সনে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রবন্ধ পড়ে তৎকালীন আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক জন ডুয়ী মুগ্ধ হয়ে যান এবং তৎপর তিনি ও ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক সেলিগম্যান এক যুক্ত-স্বাক্ষরিত ইস্তাহারে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনয়কুমারের বক্তৃতার জন্য আবেদন জানান।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বিনয়কুমারের 'ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া' গ্রন্থখানি এক যুগান্তকারী প্রকাশন। এই গ্রন্থে যে পাণ্ডিত্য ও মননশীলতা প্রতিফলিত হয়েছে তা রীতিমত বিস্ময়কর। বইখানি সমালোচনা প্রসঙ্গে বার্লিনের একটি পত্রিকা মন্তব্য করে, 'A rich collection of stimulating essays by the distinguished Indian sociologist. Prof. Sarkar reminds us in many ways of our Oswald Spengler on account of startlingly manysided erudition and intellectual flexibility with which this scholarship traverses in a powerful manner all the regions and epochs of human culture. The book exhibits plenty of learning combined with restraint of temperament and is therefore a mine of stimulating suggestions not only to the historian and the philosopher but also to the statesman.' এর সরল অর্থ হলো অধ্যাপক সরকারের বিস্ময়কর বহুমুখী প্রতিভা আমাদের ওস্ওয়াল্ড স্পেংলারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। বইখানি চিন্তার খনি বিশেষ শুধু ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের কাছে নয়, রাজনীতিজ্ঞের কাছেও। জার্মাণীর এক শীর্ষস্থানীয় চিন্তাবীর কার্ল হাউসোফার লিখেছিলেন, 'It may be regarded as a guide to the ideas of leaders of the Asian movement. Everybody who undertakes a deeper and more intensive investigation of this problem, in so far as the exhibition of surging ideas is concerned, will have to begin chiefly by analyzing Sarkar's philosophical fresco of awakening Asia. This is the most magnificent of all presentations from the Asian standpoint known to me' অর্থাৎ বইখানি হলো এশিয়ান আন্দোলনের নেতাদের চিন্তাধারার দিগ্‌দর্শন। এশিয়ান দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা যত বই আমার নজরে এসেছে এটা হলো তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তৎকালীন জার্মানীর চিন্তাধারাকে এই গ্রন্থ যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত ও বিপর্যস্ত জার্মাণীর পুনর্গঠনের কাজে এই বইখানি বিশেষ প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯২৯-৩১ সনে বিনয়কুমার যখন মিউনিক টেকনলজিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গাস্ট-প্রফেসার' বা অতিথি-অধ্যাপক রূপে কর্মরত, সে

সময় অধ্যাপক হাউসোফার বিনয়কুমারকে নিমন্ত্রণ করে নিজ বাড়িতে শোবার ঘরে নিয়ে যান। বিনয়কুমার প্রত্যক্ষ করেন সোনার জলে বাঁধানো 'ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া' গ্রন্থখানি হাউসোফারের শোবার ঘরে বিছানার শিয়রে একটা ছোট টেবিলে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। বইখানি দেখিয়ে হাউসোফার বিনয়কুমারকে বলেন, এটাই যুবক জার্মাণীর নতুন বাইবেল ('This is the new Bible of Young Germany.')। জার্মাণ রাজনীতিতে হিটলারের পরিপূর্ণ আবির্ভাব ঘটতে তখনও বছর দুই দেরী।

৭

অসাধারণ পাণ্ডিত্যের নিদর্শন হিসাবেই কেবল 'ফিউচারিজম্' গ্রন্থখানি যে মূল্যবান তা নয়। এর সর্বাপেক্ষা বড় গুরুত্ব হচ্ছে এক মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা ও তুলনামূলক সমাজবিজ্ঞানে এক অভিনব তর্কপ্রণালীর সুসম্বদ্ধ প্রয়োগ। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিনয়কুমার পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রাচ্যের জীবনচর্চার ও ইতিহাস-ব্যাখ্যার অনেকটাই গোঁজামিল-ভরা ও যুক্তি-বিরোধী বলে অভিযোগ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে গোটা প্রাচ্য পশ্চিমের সাম্রাজ্যিক, ঔপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক অভিযানের সামনে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। প্রাচ্যের সেই বিপর্যস্ত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত অবস্থায় শ্বেতাঙ্গ জাতির পণ্ডিতেরা প্রভুজাতির মনোভাব নিয়ে প্রাচ্য সমাজ ও সভ্যতার যে মন-গড়া ব্যাখ্যা শুরু করে দেন, বিনয়কুমারের "ফিউচারিজম্" গ্রন্থখানি তার বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড প্রতিবাদ ও পাল্টা আক্রমণ। তথ্য ও যুক্তিতে ঠাসা এই বইখানিতে গ্রন্থকারের বৈপ্লবিক মনোভাবের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। প্রথমেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে, গ্রীক উপাখ্যান থেকে জানা যায় একদা এক সিংহকে একটি চিত্র দেখানো হয়েছিল। সেই চিত্রে ছিল একজন মানুষের পায়ের তলায় একটি সিংহ পিষ্ট হচ্ছে। সিংহকে জিজ্ঞেস করা হলো 'চিত্র-শিল্পটি কেমন লাগছে।' উত্তরে সিংহ বললো, 'নিশ্চয়ই আমি এটা খুব উপভোগ করেছি, কিন্তু যদি সিংহ চিত্রকর হতো তবে মানুষটিকে দেখা যেতো সিংহের পায়ের তলায় পড়ে রয়েছে।' ১৭৫৭ থেকে ১৯০৫ সনের যুগটা হচ্ছে এশিয়ার পরাজয় ও ভাগ্যবিপর্যয়ের যুগ ও সেইসঙ্গে পাশ্চাত্যের সাম্রাজিক ও ঔপনিবেশিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার যুগ। "It is the 'master' races that have studied the life and institutions of their dependencies, colonies, protectorates, spheres of influence, and 'mandated' regions The mirror that has been held up to servile and semi-servile Asia by Eur-America has therefore naturally reflected this 'lion in the painting' of the fable.. There must not be one standard for judging human flesh in the West, and another standard for judging it in the East...The very attitude from which the scholars have approached the Orient has to be completely abandoned. The fact of nineteenth century success and overlordship must be banished from the field of scholarship. Oriental culture has to be weighed in the balance under the same conditions of study as the Occidental.' *(Futurism of Young Asia,* pp. 3-4, 22.) এর মুদ্দা কথা হলো আলাদা আলাদা মানদণ্ডে নয়, একই মানদণ্ডে পূবের ও পশ্চিমের রক্তমাংসের মানুষগুলিকে বিচার করতে হবে।

বিনয়কুমার উক্ত গ্রন্থে তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে পশ্চিমা পণ্ডিতদের ত্রুটি বা দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, তুলনামূলক আলোচনায় ইয়োরামেরিকার পণ্ডিতগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে 'সমশ্রেণীর তথ্য' ('সেম ক্লাস অব

ফ্যাক্টরস্') ব্যবহার করেন না। তাঁরা প্রায়ই উনিশ ও বিশ শতকের পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিক গড়নের সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারত-সংস্কৃতির বা প্রাচ্য-সংস্কৃতির তুলনা সাধন করে প্রাচ্যের দীনতা ও হীনতাকে জগৎসমক্ষে তুলে ধরেন। দ্বিতীয়ত, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের তথ্য-ব্যাখ্যায় 'একই ধরণের বিশ্লেষণ-প্রণালী' ('সেম মেথড্ অব ইন্টারপ্রিটেশন') তাঁরা প্রয়োগ করেন না। তৃতীয়ত, দফায় দফায় ('আইটেম্ বাই আটটেম্') অর্থাৎ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের আদর্শ ও চিন্তার সঙ্গে আদর্শ ও চিন্তার এবং কর্মপ্রচেষ্টা ও বাস্তব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কর্মপ্রচেষ্টা ও বাস্তব প্রতিষ্ঠানের কালানুক্রমিকভাবে তুলনা সাধন করেন না। অধিকাংশ পণ্ডিতই ঐতিহাসিক বিবর্তনের বিভিন্ন ধারা বা স্তর সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ বা ওয়াকিবহাল নন। তাই তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞাননিষ্ঠ মেজাজে ইয়োরামেরিকান পণ্ডিতেরা তুলনামূলক আলোচনা চালাতে প্রায়ই সমর্থ হন নি—তাঁরা বিজ্ঞানের নামে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে বহু অবৈজ্ঞানিক ও বুজরুকিপূর্ণ মতবাদ প্রচার করে চলেছেন। প্রাচ্য দেশীয় পণ্ডিতদের তুলনামূলক আলোচনায়ও উক্ত গলদগুলি দৃষ্ট হয়।

উল্লিখিত তিনপ্রকার ত্রুটি থেকে তুলনামূলক আলোচনাকে মুক্ত করে তাকে যথার্থ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে দাঁড় করাবার জন্য বিনয়কুমার তাঁর ঐ গ্রন্থে তথ্য ও যুক্তির সকল শক্তি নিয়ে লড়াই করেছেন ইয়োরামেরিকার বাঘা-বাঘা পণ্ডিতদের আসরে। তাঁর মূল বক্তব্য মানুষ মূলত এক ; রক্তমাংসের জীব হিসাবে মানুষ দুনিয়ার সর্বত্রই একই ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে চেয়েছে ও শ্রীবৃদ্ধি চেয়েছে। ধর্ম-অর্থ-কম-মোক্ষ কোনকিছুই তার কাছে ফেলিতব্য চিজ নয়। অথর্ববেদে বর্ণিত পুরুষের মত সে সর্বদা ও সর্বত্রই চেয়েছে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করতে। বিনয়কুমারের মতে প্রাচ্য পশ্চিম থেকে বেশি নীতিনিষ্ঠ, বেশি আধ্যাত্মিক, বেশি ধর্মপ্রবণ নয়, আবার পশ্চিমও প্রাচ্য থেকে বেশি সংসারনিষ্ঠ, বেশি ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ, বেশি বস্তুতান্ত্রিক নয়। বিনয়কুমারের ভাষায়, "We do not claim for the people of Asia, whether historically, or psychologically, greater intellectuality or greater spirituality than for the rest of mankind." প্রাচ্য-পাশ্চাত্যবাসীর জীবনদৃষ্টি বা বিশ্বদৃষ্টির মধ্যে তিনি মৌল পার্থক্যের বদলে খুঁজে পেয়েছেন মৌল সাদৃশ্য। শারীরিক বিভিন্নতা ও ঐতিহাসিক জাতি-বিদ্বেষ সত্ত্বেও মানুষের মনস্তত্ত্ব সর্বত্রই এক ও অভিন্ন। শিকাগো ধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাম্য প্রতিষ্ঠার যে সংগ্রাম ১৮৯৩ সনে শুরু হয়, বিনয় সরকারের মধ্যে তার সার্থক পরিণতি দেখতে পাই। পরিণত বয়সে লেখা তাঁর 'ক্রিয়েটিভ্ ইণ্ডিয়া' বা 'স্রষ্টা ভারত' (লাহোর, ১৯৩৭) গ্রন্থখানিকে বিনয় সবকারী মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্বকোষী ব্যাখ্যা বলা চলে। মহেনজোদারো সভ্যতা থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন পর্যন্ত ভারতীয় সৃষ্টি বিশ্ব-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে যুগের পর যুগ ধরে (তুলনামূলক সমাজ-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে) ঐ গ্রন্থে বিশ্লেষিত হয়েছে।

৮

বিনয় সরকারের সমাজচিন্তা, অর্থনৈতিক চিন্তা ও রাষ্ট্র-চিন্তা মামুলি ধরনের ছিল না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁর সৃষ্টি স্বাতন্ত্র্যে ও মৌলিকত্বে উজ্জ্বল। তিনি জার্মাণ সংস্কৃতির মস্তবড় অনুরাগী ও প্রচারক ছিলেন বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আবহাওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কেউ প্রচার চালিয়েছিলেন তিনি গণতন্ত্রের শত্রু ও হিটলারী স্বৈরতন্ত্রের সমর্থক। এ ধারণা একেবারেই

ভুল। তিনি চিন্তার ক্ষেত্রে ছিলেন বহুত্বনিষ্ঠার ("প্লুর‍্যালিজমে"র) উদ্গাতা। তিনি ছিলেন ব্যক্তি-স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী। তিনি মনে করতেন সঙ্ঘের অধীন ব্যক্তি-স্বাধীনতা অনেক সময়ই গোলামির সামিল। পার্টি বা রাষ্ট্রের প্রতিপত্তি অযথা বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব বা লুপ্ত হয়। তিনি সকলপ্রকার স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। তাত্ত্বিক দিক থেকে গণতন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধ যতই উচ্চারিত ও প্রচারিত হোক না, বাস্তব জীবনে গণতন্ত্রের ও সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদ যুগপৎ বিরাজ করতে পারে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থই হলো এক জাতির উপর আর এক জাতির আধিপত্য বিস্তার। আন্তর্জাতিকতার চর্চা করতে গিয়ে তিনি জাতীয় স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিতে রাজী হন নি। 'Unpatriotic internationalism'-এর বিরুদ্ধে তিনি বক্তব্য রেখেছেন। যে কোনো সাম্রাজ্যবাদের--তা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদ হোক বা কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ হোক তার—বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরতে দ্বিধা বোধ করেন নি। তিনি মামুলি বা গতানুগতিক চিন্তার লোকপ্রিয় প্রবক্তা ছিলেন না।

দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে বিনয় সরকার অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বহুত্বনিষ্ঠার দর্শন খাড়া করেছেন। মানব জীবনের বা ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারায় তিনি কোনো একটি শক্তি ও প্রেরণার বদলে লক্ষ্য করেছেন রকমারি শক্তি ও প্রেরণার প্রভাব। কার্ল মার্কসের অর্থনৈতিক অদ্বৈতবাদকে তিনি ততখানিই ভ্রমাত্মক বিবেচনা করতেন যতখানি হেগেলের ভাববাদী অদ্বৈতবাদকে, অথচ দুই চিন্তাবীরকে তিনি ঋষি বা যুগাবতার বলে কুর্নিশ করেছেন। তাঁর রচিত 'ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ সোশ্যাল প্যাটার্নস্' বা 'পল্লী ও শহরের সামাজিক গড়ন' গ্রন্থে (কলিকাতা, ১৯৪১) এ বিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা আছে।

৯

বিনয় সরকার শুধু একজন দিকপাল মনীষী ছিলেন না, স্বদেশপ্রেমিক হিসাবেও তাঁর স্থান ছিল খুব উঁচুতে। যৌবনের প্রারম্ভে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন তিনি 'ডন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর নিকট স্বদেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এই স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শ তাঁর সকল কর্মকে উদ্দীপিত করেছিল। জাতীয় অভাব মোচন ও স্বদেশের অগ্রগতি এই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তিনি কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদী ছিলেন, কিন্তু আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বজনীনতার ক্ষেত্রেও তাঁর জুড়িদার খুব কম ব্যক্তিই ছিলেন। ১৯৪৪ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া বিনয় সরকারকে এক পত্রে লিখেছিলেন, **'Let me say that you have excelled us all in your wide knowledge of men and things, the depth of your knowledge and the breadth of your vision. There is hardly a second man in India of today to properly evaluate all nations and their contributions to the Commonwealth of Culture.'** পাশ্চাত্যের কোনো কোনো দিকপাল মনীষীকেও বিনয় সরকার সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতে দেখি।

১০

বিনয় সরকার ইংরেজী, ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় যেমন প্রচুর লিখেছেন, বাংলা ভাষায়ও তেমন বিস্তর। আমাদের দেশে আজও পণ্ডিতেরা তাঁদের গবেষণামূলক চিন্তা সাধারণত ইংরেজী ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করতে অভ্যস্ত, বাংলা ভাষায় তাঁদের লেখালেখির পরিমাণ যৎসামান্য। বিনয়কুমার স্বদেশী যুগ থেকে স্বদেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বাংলায় লেখা মূল গ্রন্থগুলির মধ্যে 'শিক্ষা-বিজ্ঞানের ভূমিকা' (১৯১০), 'ভাষা শিক্ষা' (১৯১০), 'শিক্ষা-সমালোচনা' (১৯১২), 'সাধনা' (১৯১২), 'বিশ্বশক্তি' (১৯১৪), 'হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন' (১৯২৬), 'একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র' (দুই খণ্ড, ১৯৩০-৩৫), 'নয়া বাংলার গোড়াপত্তন' (দুই খণ্ড, ১৯৩২), 'বাড়তির পথে বাঙালী' (১৯৩৪), 'বাংলায় ধনবিজ্ঞান' (১৯৩৭-৩৯) ও 'সমাজ-বিজ্ঞান' (১৯৩৮) গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও তাঁর অসংখ্য বাংলা প্রবন্ধ সাময়িক পত্র-পত্রিকায় এখনও ছড়িয়ে রয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠান যদি উদ্যোগী হয়ে এগুলি সঙ্কলন ও প্রকাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তা হবে জন্মশতবর্ষে বিনয়কুমারের স্মৃতির প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য। সংক্ষেপে তাঁর চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিফলন পাওয়া যায় দুইখণ্ডে সমাপ্ত 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (১৯৪২-৪৫, পৃ ১৫০০)। বইখানিকে বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি বিষয়ক ব্যাপক গবেষণা বলা চলে। কিন্তু এই গ্রন্থখানিও বহুদিন থেকেই দুষ্প্রাপ্য।

১১

বাংলায় মূল গ্রন্থ লেখা ছাড়াও বিনয়কুমার বাংলা সাহিত্যের উন্নতিকল্পে বিদেশী গ্রন্থ থেকে বঙ্গানুবাদের দিকে সজ্ঞানে প্রচেষ্টা চালান। ১৯১১ সনে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হাতে তিনি যে অর্থভাণ্ডার তুলে দেন, তার শর্তই ছিল অনুবাদ সাহিত্যের জন্য ঐ সংগৃহীত অর্থ ব্যয়িত হবে। প্রথম যে বই অনূদিত হবে এবং অনুবাদক কে হবেন তা বিনয়কুমারই নির্দিষ্ট করে দেন। প্রথম যে গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ করা হবে তা হলো ফরাসী ভাষায় লেখা গীজো-প্রণীত 'ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস' আর এর অনুবাদক হবেন মনীষী রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। বিনয়কুমার প্রদত্ত অর্থ ভাণ্ডার থেকে ঐ ফরাসী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ১৯২৬ সনে প্রকাশিত হয়। বিনয়কুমার নিজেও ইংরেজী, ফরাসী ও জার্মাণ ভাষা থেকে কতকগুলি মূল্যবান গ্রন্থ বাংলায় তর্জমা বা ভাবানুবাদ করেন—যেমন 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর' (বুকার টি ওয়াশিংটনের 'আপ ফ্রম শ্লেভারী' গ্রন্থের তথ্য), 'স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণনীতি' (জার্মাণ অর্থশাস্ত্রী ফ্রেডারিক লিস্টের জার্মাণ গ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশের বঙ্গানুবাদ—বিভিন্ন পত্রিকায় ১৯১৪-২৩-এর যুগে প্রবন্ধাকারে বের হয় ও পরে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে), 'নবীন রাশিয়ার জীবন-প্রভাত' (ট্রটস্কির জার্মাণ গ্রন্থের তথ্য), 'পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র' (এঙ্গেল্‌স-এর জার্মাণ গ্রন্থের তথ্য) ও 'ধন-দৌলতের রূপান্তর' (লাফার্গের ফরাসী গ্রন্থের তথ্য)। এই গ্রন্থগুলি যথাক্রমে ১৯১৪, ১৯৩২, ১৯২৪, ১৯২৬ ও ১৯২৭ সনে প্রকাশিত হয়। বিনয়কুমারের মৃত্যুর পর (নভেম্বর ১৯৪৯) 'যুগান্তর' পত্রিকা সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখে যে, 'সাম্প্রতিক কালের যে সব চিন্তা লইয়া, মতবাদ লইয়া দেশে আজ এত মাতামাতি চলিতেছে, তাহার অনেকটুকুই আমাদের ভাষায় প্রথম আমদানী করেন বিনয় সরকার।...অন্য বহু বিষয়ের মতো এবিষয়েও তিনি দেশের অগ্রগামী ভাবুক ও নায়ক স্বরূপ।'

বাংলা সাহিত্যে বিনয়কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান 'বর্তমান জগৎ' বিষয়ক গ্রন্থাবলী। প্রায় ৫০০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই গ্রন্থগুলি তাঁর বিশ্ব-পর্যটনের (১৯১৪-২৫) ফল। এই সকল গ্রন্থ মামুলি ধরনের ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক বিবরণ মাত্র নয়। এগুলিতে আছে বর্তমান জগৎ-বিষয়ক অজস্র তথ্য—যে তথ্যের অনেকাংশই ইংরেজী, ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান ভাষায় প্রকাশিত দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যালোচনা তো আছেই। বর্তমান জগৎ বিষয়ক গবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উক্ত গ্রন্থমালা। এত তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ বাংলায় আর দ্বিতীয় নেই। এই গ্রন্থমালার তথ্যগুলি ১৯১৪-২৫-এর যুগে বাংলার বহু সাপ্তাহিক ও মাসিকে ও পরে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। সাহিত্যিক গোপাল হালদার ও গিরিজাশঙ্কব রায়চৌধুরী এবং ঐতিহাসিক ডক্টর বিনয়চন্দ্র সেনের মুখে বহুবার শুনেছি যে, তৎকালে প্রকাশিত বিনয় সরকারের রচনাবলী তাঁরা কত আগ্রহ নিয়ে পড়তেন। তখনকার দিনে অনেকেই বিনয়কুমারকে স্বামী বিবেকানন্দের যোগ্য উত্তর-সাধক বলে জ্ঞান করতেন। ১৯৩২ সনে বিনয়কুমার লিখেছিলেন, "'শ' দুই-দেড়েক বৎসর ধরিয়া 'বর্তমান জগৎ' ভাবতাত্মাকে খুব জোরসে ঘায়ের পর ঘা লাগাইতেছে। তবুও 'বর্তমান জগৎ'কে পাকড়াও কবিবার আন্তরিক আর যথোচিত প্রয়াস ভারতীয় নরনারী করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। বিশ্বশক্তিব সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে ভারত-সন্তান বড়ই উদাসীন।...বিশ্বশক্তি শক্তমুঠায় পাকড়াও করিবার উপব ভারতের আত্মিক, আর্থিক আর রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা পুরাপুরি নির্ভর করিতেছে। কাজেই 'বর্তমান জগৎ' সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা সাহিত্য সংসারের বিলাস-সামগ্রী মাত্র নয়।" 'বর্তমান জগৎ' বিষয়ক গবেষণা বিনয়কুমারের নিকট ছিল দেশোন্নতির মস্তবড় যন্ত্র বা হাতিয়াব কিন্তু তাই বলে তাঁর 'বর্তমান জগৎ' গ্রন্থাবলী প্রচারধর্মী সাহিত্য হয় নি। গ্রন্থ-প্রণয়নেব পেছনে দেশোন্নতির প্রচণ্ড তাগিদ থাকলেও গ্রন্থের মূল বিষয় বর্তমান জগতের গতি ও প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা। তের খণ্ডে সমাপ্ত বর্তমান জগৎ গ্রন্থমালা (১৯১৪-৩৫) বাংলা সাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদ।

১২

ধনবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, দর্শন ও ইতিহাসেব গবেষণায় বিনয় সরকার সারাজীবন ব্যাপৃত থাকলেও বিশুদ্ধ সাহিত্য ও সুকুমার শিল্প চর্চায়ও তাঁর উৎসাহ ছিল প্রচুর। ঐ বিষয়ে তিনি লিখেছেনও প্রচুর। বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর আলোচনা ও সমালোচনা তাঁব অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচয় প্রদান করে। 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' গ্রন্থের দুই খণ্ডে তিনি সাহিত্য সম্বন্ধীয় যে বিশ্লেষণ চালিয়েছেন তা রীতিমত চমকপ্রদ। প্রচার-সাহিত্য ও সাহিত্য-শিল্পের মধ্যে তিনি বিস্তর পার্থক্য টানতেন। শিল্পের মধ্যে বাণী-প্রচার থাকলেও যে-কোনো বাণী-প্রচার শিল্প নয়। 'বৈঠকে' তিনি বলেছেন, "গুরুমশায় সৃষ্টি করে তর্ক, শ' সৃষ্টি করে গল্প (ঘটনা), চরিত্র ও অবস্থা। সাহিত্যের ভেতর উপদেশ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। কিন্তু সাহিত্য স্রষ্টা যদি হতে চাও, তক্কা-তক্কি সৃষ্টি করো না। যদি প্রবন্ধ লেখো তা হ'লে গল্প লেখা হবে না। সৃষ্টি করো গল্প, সৃষ্টি করো চবিত্র, আর সৃষ্টি করো অবস্থা।...আনাতোল ফ্রাঁসের গল্পাবলীর ভেতর সাঁতার কাটতে শেখো। আসল সাহিত্য-সৃষ্টির কর্মকৌশল পাকড়াও করতে পারবে।"

সেকালের রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-মধুসূদন দত্ত-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যরীতি সম্বন্ধে বিনয়কুমারের মধ্যে যে দরদ ও সজাগতা লক্ষণীয় সেই দরদ ও

আন্তরিকতা নিয়ে তিনি রবীন্দ্র-নজরুল কাব্য থেকে সাম্প্রতিক কালের গদ্য কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। ১৯৩১-৪০ সনের 'একস্‌প্রেশানিস্ট'-ধর্মী কবিদের (যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে ইত্যাদি 'প্রকাশ-দরদী' কবিদের) কাব্যরীতির নয়া ঢং দেখে তিনি 'বাড়তির পথে বাঙালী'—দর্শনের নতুন ইঙ্গিত বা ইশারা পেয়েছেন। সুধীন দত্ত, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, জসীমুদ্দিন কেউই তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারেননি। তিনি নজরুল কাব্যের বিশেষ গুণগ্রাহী ছিলেন। নজরুলের রচিত 'বিদ্রোহী' কবিতা পড়ে বার্লিন থেকে তিনি নজরুলের কাব্য-প্রতিভার জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছিলেন (১৯২২) যখন হাবিলদার নজরুল কবি নজরুল হিসাবে বাংলা-সাহিত্যে প্রায় অপরিচিত মূর্তি। কাজী নজরুলের কাব্য-প্রতিভার সম্বন্ধে 'বৈঠকে' বিনয়কুমার ১৯৪৩ সনে যে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তৎকালে সেরূপ আলোচনা বাস্তবিকই বিরল ছিল। তাঁর বিচারে "নজরুল-কাব্যের প্রথম মুদ্দা বিপ্লব, আর দ্বিতীয় মুদ্দা ভালোবাসা।...নজরুল ভালোবাসার সাহিত্যে বাঙালী কবিদের ভেতর খুবই উঁচু। এই কবি খোলাখুলি ভালোবাসার গান লিখে আর গেয়ে যেতে পারে। এই কথাটা বঙ্গসাহিত্যে যারপরনাই মূল্যবান। . ভালোবাসাটা যে শারীরিক চিজ একথা কবিতায়, নাটকে, নভেলে লিখতে বাঙালীর হাত কাঁপে-মুখ শুকিয়ে আসে। বুক ফেটে যায়। যদি বা দু-একজন লিখলো—তার সমালোচকেরা এই মামুলি রক্তমাংসের স্বধর্মটাকে নিঙড়ে-শুকিয়ে একটা তথাকথিত 'আধ্যাত্মিক' তত্ত্বের-কেঠো তক্‌তায় নিয়ে ঠেকাবেই ঠেকাবে।..বাঙালী জাতের আবহাওয়ায় নজরুলের পক্ষে ভালোবাসার কবি হওয়া খুবই বাহাদুরির কাজ। অতিমাত্রায় বেহায়া আর ঠোঁট-কাটা না হ'লে নজরুলের পক্ষে অনেক কবিতাই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। এই হিসাবে নজরুল বিপ্লবী। নজরুলকে দেখে হয়ত অনেক বাঙালীর ভয় ভেঙেছে বা ভাঙছে। নজরুলের প্রেম-সাহিত্যকে বঙ্গ-কাব্যে মানবিকতা বা মানব-নিষ্ঠার পথপ্রদশক বলতে পারি।"

১৩

বাংলা গদ্য-রচনায় বিনয় সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হলো এক বিশিষ্ট রচনাশৈলীর প্রবর্তন। কথ্যভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ স্বামী বিবেকানন্দ উনিশ শতকের শেষ দশকে গ্রহণ করেছিলেন বিনয় সরকারের গদ্যরীতি তারও পরবর্তী ধাপ। 'তাঁহার অভিব্যক্তির ভঙ্গীতে একটা বিশিষ্টতা ছিল। তিনি নিতান্ত সহজ এবং সরলভাবে দুরূহ এবং জটিল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন। বাংলা সাহিত্যে এইভাবে তাঁহার লেখায় একটা 'স্টাইল' গড়িয়া উঠে' ('দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য, ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪৯)। বিনয় সরকারী গদ্যরীতির প্রথম বৈশিষ্ট্য ছোট বহরের বাক্য রচনা। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তাঁর গদ্যরীতিতে সাধু শব্দের সঙ্গে গ্রাম্য, মেঠো, চলতি শব্দের সংমিশ্রণ অর্থাৎ গুরু-চণ্ডালির সজ্ঞান প্রয়োগ। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি সাধু-চলতি বাংলা শব্দের সঙ্গে হিন্দী, উর্দু, ফার্শী ভাষা থেকে শব্দ গ্রহণ করে অনেক জোরালো বাক্য গঠন করেছেন। শান্তিনিকেতন কলাভবনের ভূতপূর্ব কিউরেটার ও 'ইণ্ডিয়ানা' নামক গ্রন্থ-পঞ্জি বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র গুহ, 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৪২) বিনয়কুমার ব্যবহৃত নতুন নতুন শব্দের এক সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করে বর্তমান লেখককে পাঠিয়েছিলেন। গ্রন্থের ১০৯ পৃষ্ঠার মধ্যেই শতাধিক নতুন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বলে গুহ উল্লেখ করেন। গুহ'র মতে এর 'অনেকগুলিরই প্রথম ব্যবহার বিনয় সরকারের মুখে ও কলমে আসিয়াছে। কবিদের

মধ্যে প্রথমে মধুসূদন দত্ত কতকগুলি নতুন শব্দ ও ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়াছেন, পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করিয়াছেন। অপরাপর লেখকদের মধ্যে বিনয় সরকার অনেক-কিছু প্রয়োগ করিতেছেন।' এই নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগের ও গুরু-চণ্ডালির পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টায় বিনয়কুমারের রচনা-শৈলীর পরিণত প্রকাশ দেখতে পাই "বিনয় সরকারের বৈঠকে'। বিনয়কুমার ব্যবহৃত শব্দাবলীর অনেকগুলিই আজ আর সাহিত্যের আসরে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়—যেমন আড্ডা, ওয়াকিবহাল, গোড়াপত্তন, গড়ন, তারিফ্, চিজ্, বাঘা বাঘা, গণ্ডা গণ্ডা, নয়া নয়া, ইজ্জদ্, বস্তুনিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ, বোধিনিষ্ঠ, প্রাবন্ধিক, গাল্পিক, শক্তিধর্মী, হিংসাধর্মী, দুনিয়া, লড়াই, বাপকা বেটা, কুছ পরোয়া নাই, টক্কর দেওয়া, পাকড়াও করা, কায়েম করা, বিলকুল বদলাইয়া গেল, জুতিয়ে দুরস্ত করা, আসমান-জমিন ফারাক, কসুর করেন নাই, বাৎলাইয়া দেওয়া, তোয়াক্কা না রাখা ইত্যাদি। বিনয়কুমারের স্টাইলের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ এই যে, তিনি বাংলা ভাষার জাত মেরেছেন। সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন এই প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'যাঁরা বাংলা ভাষাব আভিজাত্য রক্ষার পক্ষপাতী, তাঁরা বলেছেন—বিনয়বাবু বাংলা ভাষার জাত মেরে চরম অবিনয়েরই পরিচয় দিয়েছেন। বিনয়বাবুর তরফ থেকে এ কথার বিনীত উত্তর হচ্ছে এই যে, বাংলা ভাষার জাতটা এতো ঠন্‌কো নয় যে, এত সহজে তা ভেঙে যাবে। আমি বাংলা ভাষার জাত মারিনি,—বরঞ্চ তার ভেতর নতুন রক্তকণিকার সঞ্চার করে তাকে সুস্থতর ও সবলতর করতে চেয়েছি।'

১৪

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষায় অর্থশাস্ত্র ও সমাজ-বিজ্ঞান বিষয়ক উচ্চতম গবেষণার ক্ষেত্রেও বিনয় সরকার পথিকৃৎ। বার বছর বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি যখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনি প্রথম থেকেই ধনবিজ্ঞান বিষয়ক চর্চায় যুগপোযোগী নতুন চিন্তাধারা প্রচার করতে থাকেন। বিদেশে থাকাকালীন তিনি ইয়োরামেরিকার শ্রেষ্ঠ ধনবিজ্ঞানীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হন ও তাঁদের পরিচালিত ধনবিজ্ঞান বিষয়ক খাঁটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে ধনবিজ্ঞানসংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। সেই গবেষণার সময় ভারতীয় পণ্ডিতদের অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার দুর্বলতাগুলি তাঁর নজরে পড়ে। বিদেশে অবস্থানকালেই তিনি 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় "মেথডলজি অব রিসার্চ ইন্ ইকনমিক্স্" প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (১৯২৪)। দেশে ফেরার পর নরেন্দ্রনাথ লাহা প্রমুখ বন্ধুর সহযোগিতায় ১৯২৬ সনে 'আর্থিক উন্নতি' নামক একটি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ও 'বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ' (১৯২৮) নামক একটি গবেষণা পরিষৎ তিনি স্থাপন করেন। বিনয়কুমার নিজেই তদবধি আমৃত্যু পত্রিকার সম্পাদক ও পরিষদের পরিচালক ছিলেন (১৯২৬-৪৯)। উভয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্যের গবেষণা ও বিশ্লেষণ। সুপ্রচলিত সার্বজনিক চিন্তাধারা থেকে বিনয়কুমারের অর্থনৈতিক চিন্তাপ্রণালী ছিল বিলকুল স্বতন্ত্র। 'বৈঠকে' তিনি নিজেই বলেছেন।

'প্রথমতঃ, ভারতীয় সুধীমহলে আলোচিত হতো একমাত্র বা প্রায় একমাত্র ভারতীয় আর্থিক তথ্য। আমার আলোচনায় আর্থিক ভারতকে একা হাজির হতে হয় না। প্রায় প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই ভারতকে ফেলা হয় ইয়োরামেরিকার নানাদেশের ও জাপানের ভেতর।

'দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সুধীরা বিদেশী অর্থকথা ক্বচিৎ কখনো আলোচনা করতেন। অধিকন্তু তাঁদের আলোচনায় বিদেশটা ছিল প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র বিলাত। আমার

আলোচনায় ইয়োরামেরিকার বহুদেশ এবং জাপানও এসে পড়ে। সুতরাং বিলাতের একাধিপত্য থাকে না।

'তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশে যখন-তখন বকা হতো 'ভারতীয় অর্থশাস্ত্র'। তার জায়গায় আমি দাঁড় করালাম 'বিশ্বদৌলত ও আর্থিক ভারত'। তুলনামূলক ধনবিজ্ঞান হলো আমার পারিভাষিক। আমার বকাবকিতে দুনিয়ানিষ্ঠা দাঁড়িয়ে গেছে আট-পৌরে গবেষণার আত্মিক ভিত্তি।

'চতুর্থতঃ, ভারতীয় সুধীগণের আর্থিক চিন্তায় সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে রাষ্ট্রনীতির প্রভাব দেখা দিত। আমার লক্ষ্য হলো ধনবিজ্ঞানকে 'পারিত পক্ষে' রাষ্ট্রনীতি থেকে মুক্ত করা।

পঞ্চমতঃ, ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক আকাঙক্ষা, লক্ষ্য, আদর্শ ও ভাবুকতা ছিঁকেয় তুলে রেখেছি। তার বদলে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক যুক্তির স্বরাজ। সুতরাং বস্তু-পরিচয়, তথ্যসংগ্রহ ও সংখ্যাবিশ্লেষণ বা মাপাজোপা দাঁড়ালো প্রধান ধান্ধা। এর উল্টা ছিল ভারতীয় সুধীমহলে প্রায় সর্বজনপ্রিয় আদর্শ-নিষ্ঠার ধনবিজ্ঞান।'

বিনয়কুমারের নিজের কথাগুলির যাথার্থ্য যাচাই হয়ে যায় তাঁর অর্থনৈতিক রচনাবলীর দিকে একটু নজর দিলেই। ১৯২৬ সনে—তাঁর 'ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়, আর দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩২ সনে, ডিমাই সাইজের প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার বই। ভারতীয় পণ্ডিতগণের অর্থনৈতিক চিন্তাপ্রণালী থেকে বিনয় সরকারী চিন্তা-প্রণালী কতটা স্বতন্ত্র গ্রন্থের পৃষ্ঠা উল্টালেই সহজে নজরে পড়ে। জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত খাঁটি ধনবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ 'ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট'। তথ্যসংগ্রহ, সংখ্যানিষ্ঠা, তুলনামূলক বিশ্লেষণ-প্রণালী ও সিদ্ধান্ত অনুধাবন করলে মনে হয় এ জাতীয় গ্রন্থ ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তায় এই প্রথম। গ্রন্থের মুদ্দা কথা বিনয়কুমারের ভাষায় 'There is but one postulate running through the whole collection. It may be worded thus : whatever has happened in the economic sphere in Eur-America during the last half-century is bound also to happen more or less on similar and even identical lines in Asia and of course in India during the next generation or so.' পরিতাপের বিষয় এই যে, অর্থনীতিবিশারদ ডক্টর ভবতোষ দত্ত তাঁর 'দি এভোলিউশান অব ইকনমিক্ থিংকিং ইন্ ইণ্ডিয়া' পুস্তকের (১৯৬২) কোথাও বিনয়কুমারের অর্থনৈতিক রচনাবলীর বিশেষত্ব সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই করেন নি বা তাঁর কোনো গ্রন্থের নামোল্লেখ পর্যন্ত করেন নি। পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ডক্টর দত্ত ১৯০৫ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত সময়কার ভারতীয় সুধীবৃন্দের অর্থনৈতিক রচনা ও চিন্তাধারা নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। একজায়গায় তিনি লিখেছেন 'During the entire period of the first four decades of the persent century, economic thinking in India was intensely nationalistic". ১৯৬২ সনে যে কথা ডক্টর দত্ত লিখেছেন, সেটাই বিনয়কুমারের একটা প্রধান বক্তব্য ছিল বিশের দশক থেকে আগাগোড়া। ধনবিজ্ঞান তাঁর দৃষ্টিতে একটা সার্বজনীন বিদ্যা, 'ভারতীয় অর্থশাস্ত্র' থেকে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তাধারাকে জাতীয়তাবাদের কবল ও রাষ্ট্রনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য বিনয়কুমার সরকার বিশের দশক থেকে নানা বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও গ্রন্থে সজ্ঞানে লড়াই করেছেন। অন্যান্য বহু পণ্ডিতের রচনাবলীর কথা ডক্টর দত্তের গ্রন্থে আলোচিত হলেও বিনয়কুমারের অতি-উল্লেখযোগ্য অবদান সত্ত্বেও তাঁর রচনাবলীর কোনো মূল্যায়নই ঐ গ্রন্থে নেই। শিবচন্দ্র দত্ত প্রণীত 'কনফ্লিক্টিং টেনডেনসিজ্ ইন্ ইণ্ডিয়ান ইকনমিক থট' (১৯৩৪, পৃ. ২২৫ রয়েল সাইজ) গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করলে ডক্টর দত্তের গ্রন্থের দুর্বলতা বা অপূর্ণতা বুঝা যায়।

আর একটা কথা। বিনয় সরকার প্রমুখ মনীষীর অর্থনৈতিক গবেষণাকে শ্রেণীবদ্ধ করার অসুবিধা বর্ণনা প্রসঙ্গে ডক্টর দত্ত তাঁর পুস্তকের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'It is impossible, **for example, to place either Benoy kumar Sarkar or Radha Kamal Mukherjee in any specific group. Both of them wrote on economies, on subjects bordering on economics and also on subjects quite removed from economics'** বিনয়কুমার ধনবিজ্ঞান ছাড়াও অন্যান্য রকমারি বিদ্যায় যেহেতু অনুশীলন করেছেন, অতএব ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যায়ন করা যাবে না—এই চিন্তা প্রণালীতে যুক্তির ফাঁক যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ কবিতা ছাড়া অন্য বহু বিষয়েও যেহেতু মাথা খেলিয়েছেন, অতএব রবীন্দ্রনাথকে ঠিক কোনো শ্রেণীভুক্ত করা যাবে না এ দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিসিদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী হবে তাঁকে একই সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করা যাতে তাঁর প্রতিভার বহুমুখিনতা প্রতিফলিত হয়। বিনয় সরকারের বেলায়ও ঐ একই প্রণালী প্রয়োগ করতে হবে, কারণ তিনি একাধারে ধনবিজ্ঞানী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, ঐতিহাসিক ও শিল্প সমঝদার।

আরও একটা কথা প্রণিধানযোগ্য। যে কোনো বিজ্ঞান বা দর্শনের তিনটি বিভাগ—যথা তত্ত্বকাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও ঐতিহাসিক কাণ্ড। বিনয়কুমার সরকার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বকাণ্ড বা ঐতিহাসিক কাণ্ডের পরিবর্তে কর্মকাণ্ডের ('এপ্লায়েড্ ইকনমিকসের') দিকে সজাগ দৃষ্টি দিলেন কেন জিজ্ঞাসা করা হলে, বিনয়কুমার বললেন, "সর্বদাই ভাবছিলাম, আমাদের দেশের জন্য কোন চিন্তা, কোন শ্রেণীর কাজ সবচেয়ে জরুরি ও সময়োপযোগী? বাঙালি ও অন্যান্য ভারতীয় লিখিয়ে-পড়িয়েদের মগজে কোন-কোন আর্থিক কথা বেশী বসে যাওয়া উচিত? এই সকল প্রশ্ন সর্বদা মনে আসতো প্যারিসের অর্থশাস্ত্রীদের বৈঠকে। ১৯১৪-২০ এর ভারতীয় অর্থশাস্ত্রী ও রাষ্ট্রনায়কদের লেখালেখি ও বকাবকি আমি বিলাত, আমেরিকা, জাপান, চীন ও ফ্রান্স হতে বেশ কিছু দেখছিলাম। মনে হলো যে, ভারতীয় মগজ—বিশেষত বাঙালি মগজ—মেরামত করার প্রয়োজন। আর তার জন্য জরুরি ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড, বিশেষত সংখ্যানিষ্ঠাকর্মকাণ্ড। বুঝতে হবে যে কর্মকাণ্ডকে আমি নেহাৎ ছেলেখেলা বা নকড়া-ছকড়া বিবেচনা করি না। আবার ধনবিজ্ঞানের ইতিহাসও আমার বিবেচনায় ফেলিতব্য চিজ্ নয়। সবই আমি চাই। কিন্তু আমি যখন ধনবিজ্ঞানে লেখালেখি শুরু করি তখন আমাকে দেশ ও দুনিয়ার চারদিকে নজর ফেলে নিজ পথ ঠিক করতে হয়েছিল। ('বিনয় সরকারের বৈঠকে', প্রথম খণ্ড, ১৯৪৪ পৃ ১৬৫-৬৬।)

'বৈঠকে' বিনয় সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, কোনো বিদ্যার দর্শন সেই বিদ্যার কর্মকাণ্ড বা ঐতিহাসিক কাণ্ড থেকে উঁচুজাতের জিনিস নয়। কেউ দর্শনচর্চা করলেই জগতের সেরা পণ্ডিতে পরিণত হন বা দার্শনিক মাত্রেই সবচেয়ে উঁচু ধাপের পণ্ডিত এধরনের মনস্তত্ত্বের উপর 'বৈঠকে' বিনয়কুমার কষাঘাত করেছেন। কারণ এটা বস্তুনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টি নয়। সাম্প্রতিক কালে যাঁরা ধনবিজ্ঞানের অবহেলিত তত্ত্বকাণ্ড নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন ও ধনবিজ্ঞানের উপর নতুন আলোকপাত করছেন তাঁরা নিশ্চয়ই ঐতিহাসিকের কাছে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখা দরকার ঐ বিদ্যার কর্মকাণ্ড বা ইতিহাস-কাণ্ডও কোনো অংশে কম মূল্যের নয়। জীবনের ও সমাজের গতিতে বিদ্যার সকল অংশই প্রয়োজন। যে পণ্ডিত যে বিদ্যার বা বিদ্যার যে অংশের গবেষক সেটাই আসল বা সেরা বিদ্যা এই মনোভাবের মধ্যে চিন্তার অস্বচ্ছতা ও এক রকম গোঁড়ামি লক্ষণীয়। এই

গোঁড়ামি থেকে মন ও বুদ্ধিকে মুক্ত করতে না পারলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুনিয়ায় বিনয় সরকারের যথার্থ মূল্যায়ন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বাংলা ভাষায় ধনবিজ্ঞান চর্চায় তিনি যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন, তার জুড়িদার পাওয়া আজও কঠিন। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে পাদপ্রদীপের আলোকে সেই গৌরবময় ঐতিহ্য তুলে ধরার দায়িত্ব আমাদের সকলের। শুধু সরকারের উপব দায়িত্ব চাপিয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট বা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবো এটা কোনো গৌবেবের কথা নয়। ডক্টর ভবতোষ দত্ত তাঁর 'অর্থনীতির পথে' পুস্তকে (কলিকাতা. ১৯৭৭) বিনয় সরকারের অর্থনীতি চর্চা সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অনেক বেশি যুক্তিসিদ্ধ ও গ্রহণীয়।

১৫

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী স্বদেশপ্রাণ বিনয় সরকার সারা জীবন দুর্গত ও দরিদ্রদের কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এবং অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষদের ললাটে পরিয়েছেন মনুষ্যত্বের গৌরব-তিলক। যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অজ্ঞাতকুলশীলরাই ইতিহাসে নতুন নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। পয়সা বা বিত্ত মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয় এবং বিত্তহীনতা বা দারিদ্র্য মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক নয়,-এই ধারণা তিনি অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন। তাঁর সমাজ-দর্শনে "দুনিয়ার সর্বত্র আজকের পারিয়া কাল হয়েছে ব্রাহ্মণে পরিণত। আজকের গরীবের হাতে কাল এসেছে ধনসম্পদ। আজকের কাপুরুষ কাল হয়েছে গুণ্ডা। আজকে যে গুণ্ডা কাল সে সেনাপতি" ('বিনয় সরকারের বৈঠকে', প্রথম ভাগ, পৃ ৪২৩)। দুনিয়ার সর্বত্র সামাজিক রূপান্তর সাধিত হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সমাজও তার ব্যতিক্রম নয়। শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাঙালির সমাজ-জীবনে বর্ণহিন্দুর যে দাপট ছিল পরবর্তী ত্রিশ বছরে সে দাপট যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে মুসলমান শক্তি ও অন্যান্য অনুন্নত শক্তির স্পষ্ট জাগরণে। ১৯৩২ সনে 'নয়া বাঙ্গালার গোড়া পত্তন' বইয়ের প্রথম ভাগে বিনয় সরকার বঙ্গসমাজের রূপান্তর ও নিরক্ষরের অধিকার সম্বন্ধে লিখেছিলেন, "বাঙ্গলাব নরনারী বলিলে ১৯০৫ সনের যুগে আমরা যে ধরনের লোকজন বুঝিতাম, ১৯৩২ সনে একমাত্র সেই ধরনের লোকজনই বুঝি না। নতুন নতুন রঙের, নতুন নতুন রূপের, নতুন নতুন নামের, নতুন নতুন ঢঙের নরনারী বাঙ্গালী জাতের অন্তর্গত, একথা আমরা আজ বাঙ্গলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে সহরে সহরে আর কলিকাতার মতন কেন্দ্রস্থলেও অহরহ বুঝিতেছি। সোজা কথায়, আমরা আমাদের চোখের সামনে বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে একটা সুবিস্তৃত বিপ্লব দেখিতে পাইতেছি।" বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি-রাজনীতিতে শুধু মুসলমান শক্তি নয়, তথাকথিত অনুচ্চ শ্রেণীর নরনারী. আদিম জাতির নরনারী ক্রমশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে ও বাঙালি জাতির হাড়মাসের মধ্যে ক্রমশ প্রবেশ করে বঙ্গসমাজে বহু ওলট-পালট সাধন করছে। ভবিষ্যতে এই সমাজ-বিপ্লবের ঝোঁক আরও বেড়ে যাবে। ১৯৪২ সনে 'বৈঠকে' বিনয় সরকার খুব দৃঢ়তার সঙ্গে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে পরবর্তী ত্রিশচল্লিশ বছরের মধ্যে বঙ্গ সংস্কৃতি মুসলমান, তপশিল ও অনুন্নত শ্রেণীর নরনারীর হাত-পার জোরে আর মাথার জোরে গরীয়ান হয়ে উঠবে। তাঁর এই ভবিষ্যদ্‌বাণী পরবর্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিনয় সরকার নিরক্ষরদের অধিকার নিয়ে অনেককিছু ভেবেছেন ও লিখেছেন। তাদের জন্য এই দরদের পেছনে ছিল তাঁর ছোটবেলাকার মালদহী জামতল্লীর গম্ভীরার প্রভাব। তাঁর

জন্মভূমি মালদার কথা তাঁর পক্ষে ভুলে যাওয়া ছিল অসম্ভব। তিনি 'বৈঠকে নিজেই বলেছেন, "মালদার লোকজনের সঙ্গে আমার হাড়-মাস মাখানো রয়েছে। মালদার পোদ্দার, সাউ, চুনিয়া, নুনিয়া, কাঁসারি, পাঝরা, মহলদার ইত্যাদি জাতের ছোকরারা আমার পরম আত্মীয়। আমার জীবনের আসল ভিত এদের ভেতর রয়েছে। রক্তের যোগ, নাড়ীর যোগ, আঁতের যোগ মালদহীয়াদের সঙ্গে অতি-নিবিড় ('বিনয় সরকারের বৈঠকে', দ্বিতীয় ভাগ, ১৯৪৫ পৃ. ৬৫৫)।

বিনয় সরকার তাঁর সমাজ-দর্শনে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত শব্দ দুটিকে একার্থক বিবেচনা করতেন না। সাধারণত লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা নিরক্ষরদের সম্বন্ধে ঘরোয়া কথাবার্তায় বা চাল-চলনে ও ব্যবহারে যে ধরনের তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা প্রকাশ করে থাকেন, তিনি তাঁর থেকে মুক্ত ছিলেন। মানুষকে রক্তমাংসের মানুষ হিসাবেই তিনি দেখতেন। অক্ষরজ্ঞান না থাকলে ভোটাধিকার থাকবে না এই সুপ্রচলিত ধ্যান-ধারণার প্রতি তাঁর কোনো সায় ছিল না। কারণ তিনি নিরক্ষরকে অশিক্ষিত বলতেন না। এম. এ. ক্লাসে পড়াবার সময় তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রায়ই বলতেন, লেখাপড়ায় পাশ-ফেল ছাড়াও জীবনে হাজার রকমের পাশ-ফেল রয়েছে। স্কুল-কলেজে কৃতকার্যতাই একমাত্র কৃতকার্যতা নয়। 'The last boy in the class is not the worst figure in Bengal. Perhaps he is the most creative'. —এই হলো তাঁর উক্তি। 'নয়া বাঙ্গালার গোড়াপত্তন' বইয়ে তিনি লিখেছেন, "নিরক্ষর শব্দে বুঝিতে হইবে অতি সোজা কথা। লোকগুলি লিখিতেও পারে না পড়িতেও পারে না। কিন্তু নিরক্ষর বলিলে আমি লোকগুলিকে অশিক্ষিত বলি না। নিরক্ষর লোকেরাও বেশ শিক্ষিত হইতে পারে। বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় পৃথিবীতে অশিক্ষিত কোনো লোক আছে কিনা সন্দেহ। যে লোক বেত বুনিয়া টুক্রী তৈরী করে তাহার মগজে কিছু না কিছু ঘী আছেই আছে। যে লোক দিনের পর দিন নিয়মিতরূপে হাল চালায়, বলদ সেবা করে, গাড়ী হাঁকায়, নৌকা বহে সে লোক হয়ত লিখিতে পড়িতে পারে না। কিন্তু তাহার মগজও আছে আর সেই মগজের ভিতর চিন্তা করিবার শক্তিও আছে। এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, কাজ করিতে করিতে প্রত্যেক লোকই, সে যত বড় নিরক্ষর হউক না কেন, দিনের পর দিন তাহার মগজ চষিয়া যাইতেছে। কাজের সঙ্গে সংস্পর্শে মগজ চষার ফলে তাহার জ্ঞান বাড়িতেছে। প্রতি মুহূর্তে সে সজ্ঞানে সজাগভাবে মাথা খেলাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। কাজেই বাংলা দেশের যে সকল নরনারী এখনও লিখিতে পড়িতে পারে না তাহাদিগকেও আমি শিক্ষিত জ্ঞানী চিন্তাশীল ও মস্তিষ্কজীবী নরনারীর ভিতর গণ্য করিতে অভ্যস্ত। ...পেশা মাত্রই সম্মানের যোগ্য। যাহারা কোনো না কোনো পেশা চালাইতেছে তাহারা লিখিতে পড়িতে পারে কিনা তাহা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু লিখিতে পড়িতে না পারা সত্ত্বেও পেশা চালাইবার মত যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা যেসকল লোকের আছে তাহারা লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের মতনই সমাজের মেরুদণ্ড।...লিখিয়ে-পড়িয়ে শ্রেণী হইতে নিরক্ষরদিগকে যে তফাৎ করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা কোনোমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।" বুদ্ধিমত্তা, কর্মদক্ষতা, বিচক্ষণতার কথা হিসাব থেকে বাদ দিলেও চরিত্র হিসাবে নিরক্ষর শিক্ষিতের চেয়ে খাটো নয়। বিভিন্ন দেশের ও সমাজের নিরক্ষরদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব পর্যালোচনা করে বিনয় সরকার এই নিরেট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। "এইবার নিরক্ষরদিগের নৈতিক চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদির কথা বলিব। নিরক্ষর নরনারীকে চাষাভূষারূপে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা আমাদের দস্তুর। কিন্তু নিরক্ষর লোকেরা চরিত্র হিসাবে বাস্তবিক খাটো কি? লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা অর্থাৎ ইস্কুলমাষ্টার, কেরাণী, সরকারী চাকুরে, উকিল ডাক্তার, ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কংগ্রেসের

জননায়ক ইত্যাদি শ্রেণীর নরনারী চরিত্র হিসাবে চাষী মজুর মিস্ত্রী ঘরামী ইত্যাদি চেয়ে উন্নত ধরনের লোক কি? ...যাহারাই নিরক্ষর নরনারীর সঙ্গে মিলামিশা করিয়াছে তাহারাই বুঝিয়াছে যে, ইহাদের নৈতিক চরিত্র তথাকথিত শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর নরনারীর নৈতিক চরিত্রের, লিখিয়ে-পড়িয়ের চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়।... সুতরাং সকল কর্মক্ষেত্রেই নিরক্ষরের অধিকার প্রচার করা আমার নিকট সমাজশাস্ত্রের প্রথম স্বীকার্য।...লোকগুলি সাঁওতাল হউক, রাজবংশী হউক, গারো হউক, পাহাড়ী হউক, অস্পৃশ্য হউক, চণ্ডাল হউক, ডোম হউক, হাড়ি হউক, চাষী হউক, মিস্ত্রী হউক, মজুর হউক, তাহারা নিরক্ষর বলিয়াই একমাত্র এই কারণে লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর শ্রেণী হইতে কোনো অংশে খাটো নয়। বাঙ্গালী জাতির হাড়মাসে, বাঙ্গালী জাতির ধনদৌলতে, বাঙ্গালী জাতির বাড়তিতে, বাঙ্গালী জাতির শক্তিবিকাশে তাহারা সকলেই লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারীর মতনই কর্মক্ষম এবং গৌরবজনক কৃতিত্বের প্রতিনিধি। এই সকল নিরক্ষরদের বুদ্ধিমত্তা আর কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে সজাগ হইয়াই আমাদিগকে বাঙ্গালী জাতির আগামী অধ্যায়ের জন্য নতুন ধাপ গড়িয়া তুলিতে হইবে।" ('নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন', প্রথম ভাগ, পৃ. ৩৯০-৯৯ দ্রষ্টব্য।) কি পরিমাণে সমাজ-সচেতন ও মুক্তবুদ্ধি হলে মানুষ এ ধরনের কথা ঘোষণা করতে পারে আজ ২০০৩ সনের প্রথমভাগেও তা রীতিমত দুঃসাহসিক উক্তি বলে মনে হয়। অধ্যাপক সরকার ১৯৩২ সনে 'নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন' বইয়ে নিরক্ষরদের অধিকার সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত 'ডোমিনিয়ান ইণ্ডিয়া ইন ওয়ার্ল্ড পারস্‌পেক্‌টিভস্' গ্রন্থেও (কলিকাতা, ১৯৪৯, পৃ. ১৬৬-৬৮) সেই বক্তব্য জোরালো ভাষায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ঐ গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় অধ্যাপক সরকার লিখেছেন, ...'the illiterate is not a person who deserves to be differentiated from the so-called educated as an intellectual and moral being. And on the strength of this discovery we should be prepared to formulate a doctrine which is well calculated to counteract the superstition that has been propagated in Eur-America and later in Asia as well as of course in India to the effect that literacy must be the basis of political suffrage. Our observations entitle us to the creed that political suffrage should have nothing to do with literacy. The illiterate has a right to political life and privileges simply because of the sheer fact that as a normal human being he has factually demonstrated his intellectual strength and moral or civic sense. It is orientations like these that democracy needs today if it is to function as a living faith.' অর্থাৎ গণতন্ত্রকে যদি একটা জীবন্ত বিশ্বাসে পরিণত করতে হয় তবে তার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হবে নিরক্ষরদের অধিকারের উপর। বিনয় সরকার কল্পিত নব গণতন্ত্রের এই হল সমাজ-দর্শন। অত্যন্ত আনন্দের কথা আমাদের ভারতীয় সংবিধানে ডক্টর আম্বেদকারের (যাঁকে বিনয় সরকার 'একালের হিন্দু ঋষি' আখ্যা দিয়েছিলেন) আন্তরিক প্রচেষ্টায় তথাকথিত নিম্নবর্ণ ও নিরক্ষর মানুষদের রাষ্ট্রিক অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে।

১৬

ভারতবর্ষ যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের কবলে ছিল, সে সময় তিনি প্রায় চৌদ্দ বছর স্বেচ্ছাকৃত প্রবাসজীবন যাপন করে মুক্তি-পিপাসু ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, অতীতের ইতিহাস ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিদেশের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের আসরে বার বার প্রচার করেছেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও ব্যক্তিত্বের জোরে তিনি অসংখ্য পাশ্চাত্যবাসীকে ভারতনিষ্ঠ

করে তুলতে পেরেছিলেন। আজ এদেশের যাঁরা বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন আসরে স্বীকৃতি ও সম্মান পাচ্ছেন, সেই সব ভারতবাসীর জন্য বিনয় সরকার বিদেশে দুধ-কলার ব্যবস্থা অনেকখানি করে রেখেছিলেন এটা ইতিহাসের ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ভারতবাসীর পক্ষে বিদেশের তকমা পাওয়া সহজসাধ্য ছিল না। বিনয় সরকার কোনো ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট লাভের জন্য বিদেশে যান নি। বিদেশের বাঘা বাঘা পণ্ডিতদের আসরে ভারতীয় মর্যাদা বাড়াবার জন্য তাঁকে সজ্ঞানে লড়াই চালাতে হয়েছিল। ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে আমেরিকায়, ফ্রান্সে, জার্মাণীতে ও ইতালিতে, পরিষদে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে মর্যাদা ও স্বীকৃতি পেয়েছিলেন খুব কম ভারতবাসীর ভাগ্যেই আজ পর্যন্ত তা জুটেছে। বাস্তবিক পক্ষে বিনয় সরকার পরাধীন ভারতের সংগ্রাম-দূত হিসাবেই বিদেশে অসামান্য দাগ কাটতে পেরেছিলেন। তাঁর 'ক্রিয়েটিভ ইন্ডিযা' (১৯৩৭) গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে জার্মাণ চিন্তানায়ক অধ্যাপক হাউসোফার মন্তব্য করেছিলেন, **'Benoy Kumar Sarkar has, in addition to his other activities full of overpowering capacity, twice had the good luck to render the best of his services to the millions of his struggling countrymen in order to obtain self-cosciousness in the political world, the first time with the bold constructive conception of his *Futurism of Young Asia*, and now in the maturity of his life with *Creative India*. Two such works carry a great people further onwards in the culture-political front of the world than dozens of agitation speeches and hundreds of brochures by the demagogues.'**

১৭

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর বিনয় সরকার স্বাধীন ভারতের নতুন বাণী প্রচারের জন্য তৃতীয়বার বিদেশে যাত্রা করেন। নিউইয়র্কের 'ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন' ও লোস্ এঞ্জেলসের 'ওয়াটামুল ফাউণ্ডেশনের' দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা-সফরে বহির্গত হন। ১৯৪৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি শেষবারের মতো বাংলার মাটি থেকে বিদায় নেন, কারণ তিনি তাঁর প্রিয় জন্মভূমিতে আর ফিরে আসতে পারেন নি। যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় তাঁর বক্তৃতার সাধারণ বিষয় ছিল 'ডোমিনিয়ান ইণ্ডিয়া ইন ওয়ার্ল্ড-পারসপেক্‌টিভ্‌স্' অর্থাৎ বিশ্ব-পরিপ্রেক্ষিতে ডোমিনিয়ন ভারতের স্থান। তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত তাঁর সর্বশেষ গ্রন্থের নামকরণও ছিল এটাই। ৭ মার্চ ১৯৪৯ সনে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতার মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তৃতা-সফর শুরু হয়। বিশ্ব-পরিস্থিতিতে ভারতের কৃষি ও শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি বক্তৃতা করেন। পরদিন হার্ভার্ডে তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল দরিদ্র জাতির স্বদেশসেবক মহাত্মা গান্ধী। এর পর তিনি ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে, কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়, পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিতে পর পর বক্তৃতা দিয়ে চলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল বিচিত্র ধরনের। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নবীন ভারতের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। জুন মাসের ২০ তারিখ থেকে আগস্টের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের তদ্‌বিরে অধ্যাপনা করতে থাকেন। 'ভারতীয় জাতি ও সংস্কৃতি' বিষয়ের উপর তিনি বহুসংখ্যক বক্তৃতা প্রদান করেন ও প্রতি সপ্তাহে বৈঠকী মোলাকাৎও পরিচালনা করতেন। ঐ বক্তৃতাবলীর পরিশেষে মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **'The Peoples and Cultures of India'** নামক যে পুস্তিকা

মুদ্রিত হয় (১৯৪৯) তাতে বর্ণিত বিষয়সূচী দেখলেই স্পষ্টভাবে বুঝা যায় কি অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকলে এত বৈচিত্র্যশীল বিষয় নিয়ে একজন ব্যক্তি আলোচনা করতে পারেন। বক্তৃতা ছাড়াও প্রত্যেক সপ্তাহে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়ে বৈঠকী মোলাকাৎ চালাতে হত। সেই সকল বক্তৃতা ও বৈঠকী মোলাকাৎ শুনে নৃতত্ত্ব বিভাগের সেক্রেটারি গ্রেস্ এল্ উড্ (Grace L. Wood) উক্ত পুস্তিকার ভূমিকায় লিখেছিলেন (অগাস্ট ১৫, ১৯৪৯), "অধ্যাপক সরকারের ক্লাসের অন্যতম শ্রোতা হিসাবে এবং তাঁর বৈঠকী কথোপকথনের একজন অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি তাঁর আলোচ্যবিষয় ভারতবর্ষকে অতি সাফল্যের সঙ্গে আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। ভারতবর্ষকে তিনি বস্তুনিষ্ঠভাবে এবং সম্ভবপর সকল দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত করেছেন। আমাদের মধ্যে যারা তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছে তারা সকলেই তাঁর তথ্যনিষ্ঠ জ্ঞানের পরিধি এবং তথ্য ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের রকমারি প্রণালী দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে নি।"

যুক্তরাষ্ট্রে বক্তৃতা-সফরের মাঝখানেই মৃত্যু বিনয় সরকারকে ছিনিয়ে নেয় (২৪ নভেম্বর ১৯৪৯)। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে তিনি যখন আমেরিকার হাসপাতালে জীবনমৃত্যুর মধ্যে দোদুল্যমান ছিলেন সে সময় তাঁর স্ত্রী ইদা সরকার (অস্ট্রিয়ান নারী) তাঁর পাশে বসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি এখন আমার কথা বা মেয়ে ইন্দিরার কথা ভাবছো? অধ্যাপক সরকার উত্তর দিলেন, 'না। আমি আমার জন্মভূমির কথা ভাবছি আর ভাবছি আমার অসমাপ্ত কাজের কথা।' এর কয়েকদিন পরেই ওয়াশিংটন ডি সি -তে নিগ্রোজাতির হাসপাতালে তিনি অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশে বিদেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। নোবেল-লবিয়েট হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হ্যারলো শাপ্‌লে (Harlow Shapley) অধ্যাপক সরকারের মৃত্যুতে মন্তব্য করলেন. 'India has lost an important force.' আমেরিকার সোশিওলজিক্যাল সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক এফ্. এইচ্. হ্যাঙ্কিনস্ (F. H. Hankins) সে সময় লিখলেন, 'Prof. Sarkar will be missed all over the world. He was not only a colourful figure, and he was this both in his personal presence and in his writings, but he stimulated currents of thought in areas far removed from his native land...I have often recalled his visit with me at Clark University in 1919-20...His eyes flashed fire as he lectured in those days.' অর্থাৎ বিনয় সরকারের অভাবটা পৃথিবীর সর্বত্র অনুভূত হবে। ১৯১৯-২০ সনে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। সে সময় তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তাঁর চোখ দিয়ে আগুন ছিটকে পড়ত। নবীন এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম অগ্রদূত এই বরণীয় মনীষী আমাদের দেশ ও জাতিকে যা দিয়েছেন, তুলনায় আমাদের কাছ থেকে পেয়েছেন খুবই কম। তিনি নিজে ফলভোগের কোনো আকাঙ্ক্ষা রাখেন নি বলেই হয়তো তিনি এমন উজাড় করে স্বদেশের ও বিশ্বের সেবায় নিজেকে ঢেলে দিতে পেরেছিলেন।

(এই প্রসঙ্গে বর্তমান লেখকের Benoy Kumar Sarkar: A Study (1953), 'ইতিহাস চর্চায় বিনয় সরকার' (১৯৫৮) ও 'বিনয় সরকার ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন' (১৯৮৭) পুস্তকগুলি বিশেষভাবে পঠিতব্য।)

হরিদাস মুখোপাধ্যায়

কলকাতা
১৫ জানুয়ারি, ২০০৩

সূচীপত্র

আগস্ট ১৯৪২

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়)

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ	...	৪৩
অভেদানন্দের জীবন-বৃত্তান্ত	...	৪৪
রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য	...	৪৭
দর্শনের ইতিহাস	...	৪৯
দার্শনিক বনাম দর্শনের ঐতিহাসিক	...	৫১
ব্রজেন শীল দার্শনিক কিনা?	...	৫২
দর্শনের আলোচ্য বিষয়	...	৫৪
প্রাচীন ভারতীয় দর্শন	...	৫৬
দর্শনের কষ্টিপাথর	...	৫৮
প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের দরদ	...	৫৯
বর্তমান ভারতে দর্শনের সূত্রপাত হ'য়েছে কি?	...	৬০
"হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি"	...	৬১

সেপ্টেম্বর ১৯৪২

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়)

অরবিন্দ-দর্শন	...	৬৩
ব্যর্গসঁ, হেগেল ও অরবিন্দ	...	৬৫
"ভাগবত-জীবন"	...	৬৫
কাণ্ট ও অরবিন্দ	...	৬৭
দার্শনিক "সাম্য-সম্বন্ধ"	...	৬৮
সৌন্দর্য-তত্ত্ব ও সমালোচনা-দর্শন	...	৬৯
রবীন্দ্র-সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা	...	৭১
অভেদানন্দ'র রচনাবলী	...	৭৩
বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ সম্বন্ধে গবেষণা	...	৭৫
ব্রজেন শীলের "ভারতীয় দর্শন-সূচী"	...	৭৭
ব্রজেন শীল এত কম লিখ্‌লেন কেন?	...	৭৮
কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যা	...	৭৯
মার্ক্‌স, কঁৎ, হার্ডার	...	৮০

বিষয়		পৃষ্ঠা
ধন-রাষ্ট্র-সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড	...	৮১
তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বনাম কর্মকাণ্ড	...	৮৩
"স্বাধীনতারূপী আমি"র দার্শনিক কৃষ্ণ ভট্টাচার্য	...	৮৪

অক্টোবর ১৯৪২

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়)

"ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু"	...	৮৬
হেগেল-সাধক হীরালাল হালদার	...	৮৭
ভারতে জার্মাণ ভাষা	...	৮৮
হীরালাল হালদারের একাল-সেকাল	...	৮৯
অদ্বৈত-নিষ্ঠায় ইংরেজ দার্শনিকগণ	...	৯০
"গুরু-দক্ষিণা"	...	৯১
পাশ্চাত্য-নিষ্ঠার আবশ্যকতা	...	৯১
কাণ্ট ও হেগেল	...	৯২
ইয়োরোপে গীতার প্রভাব	...	৯৩
ফিখ্‌টে ও বিবেকানন্দ	...	৯৪
লিস্ট্‌, মাইনেকে, হাউসহোফার, ফোন ভীজে	...	৯৫
হীরেন দত্ত'র "বঙ্গ-দর্শন"	...	৯৬
ব্যাখ্যা বনাম ভাষ্য	...	৯৭
পাশ্চাত্য-নিষ্ঠায় হীরেন্দ্রনাথ	...	৯৮
হীরেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, অক্ষয়চন্দ্র ও হরপ্রসাদ	...	৯৯
ছোট বহরের বাক্য	...	১০০
"গুরু-চাণ্ডালি"	...	১০১
বাংলা গদ্যে "ফরাসী প্রাঞ্জলতা"	...	১০২
হীরেন দত্ত'র নাম-ডাক এত বেশী কেন?	..	১০২
উকিল-লেখকগণ	...	১০৩
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ	...	১০৪
জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ	...	১০৪
থিঅজফি	...	১০৫
স্বদেশ-সেবক হীরেন্দ্রনাথ	...	১০৬
১৯০৫ সনের পরবর্তী ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী	...	১০৬
গল্প ও কবিতার রকমারি দৃষ্টিভঙ্গী	...	১০৮
হীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী	...	১০৯
প্রবীণের অর্থ উন্নতির দুস্‌মন	...	১১০
গ্রন্থ-সম্পাদন, তর্জমা, ভাষ্য-টীকা	...	১১৩
সার-সংগ্রহ ও ইতিহাস	...	১১৪
ব্যাখ্যাশ্রেণীর দর্শন-সাহিত্য	...	১১৫

বিষয়		পৃষ্ঠা
বিদেশী দর্শনের ভারতীয় প্রচারকগণ	...	১১৭
ছয়-শ্রেণীর দর্শন-লেখক	...	১১৮
"ভাগবত-জীবন" ও "শিকাগো-বক্তৃতা"	..	১১৯
স্বাধীন দর্শন	...	১৯১
পণ্ডিতি বনাম প্রচার	...	১২১
ইয়োরামেরিকার জনসাধারণ	...	১২৩
স্বামীজিদের জ্ঞানযোগ	...	১২৫
উদীয়মান গবেষক-লেখক	...	১২৮

নবেম্বর ১৯৪২

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়)

"আর্থিক উন্নতি" ও বংগীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্	...	১৩০
দুনিয়া-নিষ্ঠ ও বস্তু-নিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র	...	১৩৩
সমাজ-বিজ্ঞানে ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সার্বজনিকের উল্টা পথে	...	১৩৫
ইতিহাসের ইজ্জদ দর্শনের সমান	..	১৩৬
যদুনাথ, রাধাকুমুদ, রাখাল, রমেশ মজুমদার, হেম রায়	...	১৩৭
বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ'র দার্শনিকতা	...	১৩৯
বিদেশে বেদান্ত-প্রচার	...	১৪১
ভারতে দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা	...	১৪২
দিগ্বিজয়ী কাকে বলে?	...	১৪৩
রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্য	...	১৪৪
স্বামীজিদের সঙ্গে পণ্ডিতদের যোগাযোগ	...	১৪৫
ইস্কুল-কলেজে চাই স্বামীজিদের আনাগোনা	...	১৪৭
পয়সা-পদ-পদবীর প্রভাব	...	১৪৮
খ্যাতি,—অধ্যাত্মিক ও সামাজিক	...	১৫০
আত্মা, পরকাল, ভগবান	...	১৫৩
রাবীন্দ্রিক প্রভাব	...	১৫৫
রবীন্দ্র-দৈত্য	...	১৫৬
রবীন্দ্র-গদ্য ভয়ের জিনিষ	...	১৫৭
ভাষা-সাধনার কর্ম-কৌশল	...	১৫৮
বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ	...	১৬০
দেশী বা গ্রাম্য শব্দের রেওয়াজ	...	১৬১
গদ্য-রচনায় বাঙালী মেজাজ	...	১৬২
কাল-মহাত্ম্য, বিপ্লব ও যুগান্তর	...	১৬৩
বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ (১৯০৫-১৯১৯)	...	১৬৪
বিবেকানন্দ-যুগ (১৮৯৩-১৯০৪)	...	১৬৫
বৃহত্তর ভারতের কর্মিবৃন্দ	...	১৬৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
"ভারতীয় সংস্কৃতির দূত" (১৯১৪)	...	১৬৯
ফরাসী, জার্মাণ আর ইতালিয়ান ভাষা	...	১৭০
বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ (১৯২০-৪২)	...	১৭১
বণিক্, মজুর, রাষ্ট্রিক ও পণ্ডিত	...	১৭৩
ঢিট্ করার অর্থ কী?	...	১৭৫
সতীশ মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ-নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ	...	১৭৬
বিবেকানন্দ-দর্শনে হাতে-খড়ি	...	১৭৮
একবগ্গা ক্ষ্যাপামি ও সর্বধর্ম-সমন্বয়	...	১৭৯
"ডন"-পত্রিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	...	১৮১
ডন সোসাইটির সংস্কৃতি-শিক্ষালয়	...	১৮২
ডন সোসাইটির পত্রিকায় ভারতীয় তথ্য ও সংখ্যা	...	১৮৩
প্রাক্-স্বদেশী যুগের ছাত্র-সমাজ	...	১৮৫
"সতীশ-মণ্ডল"	...	১৮৬
আড্ডার দর্শন	...	১৮৮
ডন সোসাইটির স্বদেশী দোকান	...	১৮৯
সতীশ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধুবর্গ	...	১৯১
ব্রহ্মবান্ধব ও ডন সোসাইটি	...	১৯২
"সুবোধ-মণ্ডল"	...	১৯৫
ভগ্নী নিবেদিতার আবহাওয়া	...	১৯৬

ডিসেম্বর ১৯৪২

(প্রশ্নকর্তা শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়)

বঙ্গ-বিপ্লব কী?	..	১৯৯
ডন সোসাইটি ও বঙ্গ-বিপ্লব	...	২০১
রবীন্দ্রনাথ ও ডন সোসাইটি	..	২০২
"নূন-চিনির স্বদেশী"	.	২০৩
অর্থশাস্ত্রী অম্বিকা উকিল	..	২০৪
"মণীন্দ্র-মণ্ডল", "ব্রজেন্দ্র-মণ্ডল" ও "নরেন্দ্র-মণ্ডল"	.	২০৫
"অশ্বিনী-মণ্ডল", "রবীন্দ্র-মণ্ডল" ও "সুরেন্দ্র-মণ্ডল"	...	২০৬
ভাগ্যকুলের রায় আর কল্‌কাতার লাহা	...	২০৭
সাংস্কৃতিক বিপ্লব	...	২০৮
রংপুর ও শচীন বসু	...	২০৯
ডন সোসাইটি ও বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কট	...	২১০
জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ বনাম সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়	...	২১১
ডন ম্যাগাজিনে ভারত-গবেষণা	...	২১৪
"শিক্ষাবিজ্ঞান"	...	২১৬
নগেন রক্ষিত ও ধর্ম্মানন্দ কোসাম্বি	...	২১৭

বিষয়		পৃষ্ঠা
অরবিন্দ ও বিপিন পাল	...	২১৮
"জাতীয় শিক্ষা" ও আশুতোষ	..	২২১
সাধনা কী চিজ?	...	২২৪
বিজ্ঞান ও দর্শন	...	২২৬
তথাকথিত সত্যদ্রষ্টারা কী দেখেছেন?	...	২২৮
বিদেশে "নাম করা"	...	২২৯
স্বদেশী আন্দোলনের শৈশব-কথা	...	২৩২
লাঠি-সেনাপতি পুলিন দাশ	...	২৩৪
গুরুসদয়ের নাচানাচি	...	২৩৫
হরিদাস পালিত ও মালদহের গম্ভীরা	...	২৩৯
গম্ভীরার সামাজিক মূল্য	...	২৪২
মেয়েদের পুরুষ-সাম্য	...	২৪৩
নয়া পারিবারিক নীতি	...	২৪৫
মজুর-আন্দোলন ও সোশ্যালিজ্‌ম্‌	...	২৪৭
স্বদেশীযুগ ও সমাজ-তন্ত্র	...	২৪৮
"বর্ত্তমান জগৎ" ও মজুর-আন্দোলন	...	২৪৯
লেনিন-রাজ	...	২৪৯
বাংলায় সোশ্যালিজ্‌ম্‌-নিষ্ঠা	...	২৫০
মানব রায় হ'তে সুরেশ ব্যানার্জি	...	২৫১
সেবাব্রত শশিপদ	...	২৫৩
কেশব সেনের মজুর-প্রীতি	...	২৫৪
ভূপেন দত্ত	...	২৫৪
বিজ্ঞানবীর জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র	...	২৫৫
জগদীশ-সম্বর্দ্ধনা	...	২৫৮
"জীবনের সাড়া" ও স্বদেশ-সেবা	...	২৬০
প্রফুল্লচন্দ্রের চেলার দল	..	২৬১
বোস্‌-ইন্‌স্টিটিউট	...	২৬৩
ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্গ-বিপ্লব	...	২৬৪
যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দু-ব্রাহ্ম	...	২৬৬
মুসলমান না ব্রাহ্মণ?	...	২৬৭
বাঙালীজাতের ভবিষ্যৎ	...	২৬৯
উন্নতি-দর্শনে অনিশ্চিতের ঠাঁই	...	২৭১
১৯৮০ সনের বাঙালী	...	২৭২
নজরুল ও অন্নদাশঙ্করের পরবর্ত্তী ধাপ	...	২৭৬
সুরেন্দ্রনাথ হ'তে শ্যামাপ্রসাদ	...	২৭৭
রাষ্ট্রিক ভারত ও বিশ্বশক্তি	...	২৭৯
হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-মিলন অবশ্যম্ভাবী	...	২৭৯

বিষয়		পৃষ্ঠা
আব্দুল ওদুদের যুক্তিনিষ্ঠা	...	২৮০
রাবীন্দ্রিক ভগবান	...	২৮১

নবেম্বর ১৯৩১
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

নিরক্ষরেরা অশিক্ষিত নয়	...	২৮২
সতীশ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা উকিল, অশ্বিনী দত্ত ও দীনেশ সেন	...	২৮৪
অশ্বিনী দত্ত'র চেলারা	...	২৮৬
দীনেশ সেন ও বঙ্গোপনিষদ্	...	২৮৬

ডিসেম্বর ১৯৩১
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

মানুষ কি উন্নতির পথে?	...	২৮৮
সবার বিরুদ্ধে একা	...	২৯০
রমাঁ রলাঁর "ক্ল্যারাঁবোল"	...	২৯০
বিশ্ব-মৈত্রীর প্রচারক	...	২৯২
সাহিত্যের 'স্বরাজ' না সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা	...	২৯৩

ফেব্রুয়ারি ১৯৩২
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

"নিগ্রোজাতির কর্মবীর"	...	২৯৫
কারবারী ও অর্থশাস্ত্রী	...	২৯৭
লেখক-মহলে দলাদলি	...	২৯৮
ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড	..	২৯৯
সরকারী চাকুরে ও অর্থশাস্ত্রী	...	৩০১
ভারত ইয়োরামেরিকার কত পেছনে?	..	৩০২

মার্চ ১৯৩২
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

বণ্টন-সমস্যা না সম্পদ্-বৃদ্ধি?	...	৩০৪
ইতিহাসে নৃতত্ত্বের ঠাঁই	...	৩০৫
ভবিষ্যদ্-বাণী	..	৩০৫

বিষয় **পৃষ্ঠা**

এপ্রিল ১৯৩২
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

আন্তর্জাতিকতায় মার্কিন ও ইংরেজ ... ৩০৭
রামজে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড ও বিলাতী মজুরদল ... ৩০৮

এপ্রিল ১৯৩২
(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

সুইস্‌জাতের ধরণ-ধারণ ... ৩১০
"বিদেশ-দক্ষ" লোকজন ... ৩১২
পারিবারিক ও সামাজিক কোঁদল ... ৩১৩
বিদেশ-গবেষণার হাতিয়ার ... ৩১৫
"আন্তর্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ ... ৩১৮

মে ১৯৩২
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

বল্কান-চক্র ও ভারত ... ৩১৯
বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য ... ৩২১
আগে বাঙালী, তারপর ভারতবাসী ... ৩২২

সেপ্টেম্বর ১৯৩২
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

স্বদেশ-সেবক শশীপদ ... ৩২৪
মনুষ্যত্ব বনাম দারিদ্র্য ... ৩২৫
দারিদ্র্য-দোষ কি গুণ-রাশিনাশী? ... ৩২৬

অক্টোবর ১৯৩২
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

যন্ত্রপাতি ও সমাজ-সেবার বিদ্যাপীঠ ... ৩২৭

জানুয়ারি ১৯৩৩
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

প্রতিনিধি-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ... ৩২৮

বিষয় **পৃষ্ঠ**

ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩
(প্রশ্নকর্তা শ্রীশিবচন্দ্র দত্ত)

বিবেকানন্দ'র "কলম্বো হ'তে আলমোড়া" ... ৩৩০
যুবক এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা ... ৩৩২
"সার্বজনিক দাদা"র যুগ ... ৩৩৫

নভেম্বর ১৯৩৬
(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

সিন্ধু ও সিন্ধী ... ৩৩৬
করাচির রামকৃষ্ণ-ধর্ম-সম্মেলন ... ৩৪১

মার্চ ১৯৩৯
(প্রশ্নকর্তা শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন)

ধর্মের আন্দোলন ও আর্থিক উন্নতি ... ৩৪৩
মার্ক্‌স্‌ ঋষি ... ৩৪৪
রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য ... ৩৪৬

এপ্রিল ১৯৪২
(লেখক-অনুবাদক ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়)

বাঙলায় দেশী-বিদেশী ... ৩৪৮
সংস্কৃতি কাহাকে বলে? ... ৩৪৮
হিন্দুধর্ম বাঙলায় বিদেশী ... ৩৫০
বাঙলার মুসলমান .. ৩৫৪
বাঙালীকরণ ... ৩৫৭
একালের বঙ্গ-সংস্কৃতি ... ৩৬০

এপ্রিল ১৯৪৩
(প্রশ্নকর্তা শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়)

নোবেল প্রাইজে ভোটাভোটি .. ৩৬৪
স্বদেশী আন্দোলন ও নোবেল প্রাইজ ... ৩৬৫
চরম সত্য আছে কি? ... ৩৬৬

বিষয় **পৃষ্ঠা**

মে ১৯৪৩

(প্রশ্নকর্তা শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল)

প্রচার-সাহিত্য বনাম সাহিত্য-শিল্প ... ৩৬৭
হার্ডির "ডাইনাস্ট্স্" ... ৩৬৮
গল্সোআর্থি ও বার্নার্ড্ শ' ... ৩৬৯
ফ্রাঁস্ ও রলাঁ ... ৩৭০
রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা (১৯১১-৩৩) ... ৩৭১
প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী" ... ৩৭২
"রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের-বাণী" ... ৩৭৩
"সন্ধ্যা-সঙ্গীত"-এর পূর্ব্ববর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্য ... ৩৭৪
বিদেশী আড্ডায়-আড্ডায় রবীন্দ্রনাথ ... ৩৭৫
ভবঘুরে রবীন্দ্রনাথ ... ৩৭৭
মন-গড়া রবীন্দ্রনাথ ... ৩৭৮
"বলাকা"র পরবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্য ... ৩৮০
রবীন্দ্র-চিত্তের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রমথ বিশীর বই ... ৩৮১
রবীন্দ্র-সাহিত্যের রাবীন্দ্রিক সমালোচনা কতখানি স্বীকারযোগ্য ... ৩৮২
রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকালবেলা ... ৩৮৪

জুন ১৯৪৩

(প্রশ্নকর্তা শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল)

হুমায়ুন কবিরের "বাঙলার কাব্য" ... ৩৮৬
"সবার উপরে মানুষ সত্য" ... ৩৮৭
মুসলমান কবিরা কি নেতি-ধর্মী? ... ৩৮৮
ভূগোল, রক্ত আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'র প্রভাব ... ৩৮৯
বঙ্কিম, রবি, দান্তে ... ৩৯০
গানের কবি ও গায়ক-কবি নজরুল ইস্লাম ... ৩৯১
করুণা, যতীন ও নজরুলের রাবীন্দ্রিক শব্দ-ছন্দ-ঝঙ্কার ... ৩৯৩
নজরুল-কাব্যে দাশরথি-নীলকণ্ঠ'র উত্তরাধিকার ... ৩৯৬
"বিদ্রোহী" যুগ-প্রবর্তক কেন? ... ৩৯৮
নজরুলের "আমি" ও ব্যক্তিত্ব ... ৪০০
হুইটম্যান ও গদ্য-ছন্দ ... ৪০১
নজরুলের সমসাময়িক যুবক বাঙ্লা (১৯১৯-৪৩) ... ৪০৩
বিপ্লব-নিষ্ঠায় নজরুল-কাব্য ... ৪০৬
স্বাদেশিকতার দরদ ... ৪০৮
মুস্লিম দুনিয়া ও যুবক-বাঙ্লা .. ৪০৯
মধুসূদন-সত্যেন-নজরুল ... ৪১১

বিষয় **পৃষ্ঠা**

জুলাই ১৯৪৩
(প্রশ্নকর্তা শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল)

নজরুল-কাব্য কি সাম্যবাদী? ... ৪১৩
সোশ্যালিজম্ বনাম কমিউনিজম্ ... ৪১৫
"অগ্নিবীণা" ও "সর্বহারা" বাণী-প্রচারের কাব্য ... ৪১৬
১৯৩১-৪০ সনের বাণী-প্রচারক কবি ... ৪১৯
উচ্চতম শ্রেণীর কাব্য কিরূপ? ... ৪২১
ভালোবাসার বঙ্গ-সাহিত্য ... ৪২৪
প্রেম-সাহিত্যে নজরুলের "ছায়া-নট্" ও "পূবের হাওয়া" ... ৪২৫
"দোলন-চাঁপা"য় নজরুলি প্রেম ... ৪২৮
নজরুল-কাব্যে করুণ রসের দরিয়া ... ৪৩০
"পূজারিণী"র অমর কবি নজরুল ... ৪৩১
নজরুলের রবীন্দ্র-প্রশস্তি ... ৪৩৪
ধর্ম ও অ-ধর্ম ... ৪৩৫

নবেম্বর ১৯৪৩
(প্রশ্নকর্তা শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়)

রামানন্দ'র চার বাঙালী ... ৪৩৮
রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথ ... ৪৪০
ভারতে ইয়োরামেরিকার চোরাই মাল ... ৪৪২
"রেণেসাঁস" ও "রিফর্মেশন" ... ৪৪৪
মিল-স্পেন্সার-হাক্স্‌লে ... ৪৪৪
চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা যদিও পড়ে ধরা ... ৪৪৫

ডিসেম্বর ১৯৪৩
(প্রশ্নকর্তা শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়)

স্পেংলার বনাম সরকার ... ৪৪৬
আধুনিক ভারত ... ৪৪৯
"উদ্বোধন"-মাসিকের "শ্রীঅরবিন্দ" ... ৪৪৯

ডিসেম্বর ১৯৪৩
(প্রশ্নকর্তা শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল)

সমালোচনা-সাহিত্য ... ৪৫০
শশাঙ্ক সেনের পরবর্তী সমালোচকগণ ... ৪৫১
মার্কস্-পন্থী সমালোচনা ... ৪৫৪

বিনয় সরকারের বৈঠকে
আগষ্ট ১৯৪২
বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ

১৯শে আগষ্ট, ১৯৪২

লেখক—আপনার মনে আছে কি না জানি না, বছরখানেক আগে আপনাকে আমি "ভারতের দুই কর্মবীর" (১৯৪১) নামক আমার লেখা পুস্তকখানি দিয়ে গিয়েছিলাম। তাতে বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ—এ দু'জনের আলোচনা ছিল।

সরকার—ভায়া! সে-কথা তো মনে পড়ছে না।

লেখক—কিন্তু আপনি সে-সময় কয়েকদিন পরে পুস্তিকাটি প'ড়ে আমাকে লিখে পাঠিয়েছিলেন, তা আমার কাছে আছে। এই দেখুন।

সরকার—দেখি! বড়ই আশ্চর্যের কথা। কিন্তু আমার কিছুই মনে নেই। চিঠিটা তো দেখ্‌ছি আমার নিজের হাতেই লেখা।

লেখক—আপনি লিখেছিলেন,—"স্বামী অভেদানন্দ দিগ্বিজয়ী কর্মবীর। তাঁহার নিকট যুবক ভারত ইয়োরামেরিকার ভিতর ভারতবাসীর ঠিকানা কায়েম করিবার কৌশল শিখিতে পারিয়াছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অন্যতম গঠনকর্তা হিসাবে অভেদানন্দ তরুণ দুনিয়ার প্রণম্য" (২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৪১, কলিকাতা)। এ বিষয়েই আজকে একটু বিস্তৃত আলোচনা করতে চাই।

বহুদিন যাবৎই আপনার সংগে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সুযোগ হয়নি। ঘটনাচক্রে আপনার সংগে পরিচিত হবার সৌভাগ্য হ'লো। গত বৎসর আমরা কলেজের কয়েকজন তরুণ ছাত্র মিলে "শিক্ষাতীর্থ" নামে কলিকাতায় একটি সংস্কৃতি-পরিষদ গঠন করি ও সেখান থেকেই আমার "নবযুগের মানুষ" নামক আর একটা বই (যার ভেতর স্বামী অভেদানন্দের জীবনী) প্রকাশিত হয় (১৯৪১)। আমাদের এ প্রতিষ্ঠানটি শৈশব অতিক্রম না কর্‌লেও ছাত্রসমাজে ও পণ্ডিতমহলে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। এ প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী হিসাবে আমি আজকে এসেছি।

সরকার—এবার কি মতলব?

লেখক—স্বামী অভেদানন্দের (১৮৬৬-১৯৩৯) জীবনবৃত্তান্ত লিখ্‌বার নূতন ঐতিহাসিক উপাদান জোগাড় করবার জন্যে এসেছি। আমি এবং আরও কয়েকটি ছাত্র অভেদানন্দের "ইণ্ডিয়া অ্যান্ড হার পীপ্‌ল্‌" ("ভারত ও ভারতবাসী" নিউইয়র্ক, ১৫ই মে ১৯০৬) প্রভৃতি গ্রন্থ প'ড়ে অত্যন্ত আকৃষ্ট হই এবং অনুপ্রাণিত হ'য়ে তাঁর জীবনী ও ভাবধারা প্রচারের

প্রয়োজন বোধ করি।

সরকার—কী প্রয়োজন বোধ করিস্?

লেখক—স্বামী অভেদানন্দ একজন যোদ্ধা-সন্ন্যাসী। তাঁর জীবন হচ্ছে ধর্মতন্ত্র ও পুরোহিত-প্রথা,—সংক্ষেপে যা-কিছু মানুষের ব্যক্তিত্বকে পংগু করে,—তার বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ-ঘোষণা। তাঁর "লেকচার্‌স্ অ্যান্ড অ্যাড্রেসেস্ ইন্ ইন্ডিয়া" (যা ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন থেকে ১০ই নভেম্বরের মধ্যে প্রদত্ত হ'য়েছিল) বইখানা প'ড়ে দেখ্‌লাম আর "ভারত ও ভারতবাসী" গ্রন্থেও পেলাম যে, তিনি ধর্ম ও পরলোকের কথা বল্‌লেও ইহলোকের দাবীকে উপেক্ষা করেন নি ; বরং খুব জোরের সংগেই বাস্তবজগতের দাবীগুলার বিষয়ে ভারতবাসীকে সচেতন করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ যখন বাঙ্‌লাদেশে সবেমাত্র ছড়াচ্ছে, সে-সময়ে তিনিও ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে ইয়োরোপ-আমেরিকায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুঃখ-দুর্দশার মর্মন্তুদ কাহিনী রীতিমত প্রচার করেন। তা'ছাড়া এই ভাবপ্রবণ বাঙ্‌লাদেশে ধর্মের নামে নানারকম হেঁয়ালি আর বুজরুকি চল্‌ছে। এ অবস্থায় অভেদানন্দের অগ্নিবাণী প্রচারিত হলে যথেষ্ট কাজ হবে। আরও একটা কারণ আছে। একালের তরুণদলও তাঁর সম্বন্ধে বেশী-কিছু জানে না, অথচ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে তাঁর অবদান বিরাট। এই সমস্ত নানা কারণেই আমরা কয়েকজন তরুণ মিলে অভেদানন্দের জীবনী-প্রণয়নে ব্রতী হয়েছি এবং অনেকের সমর্থনও বেশ পেয়েছি।

সরকার—বেশ কথা। তোরা যে অভেদানন্দকে এভাবে বুঝ্‌তে পেরেছিস্ এতে আমি খুব আনন্দিত। তোরা যুবক। তোদের কাজ হচ্ছে সমাজকে নতুন কথা বলা,—দুনিয়ায় নতুন-কিছু খাড়া করা।

লেখক—যুবকদের সম্বন্ধে আপনার এরকম মত আগেও আপনার লেখায় ও বক্তৃতায় পেয়েছি। "উন্নতির চাবী কাহার হাতে?"—প্রবন্ধে আপনি একথাই আরও জোরের সংগে বলেছেন। সেখানে আপনি বলেছেন যে, সকল দেশে সকল যুগে ১৬-২০ আর ২৬-৩০ বৎসরের তরুণ-তরুণীদের হাতেই "ঝন্-ঝন্ করে উন্নতির চাবী"। আপনার ঐ কথাটা আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। আরও মনে পড়ছে, 'ভিলেজেস্ অ্যান্ড টাউনস্ অ্যাজ্ সোশ্যাল প্যাটার্নস্' নামক আপনার নবপ্রকাশিত গ্রন্থের (১৯৪১) শেষদিকটায় আপনি যৌবনের এই দিগ্বিজয়ের অতি-বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং গত দু'শ বৎসরের মধ্যে আবির্ভূত বহু চিন্তানায়কের জীবন উল্লেখ ক'রে আপনার ঐ মত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন (উক্ত গ্রন্থের ৬৪৮ পৃঃ থেকে ৬৬৩ পৃঃ)।

সরকার—ঐ রকম বকা আমার বাতিক। কিন্তু যৌবনের গুণ কি আর কেউ গায় না?

লেখক—বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পাউল্‌সেন তরুণের কর্তব্য সম্বন্ধে ঐ রকম কথাই ব'লেছেন। তাঁর "ইন্‌ট্রোডাক্‌শান টু ফিলজফি" অর্থাৎ "দর্শন-ভূমিকা" গ্রন্থে আছে,—"বিশ্বের বুকে যতবার বিপ্লব এসেছে, ততবারই তার অগ্রদূতরূপে আবির্ভূত হয়েছে মহাযৌবনের দল।" আপনার বন্ধু নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও এক চিঠিতে আমাকে এ ধরণের কথাই লেখেন,—"বালক ও তরুণদের কার্য হইতেছে স্বপ্ন দেখা। বাল্যের স্বপ্নকে সমূর্ত করার প্রচেষ্টায় যাঁহারা জীবন অতিবাহিত করেছেন, ইতিহাস তাঁহাদেরকেই সংস্কারক বা বৈপ্লবিক ব'লে এবং সফলকামীদের যুগ-প্রবর্তক ব'লে সম্মান প্রদর্শন করে। প্রত্যেক তরুণই তাহার তারুণ্যের স্বপ্নকে যেন স্বীয় জীবনে সফল করতে পারে, তাহাই তাহার কাম্য হওয়া প্রয়োজন" (২৬শে জুন, কাঁচরাপাড়া, ১৯৪২)।

সরকার—বেশ তো। কী বল্‌তে চাস্? কর্‌তে বল্‌ছিস্ কী?

লেখক—স্বদেশীযুগে আপনি যখন মাসিক "গৃহস্থ" চালাতেন সে-সময়েই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলন বাঙালী সমাজে,—শহরে ও পল্লীতে—আপনি সজাগ ক'রে রেখেছিলেন। এ কথা আমি জানি। আপনার "বিশ্বশক্তি" বইয়ের (১৯১৪) ভেতর এসব দেখেছি। তখন হ'তে আজ পর্যন্ত এই আন্দোলনের সংগে আপনার আত্মিক যোগ আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি। শুনেছি, আপনি রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসম্মেলনের জন্য অনেক খেটেছিলেন (১৯৩৬-৩৭)। তাই মনে হয়, এই আন্দোলন বিষয়ে আপনি যতটা জানেন, এতটা খুব কম ব্যক্তিই জানেন। কাজেই আপনি যদি সাহায্য করেন, তবে আমাদের কাজ অনেকটা সহজ হবে। "নবযুগের মানুষ" বইয়ের প্রথম সংস্করণে যে-সব ভুলভ্রান্তি আছে, সেগুলা এবার দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন ক'রে দেবার ইচ্ছা।

সরকার—রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সম্বন্ধে আমাকে সব-জান্তা লোক বিবেচনা করা কোনোমতেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এমন কি, এই বিপুল কর্ম্ম-মণ্ডলের দেড়-আনা, আধ্-আনাও আমি জানি কি না সন্দেহ। তা' ছাড়া আমার মতামতেব দাম এক দামড়িও নয়। সার্ব-জনিক মতের উল্টা দিকে আমার মতিগতি। লোকপ্রিয় মত আমার মুখে বেরোয় না। সেজন্য বাজারে আমাকে আহম্মুক, মুখ্‌খু বা গরু সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত।

তোদের এই বইখানার ভেতর ভুলভ্রান্তি থাক্‌তে পারে। তবুও আমি বল্‌ছি সমাজ-জীবনে এর ঢের মূল্য আছে। জগতে কোন্-কিছুই সর্বাংগসুন্দর নয়। যারা বলে কোনো-একটা কাজ ষোল-আনায় পূর্ণ, তারা বাজে কথা বলে,—জান্‌বি। কোনোকাজেই পরিপূর্ণ সফলতা লাভ করা যায় না।—কেবল পাওয়া যায় আংশিক সাফল্য। তোরা ২০।২২ বছরের ছোক্‌রারা মিলে যে একটা জিনিষ খাড়া করেছিস্, এতে আমার উৎসাহ বাড়্‌ছে।

অভেদানন্দের জীবন-বৃত্তান্ত

লেখক—আচ্ছা, "নবযুগের মানুষ" নামটা আমার বইয়ের পক্ষে কেমন মানাচ্ছে?

সরকার—একদম মানাচ্ছে না। কেন-না নবযুগের মানুষ সার্কাসের লোকও,—সিনেমার জন্য যে নাচে সেও,—বনে-জংগলে গাছ-গাছড়ার গবেষণা যে করে সে-ও,—রাজনৈতিক আন্দোলনে মস্‌গুল্ যে থাকে সে-ও,—মজুর-আন্দোলনের যে চাঁই সে-ও।

লেখক—তবে বইয়ের নাম কি হ'লে ভাল হয়?

সরকার—"অভেদানন্দ"। বইয়ের নাম "স্বামী অভেদানন্দ" না লিখে শুধু "অভেদানন্দ" লিখ্‌বি। যাঁরা খুব বড় তাঁদের নামের আগে 'স্বামী', 'ডক্টর', 'স্যার', 'আচার্য', 'অধ্যাপক',—এসব উপাধি বা বিশেষণ লিখ্‌তে হয় না। যেমন 'রবি বলেছে'—একথা বল্‌লেই সারা দুনিয়া বুঝ্‌বে রবীন্দ্রনাথকে। আজকাল লোকেরা "শ্রীঅরবিন্দ" চালাচ্ছে। চালা'ক্! আমি চাই "অরবিন্দ"। সেরূপ অভেদানন্দও একটা রীতিমত নামজাদা কর্মবীর ও ভারত-প্রচারক। তাঁকে "স্বামী" ব'লে সম্বোধন কর্‌বি না। উপাধি দিলে লোকটা ছোট হ'য়ে যায়। অমর লোক-মাত্রই উপাধিহীন। বুঝ্‌লি?

লেখক—অভেদানন্দের জীবনবৃত্তান্তের কোন্-কোন্ কথা থাকা উচিত?

সরকার—"ধর্মপ্রচারক অভেদানন্দ", "সন্ন্যাসী অভেদানন্দ",—এসব নিয়ে বেশী

ঘাঁটাঘাঁটি করবি না। তা পুরাতন মূর্তি। অবশ্য ওসব বাদ দিতে বল্‌ছি না। তাঁকে খাড়া করবার চেষ্টা কর্‌ নয়া-নয়া মূর্তিতে, যথা ঃ—"ভারত-প্রচারক অভেদানন্দ", "ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিনিধি অভেদানন্দ", "রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের 'ধুরন্ধর', ভারবাহী বা কর্মকর্তা অভেদানন্দ" ইত্যাদি। অভেদানন্দ সম্বন্ধে লিখ্‌বি যে, তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) আসল ভাই। তাঁকে বইয়ের মধ্যে রক্তমাংসের মানুষ, বাঙালীর বাচ্চা, "বাপ্‌কা বেটা" ব'লে দেখাবি,—যে লড়তে পারে, দিগ্বিজয় চালাতে পারে, দুনিয়াকে জয় করতে পারে। অভেদানন্দ কে ছিল জানিস্‌? তবে শোন্‌ বাঙ্‌লাদেশে আজ পর্যন্ত যে-কয়টা বাপ্‌কা বেটা জন্মেছে, তাদের পয়লানম্বরের মধ্যে অভেদানন্দ অন্যতম। "বাপ্‌কা বেটা" আমি আশুতোষকে বলেছি,—বঙ্কিমকে বলেছি,—রবিকে বলেছি,—বিবেকানন্দকে বলেছি "নয়া বাঙ্‌লার গোড়া-পত্তন"-বইয়ে (১৯৩২)। রামা-শ্যামাকে "বাপ্‌কা বেটা" বলা যায় না।

লেখক—আপনি অভেদানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠ সম্বন্ধে কি মনে করেন?

সরকার—রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ভেতর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে-সকল স্বামীরা মোতায়েন আছেন, তাঁরা সকলেই কি এক পথের কর্মী না একমতের প্রচারক? তাঁদের ভেতর কর্মপ্রণালী, চিন্তা-প্রণালী, সাধনপ্রণালীর পার্থক্য আছে ঢের। তাঁরা সকলেই বিবেকানন্দের প্রচারিত পাঁতি নিয়ে ব'সে নেই। বিবেকানন্দের সুরু-করা কাজ তাঁদের অনেকেই আকারে-প্রকারে, পরিমাণে-বহরে বাড়িয়ে তুলেছেন বিস্তর। তাঁদের ভেতর জবরদস্ত্‌ কর্মবীর দেখেছি গণ্ডা-গণ্ডা,—রেঙ্গুনে, কবাচিতে, বোম্বাইয়ে, নাগপুরে, আর বেলুড়ের ত কথাই নাই। বিবেকানন্দের কোনো কাজ বা কথার সংগে তাঁদের কাজ ও কথা কাপে-কাপে মিল্‌লো কিনা চব্বিশ ঘণ্টা তাঁরা তার হিসাব নিতে ব্যতিব্যস্ত নন। তাঁরা হরদম্‌ সময়মাফিক কর্তব্য ক'রে চলেছেন। অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করা তাঁদের স্বধর্ম। অভেদানন্দ এই পার্থক্য ও বিভিন্নতারই আর একটা প্রতিমূর্তি।

লেখক—বিভিন্নতায় সমাজের ক্ষতি হয় না কি?

সরকার—না। এখানে আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বিবেকানন্দের মায়ের পেটের ভাইয়ের নাম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তা' ছাড়া অন্যান্য ভাই-ও আছেন। তাঁরা ক'জনে বিবেকানন্দের মতে চ'লে থাকেন? সকলেই জানে যে, ভূপেন দত্ত সেকালের রামকৃষ্ণ-পন্থীও নন আর একালের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের পথও মাড়ান না।

লোকে জানে তাঁকে স্বদেশী যুগের অন্যতম "যুগান্তর"-সাধক ও বিপ্লব-প্রবর্ত্তক ব'লে। ভূপেন দত্ত একদিকে কট্টর মাৎসিনি-পন্থী, অপর দিকে কট্টর মার্কস্‌-পন্থী। অধিকন্তু তিনি আবার নৃতত্ত্ব-শাস্ত্রী এবং সমাজ-সেবকও বটে।

বিবেকানন্দ ১৯০২-এ মারা না গেলে আর আজ পর্যন্ত বেঁচে থাক্‌লে কোন্‌-কোন্‌ কাজে, কোন্‌-কোন্‌ আন্দোলনে আর কোন্‌-কোন্‌ চিন্তায় হাত-পা বাড়াতেন, তা কেউ বল্‌তে পারে কি? ১৯০২-এর পরবর্তী বিবেকানন্দ আর তার পূর্ববর্তী বিবেকানন্দের মধ্যে হয় তো আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাক্‌তো। এসব পার্থক্যের কোনো-কোনো চিহ্নোৎ হয়তো একালের রামকৃষ্ণ-মিশনের অন্তর্গত কোনো-কোনো বিবেকানন্দ-শিষ্যের কাজে ও চিন্তায় দেখ্‌তে পাই।

অভেদানন্দ ১৯০২-এর পর ৩৭ বৎসর ধ'রে বেঁচেছিলেন। কাজেই একালের বাঙালী-ব্যক্তিত্বের কিছু-কিছু প্রভাব তাঁর কাজকর্মে নিশ্চয় প্রবেশ ক'রেছিল। সে-সব অতি স্বাভাবিকই বুঝতে হবে। পার্থক্যগুলো জীবনের গতি-ভংগীর বিভিন্ন স্তম্ভবিশেষ। আমার

উন্নতি-দর্শনে অনৈক্যের আর পার্থক্যের ঠাঁই খুব বেশী।

লেখক—অনেকে তো মনে করে যে, অনৈক্য আর বিভিন্নতা উন্নতি বিঘ্নস্বরূপ।

সরকার—উল্টা সম্‌ঝিলি রাম! জানিস্, যার মধ্যে ব্যক্তিত্ব আছে, সে স্বাধীনভাবে কাজ না ক'রে পারে না? এতে সমাজ এগিয় যায়। বুদ্ধদেবের শিষ্যেরা সকলেই কি এক-মতাবলম্বী ছিলেন? তাঁরা বিভিন্নভাবে চিন্তা করতেন। তাঁরা বিভিন্ন প্রণালীতে বৌদ্ধসংস্কৃতিতে নতুন-নতুন মাল দিয়েছেন। ফলে বৌদ্ধসংস্কৃতি একটা ভিন্ন ভিন্ন গড়নবিশিষ্ট বৈচিত্র্যশীল ও বহুত্বময় রূপ ধারণ করলো। অভেদানন্দের মধ্যে একটা বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল। বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ—এ দু'জন "হরিহর-এক-আত্মা" ছিলেন। কিন্তু তাই ব'লে কি দু'জনে এক? না। দু'জনেই স্বাধীনভাবে ভারতের বাণী পাশ্চাত্যে প্রচার ক'রেছেন। একালের "বৃহত্তর ভারতের" প্রতিষ্ঠাতা বিবেকানন্দ। অভেদানন্দের কৃতিত্ব তাতে যথেষ্ট। বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রথম "ধুরন্ধর" অভেদানন্দ। সেই স্বাধীন ব্যক্তিত্বেরই নতুন বিকাশ এই বেদান্ত-মঠে।

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য

২৩শে আগষ্ট, ১৯৪২

লেখক—আপনি "বৃহত্তর ভারত" শব্দটা ৩০।৩২ বৎসর ধ'রে ব্যবহার ক'রে আস্‌ছেন। সেই "গৃহস্থ" মাসিক আর "বিশ্বশক্তি" বইয়েব কথা মনে পড়ছে। আজ বিবেকানন্দ সম্পর্কেও বল্‌ছেন। জিনিষটা একটু খোল্‌সা ক'রে বল্‌বেন?

সরকার—আজকের "বৃহত্তর ভাবত" রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যকে বল্‌ছি। অথবা রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যকে একালের "বৃহত্তর ভারত" বল্‌ছি। এ সাম্রাজ্যের পরিধি ভৌগোলিক ভারতের চেয়ে ঢের বেশী। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য হচ্ছে ভাব-সাম্রাজ্য (আইডিয়োলজিক্যাল এম্পায়ার)। এযুগে বিবেকানন্দই ভারতবাসীর ভিতর সর্বপ্রথম বিশ্বের দরবারে দিগ্বিজয়ী হন। একটা নতুন ভারতীয় সাম্রাজ্যের সূচনাও তিনি ক'রে দিয়ে যান। ১৮৯৩ সনে (শিকাগো বক্তৃতার সংগে-সংগেই) এ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য ক্রমশই বাড়্‌তির পথে চলেছে। এই যে নতুন সাম্রাজ্য যুবক ভারত দশদিকে স্থাপন করছে তার নাম আসলে বিবেকানন্দ-সাম্রাজ্য হওয়া উচিত। (পরিশিষ্ট, "ধর্মের আন্দোলন ও আর্থিক উন্নতি" দ্রষ্টব্য)।

লেখক—কেন? দুটো নামই ত আপনি দিচ্ছেন। এ দুটোয় প্রভেদ কী? বিবেকানন্দে আর রামকৃষ্ণে তফাৎ করছেন কেন?

সরকার—বিবেকানন্দকে বেশ বুঝি। তাঁকে যে-কোনো লোকই বুঝবে। বিবেকানন্দকে ফুটবলের মতন এখান থেকে ওখানে ছুঁড়ে ফেল্‌তে পারি, বগল-দাবা ক'রে হাটে-মাঠে নেচে বেড়াতে পারি, পকেটে রাখ্‌তে পারি, আড্ডার ভেতর পাঁচ-সাত জনকে দেখাতে পারি, দশজনের পাতে দিতে পারি। বুঝ্‌লি?

লেখক—তবে বিংশ-শতাব্দীর ভারতীয় ভাব-সাম্রাজ্যকে আপনি রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য নাম দিলেন কেন?

সরকার—বিবেকানন্দ নিজের সব কাজই তাঁর গুরুর কাজ ব'লে প্রচার ক'রে গেছেন। কাজেই বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য আমার বিবেচনায় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য ব'লেই

পরিচিত হওয়া উচিত। তবে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য নাম দিচ্ছি বটে, কিন্তু রামকৃষ্ণকে বুঝা কঠিন, শুধু আমার পক্ষে না, যে-কোনো লোকের পক্ষেই কঠিন।

লেখক—রামকৃষ্ণকে বুঝা কঠিন কেন?

সরকার—রামকৃষ্ণ লোকজনের কাছে কোনো ব্যক্তিবিশেষ নন—বীজগণিতের "ক" বিশেষ। অনেক জিনিষ সাধারণ চিন্তায় সহজে বোঝা যায় না। তার সম্বন্ধে একটা চলনসই ধারণা মনের ভেতর আন্‌তে হ'লে এক-আধটা দাগ, চিহ্ণোৎ বা শব্দ প্রয়োগ করতে হয়। এই শব্দ বা নাম একটা সংকেত ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান, জগদীশ্বর, অবতার ইত্যাদি উপাধি কোনো মানুষকে দিলে সে-মানুষ দুনিয়ার নরনারীর কাছে অবোধ্য থেকে যেতে বাধ্য। একে "শূন্য" বল্‌লেও কোনো ক্ষতি হয় না। "ব্রহ্ম" শব্দের তাৎপর্য-ও ঠিক তাই। যা বুঝিনা তার নাম ব্রহ্ম, তেমনি যা বুঝিনা তার নাম রামকৃষ্ণ।

লেখক—অভেদানন্দকে আপনি রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের ভেতর কোথায় ফেল্‌ছেন?

সরকার—রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ বাস্তবিক পক্ষে কানাই-বলাই।

লেখক—একথা কেন বল্‌ছেন?

সরকার—জবাব অতি সোজা। বিবেকানন্দের মার্কিণ কাজ সুরু হওয়ামাত্রই তলব পড়েছিল অভেদানন্দের উপর। সেই ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে অভেদানন্দ বিবেকানন্দের কাজগুলা বজায় রাখ্‌তে পেরেছেন—ফুলিয়ে তুলেছেন—বাড়িয়ে দিয়েছেন। প্রথম কয়েক বছর ধ'রে বিবেকানন্দকে ইয়োরামেরিকায় বাড়্‌তির পথে ঠেলে তুলেছিলেন অভেদানন্দ। এই হিসাবে বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ এ দুইয়ের ঘাড়ের চোয়ালের উপর ভারতীয় গাড়ী চলেছিল দুনিয়ায়।

১৮৯৩ (বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতা) হ'তে ১৯০২ (বিবেকানন্দের মৃত্যু) পর্যন্ত যুবক-ভারত বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ নামক দুই ঘোড়ার জুড়ি হাঁকিয়ে জগতে দিগ্বিজয় চালাতে সুরু করে। ১৯০২-এর পরবর্তী অভেদানন্দের কার্যাবলী জানা না থাক্‌লেও সকলেরই জেনে রাখা কর্তব্য যে, তাঁর আগেকার কৃতিত্ব বিবেকানন্দের কর্ম ও চিন্তারাশির সঙ্গে সচেতনভাবে সুজড়িত। মনে কর্ যে, ঘটনাচক্রে বিবেকানন্দের সঙ্গে-সঙ্গেই অভেদানন্দও মারা গেলেন ১৯০২ সালে। তা হ'লেও বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ—এ দু'জনের জীবন-কথা—কম্‌সেকম্ সেই দশবছরের জীবনকথা—সবই একসঙ্গে গাঁথা দেখ্‌তে পাচ্ছি। অর্থাৎ রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাযুগের প্রথম ঘটনাগুলার ভেতর বিবেকের কথা বল্‌তে গেলে অভেদকে টান্‌তে হবে আর অভেদের কথা বল্‌তে গেলে বিবেককেও টান্‌তে হবে। যুবক-ভারতের ইতিহাস যারা আলোচনা করতে চায় তারা এই দু'জনকে অন্ততঃ সেই দশবছরের জন্য জার্মাণ সমাজতন্ত্রী মার্ক্স ও এঙ্গেল্‌সের মতন পুরামাত্রায় সহযোগীরূপে বিবৃত করতে বাধ্য। আমাদের দেশী দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্‌বো যে, বিবেক আর অভেদ—এই দু'জন যেন আমাদের একালের বৈদিক অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

লেখক—আচ্ছা, আর একদিন থেকে জিজ্ঞাসা করছি—বিংশ-শতাব্দীর ভারতীয় ভাব-সাম্রাজ্যের নাম আপনি "রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য" রাখ্‌লেন কেন? এর ভেতর কি কেবল রামকৃষ্ণমতাবলম্বী লোকদেরই কৃতিত্ব আছে? ("রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্য", ৪ঠা নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)।

সরকার—প্রশ্নটা বেশ। ভাল ক'রে বোঝ্। প্রাচীন ও মধ্যযুগের এশিয়ায় বৃহত্তম ভারত

হাজার বছর ধ'রে প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেটা মোটের উপর বৌদ্ধসংস্কৃতির সাম্রাজ্য বা বুদ্ধ-সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। কিন্তু সেই ভারতীয় সংস্কৃতির ভেতর সবই কি কাগজে কলমে নাম-লেখানো বৌদ্ধ ছিল? না। সেই বৃহত্তম ভারতের অনেক-কিছুই ছিল অবৌদ্ধ, যথা ঃ—চরকের আয়ুর্বেদ, কৌটল্যের অর্থশাস্ত্র, পাণিনির ব্যাকরণ, মনু, কালিদাস, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি। ব্রহ্মদেশ, তিব্বত, চীন, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, শ্যাম, ইন্দো-চীন, জাপান ইত্যাদি দেশের ভারতীয় সংস্কৃতিগুলা খানিকটা বৌদ্ধ-হিন্দু, খানিকটা অবৌদ্ধ-হিন্দু। বৌদ্ধ-সাম্রাজ্য বল্‌লে একমাত্র বৌদ্ধ "ধর্মের" বিস্তার সাধন বুঝ্‌তে হবে না। বুঝতে হবে ভারতীয় সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়। তার ভেতর অ-বৌদ্ধ এবং ধর্ম-ছাড়া মাল অনেক।

বর্তমান যুগের বৃহত্তর ভারতের বা বিংশশতাব্দীর ভারতীয় ভাব-সাম্রাজ্যের নাম দিয়েছি রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য। কিন্তু এ সাম্রাজ্যটা একমাত্র রামকৃষ্ণ-পন্থী গেরুয়াওয়ালাদের তৈরী নয়। এর ভেতর আছে হাজার হাজার গেরস্থ নরনারীর কৃতিত্ব। এর ভেঁতর আছে বহুসংখ্যক অহিন্দুর কাজ। মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, পার্শী ইত্যাদি নানা ধর্মাবলম্বী ভারত-সন্তানের হাতে-পায়ে এটা গড়া হচ্ছে। সেকেলে ভারতীয় ধারাটা বজায় রাখ্‌বার জন্য বল্‌ছি,—রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য বুদ্ধ-সাম্রাজ্যেরই বংশধর ও বর্তমান সংস্করণ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'র নামে সাম্রাজ্য চালাচ্ছি। কিন্তু এর ভেতর ধর্ম ছাড়াও অনেক-কিছুর দিগ্‌বিজয আছে। অধিকন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দই এর সব-কিছু নন।

লেখক—হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে বটে "প্রবুদ্ধ ভারত"-মাসিকের কথা। গত বৎসর জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ঐ পত্রিকায় "ইন্ডিয়াজ্‌ ঈপক্‌স্‌ ইন্‌ ওয়ার্লড-কালচার" নামক নাগপুরে প্রদত্ত আপনার যে বক্তৃতাটি বের হয়েছিল, তাতে-ও এ বিষয়ের আলোচনা আছে। ("বৃহত্তর ভারতের কর্মিবৃন্দ," ৭ই নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

দর্শনের ইতিহাস

২৭শে আগষ্ট, ১৯৪২

লেখক—এবার আপনাকে একালের দার্শনিকদের সম্বন্ধে দু'একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো। আচ্ছা, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন ও ডক্টর সুরেন দাশগুপ্ত দর্শন সম্বন্ধে কি কাজ করেছেন?

সরকার—বন্ধুদের কাজ সম্বন্ধে সমালোচনা চাচ্ছিস্‌? অবশ্য যা বল্‌ব তা ভালই। কিন্তু মনে করিস্‌ না যে, বন্ধু ব'লে টেনে বল্‌ছি। তবে আমার বক্তব্যগুলা বেআড়া রকমের। লোকজনের পছন্দসই হওয়া মুস্কিল।

আগেই বলেছি আমি মুখ্‌খু। বাজারে প্রচলিত চিন্তা-ধারার সঙ্গে আমার খাপ খায় না। বে-আক্কেল, বে-খাপ্পা, বে-সুরো, অ-সুর, আহাম্মুক ইত্যাদিরূপে আমি কোনো-কোনো মহলে বিবৃত হ'য়ে থাকি। কাজেই আমার মুখ থেকে পণ্ডিতদের সম্বন্ধে যেসব কথা বেরুবে, তা লোকপ্রিয় হ'তে পারে না।

যাই হোক, জিজ্ঞেস করছিস্‌ যখন, সোজাসুজি ব'কে যাচ্ছি। আবার বল্‌ছি, রাধাকৃষ্ণন ও সুরেন দাশগুপ্ত দু'জনেই আমার বন্ধু—ব্যক্তিগত সদ্ভাব আছে। তাঁরা হয়ত আমার মতটা অপছন্দ কর্‌বেন না।

লেখক—এই দুই জনের দার্শনিক কাজ কিরূপ?

সরকার—এঁদের দু'জনেরই কাজ সাধারণতঃ মোটের উপর এক শ্রেণীর অন্তর্গত। দু'জনেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস-প্রচারক—উভয়েই প্রত্নতাত্ত্বিক—ঐতিহাসিক। এই শ্রেণীরই আর একজন হচ্ছেন প্রাগ্-বৌদ্ধ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস-লেখক বেণীমাধব বড়ুয়া।

লেখক—একথাটার মানে কি বুঝা যাচ্ছে না। আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

সরকার—একটা বিদেশী দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। মনে কর্, কোনো ইংরেজ পণ্ডিত গ্রীক দর্শনের ইতিহাস লিখ্‌লেন। ইংরেজরা তাঁকে ফিলজফার অর্থাৎ দার্শনিক বল্‌বে কি? বল্‌বে না। বল্‌বে,—ঐতিহাসিক। তেমনি রাধাকৃষ্ণন ও সুরেন দাশগুপ্তকেও পাশ্চাত্যের পরিভাষা অনুসারে দার্শনিক বলা যায় না। অবশ্য তেমন ব্যাপকভাবে ধর্‌লে প্রত্যেক মানুষেরই একটা বিশিষ্ট দর্শন আছে। সেই অর্থে যে-কোনো লোকই দার্শনিক। তুইও দার্শনিক, আমিও দার্শনিক—আব্দুলও দার্শনিক, যদুও দার্শনিক। দর্শন ছাড়া মানুষ থাকতেই পারে না। সংসারে যতগুলো লোক বেঁচে আছে, তারা সবাই কোনো-না-কোনো দর্শনের জোরে বেঁচে আছে। তবে যে-বিশেষ অর্থে কোনো লেখককে দার্শনিক বলা যায়, সে অর্থে ভারতবর্ষের অধ্যাপকদের মধ্যে দার্শনিক কতজন আছেন—আমি জানি না। প্রায় সবাই, হয় কোনো-কোনো প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন, অথবা কোনো কোনো প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে আধুনিকভাবে সংস্করণ বা তর্জমা প্রকাশ করেছেন।

এই ধরণের ভারতীয় লেখকদেরকে ইংরেজরা বেশ পছন্দ করে। সেকেলে সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ইত্যাদি ভারতীয় চিন্তাগুলো ইংরাজিতে পাওয়া যায় ব'লে তারা খুসী। এই সবের প্রচারকদেরকে তারা কস্মিন্ কালেও দার্শনিক বল্‌তে রাজি হবে না। যদি এই সকল প্রচারকদের অন্যান্য রচনায় দার্শনিকতা থাকে তা হ'লে আলাদা কথা। বর্তমানে তার পরিমাণ নেহাৎ কম।

লেখক—এসব কাজের কোনো দাম নেই কি?

সরকার—এ-ধরণের কাজ সবই খুব জরুরি। এ সমস্তের কিম্মৎ কোনো কোনো সময়ে লাখ টাকা। যে-সকল প্রাচীন দার্শনিক বইয়ের নাম একালে কেউ জানতো না অথবা মাত্র উড়ু-উড়ু ভাবে জানতো—সেই সকল বই প্রকাশ করা, তর্জমা করা বা অন্য উপায়ে প্রচার করা যারপর নাই মূল্যবান। কিন্তু এ-ধরণের কাজটা দার্শনিক কাজ নয়—এ-ধরণের কাজকে বলা যেতে পারে ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক।

লেখক—খাঁটি দার্শনিকের দু'একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—ইতালিয়ান, ফরাসী, জার্মাণ বা ইংরেজি যে-কোনো একটা ভাল দর্শন-পত্রিকা খুলে দ্যাখ্। তার সংগে আমাদের দেশীয় পত্রিকায় প্রকাশিত দর্শনের অধ্যাপকদের লেখাগুলো তুলনা কর্। রচনাগুলার নামেও প্রভেদ আর ভেতরকার মালেও প্রভেদ। যাক্।

দর্শনে এম-এ পড়বার সময় ছাত্রদেরকে গোটা পঞ্চাশেক বইয়ের পাতা উল্‌টাতে হয়। সেই গুলার ভেতর কোন্ বইটা দর্শন আর কোন্ বইটা দর্শনের ইতিহাস তা জানে না কোন্ ম্যাড়াকান্ত? ভারতীয় দর্শন-লেখকদের ভেতরও কে দার্শনিক আর কে দর্শনের ঐতিহাসিক তাও যে-কোনো লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকই জানে। অবশ্য রাস্তার লোক এসব তফাৎ বুঝবে না।

কয়েকজন দার্শনিকের নাম করছি। ফরাসী পণ্ডিত বেণুভিয়ে আর ব্যর্গসঁ নামজাদা

দার্শনিক। জার্মাণ পণ্ডিত ডিল্‌থাই ও ফাইহিংগার সেই দরের দার্শনিক। ইতালিয়ান পণ্ডিত ক্রচে আর দেল্‌ভেক্‌ক্য ঠিক সেইরূপ দার্শনিক। মার্কিণ পণ্ডিত ডুয়ী এবং হকিং ভারতের সুপরিচিত দার্শনিক। আর দার্শনিক হিসাবে ইংরেজ পণ্ডিত ব্রাড্‌লে, আলেকজাণ্ডার, রাসেল আর হব্‌হাউসের পসার ভারতে সুবিস্তৃত। এঁরা যে অর্থে দার্শনিক, কোনোও দর্শনের ইতিহাস-লেখক ইয়োরামেরিকান পণ্ডিত সেই অর্থে দার্শনিক নন।

রাধাকৃষ্ণন্‌ ও সুরেন দাশগুপ্ত ইত্যাদি ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিকেরা এই মাপকাঠি অনুসারে দার্শনিক ব'লে পরিচিত হতে পারেন না। লেখক হিসাবে এঁদের "জাত্‌" ঠিক করছি। এঁদের পাণ্ডিত্য বা গুণাগুণ জরিপ করা আমার মতলব নয়। তা তোর প্রশ্নও নয়।

("প্রাচীন ভারতীয় দর্শন", ৩০শে আগষ্ট ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

দার্শনিক বনাম দর্শনের ঐতিহাসিক

লেখক—দার্শনিক গ্রন্থের তর্জমাকারী, সংক্ষিপ্তসার-প্রচারক, ভাষ্যকার বা ইতিহাস লেখক কি দার্শনিকরূপে বিবৃত হবার যোগ্য নয়?

সরকার—আমার বিবেচনায় এই ধরণের পণ্ডিতেরা দার্শনিক নন। এ সম্বন্ধে আমার মতটা কিছু একবগ্‌গা, চরমপন্থী। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের রসায়ন-শাস্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রাচীন হিন্দু জাতির রসায়ন-চর্চা সম্বন্ধে ইতিহাস লিখেছেন। এ ইতিহাস খানা সুবিখ্যাত। কিন্তু একমাত্র এ ইতিহাস লেখার জোরে প্রফুল্লচন্দ্র রসায়ন-শাস্ত্রীর ইজ্জৎ দাবী করতে পারতেন না। মনে কর্‌,—ল্যাবোরেটরীতে ধাতু-অধাতু, গ্যাস-বিষ, অ্যাসিড-অ্যালকালি ইত্যাদি বস্তু নিয়ে যোগ-বিয়োগ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ইত্যাদি কাজ করবার অভ্যাস ও ক্ষমতা তাঁর নাই বা ছিল না। তাহ'লে তাঁকে দেশ বিদেশের কেউই রাসায়নিক বলতো না। আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রাচীন ভারতবাসীর সমুদ্র-যাত্রা ও নৌ-শিল্প সম্বন্ধে ইতিহাস লিখেছেন। এই ইতিহাসের লেখক ব'লে রাধাকুমুদ কোথাও নৌ-শিল্পী অর্থাৎ নৌকা-পান্‌সীর ওস্তাদ বা মানোয়ারী জাহাজের কাপ্তেন ব'লে পরিচিত হয়েছেন কি? না। হ'তে পারেন নি, হ'তে পারেন না। এবিষয়ে ওস্তাদ বা কাপ্তেন হ'তে গেলে করা চাই জলীয় এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় গবেষণা। কিন্তু রাধাকুমুদ এ বিদ্যার লোক নন। তাঁর গবেষণার কিস্মৎ একমাত্র ঐতিহাসিক।

বই দুইটাই স্বদেশী যুগের রচনা। এই ধরণের আর একখানা বইয়ের নাম করছি। একালে বেরিয়েছে। সুশীল দে'র একটা বইয়ে সংস্কৃত "পোয়েটিক্‌স্‌"-বিদ্যা সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতীয় পণ্ডিতেরা রস-দর্শন, সমালোচনা-বিজ্ঞান, অলঙ্কার-শাস্ত্র ইত্যাদি বিদ্যা বল্‌লে কী বুঝত জানিস্‌? সুশীল দে'র প্রবন্ধগুলার ভিতর তার অনেক-কিছু জানা যায়। প্রশ্ন সম্প্রতি এই,—সুশীল দে'কে রস-দার্শনিক বল্‌ব না রস-দর্শনের ঐতিহাসিক বল্‌ব? গ্রন্থকার রস-দর্শন জানে না বা বুঝে না তা নয়। কিন্তু এই বইটার লেখক হিসাবে সুশীল দে প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক।

লেখক—কোনো বিদ্যার ইতিহাসকে আপনি সেই বিদ্যার চেয়ে ছোট মনে করেন?

সরকার—ছোট-বড়'র মামলা নয়রে, ভাই। বল্‌ছি দু'টা জাত্‌ আলাদা। মনে কর্‌ একটার নাম রসগোল্লা আর একটার নাম সন্দেশ। একটা কাঁঠাল আর একটা আম। কোনো বিদ্যার

ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিককে সেই বিদ্যার প্রতিনিধি ব'লে স্বীকার করা আমার দস্তুর নয়। অন্যান্য লোকের মত হয়তো আমার সংগে মিল্‌বে না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও নিরানব্বুই জন একদিকে আর আমি বেচারা এক্‌লা এক দিকে। এরই নাম এক নম্বর পেয়ে সংখ্যালঘিষ্ঠ ("মাইনরিটি অব ওয়ান")।

কল্পনা করা যাক যে,—দর্শনের ঐতিহাসিকেরা তাঁদের ইতিহাস-গ্রন্থ ছাড়া খাঁটি দর্শন সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করলেন না। তা হ'লে তাঁদেরকে আমি দার্শনিক বল্‌বো না। তুই বল্‌তে চাস্‌, বল্‌। আপত্তি কর্‌ব না। দর্শন একটা বিদ্যা, দর্শনের ইতিহাস আর একটা স্বতন্ত্র বিদ্যা। ঐতিহাসিক আমার মেজাজে ছোট নয়। দার্শনিক আমার মেজাজে বড় নয়। তোরা ঐতিহাসিককে দার্শনিকের চেয়ে ছোট দরের পণ্ডিত ভাব্‌তে অভ্যস্ত। এই জন্যই তোদের মগজে গোলযোগ ঢুকেছে!

লেখক—ভারতবর্ষে বর্তমানে আপনারা দৃষ্টিতে দার্শনিক কে কে?

সরকার—আমি যাকে দার্শনিক বলি,—যথা রেণুভিয়ে, ডুয়ী, ডিলথাই, হব্‌হাউস, দেলভেক্‌ক্য ইত্যাদির মতন পণ্ডিত,— সেরূপ দার্শনিক পণ্ডিত বর্তমান ভারতে কে-কে বা কতজন, আমার জানা নেই। খতিয়ে দেখা মন্দ নয়। এবিষয়ে গবেষণা করলেও দেশের উপকার হবে। যাক, আমি ছেলেবেলায় প্রেসিডেন্সি কলেজে যাঁদের কাছে পড়েছি, তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম করতে পারি। তখন মনে হয়েছিল লোকটা দার্শনিক বটে। আমার সহপাঠী বন্ধুরাও,—মনোরঞ্জন মৈত্র, অতুল গুপ্ত ইত্যাদি,—এইরূপই ভাব্‌ত। যদিও মামুলি টেক্‌স্‌টবুক পড়ানো ছিল তাঁর কাজ, তবুও তারিই ভেতর তাঁর বিশ্লেষণ-শক্তি দেখ্‌তে পেতাম। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ কববার ক্ষমতা তাঁর ছিল। অধিকন্তু বক্তব্যগুলো সহজে চিন্তাপূর্ণ ভাষায় প্রচার করবার শক্তিও তাঁর দেখেছি। একালে তাঁর দু'একটা সার্বজনিক বক্তৃতা শুনবার সুযোগ আমার জুটেছে। সে সব ছিল জার্মাণ দার্শনিক কান্ট সম্বন্ধে। এতেও কৃষ্ণবাবুর দার্শনিক শক্তি, স্বাধীন মত-প্রচার, আর সরল (যদিও কঠিন) ভাষা বেশ লক্ষ্য করেছি। ("বর্তমান ভারতে দর্শনের সূত্রপাত হয়েছে কি?" ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪২ "স্বাধীনতারূপী আমির দার্শনিক কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য" সেপ্টেম্বর ১৯৪২, "স্বাধীন দর্শন" ২৮শে অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)।

ব্রজেন শীল দার্শনিক কিনা?

লেখক—ব্রজেন্দ্রনাথ শীল সম্বন্ধে আপনার কি মত? আপনি তাঁকে দার্শনিক বলেন?

সরকার—ব্রজেন শীলকে (১৮৬৪-১৯৩৮) আমরা ছেলেবেলা থেকে দার্শনিক ব'লে জানি। তাঁকে আমি প্রথম দেখি বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করবার সময় (১৯০৫)। বিশ্ববিদ্যালয় বয়কটের আন্দোলন চল্‌ছিল ডন সোসাইটির উদ্যোগে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। সেই সময়ে এক ঘরোআ বৈঠকে ব্রজেন শীল বয়কটের বিরুদ্ধে পাঁতি দেন। তা সত্ত্বেও তাঁর সংগে সতীশবাবুর সাহচর্য কমে নি। সতীশবাবুর চেলা হিসাবে আমরাও তাঁর প্রতি ভক্তি হারাই নি।

ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল খুব বেশী। তাঁকে একালে (১৯৩০) বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি ক'রে রেখেছিলাম। মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৩৮) তিনি এর

সভাপতি ছিলেন। তাঁর "পজিটিভ সায়েন্সেজ্ অব দি এনশেণ্ট হিন্দুজ" নামক প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ এই অধমের খোরপোষের টাকায় লণ্ডনে লংম্যান্স্ গ্রীণ কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত হয় (১৯১৫)। স্বদেশী যুগে ব্রজেন শীল সম্বন্ধে আমার কি ধারণা ছিল, তা "গৃহস্থ" পত্রিকায় আর "বিশ্বশক্তি" বইয়ে খোদা আছে। বুখ্নি ছিল নিম্নরূপ—"বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ—ইঁহারা সকলেই ভারতবাসীর ইয়োরোপ-বিজয়ের প্রথম সেনাপতি।" দিগ্‌বিজয়ের এই মন্তরটা রবিবাবুর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সময়ে (১৯১৩) আমি যুবক বাঙলায় ছড়িয়েছিলাম। ব্রজেন শীলকে সে যুগে আমি দিগ্বিজয়ী ভারত-বীর ব'লে সম্বর্দ্ধনা ক'রেছি। সেই মত আমার চিরকালই ছিল, আজও রয়েছে।

কিন্তু এবার তাঁর সম্বন্ধে আমি যা বলছি তা শুন্‌লে পর অবাক হ'য়ে যাবি। তোবা তোবা করবি—কানে হাত দিয়ে বসবি—জিব্ বের ক'রে লজ্জায় মুখ দেখাতে ইচ্ছা করবে না।

লেখক—এমন কি সাংঘাতিক কথা বলবেন ব্রজেন শীল সম্বন্ধে?

সরকার—ব্রজেন শীল দার্শনিক ছিলেন কিনা, তার এক প্রকার কোনো প্রমাণ নেই। তাঁর লেখালেখি ছিল পরিমাণে খুব কম। যতটুকু পাওয়া যায় তার জোরে তাঁকে দার্শনিক সপ্রমাণ করা, বোধ হয়, গা-জুরি।

লেখক—একি কাণ্ড! কি বলছেন আপনি? লোকে যে আপনাকে পাগল বলবে!

সরকার—আমি আগেও এ ধরণের কথা বলেছি—লিখেছিও। আমার মত ছাপাও হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবেরা এ জন্য আমাকে পাগল বলেছে। অকথ্য গালাগালি করেছে। কিন্তু সত্যিকার কথা, ব্রজেন শীলকে "লেখক" হিসাবে দার্শনিকরূপে দাঁড় করানো খুবই কঠিন। আমি তো পারি না। পার্‌লে অবশ্য খুসীই হই।

লেখক—খুসী হন কেন? দার্শনিক প্রমাণিত হ'লে ব্রজেন শীল উঁচুদরের পণ্ডিত বিবেচিত হবেন ব'লে?

সরকার—তা নয়। বাঙালী পণ্ডিত মহলে অন্ততঃ একজন দার্শনিক দাঁড়িয়ে যাবে ব'লে। তাতে ব্রজেন শীলের পাণ্ডিত্য বেড়ে যাবে না—ইজ্জৎও বাড়বে না। বাংলাদেশ একটা নতুন শ্রেণীর পণ্ডিত পেতে পার্‌বে। বাঙালী সেই শ্রেণীতে খুব গরীব। বর্ত্তমানে দু'একজন আছে কিনা দূরবীণ দিয়ে দেখ্‌তে হয়।

লেখক—তবে তাঁর পাণ্ডিত্য কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত?

সরকার—আজকালকার দিনে ব্রজেন শীল "পজিটিভ সায়েন্সেজ্ অব দি এন্‌শেণ্ট হিন্দুজ" (১৯১৫) একমাত্র এ বইয়ের গ্রন্থকার হিসাবে পরিচিত। তার অন্য কোনো বইয়ের নাম একালে কেহ জানে কিনা সন্দেহ। আচ্ছা, এ বইটার ভেতর মাল আছে কিরূপ? আছে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞানসেবীদের গবেষণার বৃত্তান্ত। অর্থাৎ ব্রজেন শীল প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস-লেখক পণ্ডিত।

এই বইটার আধখানা বেরিয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্রের হিন্দু জাতির রাসায়নিক ইতিহাসের পরিশিষ্ট স্বরূপ (১৯০৭) ; আর অপর আধখানা বেরিয়েছিল আমার 'পজিটিভ ব্যাক গ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি'র পরিশিষ্ট স্বরূপ (১৯১৪)। দেখা যাচ্ছে যে, যে দুখানা বইয়ের ব্রজেন শীল পরিশিষ্ট-লেখক, সেই দু'খানা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহাসিক গবেষণা। সকল দিক হ'তেই ব্রজেন শীল সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক। একথা বল্‌লেই পাণ্ডিত্যের দুনিয়ায় তাঁর জাত্‌টা যথার্থ রূপে কষা যেতে পারে। এতে পণ্ডিত হিসাবে ব্রজেন

শীলের জাত্ মারা যায় না। কেবল বলা হ'লো যে, তাঁর পাণ্ডিত্যটা ঐতিহাসিক, দার্শনিক নয়।

শেষ পর্যন্ত একটা কথা জেনে রাখ্। ব্রজেন শীলের এই বইটার মতন বই লিখ্‌বার ক্ষমতা সেকালে দুনিয়ার কোনো পণ্ডিতের ছিল না। ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান, ইংরেজ আর মার্কিণ এই পাঁচজাতের পণ্ডিতদের ঘটে এই বিষয়ে কত বিদ্যা আছে, তা আমি ভাল ক'রে খুঁটে দেখেছি। তবে ব্রজেন শীলের সবকয়টা সিদ্ধান্তই গ্রহণযোগ্য কি না,—সে কথা আলাদা।

লেখক—বড়ই আশ্চর্য ও দুঃখের কথা যে ব্রজেন শীলের লেখা বই আর একখানাও নেই!

সরকার—একদম নেই—একথা ঠিক নয়। একালে বেরিয়েছে তাঁর 'কোয়েষ্ট ইটার্ণ্যাল'। বাংলায় নাম দিচ্ছি,—"শাশ্বতী এষণা"। এটা কবিতার বই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ১৯০৫ এর বেশ আগে ব্রজেন শীলের একটা প্রবন্ধ বইয়ের আকারে বেরিয়েছিল। নাম তার "বৈষ্ণভিজ্‌ম্ অ্যান্ড কৃশ্চিয়ানিটি" (১৮৯৯)। এ বইটার ভেতর বৈষ্ণব ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের তুলনায় সমালোচনা আছে। আর আছে ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের উপর খৃষ্টিয়ান ধর্মের প্রভাব কতখানি তার বিশ্লেষণ। কম্-সে-কম দুইয়ে যোগাযোগের আলোচনা। দেখা যাচ্ছে যে, আলোচনাটা ধর্ম-ও দর্শন-বিষয়ক। কিন্তু মোটের উপর জিনিষটা ঐতিহাসিক। অধিকন্তু শেষ পর্যন্ত বইটায় প্রাচীন দুনিয়ার তথ্য,—বিশেষভাবে ভারতের প্রত্নতত্ত্বই,—গুলজার। এই অবস্থায় ব্রজেন শীলকে যদি কেউ দার্শনিক বল্‌তে চায়, বলুক। আমি সজোরে বল্‌তে পারি না। আমার বিচার-প্রণালী কাউকে মেনে নিতে বল্‌ছি না, আর আমার সিদ্ধান্তও কারুর হজম কর্‌বার দরকার নেই।

লেখক—আর কোনো বই ব্রজেন শীলের আছে?

সরকার—আর একখানা বইয়ের নাম কর্‌ছি। সেটাও সেকালেরই লেখা। বইটার নাম "নিউ এসেজ্ ইন্ ক্রিটিসিজিম।" এটা সাহিত্য-সমালোচনার বই। ইংরেজি সাহিত্য আর বাংলা সাহিত্য—দুইয়ের বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধগুলার ভেতর আছে। বিশেষতঃ এর ভেতর পাই জার্মাণ দার্শনিক হেগেল প্রচারিত চিন্তা-প্রণালীর সমালোচনা ও প্রয়োগ। সেকালে মাত্র কয়েকখানা ছাপানো হয়েছিল। কাজেই সেটা বেশী লোক পড়েছিল আর সত্যি-সত্যি বুঝেছিল কি না, এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

যাই হোক, সাহিত্য-সমালোচনাকে আমি দর্শনের অঙ্গ বিবেচনা করি। এ হিসাবে বইটাকে দার্শনিক গ্রন্থ বল্‌তে আমি অরাজি নই। যারা সাহিত্য-সমালোচনাকে দর্শন নাম দিতে অভ্যস্ত নয়, তারা এ বইয়ের লেখক ব্রজেন শীলকে দার্শনিক বল্‌বে না। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা ও অন্যান্য সুকুমার শিল্পের ভেতরকার রস-বিশ্লেষণকে আমি দর্শন বলি। আবদুল ওদুদ-প্রণীত "সাহিত্য ও সমাজ" (১৯৩৫) এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। স্বদেশী যুগে বেরিয়েছিল শশাঙ্কমোহন সেন প্রণীত "বাণীপন্থাঃ"। সে সবও দার্শনিক মাল। তাঁর "বাণী-মন্দির" (১৯২৮) খাঁটি দার্শনিক সাহিত্য।

দর্শনের আলোচ্য বিষয়

লেখক—সাধারণভাবে বল্‌তে পারেন, আপনি দার্শনিক তবে কাকে বল্‌ছেন? দর্শনের

আলোচ্য বিষয় কী-কী?

সরকার—দার্শনিক যে সে নিজের মত প্রচার করে—পরের মত তর্জমা করা তার ব্যবসা নয়। দেশ-বিদেশের একাল-সেকাল সে আলোচনা করে বটে, কিন্তু সেই আলোচনার ভেতর প্রকাশ পায় একমাত্র তার নিজ মুড়োর ঘি। যদি বা কখনও দেশী-বিদেশী দার্শনিকদের মত তার আলোচনার ভেতর এসে পড়ে সেগুলিকে সে তার নিজ চিন্তার কুদরত্তি মাল রূপে ব্যবহার করে। সেই সকল পরমত তার কষ্টিপাথরে মাজা-ঘষা হয়, আর সেই সবের ভিত্তির উপর সে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করে। পরকীয় মতাবলীর সমালোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত একটা নামজাদা বই হচ্ছে ইংরেজ পণ্ডিত রীড-প্রণীত "নলেজ অ্যান্ড ট্রুথ" (জ্ঞান ও সত্য, ১৯২৩)। যে লোকটা নিজের কথা বল্‌তে পারে না, সে লোকটা দার্শনিক নয়।

লেখক—এই মাত্র? কোন্-কোন্ বিষয়ে দার্শনিকেরা মগজ খেলায়?

সরকার—আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানে আর দর্শনে কোনো প্রভেদ নাই। ব্যক্তি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা তার এক পেশা। প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা তার আর এক পেশা। এ ধরণের তার হাজার পেশা। শরীরকে শরীর, আত্মাকে আত্মা, দৈত্যকে দৈত্য, দেবতাকে দেবতা—এর সব-কিছুই বা যে-কোনোটা দার্শনিক বিশ্লেষণের ভেতর আসতে পারে। সত্যাসত্য, ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্য, কর্তব্যাকর্তব্য, উন্নতি-অবনতি, সু-কু—এ সবের কিছুই দর্শান-চর্চার বহির্ভূত নয়। সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, বিবাহ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এ ধরণের অনেক কিছু দার্শনিকেরা বিশ্লেষণ ক'রে থাকে। যার মর্জি যেরূপ। আমি দর্শনে আর বিজ্ঞানে এক প্রকার কোনো ফারাক দেখি না।

লেখক—দর্শনের আলোচ্য বিষয়ের ভেতর উঁচু-নীচু বা ছোট-বড় প্রভেদ নেই কি?

সরকার—আমি বল্‌বো—নেই। যারা বলে পরমাত্মার বিশ্লেষণ করা একমাত্র দর্শন-চর্চা, তাদেরকে আমি একচোখো, ভ্রান্ত বিবেচনা করি। যারা দেহাত্মক বুদ্ধির গুণগান করে, তারাও দার্শনিক বটে। যাদের বিবেচনায় অহিংসা-প্রচারকেরাই পয়লা নম্বরের দার্শনিক এবং একমাত্র দার্শনিক, তাদের মগজে ঘির অভাব যৎপরোনাস্তি। যে সকল লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক হিংসার তারিফ করে, লড়াইয়ের ইজ্জৎ দেয়, ঝগড়া, কোঁদল, আড়াআড়ি, টক্কর, প্রতিহিংসা ইত্যাদি মনোবৃত্তির যথোচিত মূল্য দিতে অভ্যস্ত—সে সকল লোককেও দর্শনিক সমঝে রাখা যারপরনাই সমীচীন।

লেখক—আপনার মতে দর্শন আর বিজ্ঞান তাহ'লে একই জিনিষ?

সরকার—প্রকারান্তরে তাই। এই দুইটা পারিভাষিক শব্দ মাত্র। আগেকার দিনে ইয়োরোপের লোকেরা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ ইত্যাদি শাস্ত্রকেও ফিলজফি বা দর্শন বল্‌ত। বিজ্ঞান শব্দটার রেওয়াজ হালে বেড়েছে। আজকালকার দিনে অনেকে একমাত্র জড়জগৎ-বিষয়ক বিদ্যাগুলোকে বিজ্ঞান বলে। এটা ভুল। নৃতত্ত্ব, চিত্তবিদ্যা অর্থশাস্ত্র, যৌনশাস্ত্র, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রবিদ্যা ইত্যাদি সবই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। আসল কথা, শব্দের মারপ্যাঁচে কিছু যায় আসে না। আমি আলেকজান্ডার-প্রণীত 'স্পেস্, টাইম অ্যাণ্ড ডীটি" (দেশ, কাল ও দেবতা) বইটাকে (১৯২০) বিজ্ঞান বলতে প্রস্তুত আছি। শুধু দর্শন মাত্র নয়। আমার কাছে একমাত্র বিবেচনার বিষয় বইয়ের ভিতরকার মালটা। এই ধর্,—কাল সম্বন্ধে যোগ বিয়োগ-গুণ-ভাগের পাটীগণিতও লেখা যায়। কাল সম্বন্ধে বলা চলে "রাজা কালস্য কারণম্।" আবার কাল সম্বন্ধে বকাবকি চ'লেছে কাণ্ট হ'তে আলেকজাণ্ডার ও ফাইহিঙ্গার পর্যন্ত। সবই দর্শন, সবই বিজ্ঞান।

লেখক—আপনি অধ্যাত্ম-দর্শনের বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব স্বীকার করেন না?

সরকার—ভায়া, আমার বিবেচনায় মানুষের সব-কিছুই আধ্যাত্মিক। লোকেবা যদি কোনো দু'একটা জিনিষকে দাগ দিয়ে আধ্যাত্মিক বল্‌তে চায়, বলুক। কিন্তু আমি "অথাতো দৈত্য-জিজ্ঞাসা" দিয়ে আধ্যাত্মিক দর্শন ব'কে যেতে পারি। "অথাতো দারিদ্র্য-জিজ্ঞাসা" দিয়েও আমি অধ্যাত্মদর্শন চালিয়ে থাকি। ধনবিজ্ঞান আমার মেজাজে আধ্যাত্মিক বিদ্যা। আধ্যাত্মিক শব্দটাতে গুড় মাখানো নেই।

বোঝাই যাচ্ছে, দেশ ও কাল—এ দুইয়ের স্বরূপ, মানুষ ও প্রকৃতি—এ দুইয়ের যোগাযোগ, শরীর ও আত্মা—এ দুইয়ের কোলাকুলি, ব্যক্তি ও সমাজ—এ দুইয়ের পারস্পর্য্য ইত্যাদি সব-কিছুই কোনো-না-কোনো দর্শনের বা বিজ্ঞানের অন্তর্গত। আর এক কথা। কোনো দর্শনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বলা যেতে পারে না যে, তথাকথিত 'সু'-গুলাই আসল দর্শন। তথাকথিত 'কু'-সমূহও দর্শন-চর্চ্চার বিষয়-বস্তু এবং অত্যুৎকৃষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্তের চরম নিদর্শন হ'তে পারে। কতকগুলা মুখরোচক, পছন্দসই, পরকাল-পরিপোষক, ইহ-বিদ্বেষী, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু মত, চিন্তা, বাণী বা উপদেশই দর্শনের সর্বোচ্চ সাক্ষী নয়। এইসব জিনিষের বিলকুল উল্টা জিনিষও পয়লা নম্বরের দার্শনিকদের চিন্তার খোরাক আর পাকা প্রতিপাদ্য।

("দর্শনের কষ্টিপাথর," ৩০শে আগষ্ট ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন

৩০শে আগষ্ট, ১৯৪২

লেখক—আচ্ছা, এবার ফিরে যাচ্ছি সুরেন দাশগুপ্ত ও রাধাকৃষ্ণন সম্বন্ধে আর একবার। এঁদের ভেতর কি কোনো প্রভেদ নেই?

সরকার—দু'জনেই দর্শনের ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু সুরেন দাশগুপ্তের ইতিহাসে মাল আছে অনেক বেশী। রাধাকৃষ্ণনের বইয়ে পাওয়া যায় প্রায় একমাত্র সে-সব কথা যা অনেক দিন ধ'রে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে জানা ছিল দুনিয়ার পণ্ডিত মহলে। তবে ঝরঝ'রে ইংরেজিতে লেখা। ভাল বই, সুখপাঠ্য।

কিন্তু সুরেন দাশগুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় দর্শনসাহিত্যের চৌহদ্দিটা বাড়িয়ে দিয়েছেন নানাদিকে—লম্বায়-চওড়ায়। এ বইয়ের ভেতর অনেক অজানা, আধা-জানা ও সিকি-জানা বই একালের দুনিয়ায় প্রথম প্রচারিত হ'ল। কাজেই সুরেন দাশগুপ্তের বইয়ের ইজ্জৎ বিংশ শতাব্দীর অনেকদিন পর্যন্ত দুনিয়ার লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে গুলজার থাক্‌বে। অধিকন্তু কম্‌-সে-কম ত্রিশ বছর লাগ্‌বে,—এই বইয়ের ভেতরকার মাল তলিয়ে-মজিয়ে বুঝ্‌তে। আর, সেকেলে ভারতীয় সংস্কৃতির গড়নে এসবের কিম্মৎ ক'ষে বের কর্‌তেও লাগ্‌বে বেশ-কিছু দিন। এত নয়া ধরণের তথ্য এই ইতিহাসে খুলে ধরা হয়েছে। এখনো অনেক পাঠক সে-সব মাল হজম ক'রে উঠতে পারে নি।

লেখক—আপনার রচনাবলীর ভিতর ভারতীয় লেখকদের নাম দেখতে পাই অনেক সময় সুরেন দাশগুপ্ত'র রচনাবলী আপনি ব্যবহার করেছেন?

সরকার—সুরেন দাশগুপ্ত'র ঐতিহাসিক বইটা ১৯১৪ সনের আগে,—এমন কি ১৯২০

সনের আগে,—বেরুলে আমি নানা উপলক্ষ্যে কাজে লাগাতে পারতাম। সে যুগে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি নিয়ে আমার কারবার চল্‌তো খুব-বেশী। আজকাল বিশ-বাইশ বছর ধ'রে প্রাচীন ভারত বিষয়ক চর্চ্চা আমার বেশ-কিছু ক'মে এসেছে। একপ্রকার নেই বল্‌লেই চলে। পাল্লায় প'ড়েছি প্রধানতঃ ধনবিজ্ঞানের—তাও আবার ধনবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ডের। এতে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঠাঁই পাওয়া কঠিন।

লেখক—সুরেন দাশগুপ্ত'র ঐতিহাসিক বইয়ের এত প্রশংসা কর্‌ছেন। এই সম্বন্ধে আরও কিছু বল্‌বেন?

সরকার—সুরেন দাশগুপ্তের বইয়ের আর একটা বড় উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব আছে। সেদিকে লোকের নজর প'ড়েছে কি না জানি না। আয়ুর্বেদের দর্শন এ বইয়ের ভেতর ঠাঁই পেয়েছে। আমার পক্ষে এটা পছন্দসই ঘটনা। আয়ুর্বেদকে ভারতীয় দর্শনের অন্যতম শাখা হিসাবে দেখা কর্তব্য। কার্য-কারণ বিষয়ক বিজ্ঞানের বা দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন চরক-সংহিতা।

লেখক—আয়ুর্বেদকে দর্শনের ভেতর ঠাঁই দেওয়া হয়েছে ব'লে আপনি বইটার প্রশংসা করছেন?

সরকার—ঠিক তাই। কেন? কথাটা শুনে তোর লজ্জা কর্‌ছে বুঝি? ভাব্‌ছিস, পাঁচনের আবার দর্শন? এই সঙ্গে ভারতীয় দর্শনের অন্যান্য কয়েক শাখা সম্বন্ধে একটা ইঙ্গিত করতে চাই। ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, দণ্ডনীতি ইত্যাদি ভারতীয় বিদ্যাগুলার ভেতর দার্শনিক মাল আছে। আজকালকার ইয়োরামেরিকান পারিভাষিকে সেই সব আইনবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার মাল। এ সকল শাস্ত্রে ঠাঁই বইটার ভেতর থাকা উচিত। তা ছাড়া শিল্পশাস্ত্র, ময়-শাস্ত্র, বাস্তুবিদ্যা ইত্যাদি ভারতীয় বিদ্যাগুলোকে একালের "এস্‌থেটিক্‌স্", রস-দর্শন. সৌন্দর্য-তত্ত্ব বা রূপবিজ্ঞানের খানিকটা জুড়িদার বলা যেতে পারে। এসবও দর্শনের অন্তর্গত। দর্শনের ঐতিহাসিকের পক্ষে এসবের চর্চাও বাঞ্ছনীয়। এই সঙ্গে সাহিত্য-দর্পণ, নাট্টশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র ইত্যাদি অলঙ্কার বা রসশাস্ত্রও নজরে রাখা কর্তব্য। সমালোচনা-বিদ্যাটা আমার মতে আসল দর্শন। প্রাচীন গ্রীক অথবা আধুনিক ইয়োরামেরিকান দর্শনের ঐতিহাসিকেরা এসকল দিকে নজর দিতে অভ্যস্ত। আমার সহপাঠী বন্ধু অতুল গুপ্ত-প্রণীত "কাব্য-জিজ্ঞাসা"য় (১৯২৯, ১৯৪১) প্রাচীন ভারতীয় রস-দর্শন সুললিতভাবে দেখানো আছে। মধ্যযুগের দুইজন কাশ্মীরী রস-দার্শনিককে বাঙালীর পাতে পরিবেষণ করা হয়েছে। একজনের নাম আনন্দবর্দ্ধন, আর একজন অভিনবগুপ্ত। "কাব্য-জিজ্ঞাসা"টা প'ড়ে দেখিস। বেড়ে বই।

লেখক—আপনি রাধাকৃষ্ণন আর সুরেন দাশগুপ্তের সব কয়খানা বই পড়েছেন?

সরকার—অনেকগুলাই পড়েছি। তবে ইতিহাস নামে পরিচিত বইগুলা বেশী ঘেটে থাকি। কাজে লাগে। দু'জনের সব লেখাই আমি জানি একথা বলা সম্ভব নয়। ইংরেজি বইয়ের আকারে যা পেয়েছি সবই গিলেছি বোধ হয়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস-গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোনো বইয়ের লেখক হিসাবে এঁরা লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে আজও পরিচিত কিনা বল্‌তে পারি না। কাউকে কখনো জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিনি। আমার যতদূর মনে পড়ছে, এঁদের প্রায় সব রচনাই প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সার, ইতিহাস বা ব্যাখ্যাশ্রেণীর অন্তর্গত। এঁদের যে সকল রচনায় প্রাচীন ভারতের নাম পর্য্যন্ত নেই, সেই সবেরও ভেতরকার মুদ্দাটা বিল্‌কুল প্রাচীন ভারতীয় মাল।

রাধাকৃষ্ণনের স্বাধীন দর্শন পাওয়া যায় তাঁর "কল্কি" বইয়ে (লণ্ডন ১৯২৯)। ভবিষ্যতের মানব-সমাজের আকার-প্রকার সম্বন্ধে উহাতে তাঁহার বাণী আছে। লেখকের অধ্যাত্ম-নিষ্ঠায় আর আদর্শ-নিষ্ঠায় ভারতীয় মাল প্রচুর। ডাইভোর্সের বিরুদ্ধে পাঁতি দিয়েছেন।

অবশ্য আমি কতটুকুই বা বুঝি? আমার মত জান্‌তে চাচ্ছিস্, ব'লে দিলাম। এতে পণ্ডিত-মহলের কোনো ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই। আমাকে মুখ্‌খু ব'লেই সকলে জানে। কাউকে আমার মতে ভিড়াতে চাচ্ছি না।

("দর্শনের ইতিহাস," ২৭শে আগষ্ট, ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

দর্শনের কষ্টিপাথর

লেখক—দর্শনের ইতিহাস যে লেখে, সে কি দার্শনিক হ'তে পারে না?

সরকার—কেন পার্‌বে না? ইতিহাস ছেড়ে অন্য দিকে মন দিলেই হ'লো। আগেও একবার একথা বলেছি। আসল কথা,—পরের চরকা 'ছিকেয় তুলে' নিজের চরকায় তেল দিলেই তো যে-কোনো লোক দার্শনিক। অনেক লেখক ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর বইয়ের গ্রন্থকার। যে লোকটা খাঁটি দর্শনের বই লেখে সে দর্শনের ইতিহাসও লিখ্‌তে পারে।

তা' ছাড়া এমন কি দর্শনের ইতিহাস-গ্রন্থেও খানিকটা দর্শন থাকা সম্ভব। কেন-না ঐতিহাসিক অনেক সময় তাঁর আলোচ্য দার্শনিকদের মতামত সমালোচনা ক'রে থাকেন। এ সকল সমালোচনার সময় তাঁর নিজ মগজের ঘি কিঞ্চিৎ-কিছু অথবা বেশ-কিছু ঢাল্‌তে হয়ই হয়।

লেখক—আপনি দেখ্‌ছি সমালোচনাকে দর্শনের ইজ্জদ দিতে অভ্যস্ত?

সরকার—হাঁ, আগেই বলেছি। সমালোচককে দার্শনিকের কোঠে ঠাঁই দেওয়া উচিত। বস্তুতঃ দর্শনবিদ্যা এক হিসাবে সমালোচনা ছাড়া আর কিছু নয়। সমালোচনা শব্দটা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার কর্‌ছি। জীবন-সমালোচনা, ব্যক্তি-সমালোচনা, কাল-সমালোচনা, কাবণ-সমালোচনা, মতামত-সমালোচনা, সাহিত্য-সমালোচনা, সঙ্গীত-সমালোচনা, চিত্র-সমালোচনা, দুনিয়া-সমালোচনা,—এসবের সোজা নাম দর্শন।

সঙ্কীর্ণ অর্থেও সমালোচনা শব্দটা চালাচ্ছি। সেই হিসাবে পরকীয় মতের সমালোচনার উপর আমি খুবই জোর দিয়ে থাকি। প্রতিবাদগুলাও দর্শন। এই সবই স্বাধীন চিন্তার প্রতিমূর্তি। প্রতিবাদসমূহের উপর নয়া দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়। সেকালের কাণ্ট (১৭২৮-১৮০৪) হ'তে একালের ব্রাড্‌লে, ডুয়ী, দেলভেক্কা, ফাইহিঙ্গার, রীড, আলেকজাণ্ডার, পর্যন্ত সকলেই পরকীয় মতের সমালোচনার উপর নিজ দর্শন দাঁড় করিয়েছেন।

লেখক—তা হ'লে স্বাধীন দর্শনের লক্ষণ কী-কী?

সরকার—বিজ্ঞানের লক্ষণ আর দর্শনের লক্ষণ একরূপ। সেকেলে দার্শনিক মতসমূহের সমালোচনা জিনিষটা স্বাধীন মগজের সাক্ষী। একালের পরকীয় মতের সমালোচনাও তাই। তা ছাড়া কার্য, কারণ, ফলাফল, দেশ, কাল, ব্যক্তি, সমাজ, আত্মা, আমি, বস্তুত্ব, সত্য, পরকাল, ভগবান, মুক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ চালানো হচ্ছে দর্শন বা বিজ্ঞান। স্বাধীনভাবে ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু যা-কিছু বলা যায়, তাই দর্শন। তাই বিজ্ঞান। অবশ্য যুক্তি থাকা চাই। তবে বৈজ্ঞানিকের বা দার্শনিকের সব পাঁতিই হাতী ঘোড়া কিছু নয়। নেহাৎ অলীক স্বপ্ন আর

গাঁজাখুরিও দর্শন বা বিজ্ঞান। সূত্র, পাঁতি বা বাণীগুলা অনেক সময় স্বীকারযোগ্য না হ'তেও পারে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সে-সবের ভেতরে হয়তো বা আধা-সত্য থাকে। কথায়-কথায় যখন-তখন দর্শন-লেখকগুলাকে পীর, পাঁড়, অবতার বা জাজ্বল্যমান ভাবা চরম আহাম্মুকি। ("ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ড", ৪ঠা অক্টোবর দ্রষ্টব্য)

আবার বলছি,—দর্শনের ইতিহাস-বিষয়ক বইগুলার অধ্যায়সমূহ খুলে বিশ্লেষণ করা হ'ক। হয়তো কোনো-কোনো বইয়ে এই ধরণের স্বাধীন মগজ বা স্বাধীন ঘি স্পর্শ করা অসম্ভব নয়। বইগুলার নাম দেখে তার ভিতরকার মাল অনেক সময়েই বুঝা যায় না। এজন্য ইতিহাস-নামে পরিচিত বইগুলার অধ্যায়সমূহ খুঁটে খুঁটে দেখা উচিত। তার ভিতরও খাঁটি স্বাধীন দর্শন থাক্‌তে পারে।

লেখক—আশ্চর্যের কথা, আপনি দর্শনকে একটা গুরুগম্ভীর ভয়ানক-কিছু মনে করেন না?

সরকার—ঠিক ধ'রেছিস্‌। আমার কাছে দর্শনের কষ্টি-পাথর অতি সোজা। চাই মগজের ঘি ঢালা, আর ভালমন্দ যা-হোক্‌-কিছু ব'কে যাওয়া। ব্যস্‌। দার্শনিকের কাছে দুনিয়া আর কিছু দাবী করে না।

("দর্শনের আলোচ্য বিষয়", ২৭শে আগষ্ট ১৯৪২, "ধন-রাষ্ট্র-সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড," সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের দরদ

লেখক—আচ্ছা, আজকাল ভারতবর্ষে ভারতীয় ইতিহাস লোকের নজরটা কেন বেশী টেনে নিচ্ছে? আপনি যাকে দর্শন বলেন, সেই বিদ্যার দিকে ভারতীয় পণ্ডিতদের গবেষণা, পঠনপাঠন, লেখালেখি খুব কম কেন?

সরকার—জবাব অতি সোজা। যুবক ভারত সবেমাত্র লেখাপড়া সুরু ক'রেছে,—অর্থাৎ পাণ্ডিত্যের দুনিয়ায় গবেষক, লেখক ইত্যাদিরূপে দেখা দিয়েছে। জেনে রাখিস্‌,—পাশ-ফেলের কথা পাড়্‌ছি না। বল্‌ছি একমাত্র লেখালেখির কথা। এ প্রচেষ্টার সূত্রপাত বলা যেতে পারে ১৯০৫ সনে, গৌরবময় বংগবিপ্লবের সমসাময়িক। সোজা কথা,—গবেষণা আর লেখালেখি মাত্র ৩৭ বছরের মাল। সত্যি কথা,—অতদিনও নয়। বিগত বিশ-বাইশ বছরের ভেতরই লেখালেখি যা-কিছু প্রকাশিত হয়েছে বলা যেতে পারে। বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শন লেখকদের বইগুলার অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে ১৯২০ সনের পরবর্তীকালে।

("বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ", ১১ই নবেম্বর, ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—এই সব ঐতিহাসিক গবেষণার উদ্দেশ্য কি? ঝোঁকটা ইতিহাসের দিকে কেন গেল?

সরকার—আমাদের বাপ দাদারা দর্শনবিদ্যায় পণ্ডিত ছিল। কে বল্‌লে? এইরূপ ব'কে যাওয়া আমাদের দেশের লোকের বাতিক। কিন্তু কথাটা ইয়োরামেরিকার দার্শনিক ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা বড় একটা স্বীকার করে না। তা সপ্রমাণ কর্‌বার জন্য আজকালকার ভারতীয় গবেষকেরা উঠে প'ড়ে লেগেছেন। বুঝ্‌লি? এঁরা সকলেই "লেখক" হিসাবে স্বদেশ সেবক। আমাদের পণ্ডিতেরা সরকারী চাক্‌রে অনেকেই। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার তোআক্কা অনেকেই

হয়ত রাখেন না। কে জানে, বাবা, কার মেজাজের ভিতর কী আছে? কিন্তু মনে হচ্ছে যে, প্রাণে প্রাণে সকলেই দেশের গৌরব চান। এজন্য অনেক লেখকই প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতকে সেকালের পাশ্চাত্য দুনিয়ার সংগে সমানে-সমানে খাড়া কর্‌বার জন্য ব্রতবদ্ধ। একেই আমার চোঁথা ভাষায় বলি, ভারত-মাতাকে "ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া" হচ্ছে, "জাতে তোলা" হচ্ছে ইত্যাদি।

বর্তমান ভারতকে গড়ে তোলা আমাদেরই সকলের প্রাণের দরদ। এই দরদের ধাক্কায়ই আমরা অন্যান্য অনেক-কিছু করবার সংগে সংগে আমাদের ভারতের অতীতটাকেও ডাইনে-বাঁয়ে বাজিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা ক'রছি। এজন্যই প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার ঝোঁক।

লেখক—অতীত ভারত নিয়ে আমাদের পণ্ডিতেরা অতিমাত্রায় মেতে রয়েছেন না কি?

সবকার—আমি তা স্বীকার করি না। আমার মনে হয়—প্রত্নতত্ত্বে আর ইতিহাসে আরও বেশী গবেষণা হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস,—এই ঝোঁক আরও কিছুকাল ভারতীয় লেখক ও গবেষক মহলে থাক্‌তে বাধ্য। বস্তুতঃ প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র, অর্থ, ধর্ম, সম্পদ্, সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত আমরা অতি অল্পমাত্র মাল আবিষ্কার কর্‌তে পেরেছি। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা কর্‌বার জন্য অনেক দিন পর্যন্ত অসংখ্য লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের দরকার হবে। কাজেই সেকেলে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস-লেখক, ভাষ্যকার, সংগ্রাহক ইত্যাদির সংখ্যা বড় শীঘ্র কম্‌তে পাবে না,—কমা আমার বিবেচনায় বাঞ্ছনীয়ও নয়। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আমি যারপর নাই মূল্যবান বিবেচনা করি। স্বদেশ-সেবক মাত্রই প্রত্নতত্ব ও ইতিহাসের দরদ সমঝিতে বাধ্য।

বর্তমান ভারতে দর্শনের সূত্রপাত হয়েছে কি?

লেখক—খাঁটি দর্শনের দিকে গবেষণা বেশী হচ্ছে না কেন? কবে এদিকে নজর পড়্‌তে পারে?

সরকার—এখনো আমাদের দেশে সত্যিকার গবেষক আর লিখিয়ে-পড়িয়েদের সংখ্যা খুব কম। পয়সা রোজগারের পথ এ নয়। লেখা-লেখিতে সংসার চালানো যায় না। যে ক'জন করিত-কর্মা দর্শন-লেখক দেখা যায়, তাঁরা প্রাচীন ভারতকে দুনিয়ার দর্শনের আসরে ঠেলে তুল্‌বার জন্য মোতায়েন রয়েছেন। নতুন-নতুন গবেষণার দিকে মাথা খেলাবার সময় তাঁদের নেই। তার জন্য চাই নয়া-নয়া গবেষক।

তবে একথাও বল্‌তে পারি যে,—যাঁরা দশ-পনের বছর ধ'রে দর্শনের প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাস চালাচ্ছেন, তাঁদেরও কেউ-কেউ হয়ত খাঁটি দর্শনের দিকে ঝুঁক্‌তে থাক্‌বেন। চিরকাল অর্থাৎ সারা বয়স একমাত্র অতীত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হয় তো তাঁদের পক্ষে তেতো হয়ে আস্‌বে। কাজেই এখন যাঁরা দর্শনের ঐতিহাসিক রয়েছেন, তাঁদেরই ভেতর থেকে কেউ-কেউ হয়তো খাঁটি দার্শনিক পরিণত হ'য়ে যাবেন। তাতে আশ্চর্য হবার কথা থাক্‌বে না! বরং অনেকক্ষেত্রে তাই স্বাভাবিক।

লেখক—এই নূতন ঝোঁকের দুএকটা চিহ্ন দেখাতে পারেন?

সরকার—কঠিন। তবে রাধাকৃষ্ণন ও মুইয়রহেড কর্তৃক সম্পাদিত "কণ্টেম্পোরারি

ইণ্ডিয়ান ফিলজফি" (সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন, লণ্ডন ১৯৩৬) বইটার ভেতর মনে হচ্ছে এক-আধটা চিহ্ন দেখেছি। এতে আছে জন তের-চোদ্দ ভারতীয় দর্শন-সেবকের রচনা। তার দুএকটাতে লেখকরা একাল-সেকালের দর্শন সমালোচনা করেছেন। এই সমালোচনার সুরের ভেতর নতুন-কিছু সৃষ্টি কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা যেন লুকিয়ে আছে। নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে দার্শনিক হবার জন্য সংগ্রাম ভারতীয় লেখকদের চিন্তাপ্রণালীতে দেখা দিয়েছে।

এই সংগ্রামেরই আর একটা চিহ্নোৎ মুরলীধর ও হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জেনেটিক হিস্‌ট্রি অব্ দি প্রব্‌লেমস্ অব্ ফিলজফি" (দার্শনিক আলোচ্য বস্তুর ক্রমবিকাশমূলক ইতিহাস ১৯৩৫)। বইটার ভেতর আছে দেশী-বিদেশী দর্শনের ইতিহাস আর তুলনা। কিন্তু লেখকদের উদ্ভাবিত একটা নয়া কাঠামোর ভেতর ঐতিহাসিক আর তুলনা-বিষয়ক তথ্যগুলাকে মুড়ে রাখা হয়েছে। স্বাধীন চিন্তার ছোঁআচ আছে।

পরকীয় দর্শন সমালোচনা কর্‌তে-কর্‌তেই লেখকেরা স্বাধীন দার্শনিক দাঁড়িয়ে যায়। দর্শন-সমালোচনা অনেক সময়েই স্বাধীন দর্শনের বনিয়াদ। ইয়োরামেরিকার দস্তুর তাই দেখা যাচ্ছে। প্রাচীন আর মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শনেও তার সাক্ষী আছে বিস্তর।

("দার্শনিক বনাম দর্শনের ঐতিহাসিক," ২৭শে আগষ্ট, ১৯৪২, "স্বাধীনতা-রূপী আমির দার্শনিক কৃষ্ণ ভট্টাচার্য", সেপ্টেম্বর, ১৯৪২, "স্বাধীন দর্শন", ২৮শে অক্টোবর, ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

"হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি"

লেখক—এই সেদিন ভিন্‌সেন্ট স্মিথের "অক্সফোর্ড হিস্‌ট্রি অব্ ইণ্ডিয়া"য় মৌর্যযুগ পড়্‌তে আপনার "পজিটিভ্ ব্যাকগ্রাউণ্ড অব্ হিন্দু সোশিওলজি"র উল্লেখ পেলাম। ঐ বইটাতে আপনি কি বল্‌তে চেয়েছেন?

সরকার—ঐ বইটার নাম আগেও আমি দু একবার করেছি। দুনিয়ার পণ্ডিতেরা প্রচার করেছেন,—"ভারতবাসীরা শুধুই আধ্যাত্মিক। তাদের কাছে জড়-নিষ্ঠা অজ্ঞাত। ভারতবর্ষ মানেই পরকাল-চর্চ্চার দেশ,"—ইত্যাদি। হিন্দু সংস্কৃতি বা ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে এরকম কথা বিদেশের বহু মনীষী যখন-তখন ব'লে থাকেন। এই মতের অন্যতম প্রবর্ত্তক মাক্‌স্ ম্যিলার।

আমাদের দেশী পণ্ডিতেরাও প্রায় সকলে এই মতেই সায় দিয়ে চ'লেছেন। ভারতের অনেকে মনে করেন যে, পাশ্চাত্যের যাঁরা ভারতবর্ষকে আধ্যাত্মিকতার দেশ ব'লে প্রচার ক'রেছেন, তাঁরাই ভারতকে যথার্থরূপে বুঝেছেন।

শুনা যায় যে ভারতের নরনারী সম্বন্ধে আধ্যাত্মিকতার দাবী প্রচার কর্‌লে ভারতীয় পণ্ডিতেরা নাকি বিলাতে বেশ-কিছু ইজ্জদ পেয়ে থাকেন? তাতে তাঁদের সাংসারিক লাভ ও বোধ হয় ঘটে ভালই। ভারতীয় নরনারী রক্তমাংসের মানুষ ছিল না,—এই কথাটা সাদা চামড়ার সুধী ও রাষ্ট্রিকবর্গ ভারতসন্তানের মুখে শুন্‌লে আহ্লাদে আটখানা হন। তাঁরা এই ধরণের ভারত-প্রচারককে খুব তারিফ করেন। সেই তারিফের জোরে মোটা মোটা অনেক কিছু হওয়া বা পাওয়া সম্ভব। কাজেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে ভারতের মূর্তি দাঁড়িয়ে গেছে নিম্নরূপ ঃ—"ভারতবর্ষ ব্যবহারিক বিজ্ঞানে, যুক্তিনিষ্ঠায়, অর্থ-নীতিতে, রাজনীতিতে, সমর-

বিদ্যায়, বস্তুনিষ্ঠায় একদম আনাড়ি। সুতরাং ভারতবর্ষ রাজনীতিতে, সমর-বিদ্যায়, বস্তুনিষ্ঠায় একদম আনাড়ি। সুতরাং ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের গোলাম হ'য়ে থাক্‌বার যোগ্য।"

এসব মতের বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ ক'রেছি আমার ঐ "পজিটিভ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি" গ্রন্থে (পাণিনি অফিস, এলাহাবাদ ১৯১৪)। আজ পর্যন্ত এই "হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি" বইটার চার খণ্ড বেরিয়েছে (১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩৭)। এখনো সম্পূর্ণ হয়নি।

লেখক—ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় সার্বজনিক মতের প্রতিবাদে আপনার সিদ্ধান্ত কি দাঁড়িয়েছে?

সরকার—আমি বলি,—ভারতবর্ষ ততখানি বস্তুনিষ্ঠ, ততখানি যুদ্ধপ্রিয়, ততখানি শক্তিযোগী সাম্রাজ্যবাদী যতখানি ইয়োরোপ ; আবার ইয়োরোপ ততখানি নীতিনিষ্ঠ ও আধ্যাত্মিক বা ঐ ধরণের আর কিছু যতখানি ভারতবর্ষ। সাধারণতঃ প্রচার করা হয় যে, ভারতবর্ষ অহিংসার দেশ, কিন্তু আমার মতে তার হিংসানীতি জবরদস্ত, এবং যুদ্ধনিষ্ঠা, রাজ্যলিপ্সা ইত্যাদি চিজও অত্যন্ত ভীষণ। আমার "আবিষ্কারটা" অতি-সরল, অতি-সোজা। ব'লেছি, ভারতের লোকগুলা মানুষের বাচ্চা, রক্তমাংসের মানুষ। ব্যস্‌।

ইয়োরামেরিকান আর ভারতীয় পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বাজারে যে সকল মত ছড়িয়েছেন তার অধিকাংশই অনৈতিহাসিকও যুক্তি-বিরোধী। বস্তুনিষ্ঠ নৃতত্ত্বসেবীরা সে সব মত বরদাস্ত করতে পারে না। এই আমার কথা। ভারতের মানুষ সম্বন্ধে অতি প্রচলিত ও অতি লোকপ্রিয় মতগুলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ঘোষণা "পজিটিভ ব্যাক্ গ্রাউন্ড" বইয়ের আসল মুদ্দা।

লেখক—এই ধরণের আর কোনো প্রতিবাদ আপনার গ্রন্থাবলীতে আছে?

সরকার—আমাদের দেশে দু'টো আধ্যাত্মিকতার কথা বল্‌লেই তাকে লোকেরা উঁচুদরের দার্শনিক সম্ঝে থাকে। এই মতিগতির আমি চরম যম। আমি এর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ ক'রে থাকি। আমার চিন্তা বহুসংখ্যক হরেক রকমের প্রতিবাদে ভরা। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, মানুষ সম্বন্ধে যা-কিছু বুজরুকি-পূর্ণ মত, সিদ্ধান্ত বা দর্শন তার অনেকগুলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালানোই আমার পেশা। প্রত্যেক রচনাই কতকগুলা প্রতিবাদের বাণ্ডিল। এই সব প্রতিবাদের ও জবাবের ভেতর ঢুঁড়তে হবে এই অধমের দর্শন। গরীব লোক আর মুখ্‌খু মানুষেরও এক-আধটা দর্শন থাকা অস্বাভাবিক নয়। আগেই একথা ব'লে চুকেছি।

লেখক—আজকাল লোকে যাকে "সরকারিজম্‌" (বিনয়সরকারী মত) বলে, এই ধরণের প্রতিবাদগুলা কি তার প্রধান কথা? বর্তমান ভারতের অনেক আধুনিক জিনিষ সম্বন্ধে আপনি যে একটি জীবন্ত প্রতিবাদ তা আমার বন্ধুরা অনেকে ব'লে থাকে। এ কয়দিনেও প্রতি মুহূর্ত্তেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। তবে এ ধরণের কথা যে ঐ বইয়ের মধ্যেও আছে তা জান্‌তাম না। আপনার অন্যান্য দু'-একটা রচনায়ও সার্বজনিক অর্থনীতি ও সমাজনীতির বিরুদ্ধে আপনার প্রতিবাদগুলা লক্ষ্য করেছি। প্রাচীন ভারত আর বর্তমান জগৎ সকল প্রকার দেশ ও মানুষ বিষয়ক মতামতের বিরুদ্ধেই আপনি লড়্‌ছেন দেখ্‌তে পাই?

সরকার—হ্যাঁ, তাই দেখ্‌ছি। লোকজনের সঙ্গে মিল্‌ছে না। কি কর্‌ব বল্‌? একে গরীব, তার ওপর মুখ্‌খু। আমার মতামতের দামই বা কি? তবে প্রতিবাদগুলা আর জবাব সমূহ সাদার উপরে কাল আঁচড়ে খুদে' রেখে যাচ্ছি। হয়তো কোনোদিন কারুর কাজে লাগ্‌বে। লোকে বলে,—গরীবের কথা বাসি হ'লে কাজে লাগে। ইতিমধ্যেই মনে হচ্ছে যেন অনেকের

কাজে লেগেছে। তার চিহ্নোৎ এখানে-ওখানে একটু-আধটু দেখ্‌তে পাই।

("১৯০৫ সনের পরবর্ত্তী ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী" ১৪ই অক্টোবর, "ব্রহ্মবান্ধব ও ডন সোসাইটি", এবং "ভগ্নী নিবেদিতার আবহাওয়া", ২৮শে নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)।

সেপ্টেম্বর ১৯৪২

অরবিন্দ-দর্শন

৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

লেখক—যদি কিছু মনে না করেন, তবে অরবিন্দ সম্বন্ধে আপনাকে আজ একটা প্রশ্ন কর্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে। শ্রীঅরবিন্দকে আপনি দার্শনিক বিবেচনা করেন কি?

সরকার—আলবৎ। কিন্তু বোঝাতে হ'লে বক্‌তে হবে অনেকখানি ; বেশ-কিছু সময় লাগবে। তারপর আমার মতন গরুর মুখে কথাগুলো ভাল শুনাবে কিনা সন্দেহ। দেখতেই পাচ্ছিস্‌,—লোকপ্রিয় মতের বেপারী আমি নই।

অরবিন্দ খাঁটি দার্শনিক। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান ভারতের এক-প্রকার প্রথম দার্শনিকই অরবিন্দ। তাঁর লাইফ্‌ ডিভাইন ('ভাগবত-জীবন,' ১৯৪০-৪১) বইয়ের কথা বল্‌ছি। রামমোহন হ'তে আজ পর্যন্ত অরবিন্দ'র পূর্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক ভারতীয় পণ্ডিতেরা প্রধানতঃ বা একমাত্র সেকেলে হিন্দু-বৌদ্ধ দর্শনের অনুবাদক, সংগ্রাহক, ভাষ্যকার, টীকাকার ছাড়া আর কিছু নন। মানুষ, দুনিয়া, কাল, কারণ, প্রকৃতি, চিত্ত, চেতনা, জ্ঞান, আত্মা, বিদ্যা, সত্য, কর্তব্য, সুখ, মুক্তি, উন্নতি ইত্যাদি বস্তু সম্বন্ধে নিজ মগজের স্বাধীন চিন্তা একালের খুব কম বাঙালী (ও অন্যান্য ভারতীয়) লেখকেরা দেখাতে পেরেছেন। দেখাতে পারেন নি বল্‌লেই ঠিক বলা হয়। যারাও বা যৎকিঞ্চিৎ দেখিয়েছেন, তাঁদেরও স্বাধীন লেখালেখির পরিমাণ নেহাৎ কম। তাঁরাও প্রধানতঃ উপনিষদ, বেদান্ত, গীতা, যোগ ইত্যাদি সেকেলে বইয়ের তর্জমাকারী বা মর্মপ্রচারক। তা'ছাড়া পাশ্চাত্যদর্শনের তর্জমা, ভাষ্য, টীকা বা সার-সংগ্রহের কাজও খুব কম হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ভারতীয় পণ্ডিতদের রচনা এখনও, বহরে বেশী নয়। সত্যি কথা, আধুনিক ভারত দেশী-বিদেশী দার্শনিক সাহিত্যে আজ পর্যন্ত লেখালেখি ক'রেছে বড়-কম।

যাহোক, অরবিন্দ'র 'লাইফ্‌ ডিভাইন' কোনো-কিছু দেশী-বিদেশী দর্শনগ্রন্থের অনুবাদ, ব্যাখ্যা, তুলনায় সমালোচনা, ইতিহাস বা সঙ্কলনগ্রন্থ নয়। প্রাসঙ্গিকভাবে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি, দার্শনিক হীরেন দত্ত'র 'গীতায় ঈশ্বরবাদ'। এ বইটা বৈদিক উপনিষদ-সাহিত্যের সঙ্গে গীতা-দর্শনের তুলনায় সমালোচনা-বিষয়ক গ্রন্থ। অরবিন্দ'র 'ভাগবত-জীবন' পুরাপুরি তাঁর নিজস্ব। হীরেন দত্ত'র বই এই শ্রেণীর বই নয়।

লেখক—কেন? "লাইফ্‌ ডিভাইন" গ্রন্থের ভিতর পরকীয় চিন্তা, দেশী-বিদেশী দার্শনিকদের মতামত কি একদম নেই?

সরকার—আছে বৈকি! কিন্তু অরবিন্দ'র গ্রন্থে 'পরানুবাদ ও পরানুকরণ' কতখানি বা কতটুকু—তা জরিপ করা চাই। কিছু বিশ্লেষণ চালাচ্ছি। তাতেই অরবিন্দ'র স্বাধীনতা বেরিয়ে

পড়্‌বে। বইটা খুল্‌বামাত্র যে-কোনো লোক দেখতে পাবে যে,—প্রত্যেক অধ্যায়েরই মাথায় আছে—দু'একটা বৈদিক "বয়েৎ" বা উপনিষদের বাণী। অধ্যায়গুলার ভেতরেও উপনিষদ, গীতা, যোগ, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি সেকেলে সাহিত্যের মাল বেশ-কিছু গোলা আছে। প্রাচীন পারিভাষিক শব্দও অল্পবিস্তর ছড়ানো আছে। শিব, শক্তি, সচ্চিদানন্দ, অবতার ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার সহজেই নজরে পড়ে। তা দেখে মনে হ'তে পারে যে, অরবিন্দ বুঝি পুরাণা ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তাগুলা একালের দুনিয়ার জন্য ইংরেজিতে ছড়িয়ে চ'লেছেন। প্রাচীন দর্শনের এরূপ প্রচার কিঞ্চিৎ-কিছু এই বইয়ের ভেতর নেই—একথা বলা চল্‌বে না। কিন্তু এ প্রচারকার্য আমাদের ভারত-সুবিদিত একেলে-সেকেলে টুলো পণ্ডিত অর্থাৎ মামুলি ভাষ্যকার, নিবন্ধকার, টীকাকার ইত্যাদি সুধীবর্গের প্রণালীতে চালানো হয়নি। প্রত্যেক অধ্যায়ই অরবিন্দ'র নিজ বক্তব্য প্রচারের জন্য লিখিত। নিজ "মাথার ঘি" ঢাল্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে অরবিন্দ এখানে-সেখানে কতকগুলা পুরাণা পারিভাষিক কায়েম ক'রেছেন। কিন্তু সর্বত্রই মুখ্য উদ্দেশ্য নিজেরই প্রাণের কথা খোলসা ভাবে বুঝানো। ফলতঃ, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সাগ্‌রেৎ-শিষ্য-পাঠকেরা এই সকল রচনার ভেতর বিল্‌কুল নয়া মালের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে বাধ্য।

লেখক—অরবিন্দ'র নয়া মালটা কি?

সরকার—এই নয়া মাল অরবিন্দ'র মগজে আমদানি হয়েছে পশ্চিম-মুল্লুক থেকে। আধুনিক ইয়োরোপের ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব "ভাগবত জীবন"-বইয়ের আসল মুদ্দা। নবীন সেনের

"ভাঙিতেছে পুরাতন, গড়িতেছে নূতন
জগতের নীতি এই মহা বিবর্তন"

জানিস্ ত? এটা পশ্চিমা মাল। বিবর্তন বা অভিব্যক্তি ইত্যাদির কথাই অরবিন্দ-দর্শনের প্রাণবস্তু। ঠিক এই ধরণের ক্রমবিকাশ কোনো উপনিষদ্-বেদান্ত-যোগ-পুরাণ-তন্ত্রে নেই। উপনিষদ-বেদান্ত-যোগ-পুরাণ-তন্ত্রের এখানে ওখানে হয়ত বিবর্তন, অভিব্যক্তি বা ক্রমবিকাশের দস্তুর হোমিওপ্যাথিক ডোজে পাওয়া যায়। কিন্তু সেই সবের সদ্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রাচীন ভারতের পণ্ডিত-মহলে বড়-একটা দেখা যায় না। আর তা দিয়ে বড়-গোছের একটা জীবন-বিজ্ঞান, জীবন-দর্শন, জীবন-বেদ গ'ড়ে তোলার ওস্তাদি আজ পর্যন্ত কোনো—একেলে-সেকেলে—ভারতীয় ঋষি-মুনি-পণ্ডিত-দার্শনিক দেখাতে পারেন নি। সেই ওস্তাদি দেখ্‌তে পাচ্ছি অরবিন্দ'র হাতে। কিন্তু বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব আমদানি ক'রে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনকে তিনি বেশ-কিছু ফুলিয়ে তুল্‌তে পেরেছেন। এই হিসাবে অরবিন্দ সেকেলে হিন্দু ঋষি-মুনি-পণ্ডিতদের সন্তান ও বংশধর। তাঁদের ধারা অরবিন্দ'য় এসে বাড়্‌তির পথে চলেছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি আবার অমরতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ একটা মস্ত কথা।

আমি মুখ্‌খু লোক। যতটুকু বুঝেছি সেটুকু ব'লে যাচ্ছি। আমার ভুলচুকে লোকজনের ক্ষতি হবে না। লোকেরা আমাকে বেআড়া, আহাম্মুক ব'লেই জানে।

ব্যর্গ্সঁ, হেগেল ও অরবিন্দ

লেখক—পশ্চিমের কোথা থেকে অরবিন্দ তাঁর নূতন মাল আমদানি ক'রেছেন?

সরকার—আমার বিশ্বাস—অন্যেরা কি মনে করে জানি না,—একালের ফরাসী পণ্ডিত ব্যর্গ্সঁ অরবিন্দ'র মাথায় ঢেলেছেন 'জীবনের ধাক্কা' (লোলাঁ দ্য লা ভী)। এই ধাক্কাটা দুনিয়াকে হিড়-হিড় ক'রে ঠেলে নিয়ে চলে। তাতেই হয় সৃষ্টি। প্রাণ, মানুষ, জগৎ, চিত্ত সবই এই ধাক্কার ঠেলায় নয়া-নয়া মূর্তিতে বিকাশলাভ কর্‌তে থাকে। এই গেল বিবর্তন বা অভিব্যক্তির এক পশ্চিমা ফোআরা।

লেখক—আর-কোনো পাশ্চাত্য প্রভাব অরবিন্দ-দর্শনে পাওয়া যায়?

সরকার—অরবিন্দ'র দ্বিতীয় পশ্চিমা গুরু জার্মাণ পণ্ডিত হেগেল (১৭৭০-১৮৩১)। এই ফোআরায় নাইতে গেলে সহজেই দখল করা যায় দুনিয়ার দ্বন্দ্ব,—টক্কর, প্রতিযোগিতা, সংগ্রাম। এই দ্বন্দ্বমূলক দুনিয়ার বিভিন্ন গতি-ভঙ্গী (অর্থাৎ ভাঙ্গা-গড়া) জীবন-বিকাশের বা সংস্কৃতি-বিকাশের বা চিত্তোন্নতির নানা স্তর, গড়ন বা রূপ মাত্র। অরবিন্দ'র "ভাগবত-জীবন" দ্বন্দ্বনিষ্ঠ, টক্করনিষ্ঠ, লড়াইনিষ্ঠ। অরবিন্দ-দর্শন শান্তি জানে না। এর ভেতরকার মন্তর হচ্ছে,—"ওঁ অশান্তিঃ অশান্তিঃ অশান্তিঃ!" মানুষের ভাগবত-জীবনকে অরবিন্দ খাড়া ক'রেছেন অশান্তির উপর—লড়াইয়ের উপর—বিপ্লবের উপর। ভাগবত-জীবনকে পাকড়াও করতে হ'লে মানুষের চল্‌তে হয় অশান্তি চাখ্‌তে চাখ্‌তে—টক্করের পর টক্কর চালিয়ে—দুনিয়াখানাকে জুতোতে-জুতোতে। যে-লোকটা বিপ্লবকে চিরসাথী করে না, সে-লোকটা দেখে না কখনও ভাগবত-জীবনের মুখ। "নমো বিপ্লবায়",—"অথাতো বিপ্লব-জিজ্ঞাসা",—এই হ'লো অরবিন্দ-দর্শনের গৌরচন্দ্রিকা। দ্বন্দ্বের পর দ্বন্দ্ব, তারপর আরও দ্বন্দ্ব, আবার মহাদ্বন্দ্ব, মহত্তর দ্বন্দ্ব—এই হ'লো অরবিন্দ-প্রচারিত ভাগবত-জীবনের সিঁড়ি, বিবর্তন, অভিব্যক্তি বা ক্রম-বিকাশের স্তরবিন্যাস। অরবিন্দ পালোআন, লড়াই-প্রেমিক, বিপ্লবের তর্কশাস্ত্রী।

এই হিসাবে অরবিন্দ পাশ্চাত্য মুনিঋষিদের সন্তান ও বংশধর। তবে অরবিন্দ'র মারফৎ হেগেল-ব্যর্গ্সঁর চিন্তা-সম্পদে গিয়ে প'ড়েছে উপনিষদ-বেদান্ত-যোগের দস্তুল। ফলতঃ ইয়োরামেরিকার দর্শন বাঙালীর বাচ্চার দৌলতে বাড়্‌তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। "ভাগবত-জীবন" সম্বন্ধে এ-ও আর একটা মস্ত কথা।

"ভাগবত-জীবন"

লেখক—"লাইফ্ ডিভাইন" সম্বন্ধে আজকালকার বাজারে যেসব মতামত শুন্‌তে পাই, আপনার ব্যাখ্যায় তার সঙ্গে কোনো মিল আছে কি? বোধ হয় নেই?

সরকার—বাজারের খবর আমি রাখি না। কি কর্‌বো, ভায়া? মিল আছে কিনা সন্দেহ। অমিল হবারই কথা। লোকের পছন্দ-সই মত আমরা এ হাড়ে কোনোদিন বেরিয়েছে কি না জানি না। লোক-প্রিয় কথা আমি বলি না। অনেকবারই বলেছি, এ জন্য আমাকে লোকেরা জানে গরু ব'লে। আমার মতামত আমি কাউকে মেনে নিতে বল্‌ছি না। আমি পাপিষ্ঠ। আমার চোখে "ভাগবত-জীবন"-বইটার ভেতর ভগবান, পরমেশ্বর দেবদেবী, পরকাল, স্বর্গ ইত্যাদি

চিজ এখন পর্যন্ত ধরা পড়েনি। বোধ হয়, লোকজনের ধারণা এই যে, অরবিন্দ কোনো এক 'ব্যূঢ়োরস্ক', 'বৃষস্কন্ধ', 'শালপ্রাংশু', 'মহাভুজ' দেবাদিদেব মহেশ্বরের কল্পনা ক'রেছেন। আর বোধ হয় তাঁর ধ্যানলব্ধ ভাগবত জগতে হাত-পা-শূন্য, নয়া-রঙের, নয়া-ঢংয়ের, নয়া-গড়নের, কিম্ভুৎকিমাকার অতি-মানব, দৈব-মানব বা ঐশ্বরিক শক্তি-ওয়ালা পুরুষ-নারীর "দিন আগত ঐ"। ঠিক যেন কোটি-কোটি "সোনার কার্তিক" আর কোটি-কোটি "ডানাকাটা পরী" বা ঐ ধরণের নরনারী দুনিয়ার দেশে-দেশে প্রায় দাঁড়িয়ে গেলো-গেলো আর কি! অধিকন্তু সড়কের মোড় ফির্‌লেই যেন ভাগবত-জগতের লোকেরা হাতে-হাতে পেয়ারার মত বিশ্বশান্তি চিবুতে আরম্ভ কর্‌বে!

লেখক—এই বইয়ের ভেতর অরবিন্দ'র বাণী আপনি কিরূপ পেয়েছেন?

সরকার—ভায়া, আমার চোখ চামড়ায় তৈরী। আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, অরবিন্দ'র "ভাগবত-জীবন"টা তেমন-কিছু বুজরুকিপূর্ণ হেঁয়ালিময় মাল নয়। অরবিন্দ'র মগজ পুরাদস্তুর বস্তুনিষ্ঠ, কট্টর সংগ্রামনিষ্ঠ। পরকালের চর্চা আর স্বর্গের স্বপ্ন বা নেশা অরবিন্দকে মাত্ কর্‌তে পারেনি। তোর মতন, আমার মতন, রামা-শ্যামার মতন, আব্দুল-ইসমাইলের মতন আট-পৌরে লোকজনের চিত্ত নিয়ে অরবিন্দ-দর্শনের কারবার। এই সকল মামুলি চিত্তই সিঁড়ির মতন ধাপে-ধাপে বিকাশ লাভ কর্‌ছে। সেই সকল বিকাশেরই কোনো এক কোঠে দেখা যায় ভাগবত-চিত্ত। ভাগবত-চিত্তটা রক্তমাংসের মানুষরই চিত্ত ছাড়া আর কিছু নয়। অরবিন্দ পাকা ইহনিষ্ঠ, সংসারনিষ্ঠ, মানুষনিষ্ঠ দার্শনিক। জগতের স্ত্রীপুরুষগুলা ইহলোকেই,—রক্তমাংসের শরীর নিয়েই, ভাগবত-চিত্তের অধিকারী হচ্ছে অর্থাৎ ভগবান হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। এই হ'ল "লাইফ ডিভাইন" বইয়ের নির্গলিতার্থ।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, অরবিন্দ একমাত্র চিত্তের ক্রমবিকাশ বিশ্লেষণ ক'রেছেন? শরীরের কোনো বিকাশের ধারা বইটার ভেতর নেই?

সরকার—ঠিক তাই। ধাপে-ধাপে মানুষের মনটা, চেতনাটা, চিত্তটা বিবর্তিত হচ্ছে, বিকশিত হচ্ছে, অভিব্যক্ত হচ্ছে। চিত্তের বিপ্লবেই মানুষের শরীরটাকে ভাগবত-জীবন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। অরবিন্দ'র উন্নতি-তত্ত্ব চিত্ত-বিপ্লবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

লেখক—চিত্ত-বিপ্লব কী?

সরকার—চিত্ত-বিপ্লব চিজ্‌টা বুঝা হয় তো কঠিন নয়। কিন্তু একটা মস্ত-বড় প্রশ্ন আস্‌ছে। এই বিপ্লবের চাবীটা কী বা কোথায়? চিত্ত-বিপ্লবটা ঘটাচ্ছে কে বা ঘট্‌ছে কেন? আগেই বলেছি, অরবিন্দ বিবর্তন, ক্রমবিকাশ, অভিব্যক্তি আর বিপ্লবের প্রণালীটাকে দ্বন্দ্বের ভেতর, টক্করের ভেতর, লড়াইয়ের ভেতর পাকড়াও কর্‌তে অভ্যস্ত। এই দ্বন্দ্ব বুঝ্‌তে হবে উঁচুতে-নীচুতে দ্বন্দ্ব—বড়'য় ছোট'য় দ্বন্দ্ব। কিন্তু মুস্কিল,—উঁচু কোন্‌টা? বড় কোন্‌টা? কে ব'লে দিচ্ছে উঁচু কী? কে বুঝিয়ে দেয় বড় কী? কার তাড়নায় ঘট্‌ছে বিপ্লব? কে লাগাচ্ছে ঘা, আর সুরু হচ্ছে ক্রমবিকাশ? এই সব সমস্যায় আসে ব্যর্গসঁর 'ইনটুয়িশন'—অন্তর্দৃষ্টি—প্রাচীন ভারতীয় যোগ-ধ্যান, সূক্ষ্ম অনুভূতি, "বোধি" ইত্যাদি। জার্মাণ দার্শনিক কান্ট-প্রচারিত অতীন্দ্রিয় দুনিয়া, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি অনেকটা এই সবের জুড়িদার অরবিন্দ'র দ্বন্দ্ব-নীতিতে, উন্নতি-দর্শনে, চিত্ত-বিপ্লবের ন্যায়শাস্ত্রে ও চিত্তবিকাশের তর্ক-বিজ্ঞানে এই ধরণের অতীন্দ্রিয়তা, অন্তর্দৃষ্টি, যোগনিষ্ঠা, বোধি, অনুভূতি বা ধ্যানলব্ধ জ্ঞান কিল্‌বিল্ কর্‌ছে। অরবিন্দ-দর্শনের ভেতর যদি কোনো রহস্য বা গুহ্য তত্ত্ব থাকে—ভবে তা কান্টের অতীন্দ্রিয়ামি, ব্যর্গসঁ'র 'ইনটুয়িশন', ভারতীয় বোধি ইত্যাদি শ্রেণীর রহস্য।

কাণ্ট ও অরবিন্দ

লেখক—রহস্য কাকে বলে?

সরকার—যাতে যুক্তির খেলা নেই, অথবা কম। অতীন্দ্রিয়, অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতি, বোধি ইত্যাদি শ্রেণীর চেতনায় বা জ্ঞানে যুক্তির সঙ্গে অসহযোগ,—যুক্তি থেকে ছুটি। অসহযোগ,—যুক্তি থেকে ছুটি। অসহযোগ আর ছুটি ষোল আনা বুঝ্‌বার দরকার নাই। যুক্তিকে কলা দেখিয়ে কাণ্ট-দর্শনের একটা মস্ত অংশের আবির্ভাব। কাণ্ট-মুনির (১৭২৪-১৮০৪) বাণী প্রথমেই স্বীকার ক'রে নেয় দুই দুনিয়া,—একটা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দুনিয়া আর একটা অতীন্দ্রিয় দুনিয়া। কাণ্ট-বাণীর অন্যতম স্বীকার্য্য,—কর্তব্য-পালনে অতীন্দ্রিয়ের আজ্ঞা। মানুষ কর্তব্য করে কার ঘা খেয়ে? কোন্ শক্তির তাড়নায়? কান্টের মতে যুক্তির তাড়নায় নয়,—অনুভূতির তাড়নায়—অতীন্দ্রিয়ের হুকুমে—লাভ-লোকসানের খতিয়ান না ক'রে। "কাটে-গোরিশেস্ ইম্পেরাটিফে"র পশ্চাতে বিচার নেই—তর্ক নেই—যুক্তি নেই। কাণ্টঋষি-প্রচারিত অতীন্দ্রিয়ের হুকুম গীতা প্রবর্তিত "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"-মন্তরের মাসতুতো ভাই। ফলাফল-নিরপেক্ষ নিষ্কামকর্ম্মটা বোধি, অনুভূতি বা অন্তর্দৃষ্টির উপর ভর ক'রে চলে। দ্বন্দ্বমূলক চিত্তবিপ্লব, লড়াইশীল চিত্তবিকাশ, বিপ্লবধারায় ভাগবত-জীবনের আবির্ভাব ইত্যাদি ঘটনা যুক্তিনিষ্ঠ নয়— এসব হচ্ছে বোধির, অতীন্দ্রিয়ের, অনুভূতির, অন্তর্দৃষ্টির লীলা।

লেখক—বোধি, রহস্য, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

সরকার—প্রথমেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

কাণ্ট ও ব্যর্গ্‌সঁ'র যেখানে ফাঁক, অসম্পূর্ণতা বা দুর্ব্বলতা—অরবিন্দ-দর্শনের ফাঁক, অসম্পূর্ণতা ও দুর্ব্বলতা ঠিক সেখানে। বোধি সম্বন্ধেও এই আমার ধারণা। তিন দর্শনই চায় যুক্তির কাছ থেকে ছুটি নিতে,—খুব মস্তবড় একটা সমস্যা-মীমাংসার বেলায়। তবে ছুটিটা বোধ হয় নেহাৎ পুরাপুরি ছুটি নয়। হাজার হ'লেও মানুষ ত! যুক্তি কিছু-না-কিছু থেকেই যায়।

ভায়া, আমি আনাড়ি লোক। আমি বলি বোধি, অতীন্দ্রিয়, অন্তর্দৃষ্টি, অনুভূতি ইত্যাদি চিজের ইজ্জৎ বাড়্‌তে থাকুক। আপত্তি নেই। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলুক যুক্তির ইজ্জৎ-—যুক্তি-নিষ্ঠর ইজ্জৎ—যুক্তিযোগের ইজ্জৎ।

লেখক—আপনি এতক্ষণ ধ'রে "লাইফ ডিভাইন' আর অরবিন্দ দর্শনের কথা যা বল্‌লেন, আমি দেখ্‌ছি অভেদানন্দের 'স্পিরিচুয়্যাল আন্‌ফোল্ডমেন্ট' (আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ ১৯০২) বইয়ের মোটের উপর সে-ধরণের কথাই আছে।

সরকার—শুধু অভেদানন্দ বা বিবেকানন্দ কেন, যাঁরাই প্রাচীন হিন্দুজাতির যোগদর্শন নিয়ে চর্চা করেন, তাঁদের সকলকেই এই উপলক্ষ্যে মনে আনা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের সুপরিচিত যোগদর্শনে আর অরবিন্দ-দর্শনে সোজাসুজি বীজগণিত-প্রসিদ্ধ সাম্য-সম্বন্ধ (ইকুয়েশ্যন্) টানা ঠিক হবে না। আগেই অরবিন্দ'র পাশ্চাত্য দঙলের কথা ব'লেছি। একমাত্র প্রাচ্যের জোরে "ভাগবত-জীবন" দেখা দেয়নি। প্রাচ্য-দর্শনকে গুণ কর্‌তে হবে পাশ্চাত্য দর্শনের মাল দিয়ে। তবে বোঝা যাবে এ-বইয়ের ভেতরকার কথা।

দার্শনিক "সাম্য-সম্বন্ধ"

লেখক—দার্শনিক বিশ্লেষণে ইকুয়েশ্যন বা সাম্য-সম্বন্ধ আবার কী?

সরকার—ব্যক্তিত্ব, সংস্কৃতি, কর্মকাণ্ড, চিন্তাপ্রণালী, আন্দোলন, বিপ্লব ইত্যাদি সম্বন্ধে ইকুয়েশ্যন টানাব বাতিক আমার আছে। অরবিন্দ-দর্শন সম্বন্ধে চালাতে চাই নিম্নের সাম্য-সম্বন্ধ ঃ—

"ভাগবত-জীবন"=হিন্দুদর্শন (উপনিষদ-বেদান্ত-যোগ)×পাশ্চাত্য দর্শন (কান্ট-হেগেল-ব্যর্গসঁ)।

এই ধরণের সাম্য-সম্বন্ধ অন্যান্য ক্ষেত্রেও আমি ঝেড়েছি। বঙ্কিমকে জরিপ কর্‌বার জন্যে আমি কায়েম করি নিম্নরূপ ইকুয়েশ্যন ঃ—

"ধর্মতত্ত্ব" (কৃষ্ণ-চরিত্র")=গীতা×কঁৎ (ফরাসী দার্শনিক)।

লেখক—আচ্ছা, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আপনার কোনো ইকুয়েশ্যন আছে?

সরকার—আছে বৈকি! নিম্নের সাম্য-সম্বন্ধে জরিপ করা আছে বিবেকানন্দকে ঃ—

"বর্তমান ভারত" ("প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", "দরিদ্র-নারায়ণ"-তত্ত্ব ইত্যাদি)= হিন্দুদর্শন×পাশ্চাত্যদর্শন (ফিখ্‌টে-কার্লাইল-কঁৎ)।

লেখক—এই সাম্য-সম্বন্ধগুলা কি কড়ায়-ক্রান্তিতে স্বীকার ক'রে থাকেন?

সরকার—রাধামাধব! সবই ঠারে-ঠোরে বুঝ্‌বার কায়দা বা সঙ্কেতমাত্র।

বলা বাহুল্য অরবিন্দ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ—এঁদের দর্শনে দেশী-বিদেশী মাল ছাড়া আছে নিজ ব্যক্তিত্বের ছাপ। দুই তরফকে গুণ করবার মর্জি ও মুরোদ আসে সেই নিজস্ব থেকে। সর্বত্রই সেই নিজস্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রভাব,—বুঝে রাখতে হবে উহ্য। ব্যক্তিত্বই প্রত্যেক লোককে জোগায় আধ্যাত্মিক যন্ত্রপাতি ও জীবন-বেদের কর্মকৌশল। আমার "গরুমি" আর কত চালাবো? এখানে দাঁড়ি টানি।

লেখক—তবুও একটা কথা জান্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। "ভাগবত-জীবনের" সঙ্গে স্বদেশী যুগের বিপ্লব-প্রবর্তক অরবিন্দ'র যোগাযোগ কিরূপ?

সরকার—যোগাযোগ বেশ গভীর। বইয়ের আকারে "ভাগবত-জীবন" বেরিয়েছে ১৯৪০-৪১ সনে। লোকেরা মনে কর্‌ছে রচনাটা এ-যুগের। আসল কথা,—বইয়ের অধিকাংশ অধ্যায় প্রবন্ধের আকারে বেরিয়েছিল ১৯১৪-১৬ সনে। তখন চল্‌ছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্র। অরবিন্দ তখন রাষ্ট্রিক হিসাবে একপ্রকার "ফেরার"। রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি যোগ ছিল ১৯০৫-১০ সনে। কাজেই প্রবন্ধগুলা তাঁর বিপ্লব-যুগেরই প্রায় সমসাময়িক। বোমা-শিল্পী বা বোমা-দার্শনিক অরবিন্দ'র আত্মারই "ভাগবত-জীবন" বেশ-কিছুকাল ঘর ক'রেছিল বলা যেতে পাবে। যারা অরবিন্দকে ১৯০৫-১০-এর যুগে জান্‌ত তারা তাঁকে যোগ-নিষ্ঠ ব'লেই জান্‌ত। "রাজা" সুবোধ মল্লিক, বিপিন পাল, হীরেন দত্ত ইত্যাদি বন্ধুবর্গের এসব কথা বেশ জানা ছিল। ভারতীয় দর্শনে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও সকলেই ওয়াকিব্‌হাল ছিল। আর তাঁর পাশ্চাত্য—বিশেষতঃ গ্রীক ও ফরাসী—দর্শনে দখল সম্বন্ধেও ডন সোসাইটির "সতীশ মণ্ডল" আর জাতীয় শিক্ষাপরিষদের আমরা সকলেই অভিজ্ঞ ছিলাম। বিপ্লবী অরবিন্দ আর যোগী অরবিন্দ ("ভাগবত-জীবন"-লেখক) আত্মিক হিসাবে এক-বয়েসি।

("অরবিন্দ ও বিপিন পাল", ৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সৌন্দর্য-তত্ত্ব ও সমালোচনা-দর্শন

১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২

লেখক—সাহিত্য-সমালোচনা, রস-বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয়ক দর্শনের অন্তর্গত কোনো রচনা আপনার আছে? (পৃষ্ঠা ২২-২৩, ২৮, ৩০ দ্রষ্টব্য)

সরকার—কতকগুলা রচনা এখনো অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী-সম্পাদিত ইংরেজী "রূপম্" (কলিকাতা ১৯২২-২৬) ইত্যাদি পত্রিকার প্রবন্ধ-স্বরূপ র'য়েছে। কোনো-কোনোটা বইয়ের আকারে পাওয়া যায় স্বদেশী যুগে বেরিয়েছিল "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" (১৯১৩-১৪)। ১৯১৬ সনে জাপান-প্রবাসের সময় তোকিওয় প্রকাশিত হয় "ল্যভ ইন হিন্দু লিট্‌রেচার" (হিন্দু সাহিত্যে প্রেমের কথা) নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হয় "হিন্দু আর্ট ইট্‌স্ হিউম্যানিজ্‌ম্ অ্যান্ড মডার্ণিজ্‌ম্" (হিন্দু শিল্প-কলায় মানব-নিষ্ঠা ও আধুনিকতা, ১৯২০)। এই লেখাটার নাম ভারতে কেহ জানে কি না সন্দেহ। প্যারিসে থাক্‌বার সময় ক'ল্‌কাতায় বেরোয় "এস্‌থেটিস্ অব ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের সৌন্দর্যতত্ত্ব, ১৯২২)।

লেখক—জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে, এই সকল বইয়ে আপনি সার্বজনিক মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্‌বার কোনো সুযোগ পেয়েছেন?

সরকার—বিনা প্রতিবাদে কি কলম এই অধমের হাতে আসে? শুধু কি প্রতিবাদ? প্রতিবাদের জন্য মার খেয়েছি ও কি কম?

লেখক—রস-সমালোচনায় মার খাবার কী আছে?

সবকার—রবীন্দ্র-সাহিত্যের কথা বলি। লোকেরা ব'লেছিল রবিকে নাকি আমি "অতি-প্রশংসা" ক'রেছি। তখনকার দিনে এমন লোকও ছিল যারা রবির নামে নাক সিঁটকাতো আর বল্‌তো "রবি আবার কবি?"

লেখক—কী আশ্চর্য্য? কেন? কাকে তারা কবি বিবেচনা কর্‌ত? রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি তখন কে ছিল?

সরকার—ভায়া, আমি ত বাংলা সাহিত্যে আনাড়ি। আমার চিন্তায় ছিল "কবি ত কবি, রবি-কবি।" কিন্তু তখন কোনো-কোনো মহলে দ্বিজেন্দ্রলালের মক্কেল ছিল অনেক। তা ছাড়া সেকালের হেম-নবীন ইত্যাদি পসারও অনেকের উপর প্রভাব বিস্তার কর্‌ত। অধিকন্তু কোনো কোনো পণ্ডিতের মাথায় একটা বিচিত্র খেয়াল চেপেছিল। তাঁরা ভাবতেন যে, আধুনিক সভ্যতার যুগে কাব্য রচনা আর সম্ভব নয়। যাচ্চ'লে! কাব্য-সৃষ্টির যা-কিছু সবই একালের পূর্বে খতম হয়ে গেছে। কাজেই রবীন্দ্র-কাব্য কাব্যই নয়। অধিকন্তু স্বদেশী আন্দোলনের রাষ্ট্রিক শাখার কোনো-কোনো দল এই সময়ে (১৯১১-১৪) রবির উপর আবার খাপ্পা ছিল।

আমি গরীব মানুষ। দলে ভিড়ে আমার লাভ কী? আমি একই সঙ্গে হেম-নবীন পূজাও করেছি, রবি-পূজাও ক'রেছি, আর দ্বিজু-কবির বাড়ীতে গিয়ে বিজয় মজুমদারের সঙ্গে তাঁকে নাচ্‌তে গাইতেও দেখেছি। দ্বিজেন্দ্র-পূজায় আমি কারু নীচে ছিলাম না। চিরকালই আমি বহুত্ব-নিষ্ঠ।

লেখক—আপনি এই আবহাওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোন্ মত প্রচার করেছিলেন?

সরকার—অনেক কথা। একটা শুধু বল্‌ছি। আমি ব'লেছিলাম, "রবি ইতিমধ্যেই কালিদাসের সমান। আর ভারতবর্ষ যদি কোনো দিন রাষ্ট্রিক হিসাবে স্বাধীন হয় তাহ'লে

তিনি কালিদাসের চেয়েও বড় ইজ্জৎ পেতে বাধ্য।" ইত্যাদি। এই সুর আমি তখন হ'তে আজ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর ধ'রে বজায় রেখেছি। গত বৎসর তাঁর মৃত্যুর দিনই আমি লম্বা গলায় পুরাণা সুরের চেয়েও চড়া সুরে বুখ্নি ঝেড়েছি নিম্নরূপ ঃ—"টেগোর দি গ্রেটেস্ট্ ইন্ডিয়ান্ অব হিস্‌ট্রি" (রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতসন্তান)। বাঙালী সমাজে, সমগ্র ভারতে আর দুনিয়ায় রবির দাম এই ত্রিশ বছরে বেড়েছে না কমেছে? কী মনে হয় তোদের? "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী"-বইয়ের কথাগুলা "অতি-প্রশংসা" বল্‌তে হয়তো অনেকেই আর সাহসী হবে না। মার খাওয়াটা মন্দ নয়। যে মারে তারই হাত ব্যথা করে। যে মার খায় তার ঘাড়টা খাড়া থাক্‌লেই হ'ল।

লেখক—অন্যান্য বইয়ের ভেতর কিরূপ প্রতিবাদ আছে?

সরকার —সার্বজনিক দর্শনে প্রেম হচ্ছে পুরামাত্রায় আধ্যাত্মিক চিজ। আমি পাষণ্ড। ব'লে ফেলেছিলাম,—"প্রেম বস্তুটা গোড়ায় জানোআর-মাত্রের যৌন জীবন।" আর যাবে কোথায়? জুতা পড়্‌ল ঘাড়ে। তখন অবশ্য আমি বিদেশে। জুতা মারার আওয়াজটা শুন্‌তে পেতাম কিঞ্চিৎ-কিছু জাপান-আমেরিকা হ'তে। আজকালকার আবহাওয়ায় ফ্রয়েডের গণ্ডূষ ক'রে সকলেই ধর্ম-অর্থ-মোক্ষের আলোচনা সুরু করে। তারা আর ১৯১৬ সনের জুতাটা এই অধমের ঘাড়ে লাগতে ঝুঁকে না। হিন্দু সাহিত্যের প্রেম-তত্ত্বটা একালে আর অতি আধ্যাত্মিক বিবেচিত হয় না। দেশের লোকগুলা "মানুষ" হয়েছে। তবে ফ্রয়েডের অদ্বৈতে মজ্‌লে আর একটা বিপদ।

লেখক—নিউ ইয়র্কে প্রকাশিত হিন্দু শিল্প বিষয়ক বইটার প্রধান কথা কী?

সরকার—সেকালের ভারতীয় সুকুমার শিল্প (চিত্র ও ভাস্কর্য) মানুষ-নিষ্ঠ চিজ। অতি-মানুষ, অ-মানুষ বা বে-মানুষ সেই শিল্প-কলার প্রাণের রসদ ও রস জোগায় নি। একেই বলেছি হিউম্যানিজ্‌ম্ (মানব-নিষ্ঠা)। তা ছাড়া আর এক কথা আছে। একালে ইয়োরামেরিকায় চিত্রশিল্পী ও স্থপতিরা মূর্তি গড়্‌বার সময় সংসারে সুপরিচিত নরনারী আর গাছ্-গাছ্‌ড়ার হুবহু নকল তৈয়ারি করে না। তাদের সৃষ্টিগুলা নিজস্বে ভরপুর। প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-কলায়ও শিল্পীদের নিজস্ব অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব বেশ-পরিস্ফুট। এই জন্য প্রকৃতির মাপজোকে সে শিল্প নিয়ন্ত্রিত হতো না। নিয়ন্ত্রিত হতো শিল্পীদের চোখ-মাফিক গড়নের কায়দায়। এই দুই তরফ থেকে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলাকে আমি ভারতের একচেটিয়া বা বিশেষত্ব রূপে দাঁড় করাই নি। ব'লেছি,—প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-প্রেরণাটা বিশ্বজনীন, কর্মকৌশলটা বিশ্বজনীন আর রসটা ও বিশ্বজনীন বটেই।

একালে অতুল গুপ্ত-প্রণীত "কাব্য-জিজ্ঞাসা" বেরিয়েছে (১৯২৯, ১৯৪১)। বইটাতে প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার-শাস্ত্র বা রস-দর্শন খুলে দেখানো হয়েছে। গ্রন্থকারের বিশ্লেষণে সেকেলে হিন্দু রস-দার্শনিকদের বিশ্বজনীনতা আর মানব-নিষ্ঠা উজ্জ্বল মূর্তিতে দেখা দিয়েছে।

লেখক—যুবক ভারতের সৌন্দর্য-তত্ত্ব বিষয়ক বইটার ভিতর বিরোধ-মূলক জিনিষ কিরূপ?

সরকার—১৯০৫-২০ সনের ভারত-প্রচলিত সার্বজনিক শিল্প-দর্শন ছিল এককথায় নিম্নরূপ ঃ—শিল্পের প্রেরণা ও লক্ষ্য ভারতে একরূপ আর ইয়োরোপে অন্যরূপ।" তার বিরুদ্ধে আমার বাণী হ'ল ঃ—"শিল্পীরা ছবি আঁকে, গান গায়, মূর্তি গড়ে,—হিন্দু হিসাবে নয়, খৃষ্টিয়ান হিসাবে নয়, এশিয়ান হিসাবে নয়, মুসলমান হিসাবে নয়, পশ্চিমা হিসাবে

নয়—মানুষ হিসাবে। শিল্প-জগৎ মানুষের সৃষ্ট জগৎ। এটা প্রাকৃতিক জগৎ হ'তে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন জগৎ। ছবিগুলা, মূর্তিগুলা, সুরগুলা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও আওয়াজসমূহের নকলমাত্র নয়। এই সব হচ্ছে মানুষের সৃষ্টি-শক্তির বিলাস। এই সৃষ্টি-কার্যে পূরবী-পশ্চিমা প্রভেদ নাই। আছে স্রষ্টার সৃষ্টি-ক্ষমতার উনিশ-বিশ, ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ ইত্যাদি বিষয়কে প্রভেদ।" শিল্প-স্বরাজ হ'ল আমার প্রাণের কথা।

লেখক—এই মতের স্বপক্ষে-বিপক্ষে আজকাল কী দেখতে পাচ্ছেন?

সরকার—সে কথা ত তোরই বলা উচিত রে! আমি দেখ্‌ছি যে, যারা ছবি আঁকে, আর মূর্তি গড়ে তারা আর পুরাণা বুলি কপ্‌চায় না। রূপ-দক্ষেরা সৃষ্টিশক্তির স্বরাজ সম্বন্ধে আস্থাশীল। আর যারা শিল্প-সমালোচক তাদের ভেতরও বেশ বড়-গোছের ভাঙন লেগেছে। অনেকেই এই অধমের বিদ্রোহকে ভারতে শিল্প-স্বাধীনতার সূত্রপাত সম্ঝে থাকে। শিল্প-স্বরাজের সুর আজকালকার সমালোচকদের লেখায় কিছু-কিছু মালুম হয়। দেখাই যাচ্ছে,—আহাম্মুক আর মুখ্‌খু ব'লে গাল খাওয়াটা তত-বেশী মারাত্মক-কিছু নয়।

হুমায়ুন কবিরের "পোয়েট্রি, মনাড্‌স্‌ অ্যাণ্ড সোসাইটি" (১৯৪১) নামক ইংরেজি বইয়ে বিদেশী রস-সমালোচকদের প্রচারিত শিল্প-স্বরাজ খুব জোরের সহিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একালের ভারতীয় সৌন্দর্য-দার্শনিকেরা "এস্‌থেটিস্‌ অব ইয়ং ইণ্ডিয়া"-বইটাকে আর বেশীদিন বোধ হয় বয়কট করবে না।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা

লেখক—রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর দুএক দিন পর (১০ই আগষ্ট, ১৯৪১) আপনি একটা রচনায় রবীন্দ্রনাথকে "গ্রেটেস্‌ট্‌ ইণ্ডিয়ান অব হিস্‌ট্রি" (ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভারত-সন্তান) বলেছেন। এর মানে কী?

সরকার- -মানেটা বুঝ্‌তে গোল বাঁধ্‌ছে কেন? অতি সোজা কথা। নামজাদা লোক ভারতের পাঁচ হাজারে বছরে পাই শ'য়ে-শ'য়ে। তা. .ের সবার সেরা একালের বাঙালীর বাচ্চা, রবি। ব'লেছি শুধু এই মাত্র।

লেখক—এত উঁচু ঠাঁই রবীন্দ্রনাথকে দিচ্ছেন?

সরকার—একটু বাদ-বিচার আছে। দুই শ্রেণীর ভারতসন্তানকে আমার জরিপ থেকে বাদ দিয়েছি।

লেখক—এই দুই শ্রেণীতে কার-কার নাম আছে?

সরকার—এক শ্রেণীতে পড়ে সেনাপতি, রাজা, বাদশা ইত্যাদি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, আকবর শিবাজি এই তিন জনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় আলোচনা করি না।

লেখক—অপর শ্রেণী কিরূপ?

সরকার—সে-সকল ভারতসন্তানকে লোকেরা একদম অবতার, দেবতা, ভগবান্‌ ইত্যাদি রূপে পূজা করে সেই-সকল ভারতসন্তানকে এই শ্রেণীর ভিতর ফেলেছি। এই হিসাবে সর্ববিখ্যাত শাক্যসিংহ বুদ্ধ। এই দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্যান্য সকল শ্রেণীর মস্তিষ্কজীবী ভারত-সন্তানের চেয়ে রবীন্দ্রনাথ বড়। এই আমার মত।

লেখক—আপনি রবীন্দ্রনাথের কোনো ত্রুটি বা দোষ দেখ্‌তে পান না?

সরকার—দোষত্রুটিহীন মানুষ থাক্‌তেই পারে না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতর ও সৃষ্টিশক্তির অসম্পূর্ণতা ও দুর্বলতা নজরে পড়েছে বৈকি। তা সত্ত্বেও আমার কষ্টিপাথরে রবির দর দাঁড়ায় ঐরূপ।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা আপনি কি পেয়েছেন?

সরকার—রবীন্দ্র-সাহিত্যে গরীবের ব্যক্তিত্ব বেশী ফুটে' উঠেনি। গরীবের জীবন, গরীবের সুখ-দুঃখ, গরীবে আবহাওয়া, গরীবের দুনিয়া এই সব চিজ রবীন্দ্র-সৃষ্টির ভেতর অতি অল্প ঠাঁই পেয়েছে। দেশ-বিদেশের গরীব পাঠকেরা ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে নিজেদের সাহিত্য সম্‌ঝিতে পার্‌বে না। তাদের বিচারে এসব মাল অ-গরীবদের মন-প্রাণে ভরা বিবেচিত হবে।

লেখক—আর কোনো দুর্বলতা দেখ্‌তে পান?

সরকার—এই ধরণেরই আর এক দুর্বলতা হচ্ছে নিম্ন শ্রেণীর নরনারীদের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সজাগ বিশ্লেষণের অভাব। সহানুভূতির অভাব হয়ত দেখা যায় না। কিন্তু এই সকল শ্রেণীর আবহাওয়া রবীন্দ্র-সৃষ্টির ভেতর মালুম হয় কম।

লেখক—এই দুই অসম্পূর্ণতা ছাড়া আর কোনো বিষয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ত্রুটি দেখেছেন?

সরকার—মুসলমান নরনারীর ব্যক্তিত্বও রবীন্দ্র-গদ্যে আর রবীন্দ্র-কাব্যে যাবপরনাই কম আলোচিত হয়েছে। ইহা আমার বিচারে একটা বড় দুর্বলতা। মুসলমান পাঠকেরা ভবিষ্যতে রবীন্দ্র-সাহিত্যকে হয়ত খানিকটা কম আদর কর্‌তে পারে।

লেখক—কেন? মুসলমান-বিরোধী কোনো কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যে আছে কি?

সরকার—তা বল্‌ছি না। পাঠকমাত্রের একটা দুর্বলতা আছে। সকলেই নিজ-পরিচিত পল্লী, দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সম্পর্কিত ব্যক্তি ও অবস্থার বিশ্লেষণকে দেখ্‌তে চায়। গরীবরা চায় গরীব জীবনের বৃত্তান্ত-বিশ্লেষণ। পারিয়ারা চায় পারিয়া-জীবনের কথামালা। বাঙালীরা চায় বঙ্গজীবনের বৃত্তান্ত। ফরাসীরা চায় ফ্রান্স-আলোচনা। ইংরেজরা চায় ইংরেজ সমাজের বিবরণ। ঠিক এই ধরণেই মুসলমানেরাও চায় দু-চার-দশ-বিশটা মুসলমান ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের বিশ্লেষণ বা সমালোচনা। মুসলমান কথাবস্তু সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্য কিছু দরিদ্র। এই দোষের জন্য রবীন্দ্র-সাহিত্যকে ভবিষ্যতে ভুগ্‌তে হবে। এই জন্য আমি দুঃখিত।

লেখক—আপনি যে-সকল দোষ, দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতার কথা বল্‌ছেন তাতে শিল্প হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য খাটো হয় কতটা?

সরকার—শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে রবীন্দ্র-কাব্য ও রবীন্দ্র-গদ্য এই সকল দোষের জন্য এক দামড়িও দামে নেমে যাবে না। তবে পাঠকমাত্রের দুর্বলতা জবরদস্ত। তারা চায় সাহিত্যে নিজ সংসার, নিজ সমাজ। মানুষ হাড়ে-হাড়ে বস্তুনিষ্ঠ। কী করা যাবে?

লেখক—শিল্প-সৃষ্টি কাকে বলে?

সরকার—প্রথমতঃ গল্প বা ঘটনাবলী খাড়া করা। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলা ব্যক্তি দাঁড় করানো। তৃতীয়তঃ গল্পের ভেতর অবস্থা সৃষ্টি করা। এই তিন রকমের চিজ্ যে কবি সৃষ্টি কর্‌তে পারে না সে উঁচু দরের কবি বিবেচিত হয় না।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতর আপনি তা হ'লে উচ্চতম উৎকর্ষ পাচ্ছেন কোথায়?

সরকার—মাত্র দুটা-একটা উৎকর্ষের কথা বল্‌ব। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতর সনাতন মাল আর বিশ্বজনীন মাল আছে বিস্তর। রবীন্দ্র-সৃষ্টির প্রথম কথা ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য।

স্বাধীনতার গান ও গল্প রবীন্দ্র-সৃষ্টির বিশেষত্ব। এই সৃষ্টির ভেতর বন্ধন হ'তে মুক্তির আকাঙক্ষা অতি উজ্জ্বল মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। এই সকল গানে ও গল্পে পৃথিবীর যে-কোনো জাত্ চাঙ্গা হয়ে উঠবে। যে-কোনো ধর্মের লোক এই রৈবিক স্বাধীনতাই কামনা করে। এই মুক্তির দর্শন হ'তে যে-কোনো আয়ের লোক সকল যুগেই নতুন-নতুন প্রেরণা পেতে বাধ্য। মুক্তির আকাঙক্ষায় ও দর্শনে রবীন্দ্র কাব্য আর রবীন্দ্র-গদ্য দুইই সার্বজনীন ও সনাতন সম্পদ। স্বাধীনতা বিষয়ক ঘটনা ব্যক্তি ও অবস্থার স্রষ্টা হিসাবে রবি অমর। ("নজরুল ও অন্নদাশঙ্করের পরবর্তী ধাপ", ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)।

লেখক—এই দরের আর কোনো উৎকর্ষ রবীন্দ্র-সৃষ্টির ভেতর পাওয়া যায়?

সরকার—আর একটার কথা বল্‌ব। সে হচ্ছে ভগবান সম্বন্ধে রবীন্দ্র-কল্পনা। মানুষের সঙ্গে ভগবানের যোগাযোগ রবীন্দ্র-সাহিত্যে যারপরনাই ব্যক্তিনিষ্ঠ ভাবে কল্পিত হয়েছে। পৃথিবীর যে-কোনো জাতের লোক, যে-কোনো ধর্মের লোক, যে-কোনো দলের লোক এইরূপ ভগবান্ পেয়ে নিজেকে শক্তিমান সম্‌ঝিতে সমর্থ। রাবীন্দ্রিক ভগবৎ-সাহিত্যের মুদ্দাটা দেখ্‌বি? "প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামি দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে",—এই গানটা শুনেছিস্ বোধ হয়? রাবীন্দ্রিক ভগবান্ আগাগোড়া এই সুরে গড়া।

লেখক—এই ধরণের ভগবান্ কি আপনি আর কোনো ভারতীয় সাহিত্যে পান না?

সরকার—ভগবৎ-সাহিত্যের কতটুকুই বা জানি? আমি পাষণ্ড। তা ছাড়া রবীন্দ্র-সাহিত্য ত প্রাণে প্রাণে ভারতীয় রসে ভরপুর। সকল প্রকার ভারতীয় ভগবানের কল্পনা রবীন্দ্র-চিত্তে ঠাঁই পেয়েছে। তবুও বল্‌ছি,—উপনিষদের মন্তরগুলায় যে-ভগবান্ পাওয়া যায় সেই ভগবানের সমান সনাতন ও বিশ্বজনীন রৈবিক ভগবান্। কিন্তু সেই ভগবানের চেয়ে এই রৈবিক ভগবান্ সরস, আত্মীয় ও মানুষ-ময় বেশী। অপর দিকে বৈষ্ণব ভক্তি-সাহিত্যের ভগবান্ রাবীন্দ্রিক ভগবানের মতনই বস্তুপূর্ণ বা ব্যক্তিত্বময়। কিন্তু বৈষ্ণব ভগবান্ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভগবানের সমান সার্বজনীন ও সনাতন নন।

দুনিয়ার নানা দেশের সংস্কারগুলা, রীতিনীতিগুলা আর লোকাচারগুলা ভুলে যা। দেখ্‌বি,—রবীন্দ্র-সৃষ্ট ভগবানের মতন মানুষমাত্রের কার্যোপযোগী, মানুষমাত্রের স্বাধীনতা-সেবক ভগবান্ আর পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ।

আমি পাপিষ্ঠ। এসব চিজ বুঝি-টুঝি না। তবুও ব'কে গেলাম।

অভেদানন্দের রচনাবলী

২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

লেখক—আপনি অভেদানন্দের "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পীপল্" (নিউ-ইয়র্ক, ১৯০৬) বইটা সম্বন্ধে কী মনে করেন?

সরকার—বইটা আমি প্রথমে পড়ি আমেরিকায় (১৯১৪-২০)। পছন্দ করেছিলাম। অনেককে পড়্‌তে বলেছি। আজকালও পছন্দ করি। প্রথম অধ্যায়ে আছে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে বিবরণ। অতি সংক্ষেপে সকল কথা বেশ বলা আছে। ঐ সম্বন্ধে সেকালে ইংরেজিতে কয়েকখানা বই পাওয়া যেতো। সে সবের সংগে গ্রন্থকারের পরিচয় দেখ্‌তে পাই। বৃত্তান্তটা সরল আর সুবোধ্য,—আজও স্বীকার-যোগ্য। তবে সন-তারিখের কথা আলাদা। অন্যান্য

প্রবন্ধে সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আর্থিক ইত্যাদি বিষয় বিবৃত আছে। একালে ও সেকাল দুই-ই পাকড়াও কর্‌তে পারি। বিনা প্রমাণে অভেদানন্দ কোনো কথা বলেন না। মেজাজটা তাঁর তথ্যনিষ্ঠ ও সংখ্যানিষ্ঠ। বই পড়ার অভ্যাস ছিল তাঁর বেশ। পাদটীকাগুলা তার সাক্ষী। রমেশ দত্ত ইত্যাদি গবেষকদের রচনার সংগে তার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য অভেদানন্দের দরদ ছিল সুস্পষ্ট। ইংরেজি রচনা-কৌশল তারিফ্‌যোগ্য।

লেখক—অভেদানন্দের "লেক্‌চার্‌স্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেজ ইন্ ইণ্ডিয়া, ১৯০৬" বইটা আপনার কেমন লেগেছে?

সরকার—বিবেকানন্দ-বিষয়ক "কলম্বো হ'তে আল্‌মোড়া" ("ভারতে বিবেকানন্দ") বইটা যা, অভেদানন্দ-বিষয়ক এই ইংরেজি বইটা বিল্‌কুল তাই। দুটোই আমার কাছে সমান মূল্যবান।

কলম্বোয় নামা হ'তে অভেদানন্দ দেশবাসীর পূজা খেতে আরম্ভ করেন। পূজা খাওয়া শেষ হয় মাদ্রাজ-কলিকাতা হ'য়ে বোম্বাইয়ে ভারত-ত্যাগ পর্যন্ত পাঁচ-ছয় মাসে। বোধ হয়, শ'দেড়েক সম্বর্ধনা জুটেছিল। এই সম্বর্ধনাগুলা আমার খুব ভাল লেগেছে। তাই দিয়ে আমি তামাম্ ভারতের মুড়োটা নিজ মুঠার ভেতর খানিকটা পাকড়াও কর্‌তে পেরেছি। তখন চল্‌ছিল গৌরবময় বংগ-বিপ্লব আর ভারত-জোড়া স্বদেশী-আন্দোলন। ভারতসন্তান শ'য়ে-শ'য়ে হাজারে-হাজারে অভেদানন্দকে মাথায় ক'রে নাচানাচি ক'রেছিল। এই নাচানাচির ভেতর দেখ্‌তে পাচ্ছি মাত্র এক ঢাক আর শুন্‌ছি কেবল এক সুর। ঢাক্ বাজ্‌ছিল,—ভারতবাসীর আমেরিকা-বিজয়। এই হ'লো অভেদানন্দ পূজার একমাত্র মুদ্দা। বইটার ভেতর বৃত্তান্তগুলা নয়া ভারতের এক অপূর্ব ইতিহাস খুলে ধ'রেছে। বিবেকানন্দ-বিষয়ক বইটারও সামাজিক মূল্য এইরূপ।

অভেদানন্দকে নিয়ে মাতামাতি কর্‌তে কর্‌তে সমগ্র ভাবত এক হ'য়ে পড়েছিল। ভারতীয় ঐক্য অভেদানন্দ সম্বর্ধনার ভেতর দিয়ে মূর্তিমন্ত হ'য়ে উঠেছিল। সে এক অভিনব দৃশ্য।

একদিকে দেখ্‌ছি ভারতবর্ষের অলিতে-গলিতে দিগ্বিজয়ের আদর্শ আর একদিকে দেখ্‌ছি ঐক্যবদ্ধ ভারতের ছবি। এই দুই জিনিষের স্বাক্ষীস্বরূপ বইটা অনেকদিন পর্যন্ত ভারতীয় নরনারীর নিকট মূল্যবান থাক্‌বে।

একটা তৃতীয় কারণও আছে। জানিস্-ই তো আমি বংগ-চন্দ্র, বাঙালীর বাঙালী। বাঙালীর চোখে ভারতের সর্বত্র অভেদানন্দ পূজাটা দেখ্‌ছি। আর মনে হচ্ছে বইটার ভেতর পাচ্ছি সর্বত্রই বাঙালীর দিগ্বিজয়; আমার বিশ্বাস,—ভারতে বিবেকানন্দ-সম্বর্ধনার সময়ই (১৮৯৭-৯৮) বাঙালীর সর্বপ্রথম দিগ্বিজয় অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল।

লেখক—এই বইয়ের ভেতরকার অভেদানন্দ-দর্শন কিরূপ মনে করেন?

সরকার—সম্বর্ধনার জবাবে অভেদানন্দ বেদান্ত ও হিন্দুত্বের কথা ব'লেছেন। আমেরিকায় বিবেকানন্দের দিগ্‌বিজয়ের উল্লেখ ক'রেছেন। দুনিয়ায় বেদান্ত-প্রচারের বর্তমান অবস্থা বিবৃত হ'য়েছে। ভাবতীয় নরনারীর জন্য কয়েকটা পাঁতিও প্রচারিত হ'য়েছে। তার ভেতর প্রধান কথা,—শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যের চর্চা। আর একটা বড় কথা, ভারতীয় ঐক্য। দলগঠন, শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদি দফাও জোরের সহিতই বলা আছে। অধিকন্তু মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখাবার বিষয়েও জোর দেওয়া আছে। কাজের কথা সবই।

লেখক—বইটা দেশে সুপরিচিত নয় কেন বল্‌তে পারেন?

সরকার—বোধ হয় ঐ বইটাতে অভেদানন্দ রাষ্ট্রিক সুর কিছু নরম। পাঁচ-সাত জায়গায় রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাকে দ্বিতীয় ঠাঁই দেওয়া হ'য়েছে,—এমন কি বেশ-একটা নকড়া-ছকড়া করা হ'য়েছে। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার উপর জোর প'ড়েছে অত্যধিক। ডোজ্‌টা চরম। তাতে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা বেচারা চাপা প'ড়ে গেছে। হয় তো এই কারণে স্বদেশী-যুগের যুবক-ভারত বইটা পছন্দ করে নি। আর আজও হয় তো এই কারণে বইটা "জাতে উঠ্‌তে" পারে নি।

কিন্তু অভেদানন্দ দর্শনে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার ঝাঁঝ বেশ কড়া। "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পীপল্" বইটার কথা আগেই ব'লেছি। কাজেই "লেক্‌চার্‌স্ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেজ্" বইটা বয়কট করা উচিত নয়। তা' ছাড়া, আগেই বলেছি,—অন্যান্য কারণেও এর কিম্মৎ খুব বেশী।

লেখক—অভেদানন্দের "রি-ইন্‌কারনেশন" (পুনর্জন্ম, ১৯০০), "স্পিরিচুয়্যাল আন্‌ফোল্ডমেন্ট" (আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ, ১৯০২), "ফিলজফি অব ওয়ার্ক" (কর্ম-দর্শন, ১৯০৩), "পাথ্ অব্ রিয়েলিজেশন্" (সাধনার পথ, ১৯৩৯) ইত্যাদি পুস্তিকাগুলা আপনার কেমন লাগে?

সরকার—অভেদানন্দের রচনাবলীর একটা মস্ত বিশেষত্ব লক্ষ্য ক'রেছি। কোনো কথা একমাত্র ভারতীয় মতামতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রায় সকল লেখাতেই এক সংগে হিন্দু ও অহিন্দু, ভারতীয় ও অ-ভারতীয় তথ্যের সমাবেশ দেখ্‌তে পাই। এই তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালী আমার অতি-প্রিয়। তবে তুলনামূলক আলোচনা-প্রণালীর সদ্ব্যবহার করা অনেক সময় ঘ'টে উঠে না। প্রয়োগ করা কঠিনও বটে। তার কারণ আমি "ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা, শিকাগো ১৯১৮) প্রবন্ধে বিশ্লেষণ ক'রেছি।

দ্বিতীয় কথা,—প্রাচীন বাণী ব্যাখ্যা কর্‌বার জন্য অভেদানন্দ আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের সাহচর্য নিতে অভ্যস্ত। ফলতঃ বেদান্তই বল্, হিন্দুত্বই বল্, যোগই বল্,—সবই পাঠকের পক্ষে সহজবোধ্য হ'য়ে উঠেছে।

লিখ্‌বার প্রণালীতে গ্রন্থকারের অস্পষ্টতা নেই। সব কথা সোজাভাবে বোঝানো আছে। যে-কোনো লোক সবই বুঝ্‌তে পারে। বুঝাবার ভেতর নকল-নবিশি কিংবা দু'মনা ভাব নেই। সব-কিছু সজোরে বল্‌বার ক্ষমতা দেখ্‌তে পাই। রচনাগুলা আন্তরিকতাময়। ঠিক যেন শ্রোতা বা পাঠককে দখল করার লক্ষ্য রেখে কথাগুলা বলা হচ্ছে। এই ধারণা মনে আসে। অভেদানন্দের ইংরেজি সরল, সরস ও সতেজ। গ্রন্থকার বাঙালী ব'লে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।

বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ সম্বন্ধে গবেষণা

লেখক—অভেদানন্দের এ পুস্তিকাগুলা একালেও কার্যোপযোগী হতে পারে কি?

সরকার—পুস্তিকাগুলা বিবেকানন্দের পুস্তিকাগুলার মতনই ধর্মের বক্তৃতায় প্রতিষ্ঠিত। ধর্ম-ঘেঁষা দর্শনের আর দর্শন-ঘেঁষা ধর্মের এরূপ ব্যাখ্যা অনেক দিন পর্যন্ত দেশবিদেশে কাজে লাগ্‌বে। বাঙালী আর অ-বাঙালী অন্যান্য ভারত-সন্তানদের পক্ষেও,—জীবনযাত্রার জন্য আর কর্তব্যপালনের জন্য,—ব্যাখ্যাগুলা যারপরনাই দামী।

বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ ইংরেজিতে যে-সব ধর্মকথা ও দার্শনিক বাণী ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন, সে-সবের ভিত্তি বেদান্ত-উপনিষদ্-গীতায় আর রামকৃষ্ণ-কথামৃতে। কিন্তু এই

ধরণের ধর্মপ্রচার আর দর্শন-ব্যাখ্যা দুনিয়ার সাহিত্যে বড়-বেশী নেই। খৃষ্টিয়ান দার্শনিক ও ধর্মগুরুদের বইগুলার সংগে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দের ব্যাখ্যাগুলা তুলনা ক'রে দেখা যেতে পারে। বিবেকানন্দ-অভেদানন্দের ধর্ম-ঘেঁষা দার্শনিক ব্যাখ্যাগুলাকে আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বিবেচনা করি। তবে ভারতের নয়া-পুরাণা টুলো পণ্ডিতেরা আর প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিক-সারসংগ্রাহকেরা বিবেকানন্দ-অভেদানন্দের রচনাবলীর আসল কিম্মৎ পাকড়াও কর্‌তে পার্‌বে কিনা জানি না। এই সকল পণ্ডিত-গবেষক-ঐতিহাসিকেরা অতিমাত্রায় দাম্ভিক।

আর একটা কথা। হিন্দুত্ব সম্বন্ধে নানাযুগে নানা ভারতবাসী নানা মত প্রচার ক'রেছেন। প্রশ্ন কর্‌ছি,—এই সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় মনীষীদের চিন্তা কিরূপ ছিল? জবাব দিচ্ছি,—তার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ কর্তৃক প্রচারিত মার্কিণ প্রবন্ধগুলা।

লেখক—অভেদানন্দ'র গ্রন্থাবলী অথবা বিবেকানন্দ'র গ্রন্থাবলী হ'তে একালের যুবক ভারত কি কোনো প্রেরণা পেতে পারে?

সরকার—যুবক ভারত ক্রমেই স্বাধীনতা-নিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌ছে। দিগ্‌বিজয়ের সোআদও তার জীবনে কিছু-কিছু ক'রে জুট্‌ছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের চৌহদ্দি দিন-দিন বেশ-কিছু বেড়ে চ'লেছে। একালের ভারতীয় আবহাওয়ায় দিগ্‌বিজয় আর বৃহত্তর ভারত খুব বড় জিনিষ।

কাজেই যুবক ভারতের পক্ষে দিগ্‌বিজয়ের প্রবর্তক বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ রোজ-রোজ নতুন-নতুন মূর্তিতে দেখা দিতে বাধ্য। এই দুই বৃহত্তর ভারত-প্রতিষ্ঠাতার জীবনকাহিনী একালের ভারতীয় নরনারীর চোখে যারপরনাই মূল্যবান্ বিবেচিত হবে। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গবেষণা, আর অভেদানন্দ সম্বন্ধে গবেষণা আগামী ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের ভেতর ভারতীয় সমাজ-শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান গবেষণায় পরিণত হবে। ১৮৯৩ হতে ১৯০২ পর্যন্ত বিবেকানন্দ'র প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক ঘটনা খুঁটিনাটির সহিত আলোচিত হবে। সেই সঙ্গেই সমান আগ্রহের সহিত আলোচিত হবে অভেদানন্দ'র ১৮৯৬ হতে ১৯০৬ পর্যন্ত বিদেশ প্রবাসের দশ বৎসর। অভেদানন্দ'র রচনাগুলা সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর আকারে প্রকাশিত হওয়া উচিত। বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে পাওয়া যায়।

দার্শনিকদের চিন্তায় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা যুগটা (১৮৯৩-১৯০২) অনেক-কিছু খোরাক যোগাবে। আর ঐতিহাসিকদের চিন্তায় এই যুগের চেয়ে কোনো যুগই গবেষণার জন্য মহত্তর বিবেচিত হবে না। বিংশ-শতাব্দীর চতুর্থ পাদে বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলী আর অভেদানন্দ-গ্রন্থাবলী দর্শন-সেবক আর ইতিহাস-সেবকদের বেদ-বাইবেল-কোরাণে পরিণত হবে।

একালে পাশ্চাত্য জগতে কান্ট-গবেষণা, হেগেল-গবেষণা ও মার্ক্‌স-গবেষণা পণ্ডিত-সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ। লেনিন-গবেষণাও সেই ধাপে উঠ্‌ছে। অনতিদূর ভবিষ্যতে বিবেকানন্দ-গবেষণা আর অভেদানন্দ-গবেষণাও ভারতীয় সুধী-সমাজে সেই কোঠে গিয়ে উঠ্‌বে।

ব্রজেন শীলের "ভারতীয় দর্শন-সূচী"

২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

লেখক—ব্রজেন শীলের লেখা কোনো দার্শনিক বই কি একদম পাওয়া যায় না?

সরকার—একটা মজার কথা বল্‌ছি। ১৯২৪ সনে ব্রজেন শীল মহীশূরে। তখন তাঁর সেখানকার অন্যতম মান্দ্রজী সহযোগী একটা ১৫।১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাতে ছিল প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে ব্রজেন শীলের আলোচ্য বিষয়ের সূচীপত্র। সেটা বইতো নয়ই,—এমন কি বইয়ের চুম্বকও নয়। তার ভেতর আলোচ্য বিষয়-বস্তুর সূচী ছাড়া আর কিছু ছিল না। কিন্তু এই সূচীটা দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে, একমাত্র ব্রজেন শীল ছাড়া আর কারো সাধ্য নেই যে, সে-বই লেখে। ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যে যারা ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌তে চায়, তারা অনেকদিন পরেও এই সূচীর ভেতর হরেক-রকমের হদিশ্‌ পেতে বাধ্য।

লেখক—এই সূচীর ভেতর ব্রজেন শীলের কিরূপ বিশেষত্ব পেয়েছেন?

সরকার—বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার কথা বেশ আছে। ব্রজেন শীলের কল্পনায় ছিল প্রকারান্তরে গোটা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস। একমাত্র দর্শনে যারা মাথা খেলায়, তাদের পক্ষে ব্রজেন শীলের সূচীর ভেতর থৈ পাওয়া কঠিন,—এমনকি অসম্ভব। দর্শন ছিল তাঁর চিন্তায় সংস্কৃতির অন্যতম অংগ। দর্শন বল্‌লে তিনি একসংগে দেখ্‌তেন অনেক জিনিষ। দর্শন শব্দে তিনি গোটা জীবন-কে-জীবন বুঝ্‌তেন। তাঁর চিন্তায় দর্শন অন্যান্য অনেক-কিছুর সংগে,—যথা নৃতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সুকুমার শিল্প, ইতিহাস ইত্যাদি,—সুজড়িত ছিল। বস্তুতঃ এজন্যই বাঙালী-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) ব্রজেন শীলকে আমরা দার্শনিক বল্‌তাম না—বল্‌তাম লোকটা বিদ্যার জাহাজ, প্রকাণ্ড বিদ্যা-দিগ্‌গজ, সর্ববিদ্যাবিশারদ-পণ্ডিত—জ্যান্ত বিশ্বকোষ। এই বিশ্বকোষ হাঁটকাতো সেযুগের ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণ-যম সকলেই। একালের দার্শনিকদের ভেতর হীরালাল হালদারকে অনেকদিন ব্রজেন শীলের বৈঠকখানার চৌকির উপর তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে গড়াতে দেখেছি।

লেখক—আর কোনো বিশেষত্ব এই সূচীর ভেতর আছে?

সরকার—এ সূচীটার ভেতর সাংস্কৃতিক স্তর-বিন্যাসের বিষয়ে ইংগিত করা আছে। তাতে ব্রজেন শীলকে খানিকটা হেগেলপন্থী ও কঁৎপন্থীরূপে পাকড়াও করা সম্ভব তা ছাড়া তিনি একালের বহুত্বনিষ্ঠা (প্লুর‍্যালিজম্‌) প্রচার ক'রেছেন। এবিষয়ে তাঁকে জার্মাণ গিয়ের্কে, ফরাসী দুগুই এবং ইংরেজ ফিগিস্‌ ইত্যাদি আইন-পণ্ডিতগণের "এক-গেলাসের ইয়ার" বল্‌তে পারি।

লেখক—ব্রজেন শীলের লেখালেখি কি সত্যসত্যই নেহাৎ কম ছিল।

সরকার—ব্রজেন শীলের বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে র'য়েছে। সেসব একত্র কর্‌লে বড় বড় দু'একখানা বই দাঁড়িয়ে যেতে পারে। বোধ হয়, হাজার-বারশো পৃষ্ঠা হবে। সে-আকারে বেরুলে আমি যারপরনাই আনন্দিত হই। হাতের লেখা মাল অ-ছাপা অবস্থায় কোথায়-কোথায় আছে জানি না।

১৯০৫-১৪ সনের পূর্ববর্তী আর সমসাময়িক যুবক বাঙ্‌লার জ্ঞানবিজ্ঞান ব্রজেন শীলে মূর্তিমন্ত ছিল। বাস্তবিক্ পক্ষে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ যুগে (১৮৮৩-১৯০২) ভারতীয় দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্য-পাণ্ডিত্যের অন্যতম বিপুল খুঁটা ব্রজেন শীল।

ব্রজেন শীল এত কম লিখ্‌লেন কেন?

লেখক—ব্রজেন শীলের পাণ্ডিত্য এত বেশী, অথচ লেখালেখি এত কম কেন?

সরকার—সেকালে আমাদের দেশে পণ্ডিত ছিলেন অনেকে কিন্তু তাঁরা লিখ্‌তেন না। লেখালেখির দ্বারা যে দেশের উপকার করা যায় তা তাঁরা বুঝ্‌তেন না। অন্যান্য কর্তব্যের মধ্যে বই লেখাও একটা কর্তব্য। এই কর্তব্যজ্ঞানটা তাঁদের ছিল না।

লেখক—আজকাল আমাদের দেশে অনেকে বই লিখে থাকেন। তাঁরা কি স্বদেশ-সেবার জন্য বই লেখেন? কর্তব্যজ্ঞানেই কি তাঁরা লেখালেখি করেন?

সরকার—দু-এক জন হয়ত কর্তব্যজ্ঞানেই বই লেখেন। অন্য টানও আছে। আজকাল চাক্‌রি পেতে হ'লে অনেক সময় বই লেখা চাই। আর হয়ত চাক্‌রি বজায় রাখ্‌বার জন্যই বই লেখা আবশ্যক হয়। সেকালে চাক্‌রির দরদে লেখালেখি জরুরি হ'ত না। আর কর্তব্যজ্ঞানের ডাকও বড় একটা ছিল না।

লেখক—ব্রজেন শীলেব সঙ্গে আপনার এ বিষয়ে কোনো কথাবার্তা হয়েছিল?

সরকার—শুধু একবার? অনেকবার তাঁর সঙ্গে আমার (আর রাধাকুমুদের) বচসা হয়েছে। অনেকবার তিনি আমাদেরকে ব'লেছেন—"আচ্ছা, এইবার থেকে ওপরের ঘরে আমি একা বস্‌বো। আর কারুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ কর্‌ব না।" মনে আছে আমরা একদিন পনর-ষোলটা মোটা-মোটা বই তাঁর দোতালার ঘরে টেবিলের উপর মজুত্ ক'রে দিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম্—এইবার বই বেরুবে। তারপরই দেখি আবার নীচের বৈঠকখানায় সকাল বেলা আটটায় সময় যে ভীড় সে ভীড়! হেসে বল্‌লেন—"দেখ্‌ছ? কাকে বাদ দিই?"

লেখক—আপনি এই অবস্থাকে কিরূপ মনে করেন?

সরকার—তবে শোন্। ১৯১৬ সনে আমি চীনের শাংহাইয়ে তাঁর "পজিটিভ সায়েন্সেজ্" বইটা (১৯১৫) রেজিস্ট্রি ডাকে পেলাম। পেয়েই ঝেড়ে দিলাম নীচের ক' লাইন (৩০শে জুন):—

আমাদের কুদৃষ্টান্ত তুমি গুরুদেব,
ভারতের হাহাকার বুঝিলে না তুমি!
বিপুল ক্ষমতা করে' রেখেছিলে গায়েব,
উঠালে না দুনিয়ায় তব জন্মভূমি।
কাণ্ট্, হার্ডার, ফিখ্‌টে, হেগেল জার্মাণের,
ইংরেজের মিল্. স্পেন্সার, সিজ্‌ইক, গ্রীণ,—
এদের মাথাও বড় নয় চেয়ে ভারত-সন্তানের ;
তোমার আলস্যে, হায়! বঙ্গ কীর্তিহীন।
টলষ্টয়, নীট্‌শে, জেম্‌স্,' ব্যর্গসেঁর বচন,
দুনিয়ার নব নব জ্ঞান বিদ্যা যত
নখ-দর্পণের মাঝে রেখেছে সতত—
মিশায়ে শীকিঙ্-বেদ-কোরাণ রতন।
বিশ্ব-ব্যাখ্যাকরা, দ্রষ্টা জীবনপথের,
ব্রজেন্দ্র, বাঙালী, তুমি রত্ন জগতের!

কবি হেমেন্দ্রবিজয় সেনকে দিয়ে ছন্দটা মেরামত করিয়ে নিয়েছি। মূলটা দেখ্‌ছিস?

আমার চোঁআড় শব্দ বেশী বদ্‌লাতে দিই নি!

লেখক—এটা কি ব্রজেন্দ্র-প্রশস্তি না ব্রজেন্দ্র-প্রহার?

সরকার—একই সঙ্গে দুই চিজ। সত্যিকার কথা জেনে রাখ্। বিদ্যা থাক্‌লেই লেখক হওয়া যায় না। বিদ্বান হওয়া আর বই লেখা দুটা স্বতন্ত্র জাতের কাজ। বই লেখার পেছনে একটা নয়া নৈতিক বল চাই। হাজার রকমের নৈতিক বল আছে। তার ভেতর বই লেখালেখির নৈতিক বল অন্যতম। এটা বিশিষ্ট ঢঙের চরিত্র শক্তি। এই চরিত্র-শক্তিটা বেশী-বেশী আবশ্যক। তবে বিদ্বান লোক লেখক হ'তে পার্‌বে। "লিখবোই",—"দেশকে কিছু দিয়ে যাবোই-যাবো",—"দুনিয়ায় দাগ রেখে যাবার জন্য জন্মেছি",—"সংসারে একটা ঠিকানা কায়েম কর্‌তেই হবে",—"দেশে আজ গ্রন্থকারের সংখ্যা কম, আমি গ্রন্থকার হ'য়ে আর পাঁচজনকে গ্রন্থকার হ'বার পথে নিয়ে আস্‌বো",—চাই এই ধরণের মতিগতি, সাধনা, মেজাজ, জীবনের ধাক্কা, "লেলাঁ দ্য লা ভী।" শুধু পাণ্ডিত্যে থাক্‌লেই হয় না রে ভাই।

কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যা

লেখক—কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যকে স্বদেশীযুগে লোকেরা কি চোখে দেখ্‌তো?

সরকার—কৃষ্ণবাবু মিশুক্ লোক নন। লোকজনের সংগে তাঁর যাওয়া-আসা কম ছিল। স্বদেশীযুগে (১৯০৫-১৪) তাঁর বেদান্ত-ব্যাখ্যা (স্টাডিজ্ ইন বেদান্তিজ্‌ম্") বেরিয়েছিল ইংরেজিতে (১৯০৯)। ছোট্ট বই, কিন্তু ঠাসা মাল। ঐ ধরণের বই তখনকার দিনে আর একখানাও, বোধ হয়, ছিল না। বেদান্তের তর্জমাকারী বা মামুলি প্রচারক ও ভাষ্যকারের মূর্তিতে গ্রন্থকার দেখা দেন নি। তখনকার দিনে উপনিষদ-বেদান্ত ইত্যাদি ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যকে ইযোরামেরিকান পণ্ডিতেরা দর্শন বল্‌তে রাজি হতো না।

লেখক—কি বলছেন? বিশ্বাস-যোগ্য নয় যে! আশ্চর্যের কথা নয় কি?

সরকার—ভায়া, ঠিক তাই। ভারত-মাতাকে "ভদ্রলোকের পাতে" দেওয়া ভয়ানক কঠিন ছিল। কৃষ্ণ ভট্টাচার্য স্বদেশসেবক, যদিও সরকারী চাক্‌রে। তাঁর কলমের লক্ষ্য ছিল বেদান্তকে দর্শনের কোঠায় ঠেলে তোলা। বুঝ্‌তে হবে,—তখনকার দিনে দুনিয়ার দার্শনিক আসরে ভারতীয় দর্শনের ঠিকানা কায়েম করানো সোজা ছিল না। এজন্য ভারতীয় পণ্ডিতদের পক্ষে আদা-নুন খেয়ে উঠে-পড়ে লাগ্‌তে হয়েছিল। কৃষ্ণবাবু এ ধরণের পণ্ডিতদের অন্যতম,—বাস্তবিক পক্ষে অন্যতম অগ্রণী।

লেখক—বেদান্ত-ব্যাখ্যায় কৃষ্ণবাবুর আর কোনো বিশেষত্ব আছে?

সরকার—আছে, জবরভাবেই আছে। বেদান্তকে একটা ষোল-কলায় সম্পূর্ণ গড়ন দেবার চেষ্টাও তাঁর ছিল। আধুনিক পাশ্চাত্য মগজ যারপরনাই যুক্তিনিষ্ঠ ও শৃঙ্খলানিষ্ঠ। যে-সে রচনাকে দর্শনের ইজ্জৎ দিতে এই মগজ রাজি নয়। কাজেই যুক্তিনিষ্ঠা আর শৃঙ্খলা দিয়ে বেদান্তকে ভূষিত করবার জন্য গ্রন্থকার লড়াই ক'রেছেন। আজকাল এবং পরবর্তীকালেও যারা বেদান্ত-চর্চা করতে চায়,—তাদের পক্ষে ঐ রচনাটা কাজে লাগ্‌বে। বেশ শক্ত বই। ঢোঁক গিলে-গিলে বুঝ্‌তে হয়।

বেদান্তের চিত্তবিজ্ঞান, অধ্যাত্মতত্ত্ব আর তর্কশাস্ত্র খোলসা কর্‌বার মতলবে তিনি জার্মাণ দার্শনিক কাণ্ট (১৭২৮-১৮০৪) আর হেগেলকে (১৭৭০-১৮৩১) মাঝে-মাঝে ডেকেছেন।

তাতে বেদান্তের পারি-ভাষিকগুলা তলিয়ে-মজিয়ে বুঝবার সুবিধা হ'য়েছে। তুলনামূলক সমালোচনার ফলে বেদান্তকে ডাইনে-বাঁয়ে বাজিয়ে দেখ্‌তে পারা গেছে।

(পৃষ্ঠা ১৮, "বর্তমান ভারতে দর্শনের সূত্রপাত হয়েছে কি?", ৩০শে আগষ্ট, "স্বাধীন দর্শন", ২৮শে অক্টোবর দ্রষ্টব্য)।

লেখক—বাঙালী পণ্ডিতমহলে জার্মাণ চিন্তার প্রভাব স্বদেশীযুগে ছিল দেখ্‌ছি।

সরকার—উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংরেজ সাহিত্যবীর কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮৯) বিলাতী সমাজে জার্মাণ দর্শনের ও সাহিত্যের প্রচার করেন। তার ঢেউ ভারতেও পৌঁছেছিল। বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ, ব্রজেন শীল, হীরালাল হালদার, কৃষ্ণ ভট্টাচার্য ইত্যাদি মনীষীরা সকলেই কার্লাইল-প্রচারিত এবং অন্যান্য ইংরেজ-সেবিত জার্মাণ সংস্কৃতিতে মস্‌গুল্‌ ছিলেন। আজও সে ধারা চল্‌ছে।

লেখক—কোন্‌-কোন্‌ জার্মাণ দার্শনিক বাঙালী দর্শন-চর্চায় প্রভাবশালী?

সরকার—কৃষ্ণবাবুকে সাধারণতঃ কাণ্টপন্থী ব'লে জানে। তিনি কাণ্ট-প্রেমিক ও কাণ্ট-প্রচারক সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক বিষয়েই তিনি কাণ্ট-পন্থী নন। ১৯৩৬ সনে বেরিয়েছে রাধাকৃষ্ণন্‌ ও মুইয়রহেড-সম্পাদিত "কণ্টেম্পোরারি ইণ্ডিয়ান ফিলজফি" (সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন)। ইহার ভিতর কৃষ্ণবাবুর একটা প্রবন্ধ আছে। তাতেও কাণ্ট-বিরোধী কথা পাই। এখানে বল্‌তে পারি যে, ব্রজেন শীল ও হীরালাল হালদারকে লোকেরা হেগেল-পন্থী বলে। কিন্তু ব্রজেন শীল পুরাপুরি হেগেল-পন্থী নন। হালদার সম্বন্ধেও কিছু "কিন্তু" আছে। তবে তাঁকে প্রায় পৌনেষোল-আনা হেগেল-পন্থী বলা চলে।

মার্ক্‌স্‌, কঁৎ, হার্ডার

লেখক—আপনাকে কেহ-কেহ মার্ক্‌স্‌-পন্থী বলে। কথাটা কি ঠিক?

সরকার—মার্ক্‌স্‌-সাহিত্যের দুটো বড়-বড় ("ক্লাসিক্‌") বই আমি বাংলায় তর্জমা করেছি (১৯২৩-২৫)। বোধ হয়, এজন্য আমাকে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা মার্কস্‌-পন্থীরূপে বিবৃত করে। কিন্তু মার্ক্সের (১৮১৮-৮৩) কয়েকটা মোটা-মোটা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি সর্বদাই বকাবকি ক'রে থাকি আর কলম চালিয়েছিও। মার্ক্স্‌-প্রবর্তিত অর্থনৈতিক অদ্বৈতবাদের আমি কট্টর বিরোধী। মানুষের জীবনে, সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে অর্থকথা অন্যতম শক্তি বটে, কিন্তু একমাত্র শক্তি নয়। এই হ'লো আমার কথা।

ঠিক এই কথাই বল্‌তে পারি আমার ফ্রয়েড-প্রচার সম্বন্ধে। ব্যক্তি সমাজ বিষয়ক যৌন-বিশ্লেষণ আলবৎ জরুরি। কিন্তু যৌনশক্তিই মানুষের জীবনে একমাত্র শক্তি নয়। অন্যান্য শক্তিও একসংগে কাজ করে।

লেখক—কেহ-কেহ মনে করে যে, আপনি কঁৎ-পন্থী?

সরকার—তার কারণ, বোধ হয়, আমার একটা বড় বইয়ের নামে "পজিটিভ্‌" (বস্তুনিষ্ঠ, ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ, যুক্তিনিষ্ঠ, সংসারনিষ্ঠ, ইহনিষ্ঠ) শব্দটা আছে। এই শব্দটা আমি কঁৎ-প্রচারিত অর্থে চালিয়েছি। কিন্তু কঁৎ (১৭৯৮-১৮৫৭) প্রবর্তিত দর্শনে অতীন্দ্রিয়, আত্মা, দেবদেবী, ধর্ম ইত্যাদি চিজের ঠাঁই নেই। আমি ইন্দ্রিয়নিষ্ঠা আর ইহনিষ্ঠার উপর জোর দিই সন্দেহ নেই। কিন্তু অতীন্দ্রিয়-নিষ্ঠার ও অধ্যাত্ম-নিষ্ঠার ইজ্জৎ দিতে সর্বদাই আমি অভ্যস্ত। আমি দু-মুখো ছুরি, আসলে বহুত্বনিষ্ঠ। হাজার হ'লেও জন্মেছি হিন্দু,—বহু দেবদেবীর পূজক। কে জানে,

বাবা, কখন কোন্ দেবতা কাজে লাগে?

লেখক—আপনাকে অনেকে আবার হার্ডার-পন্থী বলে। এর মানে কী?

সরকার—মানে অতি সোজা। অনেকদিন ধ'রে আমি হার্ডারের গুণগান ক'রে আস্‌ছি। নানাবিদ্যার ক্ষেত্রে 'হার্ডার', 'হার্ডার' (১৭৪৪-১৮০৩) বকা আমার দস্তুর। কিন্তু হার্ডারের একটা বড় কথার বিরুদ্ধে আমি পাঁতি দিয়ে থাকি। হার্ডার ছিলেন কবিবর গ্যেটের (১৭৫০-১৮৩২) যুগের জার্মাণ সমাজশাস্ত্রী,—দার্শনিক কাণ্টের (১৭২৪-১৮০৪) সমসাময়িক।

হার্ডারের মতে প্রত্যেক জাতির একটা আত্মা বা প্রাণ আছে আব সেই প্রাণ দেখ্‌তে পাই ভাষায়। এতএব তাঁর বয়েৎ,—জাতি-মাফিক রাষ্ট্র, ভাষাহিসাবে রাষ্ট্র, ভিন্ন-ভিন্ন সংস্কৃতির জন্য ভিন্ন-ভিন্ন রাষ্ট্র। এই বাণী হ'লো দুনিয়ার জাতীয় স্বাধীনতা আর জাতীয়তার মন্তর। হার্ডার চান,—যতগুলি জাতি ততগুলি রাষ্ট্র, যতগুলি ভাষা, ততগুলি রাষ্ট্র। বিভিন্ন ভাষাভাষী নরনারীর সম্মেলনে রাষ্ট্রগঠন হার্ডার-দর্শনে অসম্ভব। হার্ডার-মত অনুসারেই একালের লোকেরাও,— পোল, চেক, লিথুয়ানিয়ান, হাংগারিয়ান, বুলগার, আরব, ভারতীয় ইত্যাদি—দেশবিদেশে ভাষামাফিক 'জাতীয়' রাষ্ট্রের নেশায় মাতাল। এইমত আমার পক্ষে বরদাস্ত করা অসম্ভব।

লেখক—আপনি হার্ডার-বিরোধী কোন্ বিষয়ে?

সরকার—অন্যান্য ভারতসন্তানের মতন আমিও এই মত নিয়েই জীবন সুরু ক'রেছিলাম। কিন্তু স্বদেশী যুগেই,—১৯১০-১১ সনের আবহাওয়ায়,—"ইতিহাসবিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" প্রবন্ধে তার বিরুদ্ধে মত প্রচার কর্‌তে সুরু ক'রেছি। পরে নানা ঠাঁইয়ে এমতটার বিরুদ্ধে নিজের মত কথঞ্চিৎ পুষ্ট আকারে প্রকাশ করেছি। "পলিটিক্‌স্ অব বাউন্ডারিজ্" (সীমানার রাষ্ট্রনীতি, ১৯২৬) বইয়ে তার কিছু পরিচয় আছে।

আমার বিবেচনায় রাষ্ট্র একটা কৃত্রিম সঙ্ঘ ও শাসনযন্ত্র। এর ভেতর প্রাণ, আত্মা ইত্যাদি বস্তু দেখ্‌বার কোনো প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নানা ভাষা-ভাষী নরনারী,—হরেক-রকমের সংস্কৃতিওয়ালা নরনারী,—এক সংগে জীবন চালাতে সমর্থ। এই হিসাবে আমি হার্ডারের এবং হার্ডার-প্রবর্তিত দেশী-বিদেশী চিন্তাধারার উল্টা। জগৎপ্রসিদ্ধ (ময় ভারতপ্রসিদ্ধ) জাতীয়তা-দর্শনের বিরুদ্ধে চলে আমা:: রাষ্ট্র-দর্শন। আমি হার্ডার-প্রচারক বটে, কিন্তু কোনো-কোনো বিষয়ে আমি হার্ডারের চাঁই নই—বরং হার্ডার-বিরোধী।

ধন-রাষ্ট্র-সমাজবিজ্ঞানের তত্ত্ব, ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড

২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

লেখক—ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যা সম্বন্ধে ভারতীয় গবেষকদের কাজকর্ম ও কৃতিত্ব কী ধরণের?

("আর্থিক উন্নতি," "সমাজ-বিজ্ঞান," ১লা নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—তর্ক-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ইত্যাদি দর্শনের বা বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা সম্বন্ধে বর্তমান ভারতীয় পণ্ডিতদের যে অবস্থা, ধনবিজ্ঞান-শাখা সম্বন্ধেও প্রায় ঠিক তথৈবচ। এক কথায়,—ঐ সকল বিদ্যার লেখকেরা অধিকাংশই প্রকারান্তরে ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক। হয় প্রাচীন ও মধ্য-যুগের ভারতীয় অর্থ-কথা, রাষ্ট্র-কথা ও সমাজ-কথা

আলোচনা করা আজও প্রায় সকল ভারতীয় গবেষকদের দস্তুর। অথবা হয়ত অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হ'তে আজ পর্যন্ত আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভারতের ধারা ও ক্রমবিকাশের চর্চা করার দিকে কাহারো-কাহারো মতি-গতি।

আর এক কোঠেও কোনো-কোনো কলম চলে। সে হচ্ছে কর্ম-কাণ্ডে কোঠ। দেশোন্নতির হদিশ দেবার জন্য অনেক অর্থ-শাস্ত্রী, রাষ্ট্র-শাস্ত্রী ও সমাজ-শাস্ত্রী কলম চালিয়ে থাকেন। এ হিসাবে বল্‌বো যে, খাঁটি অর্থশাস্ত্রী, রাষ্ট্রশাস্ত্রী ও সমাজ-শাস্ত্রী আজও ভারতে এক প্রকার নেই।

লেখক—এই সকল বিদ্যার দার্শনিক অংশ কিরূপ হওয়া উচিত?

সরকার—ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিদ্যার মুল্লুকে আসল দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক হ'তে হ'লে চাই মূল্য-তত্ত্ব, মজুরি-তত্ত্ব, মুনাফা-তত্ত্ব (লাভ-তত্ত্ব), সিক্কা-তত্ত্ব (মুদ্রা-তত্ত্ব), শুল্ক-তত্ত্ব, কর-তত্ত্ব ইত্যাদির বিশ্লেষণ। আর চাই স্বাধীনতা-তত্ত্ব, বিধি-নিষেধ-তত্ত্ব, অপরাধ তত্ত্ব, শাস্তি-তত্ত্ব, সংঘ-তত্ত্ব, দলাদলি-তত্ত্ব, যোগাযোগ-তত্ত্ব, আন্তর্জাতিক মেলামেশা-তত্ত্ব, বিপ্লব-তত্ত্ব উন্নতি-তত্ত্ব ইত্যাদি বস্তুর আলোচনা। এ সকল তত্ত্ব বিশ্লেষণ করার সময় ভারত আর অবশিষ্ট দুনিয়ার কোনো দেশের বা কোনো যুগের তথ্য ঘাঁটাঘাঁটি না কর্‌লেও চল্‌তে পারে। দেশ-বিদেশের কথা বড়-জোর দৃষ্টান্ত মাত্র স্বরূপ উল্লেখ কর্‌লেই চলে। কিন্তু এসব ইতিহাস-বর্জিত, দেশকালহীন "তত্ত্ব-কথা"র বিশ্লেষণে এখনও আমাদের ধন-রাষ্ট্র-সমাজশাস্ত্রীদের মগজ একপ্রকার খেলেই না। কতটুকু বা কতখানি খেলে তা বুঝ্‌বার জন্য গ্রন্থকারদের বইগুলার বিভিন্ন অধ্যায় ঘেঁটে দেখা মন্দ নয়।

লেখক—কেন, এসব বিষয়ে কলেজে পড়ানো হয় না কি?

সরকার—এ সব বিষয়ে বই পড়ার ও পড়ানোর রেওয়াজ আছে বটে। অনেক পণ্ডিতের বাড়ীতে তত্ত্ববিষয়েও বই সংগ্রহ করা হ'য়ে থাকে সন্দেহ নেই। কিন্তু তত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ লেখা, বাদানুবাদ প্রকাশ করা, বই প্রচার করা ইত্যাদি কাজ এখনও ভারতীয় কোষ্ঠীতে নেহাৎ কম। তবে মনে হচ্ছে যেন "দিন আগত ঐ"। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর যারা পেরিয়ে গেছে তাদের ক'জন তত্ত্বের পথ মাড়াতে রাজি বলা কঠিন। বোধহয়, এক-আধজন থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। প্রায় সকলেই "দেশের অবস্থা" বিশ্লেষণ কর্‌তে অভ্যস্ত। কোন্ পথে ভারতের চলা উচিত, এ সমস্যা তাদের কারো-কারো মগজে প্রধান বা একমাত্র ঠাঁই অধিকার করে। কিন্তু পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের "ছোকরারা" আর একমাত্র ঐতিহাসিক গবেষণায় অথবা দেশোন্নতির আলোচনায় মস্‌গুল থাক্‌বে ব'লে বিশ্বাস হচ্ছে না,—না থাক্‌বারই কথা। তাদের ভিতর কেউ-কেউ খাঁটি ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি দর্শনের নানা শাখায় লেগে যেতে পারে। শুধু বাংলাদেশ সম্বন্ধে বল্‌ছি না—তামাম ভারত সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য। অন্যান্য দর্শন সম্বন্ধেও আমি সব কথাই গোটা ভারতের হ'য়েই বলেছি।

লেখক—আজকালকার প্রবীণদের মধ্যে যাঁরা ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যায় ঐতিহাসিক বা কর্মকাণ্ডের আলোচনা চালিয়ে থাকেন, তাঁদের রচনাবলীর ভেতর তত্ত্বের বিশ্লেষণ কি একদম পাওয়া যায় না?

সরকার—হয়ত কোনো-কোনো রচনায় এক-আধ কাঁচ্চা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তা টুঁড়ে বের কর্‌বার জন্যে দরকার হবে গলদ্‌ঘর্ম গবেষণা। সোজা কথা,—খাঁটি ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের পরিমাণ চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সের লেখকদের রচনায় অতি বিরল। আমার মনে হচ্ছে, ১৯৩৫ সনের পর থেকে থিয়োরি, তত্ত্ব, দর্শন বা বিজ্ঞান

শ্রেণীর কিছু-কিছু লেখা ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের হাতে বেরুচ্ছে। আমার বিচার-প্রণালী দিয়ে যুবা গবেষকদের পক্ষে এ সকল রচনা খতিয়ান ক'রে দেখা বাঞ্ছনীয়। তা'হলে ভারতীয় মগজের বর্তমান বহর ও দৌড় খানিকটা সহজে ধরা পড়্বে। দরকার হবে লেখকদের বই বা প্রবন্ধগুলার ভিতরকার অধ্যায়সমূহ বিশ্লেষণ করা। অনেক সময়ে বইয়ের নাম দেখে ভেতরে তত্ত্ব-গবেষণা আছে কিনা বুঝা যায় না। কাজেই যুবা গবেষকদের পক্ষে বেশ-কিছু মেহনৎ আবশ্যক হবে। তর্ক-বিজ্ঞান, চিত্ত-বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যান্য দর্শনের বেলায়ও আমি ভারতীয় বইগুলার ভেতর থেকে তত্ত্বাংশ টুঁড়ে বের কর্‌বার কথা বলেছি।

("দর্শনের আলোচ্য বিষয়", ২৭শে আগষ্ট, ১৯৪২ "দর্শনের কষ্টিপাথর" ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪২। "দুনিয়া-নিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র" ১লা নবেম্বর, ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)।

তত্ত্ব-বিশ্লেষণ বনাম কর্মকাণ্ড

লেখক—আপনি দেখ্‌ছি কোনো বিদ্যার কর্মকাণ্ডকে দর্শন বা বিজ্ঞান বল্‌তে নারাজ?

সরকাব—অবস্থা প্রায় তাই। তত্ত্বের বিশ্লেষণ ছাড়া আর কোনো জিনিষকে আমি দর্শন বা বিজ্ঞান বল্‌তে রাজি নই। এ বিষয়ে আমি চরমপন্থী। গোটা ভারত সম্বন্ধেই বেপরোআ ভাবে জরিপ চালানো আবশ্যক। অনেকবার ব'লেছি যে, আমার মত কাউকে মেনে নিতে বলি না।

আমার বিবেচনায় প্রত্যেক শাস্ত্র, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও দর্শনের তিনটে বিভাগ ;—একটা তত্ত্ববিষয়ক, একটা কর্মকাণ্ড বা কর্মকৌশল সম্বন্ধীয়, আর একটা ঐতিহাসিক। যেখানে তত্ত্বের ছোঁআচ নেই, সেখানে আমার বিবেচনা বিজ্ঞান বা দর্শন নেই। এ সম্বন্ধে আমি লুকোচুরি খেল্‌তে চাই না। তবে আমার মতটা নির্ভুল সম্‌ঝে রাখা আমার দস্তুর নয়।

লেখক—ঐতিহাসিক বিভাগ আর কর্মকাণ্ডের কোনো দাম নেই কি?

সরকার—কে বল্‌লো নেই? আমি এ দুই'এর ইজ্জৎ দিতে অভ্যস্ত দস্তুরমতন। সাংসারিক জীবন-যাত্রার জন্য বিজ্ঞান-দর্শনের কর্মকাণ্ড চোপর দিনরাত জরুরি। কর্মকৌশলের আলোচনা ছাড়া মানুষ এক মুহূর্তও তিষ্ঠিতে পারে না। অধিকন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের ঐতিহাসিক আলোচনার ফলে দেশের অতীতটা পাকড়াও করা সম্ভব। তাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ও জাতি নিজ নিজ শক্তি-কেন্দ্রগুলা, বিশেষত্বগুলা, উৎকর্ষের ঠাঁইগুলা শক্তমুঠায় ধরতে পারে। সঙ্গে-সঙ্গে দোষ বা অসম্পূর্ণতাগুলা সম্বন্ধেও ওয়াকিব-হাল হ'তে পারে। দেশোন্নতি, বিদ্যান্নতি, আর্থিক উন্নতি, আত্মোন্নতি, সকল প্রকার উন্নতির কাজেই ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা যারপরনাই আবশ্যক। এজন্য জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড দুয়ের উপরই জোর দেওয়া উচিত।

কিন্তু বিগত সাঁইত্রিশ বৎসরের ভেতর খাঁটি তত্ত্ব-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভারতীয় সুধীরা নেহাৎ কম মাথা খেলিয়েছে। এ জন্যই তত্ত্বের জন্য আজ ১৯৪২ সনে দরদ আমার এত বেশী। কিন্তু যদি তত্ত্বের দিকে "অত্যধিক" নজর যেতো, তা' হ'লে আমি হয় ত' ঐতিহাসিক গবেষণা ও কর্মকাণ্ডের জন্য দরদী হয়ে পড়্‌তাম। মতলব আমার সর্বদাই দেশের অভাব মোচন। আমাদের অসম্পূর্ণতা আর দুর্বলতাগুলা সম্বন্ধে বকাবকি করা আমার অন্যতম বাতিক।

লেখক—তত্ত্বের দিকে নজর গেলে আলোচনার আকার-প্রকার কিরূপ বদ্‌লাবে? কোন্-কোন্ লক্ষণ দেখ্‌লে আপনি বল্‌তে রাজি হবেন যে, ভারতীয় পণ্ডিতেরা দার্শনিক তত্ত্বের কোঠে লেগে গেছে?

সরকার—বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্বের আসল কথা পারিভাষিক শব্দ। দেশী-বিদেশী নয়া-পুরাণা পারিভাষিক শব্দের রেওয়াজ ক'মে আসবে। তার বদলে আমাদের লেখকেরা নতুন-নতুন পারিভাষিক শব্দ গ'ড়ে তুল্‌তে থাক্‌বে। কি চিত্তবিজ্ঞান, কি তর্কবিজ্ঞান, কি অধ্যাত্মবিজ্ঞান, কি সমাজ-ধন-রাষ্ট্র-বিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানই পারিভাষিক শব্দের মাম্‌লা।

তত্ত্বনিষ্ঠ হ'তে থাক্‌লে ভারতীয় সুধীরা প্রথমতঃ মুক্তি পাবে উপনিষদ-বেদান্ত-গীতা আর কৌটিল্য-মনু-শুক্রের পারিভাষিক ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ; দ্বিতীয়তঃ মুক্তি পাবে কাণ্ট-বেন্‌থাম্-হেগেল আর মিল-মার্ক্স-ব্যর্গসঁর পারিভাষিক ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে নয়া পারিভাষিক শব্দ না গ'ড়্‌লেও চল্‌তে পারে। পুরাণা পারিভাষিক শব্দ সমূহও নয়া অর্থে চালালে নতুন পারিভাষিক সৃষ্টির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। অতএব উপনিষদ আর প্লেটো হ'তে ফ্রয়েড ও লেলিন পর্যন্ত চিন্তাধারার রেওয়াজ ষোল আনা বন্ধ হতে পারে না। এসব পুরাণা পারিভাষিকের দস্তুল ও আকার-প্রকার কিছু-না-কিছু থেকে যেতে বাধ্য।

লেখক—পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার রাজ্যে ভারতীয় গবেষণাসমূহের মূল্য কিরূপ?

সরকার—বর্তমান ভারতে পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, আকর-তত্ত্ব, জলবায়ু-তত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার ক্ষেত্রে তত্ত্বের কাজ বোধ হয় খানিকটা হচ্ছে। মনে হচ্ছে—যতটা হয়েছে তর্ক-বিজ্ঞান, চিত্ত-বিজ্ঞান হ'তে সমাজ-বিজ্ঞান পর্যন্ত বিদ্যার ক্ষেত্রে ততটা হয়নি। এই তুলনায় আমার বক্তব্য কিছু স্পষ্টতর হ'তে পারে। তবে পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যা-বিষয়ক গবেষণা সম্বন্ধে আমার মতটা টেঁক্‌সই কি না বল্‌তে পারি না। এই সকল বিদ্যার জহুরীরা গবেষণাব কষ্টি-পাথরে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের কাজকর্ম ঘষ্‌তে আরম্ভ করুন। যুবক ভারতের মাথা পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌বে।

"স্বাধীনতা-রূপী' আমির দার্শনিক কৃষ্ণ ভট্টাচার্য

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২

লেখক—কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের রচনাবলীর পরিমাণ কিরূপ?

সরকার—খুবই কম। এমন কি ব্রজেন শীলের চেয়েও কম এইরূপ ত আমার বিশ্বাস। কৃষ্ণবাবুর কাণ্ট-বিষয়ক বক্তৃতাগুলাও আজ পর্যন্ত ছাপার হরপে দেখিনি।

লেখক—স্বদেশী যুগের বেদান্ত-বিষয়ক রচনার (১৯০৯) পর কৃষ্ণবাবুর আর কোনো রচনা বেরোয় নি কি?

সরকার—সেইটাই বা কয়জনে দেখেছে? যাহ'ক এ যুগে ১৯৩০ সনে তাঁর একটা বই প্রকাশিত হয়েছে। এইটেই আজ পর্যন্ত তাঁর একমাত্র "বই"। বোম্বাই প্রদেশের আমাল্‌নের শহরে একটা ভারতীয় দর্শন-পরিষৎ আছে। সেই পরিষদের তদবিরে কৃষ্ণবাবুকে কয়েকটা বক্তৃতা দিতে হয় (১৯২৯)। বক্তৃতাগুলা "দি সাব্‌জেক্‌ট অ্যাজ ফ্রীডম্" (স্বাধীনতা-রূপী আমি) নামে বেরিয়েছে।

লেখক—এই বইটা সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ?

সরকার—বইটা খাঁটি দার্শনিক গ্রন্থ। অধিকন্তু এটা অপর কোনো দার্শনিকের মত সম্বন্ধে আলোচনা বা সমালোচনা নয়। "আমি" কী? এই সমস্যার বিশ্লেষণ বক্তৃতাগুলার আলোচ্য বিষয়। "আমি"র স্বাধীনতা আছে কি? থাক্‌লে, কিরূপ স্বাধীনতা আছে? কত রকমের স্বাধীনতা থাকা সম্ভব? স্বাধীনতার ভেতর স্তর-ভেদ করা সম্ভব কি? কোন্ স্তরের স্বাধীনতা কিরূপ? আমির চরম স্বাধীনতার আকার-প্রকার কিরূপ? এই সব প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে বইটার ভেতর। দেখাই যাচ্ছে আলোচনাগুলাকে এক কথায় চিত্ত-বিজ্ঞানের অন্তর্গত কর্‌তে হবে। তবে এই চিত্ত-বিজ্ঞান মামুলি চিত্তবিজ্ঞান নয়।

লেখক—মামুলি চিত্ত-বিজ্ঞানে আর "স্বাধীনতা-রূপী আমি"র চিত্ত-বিজ্ঞানে প্রভেদ কোথায়?

সরকার—মামুলি চিত্ত-বিজ্ঞানে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু, ব্যক্তি বা দুনিয়ার সঙ্গে চিত্তের যোগাযোগ বিশ্লেষণই শেষ কথা। "স্বাধীনতা-রূপী আমি"র চিত্ত-বিজ্ঞানে বস্তুর অতীত, ব্যক্তির অতীত, দুনিয়ার অতীত অতীন্দ্রিয় চিত্তের বিশ্লেষণ একমাত্র কথা। বস্তু-নিরপেক্ষ স্বাধীনতা এই চিত্ত-বিজ্ঞানের আলোচ্য। ইহার হদিশ বা নির্দেশ পাওয়া যায় বেদান্তে। কৃষ্ণবাবু বেদান্তের পথে চ'লেছেন,—কিন্তু একদম স্বাধীনভাবে। বৈদান্তিক পরিভাষার এমন কি এক কাঁচ্চাও তিনি কাজে লাগিয়েছেন কিনা সন্দেহ। তাঁর মস্তিষ্কের স্বাধীনতা বিশেষ লক্ষ্য করার বস্তু। এই বইটাকে আমি স্বাধীন দর্শনের দৃষ্টান্ত স্বরূপ চালাতে পারি। ১৯৩০ সনে,—এমন কি আজ ১৯৪২ সন পর্যন্ত,—এই দরের স্বাধীন দর্শন আর কোনো ভারতীয় দর্শন-গবেষকের হাতে দেখা দেয়নি।

লেখক—এই বইটার নাম বেশী লোকে জানে কি?

সরকার—বল্‌তে পারি না। বোধ হয় না। না জান্‌বারই কথা। বইটা কঠিন। তার উপর ছোট। ছোট হওয়াতে আরও কঠিন। কেতাব মাত্র দু-শ' পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এটা চার-শ' পৃষ্ঠার মাল। প্রত্যেক লাইনকে ফলিয়ে একটা প্যারা করা উচিত। তা হ'লে পাঠকদের পক্ষে জিনিষটা সুখবোধ্য হ'তে পারে।

লেখক—ইংরেজি রচনাকৌশলে জটিলতা আছে কি?

সরকার—না। সেদিকে দোষ নেই। বাক্যগুলা সরল, শব্দগুলা সোজা। বস্তুটাই কঠিন। অনেকগুলা কথা না বল্‌লে এক-একটা দফা সরল করা সম্ভব নয়। কৃষ্ণবাবু সূত্রাকারে লিখ্‌তে অভ্যস্ত। সূত্রগুলার ভাষ্য, ব্যাখ্যা ইত্যাদি নির্গলিতার্থ ও তাঁরই লেখা উচিত ছিল। মাঝে-মাঝে দৃষ্টান্তের সাহায্য পেলে পাঠকেরা জিনিষটা ধরতে পারতো। মার্কিণ দার্শনিক ডুয়ী ও হকিং অথবা ইংরেজ দার্শনিক ব্রাড্‌লে, রীড্‌, আলেকজাণ্ডার ইত্যাদি লেখকেরা বেশ খোল্‌তাই ক'রে লিখে থাকেন। এই সকল দুরূহ চিজ্‌রে ভাই। দুর্বোধ্যতা কমাবার একমাত্র উপায়ই হ'চ্ছে খোলতাই ক'রে ব'কে যাওয়া।

লেখক—"স্বাধীনতা-রূপী আমি"র দর্শনের সঙ্গে কোনো পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনা করা চলে?

সরকার—কৃষ্ণ ভট্টাচার্য এই বইটাতে কান্ট-প্রণীত "ক্রিটিক্ অব পিওর রীজন্" গ্রন্থের অসম্পূর্ণতা দেখিয়েছেন। কান্ট (১৭২৪-১৮০৪) বিশ্বের চরম সত্যকে, বস্তুর বস্তুত্বকে মানুষের পক্ষে অজ্ঞেয় ব'লে "স্বীকার" ক'রে নিয়েছেন। এই গ্রন্থে কান্ট কট্টর বস্তু-নিষ্ঠ। কৃষ্ণবাবুর বিশ্লেষণে-রূপী আমির চরম স্বাধীনতাও অজ্ঞেয় নয়। কান্ট-মতে আত্ম-জ্ঞান অসম্ভব। কৃষ্ণবাবু বস্তু-নিষ্ঠায় সায় দিতে প্রস্তুত নন। কান্ট-প্রচারক ও কান্ট-ভক্ত কৃষ্ণ

ভট্টাচার্য এই বইয়ে সোজাসুজি কাণ্ট-বিরোধী। কাণ্টের আসল কথাটার বিরুদ্ধেই কৃষ্ণবাবু কলম ধ'রেছেন। কাজেই বইটা ট্রামে চল্‌তে-চল্‌তে চুম্‌ড়ে' নেবার মতন জিনিষ নয়। এম্‌-এ ক্লাসে যারা দর্শন পড়ে তাদের পক্ষেও মেহনৎ ক'রে পড়ার দরকার। কৃষ্ণ ভট্টাচার্য-প্রদর্শিত পথ কয়েকজন ২৫-৩৫ বৎসরের "ছোক্‌রা" দর্শন-গবেষক লেখাপড়া সুরু কর্‌লে বেশ-একটা বড়-গোছের দর্শন দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

("কাণ্ট ও অরবিন্দ", ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪২, 'কাণ্ট ও হেগেল", ১২ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য।

লেখক—বইটাতে বেদান্তের পথ অনুসৃত হয়েছে বল্‌ছেন। তা হ'লে ত ভারতীয় পাঠকগণের কাছে এটা বেশ-লোকপ্রিয় হবার কথা।

সরকার—ভায়া, ঘটনা-চক্রে তা হবার সম্ভাবনা নেই। কেন না কৃষ্ণবাবুর আলোচনায় না আছে ব্রহ্ম, না আছে ভগবান, না আছে মোক্ষ, না আছে যোগ, না আছে সাধনা, না আছে সামীপ্য-সাযুজ্য ইত্যাদি চিজ, না আছে ভগবানর সঙ্গে এক হ'য়ে যাওয়া। ভারতে আমাদের গৃহস্থ, ফকীর, পণ্ডিত, সাংবাদিক্‌ সকলে চায় ঐ ধরণের মাল। কৃষ্ণবাবু দিয়েছেন শুধু বস্তু-বর্জিত আমির স্বাধীনতা। কাণ্ট-ফিখ্‌টে-হেগেলের বই পড়্‌তে হ'লে কতটা গলদ্‌ঘর্ম হ'তে হয় জানিসই ত? এই বইয়ের ভেতরটা কামড়াতে গেলেও চাই ঠিক সেই রকম কাঠ-খড় আর কোস্তাকুস্তি। লাগাতে হবে ঠিক যেন এক-এক পৃষ্ঠায় প্রায় এক এক ঘণ্টা। তার পরেও ভগবদ্দর্শনও জুট্‌বে না, আর না জুট্‌বে ব্রহ্মে লয়-প্রাপ্তি। কিন্তু এই ধরণের জ্ঞান-যোগেই সুরু হবে নব্য ভারতে স্বাধীন দর্শন।

("দার্শনিক বনাম দর্শনের ঐতিহাসিক", ২৭শে আগষ্ট, "বর্তমান ভারতে দর্শনের সূত্রপাত হ'য়েছে কি?" ৩০শে আগষ্ট, "কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বেদান্ত-ব্যাখ্যা", ২৪শে সেপ্টেম্বর, "স্বাধীন দর্শন," ২৮শে অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

অক্টোবর ১৯৪২

"ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু"

৪ঠা অক্টোবর ১৯৪২

লেখক—আপনি "ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু" ও দর্শনের আলোচ্য বিষয় বা সিদ্ধান্তের ভেতর ফেল্‌ছেন কেন?

সরকার—তার কারণ, সংসারের সব-কিছুই এক হিসাবে "ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু"। জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে এমন কোনো সিদ্ধান্ত নাই যার বিল্‌কুল্‌ উল্টা পক্ষ পাওয়া যায় না। প্রত্যেক নরনারীর পক্ষে কিছু-না-কিছু "ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু" আছেই-আছে। আবার প্রত্যেক লোকের মহাসত্যও কোনো-না-কোনো লোকের চিন্তায় "ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু" ছাড়া আর-কিছু নয়।

লেখক—আপনি দুএকটা দৃষ্টান্ত বুঝিয়ে দেবেন?

সরকার—হেগেল-দর্শন মার্ক্সের চিন্তায় ছাই-ভস্ম মাথা-মুণ্ডু, আবার হেগেল-পন্থীদের মেজাজে মার্ক্স-দর্শন আগাগোড়া "ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু"। কঁৎ-দর্শনের বিচারে ক্যাথলিক

দর্শন ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু”—ক্যাথলিক জগতে কঁৎ-দর্শন ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু। ভারতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্র-দর্শন চার্চিল-এমেরী এবং অধিকাংশ বিলাতী ও ভারতীয় ইংরেজের চিন্তায় ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু। আবার ভারতীয় কংগ্রেসের চিন্তায় ব্রিটিশ জাতির প্রায় সব নরনারীর রাষ্ট্র-দর্শনই ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু। যন্ত্রনিষ্ঠার চাঁইয়েরা গান্ধীর চর্‌কা-দর্শনকে ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত ; চর্‌কা-দার্শনিকেরা যন্ত্র-দর্শনকে সম্‌ঝে ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু। প্রত্যেকেই অপর পক্ষকে ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডুর দার্শনিক বলে।

লেখক—এই সকল দার্শনিক সত্যাসত্য সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—আমি মুখ্‌খু মানুষ। আমার বিবেচনায় দুই পক্ষই দার্শনিক। দুয়ের মতই দর্শন—দুই-ই আসল দর্শন। উভয়েই মহা-সত্য। তবে প্রত্যেক মহাসত্যই ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের মহাসত্য। এসব সত্য আবার উল্টা পক্ষের চিন্তায় বুজরুকি মাত্র। অতএব প্রকারান্তরে দুনিয়ার সব-ক'টা দর্শনই একসঙ্গে বুজরুকি বা ছাই-ভস্ম-মাথা-মুণ্ডু। এতে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। আবার একটা “গরুমি” ঝেড়ে দিলাম!

(“দর্শনের কষ্টি-পাথর”, ৩০শে আগষ্ট, “আত্মা, পরমাত্মা, ভগবান”, ৪ঠা নবেম্বর, “সাধনা কী চিজ?” ১২ই ডিসেম্বর (১৯৪২) দ্রষ্টব্য)

হেগেল-সাধক হীরালাল হালদার

লেখক—আপনি দু'একবার দার্শনিক হীরালাল হালদারের নাম ক'রেছেন। তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলুন না?

সরকার—হীলালাল হালদারের দর্শন-গবেষণার কয়েকটা বিশেষত্ব আছে। কিন্তু, বোধ হয়, আমাদের লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা অতটা সন্ধান রাখে না।

লেখক—কী তাঁর বিশেষত্ব?

সরকার—আমার বিশ্বাস, হীরালালবাবু (১৮৬৲-১৯৪২) একালের ভারতীয় দর্শন-লেখকদের সর্বপ্রথম পণ্ডিত যাঁর রচনাবলী পাশ্চাত্য সুধী-পরিষদের পত্রিকায় বেরিয়েছে। সেই বিবেকানন্দ-যুগের (১৮৯৩-১৯০২) কথা মনে পড়ছে। বয়সে ব্রজেন শীল (১৯৬৪-১৯৩৮) আর হীরালাল হালদার বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) কাছাকাছি। দু'চার বছরের বেশী ফারাক্ নয়। ১৮৯৪ সনে মার্কিণ মুল্লুকের “ফিলজফিক্যাল রিভিউ” নামক দার্শনিক পত্রিকায় হালদারের একটা লেখা ছাপা হয় ; তার দু'বছরের ভেতর সেই পত্রিকায় বেরিয়েছিল তাঁর আর একটা রচনা। প্রথমটা ছিল “হেগেলপন্থী ইংরেজ দার্শনিক গ্রীণের সমালোচকদের সমালোচনা।” দ্বিতীয় প্রবন্ধের বিষয়-বস্তু ছিল “হেগেল-দর্শনের যৎকিঞ্চিৎ।”

লেখক—হালদারের পূর্বে কি ব্রজেন শীলের কোনো লেখা বিদেশে ছাপা হয়নি?

সরকার—আমার যতদূর মনে পড়ছে, শীলের কোনো লেখা ১৮৯৯ সনের পূর্বে বিদেশে ছাপা হয়নি। সে বৎসর ইতালীর রোম শহরে অনুষ্ঠিত হয় প্রাচ্য-বিদ্যার আন্তর্জাতিক কংগ্রেস। সে কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য তিনি লেখেন বৈষ্ণব ও খৃষ্টিয়ান ধর্ম বিষয়ক প্রত্নতাত্ত্বিক এবং দার্শনিক প্রবন্ধ। সে বৎসরই হালদারের আর একটা লেখা বের হয় মার্কিণ “ফিলজফিক্যাল রিভিউ”তে। আলোচ্য বিষয়—“অ্যাব্‌সলিউট”, নিরপেক্ষ, অদ্বৈত, ব্রহ্ম, সনাতন, চরমসত্য কাকে বলে? এ আলোচনায় ছিল ভাবনিষ্ঠ হেগেলদর্শন আর হেগেলপন্থী

ইংরেজ ব্রাড্‌লে এবং মার্কিণ রয়েস্ ইত্যাদি দার্শনিকদের ভাবনিষ্ঠার ব্যাখ্যা ও সমালোচনা। হেগেল-প্রবর্তিত অদ্বৈত, নিরপেক্ষ বা চরম সত্য ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তির স্বাধীনতা অস্বীকার করে না,—এই মত প্রতিষ্ঠা করা হালদারের উদ্দেশ্য ছিল।

লেখক—হালদারের দর্শন-গবেষণায় আর কোনো বিশেষত্ব আছে?

সরকার—একটা বড় বিশেষত্বের কথা বল্‌ব। ভারতীয় দর্শন লেখকদের ভেতর হীরালাল হালদার মোটের উপর প্রায় একঘ'রে। ইহা তাঁহার চরম-বিশেষত্ব। মনে রাখ্‌বি যে, আমাদের দেশী দর্শন-গবেষকেরা ১৯০৫-এর পূর্ববর্তী যুগে ভারতীয় দর্শনের তর্জমা, ভাষ্য আর ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোনোদিকে নজর একপ্রকার দিতেন-ই না। ১৯০৫-এর পরবর্তী যুগেও, এমন কি আজ পর্যন্তও, সে ধারাই প্রায় বজায় আছে। একথা অনেকবার ব'লেছি। দর্শন-চর্চা বল্‌লে ইস্কুল-কলেজের লেখাপড়া, পরীক্ষায় পাশ কার ইত্যাদি বুঝ্‌তে হবে না। বল্‌ছি দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করা, প্রবন্ধ লেখা, বই লেখা ও বইয়ের সমালোচনা করা ইত্যাদি সর্বদা মনে রাখ্‌বি, লেখক ছাড়া কাউকেই আমি পণ্ডিত, দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বল্‌ছি না। হীরালাল হালদার এই হিসাবে ভারতের একদম সৃষ্টিছাড়া লোক।

লেখক—হীরালাল হালদারকে আপনি একঘ'রে ক'রেছেন কিসের জোরে?

সরকার—সেই ১৮৯৪ হইতে আজ ১৯৪২ সনে মৃত্যু পর্যন্ত হালদার পাশ্চাত্য-দর্শনের সেবক। এ একটা মস্ত বিশেষত্ব। তাঁর দর্শন সেবায় ভারতীয় দর্শনের গন্ধমাত্রও পাওয়া যায় না। এ আর এক মস্ত বিশেষত্ব। ১৯৩৬ সনে রাধাকৃষ্ণন ও মুইয়রহেড কর্তৃক সম্পাদিত "কণ্টেম্পোরারি ইণ্ডিয়ান ফিলজফি" (সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন) বইয়ে হীরালাল হালদারের এক প্রবন্ধ আছে। তাতে ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে কিছু-কিছু মোলাকাৎ হয়। এইটুকু বল্‌তে বাধ্য। যাক্। পাশ্চাত্য-দর্শনের আবার প্রাচীন আর মধ্যযুগ তাঁর গবেষণায় ঠাঁই পায়নি। একমাত্র আধুনিক দর্শন তাঁর লেখালেখির বিষয়-বস্তু। এও একটা উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। অধিকন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য-দর্শনেরও মাত্র একটি ধারা তাঁর মেজাজে প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। অন্যান্য সকল প্রকার ধারা বয়কট ক'রে তিনি একমাত্র "আইডিয়্যালিজম্" বা ভাব-নিষ্ঠা নিয়ে আজীবন লেখাপড়া ক'রেছেন। এ বিশেষত্বটা যারপরনাই চিত্তাকর্ষক। আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবনিষ্ঠার ভেতর একাধিক মত ও পথ আছে। কিন্তু হালদার "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য হেগেলমেকং শরণং ব্রজ"—পাঁতি অনুসারে দর্শন-চর্চা ক'রেছেন। দুনিয়ার অন্যতম একনিষ্ঠ হেগেল-ব্যাখ্যাকার, হেগেল-প্রচারক ও হেগেল-সাধক আমাদের হীরালাল হালদার। এ কথাটা সজোরে প্রচার করা যেতে পারে।

ভারতে জার্মাণ ভাষা

লেখক—হেগেল ত জার্মাণ। হালদার কি জার্মাণ ভাষা জান্‌তেন?

সরকার—বোধ হয় না। তাঁর লেখালেখির ভেতর জার্মাণ জানার কোন চিহ্নোৎ দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। তাঁর সেকাল-একাল সকল কালের লেখা সম্বন্ধেই এ-রকম আমার ধারণা। এমন কি হেগেল (১৭৭০-১৮৩১),—কচিৎ কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪),—এ দুজন ছাড়া অন্য কোনো জার্মাণ দার্শনিকের নামও বোধ হয় তাঁর রচনায় নেই। বস্তুতঃ আমাদের দর্শন-গবেষক ও দর্শন-লেখকদের ভেতর বিবেকানন্দ-যুগে (১৮৯৩-১৯০২) জার্মাণ-জান্তা

কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ।

(পৃষ্ঠা ৭১, "লিস্ট্, মাইনেকে, হাউসহোফার, ফোন ভীজে", ১২ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য।)

লেখক—ভারতীয় দর্শন-গবেষকেরা জার্মাণ ভাষা শিখ্‌তে সুরু ক'রেছেন কবে?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) বোধ হয় ভারতীয় দর্শন-সেবকেরা জর্মাণে হাতে খড়ি দিতে সুরু করে। আমার বন্ধু নিখিল মৈত্রের ভাই শিশিরকে বাঙালী দর্শন-গবেষকদের সর্বপ্রথম বা অন্যতম প্রথম জার্মাণ-জান্তা পণ্ডিত বল্‌তে পারি। তাঁর জার্মাণ চর্চা আজও বজায় আছে। সুইস্ পণ্ডিত স্টাইন্-প্রণীত আধুনিক দর্শনের ধারা বিষয়ক জার্মাণ বইয়ের ইংরেজি তর্জমা তাঁর হাতে বেরিয়েছে (১৯২৪-২৮)। শিশির মৈত্র স্বাধীনভাবে ফরাসী পণ্ডিত ব্যর্গ্‌সঁ ইত্যাদি আধুনিক দার্শনিকদের জরিপ কর্‌তেও অভ্যস্ত। বছর দেড়-দুয়েক হ'লো "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকায় তাঁর লেখা অরবিন্দ-দর্শনের ব্যাখ্যা দেখেছি। বেশ পরিষ্কার সোজা কথায় বোঝানো আছে। শিশির মৈত্র হীরালাল হালদারের মতন বর্তমান-নিষ্ঠ আর পাশ্চাত্য-নিষ্ঠ দর্শন-সেবক। এ পথে অনেক ভারত-সন্তানের অগ্রসর হওয়া উচিত। শিশির মৈত্র কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

হীরালাল হালদারের একাল-সেকাল

লেখক—স্বদেশী যুগে ও পরবর্তীকালে হীরালাল হালদারের রচনাবলী কিরূপ?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে ব্রজেন শীলের সঙ্গে হীরালাল হালদারের তর্ক-বিতর্ক চল্‌তো দেখেছি। ব্যক্তি, আত্মা, অমরতা, হেগেল-দর্শন ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দে শীলের বৈঠকখানা গুলজার হ'তো। এ সময় হালদারের "হেগেলিয়ানিজম্ অ্যাণ্ড হিউম্যান প্যারসোন্যালিটি" (হেগেল-দর্শন ও মানবের ব্যক্তিত্ব) কল্‌কাতায় ছাপা হয় (১৯১০)। তখনকার দিনে ব্রজেন শীল লণ্ডনে অনুষ্ঠিত সর্বজাতি-সম্মেলনেব অন্যতম সভাপতিরূপে একটা রচনা পাঠ করেন (১৯১১)। জাতি কাকে বলে, জাতির রূপান্তর ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ছিল। প্রবন্ধটা নৃতত্ত্বের অন্তর্গত।

চীন জাপান হ'তে ফিরে ১৯১৬-২০ সনে আমি দ্বিতীয়বার মার্কিণ মুল্লুকে মোসাফিরি করি। সে সময় "ফিলজফিক্যাল রিভিউ" পত্রিকায় হীরালাল হালদারের হেগেল-দর্শনের "অ্যাব্‌সলিউট" বা অদ্বৈত ইত্যাদি বিষয়ক আর একটা প্রবন্ধ নজরে পড়ে। সে প্রবন্ধের কথা কলিকাতা হ'তে প্রকাশিত "কলেজিয়ান" নামক পাক্ষিক পত্রিকায় আমি উল্লেখ ক'রেছিলাম মনে পড়ছে।

লেখক—আপনি তো ঐ সময়ে আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমন্ত্রিত হ'য়ে বক্তৃতা কর্‌ছিলেন শুনেছি? আপনার কোনো প্রবন্ধ মার্কিণ পত্রিকায় বেরিয়েছে?

সরকার—তখনকার দিনে মার্কিণ সুধী-পরিষদের নানা পত্রিকায় আমার কতকগুলা প্রবন্ধ বের হ'য়েছিল। সে সব "পোলিটিক্যাল ইন্‌স্‌টিটিউশান্‌স অ্যান্ড থিয়োরীজ অব্ দি হিন্দুজ্" (হিন্দু জাতির রাষ্ট্র-শাসন ও রাষ্ট্র-দর্শন) এবং "সোসিওলজি অব্ রেসেজ, কালচার্‌স্, অ্যাণ্ড হিউম্যান প্রোগ্রেস্" (জাতি, সংস্কৃতি ও মানবোন্নতির সমাজশাস্ত্র) বই দুইটায় পাওয়া যায় (বার্লিন ১৯২২)।

লেখক—বিগত বিশ বৎসরের হালদার-রচনাবলী সম্বন্ধে কিছু জানেন?

সরকার—এই বিশ-বাইশ বছরকে হালদারের পক্ষে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ" বল্‌তে পারি। তাঁর "এসেজ্ ইন্ ফিলজফি" বইটা প্রকাশ হয়েছে, ১৯২০ সনে (কলিকাতা)। এই বইয়ের মুদ্দা মোটের উপর হেগেল-দর্শন। সাধারণ পাঠকেরা, বোধ হয়, এ বইয়ের টিকি দেখে নি। তাঁর সুপরিচিত বইয়ের নাম "নেও-হেগেলিয়ানিজ্‌ম্" (লণ্ডন, ১৯২৭)। যারা বইয়ের ভেতরটা দেখেনি, তারা নাম শুনে মনে কর্‌বে,—বুঝিবা এর ভেতর হেগেলের জার্মাণ শিষ্য ও প্রশিষ্যদের মতামত আলোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ বলা যেতে পারে যে, এর ভিতর এক হেগেল (আর কিঞ্চিৎ কিছু কাণ্ট) ছাড়া জার্মাণ দর্শনেব 'জ' পর্যন্ত আছে কিনা সন্দেহ।

অদ্বৈত-নিষ্ঠায় ইংরেজ দার্শনিকগণ

লেখক—তবে আছে কী?

সরকার—বইটা ইংরেজ দার্শনিকদের গ্রন্থাবলীর সার ও সমালোচনা। "ব্রিটিশ আইডিয়্যালিজ্‌ম্" (ইংবেজ দার্শনিকদের অদ্বৈতনিষ্ঠা) রূপে নামকরণ হ'লে পাঠকেরা সহজে এর আলোচ্য বিষয়টা ধর্‌তে পার্‌তো। এর ভেতর আছে ১৫।১৬ জন ইংরেজ হেগেল-সাধকের রচনাবলীর সংক্ষিপ্ত সার। মাঝে-মাঝে তুলনায় সমালোচনাও আছে। বিগত ৬০।৭০ বৎসরের ইংরেজ দার্শনিকতার ইতিহাস হিসাবে বইটাকে আমি বেশ পছন্দ করি। বলা বাহুল্য, দার্শনিকতার সকল বিভাগ এতে নেই। আছে মাত্র ভাবনিষ্ঠা, নিরপেক্ষতা, অদ্বৈত-সিদ্ধি ইত্যাদির পরিচয়। স্টার্‌লিং, গ্রীণ, কেয়ার্ড-দাদাভায়েরা, ব্র্যাড্‌লে, বোসাঙ্কে, ম্যাক্-টাগার্ট ইত্যাদি নামজাদা দার্শনিকদের সম্বন্ধে জীবন-বৃত্তান্তমূলক ছোটবড়-মাঝারি প্রবন্ধ এ বইয়ের মাল।

লেখক—তবে "নেও-হেগেলিয়ানিজ্‌ম্" গ্রন্থের উপকারিতা কি?

সরকার—আমি বইটাকে যারপরনাই মূল্যবান বিবেচনা করি। এর ভেতর পাশ্চাত্য-সংস্কৃতির আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম অংশ ভারতবাসীর সম্মুখে জ্বল্‌জ্বল্ কর্‌ছে। ভারত-সন্তানেরা আধুনিক পাশ্চাত্য-সাহিত্যের ইতিহাস. পাশ্চাত্য সঙ্গীত ও সুকুমার শিল্পের ইতিহাস, পাশ্চাত্য অর্থ-সমাজ-রাষ্ট্রের ইতিহাস ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা কর্‌লে আমাদের বিস্তর লাভ হয় না কি? এইরূপ অন্ততঃ আমার বিশ্বাস। অন্যের কথা বল্‌তে পারি না। হীরালাল হালদারের বইয়ে সে ধরণের লাভ হয়েছে।

লেখক—হালদারের বইয়ে আর কোনো উপকার হয়েছে?

সরকার—আর একটা বড় কথা জেনে রাখা ভাল। পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদীরা ধর্ম, ভগবান, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি নিয়ে মাথা ঘামায় বিস্তর। ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য নরনারী সম্বন্ধে আমাদের ভুল ধারণা আছে। আমার অনেক লেখায় এ ভুল ধারণা শুধ্‌রাবার চেষ্টা ক'রেছি। সাধারণতঃ আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভারত-সন্তানেরা (বিশেষতঃ প্রাচীনকালের ভারত-সন্তানেরা) আধ্যাত্মিকতার আলোচনায় এক-চেটিয়া ওস্তাদ। এটা মস্ত ভুল। উচ্চতম শ্রেণীর ইয়োরামেরিকান দর্শনের আখ্‌ড়ায়ও অধ্যাত্মচিন্তা, পরমেশ্বর-গবেষণা ইত্যাদি বিষয় অতি-প্রচলিত। এই বিষয়ে ভারতীয় সুধীগণের সচেতন থাকা বাঞ্ছনীয়। হালদারের বই যে-কোনো ভারত-সন্তানকে এ-সম্বন্ধে চোখে আঙুল দিয়ে শিখিয়ে দিতে পাবে।

"গুরু-দক্ষিণা"

লেখক—"নেও-হেগেলিয়ানিজম্" বইটা সম্বন্ধে আর কিছু বল্‌তে চান?

সরকার—আমার কাছে আর একটা তথ্য মূল্যবান মনে হয়েছে। হেগেল-কান্টের ইংরেজ শিষ্যদের ভেতর যে-ক'জন 'বাঘা-বাঘা' পণ্ডিত হালদারের গুরু ও গুরুভাই, তাঁদের অনেকগুলাকে তিনি ভারতীয় নরনারীর কাছে পরিচিত ক'রে দিয়েছেন। এজন্য তাঁকে ৬০।৭০ খানা ইংরেজি বইয়ের সার সংকলন ও ভাষ্য প্রচার কর্‌তে হয়েছে। স্বাধীনভাবে সমালোচনাও অল্প-বিস্তর চালাতে হয়েছে।

কাজটাকে আমি "গুরু-দক্ষিণা"র সামিল বিবেচনা করি। হালদারের পথে গুরুদক্ষিণা প্রদানের ব্যবস্থা করা দুনিয়ার প্রত্যেক বিজ্ঞান সেবক, দর্শনসেবক, সাহিত্যসাধক ইত্যাদি সুধীজনের কর্তব্য। যে-গবেষক যে-বিদ্যার সেবক, তার পক্ষে সে-বিদ্যার নাম-জাদা ধুরন্ধর ও প্রতিনিধি সম্বন্ধে কতকগুলা ছোট-বড়-মাঝারি প্রবন্ধ রচনা করার আগ্রহ থাকা উচিত।

লেখক—আপনি এ ধরণের গুরু-দক্ষিণা প্রকাশ ক'রেছেন কি?

সরকার—অল্পবিস্তর ক'রেছি বোধ হয়। নানা বই উৎসর্গ ক'রেছি বিভিন্ন চিন্তাবীরের নামে। তা ছাড়া বহুসংখ্যক মনীষীকে আমার রচনাবলীর ভেতর এখানেও-ওখানে বীররূপে পূজা কর্‌বার সুযোগ পেয়েছি। অধিকন্তু দুখানা সম্পূর্ণ বইয়ের নাম কর্‌তেও পারি। "একালের ধন-দৌলত ও অর্থশাস্ত্র" বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৩৫) দেশী-বিদেশী অর্থশাস্ত্রীদের সম্বন্ধে গুরুদক্ষিণার পরিচয় পাওয়া যায়। আর দুনিয়ার এবং সংগে-সংগে ভারতের রাষ্ট্রশাস্ত্রীদের মতামত আলোচিত হয়েছে "পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ্ সিন্‌স্ ১৯০৫" (১৯০৫-এর পরবর্তী রাষ্ট্রদর্শন) বইয়ের চার খণ্ডে (১৯২৮ এবং ১৯৪২)। তবে আমার গুরুদক্ষিণায় হালদারের মতন কোনো নির্দিষ্ট মত-পথের পণ্ডিতদেরকে ধূপ-ধুনা দিবার ব্যবস্থা হ'তে পারেনি। সকল প্রকার মত-পথই আমার চৌবাচ্চায় ঠাঁই পেয়েছে। অধিকন্তু এই সকল অর্থশাস্ত্রী ও রাষ্ট্রশাস্ত্রীদের সবাই আমার গুরু-স্থানীয় বা গুরুভাই-স্থানীয় নয়। এই দুই বইয়ে আমার স্বাধীন মতামতও আছে নানা স্থানে।

পাশ্চাত্য-নিষ্ঠার আবশ্যকতা

লেখক—দার্শনিক হিসাবে হীরালাল হালদার দেশে সুপরিচিত নন কেন?

সরকার—এ সম্বন্ধে আগে কখনো ভাবিনি। জবাব দেওয়াও কঠিন। বোধ হচ্ছে,—কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের মতন হালদারও অ-মিশুক লোক। বোধ হয়, একটা গভীরতর কারণও আছে। হালদারের রচনাবলীতে উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতা ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যের ছিটে-ফোঁটাও একপ্রকার পাওয়া যায় না (পৃঃ ৮৮)। ভারতবর্ষে আজও জনগণের,—মায় পণ্ডিতমহলেও,—ধারণা অতি বিচিত্র। যে-লোকটা প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের তর্জমা, সার বা ইতিহাস লেখে না, সে-লোকটা দর্শন-জান্তা নয়। এই হচ্ছে ভারতীয় জনগণের মেজাজ। অধিকন্তু পাশ্চাত্য দুনিয়ার দর্শনচর্চা হ'য়ে থাকে—এরূপ বিশ্বাস বোধ হয় ভারতীয় আবহাওয়ায় বেশ-কিছু প্রচলিত নয়। কাজেই পুরাপুরি বর্তমান-নিষ্ঠ আর পাশ্চাত্য-নিষ্ঠ দর্শনসেবক হিসাবে হীরালাল হালদারের পক্ষে প্রধানতঃ প্রাচীননিষ্ঠ আর ভারতনিষ্ঠ ভারতীয়

সমাজে কল্কে পাওয়া কঠিন।

লেখক—বিদেশী (পাশ্চাত্য) দর্শন-চর্চা আপনি ভারতবাসীর জন্য পছন্দ করেন?

সরকার—ভায়া, আমি মুখ্খু মানুষ। তবে সাড়ে ষোল-আনা ভারত-নিষ্ঠাও বটে, আবার সাড়ে ষোল-আনা দুনিয়া-নিষ্ঠও বটে। অধিকন্তু নবীন-নিষ্ঠায় আমার যতটা দরদ, প্রাচীন-নিষ্ঠায় দরদ তার চেয়ে কম নয়। এই জন্যেই হালদারের বইটা যে-কোন ভারত-সন্তানকে পড়তে অনুরোধ ক'রে থাকি। হালদারে রচনা-কৌশল সুন্দর। কোনো ধোঁআটে ধারণা নেই। সবই পরিষ্কার ও সুবোধ্য।

নানা বিদ্যার ক্ষেত্রে এ ধরণের পাশ্চাত্য-নিষ্ঠ আর বর্তমান-নিষ্ঠ বই ভারতীয় সুধীরা লিখ্‌লে ভারত বাড়্‌তির পথে যেতে বাধ্য। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের তর্জমা-ভাষ্য-ইতিহাস প্রকাশ করা জরুরি। অনেকবার ব'লেছি। আধুনিক পাশ্চাত্য তর্জমা-ভাষ্য-ইতিহাস প্রকাশ করাও আমার মেজাজে সেরূপই জরুরি। তাছাড়া, নিজ পায়ের উপর দাঁড়িয়ে নিজ পারিভাষিক ঝেড়ে নিজ মগজের সাক্ষী স্বরূপ স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র দর্শন দাঁড় করানো তো জরুরি বটেই।

কাণ্ট ও হেগেল

১২ই অক্টোবর ১৯৪২

লেখক—হেগেল আর কাণ্ট ছাড়া দেখ্‌ছি ভারতে দর্শন-চর্চা চল্‌তেই পারে না। ব্যাপার কি? এঁরা এত বড়? এ সম্বন্ধে আপনার মত কী?

সরকার—এ জাঁদ্‌রেল দুটো হাতী-ঘোড়াই বটে,—বর্তমান যুগের "বাঘা-বাঘা" দার্শনিক। একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পরবর্তীকালে জার্মাণ মার্ক্‌স্ (১৮১৮-৮৩) আর রুস লেলিন (১৮৭০-১৯২৪) সমাজশাস্ত্রী হিসাবে অনেকখানি চেঁড়ে উঠেছে—আরও উঠ্‌বে মনে হচ্ছে। এ দুয়ের প্রভাবের বাড়্‌তিটা লক্ষ্য কর্‌লে কাণ্ট-হেগেলের বিপুল ইজ্জৎ ও বিশ্বব্যাপী প্রভাব খানিকটা আন্দাজ করা সম্ভব। অনেকটা আমাদের সংখ্যা ও বেদান্ত আর কি? প্রাচীন ইয়োরোপের প্লেটো ও আরিষ্টটল ধরণেরই জগদ্‌গুরু। তুলনাগুলা কড়ায়-ক্রান্তিতে চালাচ্ছি না।

("কাণ্ট ও অরবিন্দ", ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪২, "স্বাধীনতা-রূপী আমির দার্শনিক কৃষ্ণ ভট্টাচার্য", ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—কাণ্ট-হেগেলের মতামত আপনি কতটা গ্রহণ ক'রেছেন?

সরকার—এ দুয়ের মতগুলা অল্পবিস্তর দুনিয়ার সকলেই গিলেছে। তবে ব'লে রাখ্‌ছি, আমি অদ্বৈত-পূজক নই। হীরালাল হালদার, বোধ হয়, বিশিষ্টাদ্বৈত,—আমি তাও নই। সোজাসুজি আমি দ্বৈত—সত্যি কথা বহুত্ব-নিষ্ঠ। কোনো লোকের দাঁত কামড়ালে তাকে বলি দাঁতের দোকানে যেতে। যদি তার কান কামড়ায় তখন তাকে পাঁতি দিই কানের ডাক্তার ডাক্‌তে। আর পেট কামড়ালে বলি কবিরাজী হজ্‌মিগুলি খেতে। কোনো এক দাওয়াই দিয়ে দশ রকমের ব্যারাম সারানো আমার চিকিৎসা-শাস্ত্র জানে না।

("মার্ক্‌স, কঁৎ, হার্ডার", ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

কিন্তু হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) দ্বন্দ্বময় তর্কশাস্ত্র ("ডিয়ালেক্‌টিক") আমার

'পূজ্যস্থান।' এটা চিন্তা-জগতের অন্যতম জবরদস্ত আবিষ্কার। এজন্য হেগেলকে সর্বদাই কুর্ণিশ ক'রে চলি। দ্বন্দ্ব না পেলে আমার চিন্তা একদম অচল। আমার উন্নতি-দর্শনে দ্বন্দ্বের ইজ্জৎ খুব বেশী। হেগেল-প্রবর্তিত দ্বন্দ্বের বাণী, বোধ হয়, প্রথম শুনি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মুখে "ডন্ সোসাইটি"তে (১৯০৪)। তাঁর পারিভাষিকে ডিয়ালেক্‌টিক ছিল "অপবাদ-ন্যায়"।

("ব্রহ্মবান্ধব ও ডন সোসাইটি", ১৮শে নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—হেগেল আর কোন্ বাণীর জন্য বিখ্যাত?

সরকার—হেগেল-দর্শনের অতিপ্রধান পাঁতি স্বাধীনতা। তাঁর বকাবকির ভেতর স্বাধীনতার ঠাঁই সকলের উপরে। সেই স্বাধীনতাই আমারও পয়লা নম্বরের পারিভাষিক। কিন্তু হেগেলের স্বাধীনতায় সংঘ, সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র ইত্যাদি সত্তা অতিমাত্রায় প্রবল। তার চাপে ব্যক্তি অনেক সময়েই—প্রায় সর্বত্র—এমন কি পুরাপুরি নিষ্পেষিত। আমি পরিবার, সংঘ, দল, দেশ, রাষ্ট্র ইত্যাদি বস্তুর একতিয়ার যখন-তখন স্বীকার করতে রাজি নই। সাধারণতঃ সংঘের অধীনতা গোলামির সামিল। আমার স্বাধীনতা-তত্ত্বে ব্যক্তি ষোল-আনা স্বতন্ত্র। ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ক্বচিৎ-কখনো কালে-ভদ্রে খর্ব কর্‌বার স্বপক্ষে রায় দিতে পারি। কিন্তু সেই ক্বচিৎ-কখনো যারপরনাই বিরল। যদি কেউ সপ্রমাণ করতে পারে যে, সত্যসত্যই শত্রুরা দেশ, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি ধ্বংস কর্‌তে ব্রতবদ্ধ, একমাত্র সেই অবস্থায় আমি দেশ, রাষ্ট্র, গভর্ণমেণ্ট, আইন-কানুন ইত্যাদি বস্তুকে ব্যক্তির উপর একতিয়ার কায়েম কর্‌তে দিতে রাজি। এ হিসাবে আমি হেগেলের উল্টা-পক্ষ,—কাণ্ট-মুখো লোক।

ইয়োরোপে গীতার প্রভাব

লেখক—কাণ্ট-দর্শনের দুএকটা বিশেষত্বের কথা বলুন।

সরকার—বুঝ্‌তে হবে,—কাণ্টকে (১৭২৪-১৮০৪) হেগেল হ'তে বিলকুল আলাদা ভেবে থাকি এবং প্রায় ষোল-আনা ফারাক ক'রে নিয়েছি। কাণ্ট আমার বিচারে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যপন্থী স্বাধীনতার দার্শনিক। কাণ্ট-প্রচারিত স্বাধীনতা প্রায় পুরোপুরি সংঘের আওতা থেকে মুক্ত। এখানে বল্‌তে চাই যে, কাণ্টের আর একটা বাণীতে আমার প্রাণের কথা আছে। সে হচ্ছে "কাটেগোরিশেস্ ইম্‌পেরাটিফ্"—অবশ্য-পালনীয় কর্তব্যের বয়েৎ। বিনা বাক্যব্যয়ে কর্তব্যনিষ্ঠার হুকুমটা নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। কাণ্ট-প্রবর্তিত নৈতিক আদেশকে আমি সেকেলে ভারতীয় গীতার "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—বাণীর আধুনিক জার্মাণ সংস্করণ সমঝে থাকি। কাণ্ট তাঁর বয়েৎ গীতার বচন থেকে পেয়েছিল কিনা গবেষণা ক'রে দেখা উচিৎ।

লেখক—ভারতবর্ষের সঙ্গে কাণ্টকে জুড়ে দিচ্ছেন কোন্ সূত্রে?

সরকার—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে,—বিশেষতঃ ফরাসী বিপ্লবের যুগে,—হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩), গ্যেটে (১৭৫০-১৮৩২), কাণ্টের (১৭২৪-১৮০৪) আমলে ইয়োরোপের নানা দেশে একটা দস্তুরমাফিক ভারতীয় চিন্তাধারার দিগ্বিজয় চ'লেছিল। হার্ডার ছিলেন বিশ্ব-সাহিত্যের পূজারী। তিনি ভারতীয় চিন্তাধারার অন্যতম জার্মাণ আমদানিকারক। অনেকটা তাঁর প্রভাবে জার্মাণিতে গ্যেটে ও শিলার কালিদাস-ময় হ'য়ে প'ড়েছিলেন। "শকুন্তলা" সে

যুগে জার্মাণ সাহিত্যবীরদের মগজে একটা আত্মিক বিপ্লব এনেছিল। সেই আবহাওয়ায় ভগবদ্-গীতা জার্মাণির লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে বেশ-একটা পসার ভোগ করে। শ্লেগেল-দাদাভায়েরা জার্মাণ গীতা-প্রেমিকদের অন্যতম। এই ভারতীয় দিগ্বিজয়ের অন্যতম সাক্ষী ও চিহ্নোৎ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে ও শিল্পে "রোমাণ্টিক," ভাবুকতা-নিষ্ঠ আন্দোলনের আবির্ভাব। ইয়োরামেরিকান সংস্কৃতির ইতিহাসে এ যুগটাকে "ভারত-আবিষ্কারের যুগ" বলে।

লেখক—গীতা আপনার চিন্তা-মণ্ডলে কখন প্রথম প্রবেশ করে?

সরকার—"ফলাফল যাই হোক্ ক'রে যা কর্তব্য",—গীতার এ বচনটা আমার কানে প্রথম ঢুকেছিল সতীশ মুখোপাধ্যায়ের চেলা হিসাবে। তাঁর কায়েম করা "ডন সোসাইটি"র ব্যবস্থায় আমার মতন অনেকে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামীর গীতা-ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হ'তো। তখন আমি ছোক্‌রা মাত্র (১৯০৩),—বয়স বছর ষোল,—থার্ড ইয়ারে পড়ি। গীতার বয়েৎটা যখন প্রথম শুনি, তখন কাণ্ট-হেগেলের নামমাত্র শুনেছি। তাঁদের দু-একটা মহত্ত্বপূর্ণ কথাও শুনেছি, কিন্তু বেশী বুঝিনি। তবে তখন হ'তে গীতার "কর্মণ্যেবাধিকারস্তে" বা কাণ্টের কর্তব্যনিষ্ঠা আমার জীবনে একমাত্র মন্তর র'য়েছে। এজন্য অনেকে আমাকে বলে গরু। বলে,—"ফলাফল-নিরপেক্ষ কি-রে, গাধা?" "লোকে তারিফ কর্‌লেও তেতে না উঠা আর গালাগাল দিলেও দ'মে না যাওয়া.—সে আবার কী?" ভায়া, এও একপ্রকার আহাম্মুকি।

("ডন সোসাইটির সংস্কৃতি-শিক্ষালয়", ২৪৫শে নভেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

ফিখ্‌টে ও বিবেকানন্দ

লেখক—আর কোনো জার্মাণ দর্শনের প্রভাব ভারতে আছে?

সরকার—ভারতীয় সুধীমহলে অন্যান্য জার্মাণ দার্শনিকের পসারও মন্দ নয়। শোপেনহাওয়ার সুপরিচিত। তবে কাণ্ট আর হেগেলই আসর গুল্‌জার ক'রে বসেছে। হার্ডারের (১৭৪৪-১৮০৩) কথা আগেই কয়েকবার ব'লেছি। সে কাণ্টের সমসাময়িক। আর একজন জার্মাণ দার্শনিককে আমি বিশেষ ইজ্জৎ দিতে অভ্যস্ত। সে হচ্ছে ফিখ্‌টে (১৭৬২-১৮১৪),—কাণ্ট (১৭২৪-১৮০৪) ও হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১) মধ্যবর্তী সমসাময়িক। ফিখ্‌টের রাষ্ট্র-দর্শন, ধন-দর্শন ও সমাজ-দর্শন আমি নানা উপলক্ষে কাজে লাগিয়েছি। জার্মাণির স্বাধীনতা-লড়াইয়ের (১৮১৩) আর যৌবন-আন্দোলনের দার্শনিক হিসাবে ফিখ্‌টে পাশ্চাত্য জগতে সুবিখ্যাত। কিন্তু তার নাম ও কাম বোধ হয় ভারতে বেশী প্রচারিত নয়।

লেখক—ফিখ্‌টের প্রভাব ভারতীয় চিন্তায় কতখানি?

সরকার—এই উপলক্ষে একটা কথা গবেষণার বস্তু হিসাবে ব'লে যাচ্ছি। আমার বিশ্বাস,—বিবেকানন্দ'র "দরিদ্র-নারায়ণ"-তত্ত্ব হয়ত ফিখ্‌টের কাছ থেকে পাওয়া জিনিষ। ফিখ্‌টের পারিভাষিকে বিবেকানন্দ'র পারিভাষিকের খানিকটা গোড়া পাকড়াও কর্‌তে পারি। এক জায়গাতে ফিখ্‌টের বাণী নিম্নরূপ,—"পদদলিত পারিয়া-গোলাম-ও ভগবানেরই মন্দির"।

ইংরেজ পণ্ডিত কার্লাইল (১৭৯৫-১৮৮১) ছিলেন জার্মাণ ভাবনিষ্ঠ দর্শনের এবং গ্যেটে-সাহিত্যের প্রচারক। তাঁর রচনাবলীর ভেতর অন্যান্য ভাবনিষ্ঠ মতামতের সঙ্গে সঙ্গে ফিখ্‌টের

ভাবুকতাও ইংরেজিতে পাওয়া যায়। বোধ হচ্ছে, ভারতীয় সুধীমহলে ফিখ্‌টের বাণী কোনো কোনো ক্ষেত্রে কার্লাইলের বাণীরূপে চ'লে যাচ্ছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুইতিন দশকে কার্লাইল ছিলেন যুবক ভারতের অন্যতম দীক্ষা-গুরু।

আমার মনে পড়ছে, ছোকরা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ১৯০২ সনে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের চেলা হিসাবে কার্লাইলের উপদেশ সম্বন্ধে একটা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেটা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে পড়া হয়। পরে তাই সতীশবাবুর "ডন"-মাসিকে ছাপা হ'য়েছিল। সভায় সতীশবাবুও বক্তৃতা করেন।

লিস্ট্, মাইনেকে, হাউসহোফার, ফোন ভীজে

লেখক—জার্মাণ দার্শনিকদের সম্বন্ধে ভারতীয় আলোচনার পরিমাণ তা হ'লে কতখানি?

সরকার—বেশী নয়। হীরালাল হালদার গৌণভাবে আর শিশির মৈত্র সোজাসুজি জার্মাণ দার্শনিকতার প্রচারক। এঁদের রচনায় জার্মাণ দর্শন ভারতবর্ষে যে-পরিমাণে প্রবেশ ক'রেছে, ব্রজেন শীল, কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, হীরেন দত্ত ইত্যাদি পণ্ডিতগণের মারফৎ ততটা প্রবেশ করে নি বলা বাহুল্য। কয়েক বছর হ'লো, হুমায়ুন কবির কাণ্টের একখানা বই ইংরেজিতে তর্জমা ক'রেছেন (১৯৩৫)। তা ছাড়া কাণ্ট সম্বন্ধে তাঁর একখানা বাংলা বইও আছে (১৯৩৯)। এতে বাঙালীর গৌরব বেড়েছে। ভূপেন দত্ত'র লেখালেখির ভেতর জার্মাণ নৃতত্ত্বশাস্ত্রীরা ঠাঁই পেয়েছে। নরেন সেনগুপ্ত আর সুহৃৎ মিত্র পরীক্ষাসিদ্ধ চিত্ত-বিজ্ঞানের চর্চায় জার্মাণ চিত্তশাস্ত্রীদের মালও কিছু-কিছু পরিবেষণ করেছেন। সুহৃৎ মিত্র "মনঃ-সমীক্ষণ" বইয়ের (১৯৪১) গ্রন্থকার। এতে ফ্রয়েড্-গবেষণার ফল আছে।

লেখক—হার্ডার ও ফিখ্‌টে ছাড়া আর কোনো জার্মাণ দার্শনিক আপনার নিজের রচনাবলীর ভেতর স্থান পেয়েছে?

সরকার—ভায়া, আমাকে নানা ঘাটে পানি ঘাঁটতে হয়,—ফরাসীকে ফরাসী, মার্কিণকে মার্কিণ, ইতালিয়ানকে ইতালিয়ান, ইংরেজকে ইংরেজ। কাজেই জার্মাণ দরিয়ার পানিও আমি গঙ্গা-সিন্ধু-গোদাবরীতে কলসী-কলসী না হোক, ঘটি-ঘটি ঢাল্‌তে পেরেছি। জার্মাণ অর্থশাস্ত্রী লিস্ট্ (১৭৮৯-১৮৪৬) দুনিয়ার অন্যতম জগদ্‌গুরু। তাহার প্রণীত বইয়ের কিয়দংশ বাংলায় দাঁড় করিয়েছি। নাম দিয়েছি "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ-নীতি" (১৯২৭)। আর একজন জার্মাণ জগদ্‌গুরু মার্ক্‌স্ (১৮১৮-৮৩)। তাঁরও একখানা নামজাদা বই এইহাতে বাংলায় হাজির ক'রেছি। "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" (১৯২৬) নামে যুবক বাঙলায় চলে এটা বেশ। মার্ক্‌স্-সাহিত্য একালের ভারতে সুপ্রচলিত। কাজেই জার্মাণ দর্শন বাংলার টুলোপণ্ডিত আর গ্রন্থকারদের বাইরেও চল্‌ছে মন্দ নয়।

বিস্‌মার্কের (১৮১৫-৯৮) পরবর্তী বহুসংখ্যক অর্থশাস্ত্রী, রাষ্ট্রশাস্ত্রী, লোকশাস্ত্রী ও সমাজশাস্ত্রীকে আমি ইংরেজিতে ও বাংলায় ধ'রে রেখেছি নানা ঠাঁইয়ে। "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (দুই খণ্ড ১৯৩০, ১৯৩৫) আর "পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ্ সিন্‌স ১৯০৫" (১৯০৫-এর পরবর্তী রাষ্ট্রদর্শন, চারখণ্ড, ১৯২৮ ও ১৯৪২) দ্রষ্টব্য। অধিকন্তু "ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউন্স অ্যাজ সোশাল প্যাটার্ন্‌স্" (পল্লী ও শহরের সামাজিক গড়ন,

১৯৪১) বইটাও ঘাঁটা যেতে পারে। এই বইগুলা একমাত্র জার্মাণ বা অন্যান্য পরকীয় চিন্তাবলীর বাহন নয়। নিজ বক্তব্যও জোরের সঙ্গে যথাস্থানে প্রচারিত করা আছে।

লেখক—বিগত ৫০ বৎসরের জার্মাণ চিন্তাবীরদের ভেতর কে-কে আপনার এই সব বইয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে?

সরকার—কত নাম কর্‌ব? যৌনশাস্ত্রী ফ্রয়েডকেও ভারতবাসীর পাতে পরিবেষণ কর্‌তে পেরেছি। আমাদের চিত্তশাস্ত্রীরা অনেকেই অল্পবিস্তর ফ্রয়েড-সাধক। গল্প-লেখকদের মহলেও ফ্রয়েডের পসার বেড়ে চ'লেছে। তা ছাড়া একালের ডিল্‌থাই, ট্যেন্নীস্‌, ফাইহিংগার, স্পেংগলার, মাইনেকে, জেরিং, স্পান্‌, ভাগেমান, হাউসহোফার, বুর্গ্‌ড্যের্ফার, ফোন ভীজে, ক্যেলরয়ট্টার ইত্যাদি অনেককেই ভারতের বারোয়ারী-তলায় এনে হাজির ক'রেছি। অবশ্য এ সব নাম বাজারে চালু কর্‌তে এখনও বেশ-কিছু সময় লাগবে। এঁদের সম্বন্ধে লম্বালম্বা প্রবন্ধ লিখ্‌বার সুযোগ বা সময় আমার জুটে নি। তবে প্রত্যেকের দুএকটা বিশেষত্ব বুঝ্‌বার মতন মাল দিয়েছি। এদিকে অনেকে লাগ্‌লে তবে এসব নাম ভারতের লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে সুপরিচিত হ'তে পার্‌বে।

(পৃষ্ঠা, ৭১, "ভারতে জার্মাণ ভাষা", ৪ঠা অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

হীরেন দত্ত'র "বঙ্গ-দর্শন"

১৩ই অক্টোবর ১৯৪২

লেখক—কয়েক সপ্তাহ হ'লো দার্শনিক হীরেন দত্ত মারা গেছেন। তাঁর দর্শন-চর্চা সম্বন্ধে কিছু বলুন না?

সরকার—দর্শন-চর্চা বল্‌লে, দেখ্‌তেই পাচ্ছিস, আমি বুঝি দর্শন-বিষয়ক গবেষণা,—দর্শন সম্বন্ধে লেখালেখি ; দর্শন-বিষয়ক বই কেনা নয় বা এমন কি বই পড়াও নয় ; দর্শনে এম-এ পাশ করাও নয় বা এমন কি এম-এ পড়ানোও নয়। আগেকার দিনে পরীক্ষায় পাশ করাই ছিল পাণ্ডিত্যের পরিচয়। আজকাল লোকে চায় লেখালেখি, গবেষণা, গ্রন্থ-প্রকাশ। দর্শন-লেখক হিসাবে আমার চিন্তায় হীরেন দত্ত (১৮৬৭-১৯৪২) বাঙালী সুধীগণের ভেতর অনেকটা অদ্বিতীয়।

লেখক—কেন? আপনার মুখে 'অদ্বিতীয়' শব্দটা কিছু নূতন ঠেক্‌ছে। আপনি তো বহুত্বনিষ্ঠ। তাই নয় কি?

সরকার—"অনেকটা অদ্বিতীয়" বল্‌ছি নেহাৎ দায়ে প'ড়ে। তাঁর বড়-বড় লেখাগুলা সবই বেরিয়েছে বাংলায়। এ কথাটার দাম খুব বেশী। তারপর প্রাচীন ভারতের প্রধান-প্রধান কয়েকটা দর্শন,—বিশেষতঃ ধর্ম-ঘেঁষা দর্শন,—তিনি একালের বাঙালীর পাতে পরিবেষণ ক'রেছেন। বাংলার নরনারী সহজে খানিকটা দর্শন-নিষ্ঠ হ'তে পেরেছে,—কম্‌-সে-কম্‌ সেকেলে ভারতীয় সংস্কৃতি-মাফিক দর্শন-নিষ্ঠ হ'তে পেরেছে হীরেন দত্ত'র দৌলতে। তিনি যদি একমাত্র বেদান্ত নিয়ে প'ড়ে থাক্‌তেন অথবা একমাত্র গীতা নিয়ে প'ড়ে থাক্‌তেন, তাহ'লে তাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে একথা বল্‌তাম কিনা সন্দেহ। এসব দানের কিম্মৎ তাহ'লে অন্যরূপ হতো। অধিকন্তু যদি তিনি বইগুলা ইংরেজিতে লিখ্‌তেন তা হ'লেও তাঁর কৃতিত্ব আমি অন্যধরণে জরিপ কর্‌তাম।

এদিক-ওদিক সকল দিক জরিপ ক'রে কথাটা বল্‌ছি। বিংশ-শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ আমরা যে-যুগে রয়েছি সেই যুগ সম্বন্ধে বল্‌ছি। প্রাচীনপন্থী হিন্দু সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা দর্শন লেখক হীরেন দত্ত। তাঁর বাংলা রচনাগুলা না পেলে বাংলার নরনারী এ-যুগে সেকেলে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে অনেকটা আনাড়ি থেকে যেতো। ওসবকে আমি হীরেন বাবুর "বঙ্গ-দর্শন" বলি।

হীরেন বাবুর বাংলা দার্শনিক গ্রন্থাবলীর আমি পয়লা নম্বরের গুণগ্রাহী। তবে তাঁর "বঙ্গ দর্শন" সম্বন্ধে আমি সমজদার কিনা বল্‌তে পারি না। আমার বিদ্যার দৌড় অতি-সামান্য।

লেখক—"গীতায় ঈশ্বরবাদ" ছাড়া হীরেন দত্তের আর কোন্‌-কোন্‌ রচনার জোরে আপনি এই মত চালাচ্ছেন?

সরকার—গীতা বিষয়ক বইটা ১৯০৫-এর আগে লেখা। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখা বেরিয়েছে বিংশ-শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের যুগে (১৯১৬ সনে)। তিনি লিখেছেন বেদান্ত সম্বন্ধে, বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা সম্বন্ধে, যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে। তা' ছাড়া "সাংখ্য-পরিচয়" আছে। এই তো গেলো প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে লেখালেখি। মধ্যযুগের দর্শন-সাহিত্যেও তাঁর মাথা খেলছে। বৈষ্ণব-দর্শনের "রাসলীলা" সম্বন্ধে বই আছে। "প্রেমধর্ম" সম্বন্ধেও বই আছে। একালের বাঙালীরা হিন্দু-সংস্কৃতির যে-সব দর্শন ও ধর্ম-ঘেঁষা সাহিত্য খেয়ে মানুষ, তার অনেক-কিছুই এসব বাংলা রচনার ভেতর পাওয়া যায়। এই জন্যই "বঙ্গ-দর্শন" শব্দটা কায়েম কর্‌ছি।

ব্যাখ্যা বনাম ভাষ্য

লেখক—এসব বইয়ে হীরেন দত্ত তো প্রাচীন দার্শনিকদের মতামত আলোচনা ক'রেছেন। তা হ'লে আপনার বিচার-প্রণালী অনুসারে হীরেন দত্তকে দার্শনিক বলা যায় কি? (পৃষ্ঠা ৫১, ৫৫, ৫৮, ৬০)

সরকার—বিষয়টা আলোচনার যোগ্য বস্তু। "দার্শনিক" শব্দটা ব্যবহার করিনি। ব'লেছি "দর্শন-লেখক"। বর্তমান যুগের বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় দর্শন-লেখকগণ হ'তে হীরেন-বাবুর একটা বড় পার্থক্য অনেক সময়ই লক্ষ্য কর্‌তে পারি। সবাই প্রাচীন ও মধ্যযুগের দর্শন নিয়ে সওদা করেন সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশের রচনাই হয় তর্জমা, না হয় ভাষ্য, না হয় সংক্ষিপ্তসার, না হয় ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ইত্যাদি। হীরেনবাবুর যে-কয়টা বইয়ের নাম ক'রেছি, তার সবই সেকেলে ভারতীয় দার্শনিকদের মতামত নিয়ে আলোচনা। ঠিক কথা। সব কয়টাতেই পুরাণা পারিভাষিকের ছড়াছড়ি দেখ্‌তে পাই, একথাও সত্য। কিন্তু কোনোটাই ঝাড়া তর্জমা নয় অথবা ভাষ্য, সারসংকলন বা ইতিহাস নয়। এ প্রভেদটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লেখক—হীরেন দত্ত পুরাণা পারিভাষিক নিয়েই লেখালেখি ক'রেছেন ; অথচ তাঁকে ভাষ্যকার ইত্যাদি বল্‌ছেন না কেন? অন্যান্য বাঙালী ও ভারতীয় ভাষ্যকার ইত্যাদি হ'তে প্রভেদটা কোথায়?

সরকার—হীরেন দত্ত "ব্যাখ্যাকার"। তাঁকে ভাষ্যকার বা তর্জমাকারী বল্‌বো না। যে-কোনো বইয়ের পাতা খুল্‌লেই দেখ্‌তে পাবি যে, হীরেনবাবু পুরাণা ভারতীয় দর্শনগুলা

বুঝিয়ে চ'লেছেন ঠিক যেন নিজেরই মগজের সন্তানরূপে। প্রত্যেক পুরাণা পারিভাষিক বুঝবার জন্য তিনি স্বাধীন তর্কপ্রণালী কায়েম ক'রেছেন। বিশ্লেষণ-প্রণালীটা আর রচনার কাঠামটা আদৌ বৈদিকও নয়—বৌদ্ধও নয়—বৈষ্ণবও নয়। কল্পনা কর্‌তে হবে যে, বৈদিক-বৌদ্ধ-বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যেন জ'ন্মেছেন। আর কল্পনা কর্‌তে হবে যে, তাঁরা যেন একালের বাঙালী বাচ্চার জন্য বৈদিক, বৌদ্ধ আর বৈষ্ণব পারিভাষিক কায়েম ক'রেছেন। তারই সাহায্যে এঁরা যেন একটা "বঙ্গ-দর্শন" তৈরী ক'রেছেন। দুনিয়া, সংসার, মানুষ, আত্মা, পরমেশ্বর মুক্তি ইত্যাদি বস্তু এই বঙ্গ-দর্শনের জন্য বিশ্লেষণ করাই যেন তাঁদের মত্‌লব।

হীরেন দত্তের বইগুলা পড়্‌লেই ঠিক এ দৃশ্য চোখে পড়্‌বে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় দর্শনগুলাকে এ ধরণের বাঙালী গড়ন দেবার চেষ্টা আর কোনো লেখকের রচনায় দেখিনি। সেকেলে দর্শনগুলার বাঙালী "ব্যাখ্যা" পাচ্ছি হীরেন দত্ত'র রচনাবলীর ভেতর। বইগুলা হীরেন দত্ত'র "বঙ্গ-দর্শন"।

আমি আর ক'জনের লেখাই বা পড়েছি? যেটুকু দেখেছি তাতে এরূপই মনে হচ্ছে। আমার "গরুমি"তে অবশ্য দুনিয়ার কোনো লোকের ক্ষতি হবে না। তবে আর-কোনো লেখক যদি থাকেন, তাঁকে হীরেন বাবুর জুড়িদার বল্‌তে অরাজি হবো না। খুঁজে দ্যাখ্‌ না। বাংলায় দর্শন-লেখকদের ভেতর হীরেন দত্ত'র মতন "ব্যাখ্যাকার" এখনো তো আমার নজরে আর কেহ ভাস্‌ছে না। ইংরেজিতেই বা এই ধরণেব্‌ "বঙ্গ-দর্শন" কার-কার হাতে বেরুলো? চারদিকেই নজর ফেল্‌ছি।

লেখক—হীরেন দত্তের আর কোন বই আপনি প'ড়েছেন?

সরকার—হাঁ, হীরেনবাবুর বইগুলা দেখ্‌তে ছোট-ছোট। কিন্তু অধিকাংশই "হীরের টুক্‌রো"। যেমন মাল, তেমন ভাষা। আরও দু'একখানা বইয়ের নাম করি। একালে বেরিয়েছে "অবতার-তত্ত্ব" (১৯২৮), "কর্মবাদ ও জন্মান্তর" (১৯২৯), "বুদ্ধি ও বোধি" ইত্যাদি। কোনো-কোনো পুরাণা ভারতীয় পারিভাষিক দিয়েই এ বইগুলার নাম রাখা হ'য়েছে। দেখ্‌তেই পাচ্ছিস্‌। সুতরাং সোজা কথায় এসবই প্রাচীন-নিষ্ঠার সাক্ষী। কিন্তু পাতা উল্টাবামাত্রই দেখ্‌তে পাবি যে, প্রবন্ধগুলা সবই লেখকের স্বাধীন মতে ভরপুর। দেশী-বিদেশী, নয়া-পুরাণা নানাপ্রকার তত্ত্ব ও তথ্য এ সকল রচনায় হাজির করা হ'য়েছে। সবত্রই তুলনায় আলোচনা আর সমালোচনা। কাজেই এসবকে হীরেন দত্ত'র দর্শন বলা চলে। তবে এসকল ক্ষেত্রে হীরেনবাবু প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহই প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। হীরেনবাবুর দর্শনটা পরকীয় দর্শন, স্বকীয় দর্শন নয়। হীরেন দত্ত'র "বঙ্গ-দর্শনে" প্রাচীন ভারত আর পরকীয় চিন্তার আসরই প্রধান দ্রষ্টব্য জিনিষ। (পৃষ্ঠা ৬৪)

পাশ্চাত্য-নিষ্ঠায় হীরেন্দ্রনাথ

লেখক—হীরেন দত্ত'র বচনাবলীর ভেতর পাশ্চাত্য দর্শন ও খৃষ্টিয়ান ধর্মের প্রভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি? (পৃষ্ঠা ৬৪)

সরকার—প্রভাবটা দস্তুরমত। এ বই তিনটার ভেতর তো বটেই। অধিকন্তু বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও বৈদিক দর্শন-বিষয়ক রচনাবলীতে ও পাশ্চাত্য চিন্তাব সংগে সহযোগ সর্বত্রই মালুম হয়।

১৯৪১ সনে বেরিয়েছে ইংরেজিতে "ইণ্ডিয়ান কাল্‌চার" (ভারতীয় সংস্কৃতি)। তার প্রত্যেক পৃষ্ঠায়ই ইয়োরোপের মাল প্রচুর। বইটা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "কমলা বক্তৃতা"।

এখানে আর একটা দৃষ্টান্ত দিতে চাই। ১৯৩৮ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে হীরেনবাবুকে বংগীয় দান্তে-সভার এক অধিবেশনে সভাপতি ক'রেছিলাম। সভাটা ব'সেছিল "মহাবোধি সোসাইটি"র ভবনে। আলোচ্য বিষয় ছিল "মহাকবি দান্তের বাণী" (ইংরেজিতে "দি মেসেজেস্ অব দান্তে")। বংগীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অন্যতম গবেষক সুবোধ ঘোষালের হাতে ছিল ইংরেজিতে প্রবন্ধটা লেখার ভার।

লেখক—দান্তে-সভায় হীরেন বাবুর পাশ্চাত্য-নিষ্ঠা কিরূপ দেখ্‌লেন?

সরকার—প্রবন্ধপাঠ শেষ হ'লে সভাপতি হিসাবে হীরেন বাবু ব'লেছিলেন,—"বছর পঞ্চাশেক ধ'রে দান্তে আমার জীবনে একটা স্থায়ী শক্তিরূপে র'য়েছে। ভার্জিলের চেয়ে দান্তেকে আমি বেশী-বড় কবি বিবেচনা করি। অসীম, অনন্ত ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা দান্তের চিত্তে ছিল অকৃত্রিম ও ভিত্তিস্বরূপ। তাঁর "ভিতা নুঅভা" (নবজীবন) হ'তে "ডিভাইন কমেডি" পর্যন্ত সকল গ্রন্থই অতীন্দ্রিয়তা, অধ্যাত্মদৃষ্টি, গূঢ় রহস্য-বোধ ও ভাবুকতার রসে ভেজানো ছিল। আমাদের বাঙালী বৈষ্ণব সাধকদের অতীন্দ্রিয়তা দান্তে-সাহিত্যে বেশ পরিস্ফুট। 'রাসলীলা', 'প্রেমধর্ম' ইত্যাদি বই লেখার সময় আমি আমার দান্তে-প্রীতির দরুণ উপকৃত হয়েছি।"

কথাগুলা হীরেন বাবু ইংরেজিতে ব'লেছিলেন। তা পাওয়া যায় সুবোধ ঘোষালের "দি মেসেজেস্ অব্ দান্তে" নামক পুস্তিকার পরিশিষ্টে (কলিকাতা, ১৯৩৮)।

হীরেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, অক্ষয়চন্দ্র ও হরপ্রসাদ

লেখক—হীরেন দত্তের বাংলা রচনাবলী সম্বন্ধে বলেছেন, 'যেমন মাল তেমন ভাষা'। তাঁর মাল তো বুঝা গেলো। কিন্তু তাঁর ভাষার এত মূল্য দিচ্ছেন কেন?

("রবীন্দ্র-গদ্য ভয়ের জিনিষ" ১১ই নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—এর জবাব দিতে গেলে হাসিয়ে ছাড়্‌বো দেখ্‌ছি। হীরেন দত্ত'র বাংলা রচনা-কৌশলকে আমি আমার বাংলা লেখার অন্যতম আদর্শ মেনে নিয়েছি। লোকে বিশ্বাস কর্‌বে না, বলাই বাহুল্য। আমার অকথ্য চোঁথা ভাষার খবর অনেকেই রাখে। হীরেন দত্ত'র সুললিত লেখার কায়দায় আর এ অধমের তুচ্ছ রচনা-প্রণালীতে কোনো ঐক্য থাক্‌তে পারে,—এরূপ কল্পনা কর্‌তেও অনেকেই নারাজ হবে। কিন্তু খাঁটি সত্যিকথাই বল্‌ছি।

লেখক—কেন? আপনাদের দুইয়ের রচনাবলীতে সমতা বা সাদৃশ্য কোথায়? বরং আপনার ভাষা তাঁর ভাষা থেকে অনেকাংশেই আলাদা।

সরকার—এর জবাবে আরও কিছু হাসিয়ে ছাড়ি। শুধু হীরেন দত্ত বাংলা-রচনায় আমার গুরু নন। আরও তিনজনকে এবিষয়ে আমি গুরু সম্‌ঝে' থাকি। তাঁদের সংগে হীরেন বাবুর ঐক্য আছে কিনা তাও, বোধ হয়, লোকের পক্ষে ভাব্‌বার বিষয়। যাই হোক্,—একজন হচ্ছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (বৈজ্ঞানিক), দ্বিতীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার (বঙ্কিম-মণ্ডলের শেষ সাহিত্যবীর), তৃতীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (ঐতিহাসিক)। আমি যে ভাষা বিষয়ে তাঁদেরকে গুরু বিবেচনা করি তা নিশ্চয়ই তাঁরা জান্‌তেন না। জান্‌লে পরে চেলার আহাম্মুকি দেখে' অবশ্যই

লজ্জিত হ'তেন।

লেখক—আপনি দর্শনসেবী, বিজ্ঞানসেবী, সাহিত্যসেবী আর ইতিহাসসেবী,—এই চার জগতের চার পণ্ডিতকে এক জালের ভেতর পুরেছেন দেখ্‌ছি। তার ওপর আবার বল্‌ছেন এঁরা আপনার বাংলা রচনা-কৌশলের আদর্শ। আজ্‌গুবি আর কী হ'তে পারে?

সরকার—"গুরু" আর "আদর্শ" বল্‌লে বুঝতে হবে না যে, আমি এই চার লেখকের রচনানীতির সদ্‌গুণগুলা দখল কর্‌তে পেরেছি। বল্‌ছি মাত্র এই যে,—এই চার লেখকের রচনা-কৌশলটা আমি পছন্দ করি। আর মনে কর,—দৈবক্রমে আমার লেখালেখির ভেতর কোথাও এই রচনা-কৌশল খানিকটা দাঁড়িয়ে গেল। তা' হ'লে আমি প্রাণে-প্রাণে খুব খুসী হবো। ব্যস্। এই পর্যন্ত।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা ক'রেছে,—কোন্ বাঙালী লেখকের রচনা-কৌশল দেখে হাত-মক্‌স করা উচিত। আমি এদিক-ওদিক না তাকিয়ে সর্বদাই এই চারজনের নাম ক'রেছি। এঁদের আমি চেলা ব'লে লোকেরা আমার বাংলা রচনা দেখে' লাভবান্ হ'তে পার্‌বে,—সেরূপ আমি ভাবি না। আমার বিবেচনায়,—বিশেষতঃ আমার ১৯০৬-১৪ সনের বিচারে,—বাঙালী ছোক্‌রাদের পক্ষে অনুকরণ-যোগ্য লেখক হীরেন দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর. অক্ষয় সরকার আর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ছোট বহরের বাক্য

লেখক—হীরেন দত্তের আর অন্য তিনজনের বাংলা রচনার সদ্‌গুণ আপনি কী-কী লক্ষ্য ক'রেছেন?

সরকার—বল্‌বামাত্রই আবার হাস্‌তে আরম্ভ কর্‌বি।

লেখক—কেন? হাস্‌বার কি আছে?

সরকার—সদ্‌গুণ অতি সামান্য। এঁদের কেউই পারিত্-পক্ষে লম্বা-লম্বা বাক্য ব্যবহার করেন না। ব্যস্। চার জনের রচনায়ই বাক্যগুলা পরিপূর্ণ হয় আট-দশ-বারোটা শব্দে। যে-কোনো আট-দশ পংক্তির ভেতর পাওয়া যায় গোটা চার-পাঁচেক বাক্য। বাক্যসমূহের শব্দগুলাতে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ বা সংখ্যাশাস্ত্রের জরিপ লাগাচ্ছি। সেই জরিপ অনুসারে বল্‌ছি যে, এঁরা প্রধানতঃ ছোট বহরের বাক্যে সন্তুষ্ট। আমার মতন আহাম্মুকের বিবেচনায় এর চেয়ে ভাল বাংলা আর কিছু হ'তে পারে না। যদি কেউ দশ-বার লাইন জুড়ে' এক-একটা বাক্যের বহর চালাতে চায়, আমার কোনো আপত্তি নেই। তাদেরকে বলি,—চালাও, বাবা, পাটনাই বাজরা; যার যেমন খুসী। বাক্যের ভেতর বাক্যাংশ, তার ভেতর আর একটা বাক্য ইত্যাদি প্রণালীতে জটিলতার সৃষ্টি করা অনেকের পছন্দসই। বেশ ভাল কথা। কারু-কারু বিশ্বাস যে, এতে ভাষার ঐশ্বর্য বেড়ে যায়। বাড়ুক। অস্বীকার করি না। কিন্তু আমি গরীব মানুষ। আমি চাই পাঁচ-সাত দশ শব্দের বাক্য। লম্বায়-চওড়ায় আমি বেশ-কিছু ভয় পাই।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, হীরেন দত্ত ইত্যাদি চারজনের যে কোনো বই খুল্‌লে প্রত্যেক পাতায় ছোট বহরের বাক্য ছাড়া আর কিছু পাব না?

সরকার—আমার কথায় অনেকটা তাই মনে হবে বটে, কিন্তু আমার বলার মতলব ঠিক তা নয়। বল্‌ছি যে, যেখানে-যেখানে ছোট-ছোট বাক্যের সমাবেশ দেখ্‌তে পাই সেখানে-

সেখানে আমার নজরে পড়ে তাঁদের রচনা-রীতির জোর। সেই সব জায়গায় আমি পাকড়াও করি তাঁদের ভাষার ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব, স্বাতন্ত্র্য। আমার এই বিশ্বাসে হয়তো ভুলচুক্ থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে। কিন্তু এরূপই আমার অন্তরের ধারণা।

কোনো-কোনো লেখক পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি টানেন সাত-আট লাইন পর-পর। কিন্তু এই সাত-আট লাইনের ভেতর তাঁরা পাঁচ-ছয়টা 'কমা' অথবা 'সেমিকোলন' ব্যবহার কর্‌তে অভ্যস্ত। 'কমা' বা 'সেমিকোলনের' ভেতরকার অংশগুলা পড়্‌লেই দেখা যায় যে, সে-সব এক-একটা সম্পূর্ণ বাক্য। এসবের অর্থ পরবর্তী বা আগেকার অংশের উপব নির্ভর করে না। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রেও বাক্যটা সাত-আট লাইনে শেষ হ'লে বল্‌বো না। বল্‌বো যে,—'কমা' বা 'সেমিকোলনের' দাম-ই পূর্ণচ্ছেদের সমান। এক কথায়,—সাত-আট লাইনে পাচ্ছি পাঁচ-ছয়টা সম্পূর্ণ বাক্য।

বড় বহরের বাক্য এঁদের কোনো বইয়ের কোনো পাতায় পাওয়া যায় না,—এরূপ বুঝা অবশ্য ঠিক হবে না।

"গুরু-চাণ্ডালি"

লেখক—আপনার চার গুরুর বাংলা বচনায় আর কোনো সদ্‌গুরু আছে?

সরকার—আর একটা সদ্‌গুণ লক্ষ্য ক'রেছি। তাও লোকের চিন্তায় ছোটখাটো, অতি-তুচ্ছ বিবেচিত হবে। এঁরা চারজনেই সহজ-সহজ শব্দ, সরস খাঁটি বাংলা শব্দ পছন্দ করেন। এঁরা ঘাট-মাঠের শব্দ চালাতে অভ্যস্ত। চল্‌তি শব্দ, গ্রাম্য শব্দ, হাট-বাজারের শব্দ এই চারজনের রচনায় বেশ-কিছু চোখে পড়ে।

হীরেন দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর আর হরপ্রসাদ,—জানিস্-ই তো সংস্কৃতের জাহাজ। কাজেই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহারে এঁরা কেউই নারাজও নন, পশ্চাৎপদও নন। রামেন্দ্রসুন্দরের অনেক বাক্য সংস্কৃতের মুক্তায় গাঁথা।

কিন্তু প্রত্যেকেই সংস্কৃতের পাশে সোজা শব্দ, কবিকঙ্কণের শব্দ, "কথামালা"র শব্দ, মামুলি বাংলা শব্দ, মেঠো শব্দ কায়েম কর্‌তে ওস্তাদ। সকলেই ভাষায় "গুরু-চাণ্ডালি"র অর্থাৎ দো-আঁস্‌লামির অবতার। এই দো-আঁস্‌লামি আমার বিবেচনায় বাংলা রচনাবলীর পক্ষে অতি-স্বাভাবিক—বাঙালী লেখকদের অতি-প্রিয় বস্তু। সংস্কৃত শব্দগুলাকে "বাংলামি"র ভেতর এনে যথাসম্ভব সহজ ক'রে তোলার দিকে প্রায় সব বাঙালীর ঝোঁক এই "গুরু-চাণ্ডালি"তে কে কতটা পাপী বা গুণী তাও সংখ্যাশাস্ত্রের জরিপমাফিক ক'ষে দেওয়া চলে। সকলেই অল্পবিস্তর দো-আঁস্‌লা-ভক্ত।

লেখক—হীরেন দত্তের রচনাবলী থেকে দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

সরকার—দেখ্‌ছি, একদম ইস্কুল-মাষ্টারি করিয়ে ছাড়্‌বি। আমার কি সব-কিছু মুখস্ত আছে, না বইগুলা টেবিলে সাজানো আছে? আমি গরীব মানুষ—ঘরবাড়ী এমন নয় যে, বই কাছে রাখ্‌তে পারি। কাজেই বই-সংগ্রহের বাতিক আমার নেই। দরকার হ'লে গাড়ী-ভরা বই নিয়ে আসি আবার গাড়ী-ভরা বই ফেরৎ দিয়ে আসি।

লেখক—আপনার বই জোগায় কে?

সরকার—ফরাসী, জার্মাণি, ইতালিয়ান আর মার্কিণ পরিষৎ-পত্রিকাগুলা বিদেশ হ'তে

আসে বিনা পয়সায়। বিদেশী লেখকেরাও তাঁদের পুস্তিকা আর বই ইত্যাদি ছাপা মাল পাঠিয়ে থাকেন। ভিক্ষার জোরেই বেঁচে আছি।

দেশী (অর্থাৎ প্রধানতঃ ইংরেজি) পত্রিকা ও বইয়ের আড়ৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী। নরেন লাহাও এই দিকে বড় জোগানদার। আর এক জোগানদার কাশীর "ভাইয়া" শিবপ্রসাদ গুপ্ত।

লেখক—এইবার তাহ'লে হীরেন বাবুর ভাষার নমুনা কিছু দিন।

সরকার—আচ্ছা, দেখ্‌বি হীরেন বাবুর "অবতার-তত্ত্ব" বইটা। যেখানেই খুল্‌বি, সেখানেই দেখতে পাবি বাক্যগুলা নেহাৎ ছোট,—মনুসংহিতার বা রামায়ণের শ্লোকার্ধের মতন ছোট। এমন কি, কোনো-কোনো সময়ে শ্লোকার্ধেরও আধখানা অর্থাৎ চরণটা যেন বাক্যগুলার গড়-পড়্‌তা বহর। কিন্তু বাক্যগুলার গাঁথ্‌নি যুক্তিতে ভরা। আবার যুক্তিগুলা ঠিক যেন ওকালতির যুক্তি প্রত্যেক যুক্তি আলাদা-আলাদা সাজানো। একটার ঘাড়ে গিয়ে আর একটা পড়্‌ছে না। আট-দশ-বারো শব্দের বাক্যগুলা। কিন্তু কি জোরাল! কি যুক্তিনিষ্ঠ! কি সজীব!

"বেদান্ত পরিচয়" বইটা প'ড়েছিস্? বাক্যগুলার বহর সিকি, আধা বা তিনপোআ সংস্কৃত শ্লোকের মতন। সব কয়টা বাক্যই সরলভাবে মগজে গিয়ে গেঁথে যাচ্ছে। পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে তার জলের ভেতরকার তলা পর্যন্ত দেখেছিস্ কখনো? সেই জলকে বলে স্বচ্ছ, বলে পরিষ্কার, বলে নির্মল। হীরেন বাবুর রচনাবলীর ভাষা ঠিক সেরূপ,—স্বচ্ছ, পরিষ্কার, নির্মল। চিন্তার ভেতর কোনো জটিলতা, অস্পষ্টতা, গোঁজামিল নেই। "বেদান্ত-পরিচয়" বইয়ের মতন-সহজ, সরল, সুস্পষ্ট, মিষ্টি বই জীবনে খুব কম প'ড়েছি।

বাংলা গদ্যে "ফরাসী প্রাঞ্জলতা"

লেখক—বিদেশী লেখকদের ভেতর হ'তে দু'একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

সরকার—পাশ্চাত্য দার্শনিকদের ভেতর মার্কিণ প্র্যাগম্যাটিস্ট (ফলবাদী) জন ডুয়ীর নাম কর্‌তে পারি। অনেক সময় তিনি এই কায়দায় ইংরেজি লিখতে অভ্যস্ত। তাঁর বহুসংখ্যক জোরাল বাক্য খুব ছোট বহরে পাই। তবে ব'লে রাখ্‌ছি সব কয়টা বাক্যই ছোট বহরের নয়। ইংরেজ লেখক আলেকজাণ্ডার ছোট-ছোট বাক্য দিয়ে "দেশ, কাল ও দেবতা" বিশ্লেষণ ক'রেছেন। ভাষা তারিফযোগ্য। ইয়োরোপীয় নজির দিলে বল্‌বো যে, এই কায়দার নাম "ক্লার্তে" বা "লুসিদিতে ফ্রাঁসেজ্" (ফরাসী প্রাঞ্জলতা)। এই ফরাসী প্রাঞ্জলতার প্রতিনিধি হীরেন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, অক্ষয়চন্দ্র ও হরপ্রসাদ। এঁদের গদ্য-রীতির সহজ-সরল ভংগী ও সজোর সরসতা চিত্ত মুগ্ধ করে।

হীরেন দত্ত'র নাম-ডাক এত বেশী কেন?

১৪ই অক্টোবর ১৯৪২

লেখক—হীরেন দত্ত'র নাম-ডাক এত বেশী কেন?

সরকার—অনেকগুলা কারণ আছে। প্রথম কথা,—বাংলা ভাষার লেখক ব'লে। ইংরেজিতে লিখ্‌লে এত নাম হ'তো না।

দ্বিতীয় কথা,—অনেকগুলা রচনার লেখক ব'লে। দু'-চার-দশটা প্রবন্ধ বা দু'-একখানা বইয়ের লেখক হ'লে বর্তমান ইজ্জৎ আসতো না।

তৃতীয় কথা,—আজীবন লেখক ব'লে। বিবেকানন্দ-যুগে (১৮৯৩-১৯০২) হীরেন বাবুর লেখা সুরু হয়। মৃত্যু পর্যন্ত লেখা খতম হয় নি। আজও তাঁর ছেলে সুধীন-সম্পাদিত "পরিচয়"-কাগজে লেখা বের হচ্ছে। উকিল হ'য়ে সারাজীবন লেখালেখি করা সোজা কথা নয়। মাঝে-মাঝে গল্প, কবিতা, গ্রন্থ-সমালোচনা বা রাজনৈতিক প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা উকিলের কাছে আশা করা যেতে পারে। আইনবিষয়ক কেতাব লেখাও সম্ভব। কিন্তু দর্শন কিছু অসাধারণ। যে-সকল দার্শনিক রচনায় সংস্কৃত লাগে তার তদ্‌বির করা মুখের কথা নয়। গণ্ডা-গণ্ডা দেশী-বিদেশী বই সাম্‌নে রেখে অনেক লেখার জন্য গবেষণা চালাতে হয়। এতে সময় লাগে, মেহনৎ লাগে। এই ধরণের রচনা হীরেনবাবুর হাতে বেরিয়েছে,—কম-সে-কম পঞ্চাশ বছর। জবরদস্ত্‌ বাহাদুরি সন্দেহ নেই। পাণ্ডিত্য ত আছেই।'

উকিল-লেখকগণ

লেখক—বাঙালী উকিলদের ভেতর আপনি হীরেন দত্তের মতন লেখক দেখ্‌তে পান না?

সরকার—তিনজন নামজাদা উকিল-লেখকের নাম কর্‌ছি। সকলেই আমার বন্ধুবর্গের অন্তর্গত। সকলেই আবার দর্শনের পণ্ডিত। নরেশ সেনগুপ্ত গল্পলেখক হিসাবে যশস্বী। চিন্তারাজ্যে মার্ক্‌স্‌ পর্যন্ত তিনি ধাওয়া ক'রেছেন। তা' ছাড়া ওকালতির বইও আছে। কিন্তু হীরেন বাবুর লেখালেখি স্বতন্ত্র জাতের জিনিষ।

কেশব গুপ্ত নানাবিষয়ে প্রবন্ধ-লেখক। ইংরেজি' আর বাংলায় হাস্যরস সৃষ্টি কর্‌তেও ওস্তাদ। উকিলি ক'রে পসার রেখে এ-সব চালানো কঠিন। কিন্তু আরও কঠিন হীরেন বাবুর কোঠের লেখালেখি।

অতুল গুপ্ত বলেন ভাল, লেখেন ভাল। অনেক-কিছুই তাজা, সোজা, উদার চিন্তায় ভরপুর। কিন্তু বহরে আর লম্বায়-চওড়ায় হীরেন বাবুর কাছে দাঁড়াতে পারেন না।

এঁরা কেউই আমার এ সব কথায় চট্‌বার লোক নন। সকলের সংগেই ছেলেবেলার ভাব। আমাকে বেশ জানে। বুঝে যে,—আমি লোকটা বেআড়া বটে, কিন্তু নিন্দা করা আমার পেশা নয়। সেজন্য নির্ভয়ে বলে যাচ্ছি। অধিকন্তু এ তিনজনের লেখালেখির পর্ব এখনও শেষ হয় নি। এ-সব হাতে ভবিষ্যতে অনেক-কিছু বেরুতে পারে.

লেখক—হীরেন দত্তের নামডাকের আর কোনো কারণ আছে?

সরকার—চতুর্থ কথা,—সহজ, সরল অথচ যুক্তিনিষ্ঠ লেখক ব'লে। সরস, প্রাঞ্জল অথচ জোরাল রচনা-কৌশলের মালিক ব'লে।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ

পঞ্চম কথা,—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের অন্যতম জন্মদাতা, কর্মকর্তা ও একনিষ্ঠ সেবক ব'লে। সাহিত্য-পরিষদকে একালের যুবক বাংলা—জাতীয়তা-পন্থীই হোক বা সোশ্যালিষ্ট-পন্থীই হোক,—বোধ হয় বড়-একটা পুছে না। আজকাল এ পরিষদ্ বাংলার অন্যতম গবেষণা-প্রতিষ্ঠান মাত্র। কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থায় একালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে পড়াশুনা ও লেখালেখি যাহ'ক-কিছু সাধিত হচ্ছে। কিন্তু গৌরবময় বংগ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১৪) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় না ছিল দেশী-বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা, না ছিল জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে দরদ ও অনুভূতি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া কিছু-কিছু বদ্‌লাতে সুরু করে। সেকালে বাংলার ভাষা, সাহিত্য, নৃতত্ত্ব ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর কাজের জন্য সাহিত্য-পরিষৎ বাঙালীজাতের "সবেধন নীলমণি"-রূপে শহরে-মফঃস্বলে পূজা পেতো। অধিকন্তু স্বদেশীযুগে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে সাহিত্য-পরিষৎ বাংলার নরনারীর চিন্তায় জাতীয়তার কেন্দ্র, স্বরাজশক্তির প্রতিমূর্তি, স্বাধীনতার উৎস বিবেচিত হ'তো। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানমাত্রই বাঙালীরা ভালবাস্‌ত প্রাণে-প্রাণে। সে ছিল ভাবুকতার যুগ—আদর্শ-নিষ্ঠার যুগ—আকাঙক্ষার যুগ—ভাবালুতার যুগ "রোমাণ্টিকতার" যুগ।

লেখক—আজকাল সাহিত্য-পরিষৎ তত-বেশী লোকপ্রিয় নয় কেন?

সরকার—ভেবে দেখিনি কখনো। ধাঁ ক'রে একটা কারণ বাৎলাতে পারি। আজকাল জেলায়-জেলায় ছোট-বড়-মাঝারি ডজন-ডজন প্রতিষ্ঠানে বে-সরকারী একতিয়ার কায়েম হ'য়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলাও কিছু-কিছু জনসাধারণের হাতে এসেছে। দল, সমিতি. সংঘ, কেন্দ্র, পরিষৎ, মজ্‌লিস্, বৈঠক ইত্যাদি ব্যবস্থায় হাজার-হাজার নরনারী আজকাল স্বাদেশীকতার আরাধনা কর্‌তে সমর্থ। মায় সমাজতন্ত্রের (সোশ্যালিজ্‌মের) পূজারীরাও গণ্ডা-গণ্ডা আড্ডায়-মজ্‌লিশে-বৈঠকে-সংঘে দলবদ্ধ। কাজেই সেকালের অনেক প্রতিষ্ঠানই একালে ইজ্জৎ হারিয়েছে। সাহিত্য-পরিষৎও বোধ হয় খানিকটা কানা হ'য়ে গেছে। কিন্তু সেকালের যারা এ পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক ছিল, তাদের ইজ্জৎ বাঙালী জাতের মজ্জায় ব'সে গেছে। অধিকন্তু হীরেন বাবু মৃত্যু পর্যন্ত এ পরিষদের সহায়ক ছিলেন।

জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ

ষষ্ঠ কথা,—জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্যতম জন্মদাতা, কর্মকর্তা ও একনিষ্ঠ সেবক ব'লে। বয়সে এটা সাহিত্য-পরিষদের ছোট। ১৯০৬ সনে এর জন্ম। কিন্তু গৌরবময় বংগবিপ্লবের বিপুল আত্মিক স্তম্ভ ছিল জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে বয়কট করা ছিল এর জন্মের উদ্দেশ্য। তার ঠাইয়ে স্বদেশী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান কায়েম কর্‌বার স্বপ্ন ও আকাঙক্ষা বা আদর্শ এই পরিষদের ভেতর মূর্তিমন্ত হ'য়েছিল। সেই আকাঙক্ষার সংগে এই অধমের জীবন অতিমাত্রায় সুজড়িত।

বলা বাহুল্য একাজ অতি কঠিন। সাহিত্য-পরিষৎ গ'ড়ে তুল্‌তে স্বার্থত্যাগের দরকার হ'য়েছিল। তার চেয়ে বেশী দরকার হ'য়েছিল জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ গ'ড়ে তুলতে। কেননা

জ্ঞাতসারে আর অজ্ঞাতসারে গভর্মেণ্ট জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌কে কড়া নজরে দেখ্‌তো। বাপ্‌-মারাও স্বাধীনতার বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাতে ভয় পেতো। ছেলেদের জন্য চাক্‌রির ভাবনা তো স্বাভাবিক। সেকালের এসব দুর্যোগের আবহাওয়া একালে চোখের সাম্‌নে রাখা কঠিন। যাই হোক, রাষ্ট্রিক আন্দোলনে যারা সোজাসুজি মস্‌গুল তাদেরও অনেকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ছেলে পাঠাতো না। পয়সাওয়ালাদের ছেলেরাও এ-পথ মাড়াতো না। নেহাৎ যারা স্বদেশী, স্বরাজ ও স্বাধীনতার আদর্শনিষ্ঠ, তাদের কেহ-কেহ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌কে আঁক্‌ড়ে' ধ'রেছিল। তাদেরকে বাঙালী জাত্‌ আজও মনে রেখেছে।

("জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ বনাম সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়," ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪২, "জাতীয় শিক্ষা ও আশুতোষ," ১১ই ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ সম্বন্ধে আপনি আজকাল কী ভাবেন?

সরকার—জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ নিজের আদর্শও আকাঙ্ক্ষামাফিক বেশী-কিছু সাধন করতে পারেনি। তবে যা ক'রেছে তা একদম নগণ্যও নয়। যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারিং শব্দ পর্যন্ত সে-যুগের বাঙালী শুনে নি। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের দৌলতে আজ বাংলা দেশে বহুসংখ্যক যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার দেখা যায়। কেউ-কেউ হয়তো বল্‌বে,—যাদবপুরের এঞ্জিনিয়ারিং কলেজটা টিং-টিং ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু এর সমান বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান বাঙালীর আর কোথায়ই বা দেখ্‌তে পাই? যাই হোক, এটাকে সামান্যমাত্র দাঁড় করাবার জন্যই স্বদেশীযুগে রীতিমত সংগ্রাম চালাতে হ'য়েছিল। সেই লড়াইয়ে যারা মেতেছিল, বাঙালী জাত তাদের অমরতা দিয়েছে। হীরেন বাবু তাদেরই অন্যতম। একালের বাঙালীরা এই পরিষদের কাজকর্মকে সেকালের ভাবুকতার চোখে দেখে কি না সন্দেহ। তবে মৃত্যু পর্যন্ত হীরেন বাবু এই পরিষদের কর্মকর্তা ছিলেন।

থিঅজফি

লেখক—হীরেন দত্তের খ্যাতির আর কোনো কারণ আছে?

সরকার—সপ্তম কথা,—"থিঅজফিস্ট্‌" ব'লে। "থিঅজফির গর্তে" বেশী বাঙালী পড়ে নি। কাজেই থিঅজফির কিস্মৎ বাংলার নরনারী সহজে বুঝ্‌বে না। কিন্তু থিঅজফির চর্চা যারা করে, তাদের সংগে গোটা ভারতের মনীষী ও জননায়ক-স্থানীয় লোকজনের যোগাযোগ কায়েম হ'য়ে যায়। এমন কি, দুনিয়ার কতকগুলা চিন্তাবীরের সংগে দহরম-মহরম অনুষ্ঠিত হয়। এখানে হীরেনবাবুর নাম-ডাকের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে।

লেখক—দু'এক কথায় থিঅজফির পরিচয় দিতে পারেন?

সরকার—সোজা নয়। থিঅজফির বাণী প্রাচীন ভারতীয় দর্শন-ও ধর্ম-ঘেঁষা। এতে লোকেরা ভারত-নিষ্ঠ হ'তে পারে। ইয়োরামেরিকার সর্বত্র লক্ষ্য ক'রেছি যে, ওসবদেশে থিঅজফিস্ট্‌দের ভেতর অনেকেই ভারত-সুহৃদ। ভারতীয় রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সুহৃদ কি না অনেক ক্ষেত্রে বলা কঠিন। কিন্তু বহু থিঅজফিস্ট্‌ ভারতের অ-রাষ্ট্রিক মংগল কামনা করে আর সাধ্যমত মংগল সাধনের জন্য চেষ্টাও করে।

ভারতীয় থিঅজফিস্ট্‌দের ভেতর চিন্তার উদারতা লক্ষ্য করা সম্ভব। তুলনামূলক ধর্ম ও দর্শনের আলোচনা এঁদের স্বভাবসিদ্ধ। থিঅজফির প্রভাবে সংকীর্ণতা ক'মে আসে।

হীরেনবাবুর এ সকল সদ্‌গুণ ছিল। কাজেই বাংলার মতন বাংলার বাইরেও তাঁর খ্যাতি দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তার অন্যতম ফল আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি,—বাংলায়ই নামডাক বেড়েছে।

স্বদেশ-সেবক হীরেন্দ্রনাথ

অষ্টম কথা—খাঁটি স্বদেশ-সেবক ব'লে। ১৯০৫-সনে বংগ-বিপ্লবের সময় হীরেনবাবুর বয়স প্রায় চল্লিশ। কিন্তু এই বয়সেও তিনি "ছোক্‌রাদের" সংগে বটকট, স্বদেশী, স্বরাজ ও জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পেরেছিলেন। যুবক বাংলার ডাকে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন প্রাণের সহিত। তার জন্য তিনি পরে কখনো পস্তান নি। বিপিন পাল, অরবিন্দ, সতীশ মুখোপাধ্যায় (ডন-সোসাইটি), ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ, সুবোধ মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, আব্দুল রসুল, অশ্বিকা উকিল, রামেন্দ্রসুন্দর, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, কৃষ্ণকুমার মিত্র, চিত্তরঞ্জন দাশ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুরেন ব্যানার্জি, মতিলাল ঘোষ ইত্যাদি করিতকর্মা লোকের সংগে হীরেন বাবু ছিলেন বংগবিপ্লবের অন্যতম সাধন ও সহায়ক। এই সূত্রে তাঁর সংগে অন্যান্য অনেক ছোক্‌রার মতন এই অধমেরও আত্মীয়তা কায়েম হয়। প্রসঙ্গক্রমে বল্‌তে পারি যে, আমার "শিক্ষা-বিজ্ঞান" বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন হীরেন বাবু (১৯১০)।

১৯১৪ পর্যন্ত তাঁকে বাদ দিয়ে যুবক বাংলা কোনো পরামর্শ বা কাজকর্ম চালাতো কিনা সন্দেহ। মনে রাখা ভাল যে, তাঁর পেশা ছিল উকিলি আর উকিলিতে পসারও ছিল। কাজেই অনেক-কিছুর জন্য তাঁর শল্লার দাম ছিল যুবক বাংলায় প্রচুর। তাঁর ডাক পড়্‌তো সর্বদা ও সর্বত্র। সেকালের অন্যতম "ছোক্‌রা", রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (ঐতিহাসিক), এ বিষয়ে সন্ধান দিতে সমর্থ।

"বন্দেমাতরম্"-এর-তিলক কেটে হীরেন বাবু হাজির ছিলেন যুবক বাংলার নয়া জীবনের সাড়ার ভেতর। "বন্দেমাতরম্"-মার্কা বংগ-সন্তান বাঙালীর ইতিহাসে অমর। বাঙালী জাত্‌ যত আহাম্মুকই হোক্‌, ১৯০৫-১৪ সনের বন্দেমাতরম-দীক্ষিত বাঙালীর বাচ্চাকে সে কোনোদিন ভুল্‌তে পার্‌বে না।

("অশ্বিনী-মণ্ডল", "রবীন্দ্র মণ্ডল" ও "সুরেন্দ্র-মণ্ডল", "ডন সোসাইটি ও বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কট", ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

১৯০৫ সনের পরবর্তী ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী

লেখক—আপনার সংগে হীরেন দত্তের চিন্তাধারার মিল আছে কতখানি?

সরকার—হীরেন বাবুর পাণ্ডিত্য, প্রাচ্য-প্রীতি, ভারত-নিষ্ঠা, আজীবন সাহিত্য-সাধনা, দর্শন-চচা, বৈজ্ঞানিক ঔদার্য, ভাষা-সৌষ্ঠব আর স্বদেশ-সেবা সবই আমি সম্বর্ধনা করি। কিন্তু চিন্তাক্ষেত্রের একটা খুব-বড় জায়গায় অমিল আছে।

লেখক—সে জায়গাটা কী? অমিলটা কোথায়?

সরকার—রামমোহন হ'তে হীরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক ভারতীয় মনীষীর চিন্তায় একটা মোটা দাগ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। তাঁদের প্রায় সকলেরই অন্যতম সমস্যা ছিল পাশ্চাত্য সংস্কৃতি, আদর্শ ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান হ'তে ভারতের আত্মরক্ষা। এ চিন্তাধারার প্রধান খুঁটা—প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভেদ। একালের রচনাবলীর ভেতর প্রমথ চৌধুরী-প্রণীত "বীরবলের হালখাতা" বইটা (১৯২৪) উল্লেখ করতে পারি। এর ভেতর "আমরা ও তোমরা" প্রবন্ধে (১৯০২) বীরবল জোর্‌সে এই প্রভেদটা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই রচনায় "বীরবলী" হাসি-ঠাট্টার আবহাওয়া আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রভেদ-তত্ত্ব প্রায় সার্বজনিক ভারতীয় মতবাদের অন্তর্গত।

১৯০৫ সনে আমরা যে-চিন্তাধারার যুগ সুরু ক'রেছি, সে-চিন্তা-ধারার পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতবাসীর পক্ষে ভয়ের বস্তু নয়। এটা ভারতীয় সংস্কৃতির সংগে সোজাসুজি লেনদেনের বস্তু। সমস্যাটাকে অন্য চোখে দেখা হয়। এযুগে আমরা প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে প্রভেদ দেখি না—দেখি ঐক্য, সাম্য, সাদৃশ্য। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে আক্রমণকারী বিবেচনা করা কমসে-কম আমার তো দস্তুর নয়। আমি একে আমাদের সহযোগী সমঝে' থাকি। রুসো ও বাষ্পযন্ত্র হ'তে লেনিনও ফ্রয়েড পর্যন্ত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সব-কিছুকে যুবক ভারত পান-সুপারী দিতে অভ্যস্ত। এ-সবকে ভারতীয় সংস্কৃতির বারোয়ারীতলায় নিয়ন্ত্রণ ক'রে নিয়ে আসা যুবক ভারতের আটপৌরে কাজ।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতে কখনো কোনো ক্ষতি করেনি?

সরকার—ক্ষতি বেশী করে নি। খুব জোর সাময়িক ক্ষতি হ'য়ে থাক্‌বে। তাও সামান্য। রাষ্ট্রিক পরাধীনতার কথা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। বস্তুতঃ আমাদের একালের চিন্তায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস নতুন আকার গ্রহণ ক'রেছে। ঐ সময়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতে এসে ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিপর্যস্ত ক'রে নি—এরূপ চিন্তা করাই আমার স্বভাবসিদ্ধ। আমি বুঝি যে, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে বরং চাংগা ক'রে রেখেছে—বাড়িয়ে দিয়েছে—ফুলিয়ে তুলেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ জ্যান্ত হ'য়ে উঠেছে—বেড়ে গেছে—পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংগে এই দেড়শ'-দুশো বছরের সহযোগিতায়। কাজেই আমি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীকে ভারতীয় সংস্কৃতির পক্ষে অগৌরবের যুগ মনে করি না। এই যুগ ভারতবাসীর নিন্দা ও অপমানের বস্তু নয়। পাশ্চাত্য আর ভারতীয় সংস্কৃতির দেড়শ'-দুশো বছরব্যাপী যোগাযোগ আর লেনদেনের ভেতর আমি নবীন ভারতীয় দিগ্বিজয়ের বিভিন্ন চিহ্নোৎ দেখ্‌তে পাই।

লেখক—নবীন ভারতীয় দিগ্বিজয় সম্বন্ধে আরও কিছু বলুন না?

সরকার—কী আর বল্‌ব রে ভাই? ঐটাই আমার বাতিক, ঐটাই আমার দর্শন, ঐটাই আমার জীবন! বেঁচে রয়েছি ঐটার জোরে। আমাকে যেখানেই চিবুস্ না কেন, পাবি দিগ্‌বিজয়, পাবি নবীন ভারতীয় সাম্রাজ্য। ভারতীয় সংস্কৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে এই শ'দেড়-দুই বছরে নয়া-নয়া আন্দোলন জুগিয়েছে—নতুন-নতুন গড়ন দিয়েছে। অপর দিকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতে এসে তার সুপরিচিত সুরৎ রক্ষা কর্‌তে পারে নি—ভোল বদ্‌লাতে বাধ্য হ'য়েছে। এমনকি ইয়োরামেরিকার জনপদে-জনপদে ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে কিঞ্চিৎ-কিছু চেহারা বদ্‌লাতে সুরু ক'রেছে। সুতরাং দেড়শ-

দুশো বছর ধ'রে ভারতবর্ষ তার সংস্কৃতির আত্মরক্ষা মাত্র ক'রে চলেছে,—এরূপ ধারণা ১৯০৫ সনের পরবর্তী চিন্তাপ্রণালীর ভেতর থাক্‌তে পারে না। একাল-সেকালের ভারতীয় সংস্কৃতি দিয়ে দুনিয়াখানাকে ভারতের তাঁবে আনা দস্তুরমাফিক্ চ'লেছে। দুনিয়াব বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সাম্রাজ্য কায়েম হ'য়েছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যের দৌড় অবশ্য এখনো অল্পমাত্র। এই হ'লো আমাদের নয়া দর্শন ও নয়া জীবন। বলতে পারি,—এইটাই এই অধমের "বঙ্গ-দর্শন"। কাজেই হীরেন্দ্রনাথেব দৃষ্টিভংগীর সংগে একালের দৃষ্টিভংগীর মিল থাক্‌তে পারে না।

("হিন্দু সমাজ-তত্ত্বেব বাস্তব ভিত্তি", ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪২, "ব্রহ্মবান্ধব ও ডন সোসাইটি", "ভগ্নী নিবেদিতার আবহাওয়া", ২৮শে নবেম্বর, ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

গল্প ও কবিতার রকমারি দৃষ্টিভঙ্গী

১৬ই অক্টোবর, ১৯৪২

লেখক—হীরেন দত্তের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে যা বল্‌লেন, তা সহজে কোথায় পেতে পারি? তাব উল্টা দৃষ্টিভঙ্গীই বা আপনার কোন্ বইয়ে পাবো?

সরকার—দৃষ্টিভংগী জিনিষটা প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক রচনায়ই আবিষ্কার করা সম্ভব। আনাতল ফ্রাঁস্ দস্তয়েব্‌স্কি, হার্ডি, হুইটম্যান, ব্রাউনিং, দোদে, মানৎসোনি, ফোন্টানে, শিলার, মলিয়েয়ার ইত্যাদি লেখকের দৃষ্টিভংগী পাক্‌ড়াও করা যায় না তাঁদের এমন-কোনো গল্প, কবিতা বা নাটক নেই।

লেখক—আমাদের দেশী নজিরও দিতে পারেন কি?

সরকার—নিশ্চয়। বাংলা-সাহিত্যের যে-কোনো লেখকের নাম কর্। নজরুল ইস্‌লাম, অন্নদাশংকর রায়, বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্মথ রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায়, আবদুল বউফ, প্রেমেন মিত্র, সুধীন দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার,—এঁরা সকলেই দৃষ্টি-ভঙ্গীওয়ালা লেখক। আর কার-কার নাম কর্‌তে চাস? বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, জসিমুদ্দীন, এবনে গোলাম নবী, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, বুদ্ধদেব বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, হুমায়ুন কবির—এঁদের দৃষ্টিভঙ্গী নেই? সমর সেন, আব্দুল কাদির, প্রফুল্লকুমার সরকার, মনোরঞ্জন হাজরা, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, সজনীকান্ত দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বন্দে আলি মিঞা,—এঁদের কাউকেই দৃষ্টিভঙ্গীর হিসাবে বাদ দেওয়া যায় না।

ক'দিন হ'ল বেরিয়েছে বিনোদবিহারী চক্রবর্তীর "যূথভ্রষ্ট"। এই গল্পের ভেতরও দৃষ্টি-ভঙ্গী পাচ্ছি। কয়েক মাস ধ'রে সুধাকান্ত দে কর্তৃক সম্পাদিত "ভালো-গল্প" বেরুচ্ছে। আট-দশ জন গল্প-লেখকের রচনা দেখা গেল। হেমেন্দ্রবিজয় সেন পাকা লেখক। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ত আছেই। অন্যান্যেরাও দৃষ্টিভঙ্গীশীল। দৃষ্টিভঙ্গী রকমারি।

লেখক—আপনি এতগুলা লেখকের নাম এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন। সবাই কি এক ধরণের বা এক দরের লেখক?

সবকার—এই সব কবি ও গল্প-লেখকেরা নানামতের লোক, জানিস্‌ই ত। এঁরা পরস্পর পরস্পরকে কী চোখে দেখেন জানি না। এঁদের ভেতর বনিবনাও আছে কিনা

বা কতটা আছে কে বলতে পারে? চিত্র-শিল্পী ও গায়কদের মতন কবি আর গল্প-লেখকেরাও বেজায় দেমাকী লোক,—জানিস্ বোধ হয়? কাজেই এলোমেলো নাম ক'রে গেলাম। এঁদের বয়স, লেখালেখির পরিমাণ আর দলাদলি ভুলে যাচ্ছি। ছোট-বড়ও বিচার কর্‌ছি না। এঁদের সম্বন্ধে পাঠকমহলের মতামত রকমারি হওয়া স্বাভাবিক। তোরও নিশ্চয় একটা মত আছে। কিন্তু প্রত্যেকের এমন কি প্রত্যেক রচনায়ই একটা ক'রে দৃষ্টিভঙ্গী আছেই-আছে,—তোর, আমার বা অন্যের ভাল লাগুক আর না লাগুক। দৃষ্টি-ভঙ্গীহীন রচনা কল্পনা করা অসম্ভব। দৃষ্টিভঙ্গী শব্দটা গল্পলেখক আর কবিরা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নন। ভালই। ব্যবহার করলে তাঁরা "শিল্পী" থাকবেন না, হ'য়ে পড়্‌বেন সমালোচক।

প্রবন্ধ-লেখক, দর্শন লেখক, সাহিত্য-সমালোচক, অর্থশাস্ত্রী, মায় ঐতিহাসিক পর্যন্ত সকল গদ্য-লেখকের বেলাই সেই কথা বল্‌তে হবে। এই সকল শ্রেণীর লেখক সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী শব্দটা জোরের সহিতই প্রযোজ্য।

লেখক—আপনি ত দেখ্‌ছি আমাদের প্রায় সব-কয়জন গল্প লেখক আর কবির খবর রাখেন? এঁদের কার ক'খানা বই প'ড়েছেন?

সরকার—অনেকগুলা বই প'ড়েছি বলা ঠিক হবে না। বিনা পয়সায় কতকগুলা এসে জুটে। সেইগুলা গিলে থাকি। তা ছাড়া আছে অধম-তারণ "পূজা-সংখ্যা"। বুঝ্‌তেই পারছিস, আমার মতন লোকগুলোকে মানুষ করবার জন্য পূজা-সংখ্যার ব্যবস্থা। এই সব ঢাউস দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিকের দৌলতে সর্বদাই ওয়াকিব্‌-হাল থাকা যায়। তার ওপর আছে বাক্-বিতণ্ডা। তোর মতন মক্কেল আমার জুটে কম নয়,—এখান থেকে, ওখান থেকে। সকলেই কিছু-না-কিছু বকে আমিও কিঞ্চিৎ-কিছু কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলি।

আমাকে অনেকে নিজ-নিজ লেখা বিনা পয়সায় পাঠায় কিজন্য জানিস? চিঠির জবাব দিই ব'লে। অনেক সময় চিঠি পাই না। পাই শুধু বই। কিন্তু হপ্তার ভেতরেই প্রাপ্তি-স্বীকার। ব্যস্। এই টুকুই আমার সদ্‌গুণ অথবা বাজে কাজের অভ্যাস। তাতেই বজায় থাকে সাহিত্যের সঙ্গে নাড়ীর যোগ।

লেখক—পূজা-সংখ্যারই কোনোটা আগাগোড়া পড়া সম্ভব কি?

সরকার—ঠিক কথা। দেখ্‌ছি তুই শেয়ানা। বলা বাহুল্য,—সকলেই বেছে-বেছে পড়ে। আমি সাধারণতঃ বাছি এমন লেখক যার নাম বেশী জানি না। কেন জানিস্? নতুন-নতুন দৃষ্টিভঙ্গী পাবার জন্য।

হীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী

লেখক—এবার তাহ'লে হীরেনবাবুর আর তাঁর উল্টা দৃষ্টিভঙ্গী দুটার দৃষ্টান্ত দিন।

সরকার—হীরেনবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর যে-কোনো প্রবন্ধে পাবি। তবুও মাত্র একটা বইয়ের নাম কর্‌ছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত "কমলা বক্তৃতা" (১৯৪১) ইংরেজিতে বেরিয়েছে। নাম "ইণ্ডিয়ান কাল্‌চার"। এর ভেতর তাঁর প্রাণের কথাগুলা পাওয়া যায় সংক্ষেপে। আগেই ব'লেছি হীরেনবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী প্রকারান্তরে ভারতের সার্বজনিক ও অনেকদিনকার দৃষ্টিভঙ্গী। আমি পাপিষ্ঠ। এই দৃষ্টিভঙ্গীটা আমি বরদাস্ত

করতে পারিনি। ১৯০৬ সনে লেখা সুরু করি। তখন অল্পদিনের ভেতরই সেই দৃষ্টিভঙ্গী বদ্‌লাতে থাকে। আগাগোড়া চালাচ্ছি এই প্রায়-সর্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে লড়াই। আমার দৃষ্টিভঙ্গীটা সহজে পাওয়া যায় "ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" (যুবক এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা) বইয়ে (বার্লিন, ১৯২২)। আজকাল এ বইটার নাম হ'য়েছে "সোশিওলজি অব রেসেজ্, কাল্‌চারস্ অ্যাণ্ড হিউম্যান প্রোগ্রেস" (জাতি, সংস্কৃতি ও মানবোন্নতির সমাজশাস্ত্র, কলিকাতা, ১৯৩৯)।

লেখক—এই বইটা আকারে খুব বড়। একটা প্রবন্ধ বা ছোট্ট বইয়ের নাম করুন,—যা সহজে সাম্‌লানো যায়।

সরকার—তা' হ'লে "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের প্রতি সম্ভাষণ, ১৯২৫-২৭) বইটার কথা বল্‌তে পারি। এর ভেতর সূত্রাকারে অথবা সংক্ষেপে অনেক-কিছু বলা আছে। আর বাংলা বই যদি চাস্, তবে "নয়া বাঙ্‌লার গোড়া-পত্তন" বইয়ের (১৯৩২) প্রথম খণ্ডটা দেখ্‌তে পারিস্।

লেখক—আপনার এই উল্টা দৃষ্টিভঙ্গীকে হীরেন দত্ত কি চোখে দেখ্‌তেন?

সরকার—মজার কথা। "ফিউচারিজম্" বইটা হীরেনবাবুর ভাল লেগেছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গীওয়ালা আর একখানা বই হচ্ছে "পোলিটিক্যাল ইনস্‌টিটিউশান্‌স্ অ্যাণ্ড থিয়োরিজ অব দি হিন্দুজ" (হিন্দু জাতির রাষ্ট্র-শাসন ও রাষ্ট্র-দর্শন ১৯২২)। এই বইটাও তিনি তারিফ করতেন। এমন কি বইটার কিয়দংশ তিনি আবার এই অধমকে দিয়েই বাংলায় লিখিয়েও ছেড়েছিলেন। তখন আমি সুইট্‌স্যারল্যাণ্ডে (১৯২৩)। জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ্‌কে দিয়ে হীরেনবাবু বাংলা বইটা প্রকাশ করিয়েছিলেন। "হিন্দু রাষ্ট্রের গড়ন" নামে বইটা (১৯২৬) পাওয়া যায়। শুনেছি ফুরিয়ে গেছে।

লেখক—হীরেন দত্তের এই সহানুভূতির কারণ কি?

সরকার—একে চিন্তার বহুত্বনিষ্ঠা বল্‌তে পারি। এরই আর এক নাম বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বা দার্শনিক ঔদার্য। অথবা এমন কি ব্যক্তি হিসাবে আমি লোকটা হয়তো তাঁর খানিকটা পছন্দসই ছিলাম। কে বল্‌তে পারে? ১৯০৫-এর চ্যাংড়া ত!

প্রবীণের অর্থ উন্নতির দুস্‌মন

২৫শে অক্টোবর ১৯২২

লেখক—একটা নূতন দিকে আজ কথা চালাতে চাই। আচ্ছা, আপনি সাধারণতঃ প্রবীণদের কাছে নূতন-কিছু আশা করেন না কেন?

সরকার—চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পেরুতে-না পেরুতেই প্রবীণদের মগজ জমাট বেঁধে যায়,—আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে,—মুড়োর ঘি আর কিল্‌বিল্ করে না। প্রথমতঃ তাঁরা পয়সার মাপে যতখানি উঠ্‌বার, এই বয়সে প্রায় উঠে পড়েন। দ্বিতীয়তঃ পেশায়, পদে আর সমাজে যতখানি ইজ্জৎ পাওয়া সম্ভব, তাও এই বয়সে এক প্রকার পেয়ে বসেন। সাংসারিক হিসাবে তাঁদের উপরওয়ালা আর কেহ থাকে না। যাই তাঁরা করুন না কেন, তাঁদের কাজের সমালোচনা বা পরীক্ষা ইত্যাদি চালানো একপ্রকার অসম্ভব।

এই বয়সে তাঁরা খোলাখুলি নিরঙ্কুশ। দাম্ভিকতা মূর্ত্তিমন্ত হ'য়ে দেখা দেয় মানুষের এই

অবস্থায় তাঁরা যা-কিছু করেন, তাঁদের চিন্তায় তাই বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্প, সাহিত্য অথবা ঐ-ধরণের আর-কিছু। সবাই তাঁদের নজরে কেরাণী, উমেদার, নবীশ, সাক্‌রেৎ ইত্যাদি মাত্র। লিখিয়ে-পড়িয়েদের আখ্‌ড়ায় মরুব্বিয়ানা করা তখন তাঁদের একমাত্র ব্যবসা। কাজেই ধরাখানাকে সরা জ্ঞান করা তাঁদের পক্ষে অতি স্বাভাবিক চিন্তা। ব্যস্‌। যাঁহা এই মানসিক ও আন্তর্মানুষিক অবস্থার উৎপত্তি, তাঁহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুনিয়ায় পতনের সূত্রপাত। প্রবীণ শব্দের অর্থ পচা, বাসি, ফেলিতব্য, বর্জনীয় মাল।

একমাত্র বাংলা দেশ সম্বন্ধে আমার এ-সব কথা প্রযোজ্য নয়। এমন কি একমাত্র ভারত সম্বন্ধেও এই মত ঝাড়ছি না। তামাম্‌ দুনিয়ারই হালত্‌ এইরূপ। সেকাল আর একাল—সকল কালই এই অবস্থার সাক্ষী।

লেখক—জ্ঞানবিজ্ঞানের জগতে প্রবীণদের শুধ্‌রাবার কোনো ব্যবস্থা কি নেই?

সরকার—একপ্রকার নেই। প্রবীণেরা নিজ মত ও পথ ছাড়া আর কোনো মত ও পথের সন্ধান রাখেন না। এইটেই তাঁদের পরম ব্যাধি। আর কোনো-কিছু থাক্‌তে পারে, তা পর্যন্ত দাম্ভিকদের মাথায় আসে না। তাঁদের মত ও পথের বাইরে যদি কিছু থাকে, তা হয় তাঁদের চিন্তায় চ্যাংড়ামি, না হয় অ-বৈজ্ঞানিক, অ-দার্শনিক, অ-পারিষদিক, অ-পাণ্ডিত্যিক যা-হোক্‌-কিছু। এক কথায়,—দাম্ভিকদের চিন্তায় এসব নিরেট মূখ্‌খুমি। যদি তাঁদের মতপথের বিরোধী কোনো-কিছু কোথাও মাথা তুল্‌তে থাকে, তাহ'লে তাঁরা হ'ন চ'টে লাল। দিগ্বিদিক্‌-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে তাঁরা ভ্যাবাচ্যাকা খেতে থাকেন। ক্ষমতা থাক্‌লে সেই বিরোধী মতপথের প্রবর্তক বা প্রতিনিধিদেরকে ধ্বংস কর্‌বার জন্য তাঁরা উঠে-প'ড়ে লাগেন। এই উঠে-প'ড়ে লাগার কাজে তাঁদের সমগ্র কৃতিত্ব, পয়সা, পদ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা নিয়োজিত হয়। নতুন কিছু তাঁদের ত্রিসীমানায় ছায়া পর্যন্ত যাতে না ফেল্‌তে পারে, তার ব্যবস্থা করাই প্রবীণদের একমাত্র সাধনা দাঁড়িয়ে যায়।

সমাজের ভিতরকার সকল শ্রেণীর প্রবীণগুলা "চোরে-চোরে মাস্‌তুত' ভাই।" এঁরা পরস্পর পরস্পরকে ঠেকা দিয়ে রাখেন। এঁদের "জোট" বড় গভীর ও জটিল। বাইরের লোকের পক্ষে এই জোট ভাঙা প্রায় অসাধ্য-সাধন।

লেখক—দাম্ভিকতা কি প্রবীণদের নিত্য-সহচর?

সরকার—প্রায় একপ্রকার তাই। প্রবীণ বল্‌লে বুঝ্‌তে হবে সাংসারিক হিসাবে সফল ব্যক্তি। একমাত্র বয়সে বুড়ো নয়। টাকা-পয়সা, উচ্চপদ, ঘরবাড়ী, জমিদারি, খেতাব, উপাধি ইত্যাদি নানা জিনিষ প্রবীণের সংগে জড়িয়ে থাকে। ফলতঃ প্রবীণ আর দাম্ভিক একার্থক। সকল দিক থেকে প্রবীণ শব্দের অর্থ দাঁড়াচ্ছে স্বাধীন চিন্তার শত্রু—স্বাধীনতার বিঘ্ন—উন্নতির দুস্‌মন।

বয়স-তন্ত্রের সঙ্গে পয়সা-পদ-পদবীতন্ত্রের কোলাকুলি চলে সর্বদা। অনেক সময়ে এই দুই "তন্ত্র" একই আধিপত্য, বাদশাহি বা আভিজাত্যের দুই বিভিন্ন গড়ন মাত্র। পয়সা-পদ-পদবীর জোর না থাক্‌লে একমাত্র বয়সের জোরে কোনো মিঞা দেশের বা সমাজের ক্ষতি কর্‌তে পারে না।

কোনো নামজাদা প্রবীণ মাতব্বরকে নয়া-নয়া চিন্তার মুরুব্বি হ'তে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। দুনিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস এইরূপ দৃষ্টান্তের যারপরনাই দরিদ্র। হয়ত এক-আধটা দেখা যায়।

লেখক—মনে হচ্ছে আপনি কিছু বাড়িয়ে বল্‌ছেন?

সরকার—বোধ হয় তাই। খানিকটা অত্যুক্তি কর্‌লে হয় তো অবস্থাটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যেতে পারে। প্রবীণদের অন্যতম আত্মিক ব্যাধি হচ্ছে অতি-উৎকট দাম্ভিকতা। এই সাংঘাতিক ব্যারামের আত্মিক দাওয়াই আবিষ্কার করা এক-প্রকার অসম্ভব। সর্বদা মনে রাখ্‌তে হবে যে, প্রবীণগুলা পয়সার গরমে আর পদের গরমে সাংসারকে উস্তম-পুস্তম্‌ আর তিতি-বিরক্ত ক'রে রাখ্‌তে সমর্থ। পয়সা-পদ-পদবীওয়ালারা যথাসম্ভব সংঘবদ্ধভাবে জীবন চালায়। পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ বজায় রেখে চলতে অভ্যস্ত। তাঁদেরকে এঁটে-উঠা সমাজের পক্ষে সহজ-সাধ্য নয়। এই হিসাবে প্রবীণরা সমাজের শত্রু,—সত্যিকার দেশদ্রোহী। পাঁচ-সাত-দশ-পনর বৎসর ধ'রে দেশের উন্নতি আট্‌কে' রাখে দাম্ভিকেরা, মাতব্বরেরা, প্রবীণেরা। দুনিয়ার সর্বত্র চল্‌ছে এই দুর্গতি।

লেখক—জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি-সাধন করে তা হ'লে কারা? এজন্য কোন্‌ রকমের আত্মিক শক্তির দরকার হয়?

সরকার—পয়লা-ওয়ালা ও উচ্চপদস্থ বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-শিল্প-সেবীদের গবেষণা-গুলাকে যারা কলা দেখিয়ে জীবন সুরু কর্‌তে পারে তারাই জ্ঞানবিজ্ঞানের সীমানা ও চৌহদ্দি বাড়িয়ে দিতে সমর্থ। তাদেব আত্মিক শক্তি হওয়া চাই লড়াইনিষ্ঠ, বিদ্রোহনিষ্ঠ, স্বাধীনতানিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠ, ব্যক্তিত্বনিষ্ঠ। নামজাদা প্রবীণদের চিন্তা ও কর্মের বাইরে নতুন-নতুন আবিষ্কার কর্‌বার মতন বিপুল দুনিয়া প'ড়ে র'য়েছে। এরূপ প্রথমেই স্বীকার ক'রে নিয়ে কাজে নামে যারা, তারাই হ'তে পারে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি-প্রবর্তক। আর কারা? মুরুব্বিস্থানীয় বিজ্ঞানবীর, দার্শনিক সাহিত্যরথী ও শিল্পস্রষ্টাদের বিরুদ্ধে নয়া-নয়া মত-পথ খাড়া কর্‌তে সাহসী হয় যারা।

সোজা কথা,—বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য-শিল্পের আবিষ্কারেরা ছোক্‌রা। এসব লোক পঁচিশ-পঁয়ত্রিশের বড় নয়। আর অধিকাংশ স্থলেই খাওয়া-পরা সম্বন্ধে এদের বরাত লক্ষ্মীমন্ত নয়। অথচ এরাই হচ্ছে দাম্ভিকগুলোকে দুরস্ত করবার মতন মুগুর। এদেরকে প্রবীণেরা কোনো মতেই মাথা তুল্‌তে দেবে না। কিন্তু এরা মাথা চেঁড়ে উঠ্‌বেই-উঠ্‌বে। এইখানে প্রবীণের বিরুদ্ধে নবীনের সনাতন বিদ্রোহ। এই বিরোধ আর লড়াইয়েই জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি। প্রবীণগুলা টিট্‌ হ'তে বাধ্য।

লেখক—প্রবীণে-নবীনে বিবোধ এত মারাত্মক কেন?

সরকার—কারণটা খুবই গুরুতর। বয়সে ফারাকের দারুণ যে হিংসা সে জবরদস্ত হিংসা। প্রবীণরা দেখে ছোক্‌রারা জীবনটাকে নিয়ে ছেলেখেলা কর্‌ছে। গোটা জীবন ছোক্‌রাদের সাম্‌নে ভাস্‌ছে। সংসারে এখনো অনেক দিন ধ'রে তারা হেসে-খেলে বেড়াবে।

প্রবীণেরা তাদের অতীত দিনগুলোর দিকে তাকায় আব দীর্ঘশ্বাস ফেলে। হায়, যৌবনের দুনিয়া চোখে বেড়ানো তাদের কপালে আর জুট্‌বে না। যৌবনে তারা বেড়েছে রোজ-বোজ, সকালে-বিকালে। নিত্যি-নতুন খেয়াল তাদের মগজে জাগ্‌তো। হাজার রকমের স্বপ্নে তারা মেতে থাক্‌তো। সেই রকমই তেতে উঠ্‌ছে একালের নবীনেরা। সেই ধরণেরই স্বপ্নের অধিকারী আজকালকার ছোক্‌রারা।

প্রবীণেরা চায় আবার একবার ছোক্‌রা হ'তে,—দ্বিতীয়বার জোআন হ'তে। কিন্তু ছোক্‌রামি তো আর ফিরে আসবে না, যৌবনও আর মুখ দেখাবে না। কাজেই বিষাদ, কাজেই নৈরাশ্য, কাজেই হিংসা, কাজেই শত্রুতা। অতএব যারা আজকে যৌবনের স্বাধীনতা চাখ্‌ছে, যৌবনের কর্মনিষ্ঠায় মাত্‌ছে, তাদেরকে ধ্বংস করাই দাঁড়িয়ে যায় প্রবীণের স্বধর্ম। নবীনকে

জাহান্নমে পাঠানো প্রবীণদের প্রায় একমাত্র সুখভোগ।

("পয়সা-পদ-পদবীর প্রভাব", নভেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

গ্রন্থ-সম্পাদন, তর্জমা, ভাষ্য-টীকা

২৬শে অক্টোবর, ১৯৪২

লেখক—হীরেন দত্ত আর অরবিন্দ—এই দুইয়ের ভেতর দার্শনিক লেখক হিসাবে কোনো প্রভেদ আছে কি?

("অরবিন্দ-দর্শনে", ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—প্রভেদ বিস্তর। বিষয়টা পরিষ্কার কর্‌বার জন্য আগেকার কথাগুলা আর এক ঢং-যে সাজিয়ে বলি। একালের ভারতে যে-সকল দার্শনিক বই লেখা হয়, সেসব প্রায় একমাত্র প্রাচীন ভারত-সম্বন্ধীয়। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেন, তাঁরা এ সকল দার্শনিক বইকে নিজেদের গণ্ডীভুক্ত ক'রে নেন। খাঁটি দার্শনিক যাঁরা তাঁরা এ সকল লেখককে নিজেদের সংগে পংক্তিভোজনের জন্য ঠাঁই দিতে অভ্যস্ত নন।

এই উপলক্ষ্যে ইংরেজ দার্শনিক মুইয়ারহেডকে সাক্ষী ডাক্‌তে পারি। তাঁর এবং রাধাকৃষ্ণন কর্তৃক সম্পাদিত "কন্‌টেম্পোরারি ইণ্ডিয়ান ফিলজফি" (সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন, ১৯৩৬) বইয়ের ভূমিকায় তিনি মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছেন। বইয়ের অন্তর্গত তের-চোদ্দজন দর্শন-লেখকের আধাআধি তাঁর বিচারে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের ভাষ্যকার বিশেষ। অবশিষ্ট হচ্ছেন পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত কিন্তু প্রাচ্য মতেরই প্রতিনিধি।

কাজেই ভারতের অধিকাংশ দর্শন-লেখক স্বাধীনভাবে দার্শনিক নন। তবে এঁদের রচনাগুলাকে কয়েকটা বড়-বড় শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

("দার্শনিক বনাম দর্শনের ঐতিহাসিক, ২৭শে আগষ্ট, "হীরেন দত্ত'র বঙ্গ-দর্শন" ১৩ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—সেই শ্রেণীগুলি কী-কী? একটু খোলসা করে বলুন না।

সরকার—প্রথমতঃ, মূল পাণ্ডুলিপি থেকে গ্রন্থ-সম্পাদন। দেশ-বিদেশের ভিন্ন-ভিন্ন কেন্দ্রে কোন গ্রন্থ-বিষয়ক ভিন্ন-ভিন্ন রকমের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়। এই ধরণের কয়েকখানা সাম্‌নে রেখে তা থেকে একটা বই সম্পাদন করা কোনো-কোনো দার্শনিক লেখকের দস্তুর। তারপর সেই বই ছাপ্‌বার ব্যবস্থা। এই শ্রেণীর কাজ এখনো বহুকাল পর্যন্ত চল্‌তে বাধ্য,—চলা উচিতও। এর জন্য অশেষ পাণ্ডিত্য ও মেহনৎ আবশ্যক। নানা গ্রন্থের অসংখ্য পাণ্ডুলিপি অজ্ঞাত আর অসম্পাদিত অবস্থায় প'ড়ে আছে।

দ্বিতীয়তঃ, তর্জমা। পাণ্ডুলিপি বা ছাপা বই হ'তে ঝাড়া অনুবাদ। বাংলা, হিন্দি, মারাঠি ইত্যাদি ভারতীয় ভাষায় তর্জমা হচ্ছে। তা ছাড়া ইংরেজিতেও হ'চ্ছে। ফরাসী, জার্মাণ ইত্যাদি ভাষায় ভারতীয় পণ্ডিতদের হাতে এক-আধ্‌টা তর্জমা এখনো বেরুচ্ছে না। সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষায় মূল প'ড়ে প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান দখল করা দু'চারজনের পক্ষে সম্ভব। সাধারণ লিখিয়ে-পড়িয়েদের জন্য চাই তর্জমা। শ'য়ে-শ'য়ে বই তর্জমা করা আবশ্যক। কৌটিল্য, মনু, শুক্র ইত্যাদি ঋষি-প্রণীত অর্থ-সমাজ-রাষ্ট্রশাস্ত্রের তর্জমাও ভারতীয় দার্শনিক গ্রন্থাবলীর তর্জমার ভেতর ফেল্‌ছি।

তৃতীয়তঃ, ভাষ্য ও টীকা। তর্জমার সংগে-সংগে বিবৃত বিষয়গুলাকে বিশদরূপে বুঝাবার চেষ্টা। ভাষ্য আর টীকাও তর্জমার জুড়িদারস্বরূপ টানা চ'লে থাকে। ভাষ্য ও টীকা ছাড়া অনেক বই-ই একমাত্র তর্জমার জোরে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না। ভাষ্যকার ও টীকাকারদের কাজ তর্জমাকারীদের চেয়ে কম মূল্যবান নয়। ভাষ্য আর টীকা বানাতে গিয়ে লেখকেরা নিজ-নিজ মাথার ঘি ঢাল্‌তে সুযোগ পান। তার ফলে দেশী-বিদেশী আর নয়া-পুরাণা হরেক-রকমের বই, মত আর গ্রন্থকারের সংগে পাঠকদের মোলাকাৎ হয়।

সেকালের মতন একালেও ভাষ্য আর টীকা লেখা হচ্ছে। এলাহাবাদের পাণিনি অফিস হ'তে বামনদাস বসু কর্তৃক সম্পাদিত "সেক্‌রেড্‌ বুক্‌স্‌ অব দি হিন্দুজ্‌" নামক হিন্দুজাতির ধর্মগ্রন্থমালায় আধুনিক ভারতীয় ভাষ্য-টীকা ইংরেজিতে পাওয়া যায় দস্তুরমতন। বস্তুতঃ একালে যাঁরাই প্রাচীন বইয়ের তর্জমায় হাত দিয়েছেন তাঁরা অনেক সময় সেকেলে ভাষ্যও টীকার তর্জমা ক'রে গেছেন। অধিকন্তু সংগে-সংগে নিজেদের ভাষ্য আর টীকাও তাঁরা প্রকাশ ক'রে থাকেন। আধুনিক ভাষ্য আর টীকার ভেতর পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানের তত্ত্ব আর তথ্য প্রবেশ ক'রেছে। এই অধমের শুক্রনীতি-তর্জমা পাণিনি অফিসের গ্রন্থমালার অন্তর্গত।

সার-সংগ্রহ ও ইতিহাস

চতুর্থতঃ, সার-সংগ্রহ ও ইতিহাস। পাঠকের পক্ষে সার-সংগ্রাহক ও ঐতিহাসিকেরা যারপরনাই উপকারী। সাধারণতঃ মূল কিংবা তর্জমা আর ভাষ্য ও টীকা ঘাঁট্‌বার সুযোগ, সময় বা শক্তি বিরল। সহজে কোনো বিদ্যার আকার-প্রকার দখল কর্‌বার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে সার-সংগ্রহ আর ইতিহাসের শরণাপন্ন হওয়া। কি ইস্কুল-কলেজের ছাত্র-মাষ্টার, কি মামুলি লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকে,—দুই শ্রেণীর পাঠকই সারসংগ্রহ আব ইতিহাসের নিকট হুবহু ঋণী। সার-সংগ্রাহক আর ঐতিহাসিকের পসার চিরকালই থাক্‌বে। এদের মার নেই—ইজ্জৎও কোনোদিন মারা যাবে না। সম্প্রতি সার-সংগ্রহ আর ইতিহাসকে এক শ্রেণীর সামিল ক'রে নিলাম। বলা বাহুল্য তা সব সময় মেনে নেওয়া ঠিক নয়।

সারসংগ্রাহক আর ঐতিহাসিকদের কেহ-কেহ হয়তো খোদ পাণ্ডুলিপি ব্যবহার কর্‌তে ওস্তাদ। কিন্তু একমাত্র পাণ্ডুলিপিব উপর নির্ভর ক'রে সারসংগ্রহ বা ইতিহাসের বই বেশী লেখা হয়নি। ছাপানো বইয়ের মাল খতিয়ান করাই প্রধান কাজ থাকে। কোনো-কোনো সারসংগ্রাহক বা ঐতিহাসিক মূলগ্রন্থের তর্জমা নিজেই ক'রে থাকেন। কিন্তু সবকয়টা মূলগ্রন্থের তর্জমা করা কোনো ঐতিহাসিকের পক্ষে একা সম্ভব নয়। কাজেই অন্যান্য লেখকদের তর্জমা আর ভাষ্য ও টীকা হ'তে সাহায্য লওয়া সকল সারসংগ্রাহক ও ঐতিহাসিকের দস্তুর।

তবে প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাবলীর নির্ভুল তর্জমা হয়তো কোনো-কোনো সময় পাওয়া যায় না। পূর্ব-প্রকাশিত তর্জমাবলীর ভেতর ভুলচুক্‌ বেশ-কিছু রয়েছে। কাজেই সারসংগ্রাহক আর ঐতিহাসিকের নিকট যদি মূল গ্রন্থটা না থাকে, তা' হ'লে অপরের তৈরী তর্জমা আর ভাষ্য ও টীকা ব্যবহার করা ছাড়া উপায় থাকে না। তাতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে বলা বাহুল্য।

একালের ভারতীয় দর্শন-লেখকদের ভেতর সারসংগ্রাহক আর ঐতিহাসিকদের সংখ্যাই

বেশী। যাঁদের বইয়ের নামে সার বা ইতিহাস শব্দ নেই, তাঁদের রচনার ভেতরও সার ও ইতিহাস বস্তু-দু'টাই অল্প-বিস্তর অথবা বেশ-কিছু পাওয়া যায়।

ব্যাখ্যাশ্রেণীর দর্শন-সাহিত্য

পঞ্চমতঃ, ব্যাখ্যা। মামুলি বুঝাবার অর্থে ব্যাখ্যা শব্দ ব্যবহার করছি না। বলাবাহুল্য যে—ব্যাখ্যা আর তর্জমা কোনোমতেই এক বস্তু নয়। তা ছাড়া ভাষ্য আর টীকা জিনিষ-দুটা গ্রন্থের লেজুড়মাত্র। মূলের আর তর্জমার সংগে-সংগে চলা তার দস্তুর। মূল-বইয়েব অধ্যায়-পরিচ্ছেদ ইত্যাদির সংগে অসহযোগ চালানো ভাষ্য আর টীকার পক্ষে সম্ভব নয়। স্বরাজ ভোগ করা ভাষ্য আর টীকার কপালে লেখা নেই। ভাষ্যকার আর টীকাকার নিজ মর্জিমাফিক্ অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ ভাগ করতে অধিকারী নন। তাঁদের কাজ মূল গ্রন্থকারের চিন্তাপ্রণালীর পেছন-পেছন অগ্রসর হওয়া। মূল-রচনার ভেতর মাঝে-মাঝে কঠিন শব্দ বা নতুন চিন্তা হাজির হয়। সে-সকল স্থানে তাঁরা এখানে-ওখানে-সেখান থেকে মাল এনে আলোচ্য বিষয়টা সহজ ক'রে দেন।

লেখক—ব্যাখ্যাকার আর ভাষ্যকারে কি প্রভেদ?

সরকার—ব্যাখ্যাকার বলছি তাঁকে যিনি মূলগ্রন্থের অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ-মাফিক্ কলম ধরতে নিজকে বাধ্য বিবেচনা করেন না। মূলগ্রন্থের কোনো নির্দিষ্ট মত বা শব্দ বেছে নিয়ে ব্যাখ্যাকার তার উপর নিজ মগজের ক্ষমতা দেখাতে অভ্যস্ত। এর জন্য ব্যাখ্যার ভেতর মূলের অনেক-কিছু বাদ প'ড়ে যেতে পারে। কিন্তু মূলের প্রতিপাদ্য বিষয়টা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। মূলের সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যাকার নিজেরই সিদ্ধান্তস্বরূপ প্রচার করবেন। এই প্রচারকার্যে তিনি যে-সব যুক্তি প্রয়োগ করেন তার সবটা মূলের ভেতর না পাওয়া যেতে পারে। তারপর ব্যাখ্যা প্রত্যেক বিষয়ে মূলের গোলাম নয়। তবে সিদ্ধান্তটা মূলমাফিক্। ব্যাখ্যাকার খানিকটা স্বরাজ ভোগ ক'রে থাকেন। ব্যাখ্যাকারের একটা স্বাধীনতা আছে যে স্বাধীনতা ভাষ্যকার আর টীকাকারের নেই। কাজেই ব্যাখ্যাকারকে খানিকটা দার্শনিক, আধা দার্শনিক বা "নিম"-দার্শনিক বলা যেতে পারে।

লেখক—ভারতীয় দর্শন-লেখকদের রচনা থেকে ব্যাখ্যাশ্রেণীর কিছু নমুনা দিন না?

সরকার—ভারতীয় দর্শন-লেখকগণের ভেতর কেউ-কেউ একই সংগে ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর বই রচনা ক'রেছেন। যিনি তর্জমাকারী, তিনি নিজেই হয়তো পাণ্ডুলিপি থেকে বইটা সম্পাদনও ক'রেছেন। কেহবা প্রধানতঃ ঐতিহাসিক। তিনি আবার স্বতন্ত্র তর্জমা এবং ব্যাখ্যাশ্রেণীর বইও লিখেছেন।

ব্যাখ্যাশ্রেণীর ভেতর পড়বে,—কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের "ষ্টাডিজ্ ইন্ বেদান্তিজম্" (১৯০৯), জগদীশ চট্টোপাধ্যায়ের "হিন্দু রিয়ালিজম্"(হিন্দু বস্তুনিষ্ঠা, ১৯১২) ও কোকিলেশ্বর শাস্ত্রীর "উপনিষদেব উপদেশ" (১৯১৩)। এই গেল স্বদেশীযুগের কথা। পরবর্তীকালে এই কোঠে ঠাঁই পাবে সুশীল মৈত্র-প্রণীত "এথিক্স্ অব দি হিন্দুজ" (কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দু চিন্তা, (১৯২১)। বইটা তথ্যপূর্ণ, সকলেরই পড়া উচিত। সুরেন দাশগুপ্ত'র "হিন্দু মিস্‌টিসিজম্" (হিন্দু রহস্যবোধ বা অতীন্দ্রিয়তা, ১৯২৭) ব্যাখ্যা-গ্রন্থ। অতুল গুপ্ত'র "কাব্য-জিজ্ঞাসা" (১৯২৯) এই শ্রেণীর সুখপাঠ্য বাংলা বই। বৈদান্তিক বুদ্ধিতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যা ধীরেন্দ্রমোহন

দত্ত-প্রণীত "সিক্‌স্ অব নোইং" (লণ্ডন, ১৯৩২)। নলিনী ব্রহ্ম-প্রণীত "ফিলজফি অব্ হিন্দু সাধনা" (১৯৩২), স্বামী শর্বানন্দ-প্রণীত "রিলিজ্যান্ অ্যাণ্ড ফিলজফি অব্ দি গীতা" (গীতার ধর্ম ও দর্শন, ১৯৩৩) এবং মহেন্দ্র সরকার-প্রণীত "উপনিষদের আলো" বই দু'টা (১৯৩৮) ব্যাখ্যা-সাহিত্যেরই মাল। ব'লে রাখা ভাল যে, বেদান্তের ওপর চাঁটি মারে সকলেই। একালের লেখকদের ভেতর নাম করতে পারি মহেন্দ্র সরকারের আর সরোজকুমার দাসের। কোকিলেশ্বরের "অদ্বৈতবাদ" (১৯২২) আর শঙ্কর-বেদান্ত বিষয়ক "ফেলোশিপ লেক্‌চার্স" (১৯৩১) প্রত্যেক পাঠকের পক্ষে বেদান্ত-ভূমিকা স্বরূপ কাজের বই।

কিছুদিন হ'লো বেরিয়েছে সতীশ চট্টোপাধ্যায়ের "ন্যায় থিয়োরী অব্ নলেজ" (ন্যায় দর্শনের বুদ্ধিতত্ত্ব ১৯৩৯)। এই বইটার প্রতি আমি সুধী সমাজের বিশেষ দৃষ্টি টেনে আন্‌তে চাই। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষক মাত্রেরই এই রচনা আগে প'ড়ে কাজ সুরু করা উচিত। হিন্দুমগজের বস্তুনিষ্ঠা ও যুক্তিনিষ্ঠা যারপরনাই উজ্জ্বল মূর্তিতে এই বইয়ের ভেতর আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। আমার "পজিটিভ ব্যাগগ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি" বইয়ের (১৯১৪, ১৯২১, ১৯২৬, ১৯৩৭) মস্ত একটা অধ্যায় যেন এই রচনার ভেতর পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ-দর্শন বিষয়ক আধুনিক ব্যাখ্যামূলক রচনার ভেতর পড়বে বেণীমাধব বড়ুয়া ও নলিনাক্ষ দত্ত'র গবেষণাসমূহ। একখানা উপাদেয় গ্রন্থ হচ্ছে সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়ের "বুদ্ধিষ্ট্ থিয়োরি অব ইউনিভার্স্যাল ফ্ল্যাক্‌স্" (বৌদ্ধ-দর্শনের অনিত্য, ক্ষণিক বা পরিবর্তন-তত্ত্ব ১৯৩৫)।

১৯৪১ সনে বেরিয়েছে সুশীল মৈত্র-প্রণীত "স্টাডিজ্ ইন্ ফিলজফি অ্যাণ্ড রিলিজ্যান্" (দর্শন ও ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাবলী) আর সুরেন দাশগুপ্ত-প্রণীত "ফিলজফিক্যাল এস্‌সেজ" (দার্শনিক প্রবন্ধাবলী)। প্রত্যেক বইয়ের অধিকাংশ রচনাই প্রাচীন ভারতীয় মতামতের সার-সংগ্রহ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা। স্বাধীন চিন্তার পরিচয় কিছু-কিছু আছে।

প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ধন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক একালের বাঙালী গবেষণাসমুহ কতকাংশে এই ব্যাখ্যা শ্রেণীর অন্তর্গত। কিছু-কিছু সারসংগ্রহ ও ইতিহাসের গণ্ডীভুক্ত।

ব্যাখ্যা পর্যন্ত পাঁচশ্রেণীর রচনার কোনোটাই আমার বিচারে খাঁটি দর্শন নয়। সবই পরকীয় মতের আলোচনা। এ সম্বন্ধে গোঁজামিল রাখা আমার দস্তুর নয়। ব্যাখ্যাকে অনেকে হয়ত ভাষ্য হ'তে তফাৎ করতে রাজি হবে না। তা হ'লে আমার বিচারমাফিক্ "নিম্"-দার্শনিকও খুঁটে-খুঁটে বের করা মুস্কিল।

লেখক—ভারতীয় দর্শন গবেষকদের প্রায় সব রচনাই আপনার জানা আছে দেখ্‌ছি?

সরকার—এইসব কাজে লাগে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির খতিয়ান কর্‌বার জন্য। তা ছাড়া আমার "পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ সিন্স ১৯০৫" (১৯০৫-এর পরবর্তী রাষ্ট্র-দর্শনসমূহ) বইয়ের ভেতর চিত্ত-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, ধর্ম-তত্ত্ব ইত্যাদি নানা দার্শনিক সিদ্ধান্তের ঠাঁই আছে। আমাদের আধুনিক লেখকগণের চিন্তাও তার ভেতর দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রায় সবই প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার সার-সঙ্কলন ও ব্যাখ্যা। এইজন্য দেওয়া সম্ভবপর হয় নি। কিন্তু খবর রাখ্‌তে হয় সব-কিছুরই। আর বিদ্যা বাড়াবার জন্য মুখস্থও কর্‌তে হয় কিছু-কিছু।

("অরবিন্দ-দর্শন", ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪২, "ব্যাখ্যা বনাম ভাষ্য", ১৩ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

বিদেশী দর্শনের ভারতীয় প্রচারকগণ

২৮শে অক্টোবর ১৯৪২

লেখক—বিদেশী দর্শন-সাহিত্যের তর্জমা, ভাষ্য, সারসংগ্রহ, ইতিহাস বা ব্যাখ্যা বর্তমান ভারতে কেমন চল্‌ছে?

সরকার—এখনো বেশী নয়। হীরালাল হালদার ও শিশির মৈত্রের রচনাবলী আগে উল্লেখ করেছি। পরবর্তী কালের লেখালেখির ভেতর বিশেষ উল্লেখযোগ্য মুরলীধর ও হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "জেনেটিক্‌ হিস্‌ট্রি অব দি প্রব্‌লেম্‌স্‌ অব ফিলজফি" (১৯৩৫)। বইটার নাম শুনে' ভেতরকার মাল বুঝা অসম্ভব। দেশী-বিদেশী দর্শনের তুলনা সাধিত হ'য়েছে। নয়া আর পুরাণা দুইই লেখকেরা পরখ্‌ ক'রে দেখেছেন। যুগের পর যুগ ধ'রে আলোচনাটা চালানো হয়নি। চালনো হয়েছে দর্শকের আলোচ্য বিষয় ধ'রে। তুলনাগুলার ভেতর লেখকেরা একটা ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব ফুটিয়ে তুল্‌তে চেষ্টা করেছেন। প্রয়াস চিত্তাকর্ষক। (পৃষ্ঠা ৩৫)

কবি ও প্রবন্ধ-লেখক ওয়াজিদ আলি বাংলায় কবি ইক্‌বালের দর্শন প্রচার ক'রেছেন। ইক্‌বাল বিদেশী নন,—ভারতীয় পাঞ্জাবী। কিন্তু তিনি ফার্সী-আর উর্দু-লেখক। এই জন্য তাঁর বাঙালী প্রচারককে এইখানে ঠাঁই দিচ্ছি।

এই শ্রেণীর ভেতর আর একটা উল্লেখযোগ্য বই হরিদাস ভট্টাচার্য প্রণীত "ফাউণ্ডেশান্‌স অব লিভিং ফেইথ্‌স্‌" (জ্যান্ত ধর্মসমূহের বনিয়াদ, ১৯৩৮)। এটা তুলনামূলক ধর্ম ও দার্শনিক আলোচনার বই। দ্বিতীয় ভাগ এখনো বের হয়নি। প্রথম ভাগে আছে পাঁচটা ধর্মের বৃত্তান্ত। হিন্দুত্ব ছাড়া আছে ইহুদি ধর্ম, খৃষ্ট ধর্ম, জারাথুষ্ট্রার ধর্ম আর ইস্‌লাম। নেহাৎ বিবরণমাত্র নয়। ঐতিহাসিক তথ্য কিছু-কিছু আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বইটার আসল কথা বিশ্লেষণ আর তুলনায় আলোচনা। (পৃষ্ঠা ৬৯-৬২)

হুমায়ুন কবির প্রণীত কাণ্ট-বিষয়ক বাংলা প্রবন্ধ-কেতাব (১৯৩৯) এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁর "পোয়েট্রি, মনাড্‌স্‌ অ্যাণ্ড সোসাইটি" (কাব্য, অণু এবং সমাজ) বইয়ের (১৪৪১) ঠাঁইও এখানে।

এই সব বিদেশী আর দেশী-বিদেশী তথ্য ও তত্ত্বের বইগুলাকে ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত কর্‌তে পারি।

লেখক—এই ধরণের বিদেশী দর্শন-সাহিত্যের আলোচনা অথবা তুলনামূলক বই আর কারো হাতে বেরোয় নি?

সরকার—হ্যাঁ, মনে পড়্‌ছে। আগেই দু'-একবার ব'লেছি ব্রজেন শীলের বৈষ্ণব ও খৃষ্টধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ (১৮৯৯)। অভেদানন্দের ছিল "গ্রেট্‌ সেভিয়ার্‌স অব দি ওয়ার্লড" (দুনিয়ার উদ্ধারকর্তৃগণ, ১৯১২ নিউইয়র্ক)। এই বক্তৃতায় আছে কৃষ্ণ, জারাথুষ্ট্রা ও চীনের লাউটুসে সম্বন্ধে আলোচনা। এই দুটো রচনাও ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত। (পৃষ্ঠা ৬১-৬২)

লেখক—এই ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্তর্গত রচনা আপনার কিছু আছে?

সরকার—চীনে থাক্‌বার সময় শাংহাইয়ে বেরিয়েছিল "চাইনিজ্‌ রিলিজ্যন থ্রু হিন্দু আইজ্‌" (হিন্দু চোখে চীনাধর্ম, ১৯১৬)। এ বইয়ের মাল হচ্ছে কন্‌ফুসিয়্‌, বৌদ্ধ, তাও, পৌরাণিক এবং শিন্তো ধর্ম। ১৯৩৭ সনে বেরিয়েছে "রিলিজ্যাস্‌ ক্যাটিগরিজ অ্যাজ ইউনিভার্স্যাল এক্‌স্‌প্রেশন্‌স্‌ অব ক্রিয়েটিভ্‌ পার্সন্যালিটি"। রামকৃষ্ণ শত-বার্ষিকীর ধর্ম-

মহাসম্মেলনে পঠিত। একাল-সেকালের সকল ধর্মেই সৃষ্টিমূলক ব্যক্তিত্বের রকমারি পরিচয় পাওয়া যায়। এই বিষয় নিয়ে রচনা। তা ছাড়া দেশী-বিদেশী অর্থশাস্ত্র ও রাষ্ট্রশাস্ত্র ইত্যাদির বিষয়ে আছে ইংরেজি বই "পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ্ সিন্স্ ১৯০৫" (৪ খণ্ড) আর বাংলায় "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (২ খণ্ড)।

("পাশ্চাত্য-নিষ্ঠার আবশ্যকতা", ৪ঠা অক্টোবর ১৯৪২, "পাশ্চাত্য-নিষ্ঠায় হীরেন্দ্রনাথ", ১৩ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কোনো-কোনো ভারতীয় রচনা আই-এ, বি-এ পরীক্ষার জন্য ব্যবহার ক'রে থাকে। সেগুলা সম্বন্ধে বিদেশী দর্শন-সাহিত্যের ভারতীয় চর্চা হিসাবে আপনি কী মনে করেন?

সরকার—আমি টেক্সটবুক-লেখকদেরকে গবেষক-গ্রন্থকারদের আখ্ড়ায় ঠাঁই দিতে অভ্যস্ত নই। তবে তাঁদের কাজে আমি সুখী আছি। কারণ টেক্সট্-বুক লিখে' তাঁরা বেশ-কিছু দু'পয়সা রোজগার কর্তে পেরেছেন। বছর কয়েক আগে পর্যন্ত এই ধরণের বই সব আস্তো একমাত্র বিলাত আর মার্কিণ মুল্লুক থেকে। তাতে বিদেশী লেখক আর প্রকাশকদের ট্যাকে ভারতীয় টাকার স্রোত ব'য়ে যেতো। তাদের ছিল একচেটিয়া পসার। আজকাল আমাদের দেশী লেখক ও প্রকাশকেরা কিছু-কিছু টাকার মুখ দেখতে পাচ্ছে। এটা আনন্দের কথা। লেখালেখির রাজ্যে,—ইস্কুল-কলেজের আবহাওয়া,—একে আমি স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনেরই অন্যতম মূর্তি সম্ঝে' থাকি।

ছয়-শ্রেণীর দর্শন-লেখক

লেখক—এই ছয় শ্রেণীর ভেতর হীরেন দত্তকে কোথায় ফেল্ছেন আর অরবিন্দের স্থানই বা কোথায়?

সরকার—আগেই বলেছি,—ভারতীয় দর্শন-লেখকগণের ভেতর অনেকেই একাধিক বইয়ের গ্রন্থকার। তাদের সবকয়টাই কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। প্রত্যেক লেখক একসংগে দুই, তিন বা এমন কি ছয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

হীরেন দত্ত'র দার্শনিক রচনাবলীর কয়েকটা ব্যাখ্যা-শ্রেণীর ভেতর পড়বে। বেদান্ত ও উপনিষদ্ বিষয়ক বই দুটা বিশেষ ভাবে সার-সংগ্রহের অন্তর্গত। খাঁটি তর্জমার আর ভাষ্যে তাঁর হাত বোধ হয় খেলেনি। হীরেন্দ্রনাথ ব্যাখ্যাকার হিসাবে বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য বক্তা-লেখকগণের দলভুক্ত। প্রসঙ্গ-ক্রমে বল্তে পারি যে, বিবেকানন্দ, বিজ্ঞানানন্দ, শর্বানন্দ, মাধবানন্দ, বীরেশ্বরানন্দ ইত্যাদি স্বামীজীরা তর্জমাকারীও বটে।

রামকৃষ্ণ-মিশনের বক্তারা প্রধানতঃ বেদান্তের ব্যাখ্যাকার। হীরেনবাবু হিন্দুদর্শনের নানাবিভাগে ব্যাখ্যার কাজ ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথও ব্যাখ্যাকার। তাঁর দার্শনিক চিন্তা প্রধানতঃ উপনিষৎ-সাহিত্যের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত।

অরবিন্দ'র "ভাগবত-জীবন"-বই ব্যাখ্যাশ্রেণীর অন্তর্গত নয়। বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-হীরেন্দ্রনাথের মতন অরবিন্দ ব্যাখ্যাকার নন। অরবিন্দ নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দার্শনিক। তাঁর "ভাগবত-জীবন" বইটার কথা বল্ছি।

লেখক—রচনাগুলার শ্রেণীবিভাগে আপনি কোনো নিয়ম মেনে চ'লেছেন কি?

সরকার—হাঁ। একটা নিয়ম আছে নিশ্চয়ই। মগজের স্বাধীনতা কোন্ রচনায় কত,—সেই দিকে আমার বেশী নজর। আমার শ্রেণী-বিভাগে তর্জমার চেয়ে ভাষ্য ও টীকা কিছু স্বাধীন। আবার ভাষ্য টীকার চেয়ে ব্যাখ্যা বেশ-কিছু স্বাধীন। কিন্তু ব্যাখ্যাকারের চেয়েও অরবিন্দ'র "ভাবগত-জীবন" বেশী স্বাধীন। তবে দার্শনিক রচনার লেখকের পক্ষে অরবিন্দ'র চেয়েও বেশী স্বাধীন হওয়া সম্ভব।

যাই হোক্, অরবিন্দ'র "ভাগবত-জীবন"-বইটা বেশ স্বাধীন। রবীন্দ্রনাথের "সাধনা" (ইংরেজি বই, হার্ভার্ড, ১৯১৪) ততটা স্বাধীন নয়। রবীন্দ্র-দর্শন প্রায় পুরাপুরি উপনিষদের ব্যাখ্যা,—তবে আধুনিক বাঙালীর লিখিত কবিত্বময় ভাবুকতাপূর্ণ ব্যাখ্যা। তার দামও ঢের।

("অরবিন্দ-দর্শন", ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪২, "স্বাধীনতা-রূপী আমির দার্শনিক কৃষ্ণ ভট্টাচার্য", ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২, "হীরেন দত্ত'র বঙ্গ-দর্শন", ১৩ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য।

"ভাগবত-জীবন" ও "শিকাগো-বক্তৃতা"

লেখক—আপনি ব'লেছেন যে, অরবিন্দ-দর্শনে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের পারিভাষিক আছে বিস্তর। তা হ'লে হীরেন দত্ত ইত্যাদির মতন অরবিন্দ ব্যাখ্যাকার আছে বিস্তর। তা হ'লে হীরেন দত্ত ইত্যাদির মতন অরবিন্দ ব্যাখ্যাকার মাত্র নন কেন? (পৃষ্ঠা ৪০)

সরকার—হীরেনবাবু কোনো-না-কোনো পরকীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য কলম ধ'রেছেন। কোনো বইয়ে উপনিষদের মত প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। অন কোনো বইয়ে তিনি বৈষ্ণব মতে সায় দিয়েছেন ইত্যাদি। কিন্তু অরবিন্দ'র "ভাগবত-জীবন" কোনো পরকীয় মতের স্বপক্ষে যুক্তি জোগাবার জন্য লেখা হয় নি। এটা বিল্‌কুল্ অরবিন্দ'র বই। অবশ্য প্রাচীন ভারতীয় শব্দের ছড়াছড়ি এর ভেতর সর্বদাই দেখ্‌তে পাই। (পৃষ্ঠা ১০৫)

লেখক—অরবিন্দর "ভাগবত-জীবন"কে তা হ'লে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত কর্‌ছেন?

সরকার—বর্তমানে এই বই একদম একা দাঁড়িয়ে আছে। একে দলস্থ কর্‌তে পার্‌ছি না। যাই হোক্, একে সপ্তম শ্রেণীর একমাত্র নিদর্শন সম্ঝে' রাখ্।

তবে এই শ্রেণীর ভেতর ফেল্‌তে পারি একটা ছোট্ট প্রবন্ধ। তা হচ্ছে বিবেকানন্দ'র "শিকাগো বক্তৃতা" (১৮৯৩)। তার ভেতর "ঈ ডিভিনিটিজ্ অন্ আর্থ,—সিনার্স?" (ওহে দুনিয়াবাসী দেবতার দল,—পাপী?)—এই পাঁচ শব্দের একটা হুংকার আছে। সেই হুংকারের ভেতর আমি বিবেকানন্দ-দিগ্বিজয়ের মন্তর দেখ্‌তে পাই। বক্তৃতা ও মন্তরটার ব্যাখ্যা "নয়া বাঙ্‌লার গোড়াপত্তন" গ্রন্থেব দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৩২) আর "ক্রিয়েটিভ্ ইণ্ডিয়া (স্রষ্টা ভারত, ১৯৩৭) বইয়ে প্রকাশ ক'রেছি। ("বিবেকানন্দ-যুগ", নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

স্বাধীন দর্শন

লেখক—আপনাব বিচারে অষ্টম শ্রেণীর কোনো দার্শনিক রচনা ভারতে আছে?

সরকার—বেশী আছে একথা বল্‌তে পার্‌ছি না। তবে একদম না থাকার কারণ নেই। আর না থাক্‌লেও একদিন-না-একদিন অষ্টমশ্রেণীর রচনাও দেখা দেবে। আগে কৃষ্ণ ভট্টাচার্য-প্রণীত "সাবজেক্ট অ্যাজ্‌ ফ্রীডম" (স্বাধীনতারূপী আমি ১৯৩০) বইটা উল্লেখ ক'রেছি। (পৃঃ ৭৯)। তা ছাড়া ব'লেছি যে, অন্যান্য লেখকদের রচনাবলীর ভেতর অধ্যায় সমূহ ঘাঁট্‌তে সুরু কর্‌লে খাঁটি স্বাধীন চিন্তা হয়তো কোথাও-কোথাও পাওয়া যাবে। বইয়ের নামমাত্র দেখে' তার ভেতরকার মাল সম্বন্ধে আন্দাজ কর্‌তে বসা ঠিক নয়। প্রত্যেক বইয়ের ভেতরটা খুঁটে-খুঁটে দেখা উচিত।

("দর্শনের আলোচ্য বিষয়", ২৭শে আগষ্ট, "দর্শনের কষ্টিপাথর", ৩০শে আগষ্ট, "অরবিন্দ-দর্শন", ৩রা সেপ্টেম্বর, "ধন-রাষ্ট্র-সমাজ বিজ্ঞান", ৬ই অক্টোবর, "ব্যাখ্যা বনাম ভাষ্য", ১৩ই অক্টোবর, "ব্যাখ্যাশ্রেণীর দর্শন-সাহিত্য", ২৬শে অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)।

লেখক—ভারতে অষ্টম শ্রেণীর দার্শনিক রচনা কিরূপ হবে?

সরকার—তা তো তোরা বল্‌তে পারিস্‌। তোদেরই কৃতিত্ব দেখাবার জন্য সেই শ্রেণীটা ব'সে রয়েছে। যাই হোক্‌, আমিও কিছু এসম্বন্ধে ব'কে যাচ্ছি। আমার "গরুমি"তে তোদের ক্ষতি হবে না।

অষ্টমশ্রেণীর রচনার ভেতর প্রাচীন ভারতীয় পারিভাষিক শব্দ হয়তো একটাও থাকবে না। আগে, বোধ হয়, কোথাও বলেছি যে, পারিভাষিকগুলা হবে প্রধানতঃ লেখকের নিজ মগজের সন্তান। সেই শ্রেণী হবে "ভাগবত-জীবন"-শ্রেণীর পরবর্তী ধাপ। তাকে বল্‌বো খাঁটি নব্য ভারতীয় দর্শন। (পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯)

লেখক—স্বাধীন দার্শনিকের বিদেশী দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টা বুঝিয়ে দিন না?

সরকার—একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এই ধর্‌ মার্কিণ দার্শনিক ডুয়ী ও হকিং। এঁদের গণ্ডাকয়েক বই আছে। এঁরা ছেলেবেলায় প্রাচীন গ্রীকদর্শনও গণ্ডুষ ক'রেছেন আর আধুনিক জার্মাণ দর্শনও গিলেছেন। কিন্তু এঁদের বইগুলা ঘাঁট্‌লে মনে হবে যেন এঁরা গ্রীসকেও কলা দেখান। আর জার্মাণিকেও কলা দেখান। এঁদের আবহাওয়ায় সক্রেটিস, প্লেটো, আরিষ্টটলের টিকিও পাকড়াও কর্‌তে পারি না আব কাণ্ট-ফিখ্‌টে-হেগেলেরও টুপি দেখ্‌তে পাই না। কথাটা অতিরঞ্জিত ক'রে বল্‌ছি,—ঠারেঠোরে বুঝাবার জন্য। যাই হোক্‌, এর নাম স্বাধীন চিন্তা,—স্বাধীন দর্শন। একেই বলে সম্পূর্ণরূপে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দার্শনিকতা জাহির করা! ডুয়ী-হকিংয়ের রচনাবলীর ভেতর আরিষ্টটল আর হেগেল মাঝে মাঝে উকি-ঝুঁকি যে মারে না, তা নয়। কিন্তু সে-সব অবান্তরভাবে ঘ'টে থাকে।

লেখক—ভারতে এই ধরণের স্বাধীন দর্শন উৎপন্ন হতে পার্‌বে কি?

সরকার—নিশ্চয়। বাঙালী আর অন্যান্য ভারতীয় দর্শন-লেখকেরা এই ধরণের স্বাধীন দর্শনেরও মালিক হ'তে পার্‌বে। বোধ হয়, বেশীদিন ব'সে থাক্‌তে হবে না। হয় তো ইতিমধ্যেই তার চিহ্নোৎ পাওয়া যায়। আগেই বলেছি,—এমন কি যে-সকল বইয়ে পরকীয় মতামতের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা বেরুচ্ছে, সেই-সব বইয়েও স্বাধীন মত পাওয়া সম্ভব। (পৃষ্ঠা ৫৯)

লেখক—প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সংগে নব্যভারতীয় স্বাধীন দর্শনের যোগ কিরূপ থাক্‌বে?

সরকার—মজার প্রশ্ন। এই সব ভবিষ্য-ভারতের দার্শনিক লেখকেরা প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সংগে অসহযোগ চালাতে ভয় পাবে না। বাস্তবিক পক্ষে,—দেশী-বিদেশী ধারার সংগে সহযোগ না অসহযোগ চল্‌ছে,—এ সম্বন্ধে মাথা খেলানো তাদের পক্ষে আহাম্মুকি

বিবেচিত হবে। তারা চালাবে দর্শন-দরিয়ায় নিজের পান্‌সী নিজ কজ্জার জোরে। যদি তাদের সংগে দেশী-বিদেশী বা নয়া-পুরাণা কারুর মিল্‌লো তো মিল্‌লো, না মিল্‌লো তো ব'য়ে গেল। এই হ'বে তাদের দার্শনিক মতি-গতি।

লেখক—আজকালকার ভারতীয় দর্শন-লেখকদের রচনা থেকে স্বাধীন দর্শনের ইংগিত দিতে পারেন?

সরকার—তবে আর একবার কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের একটা রচনা উল্লেখ করি। নাম "কন্‌সেপ্ট অব ফিলজফি" (দর্শনের প্রকৃতি বা স্বরূপ)। এটা বেরিয়েছে রাধাকৃষ্ণন্‌ ও ম্‌ইয়ারহেড কর্তৃক সম্পাদিত "কনটেম্পোরারি ইণ্ডিয়ান ফিলজফি" (সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন) গ্রন্থে (লণ্ডন, ১৯৩৬)। এই প্রবন্ধটা চিবুতে আরম্ভ করা "ছোক্‌রা" দর্শন-লেখকদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ। তার ফলে এরা হয়ত কালে একটা নূতন-কিছু খাড়া কর্‌তে পার্‌বে। কৃষ্ণ বাবুকে টোলের গুরুর মতন ব্যবহার করার দিকে কোনো-কোনো ছোক্‌রা গবেষকের চেষ্টা করা উচিত। স্বাধীন দর্শনের কয়েকটা নতুন-নতুন খুঁটা বাঙালী মগজে থেকে যাবে।

("বর্তমান ভারতে দর্শনের সূত্রপাত হয়েছে কি?" ৩০শে আগষ্ট, ১৯৪২)

পণ্ডিতি বনাম প্রচার

২৯শে অক্টোবর, ১৯৪২

লেখক—বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ ইত্যাদি রামকৃষ্ণ-বিশনের দর্শন-লেখকদের রচনায় আর অন্যান্য ভারতীয় দর্শন-লেখকদের রচনায় কোনো প্রভেদ আছে?

সরকার—আছে বৈকি! প্রচার কার্যে আর পণ্ডিতিতে যে ফারাক, এই দুই শ্রেণীর লেখকদের প্রধান বা একমাত্র পেশা প্রচার,—পণ্ডিতি করা তাঁর ব্যবসা নয়। ঘটনাচক্রে কোথাও বা একটু-আধটু টোল-চালানো অথবা দুটো-একটা ছেলে-পেটানো তাঁদের কপালে লেখা থাকে বটে। কিন্তু তাঁদের আসল কাজ আ[illegible]াদা। সে হচ্ছে হাজার-হাজার নানা বয়সের আর নানা মেজাজের নরনারীর ভেতর দীক্ষা-বড়ি ছড়ানো। বড়িগুলা গোটাকয়েক মাত্র। গুন্‌তিতে ও-সব বেশী নয়। দীক্ষা-বড়িগুলা ছড়াবার প্রণালী হচ্ছে হরির লুটের প্রণালী।

লেখক—পণ্ডিতি-প্রণালী কাকে বল্‌ছেন?

সরকার—রামকৃষ্ণ-মিশনের বাইরের দর্শন-লেখকেরা প্রধানতঃ টুলো-পণ্ডিত। এঁদের মুখ্য ব্যবসাই হ'লো নির্দিষ্ট বয়সের,—১৮-২২ বৎসরের,—ছাত্র-ছাত্রীদের উপর মাষ্টারি চালানো। টোলগুলা দুই শ্রেণীর,—প্রধানতঃ, সাবেকি-ধরণের ; দ্বিতীয়তঃ আজকালকার ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরণের।

অল্প কয়েকটা বড়ি ছড়ালে পণ্ডিতি করা চলে না। নির্দিষ্ট দু'-চার বছরের ভেতর এঁরা ডজন-ডজন বা শত-শত লোকের নাম, মতের নাম, বইয়ের নাম ছড়াতে বাধ্য। এঁদের লেখা বইগুলোতে এই পেশার ছাপ খুব পরিষ্কার। বহুসংখ্যক নতুন-নতুন পারিভাষিক আর কটমট শব্দ পাতায়-পাতায় থাকা চাই-ই চাই। আর চাই পাদ-টীকার ছড়াছড়ি।

দেখ্‌তেই পাচ্ছিস্‌, দুই শ্রেণীর রচনা দুই স্বতন্ত্র জগতের চিজ হ'তে বাধ্য। এই দুইয়ে তুলনা চালাতে বসা আমার বিচারে যুক্তিহীন। তবে দুনিয়ার লোকের মুখ তো আর বন্ধ ক'রে রাখা যায় না। তুলনা চালাবেই।

লেখক—দুই দলের পেশায় প্রভেদ আছে ব'লে আপনি দুইদলের রচনাবলীতেও প্রভেদ আশা করেন কেন?

সরকার—দুই-দলের মক্কেল এক শ্রেণীর নয়। রামকৃষ্ণ-মিশনের পাঠক ও শ্রোতা এক ধরণের লোক। আর-এক ধরণের লোক হচ্ছে নয়া-পুরাণা টুলো-পণ্ডিতদের পাঠক ও শ্রোতারা।

লেখক—রামকৃষ্ণ-মিশনের শ্রোতা-পাঠক কিরূপ?

সরকার—বল্‌ছি। মক্কেলদের প্রভেদটা দেখ্‌বি? আচ্ছা, ক'দিন ধ'রে দুর্গাপ্রতিমা দেখে বেড়াবার জন্য কোল্‌কাতায় লোকের ভিড় কেমন হয়েছিল? পূজার বাড়ীতে অথবা সার্বজনিক পূজার বারোয়ারীতলায় লোক জড়ো হতো কেমন? মনে কর্‌, এই সব ছেলেমেয়ে, পুরুষ-স্ত্রী শ'য়ে-শ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে বা ব'সে রয়েছে। এদের সাম্‌নে বক্তৃতা কর্‌তে হবে উপনিষদ-বেদান্ত-গীতা।

কোল্‌কাতায় গংগায় নাইতে যায় কারা,—দেখেছিস্‌? সকালে নায়, দুপুরে নায়, রাত্রে নায়। তা'ছাড়া পার্বনের নাওয়া আছে। অর্ধোদয়-যোগ, চূড়ামণি-যোগ বিখ্যাত। এ-সব নাওয়া-নাইয়ির কাণ্ড কে না জানে? মনে কর্‌,—এই সব হরেক-রকমের লোকজনকে একত্র ক'রে তাদের সামনে ঝাড়্‌তে হবে উপনিষদ্‌-বেদান্ত-গীতা।

লেখক—স্বামীজিদের পেশায় বিশেষত্ব কী-কী?

সরকার—রামকৃষ্ণ-মিশনের মক্কেল হ'লো এই ধরণের "রাস্তার লোক"। এই সব সাধারণ লোক্‌কে ধ'রে-ধ'রে শেখাতে হয় "ধর্মের কাহিনী"। হিন্দু ধর্ম কি, হিন্দু আদর্শ কাকে বলে, হিন্দুত্বের আকার-প্রকার,—এই সব হচ্ছে আলোচ্য বিষয়। এই সম্বন্ধে সমঝাতে হয় নিরক্ষর-সাক্ষর, গরীব-ধনী, চণ্ডাল-ব্রাহ্মণকে।

লেখক—বক্তৃতা করাই কি স্বামীজিদের একমাত্র কাজ? (পৃঃ ১২৫)

সরকার—এই গেল রামকৃষ্ণ-মিশনের প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজও একটা আছে। তা হচ্ছে প্রত্যেক লোককে চরিত্রগঠনের কাজে খানিকটা সাহায্য করা। যাকে লোকগুলা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হিসাবে কিঞ্চিৎ-কিছু মানুষ হ'তে পারে তার হদিশ দেওয়া। বিবেকানন্দ'র একটা মন্তর হচ্ছে ঃ—"মা আমায় মানুষ কর।" দেখ্‌তেই পাচ্ছিস, স্বামীজিদের পেশার সংগে নয়া পুরাণা টুলো-পণ্ডিতদের পেশার ফারাক্‌ আকাশ-পাতাল। রামকৃষ্ণ-মিশনের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সম্প্রতি কিছু বলা হচ্ছে না। সেবাকার্য, প্রতিষ্ঠান-পরিচালনা ইত্যাদি কাজ তার অন্তর্গত।

লেখক—কৈ, আমি তো পণ্ডিতি-পেশায় আর স্বামীজিদের পেশায় কোনো প্রভেদ দেখ্‌তে পাচ্ছি না?

সরকার—বল্‌ছিস্‌ কি রে? ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মাস-মাস মাইনে দেয় কি জন্য? হিন্দুত্বের আকার-প্রকার শিখ্‌বার জন্য? মনে কর্‌,—চরিত্রগঠনের কথা কোনো বেআকুব অধ্যাপক ক্লাশে বেফাঁস ভাবে বলে ফেল্‌লো? ঠিক বল্‌ছি কি না? নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা কেউ তুল্‌লে তোরা কি বলিস্‌? তোরা বলিস্‌ না কি,—"মাষ্টারি কর্‌তে এসেছ, বাবা, মাষ্টারি ক'রে যাও। আবার তত্ত্ব-কথা কেন?"

তা'ছাড়া ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তো আর মামুলি জনসাধারণ বা রাস্তার লোক নয়। এরা মোটা-মোটা কেতাব গিল্‌তে অভ্যস্ত। এরা মাষ্টারদেরকে বাজিয়ে দেখে। মাষ্টারদের যাচাই কর্‌তে এরা ওস্তাদ। এরা সর্বদা দেখ্‌ছে কোন্‌ মাষ্টার নতুন বইয়ের

নাম কর্‌লে বা নতুন একটা শব্দ কপ্‌চালে।

পণ্ডিতদের লেখা বই বেরুবামাত্র ছাত্র-ছাত্রীরা আর অন্যান্য লোকেরাও দেখে নতুন কোনো মাল দিতে পেরেছে কি না ; বইয়ের ভেতর চর্বিত-চর্বন আর গড্ডালিকা-প্রবাহ চলেছে, না খানিক্‌টা খোঁজখবর, অনুসন্ধান, গবেষণা, স্বাধীন চিন্তা ইত্যাদির ফলও বইটার ভেতর আছে। মক্কেলরাই পণ্ডিতগুলাকে "পাণ্ডিত্যপূর্ণ" ক'রে তোলে। পণ্ডিতি দেখাতে না পার্‌লে পণ্ডিতেরা আসর জম্‌কাতে পারে না--কঙ্কেও পায় না।

ইয়োরামেরিকার জনসাধারণ

লেখক—রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামীজিদের শ্রোতা ও পাঠক আমেরিকায় হাজারে-হাজারে আছে শুনেছি। তাদের বিদ্যাবুদ্ধি তো আমাদের রাস্তার লোক বা জনসাধারণের থেকে উন্নত। সেখানে পণ্ডিতি-ই তো স্বামীজিদের আবশ্যক।

সরকার—মার্কিণ নরনারী, সাধারণতঃ, আমাদের ভারতীয় নরনারীর চেয়ে বিদ্যা-বুদ্ধিতে বড় নয়। ওদের বহুসংখ্যক লোক খৃষ্টিয়ান গির্জায়, ইহুদি সিনাগগে, থিঅজফিষ্ট-ভবনে আর গণ্ডা-গণ্ডা অন্যান্য শ্রেণীর ধর্মের আখড়ায় যাওয়া-আসা করে। তাদের কেউ-কেউ পয়সাওয়ালা সন্দেহ নেই। তবে মার্কিণ মাপে অনেকেই গরীব। বই পড়্‌তে আর নাম সই কর্‌তে তারা সকলেই পারে.—একথা ঠিক। নিরক্ষর সেখানে নেই বল্‌লেই চলে। কিন্তু লিখ্‌তে-পড়্‌তে পারে ব'লেই তাদের মগজটা বড়-বেশী চাষা নয়। সোজা-কথায় তারা অনেকেই অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বা সিকি-শিক্ষিত লোক।

লেখক—ভারতীয় জনসাধারণকে আপনি মার্কিণ জনসাধারণের তুলনায় কিরূপ বিবেচনা করেন?

সরকার—আমাদের রাস্তার লোকেরা আর অর্ধোদয়-নাইয়েরা অধিকাংশই নিরক্ষর বটে, কিন্তু তারা সকলেই পুরোপুরি অশিক্ষিত নয়। আমাদের স্ত্রী-পুরুষদের মগজটা নেহাৎ গোবরে-ভরা ভাঁড় নয়। এদের কাণ্ডজ্ঞান আছে টন্‌ট'নে। গেরস্থালি, সমাজ, ইহকাল-পরকাল, সু-কু ইত্যাদি বস্তু এদের সকলেই বেশ-কিছু বোঝে। তবে টাকা কড়ির অভাব জবরদস্ত্। কাজেই কাপড়-চোপড়ের অবস্থা চিত্তাকর্ষক নয়। এজন্য বেশী-কিছু চটক দেখাবার সুযোগ এদের নেই। কিন্তু মার্কিণ গির্জাযাত্রীরা আমাদের কালীমন্দিরের যাত্রী ও অন্যান্য বারোয়ারীতলার লোকজনের চেয়ে মগজের ক্ষমতা হিসাবে উঁচুদরের জানোয়ার নয়। সোজাসুজি এই কথাটা জেনে রাখা ভাল। তবে লিখ্‌তে-পড়্‌তে পারাটা একটা মস্ত সুবিধা ও শক্তি সন্দেহ নাই।

আর এক কথা। মার্কিণ পুরুষ-নারী অনেকেই যন্ত্রপাতির ব্যবহার জানে। কল-কব্‌জায় তাদের হাত-পা পেকে উঠে। কাজেই চোখ-কানও বেশ-কিছু বস্তু-নিষ্ঠ। মগজটা চাঁছা-ছোলা ও কর্মঠ। এই সব সুবিধা ওদের আছেই। এই হিসাবে ভারতের নরনারী বিলকুল আনাড়ি ও ম্যাড়াকান্ত। তা ভুলে গেলে চল্‌বে না। আমাদের দেশী লোকেরা যন্ত্রের কাজে হাত-পা-চোখ-কান পাকাতে লেগে যাক্। দেখ্‌বি—নাম সই কর্‌তে না শিখে ও তারা নতুন-নতুন মগজের ক্ষমতা দেখাতে পার্‌বে।

লেখক—আপনি ইয়োরোপের জনসাধারণ সম্বন্ধে কী বিবেচনা করেন?

সরকার—শুধু মার্কিণ নরনারী নয়রে ভাই, ইয়োরোপের নরনারীর বুদ্ধি-বোধির দৌড়ও ভারতীয় নরনারীর বুদ্ধি-বোধির দৌড়েরই প্রায় সমান। ইংরেজ, ফরাসী, ইতালিয়ান, জার্মাণ, চেক, সুইস ইত্যাদি জাতের কথা বল্‌ছি। ডজন-ডজন পল্লী-সহরের লোকজনকে পরখ্ ক'রে দেখেছি। তাদের হেঁশেল-ঘরের কথা,—গোয়াল-ঘরের কথা,—আর বৈঠকখানার কথাতো বটেই,—বেশ-কিছু জানা আছে। এসব জাতের ননদ-বৌয়ের কোঁদল, শ্বাশুড়ী জামাইয়ের ঝগড়া, পাড়া-পড়শীর লাঠালাঠি, মাস্টারদের রেশারেষি, সবই খতিয়ে দেখেছি। লোকগুলাকে ডাইনে-বাঁয়ের বাজিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ জুটেছে বিস্তর। ঠিক যেমন মানুষকে দেখে মানুষ—সেভাবেই দেখ্‌তে পেয়েছি এসব জাতের নরনারীকে। সর্বত্রই পেয়েছি মোটের উপর ভারতীয় নরনারীর মগজ, কাণ্ডজ্ঞান ও সংস্কৃতি-বোধ।

লেখক—আপনি এসব কথা বল্‌ছেন কী বোঝাবার জন্য?

সরকার—তোর সওয়ালের জবাব দেবার জন্য। নাম সই কর্‌তে পার্‌লেই আর খবরের কাগজ পড়তে পারলেই লোকগুলোর মগজ পেকে উঠে না। আমাদের দেশেই যারা লেখাপড়া জানে তারা নিরক্ষর চাষী-মজুরদের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান কি? বেশী কাণ্ডজ্ঞান-শীল কি? বেশী কর্তব্যনিষ্ঠ কি? দুনিয়ার লোককে শিক্ষিত ক'রে তোলা অতি কঠিন কাজ। নাম সই যারা কর্‌তে পারে না আব খবরের কাগজ যারা পড়্‌তে জানে না, তাদের ভেতরও হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষ আমার বিচারে পাকা শিক্ষিত অর্থাৎ মগজওয়ালা, বুদ্ধিমান লোক। সম্প্রতি চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, নৈতিক জীবন, আধ্যাত্মিকতা, স্বার্থত্যাগ, স্বদেশ-সেবা, বিপ্লব-নিষ্ঠা ইত্যাদির কথা পাড়্‌ছি না।

লেখক—ভারতীয় জনসাধারণ নিরক্ষর থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের সাক্ষর জনসাধারণের সংগে শিক্ষাহিসাবের প্রায় সমান,—একথাটা ব'লে বর্তমানে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

সরকার—কথাটা এত নতুন যে কোনোমতেই বুঝ্‌তে পারছিস না বোধ হয়? বুঝাতে চাচ্ছি যে,—রামকৃষ্ণ-মিশনের মার্কিণ মক্কেল, বিলাতী মক্কেল, ইতালিয়ান মক্কেল, ফারসী মক্কেল, জার্মাণ মক্কেল আর দক্ষিণ আমেরিকার মক্কেল ভারতীয় মক্কেলরই প্রায় মাসতুতো ভাই-বোন। কাজেই ওসব দেশে প্রচারকার্যটাও আমাদের দেশী প্রচার কার্যেরই প্রায় সমান দরের হ'তে বাধ্য। দুই মুল্লুকের জন্যই পেশাটা এক—পেশার ধরণ-ধারণ এক, পেশা চালাবার কায়দা-কৌশলও এক। বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ হ'তে আজকের বিশ্বানন্দ (শিকাগো), অশোকানন্দ (স্যান্‌ফ্রান্‌সিস্কো), নিখিলানন্দ (নিউইয়র্ক), যতীশ্বরানন্দ (সুইট্‌সারল্যাণ্ড), সিদ্ধেশ্বরানন্দ (প্যারিস্), অব্যক্তানন্দ (লণ্ডন), বিজয়ানন্দ (বিউনস্ আইরেস্—আর্জেণ্টিনা) ইত্যাদি পর্য্যন্ত ইয়োরামেরিকায় স্বামীজিদের সমস্যা একরূপই র'য়ে গেছে।

ঐ সকল দেশে তাঁদের প্রথম কাজ উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতা প্রচার করা; দ্বিতীয় কাজ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে সাহায্য করা। এই দুই কাজ ছাড়া মুখ্যভাবে স্বামীজিদের আর কোনো কাজ নেই। অন্যান্য কাজ এই দুই কাজেরই আনুসংগিক: কি ভারতে কি ভারত্ বহির্ভূত দুনিয়ায় এই দুই শ্রেণীর কাজের জন্য রামকৃষ্ণমিশন কায়েম হয়েছে। (পৃষ্ঠা ১২২)

লেখক—বিদেশের ভেতর স্বামীজিদের কাজে আব ভারতের ভেতর স্বামীজিদের কাজে আপনার দৃষ্টিতে তবে কি কোনো প্রভেদ নেই?

সরকার—তফাৎ খুব বেশী বিদেশীরা জন্মতঃ খৃষ্টিয়ান বা ইহুদি। আর আমরা জন্মতঃ হিন্দু বা মুসলমান। বিদেশে খৃষ্টিয়ান-মুখো হ'য়ে আর ইহুদিমুখো হ'যে স্বামীজিদেরকে বক্তৃতা

করতে হয়,—বই লিখতে হয়। উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতা গেলাতে হয় খৃষ্টিয়ান-সংস্কারওয়ালা লেকজনকে আর ইহুদি রীতিনীতিওয়ালা লোকজনকে।

প্রচারক যারা হয় তাদের ব্যবসা কথাগুলা এমনভাবে বলা, যাতে শ্রোতারা বা পাঠকেরা সহজে ধরতে পারে। খৃষ্টিয়ানিতে আর ইহুদি আচারে অভ্যস্ত নরনারীর মেজাজে কতকগুলা চিন্তা আর পারিভাষিকের আপনা-আপনিই ব'সে রয়েছে। সেই সকল চিন্তা ও পারিভাষিকের সংগে খাপ-খাইয়ে স্বামীজিদেরকে ওসবদেশে উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতার পিচকারি চালাতে হয়। ইয়োরামেরিকার জনসাধারণের নিকট অনেকগুলা সংস্কৃত শব্দ বা পালি শব্দ ঝাড়তে গেলে আহাম্মুকি প্রকাশিত হবে। ঐ সকল আবহাওয়ায় বুদ্ধ, শংকর ইত্যাদি ডজন-ডজন নাম জাহির করার মতন মুখ্খুমি আর নেই। গণ্ডা-গণ্ডা ভারতীয় বইয়ের তালিকা ঝেড়ে পণ্ডিতি করা সম্ভব, কিন্তু তাতে প্রচারকের কাজ ফেল মারতে বাধ্য। ওসবদেশের শ্রোতা ও পাঠকের ভেতর সুপণ্ডিত লোকও আছে। কিন্তু বিদেশী মাল আত্মস্থ করা তাদের পক্ষেও কঠিন। কাজেই স্বামীজিদেরকে বুঝে-সুঝে' লেখালেখি করতে হয়। অতি-মাত্রায় পণ্ডিতি চালালে, স্বামীগিরিতে দেউলিয়া লেগে যাবে।

লেখক—ভারত-মুখো হবার সময় স্বামীজিদের কী-কী আবশ্যক হয়?

সরকার—হিন্দু-মুসলমান শ্রোতা ও পাঠকদের সংস্কার, আচার ও রীতিনীতি খৃষ্টিয়ান-ইহুদিদের সংস্কার-আচার-রীতিনীতি হ'তে স্বতন্ত্র। এজন্য ভারতে প্রচার চালাবার জন্য লেখালেখি আর বকাবকির ভেতর খানিকটা বেশী ভারতীয় শব্দ, কাহিনী ও দৃষ্টান্ত লাগানো চলে। ইয়োরামেরিকায় দরকার হয় পাশ্চাত্য সমাজের সুপরিচিত বোলচালের। এই প্রভেদটা আছেই। কিন্তু অতি-পণ্ডিতি ভারতেও চলবে না আর বিদেশেও চলবে না। আর একটা প্রভেদও আছে। ভিন্ন-ভিন্ন দেশের ভিন্ন-ভিন্ন ভাষা,—একথাটা প্রথমেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে। ফরাসীতে, জার্মাণে, ইতালিয়ানে, স্পেনিযে,—এইরূপ নানা ভাষায় বকাবকি আর লেখালেখি করা চাই। তা' ছাড়া স্বামীজিদেরকে বিদেশে আর কোনো প্রভেদ মেনে চলতে হয় না। স্বদেশী মক্কেল আর বিদেশী মক্কেল মগজ আর ব্যক্তিত্ব হিসাবে প্রায় একজাতের নরনারী। আর দুই আবহাওয়ায়ই প্রচার-পেশা পেটের উপর একশ্রেণীর অন্তর্গত। সেই পেশাটা কোথাও পণ্ডিতি-ঘেঁষা নয়।

স্বামীজিদের জ্ঞানযোগ

লেখক—আপনি তা' হ'লে স্বামীজিদের ভেতর পাণ্ডিত্য চান না?

সরকার—পাণ্ডিত্য চাই, পণ্ডিতি চাই না। শতকরা দু-চারজন যদি পণ্ডিতি করেন, তাতে আমার আপত্তি নেই। সাধারণভাবে আমি বলবো যে, পণ্ডিতি করা স্বামীজিদের পেশা নয়। তাঁদের প্রধান পেশা কর্মযোগ ও ভক্তিযোগের কাজ। তাঁদের পক্ষে জ্ঞানযোগও আবশ্যক। তবে জ্ঞানযোগের ভেতর আমি উনিশ-বিশ ক'রে থাকি।

লেখক—জ্ঞানযোগের ভেতর উনিশ-বিশ আবার কী?

সরকার—জ্ঞানযোগের সবকিছুই যে-কোনো পেশার লোকের পক্ষে বাঞ্ছনীয় মনে করি না। আমি পেশা-মাফিক্ জ্ঞানযোগের পার্থক্য মেনে চলি।

লেখক—স্বামীজিদের জন্য আপনি কিরূপ জ্ঞানযোগ চান?

সরকার—স্বামীজিদের জ্ঞানযোগে পাণ্ডিত্য জন্মাবে কিন্তু পণ্ডিতি থাক্‌বে না। দেশবিদেশের সুধীরা সর্বদাই জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাও আবিষ্কার ক'রে চ'লেছেন। সেই সব গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলসমূহ স্বামীজিদের জানা চাই। বস্তুতঃ সে-সব সকল দেশেই যে কোনো লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের জানা উচিত। বলা বাহুল্য, কর্মযোগ আর ভক্তিযোগের কাজ চালাতে-চালাতেই স্বামীজিদের পক্ষে এইসব অল্পবিস্তর জেনে রাখা সম্ভব। বিদ্যার সীমানা নানাদিকে বেড়ে চলেছে। সে সম্বন্ধে ওকাকিব্‌হাল হওয়া অন্যান্য লোকের মতন স্বামীজিদেরও জরুরি। ব্যস্‌। তার বেশী চেষ্টা করা উচিত নয়।

লেখক—তা হ'লে স্বামীজিদের জ্ঞানযোগে বাদ পড়ছে কী?

সরকার—স্বামীজিদের পক্ষে নতুন-নতুন গবেষণায় মস্‌গুল্‌ থাকা চল্‌তে পারে না। বিদ্যার সীমানা বাড়াবার দিকে মেজাজ গেলে পণ্ডিতি করা হ'য়ে যাবে। সেরূপ পণ্ডিতি করা নয়া-পুরাণা টুলো-পণ্ডিতদের মার্কামারা কাজ। সেই কাজে মেতে গেলে স্বামীজিদের আসল কাজ বাদ প'ড়ে যেতে পারে। তা' হ'লে তাঁদের স্বামীজি না হ'য়ে পণ্ডিতি করাই উচিত।

স্বামীজিদের কাজে আর পণ্ডিতির কাজে গভীর প্রভেদ মেনে চলা আমার দস্তুর। এই জন্য স্বামীজিদের দার্শনিক রচনাবলীতে আর পণ্ডিতদের দার্শনিক রচনাবলীতে তুলনা চালাবার দিকে মেজাজই আমার খেলে না।

লেখক—স্বামীজিদের কোনো বইয়ে পণ্ডিতি দেখ্‌লে আপনি তা হ'লে দুঃখিত হবেন?

সবকার—কেন দুঃখিত হবো? আগেই বলেছি,—শতকরা দু'-চারজন স্বামীজি মাঝে-মাঝে পণ্ডিতি কর্‌লে অস্বাভাবিক কিছু হবে না। আজকাল শ'-পাঁচেক স্বামীজি দেশ-বিদেশে মোতায়েন আছেন। মনের কর্‌,—এঁদের আধা-আধি প্রাচীন ভারতীয় দর্শন, ধর্ম ও সংস্কৃতির গবেষণায় মতোয়ারা হ'য়ে উঠ্‌লেন। কয়েকজন লেগে গেলেন "নির্বাণ" শব্দটা সংস্কৃত ও পালি পুঁথির কত জায়গায় পাওয়া যায় তার সন্ধান দিতে। "মায়া" শব্দের ব্যাখ্যায় মাত্‌ হ'য়ে রইলেন পঁচিশ-ত্রিশ জন। গণ্ডাকয়েক স্বামীজিব মেজাজ খেল্‌লো "অহিংসা" সেকেলে ব্যাখ্যাগুলো আবিষ্কারের জন্য। ইত্যাদি ইত্যাদি। তা হ'লে রামকৃষ্ণ মিশন প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের টোলে পরিণত হবে। এ ধরণের টোল ভারতের পক্ষে আর দুনিয়ার পক্ষে খারাপ কিছু নয়—বরং ভালই। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের মুখ্য কারবার তা নয়। (পৃষ্ঠা ১২৪)

লেখক—রামকৃষ্ণ মিশনের মুখ্য কারবার কী? (পৃষ্ঠা ১২২)

সরকার—রামকৃষ্ণ মিশন আধুনিক ভারতীয় জীবনের অন্যতম কর্মকেন্দ্র। এই কর্ম-কেন্দ্রকে সমাজেব জ্যান্ত অংগের মতন কাজ চালাতে হবে। সর্বদা মনে রাখতে হবে বিবেকানন্দ'র কর্মপ্রণালী আর জীবন কথা। মন-মাতানো বক্তৃতা আর প্রাণ-তাতানো লেখালেখি চাই বিবেকানন্দ'ব চেলাদের কাছে। একালের ছোক্‌রাদেরকে চাংগা ক'রে তুল্‌বার মতন গলাবাজি আর গ্রন্থপ্রকাশ বেশ-কিছু জরুরি।

লেখক—স্বামীজিদের পণ্ডিতি করাব নমুনা আপনি পেয়েছেন?

সরকার—স্বামীজিদের ভেতর বিজ্ঞানানন্দ'র পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই আছে পাণিনি আফিসের গ্রন্থমালায় (এলাহাবাদ)। স্বদেশী যুগের কথা বল্‌ছি। আজকাল বেরিয়েছে মাধবানন্দ'র "বৃহদারণ্যক উপনিষদ্‌" (১৯৩৪)। বীরেশ্বরানন্দ-সম্পাদিত "ব্রহ্মসূত্র" (১৯৩৬) ও আছে। এই সবের সম্পাদনে, তর্জমায়, ভাষ্য-টীকায় ও ব্যাখ্যায় স্বামীজিরা পণ্ডিতি দেখাতে পেরেছেন। এসব তারিফ্‌যোগ্য কাজ। অথচ এঁদের অন্যান্য কাজও পুরামাত্রায় বজায় আছে। কর্মযোগী আর ভক্তিযোগী থাকায় সংগে সংগে এঁরা জ্ঞানযোগের পণ্ডিতি-শাখায়ও হাত

দেখিয়েছেন। এসব বাহাদুরির লক্ষণ। আরও পাঁচ-সাতজন এইদিকে হাত দেখালেও রামকৃষ্ণ-মিশনের আসল কাজে বাধা পড়্‌বার কোনো সম্ভাবনা নেই। আবার ব'লে রাখ্‌ছি, জ্ঞানযোগের কিছু-কিছু স্বামীজিদের আসল কাজের অন্তর্গতও বটে।

লেখক—স্বামীজিদের জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে আপনি অনেক-কিছু বল্‌লেন। কিন্তু সব যেন গুলিয়ে গেল মনে হ'চ্ছে। আপনি বল্‌তে চাচ্ছেন কি যে, তাঁদেব দু'-চারজনমাত্র এক-আধখানা বই লিখুন আর আনোরা লেখালেখির সংগে অসহযোগ চালান?

সরকার—রাধামাধব! আমি ঐ ধরণের কোনো কথাই বলিনি। জ্ঞানযোগেব সংগে স্বামীজিদের পুরামাত্রায় সহযোগ আমি চাই। স্বামীজিদের জন্য জ্ঞানযোগের আমি তিন্‌টে স্বতন্ত্র ধারার বিশ্লেষণ ক'রেছি ঃ—

প্রথমতঃ, প্রত্যেক স্বামীজির পক্ষে দুনিয়ার জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে,—বিশেষতঃ ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতি সম্বন্ধে—যথাসম্ভব ওয়াকিব্‌হাল থাক্‌বার চেষ্টা করা উচিত। সংসারের অন্যান্য লোকের পক্ষেও সেই পাঁতি। তোর পক্ষেও তাই। আমার পক্ষেও তাই। তবে এই বিষয়ে অবশ্য অত্যধিক আশা করা উচিত নয়। প্রত্যেক চেষ্টারই একটা সীমানা আছে। সাধারণভাবে বল্‌তে পারি যে, স্বামীজিদের লাইব্রেরীতে কয়েকখানা বিদেশী "পবিষৎ-পত্রিকা" রীতিমত পড়্‌বার ব্যবস্থা থাকা ভাল।

দ্বিতীয়তঃ স্বামীজিরা ভারতের আর ইয়োরামেরিকার নানাকেন্দ্রে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকর্তা র'য়েছেন। তাঁদেরকে নিত্য-নৈমিত্তিকরূপে উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতা প্রচার কর্‌তে হয়। এই উপলক্ষ্যে বকাবকি কবা আর লেখালেখি তাঁদের পক্ষে অনিবার্য। এই ধরণের রচনাবলী আমি মোটের উপর ব্যাখ্যাশ্রেণীব অন্তর্গত ক'রেছি। বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ এই শ্রেণীর প্রবর্তক। আজ পর্যন্ত এই ধারা বজায় আছে। পরমানন্দ-প্রণীত ইংরেজি বইগুলা একালের অন্যতম নিদর্শন।

বিবেকান্দ'র ইংরেজি বইগুলা বাংলায় প্রচার ক'রেছেন শুদ্ধানন্দ। এই তর্জমাসমূহ বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ। অভেদানন্দ আমেরিকায় বিবেকানন্দ জিরিয়ে রেখেছিলেন। বাংলা দেশে বিবেকানন্দকে জিরিয়ে রেখেছেন শুদ্ধানন্দ। "ভারতে বিবেকানন্দ" বইটার কিম্মৎ লাখটাকা।

সারদানন্দ-প্রণীত "গীতাতত্ত্ব" (১৯২৮) এই শ্রেণীরই বাংলা বই। কয়েক বৎসর হ'ল বেরিয়েছে নির্লেপানন্দ-প্রণীত "রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনালোকে" (১৯৩৪)। এর ভেতর অবশ্য উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতার ব্যাখ্যা নেই—আছে দেশের রকমারি সমস্যার আলোচনা। "ছোক্‌রা" স্বামীজির উপর প্রবীণ স্বামীজিদের প্রভাব পরিষ্কারভাবে দেখ্‌তে পাই। এজন্য বইটার দাম আছে বিস্তর। প্রজ্ঞানন্দ প্রণীত "ভারতের সাধনা" বইটা অনেকদিন আগে বেরিয়েছিল (১৯১৮)। এর ভেতরও স্বামীজিদের বর্তমান-নিষ্ঠা পাকড়াও করা যায়। এই বইয়ে স্বদেশী যুগের আবহাওয়া স্পর্শ কর্‌তে পারি।

"কলম্বো হ'তে আল্‌মোড়া পর্যন্ত" ("ভারতে বিবেকানন্দ") বইয়ে বিবেকানন্দ'র যে মূর্তি ছিল সেই মূর্তিওয়ালা স্বামীজি চাই আজ ১৯৪২ সনেও। একালের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সমস্যায় হাত দেখাতে পারেন এমন স্বামীজির ডাক প'ড়েছে দুনিয়ায়। সেই ডাকে কোন্ স্বামীজি সাড়া দেবেন? এদিকটা স্বামীজিদের ভুল্‌লে চল্‌বে না। চাই নয়া বিবেকানন্দ আগামী দু-তিন দশকের জন্য।

তৃতীয়তঃ, স্বামীজিদের "পাণ্ডিত্যপূর্ণ" রচনাকে জ্ঞানযোগের বিশিষ্ট ধারা বল্‌ছি।

বিজ্ঞানানন্দ, মাধবানন্দ, বীরেশ্বরানন্দ, শর্বানন্দ ইত্যাদি লেখক-প্রণীত ইংরেজি তর্জমাগুলা এই ধারার সাক্ষী। গম্ভীরানন্দ-প্রণীত নয়টা উপনিষদের বাংলা সংস্করণ (১৯৪১) এই সংগে উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানযোগের এই তৃতীয় ধারা সম্বন্ধেই ব'লেছি যে, স্বামীজিদের পক্ষে এই পথ বেশী মাড়ানো চল্‌বে না।

আবার মনে রাখিস্‌,—স্বামীজিদের ভেতর যাঁরা লেখক তাঁরা সকলেই কর্মযোগী ও ভক্তযোগী। এমন কি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার গ্রন্থকারেরাও,—অর্থাৎ তৃতীয় ধারার প্রতিনিধিরাও,—কর্মকাণ্ডে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আমার ইচ্ছে,—স্বামীজিদের সকলপ্রকার পুস্তিকা ও বইগুলা সম্বন্ধে একটা সুবিস্তৃত গবেষণা প্রকাশিত হোক। তা হ'লে রামকৃষ্ণ মিশনের জ্ঞানযোগ কতদিকে কত আকারে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে দুনিয়ার লোক তা সহজে বুঝ্‌তে পার্‌বে।

উদীয়মান গবেষক-লেখক

লেখক—উদীয়মান বাঙালী সুধীবর্গের ভেতর কার-কার লেখালেখি আপনি ভবিষ্যতের পক্ষে উঁচুদরের বিবেচনা করেন?

সরকার—দেখ্‌ছি, একমাত্র ভূতে আর বর্তমানে তোর সানালোনা,—মায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আমাকে দিয়ে বাণী কবিয়ে ছাড়্‌বি! ত্রিকালজ্ঞ ঋষিত্বের ঝক্‌মারি আমার নেই। আমার চোখটা চামড়ায় তৈরী আর বেশ-কিছু কুচুটেও বোধ হয়। তবে লোকজনের কু-গুলা আমার নজরে পড়ে না। দশের সুখ্যাতি করা আমার পেশা। এজন্যও লোকেরা আমাকে গরু বলে। যাই হ'ক, কিন্তু বড়-বড় হাতী-ঘোড়াও আমার নজরে অনেক সময় সুজে না। এই এক বিপদ। চন্দ্র-সূর্যও মাঝে-মাঝে ঢাকা প'ড়ে যায়। কাজেই আমার চাল্‌নির ভেতর ফেল্‌লে ভাল-ভাল অনেক-কিছু বে-মাল ভাবে বেরিয়ে যেতে পারে। থাক্‌বে নেহাৎ অল্প-কিছু। তা-ছাড়া, অনেক জিনিষেরই খবব রাখি না। কতটুকুর সন্ধান রাখাই বা এক হাড়ে সম্ভব?

লেখক—আপনি সদা-সর্বদা যে চাল্‌নি ব্যবহার ক'রে থাকেন সেইটেই ব্যবহার করুন।

সরকার—ভায়া, আমার চাল্‌নি আমি চালাই হামেশা আমার নিজের উপর। নিজেব লেখলেখি সম্বন্ধে আমার কোনো উঁচু ধারণা নেই। অতি-কড়া সমালোচনা দিয়ে নিজেকে সর্বদা যাচাই ক'রে থাকি। আমি গরীব মানুষ। রোজ আনি রোজ খাই আর সাধ্যমত কর্তব্য ক'রে চলি মাত্র। ব্যস্‌। আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় অতি সামান্য। "যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল, তোমারি কার্য্য সাধিবে,"—এই মন্তর আমার একমাত্র সহায়।

কিন্তু সেই কড়া সমালোচনা অন্যের উপর চালানো উচিত কি? তাও আবার বাজারে দাঁড়িয়ে?

লেখক—কেন, আপনি ত আগাগোড়াই বে-পরোয়াভাবে কথা ব'লে যাচ্ছেন? কাজেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর আপত্তি কেন?

সরকার—কুছ পরোআ নাই। "ভবিষ্যতের পানে মোরা চাই আশাভরা আহ্লাদে"। স্বদেশীযুগের কবি সত্যেন দত্ত'র এই বাণীটার ভেতর আমারও আশা-নিষ্ঠা ব'য়ে যাচ্ছে। তবে আমার আশাতত্ত্বে দোষ-দুর্বলতা, পরাজয়, নৈরাশ্য ইত্যাদির ঠাঁইও বিপুল। প্রত্যেক

উন্নতির ধাপেই আমি দেখ্‌তে পাই ছোট-বড়-মাঝারি হিমালয়ের বাধাবিঘ্ন।

লেখক—আগে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। "উদীয়মান" শব্দে বাস্তবিক পক্ষে কী রকম লেখক বুঝা উচিত?

সরকার—"উদীয়মান" বল্‌তে আমি বল্‌তে আমি বুঝি পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের "ছোক্‌রা"। বর্তমানে আমার চেয়ে কম্‌সে-কম্‌ বছর বিশেক ছোট। তারপর "উল্লেখযোগ্য" গবেষক-লেখক বল্‌লে বুঝি বিশেষত্বশীল লোক। লেখালেখির ভিতর,—শুধু বক্তৃতার ভেতর নয়,—সে নতুন তত্ত্ব, নতুন সিদ্ধান্ত বা নতুন আলোচনা-প্রণালী দিয়ে চ'লেছে। বাড়া ভাতে কাঠি লাগানো তার প্রধান ব্যবসা নয়। তা ছাড়া কালে-ভদ্রে যারা দু-একটা প্রবন্ধ লেখে তাদেরকে সাধারণতঃ এই দলে ফেলা কঠিন। হয়ত তাদের লেখালেখির ভেতর মাল আছে বেশ। কিন্তু অনেক সময় সে-সব নজরে পড়ে না।

লেখক—এবার তা' হলে ক'রে ফেলুন আপনার ভবিষ্যদ্বাণী?

সরকার—কাব্য-নাট্য-গল্প ইত্যাদি রচনার কোঠ এড়িয়ে যাচ্ছি। অধিকন্তু পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি বিদ্যার রাজ্যে পথ মাড়াবার ক্ষমতা নেই। অন্যান্য ক্ষেত্রে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের নজরে পড়্‌ছে বটকৃষ্ণ ঘোষ। এঁর কারবার চ'লেছে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে। প্রাচীন ভারতীয ভাষা, সাহিত্য ও দর্শন ইত্যাদি মুল্লুকে নানাপ্রকার রচনা এই হাতে বেরুচ্ছে।

ফরাসী ও জার্মাণ ভাষা বটকৃষ্ণ ব্যবহার করতে পারেন আটপৌরে-ভাবে, দেখ্‌ছি না। যুবক বাংলা বটকৃষ্ণকে এই দিকে পথপ্রদর্শক ক'রে অগ্রসর হোক। নানা বিদ্যার ক্ষেত্রেই ফরাসী ও জার্মাণ চাই একসঙ্গে।

লেখক—আর কারো নাম কর্‌বেন না?

সরকার—আর একজনকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তিনি হচ্ছেন যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী। তাঁর কাজও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে। দু'জনেই জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে যথার্থ "সাধক"। লেখাপড়া নিয়েই এঁরা জীবন কাটাবেন মনে হচ্ছে। দুইয়েরই বৈজ্ঞানিক বনিয়াদ পাকা নিরেট। নয়া বাংলার সংস্কৃতি এই দু-জনের কাজকর্মের ফলে বেশ-কিছু উঁচিয়ে উঠ্‌তে বাধ্য।

লেখক—মাত্র দু'জনের নাম কর্‌ছেন?

সরকার—শুধু দু'জনের নাম কর্‌ছি ব'লে ভাব্‌তে হবে না যে, মাত্র এক জোড়া গবেষক-লেখকের দৌলতে বাঙালী জাত্‌ এগিয়ে যাচ্ছে বা যাবে। বিদ্যার দৌড় আমার বেশী নয়। আর অনেকেরই খবর রাখি না। রাখা সম্ভবও নয়। হয়ত উল্লেখযোগ্য অনেকেই বাদ প'ড়ে যাচ্ছে। যেটুকুর অভিজ্ঞতা আছে, তার ভেতর থেকেই ব'ল্‌ছি। আমার মতামত অবশ্য তোর মেনে নিতে হবে না। হাজার বার ব'লেছি একথা। যা'ক।

তবে ঢাক্‌-ঢাক্‌-গুড়্‌-গুড় ক'রে লাভ নেই। তর্কবিজ্ঞান, চিত্ত-বিজ্ঞান হ'তে ধন-রাষ্ট্র-সমাজ-বিজ্ঞান পর্যন্ত নানা নানা বিদ্যার দিকে নজর ফেলে দেখ্‌লাম। প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই দরের "সাধক" একজন ক'রে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ভাত-কাপড়ের কষ্ট এত বেশী যে, লেখাপড়ার আখ্‌ড়ায় সাধনা চালাবার মতন পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ছোক্‌রা জুটানো কঠিন।

লেখক—উদীয়মান লেখক-গবেষকদের সম্বন্ধে আপনার কোনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে?

সরকার—আছে বৈকি! বংগীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ, বংগীয় সমাজ বিজ্ঞান পরিষৎ প্রভৃতি কয়েকটা পরিষদের সংশ্রবে গণ্ডা কয়েক উৎসাহী গবেষকের সংগে আমার দহরম-মহরম

চলে। হালের ষোল-সতের বৎসরের কথা বলছি। স্বদেশী যুগের অভিজ্ঞতা দিচ্ছি না। কিন্তু খাওয়া-পরার অভাব অতি ভীষণ। অনেকেই লেখালেখির আসরে বেশী-কিছু করতে পারে না। আর আমিও এ-সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করি না। এযুগে আমি স্বদেশী যুগের দায়িত্ব নিতে পারি নি। তবুও প্রত্যেককে দিয়েই কিছু-না-কিছু লিখিয়ে ছেড়েছি।

দেশে-অনুসন্ধান-গবেষণায় অনুরাগী ছোক্‌রার অভাব নেই,—অভাব যা-কিছু অন্নবস্ত্রের। লেখালেখি জিনিষটা রীতিমত জীবন-সংগ্রাম। তার উপর জীবনের লক্ষ্য, ব্যক্তিত্বের আদর্শ, স্বদেশসেবার আকাঙ্ক্ষা তো আছেই।

("ব্রজেন শীল এত কম লিখলেন কেন?" ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)।

নবেম্বর ১৯৪২

"আর্থিক উন্নতি" ও বংগীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদ্

১লা নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—আপনি তো ১৯২৬ সন হ'তে ষোল-সতর বছর ধ'রে "আর্থিক উন্নতি" মাসিক আর বংগীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদ্ চালাচ্ছেন। এই পরিষৎকে শুনেছি কেহ-কেহ আপনার টোল বলে? আপনার ব্যবস্থায় ধনবিজ্ঞানের আকার-প্রকার কিরূপ?

সরকার—আমার ব্যবস্থায় ধনবিজ্ঞান সোজাসুজি অর্থশাস্ত্রের কর্মকাণ্ড। ধনবিজ্ঞানের ইতিহাসকে বয়কট ক'রে কাজ সুরু ক'রেছি বলা যেতে পারে। আরও বলা উচিত যে, জ্ঞানকাণ্ড, থিয়োরি বা তত্ত্বও বয়কট করা হ'য়েছে। এই অসহযোগ জেনে-শুনেই চালাচ্ছি। তবে ক্বচিৎ-কখনো ঐতিহাসিক রচনা "আর্থিক উন্নতি"তে বেরোয় না তা নয়। তত্ত্বকথাও যে পুরাপুরি বাদ গেছে তাও বলা ঠিক নয়। কিন্তু এই দুইপথের গবেষণা সজ্ঞানে বন্ধ রাখা হ'য়েছে। প্রধানতঃ বা একমাত্র আর্থিক কর্মকৌশল বা ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে মগজ খেলাবার মতলবেই আমি এই পত্রিকা ও টোল-জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত ক'রেছি। এজন্যই পত্রিকার নাম "ধনবিজ্ঞান" দিই-নি—দিয়েছি "আর্থিক উন্নতি"।

লেখক—আপনি ব'লেছেন যে, ভারতে ধনরাষ্ট্রসমাজ-দর্শনের তত্ত্বকথা, বা জ্ঞানকাণ্ড একপ্রকার আলোচিত হয় না। আপনার কাছে তো তত্ত্বকথার জন্যই বিশেষ ব্যবস্থা আশা করা উচিত। অথচ আপনি নিজেই অন্যদিকে মাথা খেলালেন কেন?

("ধন-রাষ্ট্র-সমাজ-বিজ্ঞানের তত্ত্ব, ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড", ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—বুঝতে হবে যে, কর্মকাণ্ডকে আমি নেহাৎ ছেলে-খেলা বা নকড়া-ছকড়া বিবেচনা করি না। আবার ধনবিজ্ঞানের ইতিহাসও আমার বিবেচনায় ফেলিতব্য চিজ্ নয়। সবই আমি চাই। কিন্তু আমি যখন ধনবিজ্ঞানে লেখালেখি সুরু করি তখন আমাকে দেশ ও দুনিয়ার চারদিকে নজর ফেলে নিজ পথ ঠিক করতে হ'য়েছিল। ধন-বিজ্ঞান বিদ্যাটাকে আদৌ লেখালেখির প্রধান ধান্ধা করবো কিনা,—এমন কি তাই ঠিক ছিল না। তারপর ধনবিজ্ঞানেরই বা কোন্ পথে যাই এ সম্বন্ধেও একটা সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছিল।

লেখক—শেষ পর্যন্ত আপনি কর্মকাণ্ডের পথ বেছে নিলেন কেন?

সরকার—১৯১৪-২৫ এর ভেতর দুনিয়া-পর্যটনের সময় মগজ খেল্‌তো একসংগে নানা বিদ্যার আসরে। তার তের ধনবিজ্ঞান ছিল অন্যতম মাত্র। ১৯২০ সনের নবেম্বর মাসে হাজির হই প্যারিসে। তখন ঠিক করি যে, ধনবিজ্ঞান নিয়েই বেশী সময় কাটানো যাবে। সেখানে ফরাসী ধনবিজ্ঞান পরিষদের দুই সভাপতি,—সেনেটার রাফায়েল জর্জ লেভি এবং ঈভ্-গিয়ো,—আমাকে তাঁদের সভ্য ক'রে নিলেন (১৯২১)। প্রায় বার বছর ধ'রে নানাদেশে মুসাফিরি করতে-করতে হরেক-রকম,—ইংরেজ, অন্-ইংরেজ,—অর্থশাস্ত্রীর সংগে দহরম-মহরম চালিয়েছি। কিন্তু নজরটা আমার ছিল সর্বদাই ভারতের দিকে।

লেখক—১৯১৪-২০ সনের যুগে অর্থনৈতিক গবেষণা ভারতে কিরূপ ছিল?

সরকার—সেই কথাই বল্‌ছি। গবেষণার পরিমাণ ছিল নগণ্য। বিশেষতঃ বাংলাদেশে এত কম ছিল যে, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। না তত্ত্ব, না ইতিহাস, না কর্মকাণ্ড,—কোনোদিকেই এক-প্রকার কিছু ছিল না ব'ল্‌লেই চলে। যা-কিছু ছিল তা প্রায় আগাগোড়া ইতিহাস অথবা পল্লী-কুটীরের নৃতত্ত্ব। এই যুগের খতিয়ানে স্বদেশী যুগের রমেশ দত্ত, অম্বিকা উকিল আর ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায়ের কথা বাদ দিয়ে যাচ্ছি।

লেখক—আপনার মেজাজে কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা খুব-বড় মনে হ'লো কেন?

সরকার—সর্বদাই ভাব্‌ছিলাম,—আমাদের দেশের জন্য কোন চিন্তা, কোন্ শ্রেণীর কাজ সবচেয়ে জরুরি ও সময়োপযোগী? বাঙালী ও অন্যান্য ভারতীয় লিখিয়ে-পড়িয়েদের মগজে কোন্-কোন্ আর্থিক কথা বেশী ব'সে যাওয়া উচিত? এই সকল প্রশ্ন সর্বদা মনে আস্‌তো প্যারিসের অর্থশাস্ত্রীদের বৈঠকে। ১৯১৪-২০-এর ভারতীয় অর্থশাস্ত্রী ও রাষ্ট্রনায়কদের লেখালেখি ও বকাবকি আমি বিলাত, আমেরিকা, জাপান, চীন ও ফ্রান্স হ'তে বেশ-কিছু দেখ্‌ছিলাম। মনে হ'লো যে, ভারতীয় মগজ,—বিশেষতঃ বাঙালী মগজ,—মেরামত করা প্রয়োজন। আর তার জন্য জরুরি ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড,—বিশেষতঃ সংখ্যানিষ্ঠ কর্মকাণ্ড।

লেখক—লোকেরা কি আপনাকে কর্মকাণ্ডের লোক ব'লে জানে? আমাদের দলে আপনি ত আজকাল কেবল গ্রন্থকাররূপে পরিচিত?

সরকার—কথাটা ঠিক। এখানে রগড়ের জন্য [illegible] একটা কথা ব'লে যাচ্ছি। স্বদেশী যুগে জীবন সুরু কর্‌বার সময় (১৯০৭) কর্মকাণ্ড ছিল একমাত্র সাধনা। "শিক্ষা-বিজ্ঞান" বিষয়ক বইগুলা জন্মেছিল,—মালদহে নিজের কায়েম-করা "জাতীয়" শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহ চালাবার জন্য। তখনকার দিনে বন্ধুরা আমাকে "কেজো লোক" ব'লে জান্‌তো আর "শিক্ষাবিজ্ঞান সরকার" বলে ঠাট্টা কর্‌তো।

লেখক—অর্থশাস্ত্রের কর্মকাণ্ড কি ১৯১৪-২০ সনে ভারতে জানা ছিল না?

সরকার—নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু আমার পছন্দ-সই প্রণালীতে ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড আলোচিত হ'তো না। ভারত-প্রচলিত পথের প্রতিপাদস্বরূপ দেখা দেয় আমার কর্মকাণ্ড। অন্যান্য অনেক-কিছুর মতন এই অধমের "আর্থিক উন্নতি"-গবেষণাটাও প্রতিবাদবিশেষ।

লেখক—ভারত-পরিচিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আপনি বিদেশে প্রবাসী থাক্‌বার সময় প্রতিবাদগুলা প্রচার কর্‌লেন কী ক'রে?

সরকার—১৯২০-২৫ সনের ভেতর ফ্রান্স, জার্মাণি, অষ্ট্রিয়া, সুইট্‌সার্ল্যাণ্ড ও ইতালি হ'তে আমি ভারতবর্ষের নানা মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় ভারতীয় সুধীগণের অপরিচিত হরেক-রকমের তথ্য ও তত্ত্ব প্রকাশ ক'রেছিলাম। আমি যখন সুইট্‌সার্ল্যাণ্ডে, সুভাষচন্দ্র বসু তখন চিত্তরঞ্জন-প্রবর্তিত ও সম্পাদিত "ফরওয়ার্ড" দৈনিকের কর্মকর্তা।

১৯২৩ সনের শেষের দিকে তিনি আমাকে "ফর্‌ওয়ার্ডে"র ইয়োরোপীয় সংবাদদাতা বাহাল করেন। তাতেও অর্থনৈতিক লেখা-লেখির সুযোগ বেড়ে যায়।

লেখক—এই সকল লেখালেখির বিশেষত্ব কী ছিল?

সরকার—প্রত্যেক প্রবন্ধই ছিল ফরাসী, জার্মাণ বা ইতালিয়ান ভাষায় প্রচারিত অর্থনৈতিক দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত। এসব মাল ভারতীয় পণ্ডিতমহলে বিল্‌কুল নয়া মালুম হ'য়েছিল। অনেকের কাছ থেকে আমি এই মর্মে চিঠি পেতাম। আমার আলোচনা-প্রণালী সম্বন্ধে কলিকাতার "মডার্ণ রিভিউ"-তে "মেথডলজি অব রিসার্চ ইন্ ইকনমিক্‌স্" প্রকাশ করি (১৯২৪)। বংগীয় ধনবিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালী জাতের নিকট একটা প্রস্তাব পেশ করি "প্রবাসী" মাসিকের মারফৎ। (১৯২৫)।

লেখক—দেশে ফেরার পর বাঙালী জাতের সাড়া কিরূপ পেয়েছিলেন?

সরকার—সাড়া পাওয়া গেছে প্রথম-প্রথম কয়েকজন বন্ধুর। নরেন্দ্রনাথ লাহা, তুলসীচন্দ্র গোস্বামী (শ্রীরামপুর), তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), সত্যচরণ লাহা, গোপালদাস চৌধুরী (সেরপুর, ময়মনসিংহ), নলিনীমোহন রায় চৌধুরী (টেপা, রংপুর) ইত্যাদি বন্ধুবর্গ "আর্থিক উন্নতি" আর বংগীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের প্রথম সহায়ক হন (১৯২৬)। তারপর হ'তে প্রধানতঃ বা একমাত্র নরেন লাহার ঘাড়ে প'ড়েছে বন্ধুত্বের অত্যাচার। তাঁর বারান্দায় বসে টোলের বৈঠক, আর লাইব্রেরিতে পাই আত্মিক খোরাক। আর তাঁর ছাপাখানা আছে ব'লে নিয়মিতরূপে বেরোয় "আর্থিক-উন্নতি"। "বাংলায় ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের দুই খণ্ডে (১৯৩৭, ১৯৩৯) এসব খবর পাবি। অবৃত্তিক গবেষকদের রচনাবলীও এই বইয়ের ভেতর আছে।

লেখক—আপনার অর্থনৈতিক গবেষণা-প্রণালীর বিশেষত্ব কী?

সরকার—প্রথমতঃ, ভারতীয় সুধীমহলে আলোচিত হ'তো একমাত্র বা প্রায় একমাত্র ভারতীয় আর্থিক তথ্য। আমার আলোচনায় আর্থিক ভারতকে একা হাজির হ'তে হয় না। প্রায় প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রেই ভারতকে ফেলা হয় ইয়োরামেরিকার নানাদেশের আর জাপানের ভেতর।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সুধীরা বিদেশী অর্থকথা কচিৎ-কখনো আলোচনা করতেন। অধিকন্তু তাঁদের আলোচনায় বিদেশটা ছিল প্রায় সকল ক্ষেত্রেই একমাত্র বিলাত। আমার আলোচনায় ইয়োরামেরিকার বহুদেশ এবং জাপানও এসে পড়ে। সুতরাং বিলাতের একাধিপত্য থাকে না।

তৃতীয়তঃ, আমাদের দেশে যখন-তখন বকা হতো "ভারতীয় অর্থশাস্ত্র"। তার জায়গায় আমি দাঁড় করালাম "বিশ্বদৌলত ও আর্থিক ভারত"। তুলনামূলক ধনবিজ্ঞান হ'লো আমার পারিভাষিক। আমার বকাবকিতে দুনিয়ানিষ্ঠা দাঁড়িয়ে গেছে আট-পৌরে গবেষণার আত্মিক ভিত্তি।

চতুর্থতঃ ভারতীয় সুধীগণের আর্থিক চিন্তায়,—সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে,—রাষ্ট্রনীতির প্রভাব দেখা দিত। আমার লক্ষ্য হ'লো ধনবিজ্ঞানকে "পারিত্-পক্ষে" রাষ্ট্রনীতি থেকে মুক্ত করা।

পঞ্চমতঃ, ধনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য, আদর্শ বা ভাবুকতা ছিকে'য় তুলে' রেখেছি। তার বদলে দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক যুক্তির স্বরাজ। সুতরাং বস্তু-পরিচয়, তথ্যসংগ্রহ ও সংখ্যা-বিশ্লেষণ বা মাপাজোপা দাঁড়ালো প্রধান ধান্ধা। এর উল্টা ছিল ভারতীয় সুধীমহলের প্রায় সর্বজনপ্রিয় আদর্শ-নিষ্ঠার ধনবিজ্ঞান।

এক কথায় বল্‌তে পারি যে, এই অধমের অর্থনৈতিক গবেষণা-প্রণালীর খুঁটা মাত্র দুই,—প্রথমতঃ, দুনিয়ানিষ্ঠা ; দ্বিতীয়তঃ, বস্তুনিষ্ঠা।

দুনিয়া-নিষ্ঠ ও বস্তু-নিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র

লেখক—এই প্রণালীর নমনা আপনার কোন্-কোন্ বইয়ে পাওয়া যায়?

সরকার—মাত্র একটার নাম কর্‌ছি। বিদেশ হ'তে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলার সংগ্রহ একত্রে পাবি "ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেন্ট" বইয়ের প্রথম খণ্ডে (মাদ্রাজ, ১৯২৬)। "মডার্ণ রিভিউ"-র প্রবন্ধটা (১৯২৪) এই বইয়ের ভেতর আছে। "প্রবাসী"র প্রবন্ধটা (১৯২৫) পাবি "বাঙলায় ধনবিজ্ঞান" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে (১৯৩৭)।

লেখক—ভারত-প্রচলিত "ভারতীয় অর্থশাস্ত্র" হ'তে আপনার "দুনিয়ানিষ্ঠা ও বস্তুনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্র" বিভিন্ন কতটা? দু-এক কথায় প্রভেদটা বুঝাতে পারেন?

সরকার—ভারতীয় সুধীগণের বিবেচনায় বিলাতে বা জার্মাণিতে যা-কিছু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঘট্‌ছে, ভারতেও এই মুহূর্তেই সেইসব ঘটা সম্ভব। আমার বিবেচনায় একদম অসম্ভব। দুনিয়ানিষ্ঠা আর বস্তুনিষ্ঠার অর্থশাস্ত্র অনুসারে আর্থিক ভারত আজ আর্থিক বিলাতের প্রায় একশ' বছর পেছনে,—আর্থিক জার্মাণির প্রায় সত্তর বছর পেছনে। কাজেই পাঁতি আমার সোজা। বছর সত্তরেক আগেকার জার্মাণিতে যা ঘট্‌তো, আজকের ভারতে তা ঘট্‌তে পারে। "সাধারণতঃ" এর বেশী আশা করা অলীক কল্পনা মাত্র। ইত্যাদি। তবে আমি কল্পনা, আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা, চরম লক্ষ্য, ভাবুকতা ইত্যাদিও পছন্দ করি। কিন্তু সে-সব যে কল্পনা মাত্র তাতে আমার সন্দেহ থাকে না।

অপর দিকে ইয়োরামেরিকার নানাদেশ রাষ্ট্রিক হিসাবে স্বাধীন বটে, কিন্তু আর্থিক হিসাবে অনেক দেশই ঠিক যেন পরাধীন ভারতের অবস্থায় র'য়েছে। বল্‌কান অঞ্চল, রুশিয়া (সোভিয়েট ব্যবস্থার পূর্ববর্তী), স্পেন-পর্তুগাল, দক্ষি' আমেরিকা ইত্যাদি জনপদ আর্থিক ভারতেরই প্রায় সমান ধাপে অবস্থিত। এই সকল দেশে বর্তমানে যে-সব কর্মকৌশল চল্‌ছে সেইসব কর্মকৌশলই ভারতে প্রয়োগ করা সম্ভব, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এই হ'লো "আর্থিক উন্নতি"র তত্ত্বকথা, থিয়োরি, বিজ্ঞান বা দর্শন। বলা বাহুল্য, এই ধরণের সিদ্ধান্ত সার্বজনিক "ভারতীয় অর্থশাস্ত্র"-মাফিক সিদ্ধান্তের আগাগোড়া উল্‌।

লেখক—এই সকল কথা কোন্ বইয়ে পাওয়া যাবে?

সরকার—"ইকনমিক ডেভেলপ্‌মেন্ট" বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (কলিকাতা, ১৯৩২, ১৯৩৮)।

লেখক—ভারতবর্ষের আর্থিক ব্যবস্থার জন্য আপনি সার্বজনিক মতের বিরোধী প্রস্তাব কোন্-কোন্ বইয়ে প্রকাশ ক'রেছেন?

সরকার—"ইণ্ডিয়ান্ কারেন্সি অ্যাণ্ড রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রব্‌লেম্‌স্" (১৯৩৩, ১৯৩৪)। এই বইয়ে ভারতীয় মুদ্রানীতি, সিক্কা-ব্যবস্থা, বিনিময়ের হার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত আছে। আর একটা বইয়ের নাম "ইম্পীরিয়্যাল প্রেফারেন্স ভিজাভি ওয়ার্লড ইকনমি" (সাম্রাজ্যিক পক্ষপাত ও বিশ্বদৌলত, ১৯৩৪)। এই বইয়ে আছে ভারতীয় শুল্কনীতি, আমদানি রপ্তানি, বহির্বাণিজ্য, অটাওয়া-চুক্তি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা। এই দুই বই সার্বজনিক "ভারতীয়

অর্থশাস্ত্রের" পক্ষে চক্ষুশূল।

লেখক—বর্তমান ভারতে কাজে লাগ্‌তে পারে এমন কোন অর্থনৈতিক প্রস্তাব আপনার কোনো বইয়ে প্রকাশিত হ'য়েছে?

সরকার—"সোশ্যাল ইন্‌শিওর্‌্যান্স লেজিস্‌লেশান্ অ্যাণ্ড স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্" (সমাজ-বীমার আইনকানুন ও সংখ্যাহিসাব, ১৯৩৬)। আমার বিবেচনায় "সমাজ-বীমা" ভারতীয় মজুর-সম্প্রদায়, কেরাণী এবং অন্যান্য নরনারীর পক্ষে যারপরনাই জরুরি।

লেখক—শুনেছি লোকসংখ্যা সম্বন্ধেও নাকি সার্বজনিকের উল্টা মত আপনার? কোন-কোন্ রচনায় সে-সব পাওয়া যায়?

সরকার—লোকবিদ্যা সম্বন্ধে আমার প্রথম রচনা ইতালিয়ান ভাষায় (১৯৩১)। ফরাসী ও জার্মাণ ভাষায় কয়েকটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে। দেশী পত্রিকার ভেতর "জার্ন্যাল অব্ দি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন", "ইণ্ডিয়ান জার্ন্যাল অব্ ইকনমিক্‌স্", "সায়েন্স অ্যাণ্ড কাল্‌চার" ইত্যাদিতে কয়েকটা আছে। বইয়ের নাম কর্‌তে পারি "সোশিঅলজি অব্ পপিউলেশন" (১৯৩৬)। লোক-বিদ্যা সংখ্যাশাস্ত্রের মাল। অঙ্কের কারবার খুব বেশী।

দুনিয়ার পণ্ডিতেরা ব'লে চ'লেছেন যে, ভারতের লোকগুলা জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধি-সম্বন্ধে সৃষ্টিছাড়া নরনারী। আমি ব'লে চ'লেছি যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধির হার যে-গতিতে চলে ভারতেও সেই গতিতেই চলে। দুনিয়ার পণ্ডিতেরা বল্‌ছেন,—"ভারতের সমাজে চ'লেছে লোকসংখ্যার অতি বৃদ্ধি।" আমি ব'লেছি—"অতিবৃদ্ধি সপ্রমাণ করা সম্ভবপর নয়, কেন না দারিদ্র্যের বৃদ্ধি সপ্রমাণ করা সহজ নয়।"

লেখক—দারিদ্র্যের সঙ্গে লোকসংখ্যার অতি-বৃদ্ধির সম্পর্কটা বুঝিয়ে দেবেন?

সরকার—লোকসংখ্যার অতি-বৃদ্ধি সপ্রমাণ কর্‌বার জন্য আগে সপ্রমাণ করা চাই যে, দেশের "দারিদ্র্য বেড়ে চলেছে।" ভারতবর্ষ আজও গরীব, খুবই গরীব সন্দেহ নেই। কিন্তু দারিদ্র্য বাড়্‌তির পথে একথা সপ্রমাণ করা সম্ভব নয়। ১৯৪০ সনে ভারতবাসীর মাথাপিছু দারিদ্র্য ১৯০০ সনের চেয়ে বেশী কি? ১৯০০ সনের দারিদ্র্য ১৮০০ সনের চেয়ে বেশী কি? এই সব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেওয়া কঠিন। কাজেই বিনা প্রমাণে লোকসংখ্যার অতি-বৃদ্ধি প্রচার কর্‌লে বিজ্ঞান-নিষ্ঠ কাজ করা হয় না। অপর দিকে শিবাজির আমলে, আকবরের আমলে, চন্দ্রগুপ্তের আমলে, বৈদিক আমলেও ভারতবাসী গরীব ছিল। দারিদ্র্যকে লোকসংখ্যার অতি-বৃদ্ধির প্রমাণ ধ'রে নিলে শিবাজি, আকবর, চন্দ্রগুপ্ত ও বৈদিক যুগের ভারতেও লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি ছিল বুঝ্‌তে হয়! তা হ'লে অবস্থা দাঁড়ায় যে, যখন মাত্র দুচার-কোটি লোক সারা ভারতের অধিবাসী তখনও ভারতবর্ষ লোকসংখ্যায় অতিবৃদ্ধির দেশ ছিল!!

লেখক—এইসব যুক্তি আপনি কোনো বইয়ে প্রকাশ ক'রেছেন?

সরকার—"ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউনস্ অ্যাজ্ সোশ্যাল প্যাটার্নস্" (১৯৪১)।

লেখক—আপনি ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ডের সংগে-সংগে ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস আর জ্ঞানকাণ্ডও চালালেন না কেন?

সরকার—এই অধমকে ধনবিজ্ঞান ছাড়াও আর দুইটা বিজ্ঞানের সেবা কর্‌তে হয়। একটার নাম রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর একটার নাম সমাজ-বিজ্ঞান। এই দুই বিজ্ঞানের সংগে ধনবিজ্ঞানের নাড়ীর যোগ নেই বল্‌লেই চলে। কম্‌সেকম্ আমার আলোচনায় এই দুই বিদ্যা প্রায় সম্পূর্ণ স্বরাজশীল। ঘটনাচক্রে এই দুই বিজ্ঞানের কোঠেও এই অধম কিঞ্চিৎ-কিছু

স্বাধীন মগজ চালাতে অভ্যস্ত। স্বাধীন শব্দের অর্থে বুঝ্‌তে হবে আবার প্রতিবাদ, বিরোধ ও লড়াই। তার জন্যও লেখালেখি কর্‌তে কম হয় না।

তিন-তিনটা স্বতন্ত্র বিদ্যা, বিজ্ঞান বা দর্শনের ঝুঁকি লওয়া উচিত কিনা জানি না। তবে ঘাড়ে এসে প'ড়েছে। কাজেই ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস ও জ্ঞানকাণ্ডে স্বাধীন কলম চালাবার ফুরসুৎ কোথায়? এজন্যই ডাক্‌ছি নয়া-নয়া গবেষকদেরকে। পঁচিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের ছোক্‌রারা লেগে যাক্ এই সব কাজে।

লেখক—তা হ'লে বর্তমানে আমাদের দেশে ধনবিজ্ঞানের চর্চা কী অবস্থায় রয়েছে?

সরকার—আগেই বলেছি,—আমি যাকে ধনবিজ্ঞান বলি, তার চর্চা ভারতে আজও খুবই কম। "ভারতীয় অর্থশাস্ত্র'-মাফিক্ লেখালেখির ভেতর আসল কথা হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। এর প্রেরণা রাষ্ট্রনৈতিক কর্মকৌশলে। আর এই অধমের "দুনিয়ানিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র" প্রধানতঃ সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত। সুতরাং খাঁটি ধনবিজ্ঞানের টিকি বা লেজুর এই দুই কোঠে বড একটা দেখা যায় না।

লেখক—আপনার মতোপযোগী স্বাধীন দর্শন বা বিজ্ঞান কি ভারতীয় ধনবিজ্ঞান-চর্চার ভেতর কিছুই নেই?

সরকার—অনেকবারই ব'লেছি—প্রত্যেক বই, প্রবন্ধ বা পুস্তিকা বিশ্লেষণ ক'রে দেখা উচিত। কোথাও কোথাও হয় তো মূল্যতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, মজুরিতত্ত্ব, সুদ-তত্ত্ব, চক্রতত্ত্ব ইত্যাদি নানা তত্ত্বের কুচোকাচা পাওয়া যেতে পারে। ১৯৩৫ সনের পরবর্তী ভারতীয় রচনাবলীর ভেতর হয়তো ধনবিজ্ঞানের তত্ত্ব, দর্শন বা বিজ্ঞান খানিকটা বেশী ডোজে পাওয়া যাবে। "ইণ্ডিয়ান জার্ন্যাল অব্ ইকনমিক্‌স্" পত্রিকাটা ঘেঁটে দেখা মন্দ নয়। (পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯, ৬০)

("ধন-রাষ্ট্র-সমাজ-বিজ্ঞান", ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সমাজ-বিজ্ঞানে ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সার্বজনিকের উল্টাপথে

২রা নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনার কলম স্বাধীনভাবে চলে ব'লেছেন। কথাটার মানে কি?

সরকার—ধনবিজ্ঞানের মতন সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই অধমের চিন্তাগুলা পরকীয় (দেশী-বিদেশী বা সার্বজনিক) চিন্তাসমূহের প্রতিবাদ। অনেক সমাজশাস্ত্রী আর রাষ্ট্রশাস্ত্রীর সংগেই চ'লেছে অমিল। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধানই ভাঙে রে ভায়া! কী কর্‌বো? পোড়াকপাল আমার। যা-ই ছুঁই তাতেই বিরোধ। বাঁধা-পথগুলায় কোনোমতেই চলা সম্ভব হ'লো না। জীবনটা কেটে যাচ্ছে লড়াই চালাতে-চালাতে। সর্বত্রই র'য়েছি আজ পর্যন্ত উল্টা পথের পথিক। (পৃষ্ঠা ৮০-৮১)

লেখক—সমাবিজ্ঞানের অন্তর্গত কোন্-কোন্ বইয়ে আপনার প্রতিবাদগুলা দেখ্‌তে পাব?

সরকার—কোন্‌টার নামই বা করি আর কোন্‌টারই বা না করি? যেখানেই আমাকে কামড়াবি, সেখানেই পাবি প্রতিবাদ। প্রতিবাদের সুযোগ না আসা পর্যন্ত কলমই আমার হাতে উঠে না। যেখানে প্রতিবাদের আবহাওয়া সেখানে কলমটা আপনা-আপনি হাতে এসে পড়ে।

"পজিটিভ্ ব্যাক্গ্রাউণ্ড অব হিন্দু সোশিওলজি"'র নাম শুন্তে শুন্তে বোধ হয় তোর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। তারপর দেখ্বি "চাইনীজ রিলিজ্যন থ্রু হিন্দু আইজ" (হিন্দু চোখে চীনা ধর্ম, শাংহাই ১৯১৬) ও "ফোক্ এলিমেণ্ট ইন্ হিন্দু কালচার" লণ্ডন (১৯১৭)। "সোশিওলজি অব রেসেজ" বইটা (১৯২২,১৯৩৯) তো আছেই। একালের বইয়ের মধ্যে "কম্প্যারেটিভ্ বার্থ, ডেথ্ অ্যাণ্ড গ্রোথ-রেট্স্" (আন্তর্জাতিক জন্ম-মৃত্যু-বৃদ্ধিহার, ১৯৩২), "সোশিওলজি অব পপিউলেশন" (১৯৩৬) আর "ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউন্স অ্যাজ্ সোশ্যাল প্যাটার্নস্" (১৯৪১) দ্রষ্টব্য। এই বইগুলার প্রত্যেকটাই কতকগুলা পণ্ডিতমহলে সুপ্রচলিত এবং প্রায়-সর্ববাদিসম্মত মতের প্রতিবাদ। নিজের সিদ্ধান্তগুলা আগাগোড়াই সার্বজনিকের উল্টাপথে চ'লেছে।

লেখক—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আপনার প্রতিবাদগুলা কোন্-কোন্ বইয়ে পাব?

সরকার—সেই স্বদেশীযুগের "সায়েন্স অব হিস্ট্রি" (১৯১২) প্রথমে দেখ্তে পারিস্। তারপর দেখ্বি "পোলিটিক্যাল্ ইনস্টিটিউশান্স্ অ্যাণ্ড থিয়োরিজ্ অব্ দি হিন্দুজ্", (১৯২২, ১৯৩৯)। একালের "পলিটিক্স্ অব বাউণ্ডারিজ" (১৯২৬) আর "পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ্ সিন্স্ ১৯০৫" (১৯২৮, ১৯৪২) বই দু'টার চার ভাগও ঘাঁটতে হবে।

লেখক—"পোলিটিক্যাল্ ফিলজফিজ্" বইটা তো ঐতিহাসিক। এর ভেতর আপনার প্রতিবাদসমূহ এলো কী ক'রে?

দরকাব—ঠিক ধ'রেছিস্। নামেই প্রকাশ যে, বইটা ঐতিহাসিক। তবে অতিমাত্রায় সমসাময়িক আর তাজা ইতিহাস। ১৯৪২ সন পর্যন্ত অর্থাৎ এই বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এনে ঠেকিয়েছি। এর সবথেকে পুরাণা খুঁটা ১৯০৫ সন,—অর্থাৎ মাত্র সাঁইত্রিশ বছরের চিন্তারাশি ঐ বইয়ের চার খণ্ডের মাল। তবে ভূমিকা স্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শেষ আর গত শতাব্দীও চুম্‌ড়ে' নেওয়া গেছে। নানাদেশের, মায় ভারতেরও, রাষ্ট্র-শাস্ত্রীদের "ফিলজফিজ্" অর্থাৎ দার্শনিক চিন্তাসমূহ এর ভেতর পাবি। কিন্তু পরকীয় দর্শনের ফাঁকে-ফাঁকে আছে স্বকীয় অর্থাৎ নিজ মতের পশ্‌লা ছোট-বড়-মাঝারি আকারে। স্বকীয় চিন্তাগুলা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সার্বজনিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাসের ইজ্জদ দর্শনের সমান

লেখক—কৌটিল্য, মনু, শুক্র ইত্যাদি প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্র-দর্শন বা সমাজ-দর্শন বা অর্থ-দর্শন সম্বন্ধে একালের ভারতীয় পণ্ডিতগণের গবেষণাসমূহকে আপনি দার্শনিক রচনার অন্তর্গত করেন না কি?

সরকার—কোনো দিনই না। এই সকল গবেষণাকে রাষ্ট্র-দর্শন বা রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বল্‌বো না। সমাজ-দর্শন বা সমাজ-বিজ্ঞান বল্‌বো না। ধন-দর্শন বা ধন-বিজ্ঞানও বল্‌বো না।

কৌটিল্য-প্রণীত "অর্থশাস্ত্র" খেয়ে একালের অনেক পণ্ডিত মানুষ হ'য়ে গেল। "শুক্র-নীতি"টার ইংরেজি তর্জমা এই অধমের হাতেই বেরিয়েছে (১৯১২-১৪)। মনু, মহাভারতের শান্তিপর্ব, বৌদ্ধ জাতক, পালি মহাবস্তু, চণ্ডেশ্বর ইত্যাদি নিয়ে অনেককেই ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌তে হয়। তা ছাড়া আছে সেকেলে ভারতসন্তানদের রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে গবেষণা। ভারতীয় গবেষকের সংখ্যা এই ক্ষেত্রে মন্দ নয়। এতে দেশের ও দুনিয়ার উপকার

হ'য়েছে প্রচুর।

লেখক—এই সকল গবেষণাকে আপনি বিদ্যার কোন্ শ্রেণীতে ফেল্‌বেন?

সরকার—সব-কয়টা বই ; প্রবন্ধকার ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য সোজা। রাষ্ট্রশাস্ত্রী, সমাজশাস্ত্রী, অর্থশাস্ত্রী যে-ধরণের পণ্ডিত, এই সকল লেখক এই ধরণের পণ্ডিত নন। কম-সে-কম একমাত্র এই সমুদয় রচনার জোরে এঁদেরকে সেই দলের অন্তর্গত করা চল্‌বে না। এই সকল মাল ও মাল-স্রষ্টারা এক কথায় প্রাচীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের আওতায় পড়ে। জার্মাণ পারিভাষিকে বিদ্যাটার নাম "কুল্টুর-গেশিষ্টে" (সাংস্কৃতিক ইতিহাস)।

লেখক—ইতিহাস-বিদ্যাকে আপনি দর্শনের চেয়ে ছোট বিবেচনা করেন না? (পৃষ্ঠা ৫১-২)

সরকার—হাজার বার বলেছি,—না। আমার মেজাজে কোনো বিদ্যা, বিজ্ঞান বা দর্শন অন্য কোনো বিদ্যা, বিজ্ঞান বা দর্শনের চেয়ে খাটো নয়। গবেষণায়-গবেষণায় উনিশ-বিশ করা অসম্ভব। আবিষ্কার মাত্রই মেহনৎ-সাপেক্ষ, যুক্তি-সাপেক্ষ। আবিষ্কারে-আবিষ্কারে তফাৎ কর্‌তে বসা অনেক সময়েই ঝক্‌মারি। প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক গবেষণা ও আবিষ্কার বিচার কর্‌বার সময় মাত্র একটা জিনিষ দেখ্‌তে হবে। একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে,—আলোচনাটা যুক্তি-নিষ্ঠ কি না? যুক্তির বিচারে টেঁক-সই কি না?

লেখক—আমি দর্শনকে কোনো মতেই ইতিহাসের সমান ভাব্‌তে পার্‌ছি না।

সরকার—তা আমি বেশ জানি। আমায় বল্‌তে হবে না। তোমাদেরই মগজে ঢুকে' গেছে যে, তথাকথিত দর্শন একটা অতি-মাত্রায় হোমরা-চোমরা বিদ্যা। অন্যান্য বিদ্যাগুলোকে তোরা "পারিয়া" সমঝে' রেখেছিস্। এটা মস্ত ভুল। চরম বুজরুকি। এই বুজরুকি ইয়োরামেরিকার আর চীন-জাপানের কোথাও দেখিনি। দর্শনের ইতিহাস, জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতির ইতিহাস, ধনবিজ্ঞানের ইতিহাস, রীতিনীতির ইতিহাস, ধর্মের ইতিহাস, রাষ্ট্রিক ইতিহাস, আর্থিক ইতিহাস কোনো ইতিহাসই ছোটখাটো বিদ্যা নয়। সব কয়টা বিদ্যাই ভদ্রলোকের পাতে দেবার উপযুক্ত বিজ্ঞান বা দর্শন। কোনো তথাকথিত বিজ্ঞান বা দর্শন ব্রাহ্মণ-জাতীয় মাল নয়। তবে সর্বদাই দর্শন-বিজ্ঞানে আর দর্শনের ইতিহাসে ফারাক্‌টা সম্বন্ধে টন্‌টনে' জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, আজকাল যাঁরা প্রাচীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব আর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা কর্‌ছেন তাঁরা প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধীয় গবেষকদের সমান সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য?

সরকার—আলবৎ। এমন কি যাঁরা নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীন দর্শনের গবেষণায় ওস্তাদ তাঁদেরও সমান ইজ্জদ পাবার যোগ্য যে কোনো ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের গবেষক।

যদুনাথ, রাধাকুমুদ, রাখাল, রমেশ মজুমদার, হেম রায়

লেখক—ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ ইতিহাস-গবেষককে পাণ্ডিত্য হিসাবে আপনি খাঁটি দার্শনিকের সমান ইজ্জদ্ দিতে পারেন?

সরকার—অনেক ইতিহাস-গবেষকের নাম কর্‌তে পারি। জেনে রাখ্ যে, ঐতিহাসিক

গবেষণায় মগজ লাগে প্রচুর। মেহনতের ত কথাই নাই। কার নাম কর্‌বো? প্রেসিডেন্সি কলেজের আমার অন্যতমা গুরু যদুনাথ সরকার। একালের বাঙালী ঐতিহাসিকদের তিনি পথপ্রদর্শক। সপ্তদশ শতাব্দীর ভারত নিয়ে তাঁর কারবার। ফার্সী ও মারাঠি এই দুটা নতুন ভাষা তাঁকে এই জন্য দখলে আন্‌তে হয়েছে। তার উপর ফরাসী। আউরাংজেব আর শিবাজি এই দুইজনের জীবন-বৃত্তান্ত দাঁড় করাতে যে-সে যুক্তিনিষ্ঠার ডাক পড়েনি। তথ্যগুলা পাকড়াও করা কত কঠিন জানিস্‌?

লেখক—দুটা-একটা দৃষ্টান্ত দিন না।

সরকার—আজকাল লড়াই চল্‌ছে দেখ্‌তে পাচ্ছিস। একই যুদ্ধের খবর দুই পক্ষের লোক লেখে দুই বিভিন্ন রকমের। কোন্‌টা খাঁটি কার সাধ্য বুঝে? তার উপর সেনাপতিরা শত্রু পক্ষকে উল্টা খবর দেবার জন্য নিজের দেশেই মিথ্যাগুজব রটিয়ে থাকে। দুই পক্ষেই এইরূপ মিথ্যা প্রচার করা হয়। কার খবরটাকে ঐতিহাসিক সত্য ব'লে লওয়া চলে? কাজেই হাতের লেখা অথবা ছাপার হরপে কয়েকটা দলিল পেলেই গবেষকেরা নাচা-নাচি কর্‌তে অধিকারী নয়। কোনো একটা ঘটনা সম্বন্ধে দশ রকমের পরস্পর-বিরোধী বা গোলমেলে সাক্ষ্য জুটা সম্ভব। এই ধরণের দলিল ৫০।৬০।৭৫। বৎসর-ব্যাপী জীবনের প্রত্যেকদিন সম্বন্ধে পাওয়া যেতে পারে।

এই সকল সমস্যার ভেতর নিজেকে ফেলে দ্যাখ্‌। তা'হলে বুঝ্‌বি আউরাংজেব সম্বন্ধে একটা জীবন-বৃত্তান্ত খাড়া কর্‌তে যদু সরকারকে কতখানি যুক্তিনিষ্ঠ মাথা খোলাতে হ'য়েছে। শিবাজির জীবন-কথায়ও সেই ধরণেরই সমস্যা ছিল। এইসবও মীমাংসা কর্‌তে হয়েছে।

ঐতিহাসিক গবেষণাগুলা ফার্সী, মারাঠি, পর্তুগীজ বা ইংরেজি চিঠিপত্র ও দলিলের তর্জ্জমা মাত্র নয়। আর একমাত্র কল্পনার ক্ষমতা জাহির ক'রে কোনো রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি বা সেনাপতির রোজ-নামচা আবিষ্কার করা যায় না। পণ্ডিত হিসাবে ঐতিহাসিক যদুনাথ আর দার্শনিক হীরেন দত্ত আমার নিকট দুইই সমান দরের লোক।

লেখক—আপনি আর কোনো ঐতিহাসিককে যদুনাথের সমান সম্মান করেন?

সরকার—আগেই বলেছি, অনেককে। আমার সহপাঠী বন্ধু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদড়োর ভূমি আবিষ্কার ক'রে জগৎ প্রসিদ্ধ। এই আবিষ্কারেও যুক্তিনিষ্ঠা আর বিচার-ক্ষমতা আবশ্যক হ'য়েছে দস্তুরমতন। এখনো মহেঞ্জোদড়োর লিপিগুলা কেহ স্বীকার যোগ্যরূপে প'ড়ে উঠ্‌তে পারেনি। পড়্‌বার চেষ্টা চল্‌ছে। প্রত্যেক চেষ্টায়ই অনেকগুলা ভাষাজ্ঞান আর লিপিজ্ঞান আবশ্যক। এত আবশ্যক যে, ভারতসন্তানের ভেতর কোনো পণ্ডিতের পক্ষেই তা সম্ভবপর নয়। এতেই বুঝ্‌তে হবে যে, লিপি আবিষ্কার করার বিদ্যাটা কোনো তথাকথিত আধ্যাত্মিক বা অনাধ্যাত্মিক দর্শনের চেয়ে ছোট দরের কিছু নয়।

লেখক—মধ্যযুগের ভারত সম্বন্ধে গবেষণার অবস্থা কিরূপ?

সরকার—হেম রায়-প্রণীত ভারতীয় মধ্যযুগের রাজবংশগুলার বৃত্তান্ত দেখেছিস্‌? দুই খণ্ড বেরিয়েছে (১৯৩২, ১৯৩৬)। হিন্দু-মুসলমানের যোগাযোগের প্রথম তিন-চারশ' বছরের ইতিহাস এই বইয়ের মাল। দেখ্‌বি রকমারি সাক্ষীর বারোয়ারীতলা কাকে বলে। কে কার চেয়ে বেশী মিথ্যাবাদী বা খোসামুদে লোক? এক-একটা তাম্রশাসন ঠিক যেন অত্যুক্তির জাহাজ। চাটুকথার, অলীক কল্পনার, কবি-প্রশস্তির জয়-জয়কার চ'লেছে সর্বত্র,— প্রত্যেক চাপরাশি, দফাদার, হাবিলদার, নায়েব, তালুকদার, জমিদার ইত্যাদি সম্বন্ধে। আর আসল রাজা, বাদশা, সম্রাট্‌, মহাসম্রাট্‌ ইত্যাদি নরপতিদের সম্বন্ধে তো কল্পনার লাগাম আস্‌মান

পর্যন্ত স্বাধীন বটেই। এই হচ্ছে তথ্যের আকার-প্রকার।

রাজ-রাজড়া এখনো কত ডজন অনাবিষ্কৃত কে জানে? তথ্যহীন যুগ, দেশ, জমিদার আর রাজা-বাদ্‌শা ইত্যাদির সংখ্যাও যৎপরোনাস্তি। এই ধরণের মাল-মশলা নিয়ে ভারতীয় মধ্য-যুগের ঐতিহাসিকদেরকে কাজ করতে হয়। যে-কোনো দর্শন-গবেষকের যে-কোনো লম্বা-চওড়া নামওয়ালা বইয়ের পাশে ঐতিহাসিকদের বইগুলা ফেলে দ্যাখ্। ওজনে এঁদেরকে মাথা হেঁট্ কর্‌তে হবে না।

রাখালদাস-প্রণীত "বাঙ্‌লার ইতিহাস" (১৯১৫-১৬) দেখ্‌লেও ঐতিহাসিককে দার্শনিকের সমান ইজ্জদ্ দিতে পার্‌বি। পড়েছিস বোধ হয়? এটাও মধ্যযুগ সম্বন্ধে রচনার অন্তর্গত।

লেখক—আপনি ত প্রায়ই বৃহত্তর ভারতের কথা ব'লে থাকেন। এই বিষয়ে বাঙালী গবেষণার মূল্য কিরূপ? সেই-সবকে দর্শন-গবেষণার সমান বিবেচনা করা যায়?

সরকার—"গ্রেটার ইণ্ডিয়া" শব্দটা রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত ভারতীয় সমুদ্র-যাত্রার ইতিহাসে প্রথম ব্যবহৃত হয় (১৯১১),—স্বদেশী যুগে। যদুনাথের পর রাধাকুমুদ বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে ইতিহাস-গবেষণার পথ-প্রদর্শক। শব্দ আর বস্তু দুইই আমরা পাই ডন সোসাইটিতে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের চেলা হিসাবে। "বৃহত্তর ভারত" শব্দটা সেই আবহাওয়ায়ই বাংলায় চালাতে সুরু করে এই অধম।

বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে একালে কয়েকখানা তথ্যপূর্ণ বই বেরিয়েছে। ইন্দোচীন সম্বন্ধে রমেশ মজুমদারের গবেষণা আছে (১৯২৭)। এটা খুব দামী রচনা। সুমাত্রা-যবদ্বীপ সম্বন্ধে আছে বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়ের আর হিমাংশু সরকারের গবেষণা। শ্যাম সম্বন্ধে ফণী বসুর আর বার্মা সম্বন্ধে নীহার রায়ের বইয়ের নাম শুনে থাক্‌বি। পাতা উল্টালেই দেখ্‌বি যে, ঐতিহাসিক তথ্যগুলাকে খাড়া করার বিদ্যাটা যে-কোনো দার্শনিক বিদ্যার সমান।

বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ'র দার্শনিকতা

৪ঠা নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ প্রণীত বেদান্তবিষয়ক রচনাবলীর দার্শনিকতা সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—আগেই বলেছি, প্রত্যেক লেখকের রচনা নানাশ্রেণীর অন্তর্গত। এক-এক রচনার এক-এক সোআদ। যে-যে রচনায় বা বক্তৃতায় বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ বেদান্ত, যোগ, গীতা, উপনিষদ্ ইত্যাদি সাহিত্যের তর্জমাকারী, ভাষ্যকার, সার-প্রচারক ও ব্যাখ্যাকার,—সেই সকল রচনায় বা বক্তৃতায়, বলা বাহুল্য, এঁরা দার্শনিক নন। এঁরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন বা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচারকমাত্র। প্রসংগক্রমে ব'লে রাখ্‌ছি যে, এঁদের অনেক বক্তৃতায়, বেদান্ত ইত্যাদি ভারতীয় সাহিত্যের নাম দেখা যায় না। কিন্তু ভেতরে প্রচারিত মতগুলা সবই প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি হ'তে গৃহীত। সিদ্ধান্তগুলা প্রাচীন।

এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত প্রচারের কাজকেই এঁরা স্বধর্মরূপে গ্রহণ ক'রেছিলেন। সর্বদা মনে রাখ্‌তে হবে যে, প্রাচীন ভারতীয় দর্শনকে দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা ও লক্ষ্য। কাজেই নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা দার্শনিক কিনা এই প্রশ্নটা অবান্তর

বা অপ্রাসঙ্গিক।

("ছয় শ্রেণীর দর্শন-লেখক", ২৮শে অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্তের প্রচারকদেরকে আপনি দার্শনিক বলছেন কেন? আপনার মতে তো এঁরা দার্শনিক শ্রেণীর লেখক নন?

সরকার—তথাপি এঁদেরকে আমি পাকা দার্শনিক বিবেচনা ক'রে থাকি। বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ তর্জমা ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বইও লিখেছেন। সেই সব রচনায় আছে লোকজনকে কর্তব্য শেখানো। প্রথমতঃ, দেশবিদেশের নরনারীকে আত্মোন্নতির উপায় বাৎলানো আছে। দ্বিতীয়তঃ, কোনো-কোনো লেখায় হদিশ আছে দেশোন্নতির। এই হদিশগুলা ভারত-সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট। কর্তব্যপ্রচার আমার বিচারে দর্শনের অন্তর্গত।

("পণ্ডিতি বনাম প্রচার", "স্বামীজিদের জ্ঞানযোগ", ২৯শে অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—বিদেশকে উপদেশ-দেবার চিহ্ন আপনি বিবেকানন্দ সাহিত্যে আর অভেদানন্দ-সাহিত্যে বেশী পান কি?

সরকার—জবর পরিমাণেই পাই। বিবেকানন্দ'র বকাবকির ফলে পাশ্চাত্য দুনিয়া বেদান্তের দিকে, ভারতের দিকে, ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকতে উৎসাহী হ'য়েছিল। উৎসাহটা গজিয়ে তোলা সহজ ছিল না। এজন্য অনেক কাঠখড়ের দরকার হ'য়েছিল। শত্রু ছিল হরেক রকমের। দুনিয়ায় বেদান্তপ্রচার "মধুর বহিবে বায়, বেয়ে যাব রঙ্গে"—নীতিতে অগ্রসর হয় নি। যাই হোক্, সেই সকল বকাবকির ভেতর বিবেকানন্দ'র দর্শন ঢুঁড়তে হবে। আগেই দু'একবার বলেছি। বকাবকি ছাড়া, শব্দের হরির লুট ছাড়া—দর্শন আর কিছু নয়।

বিবেকানন্দী বক্তৃতাগুলার মুদ্দা হয়তো প্রধানতঃ বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা বা রামকৃষ্ণ। কিন্তু তার ফলে শ্রোতারা হোমিওপ্যাথিক ডোজে ভারতপন্থী হ'তে থাকে। সুতরাং এই সকল বকাবকিতে একমাত্র পরকীয় মতের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা বলবো না। সেইগুলোতে কিছু-কিছু পাই বিবেকানন্দ'র স্বাধীন ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন চিন্তাশক্তি, স্বাধীন পরিভাষা।

লেখক—বেদান্ত-প্রচারের ভেতর আপনি স্বাধীন দর্শন পাচ্ছেন কোথায়?

সরকার—শিকাগো-বক্তৃতার (পৃঃ ১১৯) কথা আগে দুএকবার ব'লেছি। অন্য কথাও আছে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের সূত্রপাত একমাত্র বেদান্তের ভাষ্য, যোগের ব্যাখ্যা আর গীতার তর্জমা দিয়ে সাধিত হয় নি। তার জন্য জরুরি ছিল আধুনিক ভারতীয় রক্তমাংসের মানুষ, আর সেই জ্যান্ত মানুষের সঙ্গে মার্কিণ নরনারীর সজ্ঞান হাতাহাতি। আবশ্যক হ'য়েছিল বিবেকানন্দ'র ব্যক্তিগত কৃতিত্ব,—বিবেকানন্দ'র বর্তমান বাঙালীত্ব, লড়াই-দক্ষ বাঙালীর জীবন-বেদ। এই দস্তুলটুকুই বিবেকানন্দ-দর্শন। দেখতে পাচ্ছিস্,—প্রকারান্তরে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যাগুলাই মার্কিণ মুল্লুকে বিবেকানন্দ-দর্শনের ইজ্জদ্ পেয়েছিল। সেকেলে বেদান্তকে বর্তমান কালের বাঙালীর বাচ্চা বিবেকানন্দ'র ব্যক্তিত্ব দিয়ে গুণ কর্। তাহ'লে পাবি নবীনীকৃত বেদান্ত। সেইটাই বিবেকানন্দী হিন্দুত্ব। ওদেশের পণ্ডিতেরা,—জেমস্, রয়েস ইত্যাদি দার্শনিকগণ বিবেকানন্দী ব্যাখ্যাকে,—নবীনীকৃত বেদান্ত,—নয়া-বাংলার হিন্দুত্বকে একালের অন্যতম দর্শনরূপে গ্রহণ ক'রেছিল। একমাত্র সেকেলে বেদান্ত, যোগ ইত্যাদি সাহিত্য তাঁদের পরীক্ষায় এই ইজ্জদ্ পেত না। একথা বিনা সন্দেহে বলা চলে।

("স্বাধীন দর্শন", ২৮শে অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—অভেদানন্দের বেদান্ত-প্রচারের ভেতর স্বাধীন দর্শন আছে কি?

সরকার—আছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর তাকে বাঁচিয়ে রাখাব জন্য দরকার হয়েছিল আমেরিকায় অভেদানন্দ'র বকাবকি ও লেখালেখি। বছর নয়-দশেক তাঁকে একা বিবেকানন্দ'র ঝুঁকি ঘাড়ে বইতে হ'য়েছিল (১৮৯৭-১৯০৬)। অভেদানন্দ'র মতন ভারত-প্রচারক না পেলে বিবেকানন্দ'র সুরু-করা কাজ মার্কিণমুল্লুকে কিরূপ দাঁড়াতো,—আজ বলা কঠিন। সুতরাং অভেদানন্দ'র বৈদান্তিক বকাবকিগুলাকেও একমাত্র প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির তর্জমা, ভাষ্য বা ব্যাখ্যা ইত্যাদিরূপে বিবৃত করা ঠিক নয়। সেইসবের ভেতব অভেদানন্দ'র ব্যক্তিত্বও দেখ্‌তে পাচ্ছি। একমাত্র পরকীয় মত কপ্‌চিয়ে লোক-মাতানো যায় না আর অনেকদিন ধ'রে লোকজনকে সংঘবদ্ধ রাখাও সম্ভব হয় না।

("ব্যাখ্যাশ্রেণীর দর্শন-সাহিত্য", ২৬শে অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

বিদেশে বেদান্ত-প্রচার

লেখক—বিদেশে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দের হিন্দুত্ব প্রচারকে আপনি খুব-বেশী মূল্য দিচ্ছেন না কি?

সরকার—"খুব বেশী" মূল্য দিচ্ছি। সর্বদাই দিয়ে থাকি। কিন্তু "অতি-বেশী" নয়। বিদেশে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ'র ভারত প্রচারকে আমি যত বেশীই তা'রিফ্ করি না কেন, কখনো তা অতিমাত্রায় তারিফ্ করা হবে না। এই কাজটা এত মহত্ত্বপূর্ণ ও গৌরবজনক।

লেখক—পরিষ্কারভাবে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

সরকার—একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এশিয়ায় ও আফ্রিকায় ইয়োরামেরিকায় খৃষ্টিয়ান পাদ্রীরা লোকজনকে দলে-দলে নতুন ধর্মে ও সংস্কৃতিতে দীক্ষিত করে। একাজটা খুবই বাহাদুরিপূর্ণ। কিন্তু একাজের পশ্চাতে থাকে কোটি-কোটি টাকা আর থাকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যগুলার সামরিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষমতা। জাপানীরা তা হাড়ে হাড়ে বুঝেছে।

লেখক—খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আপনার মত কীরূপ?

সরকার—খৃষ্টধর্ম-প্রচারটা ইয়োরামেরিকানদের পক্ষে সাম্রাজ্যবিস্তারেরই নামান্তর মাত্র। এশিয়ায় আর আফ্রিকায় খৃষ্টিয়ান পাদ্রীরা তাঁদের নিজ-নিজ দেশীয় পররাষ্ট্রবিভাগের কর্মচারী বিশেষ। ধর্মের নামে পাদ্রীরা স্বদেশের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক আধিপত্য বিদেশে বাড়াতে সাহায্য করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদেরকে রাজপ্রতিনিধি, বাণিজ্যিক কন্‌সাল, রাষ্ট্রদূত ইত্যাদি শ্রেণীর কর্মচারী বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত। পাদ্রীদেরকে অনেক স্থলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শক্তির প্রতিনিধি সমঝে' রাখা উচিত। এজন্য জাপান বিদেশী পাদ্রীদেরকে ঠুঁটো ক'রে দিয়েছে।

লেখক—খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন কেন?

সরকার—দেখ্‌তে পাচ্ছিস্, আমেরিকায় (আর কিছু-কিছু ইয়োরোপে) বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ ভারতপ্রচারের কাজ খানিকটা নিরেট বনিয়াদের উপর দাঁড় করাতে পেরেছেন। অথচ এঁদের পশ্চাতে না আছে ভারতীয় নরনারীর সমর-শক্তি, না আছে রাষ্ট্রশক্তি। এই জন্য খৃষ্টিয়ান পাদ্রীদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-পন্থীদের কৃতিত্ব সর্বদা তুলনা ক'রে দেখা কর্তব্য।

লেখক—রামকৃষ্ণ-পন্থীদের কৃতিত্ব এই তুলনায় কিরূপ দাঁড়াবে?

সরকার—এই কৃতিত্বটা কি যে-সে কৃতিত্ব? কম্-সে-কম্ খৃষ্ট-প্রচারকদের সর্বোচ্চশ্রেণীর লোকজনের ভেতর বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দকে ঠাঁই দিতে হবে। দুনিয়ার ইতিহাস এই ঠাঁই দিতে বাধ্য। ভেবে দ্যাখ্, তাঁরা এক পয়সাও ভারত থেকে পান নি—সেই সম্ভাবনাই ছিল না। তা ছাড়া ভারতীয় রাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যের সামরিক ক্ষমতা ছিল না বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ'র পশ্চাতে। এঁরা মার্কিণ টাকায় মার্কিণ মুল্লুকে মার্কিণ নরনারীর জন্য খৃষ্টিয়ানি আর ইহুদিয়ানার ভেতর ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। এঁদের কৃতিত্ব উনিশ-শ' বছরের যে-কোনো খৃষ্টপ্রচারকদের চেয়েও অনেকগুণ বেশী। এই কথাটা সর্বদা মনে রাখ্‌বি।

দার্শনিক হিসাবে বিবেকানন্দ ও অভেদানন্দ উঁচুদরের লোক। আমাদের একেলে-সেকেল টুলো পণ্ডিতেরা এই দিকে গবেষণা সুরু করুন। তাতে পণ্ডিত মশায়দের জাত্ যাবে না। কেউ-কেউ হয়ত বা জাতে উঠতে পার্‌বেন।

ভারতে দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা

লেখক—বিদেশে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ'র দর্শন-চর্চা সম্বন্ধে বল্‌লেন। ভারতবর্ষে তাঁদের দার্শনিকতার পরিচয় কোথায়?

সরকার—বিবেকানন্দ ভারতের নরনারীকে তাতিয়ে তুল্‌লেন কিসের জোরে? বেদান্ত আর যোগ তর্জমা ক'রে? কোনোমতেই না। বেদান্ত-জান্তা আর যোগ-জান্তা লোক ভারতে অসংখ্য ছিল, এখনো আছে। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-সংস্কৃতির সার বা ব্যাখ্যার সাহায্যে ভারতের নরনারীকে তাতানো সম্ভব হয় নি। তা সম্ভব হ'য়েছিল বিবেকানন্দ'র হাতে দিগ্বিজয়ের চাপ্‌রাস্ ছিল ব'লে।

লেখক—দিগ্বিজয়ের কথা কি বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে ব'লেছিলেন?

সরকার—এক-আধবার ব'লেছিলেন মনে পড়ছে। কিন্তু তিনি বলুন বা না বলুন, তাঁর কাজটার প্রভাব কী? সত্য কথা,—"দিগ্বিজয়" শব্দটা বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বেশী ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সন্দেহ। "রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য" পারিভাষিকও বিবেকানন্দ'র তৈরী নয়। কিন্তু বিবেকানন্দ'র কাজটা ছিল দিগ্বিজয়, আর তার ফলটা হ'লো রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য।

বিবেকানন্দ বেদান্ত দিয়ে দিগ্বিজয়ী কি হিন্দুত্ব দিয়ে দিগ্বিজয়ী? ধর্ম দিয়ে দিগ্বিজয়ী না রামকৃষ্ণ দিয়ে দিগ্বিজয়ী? যুবক ভারত এ বিশ্লেষণে সময় দেয়নি। যুবক ভারত দেখ্‌লো—বিবেকানন্দ লোকটা দিগ্বিজয়ী। কাজেই ভারতের নরনারী দিগ্বিজয়ের নেশায় মাতোআরা হ'লো। বর্তমান যুগের ভারতবাসীর কাছে দিগ্বিজয় একদম নয়া চিজ্। বিবেকানন্দ'র মারফৎ দিগ্বিজয় শব্দটা না হোক্,—বস্তুটা অন্ততঃ একটা নতুন আকাঙ্ক্ষার ভেতর দাঁড়িয়ে গেল।

লেখক—দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া ভারতবাসী বিবেকানন্দ'র কাছ থেকে আর কোন্ দর্শন পেয়েছে?

সরকার—ভারতে দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা এসেছে বিদেশে প্রাচীন ধর্ম, দর্শন ইত্যাদির ব্যাখ্যা বিষয়ক কাজের প্রভাবে। অধিকন্তু ভারতীয় জনগণের জন্য বিবেকানন্দ'র আলাদা দর্শনও আছে। তা ঢুঁড়তে হবে "কলম্বো হ'তে আলমোড়া পর্যন্ত" ("ভারতে বিবেকানন্দ")

বক্তৃতাবলীর ভেতর। "বর্তমান ভারত", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" ইত্যাদি প্রবন্ধগুলাও যুবক ভারতের পক্ষে বিবেকানন্দ-দর্শন। এই বক্তৃতাসমূহ যুবক ভারতের উপর বিবেকানন্দ'র চাবুক। এই চাবুকটাই দর্শন।

লেখক—ভারতবাসীর পক্ষে অভেদানন্দ-দর্শন পাবো কোথায়?

সরকার—তাঁর "ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড হার পীপ্‌ল" (ভারত ও ভারতবাসী, ১৯০৬ নিউইয়র্ক) নামক বক্তৃতা-গ্রন্থে। তা ছাড়া "লেক্‌চারস্‌ অ্যাণ্ড অ্যাড্রেসেস্‌" নামক ১৯০৬ সনে ভারতের নানাস্থানে প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহে। তখন চল্‌ছিল গৌরবময় বংগবিপ্লব।

("অভেদানন্দ'র রচনাবলী", ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)।

দিগ্বিজয়ী কাকে বলে?

লেখক—অভেদানন্দ আর তাঁর পরবর্তী রামকৃষ্ণ-প্রচারকদের আপনি "দিগ্বিজয়ী" বল্‌ছেন কোন্‌ অর্থে?

সরকার—যোগ, বেদান্ত, গীতা সম্বন্ধে অভেদানন্দ'র মার্কিণ বক্তৃতাগুলা প্রাচীন দর্শনের ব্যাখ্যামাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এগুলা পড়্‌লে একটা বড় কথা মনে হয়। ফ্রান্সে, জার্মাণিতে, বিলাতে আর আমেরিকায় ফরাসী, জার্মাণ, ইংরেজ বা মার্কিণ পুরুত ঠাকুরেরা ফি রবিবার গির্জায় খৃষ্টীয় ধর্ম-বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত। তাঁদের অনেকেই খুব পণ্ডিত লোক। বক্তৃতা শুন্‌লে হ'তে হয়। সেই সব বকাবকির মাপকাঠিতে অভেদানন্দ'র বক্তৃতাগুলা বেশ উঁচুদরের মালুম হবে। বস্তুতঃ মার্কিণ নরনারী অভেদানন্দকে তাঁদের যে-কোনো ধর্মবক্তার সমান ভাব্‌তো। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অভেদানন্দকে অনেক মার্কিণ ধর্মপ্রচারকের চেয়ে বড় বিবেচনা করা হ'তো। জেম্‌স্‌ ইত্যাদি সেকালের মার্কিণ দার্শনিকেরা বিবেকানন্দ'র মতন অভেদানন্দকেও বেশ সম্মানযোগ্য জ্ঞানবীররূপেই সম্বর্ধনা ক'রেছেন। এও এক-প্রকার পরীক্ষায় পাশ।

বুঝ্‌তে হবে যে, প্রাচ্য আর পশ্চিমা মুড়োর টক্কর চল্‌তো মার্কিণ ময়দানে অহরহ। আর সেই লড়াইয়ে বাদামী আদ্‌মি সাদাকে কুপোকযা ক'র্‌তো সমানে-সমানে। সাদায়-বাদামীতে এই যে পাঞ্জাকষাকষি তার মানে জাতে-জাতে সাম্য-প্রতিষ্ঠা। বাঙালীর বাচ্চার পক্ষে, ভারত-সন্তানের পক্ষে এ একটা দিগ্বিজয়।

লেখক—কয়েকটা বক্তৃতায় মার্কিণ প্রশংসা পাওয়ায় অভেদানন্দকে আপনি দিগ্বিজয়ী ভাব্‌ছেন?

সরকার—এক হিসাবে তাই। তবে বিষয়টা তলিয়ে-মজিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌। বাঙালীর বাচ্চা নিত্য-নৈমিত্তিকরূপে অভেদানন্দ'র মূর্তিতে আন্তর্জাতিক পরীক্ষার বস্তু ছিল। একদিন নয়, এক বৎসর নয়,—নয় বৎসরকার—মার্কিণ যাচাইয়ের ভেতর জীবন চালাতে হয়েছে অভেদানন্দকে। সেই পরীক্ষায় পাশ হওয়া আর বংগ-জননীর জন্য প্রথম-শ্রেণীর পয়লাদের চাপরাস্‌ দখল ক'রে আনা অভেদানন্দ'র কৃতিত্ব। বুঝলি? একেই বলে সত্যেন দত্ত'র ভাষায়—

> "কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ শাতন করি
> বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে যশের মুকুট পারি।"

লেখক—এই ধরণের আন্তর্জাতিক পরীক্ষার সুযোগ কি দেশের ভেতর নেই?

সরকার—একপ্রকার নেই বল্‌লেই চলে। ভারতবর্ষে যে-কোনো সাদা আদ্‌মি বিনা বাক্যব্যয়ে বাদামীদের চেয়ে বড় বিবেচিত হয় সমানে-সমানে যাচাইয়ের সুযোগ এদেশে বেশী ঘটে না। মার্কিণ মুল্লুকের হাটে-ঘাটে, ক্লাবে-পাঠশালায় গির্জায়-সিনাগগে অভেদানন্দ সাদা নরনারীকে কানে ধ'রে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ঃ—"আগে দেখেছিস্ আমার বড়্-দা বিবেকানন্দকে। আজ দ্যাখ্ অভেদানন্দকে। আর মনে রাখিস্ যে, আমার পেছনে আছে আমাদেরই সমান হাজার হাজার। তারা সকলেই তাদের নিজ-নিজ কোঠে তোদের যে-কোনো লোককে ঢিট্ ক'রে দিতে পারে।"

আসল আন্তর্জাতিক যাচাইয়ের সুযোগ পাওয়া ভারত-সন্তানের পক্ষে সহজ নয়। অভেদানন্দ পেয়েছিলেন আর তার সদব্যবহারও ক'রে গেছেন।

("ঢিট্ করার অর্থ কী?" নবেম্বর "বোস্-ইন্‌স্‌টিটিউট", ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্য

লেখক—রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের দর্শন কিছু আছে? ("বৃহত্তর ভারতের কর্মিবৃন্দ", নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—নিশ্চয় আছে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অন্যতম অংশ রামকৃষ্ণ মিশন। একালে রামকৃষ্ণ মিশনের পঁচিশ-ত্রিশজন প্রতিনিধি ইয়োরামেরিকার নানাদেশে মোতায়েন আছেন। তাঁদের সকলেরই জীবন ও কাজকর্ম চোপর দিনরাত সাদা চামড়াওয়ালা পুরুষনারীর পক্ষে বিপুল শিক্ষাকেন্দ্র হ'য়ে রয়েছে। পশ্চিমারা এঁদেরকে দেখে নিজেদের দেশে ব'সেই এশিয়া সম্বন্ধে প্রতিমুহূর্তে শিক্ষা পাচ্ছে। স্বামীজিদের দলের বহির্ভূত বহুসংখ্যক ভারতসন্তানও রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের কর্মকর্তা ও সেবক বিশেষ। সেই সকল কর্মদক্ষ প্রবাসী ভারত-সন্তানদের জীবন দেখেও পশ্চিমারা নিরেট শিক্ষা পাচ্ছে।

লেখক—কী শিক্ষা পাচ্ছে?

সরকার—দেখ্‌ছে যে, বাঙালীর বাচ্চা আর অন্যান্য ভারতসন্তান সাদা লোকগুলাকে দিনের পর দিন ঢিট্ ক'রে চলেছে। ধর্মের আসরে, দর্শনের আসরে, সংস্কৃতির আসরে ভারতীয় দিগ্বিজয় তো চ'লেছেই। সংগে-সংগে দিগ্বিজয় চ'লছে ব্যক্তিত্বের আসরে, কর্মদক্ষতার আসরে, কর্তব্যজ্ঞানের আসরে। এই ধরণের দিগ্বিজয়কে আমি অনেক সময়ই "এশিয়ার মন্‌রো-নীতি" ব'লেছি।

লেখক—"এশিয়ার মন্‌রো-নীতি" কাকে বলে?

সরকার—মন্‌রো ছিলেন মার্কিণ রিপাব্লিকের প্রেসিডেন্ট। ১৮২৩ সনে তিনি ইয়োরোপের নিকট এক ফতোআ জারি করেন। তাতে বলা ছিল ঃ—"ইয়োরোপ, খবরদার! আমেরিকা-ভূখণ্ডে হাত লাগিও না, বাবা। আমেরিকা ইয়োরোপ হ'তে স্বাধীন। তুমি থাকো তোমার কোঠে। আমেরিকা থাকুক আমেরিকার কোঠে।"

লেখক—এ ত রাষ্ট্রনৈতিক কারবার দেখ্‌ছি। আপনার মন্‌রো-নীতি কি রাষ্ট্রনৈতিক?

সরকার—আমি রাষ্ট্রনীতির ধার ধারি না। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে কোনো রাষ্ট্রিক আন্দোলনে ঢুকতে পার্‌লে না। আমার মন্‌রো-নীতি সাংস্কৃতিক।

মন্‌রোর এই নীতিকে আমি অনেকদিন ধ'রে এশিয়া সম্বন্ধে কায়েম ক'রে রেখেছি।

অবশ্য মাত্র লেখালেখিতে। এটা আমার আত্মিক ও সাংস্কৃতিক ফতোআ। এতে রাষ্ট্রনীতি নেই। এর এক অর্থ,—এশিয়া হ'তে ইয়োরামেরিকার প্রভাব-তাড়ানো। আর এক অর্থ,—ইয়োরামেরিকার সংগে এশিয়ার সাম্য কায়েম করা।

লেখক—এর ভেতর রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যকে ঢুকালেন কী ক'রে?

সরকার—মনে রাখিস,—একালের গোটা বৃহত্তর ভারতকে আমি রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য বলি। (পৃঃ ৪৭—৪৯, ১৩৯) রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তর ভারতের আসল আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এখানে। একেই বলি নবীন বেদান্ত। এর নাম নয়া স্বরাজ্যসিদ্ধি। বাদামী-সাদায় সমতা-প্রতিষ্ঠা এই নবীনীকৃত উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতার আসল ভিত্তি ও লক্ষ্য। এশিয়ার সংগে ইয়োরামেরিকার সমানে-সমানে লেনদেন সুরু হ'য়েছে বিবেকানন্দ'র দৌলতে (১৮৯৩)। বিবেকানন্দ আমার এই এশিয়ান মন্‌রো-নীতির প্রবর্তক। সেই সমানে-সমানে লেনদেনের কাজ বেড়ে চ'লেছে বহুসংখ্যক অ-সন্ন্যাসী, গৃহস্থ ভারত-সন্তানের কৃতিত্বে। সেই কাজেই ব্রতবদ্ধ রয়েছে আবার আজকালকার মার্কিণ বেদান্ত-সমিতি আর রামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠানগুলা। স্বামীজিরা রাষ্ট্রনীতি এড়িয়ে চলেন বলাই বাহুল্য।

লেখক—দুনিয়ায় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্য কী?

সরকার—রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের কর্মীরা সকলেই রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামীজি নন। বাইরের লোক আছে বহুসংখ্যক। এই সাম্রাজ্যের প্রত্যেক কর্মচারী, প্রচারক বা সেবকের অন্তরে-অন্তরে একটা প্রবল দর্শন কাজ ক'রে থাকে। এই দর্শনটা অনেক সময় হয়ত অজ্ঞাত সারেই কাজ ক'র্‌ছে। প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে সমতাস্থাপন করা সকলেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। এশিয়া হ'তে ইয়োরামেরিকার আধিপত্য তাড়িয়ে দেওয়া ঘ'ট্‌ছে এঁদের প্রভাবে সর্বদাই অল্প-বিস্তর। আর ইয়োরামেরিকায় এশিয়ার প্রভাব বাড়ানো ত যে-কোনো লোকই দেখ্‌তে পাচ্ছে। ("রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য", ২৩শে আগষ্ট, ১৯৪২, "বৃহত্তর ভারতের কর্মিবৃন্দ", ৭ই নবেম্বর, ১৯৪২, পরিশিষ্ট "ধর্মের আন্দোলন ও আর্থিক উন্নতি" দ্রষ্টব্য)।

স্বামীজিদের সঙ্গে পণ্ডিতদের যোগাযোগ

লেখক—কিছু না মনে করেন তা হ'লে আপনাকে আর একটা পুরাণা কথা তুলে কিছু বিরক্ত কর্‌ছি। মাঝে-মাঝে দু'একটা কথা পরিষ্কার ঠেক্‌ছে না। আপনি কি স্বামীজিদের সংগে পণ্ডিতদের মেলামেশা চান না?

সরকার—তাতো আমি কখনো বলিনি। সর্বদা ব'লেছি যে, স্বামীজিদের পেশা পণ্ডিতি করা নয়—তাঁদের পেশা প্রচার। পণ্ডিতি যাঁরা করেন তাঁদের পেশা পাণ্ডিত্য,—প্রচার করা তাঁদের পেশা নয়। কিন্তু দুই শ্রেণীর লোকের ভেতর আনাগোনা, মেলামেশা, দহরম-মহরম্ হামেশাই আবশ্যক।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, স্বামীজিদের সংগে পণ্ডিতদের যোগাযোগ বেশ নিষ্ঠ র'য়েছে?

সরকার—স্বামীজিদের তরফ্ থেঁকে যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠ বটে। এজন্য তাঁরা আমার পাঁতির উপর নির্ভর করেন নি। তাঁরা বেশ ওস্তাদির সহিত মেলামেশার কাজ চালাতে অভ্যস্ত। ইয়োরামেরিকার নানাকেন্দ্রে দেখেছি তাঁরা স্থানীয় কবি, গায়ক, চিত্রশিল্পী, ধর্মবক্তা,

ব্যবসায়ী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, অর্থশাস্ত্রী, সংবাদপত্রসেবী ইত্যাদি সকল শ্রেণীর লিখিয়ে-পড়িয়ে বা মস্তিষ্কজীবী লোকের সংগে যোগাযোগ কায়েম ক'রেছেন। বাংলাদেশে আর ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রেও এই দস্তুর পুরামাত্রায় বজায় আছে।

স্বামীজিরা ম'রচে-পড়া লোক নন। সর্বদাই নতুন-কিছুর সংগে ছোঁয়াছুঁয়ি এঁরা রক্ষা ক'রে চলেন। মগজটা এঁদের বস্তুনিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠ। একতরফা, একবগ্‌গা, একচোখো মেজাজ নিয়ে এঁরা লোকজনের সংগে চলাফেরা করেন না। এঁদের প্রায় সকলেই চৌকোস্ লোক—গোলোকার—সর্বভুক্। কোনো-কিছুতেই এঁদের আপত্তি নেই।

পণ্ডিতকে পণ্ডিত, অপণ্ডিতকে অপণ্ডিত,—সবাই এঁদের মহোচ্ছবে হাজির থাকে। শিক্ষিত, সিকি-শিক্ষিত, অশিক্ষিত কেউই বাদ পড়ে না। ধনী ও নির্ধন দুইয়েরই টিকি-দাড়ি দেখা যায়। উকিল, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, বণিক, সকল পেশার প্রতিনিধিকেই এঁদের বাথানে দেখ্‌তে পাই। তা ছাড়া কেরাণী, ইস্কুল-মাষ্টার ইত্যাদির ঠাঁইতো আছেই।

লেখক—বেদান্তভক্ত ছাড়া আর কোনো লোকের সংগে স্বামীজিরা লেনদেন চালাতে অভ্যস্ত কি?

সরকার—তা-ও আমায় বল্‌তে হবে? স্বামীজিদের একটা ইংরেজি মাসিক আছে। নাম তার "প্রবুদ্ধ ভারত"। বাংলা মাসিকের নাম "উদ্বোধন"। এই দুই পত্রিকায় লেখে কারা জানিস্? যত রাজ্যের বারভূত। কারো সংগে কারো মিল নেই। এই দুই চিড়িয়াখানায় দেখি হরেক-রকমের চিন্তা, হরেক-রকমের ধর্ম, হরেকরকমের দর্শন। সবই চ'লেছে এক সংগে। এই জন্যই অনেকবার মনে হয়েছে যে,—স্বামীজিদের মগজ বড় শীগ্‌গির প'চে যাবে না, বহুকাল তাজা থাক্‌তে বাধ্য।

লেখক—এই ত গেল না হয় পত্রিকা চালাবার কায়দা। কিন্তু সভা-সমিতিতে রামকৃষ্ণ মিশন কি বেদান্ত-ভক্ত ছাড়া আর কাউকে চান? স্বামীজিরা কতকগুলা বাঁধা মতের লোক নন কি?

সরকার—বল্‌ছিস্ কী রে? এঁদের বারোয়ারীতলায় ঢাক পেটায় অর্থাৎ গলাবাজি করে কারা জানিস্? রামকৃষ্ণ-তিথি আর বিবেকানন্দ তিথি দু'টার কথা বল্‌ছি। তা ছাড়া বছরকয়েক হ'লো একটা সংস্কৃতি পরিষৎ কায়েম হয়েছে। নাম তার "রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অব্ কালচার"। অন্যান্য অনেক-কিছুর সংগে গলাবাজির ব্যবস্থা করা এই পরিষদের কারবার। নিত্যস্বরূপানন্দ'র কাছে খবর নে গিয়ে। ১৯৪০-৪১ সনের কার্য-বিবরণী ছাপার হরপে পাবি।

মুসলমান, খৃষ্টিয়ান, ইহুদি, কন্‌ফিউসিয়ান, শিন্তো,—এইসব রকমারি ধর্মের লোক নিজ-নিজ অথবা অন্যকোনো রকমের ঢাক পেটাতে নিয়ন্ত্রিত হয়। বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, জৈন, পার্সী,—কেহ বাদ যায় না। আর মামুলী হিন্দু-ব্রাহ্ম-আর্য তো আছেই। তারপর সাদা আর কালো, হল্‌দে আর বাদামী,—যত রকমের রংওয়ালা মেয়ে-পুরুষ থাক্‌তে পারে, সকলের গলার আওয়াজ এঁরা শুন্‌তে অভ্যস্ত। আর দুনিয়াকে শুন্‌বার সুযোগ দিতেও অভ্যস্ত। মারাঠা, গুজরাটী, মান্দ্রাজী, বার্মান. পাঞ্জাবী, বিহারী ইত্যাদি গণ্ডা-গণ্ডা ভারতীয় নরনারী এঁদের বারোয়ারী-তলায় যার যা খুসী ব'কে যেতে অধিকারী। তবে কেউ কোনো পরমতের নিন্দা করবার আস্কারা পায় না।

লেখক—বেদান্ত-ভক্ত স্বামীজিরা এত সব বিভিন্ন মতের লোকজনের সংগে সহযোগিতা কর্‌তে উৎসাহী হন কিসের জোরে?

সরকার—একেই বলে বিবেকানন্দী বেদান্ত। বুঝ্‌লি? এটা মান্ধাতার আমলের বেদান্ত

নয়, নবীনীকৃত বেদান্ত। এ হচ্ছে একটা নয়া দর্শন। স্বামীজিদের জ্ঞানযোগ এক নিরেট বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিছুই এঁদের বহুত্বনিষ্ঠায় বয়কট হয় না। এঁদের আখড়ায় অদ্বৈতের সরবৎ তৈরি হয় কী দিয়ে জানিস্? হরেক-রকম মত-পথের চিন্তা ঘ'ষে আর বহু বৈচিত্র্যময় দর্শন গুলে'। এঁরা অদ্বৈতবাদী বটে কিন্তু কোনো-কিছুর সংগে অসহযোগ এঁদের ধর্ম বা দর্শন নয়। এমনকি আমার মতন পাপিষ্ঠ আর মুখ্খুকেও এঁরা অস্পৃশ্য বিবেচনা করেন না। আর কি চাস্?

("স্বামীজিদের জ্ঞানযোগ", ২৯শে অক্টোবর ১৯৪২)

ইস্কুল-কলেজে চাই স্বামীজিদের আনাগোনা

লেখক—যাঁরা পণ্ডিতি করেন, তাঁরা স্বামীজিদেরকে কি চোখে দেখেন?

সরকার—ভায়া, পণ্ডিতেরা বড়লোক, পয়সাওয়ালা লোক, পদস্থ লোক। পণ্ডিতের দলে আমার ঠাঁই নেই। আমি গরীব মানুষ—বড় ঘরের খবর রাখি না। তাঁদের মেজাজে আমার পক্ষে প্রবেশ করা কঠিন। লোকেরা আমাকে মুখ্খু বলে।

তবে বাইরে থেকে রগড় দেখা যায় মন্দ নয়।

১৮৯৩ সনে বিবেকানন্দ'র দিগ্বিজয় সুরু। আগামী বৎসর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হবে। কিন্তু ভারতীয় নয়া-পুরাণা টুলো-দাদারা আজও স্বামীজিদেরকে পুছ্তে শিখেছেন কি না ঠাওরাতে পার্ছি না।

এই বিপুল দিগ্বিজয়ের মাহাত্ম্য আজ পর্যন্ত দেশের ইস্কুল-কলেজ-পরিষদ্-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ বুঝে উঠ্তে পেরেছে কিনা সন্দেহ। বর্তমান ভারতকে স্বামীজিরা চব্বিশ ঘণ্টা দেশ-বিদেশে জগদ্বরেণ্য ক'রে তুল্ছেন। অথচ তাঁদের মগজ, কর্মদক্ষতা, স্বদেশনিষ্ঠা আর স্বাধীনতা-বোধ যথার্থরূপে সম্বর্ধনা করার মতন ব্যবস্থা আজও ভারতীয় পণ্ডিতমহলে নেই। বড়ই মজার কথা।

লেখক—স্বামীজিদের যথার্থ সম্বর্ধনা পণ্ডিতমহলে নেই কেন?

সরকার—বলা কঠিন। দু'একটা সোজা কথাও আছে। হয়তো প্রথমতঃ, স্বামীজিদের কাজ সম্বন্ধে পণ্ডিত-মশায়দের অভিজ্ঞতার অভাব। তা ছাড়া হয়তো পণ্ডিতবর্গের স্বদেশনিষ্ঠার অভাব। কে জানে কার মেজাজ কিরূপ?

বিদেশ সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বল্ছি। আজকালকার টুলো-ভায়ারা কেউ-কেউ দেশ-বিদেশে গিয়ে নানামহলে একটু-আধ্টু দুধ-কলা ভোগ কর্তে পান। ভারতীয় বণিক, রাষ্ট্রিক, শিল্পী, মজুর-নায়ক ইত্যাদি অন্যান্য পেশায় লোকেরাও বিদেশে আজকাল কিঞ্চিৎ-কিছু সম্বর্দ্ধনা পেয়ে থাকেন। তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরাই প্রথম দেশ-বিদেশে দুধ-কলা পাচ্ছেন। তাঁদের আগে ইয়োরামেরিকায় বা জাপানে যেন কোনো ভারতসন্তান ইজ্জদ্ পায় নি।

আফ্শোষের কথা। এরা নিজের ছায়ার বাইরে কোনো কিছু দেখ্তে পান না। সন-তারিখ সম্বন্ধে এঁরা তো চরম নির্বিকার বটেই। কি রাষ্ট্রিক, কি টুলো পণ্ডিত, কি চিত্রশিল্পী, কি মজুর-নায়ক,—সকলেরই ব্যাধি একপ্রকার।

প্রত্যেকেই নিজ-নিজ কোঠে নিজেকে "দুনিয়ার এক", সর্বশ্রেষ্ঠ ও "সকলের প্রথম" ভাব্তে অভ্যস্ত। আর বিদেশে নাম-ডাক সম্বন্ধে প্রত্যেকেই নিজেকে অন্যান্য সকল কোঠের

সকল কৃতী ভারত-সন্তানের চেয়ে সেরা যশস্বী সমঝে" থাকেন।

স্বামীজিদের দৌলতে ইয়োরামেরিকায় ভারতীয় নরনারীর জন্য দুধ-কলার ব্যবস্থা অনেকখানি সম্ভব হয়েছে। আমাদেব ইতিহাস পণ্ডিতেরা একবার সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা সুরু করুন। বর্তমান যুগের বৃহত্তর ভারতের একটা চিত্তাকর্ষক অধ্যায় বেরিয়ে পড়বে।

স্বামীজিদের সম্বন্ধে ইস্কুল-কলেজ-পরিষৎ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম-কর্তাদের পক্ষে নির্বিকার থাকা উচিত নয়। বড়ই লজ্জার কথা। আর কী বল্‌বো?

লেখক—আপনি পণ্ডিতদের সংগে স্বামীজিদের মেলামেশার জন্য কী কর্‌তে বলেন?

সরকার—অতি সোজা কথা। ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে স্বামীজিদেবকে ফি বৎসর কম্‌সেকম্ একবাব ডেকে নিয়ে আসা বাঞ্ছনীয়। তাঁদের বাণী এই সকল টোল আর টুলো পণ্ডিত ও টুলো ছাত্রছাত্রীদের ভেতর ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা থাকা উচিত। তাতে নয়া-পুরাণা টুলোদের লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

লেখক—স্বামীজিদের সংগে যোগাযোগ হ'লে পণ্ডিতমহলে লাভ কিরূপ?

সরকার—স্বামীজিরা চোপব দিনরাত দেশ-বিদেশে লোকজনের সংগে খোলামাঠে সহযোগ গ'ড়ে উঠ্‌ছেন। অনেকেই জবরদস্ত্ কর্মবীর, খাঁটি ভক্তিযোগী আর পাকা জ্ঞানযোগী। তাঁদের মাথায় নিত্যি-নতুন তাজা-তাজা ঘিলু এসে জম্‌ছে। সেই ঘিলুতে আছে পাড়াগেঁয়ে ভিটামিন, শহুরে ভিটামিন, শক্তিধর নরনারীর ভিটামিন।

এই ঘি কিঞ্চিৎ-কিছু পেলে মাষ্টারদের, গবেষকদের, গ্রন্থকারদের আর ছাত্রছাত্রীদের জীবনে নতুন-নতুন ধাক্কা এসে পৌঁছবে। খানিক্‌টা খোলা-হাওয়া প্রবেশ কর্‌বে। দেশ-বিদেশের রকমারি কথা ও চিন্তাপ্রণালী তাদের ব্যক্তিত্বকে ছুঁতে পার্‌বে। মামুলি জনসাধারণেব জীবন-কথাও কিছু-কিছু পণ্ডিতি-আবহাওয়ায় আত্মপ্রকাশ কর্‌বে। মোটের উপর,—দেশ ও দুনিয়ার নয়া-নয়া ধরণ-ধারণ টুলো-ভায়াদের দখলে আস্‌তে পারবে। তাতে এঁদের মগজে নতুন-নতুন চিন্তা কিল্‌বিল্ কর্‌তে সুরু করবে।

ফলতঃ, মাষ্টার-মশায়রা বক্তৃতার জন্যও নতুন-নতুন মশ্‌লা পাবেন আর বই লিখ্‌বার মতলবেও নতুন-নতুন ইংগিত পাবেন; আর ১৪-২৪ বৎসরের ছাত্রছাত্রীদের জুট্‌বে স্বদেশসেবার নয়া-নয়া হদিশ এবং কর্মক্ষেত্রের নয়া-নয়া দুনিয়া।

পয়সা-পদ-পদবীর প্রভাব

৬ই নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—গবেষণার বহির্ভূত একটা প্রশ্ন অনেক দিন হ'তে মনে এসেছে। জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস হচ্ছে না; জবাব দেবেন কি?

সরকার—এত গৌরচন্দ্রিকা কেন? ব'লেই ফ্যাল্ না শুনি।

লেখক—আমাদের দেশে টাকা-পয়সা, চাকরি, পদ, উপাধি, পদবী, খেতাব এইসবের প্রভাব খুব বেশী নয় কি? এইসব বাহিরের চটক দিতেয় লোকজনের উৎকর্ষ, গুণ, কৃতিত্ব, ক্ষমতা, যোগ্যতা ইত্যাদি বিচার করা হয় না কি? এটা কি একটা ব্যাধি নয়?

সরকার—তাতে ক্ষেপে যাবার কি আছে বে? একে কুনীতি বা ব্যাধি বল্‌বার কোনো কারণ নেই। এসব অতি স্বাভাবিক কাণ্ড। দুনিযার সকল দেশেই লোকের ক্যর্দানি জরিপ

করা হয় তার বাইরের চটক দেখে'। এই সর্বজনিক ও সনাতন রেওয়াজটা ভারতে আপেক্ষিক হিসাবে বেশী কিনা বলা কঠিন।

লেখক—এই দস্তুরটা এত স্বাভাবিক ও সনাতন হবার কারণ কী?

সরকার—এই রে! তুই দেখ্‌ছি শেষ পর্যন্ত আমাকে নীতিকথা বকিয়ে ছাড়্‌বি? অথবা আমাকে একদম চরম আধ্যাত্মিকতার কোঠে নিয়ে ঠেকাবি? পরমহংসদেবের বয়েৎ হ'চ্ছে,—কাম-কাঞ্চন-কীর্তিবর্জন। কিন্তু বুঝেছিস্—ওসব রামা-শ্যামা-আবদুল-ইস্‌মাইলের জন্য নয়। ওসব কার জন্য তাও বল্‌তে পারি না রে ভাই। মামুলি লোকজনের জন্য চাই প্রায় উল্টা পাঁতি। অর্থাৎ মাত্রা-বিশেষে কাম-কাঞ্চন-কীর্তির ব্যবস্থা। পয়সা-পদ-পদবী ছাড়া সংসারের লোক কিছু বুঝে-সুঝে না—এশিয়ায়ও নয়,—ইয়োরামেরিকায়ও নয়। যে-কয়দিন তোর পয়সা সে-কয়দিন তুই গুণী। দুনিয়া বড়ই নির্দয়। বুঝ্‌লি? বাণীটা কিছু অত্যুক্তি ক'রে ঝাড়া গেল।

লেখক—পৃথিবীর কোথাও লোকেরা কি আসল গুণ দেখ্‌তে বা সম্মান কর্‌তে চায় না?

সরকার—চায়ও, আবার চায়ও না। সংসার বিচিত্র। এ এক জটিল চিড়িয়াখানা। বেদান্তের অদ্বৈত দিয়ে এ চিজ্‌ চুম্‌ড়ে' নেওয়া যাবে না। হরেক-রকম মতিগতি র'য়েছে পৃথিবীতে। আর প্রত্যেক লোকই নানা অবস্থায় নানা মতিগতির জানোআর। চেনা ভার সব কয়টা লোককেই।

লেখক—তা হ'লে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে খাঁটি কষ্টিপাথর কি একদম পাওয়া যাবে না?

সরকার—কেন পাওয়া যাবে না? আসল কষ্টিপাথর জুট্‌বে একদিন না একদিন। কবে জানিস্? লোকটা ম'রে গেলে পর। বেঁচে থাক্‌তে-থাক্‌তে কোনো মিঞা নিজের আসল যাচাই দেখে যেতে পায় না। যতদিন বেঁচে র'য়েছিস্ ততদিন লোকে দেখ্‌বে তোর রোজগার কত।

লেখক—আপনি বল্‌ছেন কী?

সরকার—বল্‌ছি খাঁটি বেদান্ত। রোজগার দিয়ে তোর কবিতার দর কষা হবে। বুঝ্‌লি?—যদি তুই কবি হস্। মনে কর্,—তুই চিত্রশিল্পী। কোনো সমজদার তোর হাতের ছবিগুলা ভাল বল্‌বে কবে জানিস্? যখন দেখ্‌বে তুই বেশ মোটর হাঁকিয়ে চ'লেছিস্। আর যখন দেখ্‌বে তোর বাড়ীটা নিজের সম্পত্তি। অধিকন্তু যখন হপ্তায় কম্‌সে-কম্ একদিন ক'রে তুই চা-যোগের মজলিস্ বসাচ্ছিস্। তার আগে নয়।

ধর্,—তুই রসায়ন বা ভূতত্ত্ব বা অন্য কোনো বিদ্যার বেপারী। তাহ'লে তোর বৈজ্ঞানিক গবেষণাগুলার ইজ্জদ হবে কিসের জোরে জানিস্? গবেষণা-ঠবেষণার জোরে নয়। যদি তোর মাইনে হয় (ভারতীয় অবস্থা মাফিক্) কম্‌সে-কম হাজার দেড়েক বা দুই টঙ্কা আর তোর ঠিক নিচের গবেষকের মাইনে থাকে মাত্র শ' দুই বা আড়াই। তোতে আর তোর দ্বিতীয়তে ফারাক থাকা চাই বিপুল। পদটা এমন হওয়া চাই যে, তোর দিকে তাকাতেই ভয় পাবে তোর নিম্নপদস্থ গবেষক, অধ্যাপক, কর্মচারী। কতকগুলা লোককে চাক্‌রি দেবার ক্ষমতা থাকাও আবশ্যক। সঙ্গে-সঙ্গে সাদা চামড়াওয়ালা লোকজনের আফিসে তোর যাওয়া-আসার ব্যবস্থা থাকা চাই। লোককে যেন বুঝাতে পারিস্ যে, উপরওয়ালাদের সঙ্গে,—বিশেষতঃ সাদা উপরওয়ালাদের সঙ্গে—তোর দহরম-মহরম চলে। এক-আধটা ছোট-বড়-মাঝারি উপাধি থাক্‌লে তো সোনায়-সোহাগা। দুনিয়ার লোক তা হ'লে বলবে—"হাঁ, তুই একটা ক্ষণ জন্মা গবেষক-বীর, বিজ্ঞানরথী, দর্শন-সাধক বটে,—বর্তমান

জগতের সব্‌সে-সেরা পণ্ডিত। তোর মতন গুণী ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।"

লেখক—বাইরের চটক থেকে বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যের উৎকর্ষ সম্বন্ধে পরীক্ষাকে মুক্তি দেওয়া যায় না কি?

সরকার—আগেই ব'লেছি। মুক্তি দেওয়া যায়। বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যের সাধকটা ম'রে যাবার পর খাঁটি সমালোচনা পাবে। তখন কেউ তার পয়সা-পদ-পদবীর তোআক্কা রাখ্‌বে না। সংসারের জীব হিসাবে কোনো মানুষের পক্ষে খাঁটি সমালোচনা পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। পয়সা-পদ-পদবীর প্রভাব এড়িয়ে চলা পাড়া-পড়সীর পক্ষে সম্ভব নয়। সহযোগী পণ্ডিতদের পক্ষেও সম্ভব নয়। আর খবরের কাগজওয়ালারা ত এই সব দেখেই মতামত গঠন কর্‌তে অভ্যস্ত।

সেকেলে কালিদাস আর একেলে কাণ্ট্‌,—সব মিঞাই হালে হ'য়েছে পীর, অবতার, জগদ্‌গুরু। জ্যান্ত অবস্থায় কেউ পেত চা'ল-কলা, আর কেউ মাইনে-মাফিক রুটি-মাংস। নিজ পাড়ায় কালিদাস ইজ্জদ্‌ পেত কতখানি জানিস্‌? তার চা'ল-কলার মাপে অন্যান্য লোক যতটা পেতে পারে ঠিক ততটা। কাণ্ট্‌কেও তার পাড়ার লোকেরা তার মাইনের বহর দেখে' জরিপ কর্‌তো। সেই-মাইনের অন্যান্য জার্মাণও যা, কাণ্টের ইজ্জদ্‌ তার চেয়ে বেশী ছিল না। একে বলে "সমাজ"। রক্তমাংসের মানুষকে যাচাই করা সম্বন্ধে অন্য-কিছু আশা করা ঝক্‌মারি।

লেখক—ঝক্‌মারি কেন? পয়সা-পদ-পদবীর প্রভাব থেকে বৈজ্ঞানিক মর্যাদাকে মুক্ত করার চেষ্টা বাঞ্ছনীয় নয় কি?

সরকার—পরমহংসদেবের প্রচারিত কাম-কাঞ্চন-কীর্তি বর্জন কম বাঞ্ছনীয় কি? তার পর,—পয়সা বেচারার, পদ বেচারার আর পদবী বেচারার দোষ কোথায়? এইসব কি তুচ্ছ কর্‌বার জিনিষ? যার এসব আছে সে কখনো দুঃখ ক'রেছে শুনেছিস্‌? এই সবে জীবনটা সুখময় হয়। সাংসারিক সুখ সম্বন্ধে নাক সিঁট্‌কানো স্বভাব কার জানিস্‌? যে সুখে রয়েছে তার নয়। তার পয়সা-পদ-পদবীর পেছন-পেছন সেলাম ঠুক্‌ছে তার ওমেদারের দল। এতে তার দোষ কী? তার তো খুসী থাক্‌বারই কথা। আশে-পাশের লোকের কুর্ণিশ খেয়ে সে সন্তুষ্ট হবে কেন? তাতে তার বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক গবেষণার ইজ্জদ কম্‌বার সম্ভাবনা কোথায়? এর ফলে বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক গবেষণার কিম্মৎ হয়ত "অতি-মাত্রায়" বেড়েই যায়। ফাঁকতালে লাভ ছাড়া তার লোকসান নেই। বেঁচে থাক্‌তে-থাক্‌তে সে দেখে গেল যে, পয়সা-পদ-পদবীর জোরে তার আসল বা আধ্যাত্মিক যাচাই আটক রইল বটে। কিন্তু সাংসারিক পরীক্ষায় সে জবরদস্ত্‌ সুফলই লাভ ক'রেছে। ম'রে যাবার পর ইজ্জদ বাড়্‌লেই বা কী আর কম্‌লেই বা কী? মর্‌বার পর অমর হ'তে চায় দুনিয়ার খুব কম লোক।

খ্যাতি,—আধ্যাত্মিক ও সামাজিক

লেখক—বাইরে চটক সম্বন্ধে আপনি তা হ'লে কী কর্‌তে বলেন?

সরকার—অনেকবারই ব'লেছি। কর্‌বার কিছুই নেই। পয়সাওয়ালা বৈজ্ঞানিকের ইজ্জদ বা নামডাক তার খাঁটি বৈজ্ঞানিকের কৃতিত্বের চেয়ে বেশী হ'তে বাধ্য। উচ্চ পদস্থ বৈজ্ঞানিকের ইজ্জদ বা নামডাক তার খাঁটি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের চেয়ে বেশী হ'তে বাধ্য।

আর পদবীওয়ালা বৈজ্ঞানিকের ইজ্জদ বা নামডাক তার খাঁটি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের চেয়ে বেশী হ'তে বাধ্য। প্রত্যেক নামডাকেই থাকে খানিকটা "সাংসারিক" মাল আর খানিকটা হয়ত "আধ্যাত্মিক"।

লেখক—পয়সা-পদ-পদবী অর্থাৎ সাংসারিক সুখ কি বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে না?

সরকার—অনেক সময়েই করে না। পয়সা রোজগার জিনিষ্টা অতি জটিল। কোনো নির্দ্দিষ্ট দুচারটা সদ্‌গুণ বা দুর্গুণের সঙ্গে পয়সা রোজগারের যোগাযোগ নেই। উঁচু পদে বাহাল হওয়া কিসের উপর নির্ভর করে তা পৃথিবীর সর্বত্রই অনেক সময়ে বলা কঠিন। আর কোনো লোকের উপাধি বা খেতাব লাভ ঘট্‌বা মাত্র কী হয় জানিস্? সে সম্বন্ধে আশে-পাশের লোক সর্বদাই কানাঘুশা করে। এসব রহস্যপূর্ণ ঘটনা।

লেখক—পয়সা-পদ-পদবীর অভাবে গুণী ব্যক্তিরা সমাজে ইজ্জদ পায় না-কি?

সরকার—কেন পাবে না? তবে ইজ্জদটা অল্প-কয়েকজনের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। তাকে "সামাজিক" ইজ্জদ বলে না। "আধ্যাত্মিক" ইজ্জদ বল্‌তে পারি। বিশেষভাবে যাকে নামডাক, প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ইত্যাদি বলে সে-সব চিজ আলাদা। তা হচ্ছে সাংসারিক মাল, আধ্যাত্মিক মাল নয়।

লেখক—"আধ্যাত্মিক" ইজ্জদ আর "সামাজিক" (ও সাংসারিক) ইজ্জদে প্রভেদ কী?

সরকার—খাঁটি স্বার্থত্যাগী স্বদেশ-সেবকরা যে ইজ্জদ পায় সেটা "আধ্যাত্মিক",—"সামাজিক" নয়। সাংসারিক হিসাবে তারা না খেয়ে মরে, ব্যারামে ভোগে, কষ্টে চালায় আটপৌরে জীবন। অথচ জনসাধারণ তাদের নামে পাগল,—অর্থাৎ ঘরে ব'সে স্বদেশসেবকদের নিয়ে গুল্‌তান করে। স্বদেশসেবকদের নাম ও কাম দ্বরজা বন্ধ ক'রে গরীব-গুর্বারা আলোচনা ক'র্‌তে অভ্যস্ত। অপর পক্ষে "নামডাক"ওয়ালা লোক কারা? যারা স্বদেশসেবক নয়,—যারা স্বার্থত্যাগ জানে না,—যাদের আয় দিনের পর দিন বেড়েই চ'লেছে,—যাদের পদোন্নতি ঘটে যখন-তখন,—যাদেরকে লোকে ভয় ক'রে চলে। একে বলে "সামাজিক" ইজ্জদ।

("প্রবীণের অর্থ উন্নতির দুস্‌মন", ২৫শে অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—স্বদেশ-সেবক আর অন্যান্য গুণী ব্যক্তিদেরকে নামডাক হিসাবে আপনি একগোত্রের অন্তর্গত ভাবেন?

সরকার—হাঁ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে যারা গুণী আর স্বদেশ-সেবার কর্মক্ষেত্রে যারা স্বার্থত্যাগী তাদের পয়সা-পদ-পদবীর অভাব স্বাভাবিক। কাজেই তাদের নামডাক আশা করা উচিত নয়। তাদেরকে "সামাজিক" ইজ্জদের অধিকারী বল্‌ব না। তাদের যশ, খ্যাতি যা কিছু তা হয় নেহাৎ বন্ধু-বান্ধবদের দলে সীমাবদ্ধ। অথবা তাদেরকে বড়-জোর কোনো-কোনো সংবাদ-পত্রের নিরপেক্ষ সম্পাদক একটু-আধটু তারিফ্ করেন। এক-আধজন কেরাণী-স্থানীয় সাংবাদিক হয়ত দুচারটা মুখরোচক মিঠে বুলি ছাপিয়ে দেন। যাই হ'ক,—এই তারিফ্ বা মিঠে বুলিওলা "আধ্যাত্মিক"। এতে সাংসারিক বস্তু কিছু নেই। এতে পেট ভরে না। লোকেরা পয়সা-পদ-পদবীর পেছন-পেছনই ছুট্‌বে,—পয়সা-পদ-পদবী-হীনের ছায়া মাড়াবে না। "সামাজিক' নামডাক এদের খুবই কম।

লেখক—হীরেন দত্ত'র নামডাক সম্বন্ধে কি আপনি "সাংসারিক" ও "আধ্যাত্মিক" দুই জিনিষই দেখ্‌তে পান?

সরকার—ঠিক ধ'রেছিস্। হীরেনবাবুর বেলায় কী বলেছি মনে আছে? তাঁর উকিলি পেশা আর সেই পেশায় পশার এই দুটা উল্লেখযোগ্য শক্তি। (পৃঃ ১০৬) অবশ্য একমাত্র শক্তি বলিনি। এই দুইয়ের প্রভাব তাঁর নামডাকের ভেতর দেখ্‌তে হবে। যশের কত হিস্যা সাংসারিক আর কত হিস্যা আধ্যাত্মিক তা বলা কঠিন। যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন "সাংসারিক" অবস্থার হিস্যা বেশ-বড় ছিল। আজ মৃত্যুর পর আর সে জিনিষ থাক্‌বে না। এখন যা-কিছু থাক্‌বার সবই একমাত্র আধ্যাত্মিক।

রবীন্দ্রনাথের বেলায়ই কি যশের ভেতর সাংসারিক অবস্থার হিস্যা কম? সাংসারিক অবস্থা বাদ দিয়ে যশ, নামডাক, কীর্তি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। বর্তমানে বঙ্কিমের যশ যা-কিছু প্রায় সবই আধ্যাত্মিক। মৃত্যুর (১৮৯৪) পর প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হ'তে চল্‌ল।

লেখক—বেঁচে থাকবাব সময় "সামাজিক" হিসাবে যশস্বী কারা?

সরকার—যারা "সাংসারিক" হিসাবে বড়। "আধ্যাত্মিক" হিসাবে যারা বড় তারা "সামাজিক" জীব হিসাবে প্রায়ই বেশী-কিছু নয়।

লেখক—মৃত্যুর পর পয়সা-পদ-পদবীওয়ালাদের অর্থাৎ সামাজিক বড়'দের নামডাক কিরূপ থাকে?

সরকার—মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই সামাজিক বড়'দের নামডাক এক প্রকার লোপ পায়। মর্‌ত্যুর পরের দিন হ'তে পয়সা-পদ-পদবী-ওয়ালাদেরকে কেউ পুছে না। দুনিয়া নির্দয় একটা চরম দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। লাখ-লাখ টাকা দান ক'রে বেঁচে থাক্‌বার সময় নামজাদা হয়েছিলেন কল্‌কাতার অনেক ধনী। দান করার যশটা সাংসারিক, আধ্যাত্মিক নয়। কিন্তু তাঁদের নাম দশ-বিশ-পঁচিশ বৎসরের ভেতর প্রায় উপে' গেছে বলা যেতে পারে। বুঝা যাচ্ছে যে, "আধ্যাত্মিক" যশ তাঁদের বিলকুল ছিলই না।

অপরদিকে বিক্রমপুরের কবি গোবিন্দদাস না খেতে পেয়ে মারা গেছেন। সামাজিক জীব হিসাবে তাঁর কিস্মৎ ছিল প্রায় শূন্য। অথচ তাঁর "স্বদেশ স্বদেশ করছিস্ কারে,—এদেশ তোদের নয়" গান্‌টা জানে না, এমন বাঙালী আজ কোথাও নেই। অর্থাৎ পয়সা পদ-পদবীহীন যদি গুণী লোক হয় তার আধ্যাত্মিক যশ মৃত্যুর পরেও থাকে। থাকে মাত্র নয়,—বেড়েও চলে।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চাচ্ছেন যে, "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা. বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে" কথাটার কোন দাম নেই?

সরকার—সাংসারিক ও সামাজিক হিসাবে এই বুখ্‌নির দাম এক কানা-কড়িও নয়। পূজা দু'টা দুই রকমের। একটা সামাজিক জ্যান্ত অবস্থায় দেশের অলিতে-গলিতে, ঘাটে-বাজারে পণ্ডিতের চেয়ে বেশী পূজা পায় পয়সাওয়ালা লোক,—পয়সাওয়ালা লোকের চেয়েও বেশী পূজা পায় বোধ হয় পদওয়ালা লোক। বিদেশেও রাজরাজড়া লোকই পূজা পায়। পণ্ডিতের সামাজিক ইজ্জদ্ কোথাও নেই,—না স্বদেশে, না বিদেশে। পণ্ডিত যে পূজা খায় সেটা আধ্যাত্মিক। ম'রে ভূত হ'য়ে যাবার ত্রিশ বৎসর পর দেশের লোক তার জন্য স্মৃতি-সভা করে, দুনিয়ার লোক তাকে ক্ষণ-জন্মা পুরুষ বলে। ইত্যাদি ইত্যাদি। বেঁচে থাক্‌বার সময় কয়লাওয়ালা বাড়ী চড়াও ক'রে পণ্ডিতকে অপমান করে, আফিসের কেরাণী তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়ায়। বিদ্বানের এই দুর্গতি,—কি স্বদেশে, কি বিদেশে অর্থাৎ "সর্বত্র"।

লেখক—সাংসারিক-সুখী ব্যক্তিকে আপনি বড় মনে করেন, না অমর গুণীকে বড় বিবেচনা করেন?

সরকার—ভায়া, এটা ছোট-বড়'র মামলা নয়। দুটা দুই আলাদা ধরণের সার্থকতা, কৃতকার্যতা, সফলতা, যশ ও নামডাক। এক রকমের কাজে লোকেরা হয় অমর, আর একটার হয় সাংসারিক ও সামাজিক হিসাবে সুখী। আমি গরীব কবিকেও সম্মান করি, আবার হাসপাতালের জন্য যে ধনী টাকা দেয় তাকেও সম্মান করি। কবিতা আমি চাই-ই চাই। হাসপাতাল কি আমি কম চাই? একজন অমর হবে। কিন্তু কষ্টে কাটাচ্ছে জীবন। আর একজন অমর হবে কিনা জানি না। কিন্তু আছে সুখে।

লেখক—কিন্তু কাজের তরফ থেকে একজনকে বড় আর একজনকে ছোট বললেন না কেন?

সরকার—এই বিষয়ে নানামুনির নানা মত। আমি অবশ্য মুনি নই। তবে আমারও একটা মত আছে। আমি বলি দুনিয়ার সবকয়টা লোকই কোনো-না-কোনো কাজ ক'রছে। আর কাজগুলা সবই মানুষের কোনো-না-কোনো অভাব পূরণ করে। মেথর ছাড়া সংসার চলে না। মুর্দফরাস ছাড়া সংসার চলে না। মজুর ছাড়া সংসার চলে না। চাষী ছাড়া সংসার চলে না। আবার ডাক্তার ছাড়া সংসার চলে না। এঞ্জিনিয়ার ছাড়া সংসার চলে না। কেরাণী ছাড়া সংসার চলে না। ইস্কুলমাষ্টার ছাড়া সংসার চলে না। সেনাপতি ছাড়া সংসার চলে না। কোতোয়াল ছাড়া সংসার চলে না। ঠিক সেইরূপই কবি ছাড়া সংসার চলে না। গায়ক ছাড়া সংসার চলে না। গবেষক ছাড়া সংসার চলে না। বিজ্ঞানসেবক ছাড়া সংসার চলে না। দার্শনিক ছাড়া সংসার চলে না। কে বড়, আর কে ছোট? এই প্রশ্নগুলার আলোচনায় সময় কাটানো ভাল। কিন্তু কোনো সন্তোষজনক জবাবে আমি তো পৌঁছোতে পারি না। তুই চেষ্টা ক'রে দ্যাখ্।

আত্মা, পরকাল, ভগবান

৭ই নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—চিন্তার বিষয় হিসাবে আত্মা, পরকাল, ভগবান ইত্যাদি বস্তু সর্বশ্রেষ্ঠ নয় কি?

সরকার—না। আত্মা, ভগবান ইত্যাদি বস্তু কল্পনা করা মানুষের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্পনা নয়। এইসব তার হাজার কল্পনার অন্যতম কল্পনামাত্র। এই সব কল্পনায় খারাপ কিছু নেই। মানুষের উপকারও হ'তে পারে। তবে অন্যান্য কল্পনায়ও মানুষের উপকার হয়। কোন্ কল্পনায় কিছু-বেশী উপকার আর কোন্ কল্পনায় কিছু-কম উপকার তা এক কথায় বলা কঠিন। সবাই বিশ্লেষণ-সাপেক্ষ।

আত্মা, ভগবান ইত্যাদি বস্তুর কল্পনা না ক'রেও মানুষ দুনিয়ার চরম-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হ'তে পারে। এই সব শব্দ মুখে যে না আনে তার পক্ষেও চরিত্র হিসাবে মহত্তম হওয়া সম্ভব।

আমি বহুত্বনিষ্ঠ। সেজন্য আত্মা, পরকাল, ভগবান ইত্যাদি বস্তু সম্বন্ধে চর্চা-গবেষণা-বিশ্লেষণের সংগে অসহযোগ চালাই না। যাঁরা আত্মাকে উপলব্ধি কর্‌তে চান, ভগবানকে দেখ্‌তে চান, পরমেশ্বরের সংগে মিলে যেতে চান,—তাঁদের স্বরাজ আমি সর্বদাই স্বীকার ক'রে চলি। ভগবানকে যাঁরা দেখ্‌ছেন, তাঁরা আরও দেখুন, ভগবানে যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা আরও বিশ্বাস করুন।

লেখক—ভগবানকে "উপলব্ধি" কর্‌বার অভিজ্ঞতা লাভ কি দার্শনিকের চরম লক্ষ্য নয়?

(পৃঃ ৫৪-৫৫)

সরকার—না। আত্মা, ব্রহ্ম, ভগবান, পরমেশ্বর ইত্যাদি বস্তু দেখার বা জীবনে উপলব্ধি করার অভিজ্ঞতা সর্বশ্রেষ্ঠ বা চরম অভিজ্ঞতা নয়। এই সবের সাহিত্য সর্বশ্রেষ্ঠ বা চরম দর্শন (বা বিজ্ঞান) নয়। এইসবের আলোচনা বা গবেষণা একমাত্র দর্শন (বা বিজ্ঞান) নয়।

লেখক—ভারতীয় দর্শনের অধিকাংশই ভগবানকে "উপলব্ধি" করার সাহিত্য নয় কি? ভারতে দর্শন বল্‌লে ভগবানকে দেখার আলোচনাই বুঝায় না কি?

সরকার—অতটা জরিপ ক'রে দেখিনি। ঐ বিশাল সমুদ্রে ডুব মারবার ক্ষমতাও নেই। এক কথায় জবাব দেবো,—"বোধ হয় না"। মনে কর্‌,—ভগবানকে দেখার সাহিত্য একমাত্র বা সর্বশ্রেষ্ঠ বা চরম দর্শন। তা'হলে অবস্থা কী দাঁড়ায় জানিস্? সেকালের বৈশেষিক হ'তে একালের নব্যন্যায় ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের স্মৃতি পর্য্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের পৌনেষোল-আনা হিস্যা দর্শনের বহির্ভূত মাল, কেননা এই সকল সাহিত্যে ভগবান দেখা-দেখির মামলা নেই। তা'হলে মারাঠী অভঙ্, বৈষ্ণব পদাবলী, কবীরের দোঁহা ইত্যাদি কাব্য-সাহিত্যের কিয়দংশ বাদে আর সব-কিছুই দর্শন ব'লে পরিচিত হবে না, কেননা অন্যান্য সাহিত্যে ভগবান দেখার কারবার অজ্ঞাত। তাহ'লে "রাম রহিম না জুদা করো ভাই, দিল্‌কো সাচ্চা রাখো জী" ইত্যাদি সাধু-ফকিরদের বয়েৎসমূহের মতন পাঁতিগুলাই ভারতীয় দর্শনের একমাত্র প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে যাবে। এই যদি অবস্থা হয় তবে ভারতীয় মগজখানা দর্শনের ইতিহাসে কৃপার পাত্র বিবেচিত হ'তে বাধ্য!

লেখক—আপনার বিবেচনায় ভারতীয় দর্শনেব প্রধান অংশ কিরূপ?

সবকার—ভারতীয় সাহিত্যের দর্শনবিভাগে ভগবান দেখাদেখি বেশী আছে কিনা সন্দেহ। কিন্তু একটা জিনিষ আছে। তা দুনিয়ার, বোধহয়, সব মিঞাই জানে। সে হচ্ছে তর্কের কচ্‌কচানি,—ভাষা-পরিচ্ছেদের মাম্‌লা, "প্রমা"র স্বরূপ, "বুদ্ধি"-তত্ত্ব ইত্যাদি। ভাষা, টীকা, তারও ভাষ্য, তস্যাপি টীকা,—এই হ'লো ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যের কাঠাম। এসবের ভেতর অন্তর্দৃষ্টি, গূঢ়রহস্য, অনুভূতি, বোধ ইত্যাদির হাওয়া চলে কিনা সন্দেহ। সর্বত্রই পাই বুদ্ধির লীলা—যুক্তির রেওয়াজ। সোজা কথা, পাশ্চাত্য দর্শনে মগজের খেলা যতখানি ভারতীয় দর্শনেও ততখানি। ভক্তিযোগের পাল্লায় প'ড়ে জ্ঞানযোগ রাহুগ্রস্ত হয় নি।

লেখক—ভগবানকে দেখার দর্শন কি ভারতীয় চিন্তাধারার "বৈশিষ্ট্য" নয়?

সরকার—না। কেননা পাশ্চাত্য খৃষ্টিয়ান চিন্তায় আত্মার সাহিত্য,—ভগবানকে দেখাদেখির সাহিত্য,—বহরে খুব লম্বা-চওড়া। বোধি, অন্তর্দৃষ্টি, রহস্যবোধ, অতীন্দ্রি-জ্ঞান, গূঢ়-অনুভূতি ইত্যাদি বস্তু মধ্যযুগের ইয়োরোপে বেশ প্রবল। ইয়োরোপের প্লতিনুস্, দান্তে, ব্যোমে, একেহার্ট, দাতোদি ইত্যাদি লেখকেরা সাধক, যোগী, সত্যদ্রষ্টা, ঋষি। এঁদের পশার ইয়োরোপে আজও কম নয়। আবার মার্কিণ মুল্লুকের থোরো, পার্কার, এমার্সন ইত্যাদি লেখকদেব রচনা বোধিনিষ্ঠায় ভরপুর। ভগবান দেখাদেখির কাণ্ডকে একমাত্র, সর্বশ্রেষ্ঠ বা চরম দর্শন বল্‌তে চাস্? ব'লে যা, কুছ্-পরোআ নেই। তা'হলে ভারতবর্ষকে তার একচেটিয়া বেপারী ভেবে রাখ্‌লে চলবে না। তাতে ইয়োরামেরিকাকেও বেশ-কিছু হিস্যা দিতে হবে। ইয়োরামেরিকার দর্শন-সাহিত্যটা একমাত্র বুদ্ধি, যুক্তি ও তর্কের আখ্‌ড়া নয়।

লেখক—আত্মা, ভগবান ইত্যাদি বস্তু মানুষের চিন্তায় সর্বশ্রেষ্ঠ নয়,—একথা সাধারণ ভারতবাসী বিশ্বাস করতে রাজি হবে কি?

সবকার—কি কর্‌বো ভায়া? আমি পাপিষ্ঠ,—তা তো জানাই আছে। আত্মা, পরকাল,

ভগবান ইত্যাদি বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করা, কল্পনা করা কঠিন হ'তে পারে। কিন্তু এই চিন্তা বা কল্পনা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা বা কল্পনা নয়। এসব জিনিষ চোখে দেখা যায় না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের শ্রেণীতে এসব পড়ে না। এসবকে খানিকটা অলীক বলা যেতে পারে। এজন্যই ধারণা করা সহজ নয়।

কিন্তু স্বার্থত্যাগী, পরোপকারী মানব-সেবক হবার জন্য আত্মা, ভগবান ইত্যাদি বস্তু কল্পনা আবশ্যক হয় না। ব্রহ্মচর্য-পালন বা সন্ন্যাস-গ্রহণের তাগিদ্‌ও আত্মা, ভগবান ইত্যাদি বস্তুকে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। আত্মা, ভগবান ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ মানুষের কর্ম বা চিন্তায় অতিমাত্রায় জরুরি চিজ নয়। কোনো-কোনো লোকের কাছে হয়তো এই সব পারিভাষিক শব্দ বেশ-কিছু আবশ্যক।

("সাধনা কী চিজ?" ডিসেম্বর, "তথাকথিত সত্যদ্রষ্টারা কী দেখেছেন?" ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

রাবীন্দ্রিক প্রভাব

৫ই নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—হীরেন দত্তের ভাষা সম্পর্কে আরও দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি চারজন বাঙালী সাহিত্যবীরের নাম ক'রেছেন (পৃঃ ৯৯-১০০)। তাঁদের আদর্শে আপনি বাংলা লেখেন বল্‌ছেন। বড়ই আশ্চর্যের কথা যে, রবীন্দ্রনাথের নাম ক'রলেন না। এর কারণ কী? শুনেছি যে, নোবেল প্রাইজ পাবার খবর শুন্‌বামাত্র দুএক দিনের ভেতরেই নাকি আপনি (তখন এলাহাবাদে মেজর বামনদাস বসুর অতিথি) "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" বইটা লিখেছিলেন (১৯১৩)। রবীন্দ্র-রসে যে এত মুগ্ধ, তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের ভাষাই তো আদর্শ হওয়া স্বাভাবিক।

("বাংলা গদ্যে ফরাসী প্রাঞ্জলতা", ১৩ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—এর ভেতর একটু "কিন্তু" আছে। ১৯০২-০৩ সনে ডন-সোসাইটিতে সতীশ মুখোপাধ্যায়ের চেলা হবার সংগে-সংগেই রবীন্দ্ররসে মাতোআরা হ'তে থাকি। আমার চেয়ে যারা বয়সে বড়, তারা আগে হ'তেই "রৈবিক", "রাবীন্দ্রিক" ইত্যাদিরূপে ছেলেমহলে পরিচিত ছিল। যুবক বাঙ্‌লা রবির মুখে "স্বদেশী সমাজ" (১৯০৪) শুনে' নয়া দুনিয়ার সন্ধান পেয়েছিল। গৌরবময় বংগ-বিপ্লবের অন্যতম সূত্রপাত এই বক্তৃতায়। ১৯০৫ সনে খোদ রবিবাবুর কাছে আমরা ডন-সোসাইটির ঘরে (একালের বিদ্যাসাগর কলেজের সাম্‌নের দোতলায়) তাঁর নিজের তৈরী গান শিখেছিলাম। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে এক্‌লা চলো রে",—এই গানটা মনে পড়্‌ছে। আর একটা মনে পড়্‌ছে। সে হচ্ছে—"তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে, তা ব'লে ভাব্‌না করা চল্‌বে না"।

লেখক—ভাষা ও সাহিত্যের তরফ থেকে যুবক বাংলার উপর রৈবিক প্রভাব কিরূপ ছিল?

সরকার—ছোঁড়ার রৈবিক হাতের লেখা নকল ক'রতো। রৈবিকতার ভেতর আস্‌তো নয়া বানান। নতুন-নতুন শব্দ তো আমদানি হ'তোই। তার ওপর ছিল ক্রিয়াপদের ভাঙা-চুরা। এই সব উপায়ে রাবীন্দ্রিক ভাষা ছড়িয়ে পড়্‌ছিল। এ একটা দিগ্‌বিজয়।

লেখক—"রৈবিকতা" আপনার চিন্তায় কোন্ আকারে দেখা দিয়েছিল?

সরকার—ঘটনাচক্রে আমার রৈবিকতার দৌড় সীমাবদ্ধ ছিল। এটা চিন্তার আদর্শ, জীবনের লক্ষ্য, সাংস্কৃতিক ভাবুকতা ইত্যাদি পর্য্যন্ত যেতো। তার বেশী নয়। রাবীন্দ্রিক প্রভাব আমাকে কবিতা লেখার দিকে নোআতে পারে নি। আমার চেনাশুনার ভেতর অনেকে কবিতা লেখার রসে ম'জেছিল। কিন্তু তাদের ভেতর রৈবিক চিন্তার আদর্শ, ভাবুকতা ইত্যাদি বেশী ব'সেছিল কিনা সন্দেহ। যাই হোক্, আর একটা মজার কথা বল্‌ছি। রবির কবিতা ছাড়া সেযুগে আমি আর কোনো কবিতা জান্‌তাম কিনা সন্দেহ। ১৯০২-০৪ সনেও বাংলা সাহিত্যের অ, আ, ক, খ, আমার জানা ছিল না। কবি বল্‌লেই বুঝ্‌তাম "রবি"। বুঝাই যাচ্ছে,—রাবীন্দ্রিক প্রভাব আঁকাবাঁকা পথে চ'লেছিল। সোজা একটানা পথে চলেনি।

রবীন্দ্র-দৈত্য

লেখক—কবিতা-রচনার দিকে না হয় লেখক হিসাবে আপনার যাওয়া সম্ভব হয় নি। কিন্তু রবীন্দ্র-গদ্যকে আপনি আপনার রচনা-রীতির আদর্শ কর্‌লেন না কেন?

সরকার—১৯০৬ সনে যখন লেখা সুরু করি তখন জীবনে রাবীন্দ্রিক ভাবুকতার প্রভাব জবরদস্ত,—বলা বাহুল্য। কিন্তু লোকটা আমি কবি নই। আর, রবি যতই গদ্য লিখুন না কেন, মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত লোকটা কবি। তাঁর রক্তের প্রত্যেক বিন্দু এক-একটা কবিতা বিশেষ। রবীন্দ্র-গদ্যে রচনার প্রাণটা কবিত্বময়। কাব্যের উপমা, কাব্যের অলংকার, কাব্যের কল্পনা, কাব্যের ঝঙ্কার, কাব্যের সব-কিছুই তাঁর গদ্য লেখায় ষোলআনা হাজির। এহেন কবিত্বময় গদ্যলেখকের পাল্লায় যদি কোনো অ-কবি পড়ে, তাহ'লে তার "পরকাল ঝর্‌ঝরে্" হ'তে বাধ্য।

লেখক—কেন? রবীন্দ্র-প্রভাব সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

সরকার—ধারণা অতি বিচিত্র। এই প্রভাব দৈত্য-দানবের প্রভাব।

আমি, ভাই, গরীব মানুষ। সৌভাগ্যক্রমে আমি রবীন্দ্র-দৈত্যের পাল্লায় পড়িনি। বুঝ্‌লি? রাবীন্দ্রিক প্রতিভা একটা দৈত্য বিশেষ। এই ভূত যার ঘাড়ে চাপে তার উদ্ধার নেই। রবীন্দ্র-দৈত্যের কাছে যাওয়া-আসা করা ভাল। মাথা পরিষ্কার হয়, হৃদয় চওড়া হয়, চিন্তা চক্-চ'কে হয়। কিন্তু এই দৈত্যকে সেলাম ঠুকা উচিত দূর থেকে। বেশী কাছে ঘেঁস্‌লে ভূতটা এসে ঘাড় ম'ট্‌কে দেবে। খবরদার। তোরা তো রবীন্দ্র-দৈত্যকে ১৯০৪-১৪ সনের যুগে দেখিস্‌নি। আমার কথা কী বুঝ্‌বি?

লেখক—রবীন্দ্র-গদ্য থেকে মুক্তি পাবার জন্য আপনাকে বেগ পেতে হ'য়েছিল।

সরকার—না। জেনে-শুনে ইচ্ছে ক'রে রবীন্দ্র-গদ্যকে আদর্শের স্থান হ'তে বয়কট ক'রে চ'লেছি,—একথা বল্‌তে পারি না। কপালের জোর,—অজ্ঞাতসারে,—দৈবক্রমে রবীন্দ্র-গদ্যের পথে আমার কলমটা প্রলুব্ধ হয় নি।

রবীন্দ্র-গদ্য ভয়ের জিনিষ

লেখক—একথা কেন বল্‌ছেন? রবীন্দ্র-গদ্যকে আপনি নিন্দনীয় বিবেচনা কর্‌তেন কি? তাকে এত ভয় কর্‌তেন কেন?

সরকার—নিন্দনীয় মোটেই নয়—ঠিক উল্টো। তবে মামুলি লোকের পক্ষে ভয়ের জিনিষ বটে। রবীন্দ্র-গদ্য অতিমাত্রায় তারিফ্‌যোগ্য। সে বিশ্ব-সাহিত্যের অদ্ভুত সৃষ্টি,—জগদ্বরেণ্য জিনিষ। কিন্তু তা একমাত্র রবির হাতেই শোভা পায়। গদ্য-সংসারের লেখকেরা সাধারণতঃ সাহিত্য-সমালোচক, শিল্প-সমজদার, প্রবন্ধ-লেখক। অনেকে গল্প ও উপন্যাস লিখ্‌তে অভ্যস্ত। গদ্যের ডাক পড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায়, ঐতিহাসিক রচনায়, রাজনৈতিক চিন্তায় আর দার্শনিক তর্কাতর্কিতে। গদ্য-লেখকদের কেউ-কেউ আবার সংবাদপত্রসেবী।

লেখক—এই সব শ্রেণীর লেখকের পক্ষে গদ্যের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত?

সরকার—যে গদ্য-রচনার ভিত্তি যুক্তিনিষ্ঠায়—সেই গদ্য। চাই প্রশ্নাপ্রশ্নি. চাই হাতাহাতি, চাই প্রমাণের সিঁড়ি, চাই কার্য-কারণ সম্বন্ধের সারি, চাই আরোহ-পদ্ধতিতে আলোচনা, চাই অবরোহ-প্রণালীতে সিদ্ধান্ত প্রকাশ। এই সব নিয়ে গদ্য-লেখকদের ধান্ধা। গদ্যের উদ্দেশ্য এই যে, পাঠকের বুদ্ধিকে বুঝাতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। এই বুঝাবার ভাষা কাব্যের ভাষা নয়।

হীরেন বাবুর পারিভাষিক লাগাচ্ছি। বল্‌তে পারে যে, দুনিয়ায় গদ্য-লেখকেরা ভর দিয়ে চলে "বুদ্ধির" উপর। রবীন্দ্র-গদ্যের ভিত্তি "বোধিতে" প্রতিষ্ঠিত। সেই বোধির উপরই ভর ক'রে চলে তাঁর কাব্য! বাস্তবিক পক্ষে বোধি হ'লো সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের উৎস,—কি কাব্যের, কি গদ্যের।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যে যুক্তির স্থান কি নেই?

সরকার—ভাল প্রশ্ন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বুদ্ধি নেই, যুক্তি নেই, তর্ক নেই,—একথা ব'ল্‌ছি না। আলবৎ আছে। তবে তা পাঠককে মেহনৎ করে' খুঁজে বের ক'র্‌তে হয়। রবির অনেক প্রবন্ধ পড়্‌লে মনে হয় যেন, প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একটা কথাই বলা হচ্ছে। প্যারাগ্রাফের পর প্যাবাগ্রাফ্ চ'লেছে, অথচ নতুন-নতুন যুক্তি, নতুন-নতুন সিদ্ধান্ত, নতুন-নতুন প্রমাণ যেন পাচ্ছি না। পাচ্ছি কেবল উপমার পর উপমা, তুলনার পর তুলনা, নয়া-নয়া শব্দের ফুলঝুরি, নয়া-নয়া কল্পনার রঙীন ঝলক। রবীন্দ্র-গদ্যের ভেতর বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক প্রধান জিনিষ নয়, আর কাব্যে তো নয়ই। এ সব আনুষংগিক। রবীন্দ্র-কাব্য আর রবীন্দ্র-গদ্য দুইই উৎপন্ন হয় সোজাসুজি বোধির প্রেরণায়। তার ভেতর বুদ্ধি, যুক্তি, তর্ক—যথাস্থানে হয়ত এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু রবির কলম বুদ্ধির প্রেরণায় চলে না। অপর পক্ষে, কি বাঙালী, কি অ-বাঙালী, কোনো গদ্য-লেখকই বোধির তোআক্কা একপ্রকার রাখে না। তারা সকলেই বুদ্ধিজীবী, তর্কসেবক, যুক্তিনিষ্ঠ লেখক। বোধি-জিনিষটা লাখে-হাজারে এক-আধজনের ভাগ্যে ঘটে।

লেখক—কোন্-কোন্ বাঙালী গদ্য-লেখক রবীন্দ্রনাথের সমশ্রেণীভুক্ত?

সরকার—আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের হিসাব ক'রে দ্যাখ্। সেকালের রামমোহন হ'তে সুরু ক'রে একালের দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক যে-কোনো পত্রিকার যে-কোনো নামজাদা লেখকের কথা তুল্‌তে চাস্, তোল্। এতগুলো বাংলা গদ্য-লেখকের ভেতর একজনও নেই যার রচনা রবীন্দ্র-গদ্যের সংগে তুলনা করা যেতে পারে।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, রবীন্দ্র-গদ্য অন্য কোনো লেখকের পক্ষে ব্যবহার করা সম্ভব নয়?

সরকার—ঠিক তাই। রবির কবিতা দেখে ক'টা লোকের পক্ষে কবিতা লেখা সম্ভব হয়েছে? আর ক'জনই বা সত্যিকার রৈবিক কবি হ'তে পেরেছে? আমার বিবেচনায় সে-সব সম্ভব নয়। তাঁর গদ্য দেখেও সেরূপ গদ্য লেখা সম্ভব নয়। এই আমার বিশ্বাস। বড়-জোর দু'একটা নতুন-নতুন চোস্ত মোলায়েম, জোরাল বা শাঁসাল শব্দ পকেটস্থ করা যেতে পারে। রবীন্দ্র-গদ্য রবীন্দ্র-কাব্যের মতনই একা-একা চলে। কোনো শ্রেণীতে এই দুয়ের কোনোটাকে ফেলা সম্ভব নয়।

লেখক—এর কারণ কী?

সরকার—বোধিনিষ্ঠ লেখকের চিন্তাযন্ত্র বিল্‌কুল্ স্বতন্ত্র চিজ্। এই চিন্তার কাঠাম সাধারণ কাঠাম নয়। বোধিনিষ্ঠ লেখকদের প্রকাশভংগীর সংগে যুক্তিনিষ্ঠ লেখকদের প্রকাশভংগীর একপ্রকার কোনো মিল নেই। দুই মগজের গড়ন ও ঢং স্বতন্ত্র।

লেখক—রবীন্দ্র-গদ্যের বিশেষত্বটা কী?

সরকার—রবীন্দ্রনাথের মুখে প্রবন্ধাবলী আমরা অনেকেই শুনেছি। শুন্‌তে শুন্‌তে কল্পনায় ভেসে বেড়িয়েছি। লোকজনের সংগে বুক-চেঁড়ে মাতামাতি কর্‌তে পেরেছি। এ সবই সম্ভব। শুন্‌তে-শুন্‌তে আকাশে লাফালাফি করাও সম্ভব। কিন্তু তাতে দুনিয়ার পাথুরে মাটিতে রক্তমাংসের পা-রাখার ঠাঁই টুঁড়ে পাওয়া যাবে না। এমন কি নিজ ঘরে ব'সে রৈবিক গদ্য পড়্‌তে থাক্‌লে আনন্দে হাবুডুবু খাওয়া সম্ভব। ভাষা-সম্পদ এত মন-মাতানো, এত বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভাবের কথা এখন আমার আলোচ্য নয়। শুধু প্রকাশভংগী সম্বন্ধে ব'ল্‌ছি। আশ্চর্য হ'য়ে ভাবা যেতে পারে,—"আঃ লোকটা কি লেখাই লিখেছে রে!" ঐ পর্যন্ত। কিন্তু তাতে সেই ভাষাটাকে নিজের কাজে লাগাবার কায়দা হস্তগত হবে না। সে খাঁটি রৈবিক রহস্য। চাবীটা তাঁর নিজের ট্যাকে।

সুতরাং বোধিপ্রাণ রবীন্দ্রনাথ কখনো আটপৌরে গদ্য-সাধকদের আদর্শ হতে পারেন না। লোকটা যদি বোধিপ্রাণ হ'য়ে জ'ন্মে থাকে, তা হ'লে কথা আলাদা। তা না হ'লে বোধিওয়ালা সাহিত্যবীরকে গুরু কর্‌লে রামা-শ্যামা-আব্দুল-ইস্‌মাইল একদিন না একদিন পস্তাবেই পস্তাবে। আমি বেচারা দৈবক্রমে বোধিনিষ্ঠ রবীন্দ্র-গদ্যের পেছন-পেছন ছুটিনি। এজন্য বেঁচে গিয়েছি কি ম'রে রয়েছি তা অবশ্য বল্‌তে পারি না। তোরা হয়তো বল্‌তে পারিস্।

ভাষা-সাধনার কর্মকৌশল

লেখক—আপনি হীরেন দত্ত ইত্যাদি যে চারজনের কথা ব'লেছেন, সে ক'জন ছাড়া আর কেউ কি আপনার ফরাসী প্রাঞ্জলতাশীল বাংলা-গদ্যের লেখক নেই? এই চারজনকেই বা আদর্শ ভাব্‌লেন কী জন্য? (পৃঃ ৯৯, ১০২)

সরকার—আমার ছোক্‌রা বয়সে (১৯০৬-১৯১৪),—প্রকারান্তরে বংগ-বিপ্লবের যুগে,—এই চারজনই ছিলেন বাংলা গদ্য-লেখকদের গণ্যমান্য। ঘটনাচক্রে তাঁদের সঙ্গে আমার আনাগোনাও ছিল আটপৌরে রকমের। তাঁদের রচনাবলী আমি সর্বদা কাছে রেখে কিছু লিখেছি এরূপ ভাবা ঠিক হবে না। তাঁরা আমাকে তাঁদের পথে টেনে নিতেও চেষ্টা

করেন নি। তবে অনেক-কিছুর সংগে রচনা-রীতি সম্বন্ধেও তাঁদের সংগে মোলাকাৎ চল্‌তো। সেই সব কথাবার্তার প্রভাব হয়তো আমার রচনার উপর কাজ ক'রে থাক্‌বে।

লেখক—১৯১৪ সনে বিদেশে রওনা হওয়ার আগে আপনার সংগে অন্য কোনো লোকের যোগাযোগ ছিল?

সরকার—অনেকের সংগে যোগাযোগ ছিল।

অধিকন্তু "বিশ্বকোষ"-সম্পাদক নগেন বসু, "বংগভাষা ও সাহিত্য" লেখক দীনেশ সেন, "দেশের কথা"-লেখক মারাঠা-বাঙালী সখারাম গণেশ দেউস্কর, "সাহিত্য"-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, "নায়ক" সম্পাদক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, "ভারতবর্ষ"-সম্পাদক জলধর সেন, "আর্যাবর্ত"-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, "সিরাজদৌল্লা" ও "গৌড়-লেখমালা"র গ্রন্থকার অক্ষয়কুমার মৈত্র, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, নৃতত্ত্বশাস্ত্রী বিজয়চন্দ্র মজুমদার, "জ্ঞান ও কর্ম" এবং "শিক্ষা"র গ্রন্থকার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকাচার-শাস্ত্রী অমূল্য বিদ্যাভূষণ, কবি কুমুদনাথ লাহিড়ী ইত্যাদি লেখকদের নিকট আমি ভাষা সম্বন্ধে ঋণী। আমার ভাষাটা ঘষা-মাজার কাজে তাঁদের সাহায্য পেয়েছি।

লেখক—আচ্ছা, বুদ্ধিনিষ্ঠ লোক কি বোধিনিষ্ঠ হ'তে পারে না?

সরকার—বুদ্ধিতে আর বোধিতে আদায়-কাঁচকলায় সম্বন্ধ সম্‌ঝে' রাখার প্রয়োজন নেই। দুইই প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্বে,—অর্থাৎ কাজে ও চিন্তায়,—বর্তমান। তবে "ডোজ" বা মাত্রার ফারাক্‌। বুদ্ধির মাত্রাটা কোনো লোকের বেশী—বোধির মাত্রা কম। আবার কারু বা বোধির মাত্রা বেশী, বুদ্ধির মাত্রা কম। সংসারের মামুলি নরনারীর জীবনে, কর্মে ও চিন্তায় বুদ্ধির একতিয়ার পৌনে ষোল-আনা,—সিকি-আনা মাত্র বোধির একতিয়ার। তবে বিলকুল্‌ বোধিহীন মানুষ, বোধ হয়, একজনও নেই।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যে বুদ্ধি বেশী কি বোধি বেশী?

সরকার—রবীন্দ্রনাথের শিল্প-প্রেরণার মূলে, বোধ হয়, পৌনে-ষোল-আনাই বোধি আর বাকিটুকু বুদ্ধি। রবির বরাতের জোর খুব বেশী। তাঁর বোধিপূর্ণ সৃষ্টিগুলা বুদ্ধিটাকে নাকে দড়ি দিয়ে সংগে টেনে এনেছে। অত বেশী বোধিওয়ালা লোকের রচনায় বুদ্ধির খাঁক্‌তি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তা ঘটেনি। যাই হোক্‌, সম্প্রতি আমি পরীক্ষাসিদ্ধ চিত্তবিজ্ঞানের মাপকাঠি আর সংখ্যাশাস্ত্রের অংক ক'ষে অনুপাতগুলা দেখাতে চেষ্টা কর্‌ছি না। চিত্তবিজ্ঞানের কোনো গবেষক যদি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতরকার বোধি বনাম বুদ্ধি সমস্যা বিশ্লেষণ কর্‌তে অগ্রসর হয় তা হ'লে একটা বড় কাজ হবে।

লেখক—আপনি একটু আগে আপনার ভাষাটা ঘষা-মাজার কথা বল্‌লেন। তা কি একমাত্র ভাষা সম্বন্ধে বুঝতে হবে? বক্তব্য, বাণী, সিদ্ধান্ত, দর্শন ইত্যাদি ভাবের রদ-বদলও ঐ সকল মোলাকাতের ফলে সাধিত হ'তো কি?

সরকার—বর্তমানে একমাত্র ভাষা শুধ্‌রাবার কথাই বল্‌ছি। মতামতের কথা বল্‌ছি না। এখানে বলা আবশ্যক যে, নামজাদা লেখকেরাই বাংলা রচনা সম্বন্ধে আমার একমাত্র গুরু ছিলেন না। আমার চেয়ে যারা বয়সে ছোট, সেই ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদেরকেও আমি একালের মতন সেকালেও এবিষয়ে গুরু সম্‌ঝে চল্‌তাম। তাদের কাছে আমার লেখাগুলা পড়্‌তাম। শুধু তাই নয়, কোনো ছাত্রকে দিয়ে আড্ডায় ব'সে অন্যান্য ছাত্রদের নিকট পড়াতাম। নানা বয়সের লোকের সমালোচনা খেয়ে ভাষা শুধ্‌রানো ছিল আমার রেওয়াজ,—অথবা বাতিক। কারো কাছে পেয়েছি একটা বিশেষণ, কেউ দিয়েছে একটা ক্রিয়া, আবার কারো

ঝুলিতে ছিল হয়তো মাত্র একটা অব্যয়।

লেখক—এই সকল প্রবীণ-নবীন লোকজনের পরামর্শে আপনি উপকার পেয়েছেন মনে করেন?

সরকার—খুব বেশী। লেখাগুলাকে জলের মতন সোজা কর্‌বার হদিশ্‌ জুটেছে। সবচেয়ে বড় উপকারের কথা বলি। অনেক সময় কোনো-কোনো লোক আমার কথা বুঝ্‌তে পার্‌তো না। তখন আমি মনে ক'র্‌তাম যে, দোষটা শ্রোতার বা পাঠকের নয়—আমার নিজের। কোনো-না-কোনো গলদ্‌ আছেই আছে। এই কথাটা মনে রেখে লেগে যেতাম লেখাগুলাকে ঝাড়্‌তে-কাট্‌তে-বাছ্‌তে শুধ্‌রাতে-পালিশ্‌ কব্‌তে। নিজের দুর্ব্বলতা, দোষ-ত্রুটি আব অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে টন্‌টনে' জ্ঞান সর্বদাই ছিল—এখনো আছে। তা না হ'লে আমার লেখাগুলো কটু-কাটব্য হ'তে সামান্যমাত্র মুক্তিও পেতো না। আমার ভাষাটা কিঞ্চিৎ কিছু সহজ, সরল, স্পষ্ট, ও পরিষ্কার হ'য়েছে একথা বল্‌ছি না। যদি কিছু হ'য়ে থাকে, তার কারণ মাত্র এক। সর্বদাই বহুসংখ্যক আর বহু-মেজাজের লোককে নিজের পরীক্ষকভাবে ব্যবহার ক'রেছি, এইজন্য।

লেখক—আপনার গুরুর কি শেষ নেই?

সরকার—ঠিক ধ'রেছিস্‌। কে যে আমার গুরু নয় তাই জানি না। মুখ্‌খু লোককে শেখায় অনেকেই। তবুও তার বুদ্ধি খোলে না। আজ যদি কোনো লোক এসে বলে, "ওরে, তোকে আমি অমুক সালে প্রুফ্‌ দেখ্‌বার সময় ভাষাটা ঝেড়ে দিয়েছিলাম", তা হ'লে হয়তো তাকে আমি মিথ্যাবাদী বল্‌বো না। সে-ও আমার আর এক গুরু।

এই ধর্‌ না—তুই আমার কাছে ক'-দিন ধরে যাওয়া-আসা ক'র্‌ছিস্‌। তোর কাছেই কি আমি কম শিখ্‌ছি। তুইও আমার গুরু। শুধু ভাষা বিষয়েই নয়। অন্যান্য অনেক বিষয়ে। ও চম্‌কে গেলি বুঝি?

বাংলা গদ্যের ভবিষ্যৎ

লেখক—বাংলা গদ্য-রচনার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কোনো মত আছে?

সরকার—আমার বিশ্বাস,—বাংলা গল্প-রচনার গতি হীরেন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ও হরপ্রসাদের রচনা-রীতির দিকে। বাংলা ভাষায় যাঁরা আজকাল অল্পবিস্তর অথবা আস্‌মান-প্রমাণ পশার জমাতে পেরেছেন, তাঁদের অধিকাংশই এই পথের পথিক। আর সকলেরই অন্যতম বা প্রধান জন্মদাতা বঙ্কিমচন্দ্র।

লেখক—বঙ্কিমী ভাষার কোনো বিশেষত্ব আছে?

সরকার—বঙ্কিম-প্রদর্শিত পথটা বঙ্কিমেরই আবিষ্কৃত একথা বলা ঠিক হবে না। সত্যি কথা,—আবার একটা আহাম্মুকি চালাচ্ছি বোধ হয়,—প্রবন্ধ-সাহিত্যে বঙ্কিমী ভাষাটা অক্ষয় দত্তের "চারুপাঠ", আর বিদ্যাসাগরের "সীতাব বনবাস" ইত্যাদি বইয়ের ভাষার খানিকটা নিকট-আত্মীয়। অবশ্য ক্রমবিকাশ ত বটেই। সেকাল হ'তে আজকের আনন্দবাজার পত্রিকার সংবাদ-সাহিত্যের আর সম্পাদকীয় সাহিত্যের ভাষা পর্যন্ত,—বাংলা গদ্য মোটের উপর এক কাঠামেই চ'লেছে। তাকে আধুনিক গদ্যের সনাতন পথ বলা যেতে পারে। বোধিনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের রৈবিক বিশেষত্বগুলা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সহ প্রত্যেক ছোট-

বড়-মাঝারি লেখক সবাই এ বাঁধা পথের পথিক।

লেখক—সেই সনাতন পথের প্রকৃতি কিরূপ?

সরকার—সকল লেখকের বনিয়াদ সংস্কৃত শব্দ। কিন্তু প্রত্যেকেই চেষ্টা ক'রেছেন কম-বেশী সহজ ও অসংস্কৃত শব্দ প্রয়োগ কর্‌তে। এই গুলাকে কবিকঙ্কণের শব্দ বল্‌তে পারি,—কৃত্তিবাসী শব্দ বল্‌তে পারি, "হিতোপদেশে"র শব্দ বল্‌তে পারি—"কথামালা"র শব্দ বল্‌তে পারি। কেউ-কেউ এসব সহজ শব্দকে দেশী বা গ্রাম্য শব্দ বলে। আমি মাঝে-মাঝে এগুলাকে বারোয়ারীতলার শব্দ ও হাটবাজারের শব্দ ব'লে থাকি। এই শ্রেণীর শব্দের রাজ্যে রবি অদ্বিতীয়।

লেখক—সহজ শব্দের দৃষ্টান্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যে বেশী পাওয়া যায় কি?

সরকার—বিস্তর। যদিও গদ্যের কথা বল্‌ছি, তাঁর কবিতা থেকে একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। "কথামালা"র শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ পাই না বিশ্ব-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতায়। রবীন্দ্র-রচনা হ'তে "বধূ" কবিতার—

"মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে,"

—ইত্যাদি লাইনগুলা উদ্ধৃত কর্‌তে পারি। তোর মনে আছে বোধ হয়? এই কবিতাটির ভেতর একটাও যুক্তাক্ষরওয়ালা শব্দ আছে কিনা সন্দেহ। একেই বলে ভাষার উপর এক্‌তিয়ার। এই ধরণের সোজা, গ্রাম্য বা দেশী শব্দের জাহাজ রবীন্দ্র-গদ্য।

দেশী বা গ্রাম্য শব্দের রেওয়াজ

লেখক—এসব দেশী বা গ্রাম্য শব্দ বাংলা গদ্য-লেখকদের ভেতর আপনি কি অনেক দেখ্‌তে পান?

সরকার—হাঁ। এই শ্রেণীর শব্দ কোনো লেখকের আবহাওয়ায় শতকরা দশ-বারটা—কোনো লেখকের হয়তো দু'চারটা মাত্র। এমন কি বিদ্যাসাগরী বাংলায়ও "মাথা খাও", "দোহাই" ইত্যাদির রেওয়াজ আছে। গুন্‌তিতে অবশ্য এসব বেশী ছিল না। আবার উল্টা দৃষ্টান্তও দেওয়া যায়। একালের রামেন্দ্রসুন্দরও কোনো-কোনো রচনায় বিদ্যাসাগরী সংস্কৃত-বাহুল্যে গিয়ে ঠেকেছেন। কাজেই সোজাসুজি এক-তর্‌ফাভাবে আমার সূত্রটা খাটানো সম্ভব হবে না। দেশী শব্দের ব্যবহার কর্‌তে কে কত অভ্যস্ত তার ষ্টাটিস্‌টিক্‌স্ বা সংখ্যা-হিসাব আমি এখনো কষিনি। যদি কেউ ক'ষ্‌তে চায়, ভালই হয়। তাও একটা গবেষণার জিনিষ বটে।

("গুরু-চাণ্ডালি", ১৩ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—সেকালের আর একালের গদ্যে কি কোনো তফাৎ নেই?

সরকার—থাক্‌বে না কেন? একশ' বছরে দেশী শব্দের ধারায় বাড়্‌তি লক্ষ্য করা সম্ভব। প্রবীণতম অক্ষয় দত্তের রচনায় আর নবীনতম আনন্দবাজার পত্রিকার রচনায় পার্থক্য কি নেই? নিশ্চয়ই আছে। তফাৎটা দেখা যাবে প্রধানতঃ বা একমাত্র চল্‌তি, দেশী অর্থাৎ সোজা শব্দের শতকরা সংখ্যায়। তা ছাড়া আর কোনো বড়-প্রভেদ আছে কি না সন্দেহ।

সকলেই পারিত্‌-পক্ষে ছোটবহরের বাক্য ব্যবহার কর্‌তে অভ্যস্ত। সকলেরই প্রাণের

দরদ র'য়েছে পাঠকদের নিকট নিজেকে সুবোধ্য করা,—নিজের বক্তব্যগুলাকে সহজ-সরলভাবে প্রকাশ করা।

লেখক—বাংলা গদ্যের ধারা সম্বন্ধে আপনি আগামী ভবিষ্যতে কিরূপ পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—আমার মনে হচ্ছে,—আগামী বিশ-ত্রিশ বছরের ভেতর বাংলা রচনাতে সংস্কৃত অর্থাৎ কঠিন ও যুক্তাক্ষরশীল শব্দের অনুপাত বেশ-কিছু ক'মে আস্‌বে। অপরিচিত শব্দের ঠাঁইয়ে দেখা দেবে সুপরিচিত শব্দ।

লেখক—কী রকম দেশী বা গ্রাম্য শব্দের আমদানি আশা ক'রছেন?

সরকার—বাংলা রচনাবলীর ভেতর খাঁটি বাংলা অর্থাৎ অসংস্কৃত শব্দ ঝুড়ি-ঝুড়ি এসে পড়্‌বে। কোনো শব্দ পাড়াগেঁয়ে, কোনো শব্দ পাহাড়ী বা বুনো। যদি বা যুক্তাক্ষরওয়ালা শব্দ এসে পড়ে, সেগুলা হয়তো বাংলাদেশের কোনো-না-কোনো জেলার সুপ্রচলিত, অতি-পরিচিত সরস ও মোলায়েম শব্দ। বাঙালকে বাঙাল, রাঢ়ীকে রাঢ়ী,—এ ধরণের অনেক-কিছুই ছাপা-সাহিত্যের পাতে পড়্‌তে থাক্‌বে। কোনো-কোনো শব্দ আস্‌বে হয়তো নেপাল থেকে, আসাম থেকে, হিমালয়ের অপর পার থেকে। তিব্বতী শব্দ, চীনা শব্দ, বর্মী শব্দ, প্রাচ্য এশিয়ার শব্দ ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়্‌বে না। তারপর আমাদের সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, গারো, খাসী, কুকী, লেপ্‌চা, ভুটিয়া ইত্যাদি জাতের শব্দগুলা নামজাদা লেখকদের হাতে যখন-তখন দেখা যাবে। মোটের উপর,—এ শ্রেণীর শব্দের অনুপাত বেড়ে যেতে বাধ্য। তবে সংখ্যাশাস্ত্রের সাহায্যে এখনি বলতে পারছি না,—অনুপাতটা গড়-পড়্‌তা শতকরা কত দাঁড়াবে। এই গেল শব্দ সম্বন্ধে বাংলা গদ্য-রীতির সমীপবর্তী ভবিষ্যৎ।

("১৯৮০ সনের বাঙালী", ডিসেম্বর দ্রষ্টব্য)

গদ্য-রচনায় বাঙালী মেজাজ

লেখক—শব্দ ছাড়া আর কোনো দিকে গদ্য-রীতির পরিবর্তন দেখ্‌ছেন না?

সরকার—আর একটা কথা আছে। তা হচ্ছে রচনা-কৌশলের প্রাণের কথা। কি শরৎ চট্টোপাধ্যায়, কি হীরেন দত্ত, কি বঙ্কিম, কি বিদ্যাসাগর, কি অক্ষয় দত্ত সকলেই বাক্য-রচনায় একটা বাঙালী মেজাজ দেখিয়ে গেছেন। আগামী ভবিষ্যতেও সেই বাঙালী মেজাজেরই দিগ্বিজয় দেখ্‌তে পাবো।

লেখক—বাক্য-রচনায় বাঙালী মেজাজটা কী?

সরকার—অনেকবারই ব'লেছি। আবার বল্‌ছি। তা হচ্ছে ছোট বহরের বাক্য। গড়-পড়্‌তা ১৫-১৮-২০ শব্দে পরিপূর্ণ বাক্য রচনা হচ্ছে বাঙালীর মেজাজ-মাফিক্ ভাষা-সাধনা। প্রায় এক শ' বছরের অভিজ্ঞতা সাম্‌নে রয়েছে। তাই দেখে' একথা বল্‌ছি।

লেখক—বাঙালী মেজাজের দু-একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—ছোট বহরের বাক্য সম্বন্ধে আর কী বল্‌ব? আরও কতকগুলা লক্ষণ বাঙালীর ধাতে প্রায় সার্বজনিক ও সনাতন দাঁড়িয়ে গেছে। প্রথমতঃ, বাঙালী গদ্য-লেখকেরা সর্বনাম এড়িয়ে চল্‌তে চেষ্টা করে। তার বদলে বিশেষ্যের ব্যবহার এদের পছন্দসই। দ্বিতীয়ঃ, একাধিক কর্তার সংগে কোনো-একটা ক্রিয়ার যোগাযোগ বাঙালী লেখকেরা পছন্দ করে না।

ভিন্ন-ভিন্ন বিশেষ্যকে ভিন্ন-ভিন্ন ক্রিয়ার সংগে সংযুক্ত রাখার দিকে এদের ঝোঁক্। ফলতঃ, ক্রিয়ার বাহুল্য বাংলা গদ্যের স্পষ্টতা ও শক্তি বিধান করে। তৃতীয়তঃ, ইংরেজিতে আর জার্মাণে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়ার বিশেষস্বরূপ পরাধীন বাক্য বা "ক্লজ" খুব বেশী-বেশী চলে। কিন্তু বাঙালী মেজাজ এই ধরণের পরাধীন বাক্য বড়-একটা দেখ্‌তে চায় না। বস্তুতঃ, এ জন্যেই বাংলা ভাষায় ছোট-বহরের বাক্যের কদর ও প্রাধান্য। তার ফলেই জটিলতার লোপ আর স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতার আবহাওয়া।

বাঙালী মেজাজের যে-সকল লক্ষণ বিবৃত করা গেল, সে-সবের উল্টা কোনো লক্ষণ বাংলা ভাষায় নেই বা ছিল না, বা থাক্‌বে না,—এরূপ বল্‌ছি না। অধিকন্তু এই কয়টা লক্ষণই যে একমাত্র লক্ষণ,—তাও বুঝতে হবে না।

("ছোট বহরের বাক্য", ১৩ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

কাল-মাহাত্ম্য, বিপ্লব ও যুগান্তর

৭ই নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—আপনি কয়েকবার বিবেকানন্দ-যুগ, বংগ-বিপ্লবের যুগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন। ১৮৯৩, ১৯০৫ ইত্যাদি বৎসরও আপনার কথাবার্তার ভেতর একাধিকবার ব্যবহৃত হ'য়েছে। এসব যুগবিভাগ সম্বন্ধে আপনি একটু পরিষ্কার ক'রে কিছু বল্‌বেন?

সরকার—প্রত্যেক মানুষের জীবনেই,—চিন্তা ও কাজের ধরণ-ধারণ দেখে',—যুগবিভাগ করা সম্ভব। আমার বিশ্বাস,—মানুষের জীবনযাত্রা তিন-তিন মাস পর-পর, ছ'-ছ-মাস পর-পর বদ্‌লে' যায়। দেড়-দেড় বছর পর-পর অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে বেশ-কিছু পরিবর্তন দেখ্‌তে পায়। তিন বছর, পাঁচ বছর, বা সাত বছর মেয়াদ দিলে তো আরও বেশী ওলট-পালট দেখা যেতে বাধ্য।

আগে একবার ব'লেছি বয়স-তন্ত্র। এখন বল্‌ছি কাল-তন্ত্রের কথা। সময়ের প্রভাব খুব বেশী। (পৃঃ ১১১-১১২)

লেখক—এই সকল পরিবর্তন সম্বন্ধে আপনি কী বল্‌তে চাচ্ছেন?

সরকার—এরকম মেয়াদে পরিবর্তনগুলা খুব গভীর আকারে দেখা দেয়। পাঁচ বছর আগেকার জীবনের সংগে প্রায় কোনো লোকই তার বর্তমান জীবনের যোগাযোগ ঢুঁড়ে পায় না। মনে কর্,—কোনো দুই বন্ধু সাত বছর পরস্পরের সংগে দেখা কর্‌বার সুযোগ পায়নি। সাত বছর পর দেখা হ'লো। হুঁকোর নল-নল্‌চে বদ্‌লে যাওয়া কাকে বলে জানিস্? পুরাণা হুঁকোটার অস্তিত্বই নেই। একটা নয়া হুঁকো এসে হাজির। পাঁচ-সাত বৎসর পর ব্যক্তিত্বটা দু'জনেরই ঠিক যেন নল্-নল্‌চের মতো আগা-গোড়া বদ্‌লে গেছে মনে হবে। কাল-মাহাত্ম্য এতই বেশী। কালের অর্থ অভিজ্ঞতা ও ঘটনা।

লেখক—ব্যক্তিগত জীবনে কাল-মাহাত্ম্য বেশী কি?

সরকার—নিশ্চয়। সন-তারিখ সম্বন্ধে খুব-বেশী জোর দেওয়া উচিত। কোনো ঘটনা কবে ঘ'ট্‌ল জানা যেমন জরুরি, ক'দিন পরে ঘ'ট্‌ল তা জানাও তেমনি জরুরি। মানুষ মাত্রেরই জীবন বিপ্লবে পরিপূর্ণ। ছোটখাটো পরিবর্তন, ওলট্-পালট বা বিপ্লব অনুসারে আমি ব্যক্তিগত জীবনে যুগবিভাগ ক'রে থাকি। যাঁহা নতুন অভিজ্ঞতা, তাঁহা নতুন যুগ। যাঁহা নতুন ঘটনা,

তাঁহা নতুন যুগ।

লেখক—আপনি কি ব্যক্তিগত জীবনের যুগবিভাগ-প্রণালী জাতির, রাষ্ট্রের বা দেশের সম্বন্ধেও প্রয়োগ করতে চান?

সরকার—ঠিক তাই। আজ ১৯৪২ চল্‌ছে—নবেম্বরের প্রথম সপ্তাহ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র সুরু হ'য়েছে তিন বছর দু'মাস হ'লো (১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর)। এই সময়টুকুর ভেতর ইয়োরোপে চরম পবিবর্তন ঘ'টে গেছে। বিলাতে সাধিত হ'য়েছে একটা খাঁটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-বিপ্লব। ভারতবর্ষেই কি কম বিপ্লব ঘ'টেছে? তবুও দেশের বুকের উপর আসল লড়াইটা এসে হাজির হয় নি।

লেখক—১৯৪২ সনে আপনি ভারতবর্ষেও বিপ্লব দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—হাঁ, নিশ্চয়। ইংরেজেরা ১৯৩৯ সনে ভারতের নর-নারীকে একচোখে দেখ্‌তো। সেই গবর্ণমেণ্টই আজও র'য়েছে। কিন্তু আমাদের দেশকে এরা ঠিক সেই চোখে আর দেখ্‌ছে না। ১৯৩৯ সনে ভারতীয় জননায়কগণ নানাদলে বিভক্ত ছিল—নানা লোকের নানা আওযাজ শোনা যেতো। আজ সে সব দলও নেই, সে সব নেতাও নেই,—সে সব আওয়াজও নেই। আছে অন্য ঢংয়ের সংঘজীবন, অন্য ধরণের নেতৃত্ব, অন্য ধরণের চিন্তা ও কর্ম। এরই নাম পরিবর্তন, বিবর্তন, ওলট্‌-পালট্‌, বিপ্লব। আর,—যাঁহা বিপ্লব, তাঁহা যুগ। কয়েকদিন হ'ল গবর্ণমেন্ট স্বয়ংই এই সব বিপ্লবের কথা ব'লেছে। মায় মার্কিণ মুল্লুকেও ভারতীয় বিপ্লবের কথা আলোচিত হচ্ছে।

লেখক—লড়াইয়ের আবহাওয়ায় বিপ্লব ও যুগান্তর দেখা যেতে পারে মেনে নিলাম। কিন্তু অন্য সময়ে কিরূপ অবস্থা?

সরকার—সব কয়টা বিপ্লব অবশ্য একমাত্র লড়াইয়ের আমলে দেখা দেয় না। নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম আর ঘটনাগুলাও পরিবর্তনে ভরা, ওলট্‌-পালট্‌ময়, বিপ্লবপূর্ণ। প্রায় যে-কোন দেশ বা সমাজ সম্বন্ধেই দেড-তিন-পাঁচ-সাত বৎসর পর-পর বিপ্লব বুঝে' রাখা আমার দস্তুর। সংগে-সংগে যুগ-পরিবর্তন আর যুগান্তর ইত্যাদিও আমি দেখে থাকি।

যুগ ভাগ করার খেয়াল আমার অনেকদিন থেকেই র'য়েছে। স্বদেশী যুগের "গৃহস্থ" পত্রিকায় তার পরিচয় পাবি। "বিশ্বশক্তি" বইটাতে (১৯১৪) তখনকার আট-নয় বৎসরের সময়কে দুই-তিন যুগে বিভক্ত ক'রেছি।

বঙ্গ বিপ্লবের যুগ (১৯০৫-১৯)

লেখক—এই ধরণের বিপ্লব আর যুগ বা যুগান্তর কি আপনি ১৮৯৩, ১৯০৫ ইত্যাদি বৎসরের সংগে জুড়ে' রেখেছেন?

সরকার—হাঁ, ঠিক তাই। বাঙালীর বাচ্চা আমি,—বাঙালীর চোখে দুনিয়া দেখি। আমার কাছে ১৯০৫ হ'চ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর। এই সময় সুরু হয় গৌরবময় বংগ-বিপ্লব। এ একটা খাঁটি যুগান্তর। এই বংগ-বিপ্লব শেষ হ'লো কবে? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সোজা নয়। গভীরভাবে দেখ্‌লে ব'ল্‌তে হবে যে, এই বিপ্লব বা যুগান্তর আজও সমে এসে ঠেকে নি অর্থাৎ শেষ হয় নি। আর নেহাৎ ভাসা-ভাসাভাবে দেখ্‌লে ১৯০৫এর "স্বদেশী", "বয়কট", "স্বরাজ" আর "জাতীয় শিক্ষা"র আন্দোলন মাস-দুয়েক বা বৎসর-দেড়েকের

ভেতরই খতম হ'য়ে গিয়েছিল।

আমি বংগ-বিপ্লবকে সম্প্রতি অতি-লম্বা মেয়াদেও রূপ দিচ্ছি না আবার নেহাৎ ছোট বহরেও দেখ্‌ছি না। কয়েক বৎসর ধ'রে কতকগুলা ভিন্ন-ভিন্ন রকমের মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা ঘ'টেছিল। সেই সবগুলাকে স্বদেশী, স্বরাজ ইত্যাদি আন্দোলনের সংগে জুড়ে' দেওয়া আমার দস্তুর। কাজেই ১৯০৫এর পর অনেকদিন পর্যন্ত সেই বিপ্লব বা যুগান্তরের মেয়াদটা টেনে আনা যায়।

লেখক—আপনি ঐ যুগের কয়েকটা বড় বড় ঘটনা উল্লেখ কর্‌বেন যার জন্য আপনি স্বদেশী যুগেব মেয়াদ বাড়িয়ে দিচ্ছেন?

(“বঙ্গ-বিপ্লব কী?” ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—প্রথম, ১৯১১ সনে গবর্ণমেন্ট দু-টুক্‌রো করা বাংলাদেশকে পুনরায় জুড়ে' দিতে বাধ্য হ'য়েছিল। এই কাজের ভেতর যুবক বাংলার রাষ্ট্রিক জয়-জয়কার মূর্তি পেয়েছিল। এ একটা বিপ্লব বা যুগান্তর। আর একটা ঘটনা ১৯১৩ সালের। রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল প্রাইজ্। তামাম্ দুনিয়ায় জারি হ'য়ে গেল বংগবিপ্লবের সার্থকতা। জগতের লোক দেখ্‌লো বাঙালীর আত্মিক দিগ্বিজয়। এই ঘটনাও দুনিয়ায় বিপ্লব বা যুগান্তরের সামিল। এই সকল কারণে আমি বংগ-বিপ্লবের যুগ বল্‌লে ১৯০৫ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত সাত-আট বছর বুঝে' থাকি।

লেখক—নোবেল প্রাইজ পাওয়াটাকে আপনি যুগান্তর ভাবেন?

সরকার—আল্‌বৎ। রবি পেলেন নোবেল প্রাইজ,—আর আমি হ'য়ে গেলাম মাতাল বা পাগল। আমার মতন হাজার-হাজার বাঙালীও সুরু কর্‌লো মাতলামি আর পাগ্‌লামি। সেই সময়ে “গৃহস্থ” মাসিকের রবীন্দ্র-দিগ্‌বিজয়-সংখ্যা প্রকাশ করি। তাও একটা পাগ্‌লামি। কল্‌কাতার কোনো-কোনো মহলে হাসি-ঠাট্টা চ'লেছিল। ব'লেছিল আমি অতি-মাত্রায় আহাম্মুক বা গরু।

লেখক—তা হ'লে বংগ-বিপ্লবের যুগ শেষ ক'র্‌ছেন ১৯১৩ সনে?

সরকার—কর্‌তে আপত্তি নেই। আরও কিছু মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা এসে জুটেছে। সে হচ্ছে ১৯১৪ সন হ'তে ১৯১৮ পর্যন্ত মহালড়াই। তাকে আমি বলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্র। এই লড়াইয়ের সংগে-সংগে বা ফলস্বরূপ বাংলাদেশে ওলট্-পালট্ সাধিত হ'য়েছে অনেক। শিল্পকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাষ্ট্রিক আন্দোলন,—সবই নানাদিকে এগিয়ে গেছে বিস্তর। কাজেই বংগবিপ্লবের জের এই লড়াইয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে আনা আমার দস্তুর। তা হ'লে শেষ বৎসর হয় ১৯১৯ (ভার্সাই সন্ধি)। অতএব বংগ-বিপ্লবের যুগ বল্‌লে আমি বুঝি ১৯০৫ থেকে ১৯১৯।

বিবেকানন্দ-যুগ (১৮৯৩-১৯০৪)

লেখক—আপনি ১৯০৫ সনের যুগকে পেছনদিকে টেনে ১৮৯৩ পর্যন্ত ঠেকিয়েছেন কেন? (পৃঃ ৪৭-৪৯, ৭৫-৭৬)

সরকার—আমি বংগবিপ্লবের গোড়া বা আগা টুঁড়ছিলাম। ১৯০৫ সনের বাঙালী জাতের কর্ম ও চিন্তারাশি দিগ্বিজয়ের আকাঙ্ক্ষার ও সাধনার সংগে জড়িত। এই দিগ্বিজয়ের দৃষ্টান্ত অনতিদূর অতীতের কোথায়-কোথায় পাওয়া যায়,—এইটে হ'লো ভাব্‌বার কথা।

দেখ্‌লাম,—দিগ্বিজয়ের ঝাণ্ডা খাড়া ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দ। সেই দিগ্বিজয়ের সূত্রপাত বিবেকানন্দ'র শিকাগো-বক্তৃতা (১৮৯৩)। আমার বিচারে সেই বৎসরই সুরু হ'লো বিবেকানন্দ-যুগ। ১৮৯৩ হচ্ছে ১৯০৫-এর আত্মিক পূর্বপুরুষ।

লেখক—১৮৯৩ সনের শিকাগো-বক্তৃতা আপনার বিবেচনায় বিবেকানন্দ'র সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ?

সরকার—কোন্ কাজটা সর্বশ্রেষ্ঠ, কোন্ কাজটা মাঝারি-শ্রেষ্ঠ তার ওজন করা অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। কিন্তু শিকাগো-বক্তৃতা হচ্ছে আমার মগজে বিবেকানন্দী-দর্শনের সূত্রপাত। এই মুদ্দাই দেখ্‌তে পাবি নিম্নলিখিত রচনায়ঃ—

"যুবক ভারতে দেখায়েছ তুমি নব জীবনের পথ,
ভারতে স্বাধীন চিন্তাধারার তুমি বীর ভগীরথ!
বিশ্ববাসীরা চমকিল তব উদাত্ত আহ্বানে,—
হঠাৎ আবার ভারতের সাড়া কেন দুনিয়ার কানে?
বিরাট দুনিয়া চাহিছে এখনো ভারতের মহাদান,
হুঙ্কারে তব জাগিয়া উঠিল ভারতের সন্তান।
নব বিশ্বের নানান্ অভাব বিদূরিত করিবারে
এই জগতের কর্মক্ষেত্র ডাকিছে আবার তারে?
সিংহের মতন সাহস তোমার, বাঘের দীপ্ত নয়ন,—
এই তেজেতেই কর্‌বে ভারত জগৎ সংগঠন।
বেদান্ত আর শাস্ত্রমহিমা বুঝেছিলে কিনা স্বামি,
লভেছিলে কিনা গোপন তত্ত্ব, জানিনে কিছুই আমি।
জীবন-বেদের গোড়া আঁক্‌ড়ায়ে ধ'রেছিলে বীরবর,
সেই ওঙ্কারে তাজা প্রাণ এলো, ভারতে যুগান্তর!"

লেখক—এই কবিতাটা আবার কবে লিখ্‌লেন?

সরকার—লেখা হ'য়েছিল চীনের শাংহাইয়ে। ১৯১৬ সনের ৩০শে জুন। এটা প্রথম ছাপা হয় ১৯৩২ সনে কল্‌কাতায়। বিবেকানন্দ-জন্মোৎসবের সার্বজনিক সভা উপলক্ষ্যে। ছন্দটা ঝাড়িয়ে নিয়েছিলাম কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হাতে।

লেখক—বিবেকানন্দ-যুগ সমাপ্ত হ'লো কবে?

সরকার—সোজাসুজি জবাব দেবো বিবেকানন্দের মৃত্যুর সংগে-সংগে অর্থাৎ ১৯০২ সনে। কিন্তু এখানে সমস্যা উপস্থিত। কেন না বংগবিপ্লব দেখা দিল তার তিন বৎসর পর। এই তিন বৎসরের বড় বড় ঘটনা কী? তাই খতিয়ে দেখা আবশ্যক। আমার মেজাজে বিবেকানন্দ'র রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বর্তমান ভারতের সর্বোচ্চ ঘটনা। এর চেয়ে মহত্ত্বপূর্ণ জিনিষ ভারতের নর-নারী দেড়শ'-দুশ' বছরের ভেতর কিছু কর্‌তে পারে নি। এত বড় সার্থকতা লাভ আর কোনো ঘটনায় দেখ্‌ছি না। এই ঘটনার নানাপ্রকার তথ্য বিবেকানন্দ'র সম-সাময়িক ও পরবর্তী স্বামীজিদের জীবন-কথার ভেতর পাওয়া যায়। এইখানে পাচ্ছি অভেদানন্দকে। বিবেকানন্দ'র সহযোগী হিসাবে অভেদানন্দ বিদেশে ছিলেন প্রথমবার ১৮৯৬ থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত। কাজেই অভেদানন্দকে বিবেকানন্দ'র জের বিবেচনা করা আমার দস্তুর। এই উপায়ে আমি বিবেকানন্দ-যুগকে ১৯০৫ পর্যন্ত নিয়ে এসে ঠেকাতে পারি।

("অভেদানন্দ'র জীবন-বৃত্তান্ত", ১৯শে আগষ্ট ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

বৃহত্তর ভারতের কর্মিবৃন্দ

লেখক—রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের আপনি দুই কর্মবীরের নাম কর্‌লেন। তাঁরা দুজনেই রামকৃষ্ণের সন্তান, বেদান্ত-প্রচারক এবং ধর্ম-বক্তা। কিন্তু আপনি রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের ভেতর স্বামীজিদের দলের বহির্ভূত অন্যান্য কর্মবীর ও চিন্তাবীরদের দানও স্বীকার ক'র্‌তে অভ্যস্ত। এবার জান্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে,—১৯০৫-১৪ সনের যুগে বৃহত্তর ভারত প্রতিষ্ঠার কাজে স্বামীজিদের দলের বহির্ভূত কোন্‌-কোন্‌ শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিলেন?

("রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য", ২৩শে আগষ্ট ১৯৪২, "রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্য", ৪ঠা নবেম্বর "বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ", ১১ই নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—আমেরিকার কথা ব'লে বুঝাচ্ছি। মার্কিণ মুল্লুকে বৃহত্তর ভারতের কর্মকর্তা হিসাবে ভারতীয় ছাত্রেরা এক বড় দল। এরা স্বামীজিদের দলের বহির্ভূত কর্মদক্ষ স্বদেশ-সেবক। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের আকার-প্রকার এই ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে যারপরনাই বেড়ে গেছে।

লেখক—এই সম্বন্ধে আপনার নিজের অভিজ্ঞতা আছে?

সরকার—১৯১৪ সনে নবেম্বর মাসে লণ্ডন হ'তে আমি প্রথম আমেরিকায় পৌঁছি। দ্বিতীয়বার আমেরিকায় পৌঁছি ১৯১৬ সনের নবেম্বর মাসে। চীন-জাপান হ'তে। তখন হ'তে ১৯২০-এর নবেম্বর পর্যন্ত আমেরিকায়ই ছিলাম। এই সময়ে লক্ষ্য ক'রেছি আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের জীবন।

লেখক—কী দেখ্‌লেন?

সরকার—দেখ্‌লাম,—যুবক ভারত মার্কিণ মুল্লুকের ছোট-বড়-মাঝারি শহরে অসংখ্য মার্কিণ নরনারীকে ভারত-বন্ধুর দলে টেনে আন্‌তে পেরেছে। বণিক্‌, ব্যাঙ্কার, কারখানার কর্মাধ্যক্ষ, এঞ্জিনিয়ার, রাসায়নিক, ডাক্তার, অধ্যাপক, কবি, গল্পলেখক, সংবাদপত্রসেবী,—সকল শ্রেণীর মার্কিণ নরনারী ভারতীয় ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছে। দেখেছি পরস্পরের যোগাযোগ ছিল বন্ধুত্বময় ও অতিবিস্তীর্ণ। ভারতীয় ছাত্রদেরকে মার্কিণ নরনারী বিচক্ষণ কর্মবীররূপে সম্বর্ধনা কর্‌তো। ভারতীয় ছাত্রেরা মার্কিণ ছাত্রদের তুলনায় মার্কিণ সমাজের কাছে উঁচুদরের ইজ্জৎ পেতো। ভারতীয় ছাত্রদের মার্কিণ কাজকর্ম দেখে আমার তাক্‌ লেগে গিয়েছিল। (পৃঃ ১৪৭-১৪৮)

লেখক—বিদেশে যুবক ভারতের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আপনি কখনো কিছু লিখেছেন?

সরকার—"বর্তমান-জগৎ" গ্রন্থাবলীর হাজার-পাঁচেক পৃষ্ঠার ভেতর অনেক জায়গায় পাবি যুবক ভারতের তারিফ্‌। ছোট্ট নমুনা দেখাচ্ছি। ১৯১৬ সনে আমি জাপানে ছিলাম। ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে "বাঙালী" নামে একটা কবিতা ঝেড়েছিলাম। তার কিয়দংশ নিম্নরূপ ঃ—

"পরাজয়ে ডর নাই যাদের, আশা নাই বুঝে'
তবুও কর্তব্য করে দিবায় নিশায়,
ভারতের প্রাণ, এশিয়ার মান ছড়ায় যারা
আলাস্কা, তুর্কী, আফ্রিকা, ফ্রান্স, চীন, আর্জেন্টিনায়,
বিশ্বের জ্ঞান হজম করা, আর বাড়িয়ে দেওয়া
বিশ্বশক্তি যাবা বুঝে আসল জীবন

আধ্-পেটা-খাওয়া ডানপিটে সেই বাঙালী
মোরা জন্মেছি কর্‌তে অসাধ্য সাধন।"

এই আমার যুবক ভারত। বৃহত্তর ভারত বা রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের গঠনকার্যে ভারতীয় যুবকেরা সর্বদাই রয়েছে পাকা মিস্ত্রী আর এঞ্জিনিয়ার। স্বামীজিদের সংগে-সংগে ছাত্রবীরদের কৃতিত্ব সর্বদাই চোখে রাখ্‌তে হবে।

লেখক—বৃহত্তর ভারতের এই সকল ছাত্রবীরদের ভেতর কয়েকজনের নাম মনে আছে?

সরকার—এই ছাত্রদলের ভেতর মারাঠা ছিল, মাদ্রাজী ছিল, পাঞ্জাবী ছিল আর বাঙালী তো ছিলই। হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। বেশী লোকের নাম ক'রে দরকার নেই। একালের "বৃহত্তর ভারত"-প্রতিষ্ঠাতা অনেকের নাম আমি কোনো-কোনো বইয়ে প্রকাশ ক'রেছি। "সোশিওলজি অব্ রেসেজ" বইটা (১৯২২, ১৯৩৯) দেখ্‌তে পারিস্।

আমেরিকায় ভারতীয় ছাত্রদের আন্দোলন সুরু হয় ভারতে বংগ-বিপ্লবের সংগে-সংগে (১৯০৫)। এই বংগবিপ্লবেরই অন্যতম জের ভারতবাসীর জাপান-গমন, আমেরিকা-গমন, জার্মাণি-গমন ইত্যাদি। মার্কিণ কর্মক্ষেত্রে কয়েকজন বাঙালী ছাত্রকে বেশ উজ্জ্বল মূর্তিতে দেখ্‌তে পাই। কেহ-কেহ আজকাল নানাক্ষেত্রে সুবিদিত।

লেখক—কয়েকজনের নাম করুন না?

সরকার—এক জনের নাম তারকনাথ দাশ। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে ইনি একাধিক গ্রন্থের লেখক। আর একজন সুরেন কর। ইনি ছিলেন বিদেশে ভারতীয় সংবাদ-প্রচারক। খগেন দাশগুপ্ত'র নাম শুনেছিস্ বোধ হয়? ইনি কল্‌কাতায় রাসায়নিক কারখানা চালাচ্ছেন। আর এক জন রফি আহম্মদ। ইনি কল্‌কাতায় দাঁতের কলেজ কায়েম ক'রেছেন। আর একজন সুরেন্দ্রমোহন বসু। ইনি বর্ষাতির কারখানা খাড়া ক'রে ভারতে যশস্বী। যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ার ব্রহ্মবিহারী সরকারের নামও কর্‌তে পারি। নৃতত্ত্ববিদ ভূপেন দত্তকে তো জানিস্ই। তাঁকেও এদলের ভেতর ফেল্‌বো। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থলেখক বসন্তকুমার রায়, "ফিফ্‌টীন ইয়ার্স ইন আমেরিকা" (আমেরিকায় পনর বৎসর)—লেখক সুধীন বসু, বণিক্ হেমেন্দ্র রক্ষিত-মজুর-শাস্ত্রী রজনী দাশ ইত্যাদি কয়েকজন তারক দাশের মতন আজও আমেরিকা-প্রবাসী। বানেশ্বর দাশের কাজ উল্লেখযোগ্য। ইনি রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অন্তর্গত যাদবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। অখিল চক্রবর্ত্তী যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ার। ইনি নলকূপ ইত্যাদির ব্যবসা করেন। বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ার বীরেন দাশগুপ্ত'র বর্তমান ব্যবসা যন্ত্রপাতির আমদানি। শৈলেন ঘোষ আজকাল ঢাকায় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল।

এই ধরণের বাঙালী-অবাঙালী, হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের কাজকর্মের ফলে আমেরিকায় বৃহত্তর ভারত বেশ-কিছু বাড়্‌তির পথে অগ্রসর হ'য়েছে।

লেখক—ভারতীয় ছাত্রদের মার্কিণ কাজ-কর্মের ফলাফল সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌তে পারেন?

সরকার—বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের যুগে (১৯১৪-১৮) বহু-সংখ্যক মার্কিণ নরনারী ব্যক্তিগত ভাবে অথবা দলবদ্ধ হিসাবে ভারতীয় রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী হ'য়েছিল। লাজপত রায় ইত্যাদি রাষ্ট্রিক ধুরন্ধরদের কাজকর্মে অনেক মার্কিণ স্ত্রীপুরুষ সাহায্য ক'রেছিল (১৯১৭-২০)। মার্কিণ পাদ্রী হোম্‌স্ গান্ধিকে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ রূপে প্রচার ক'রেছিলেন (১৯২২)। তারপর হ'তে মার্কিণ নরনারী ভারতীয় স্বাধীনতার দিকে বেশ-কিছু এগিয়েছে। ১৯৩৯ সনে সুরু হ'য়েছে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র। এই আবহাওয়ায়ও অনেক মার্কিণ

ব্যক্তি, সঙ্ঘ, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ভারতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে রয়েছে। এই সকল কাজের ভেতর ভারতীয় ছাত্রদের প্রভাব খুব সোজাসুজি ও স্পষ্টভাবে দেখ্‌তে হবে। (পৃঃ ২৪৩-৪৫)

"ভারতীয় সংস্কৃতির দূত" (১৯১৪)

লেখক—আপনি ১৯১৪ সনে দেশ থেকে বাইরে গেলেন। প্রথমবার প্রায় বার বৎসর বিদেশ ছিলেন শুনেছি। বিভিন্ন দেশে আপনার কাজকর্ম কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল? অন্যান্য ভারতীয় কর্মীদের সংগে আপনার যোগাযোগ ছিল কি?

সরকার—বিদেশে গিয়ে দেখ্‌লাম বৃহত্তর ভারত দুই বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতবাসীদের কর্ম্মদক্ষতায় পুষ্ট হচ্ছে। প্রথমতঃ, রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামীজিদের দল; দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ছাত্রদের দল। এই দুই দল বিভিন্ন পথে কাজ ক'র্‌তো। কিন্তু পরস্পরের সংগে যোগাযোগ ছিল—বন্ধুত্বও ছিল। কাজেই আমার পক্ষে দরকার হ'লো একটা নতুন পথ তৈরী কর্‌বার। (পৃঃ ১৪৭)

লেখক—এই নতুন পথটা কিরূপ?

সরকার—আমি বেছে নিলাম প্রধানতঃ মস্তিষ্কজীবী নরনারীর সমাজ,—গবেষক, লেখক, অধ্যাপক, পরিষদ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়। এই সবের ভেতর আনাগোনা করা ছিল আমার মেজাজ-মাফিক্ কাজ। মার্কিণ নরনারী ভারতবর্ষের সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে এই অধমকে প্রকারান্তরে ভারতীয় প্রতিনিধি ঠাওরে নিল। সেই সময়ে ভারতবর্ষ থেকে অনেকে আমাকে চিঠি লিখ্‌তো। তারা আমাকে "ভারতীয় সংস্কৃতির দূত" (কালচার‍্যাল অ্যাম্ব্যাস্যাডার) বল্‌তো। এতে অবশ্য আমার পেট গরম হ'য়ে পড়েনি।

লেখক—বিদেশী সুধীগণের মহলে আপনার কর্মপথটা কিরূপ ছিল?

সরকার—আমি মোটের উপর দুই রকম কর্মকেন্দ্র পেয়েছি। প্রথমতঃ, পরিষৎ-পত্রিকা। সুধী-সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকায় লেখা-লেখি করা ছিল আমার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা তার সমশ্রেণীভুক্ত প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা ছিল আমার অন্যতম পেশা। ফলারে' বামুনরা যা ক'রে থাকে। "সতীশ-মণ্ডলে"'র আর "ব্রজেন্দ্র-মণ্ডলে"'র যুগে অম্বিকা উকিল, মনোমোহন ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি প্রবীণরা আমার সম্বন্ধে বল্‌তেন ঃ—"বামুনদের সঙ্গে থেকে-থেকে ছোক্‌রা বামুন হ'য়ে গেছে" (১৯১০-১২)। যা'হক,—সেই বামনামি চালিয়েছি আমেরিকায়। বলা বাহুল্য, অন্য দুই ভারতীয় দলের সংগে আমার সহযোগিতা ছিল দস্তুরমতন। তাদের মার্কিণ বন্ধুর অনেকেই আমার বন্ধুবর্গের অন্তর্গতও ছিল।

লেখক—আপনার কয়েকজন মার্কিণ বন্ধুর নাম ক'র্‌বেন? আমেরিকায় লেখাপড়ার আর দেখাশুনার একটু আন্দাজ দেবেন?

সরকার—দু'চারজন বা দশ-বিশ জন মাত্র নয়। দুইবারে সবশুদ্ধ আমেরিকায় কাটে প্রায় সাড়ে চার বৎসর। আর আমার "বর্তমান জগৎ"-পর্যটন ছিল বিশ্বগ্রাসী। কোনো-কিছুই বাদ যায় নি। কি প্রতিষ্ঠান, কি আন্দোলন, কি ব্যক্তি,—সব-কিছুই ছিল গুনতিতে অনেক। অধিকন্তু অনেক বিদ্যার সংগেই ছোঁআছুঁয়ি ছিল। তবে ভবিষ্যতে কাজে লাগাবার মতলবে,—নিজের

"বিদ্যা বাড়াবার" জন্য,—বেছে নিয়েছিলাম মাত্র তিনটা বিজ্ঞান,—ধর্মবিজ্ঞান, দর্শন, নৃতত্ত্ব। আমার বক্তৃতা ও লেখালেখির বিষয় ছিল এশিয়ায় ও ইয়োরামেরিকায় তুলনাসাধন। তার জন্য বিশেষভাবে গবেষণার দরকার হ'তো ভারতীয় সংস্কৃতির নানা তথ্য সম্বন্ধে। অন্যান্য অনেক-কিছু তো ছিলই। মার্কিণ-প্রবাসের কথা পাবি "ইয়াঙ্কিস্থান বা অতিরঞ্জিত ইয়োরোপ" বইটার ভেতর।

লেখক—কোন্-কোন্ মার্কিণ পরিষৎ-পত্রিকায় আপনার লেখা বেরিয়েছে?

সরকার—নানা বইয়েব ভূমিকায় সেইসব মার্কিণ পত্রিকার নাম উল্লেখ ক'রে দেওয়া আছে। কয়েকটার নাম দিয়ে যাচ্ছি, যথা ঃ—ইন্টার্ন্যাশন্যাল জার্ন্যাল অব এথিক্‌স্, সায়েন্টিফিক মান্থলি, স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটি, আমেরিকান পোলিটিক্যাল সায়েন্স রিভিউ, অ্যানাল্‌স্ অব দি আমেরিকান অ্যাক্যাডেমি অব পোলিটিক্যাল অ্যাণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স, পোলিটিক্যাল সায়েন্স কোয়ার্টার্লি, ওপন কোর্ট, জার্ন্যাল অব্ রেস-ডেভেলপ্‌মেন্ট জার্ন্যাল অব ইন্টার্ন্যাশান্যাল রেলেশ্যন্‌স্ ইত্যাদি। কোনো-কোনো পত্রিকায় একাধিক রচনা বেরিয়েছিল (১৯১৮-২১)।

লেখক—কোন্-কোন্ মার্কিণ পণ্ডিতের সঙ্গে মাখামাখি ছিল আপনার খুব বেশী?

সরকার—তাব সংখ্যাও ছোট নয়। তবুও মাত্র দুজনের নাম ক'র্‌ছি। দুজনই নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক। একজন অর্থশাস্ত্রী সেলিগ্‌ম্যান। আর একজন দার্শনিক ডুয়ী। এঁরা দুজনে মিলে আমার লেখাগুলা বিভিন্ন পরিষৎ-পত্রিকায় ছাপ্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিতেন। নিউ ইয়র্ক শহরের দর্শন-শাস্ত্রী, অর্থ-শাস্ত্রী, রাষ্ট্র-শাস্ত্রী, সমাজ-শাস্ত্রী, সাহিত্য-শাস্ত্রী, নৃতত্ত্ব-শাস্ত্রী, চীনশাস্ত্রী, ভারত-শাস্ত্রী ইত্যাদি অধ্যাপকদের অনেকের সঙ্গেই যাওয়া-আসা ছিল।

লেখক—দুএকজন নৃতত্ত্ববিদ্ মার্কিণ বন্ধুদের নাম করুন।

সরকার—নিউইয়র্কে ছিল প্রধান ঠিকানা ও বাড়ীঘর। কাজেই সেখানকার নৃতত্ত্বশাস্ত্রীদের ভেতর "এক গেলাসের ইয়ার" ছিল অনেকেই। আমাদের একটা ক্লাব ছিল। "ইউনিকর্ণ" (এক-শিঙে জানোআর) নামে ক্লাব ব'স্‌ত। মাসে দুবার। গোল্ড্‌নভাইজারের বাড়ীতে। কখনো-কখনো হোটেলে। গুল্‌তান চলতো রাত্রি একটা পর্যন্ত। গোল্ড্‌নভাইজার সেকালের বুড়ো নৃতত্ত্বশাস্ত্রী বোআজের শিষ্য।

লোভি, গডার্ড ইত্যাদি অনেকেই সেই আড্ডায় হাজির থাক্‌তো। চিকিৎসা-শাস্ত্রী, ফ্রয়েড-শাস্ত্রী, চিত্ত-শাস্ত্রী, আন্তর্জাতিক আইন-শাস্ত্রী ইত্যাদি ধরণের পণ্ডিতও এক-শিঙেদের এক-বগ্‌গামিতে নাম-লেখানো ছিল। হৈ-হৈ চল্‌তো খুব। কারু-কারু লেখা বইয়ের বা প্রবন্ধের প্রুফ দেখা হ'তো একসঙ্গে। আমাকে বিদায় দিবার দিন মজলিশ চ'লেছিল এক হোটেলে রাত দু তিনটা পর্যন্ত।

ফরাসী, জার্মাণ আর ইতালিয়ান ভাষা

লেখক—আপনি আমেরিকা ছাড়া ইয়োরোপের নানা দেশেও তো গেছেন। সে-সব দেশে আপনার কাজ-কর্মের রীতি কিরূপ ছিল?

সরকার—১৯২০-এর নবেম্বর থেকে ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমি ফ্রান্স, জার্মাণি,

অষ্ট্রিয়া, সুইট্সারল্যাণ্ড ও ইতালিতে কাটাই। এইসব দেশেও আমি আমার মার্কিণ-প্রবাসের রীতিমাফিক্ জীবন চালিয়েছি। তফাৎ শুধু ভাষায়। আমেরিকায় ছিল ইংরেজিতে লেখালেখি আর বকাবকি। ইয়োরোপে হ'লো ফরাসীতে, জার্মাণে আর ইতালিয়ানে প্রবন্ধ-রচনা ও বক্তৃতা।

লেখক—ফ্রান্স, জার্মাণি, ইতালি ইত্যাদি দেশে ভারতবাসীর পক্ষে একমাত্র ইংরেজি ভাষার সাহায্যে কতখানি কাজ করা সম্ভব?

সরকার—বেশী কাজ করা সম্ভব নয়। কেননা ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান ইত্যাদি সমাজের ব্যবসায়ী, রাষ্ট্রিক আর সাংস্কৃতিক মহলে ইংরেজি-জানা লোক মাত্র দুচারজন দেখা যায়। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ইংরেজিতে কথা বল্‌তে পারে না। ইংরেজিতে বক্তৃতা বুঝাও তাদের অনেকের পক্ষে কঠিন। এই সকল ভাষায় অনভিজ্ঞ ভারত-সন্তানের পক্ষে বিশেষ অসুবিধায় পড়্‌তে হয়। জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা ত চল্‌তেই পারে না। তবে প্রত্যেক ভারতসন্তানই নিজ-নিজ পরিচিত দু-একজন ইংরেজি-জানা ফরাসী, জার্মাণ বা ইতালিয়ানের সাহায্যে কাজ চালিয়ে নেয়। তাতে বেশী লাভ হয় না।

লেখক—আপনি ঐ সকল দেশে তো অনেক দিন ছিলেন? কাজ চালাতেন কী ক'রে?

সরকার—ঘটনাচক্রে ভাষা ক'টা শিখে নিয়েছিলাম। কাজেই ইংরেজির সাহায্য নিতে হয় নি।

লেখক—ফরাসী, জার্মাণ আর ইতালিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ ভাষায় বক্তৃতা ক'রেছেন? ঐ সকল দেশের পত্রিকায় লিখেছেন কোন্ ভাষায়?

সরকার—ফরাসী, জার্মাণ আর ইতালিয়ানে।

("রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য", : ২৩শে আগষ্ট, "রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্য", ৪ঠা নভেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ (১৯২০-৪২)

১১ই নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—আপনি বর্তমান ভারতের যুগবিভাগ সম্বন্ধে বিবেকানন্দ-যুগ আর বংগ-বিপ্লবের যুগ উল্লেখ ক'র্‌লেন। তাতে ১৯১৯ পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। ১৯২০ থেকে আজ পর্যন্ত কী যুগ চ'লেছে,—মনে করেন?

সরকার—১৯২০-৪২এর ঘটনাগুলা বৈচিত্র্যময়। এযুগ ভারতবাসীর পক্ষে খুবই মহত্ত্বপূর্ণ। ১৯৪২-এর পরবর্তী ভারতীয় নরনারী নতুন সুরতে দেখা দেবে। ভারতের অন্যতম অংগ হিসাবে বাঙালী জাতও নানা কর্মক্ষেত্রে দিগ্বিজয়ের পর দিগ্বিজয় চালিয়ে চ'লেছে। কাজেই এই সবের জন্য একটা সরস, শাঁসাল ও মূল্যপূর্ণ নাম বের করা সহজ নয়। অনেকবার মনে হ'য়েছে,—রাষ্ট্রিক হিসাবে এই যুগটা গান্ধির যুগ। কিন্তু সংস্কৃতির কথা ভাব্‌লে আর একটা নাম বের করতে ইচ্ছা হয়। এজন্য কোনো-কোনো সময় গোটা ভারতের জন্য একে আমি "বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ" বলি।

লেখক—কেন? "বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ" শব্দটা কি সরস ও শাঁসাল? হীরালাল হালদারের লেখালেখি সম্পর্কে আপনি এই শব্দটা ব্যবহার ক'রেছেন বটে। কিন্তু আপনার এই

পারিভাষিক মানান-সই কি? (পৃঃ ৮৯-৯০)

সরকার—১৯২০-এর আগে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমানা বাড়াবার কাজে একপ্রকার কিছুই করেনি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবশ্য ১৯১৪ সনের আগেই এই কাজ কিছু-কিছু সুরু হ'য়েছিল। তবে দুনিয়ার লোক ভারতীয় পাণ্ডিত্যের নিদর্শন মাত্র এই বিশ-বাইশ বছর ধ'রে উল্লেখযোগ্য আকারে দেখতে পাচ্ছে। এই বিশ-বাইশ বছরের ভারতীয় গবেষণা ও গ্রন্থপ্রকাশ এবং পরিষদ্-প্রতিষ্ঠা ও বৈজ্ঞানিক সম্মেলন ইত্যাদি কাজকর্ম ফেলিতব্য চিজ্ নয়। এ সব যারপরনাই মূল্যবান। কিন্তু গবেষণা ও সম্মেলন ইত্যাদি কৃতিত্বগুলা প্রায় সবই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহিত সুজড়িত। মনে রাখিস্,—শুধু বাংলাদেশ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলছি না। গোটা ভারতেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলা ভারতীয় মগজের দান পুষ্ট করবার জন্য খানিকটা উঠে-পড়ে' লেগেছে। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কাজগুলা মোটের উপর ১৯২০ সনে সুরু হ'য়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো-কোনো গবেষক ১৯১৭-১৮ সনেই নাম ক'রেছিল।

("দিগ্‌বিজয়ী কাকে বলে?" ৪ঠা নবেম্বর, "প্রফুল্লচন্দ্রের চেলার দল", "বোস-ইন্‌স্টিটিউট", ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাহিরে কি কোনো গবেষণা হ'তো না, না হচ্ছে না?

সরকার—হ'তোও বটে, হচ্ছেও বটে। বস্তুতঃ ১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের জন্মের সঙ্গে গবেষণা, অনুসন্ধান, গ্রন্থপ্রকাশ ইত্যাদি জিনিষের দরদ সুরু হয়। কিন্তু পরিষদের টাকার অভাব। শেষ পর্যন্ত সরকারী সাহায্য ছাড়া এসব কাজ উল্লেখযোগ্যরূপে সম্ভবপর হ'লো না। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবকে একটা স্বতন্ত্র ইজ্জৎ দিচ্ছি। বাংলাদেশের পক্ষে—আর খানিকটা ভারতের পক্ষেও—আশুতোষ এই "বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগে"র অন্যতম প্রবর্তক।

("প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাসের দরদ", ৩০শে আগষ্ট, "জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ, ১৪ই অক্টোবর, "জাতীয় শিক্ষা ও আশুতোষ" ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—আপনার বিবৃত তৃতীয় যুগে বৃহত্তর ভারতের কাজকর্ম কেমন চল্‌ছে?

সরকার—অন্যান্য দুই যুগের মতনই সমানভাবে। তবে ১৯২০-৪২ সনে যুগে বিদেশে ভারতীয় কাজের আকার-প্রকার ও বহর বেড়ে গেছে বিস্তর। কাজ চ'লেছে প্রধানতঃ চার পথে ঃ—

প্রথমতঃ, রামকৃষ্ণ-মিশনের স্বামীজিদের পথ। দুনিয়ার অনেক দেশে বেদান্ত-সমিতি কায়েম হ'য়েছে। বহুসংখ্যক স্বামীজি আজকাল উত্তর আমেরিকায়, ইয়োরোপে, আর দক্ষিণ আমেরিকায় মোতায়েন আছেন।

দ্বিতীয়তঃ, ছাত্র-ছাত্রীদের পথ। ইয়োরামেরিকার নানা-দেশে আর জাপানে ভারতীয় ছাত্রের দল অন্যতম সামাজিক শক্তিতে পরিণত হ'য়েছে।

তৃতীয়তঃ—গবেষক-লেখক-অধ্যাপকদের পথ। এই বিশ-বাইশ বছরের ভেতর বহুসংখ্যক ভারতীয় গবেষক, লেখক ও অধ্যাপক দুনিয়ার নানা দেশে পর্যটনের সুযোগ পেয়েছেন। তাঁদের গবেষণার ফলসমূহ ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন পরিষৎ-পত্রিকায় বেরিয়েছে। দেশ-বিদেশের বহুসংখ্যক সম্মেলনে, পরিষদে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁরা নিমন্ত্রিত হ'য়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। এক কথায়, নানা প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভারতীয় প্রতিনিধি বিদেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে "ভারতীয় সংস্কৃতির দূত" রূপে চলাফেরা করবার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। জগতের

সুধী-সমাজের সংগে ভারতীয় সুধী-সমাজের সমানে-সমানে লেনদেন বেশ-কিছু বেড়ে গিয়েছে। (পৃষ্ঠা ১৯৭)

চতুর্থতঃ, বণিক-শিল্পীদের পথ। এই বিশ-বাইশ বছরের যুগে ভারতীয় ব্যবসাদার, ব্যাংকার, বীমা-বণিক, এঞ্জিনিয়ার, কারখানা-পরিচালক, মজুর-সেবক ইত্যাদি শ্রেণীর করিৎকর্মা লোক দুনিয়ার নানাদেশের সমশ্রেণীর লোকের সংগে মেলামেশা ক'র্‌তে পেরেছেন। জগতের শিল্প-বাণিজ্যক্ষেত্রে ভারতীয় বণিক-শিল্পীদের ঠিকানা কায়েম হ'য়েছে বলা যেতে পারে। এই পথের কর্মী দ্বিতীয় যুগে (১৯০৫-১৯) অপেক্ষাকৃত কম ছিল। তৃতীয় যুগে ভারতীয় শিল্প-বণিক-মজুরসেবক দেশবিদেশে অনেকটা সুপরিচিত ব্যক্তি।

("বিদেশে নাম করা", ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—বৃহত্তর ভারতের ভেতরকার রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কথা তো কিছু বল্‌লেন না?

সরকার—রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য অ-রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজিরা রাষ্ট্রিক আন্দোলনে হিস্যা নিতে অভ্যস্ত নন। বৃহত্তর ভারতের সর্বত্রই রাষ্ট্রিক আন্দোলন চলেছে ১৮৯৩ সন হ'তে তিন যুগ ধ'রেই। কি বিবেকানন্দ-যুগ (১৮৯৩-১৯০৪), কি বংগ-বিপ্লবের যুগ (১৯০৫-১৯), কি বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ বা গান্ধিযুগ (১৯২০-৪২),—তিন যুগই রাষ্ট্রিক আন্দোলনের কাজকর্মে ভরপুর।

বলা বাহুল্য, রাষ্ট্রিক আন্দোলন চালাবার জন্য স্বতন্ত্র ভারতীয় দল অল্প-বিস্তর বিদেশের বড়-বড় ডিহিতে হাজির আছে। বিদেশে ভারতের রাষ্ট্রিক আন্দোলনের পথকে স্বতন্ত্র—পঞ্চম—পথরূপে বিবৃত করা আবশ্যক। "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহারের" অন্যতম উপায় ভাবে এই পথের কিম্মৎ খুব বেশী।

সেকালে "বিশ্বশক্তি" নামে একটা আমার বই বেরিয়েছিল (১৯১৩-১৪)। "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানব-জাতির আশা" নামক বাংলা ও ইংরেজি রচনায়ও (১৯১১, ১৯১২) বিশ্ব-শক্তির বিশ্লেষণ আসল কথা। সে-সব বাড়িয়ে একটা বড় বই লেখা উচিত।

বণিক, মজুর, রাষ্ট্রিক ও পণ্ডিত

লেখক—আপনার অর্থনৈতিক মতামতসমূহকে আজকাল লোকেরা কী চোখে দেখে?

সরকার—তা বলা সহজ নয়। তবে চোখও আছে, কানও আছে। পত্রিকায় সমালোচনাগুলা প'ড়েছি। আর লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তায়ও কিছু-কিছু বুঝ্‌তে পারা যায়। মনে হচ্ছে যে,—যারা কারখানা চালায়, ব্যাঙ্ক চালায়, বীমা চালায়, আমদানি-রপ্তানির কাজ করে তাদের অনেকে এই অধমের মতগুলা আজকাল নেহাৎ গাঁজাখুরি বিবেচনা করে না। তারা দেখ্‌ছে যে, যখন-তখন দিন-রাত রাষ্ট্র-নীতির দোহাই দিলে ব্যাঙ্ক-বীমাও বাড়ানো যাবে না আর কারবারও ফুলিয়ে তোলা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা যাই হ'ক, আর্থিক আইন-কানুনের অবস্থা যাই হ'ক্‌—ব্যবসাদারকে ব্যবসা চালাতেই হবে, টাকা রোজগার কর্‌তে হবে, আর আয় বাড়াতে হবে। কাজেই রাষ্ট্রনীতি হ'তে মুক্ত ধনবিজ্ঞানের মক্কেল খাঁটি শিল্পী-বণিক-ব্যবসাদার মহলে বাড়্‌ছে। ব্যবসা-পাড়ার কথাবার্তায় এইরূপ বুঝেছি। ব্যাঙ্ক, বীমা, বহির্বাণিজ্যের কেজো লোকেরা এই ষোল-সতর বছর আমাকে বন্ধুভাবেই দেখে আস্‌ছে। কেহ-কেহ এই অধমকে কেজো লোকও ভাবে।

লেখক—আর কোনো মহলে আপনার আর্থিক মতামতের দিকে সহানুভূতি দেখ্‌তে পান?

সরকার—মজুর-পন্থীরা, সোশ্যালিষ্টরা আর কমিউনিষ্টরা এই অধমের বস্তুনিষ্ঠ ও দুনিয়া-নিষ্ঠ বাণী পছন্দ করে। তারা পূব-পশ্চিম ফারাক্‌ কর্‌তে অভ্যস্ত নয়। তাদের আত্মা মার্ক্‌স্‌পন্থী। তারা দেখ্‌ছে,—আর্থিক দুনিয়া একই নিয়মে একই পথে চ'লেছে সর্বত্র। ভারতে পুঁজিনিষ্ঠার ক্রম-বিকাশ তারা চায়। কাজেই যন্ত্রনিষ্ঠা তাদের কাছে অতি প্রিয়। এই সকল বিষয়ে ভারতবর্ষ ইয়োরামেরিকার অনেক পেছনে প'ড়ে র'য়েছে। আর ভারতে রাতারাত্‌ ইয়োরামেরিকান কর্মকৌশল কায়েম করা অসম্ভব। এই সব মত তাদের পক্ষে সহজেই হজম হয়। মজুর-পন্থী মহলে তথাকথিত "ভারতীয় অর্থশাস্ত্র" তত-বেশী প্রিয় না হবারই কথা।

লেখক—আপনি মার্ক্‌স্‌-প্রচারক ব'লে মজুর-পন্থীরা আপনাকে বিশেষ সহানুভূতির চোখে দেখে না কি?

সরকার—ঠিক কথা। আমার বিশ্বাস,—সহানুভূতির একটা বড় কারণই এই। তবে সোশ্যালিষ্ট ইত্যাদি মহলে অনেকেই জানে যে, আমি মার্ক্‌স্‌- পন্থী নই,—মার্ক্‌স্‌-প্রচারক মাত্র। কিন্তু মার্ক্‌স্‌কে আমি অন্যতম "জগদ্‌গুরু" বিবেচনা করি। মার্ক্‌সের তারিফ্‌ আমার মুখে যত বেরোয় খুব কম লোকের মুখেই তত বেরিয়েছে। তারপর লেনিনকে আমি বলি বিংশ শতাব্দীর যুগাবতার। অধিকন্তু এই অধমের রচনাবলীর ভেতর যেখানেই কামড়া না কেন, সেখানেই পাবি মজুর, মজুর-মঙ্গল, মজুর-নিষ্ঠা, মজুর-সমিতি, মজুর-স্বরাজ ইত্যাদি। মজুর-পন্থীরা আমাকে সমাজ-বীমার প্রচারক হিসাবেও সুনজরে দেখে। ১৯১৪-২০ সন হ'তে আমি জনসাধারণের স্বার্থে ব্যাধি-বার্দ্ধক্য আর দৈব ও বেকার-বিষয়ক বীমার জন্য বকাবকি ক'রে চ'লেছি।

(মার্ক্‌স্‌, কঁৎ, হার্ডার", ২৪শে সেপ্টেম্বর, "লেনিন-রাজ" ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—রাষ্ট্রিক মহলে আপনার অর্থশাস্ত্র কিরূপ চলে?

সরকার—রাষ্ট্রিক জন-নায়কেরা জানেন যে, এই লোকটাকে কোনো দলে ভিড়ানো সম্ভব নয়। কাজেই তাঁদের কাছে আমি একটা শূন্য বিশেষ বা ছায়া মাত্র। আমার মতামতগুলা বিলকুল না-থাকারই সমান। এঁরা মনে করেন,—"যাক্‌, বই লিখ্‌ছে, লিখুক। থাক্‌ কিছু ছাপা মাল।" জন-নায়কের সংখ্যা গুন্‌তিতে আর ক'জনই বা? জনসাধারণ দেখ্‌ছে যে,—লোকটা উল্টা ব'কে চলেছে সর্বদাই, ঘাড় সোজা রেখে। মনে করে, কম-সে-কম একটা সাহিত্য তো গ'ড়ে উঠ্‌ছে।

লেখক—রাষ্ট্রিক নেতারা আপনাকে ছায়া মাত্র বিবেচনা করে বল্‌ছেন। কথাটার মানে কী?

সরকার—অতি সোজা কথা। এরা আমাকে কাজে লাগাতে পারেন না। তাঁদের কোনো কাজে আমি এলাম না। অথচ ভাব আমার আছে এঁদের অনেকেরই সঙ্গে।

লেখক—রাষ্ট্রিক নেতাদের কাজে আসা কাকে বলে?

সরকার—তাঁদের দলস্থ হওয়া। ঘটনাচক্রে আমি নির্দয়ভাবে নির্দল লোক। ঘাড়ের উপর যাদের মাথা থাকে তারা কোনো "দলের লোক" হতে পারে না। কিন্তু কেজো লোকেরা কোনো মতের ভাল-মন্দ'র তোআক্কা রাখে না। তারা নিজেদের মতলব হাঁসিল করবার ফিকির মাত্র টুঁড়তে অভ্যস্ত। এই কাজের জন্য চাই দল।

লেখক—দলের জন্য চাই কিরূপ লোক?

সরকার—যেসব লোক একমাত্র "হাঁ" আর 'না" বল্‌তে পারে। সভায় ব'সে হাত তোলা আর ভোট দেওয়া পর্যন্ত তাদের কাজ। তাদের মতামত থাক্‌বার কোনো প্রয়োজন নেই। ভাল-মন্দ বল্‌বার বা বিচার কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌লেই বিপদ। তাতে দল ভেঙে যেতে পারে। দল-পতি বেচারার প্রাণ অতিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা। আমার মতন লোক কোনো সভায় বস্‌লে হয়ত বন্ধুদের ঠিক বিরুদ্ধেই ভোট দিয়ে বস্‌বে! কেননা,—মনে কর্, আলোচ্য বিষয়টার বিচার করা সুরু হ'ল। তখন হয়তো শত্রুপক্ষের দিকেই রায় দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হ'তে পারে। এমন লোককে জন-নায়কেরা ছায়া বা শূন্য ভাব্‌বে না ত কী?

লেখক—ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীদের মহলে আজকাল আপনার "বিশ্বদৌলত ও আর্থিক ভারত" কেমন চলে?

সরকার—অনেকেই দেখ্‌ছেন যে, লোকটা নিজের মত বেচে পয়সা করে না। অথচ মত বেচে পয়সা করা যায়। কাজেই কোথাও-কোথাও কেহ-কেহ ভাব্‌ছেন যে,—মতগুলা হয়ত বা স্বার্থ-জড়িত নয়। আর ক্ষতিই বা কার হচ্ছে? তাই এঁরা "বিশ্বদৌলত ও আর্থিক ভারত" বিষয়ক ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে খানিক্‌টা নির্বিকার ও নিশ্চিন্ত। মাঝে-মাঝে এই ধরণের খবর ভারতের নানা শহর থেকে কানে এসে পৌঁছে।

তা ছাড়া, এঁদের বিশ্বাস যে,—"নতুন-কিছু বক্‌তে গেলে গলা ব্যথা হয় বক্তার। যায় শত্রু পরে-পরে। ক্ষতি কী? বরং ফাঁক তালে একটু লাভ আছে। অন্ততঃ পক্ষে গবেষণার নয়া-নয়া সমস্যা পাওয়া যায়। তাই বা মন্দ কী? যারা-যারা গবেষণা কর্‌তে চায় তারা করুক। সকলের মাথা ঘামাবার দরকার কী?" তার পর পনর-ষোল বছর চ'লে গেল। কাল-মাহাত্ম্য আছে। আর ভারতও বহরে বড়। কেহ-কেহ লক্ষ্য কর্‌ছেন যে,—"এই লোকটার কোন-কোনো কথা দু-পাঁচ-সাত বৎসরের ভেতর ফ'লে যায়। অধিকন্তু ফরাসী, জার্মাণ, ইতালিয়ান, স্পেনিশ, রুশ ইত্যাদি ভাষা জানাটা নেহাৎ মন্দ নয়। বিদেশী তথ্য, তত্ত্ব ও সংখ্যা জানা থাক্‌লে কম-সে-কম্ বিদ্যার পরিচয় দেওয়া চলে। হয় তো বা কিঞ্চিৎ-কিছু সাংসারিক লাভ ও হয়। কে জানে?"

সুতরাম পণ্ডিত-মহলেও এই অধমের আলোচনা-প্রণালীর স্বপক্ষে অল্প-বিস্তর ভাঙন লেগেছে। আজকালকার বাঙালী ও অবাঙালী ভারতীয় অর্থশাস্ত্রী কেহ-কেহ এক-বগ্‌গা ভাবে কোনো নির্দিষ্ট তথাকথিত ভারতীয় স্বার্থের ওকালতি করেন না।

("দুনিয়ানিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্র", ১লা নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

টিট্ করার অর্থ কী?

১৪ই নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—মানুষে-মানুষে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আপনি "টিট্ ক'রে দেওয়া" কাকে বলেন? "সমানে-সমানে কুপোকষা করার'ই বা অর্থ কী? ("দিগ্‌বিজয়ী কাকে বলে?" ৪ঠা নবেম্বর ১৯৪২)

সরকার—"টিট্ করা" আর "সমানে-সমানে কুপোকষা করা",—দুইয়ের অর্থই আমার পারিভাষিকে এক। ইস্‌মাইল আবদুলকে দু'ঘা' লাগিয়ে দিলে। আবদুলও তার জবাবে ইস্‌মাইলকে লাগিয়ে দিলে দু'ঘা' বা তিনঘা'। এর নাম সমানে-সমানে পাঞ্জাকষা-কষি,

হাতাহাতি বা লড়াই। একজন হামেশা জুতো লাগাচ্ছে আর এক জন হামেশা জুতো খেয়ে যাচ্ছে,—সেই অবস্থাকে আমি 'টিট্" করা বলি না। পরস্পর-পরস্পরকে জুতোচ্ছে,—এই হ'ল আমার পারিভাষিকে টিট্ করা বা কুপোকষা করা। আসল জিনিষ সমানে-সমানে যোগাযোগ।

লেখক—এশিয়া ইয়োরামেরিকাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে টিট্ কর্‌ছে কী অর্থে?

সরকার—এতদিন ছিল ইয়োরামেরিকা ব'কে যায়, আর এশিয়ার কাজ কেবল শুনে' যাওয়া,—এই সম্বন্ধ। এশিয়া বক্‌ছে আর ইয়োরামেরিকা শুনে' যাচ্ছে,—এই অবস্থা বড়-একটা ছিল না। বিবেকানন্দ'র দিগ্‌বিজয়ে সুরু হ'ল এই পারস্পরিক বকা-শুনার অবস্থা। আজ পাশ্চাত্যের দশ-বিশ জন লোক আছে, আর প্রাচ্যের ও কম-সে-কম দু-চার-জন লোক আছে। নানা র্মক্ষেত্রের ও চিন্তাক্ষেত্রের কথা ব'লছি। তক্কা-তক্কিতে, পারিষদিক বিতণ্ডায়, পত্রিকার হাতা হাতিতে দুই তরফা আওয়াজই শুনা যাচ্ছে। প্রাচ্যের গবেষণাগুলা পাশ্চাত্যের গবেষণাগুলার সঙ্গে সঙ্গেই ছাপাও হয় আর সমালোচিতও হয়। এক মাত্র ইয়োরামেরিকা গবেষণা সমূহই সুধী সমাজের বৈঠকগুলা দখল ক'রে ব'সে নেই। একচেটিয়া প্রভাব লুপ্ত হ'য়েছে। এই অবস্থাকে বলি এশিয়ার হাতে ইয়োরামেরিকাকে টিট্ করবার অবস্থা। এই হ'লো পারস্পরিক সম্মান বা শ্রদ্ধার সম্বন্ধ।

লেখক—এশিয়া ইয়োরামেরিকাকে নানা বিষয়ে পুরাপুরি হারিয়ে দিচ্ছে,—আপনার দিগ্‌বিজয় বা টিট্ করা ইত্যাদিতে এই অবস্থা বুঝা যায় না কি?

সরকার—না, আমি তা বুঝি না। দুনিয়ায় এমন অবস্থা স্বাভাবিক অবস্থা নয়। পুরাপুরি হারিয়ে দেওয়া সকল ক্ষেত্রে, এমন কি কোনো-এক ক্ষেত্রেও ঘ'ট্‌তে পারে না। যে-যে ক্ষেত্রে ঘটে সেই-সেই ক্ষেত্রে হেরে-যাওয়া লোক বা জাতটা মরা লোক বা জাতের সামিল। ১৮৯৩ পর্যন্ত ভারতবর্ষ ইয়োরামেরিকার তুলনায় বা চোখে এক প্রকার তাই ছিল। আওয়াজ-হীন মরা জাত ছিল।

কিন্তু বিলাতে আর ফ্রান্সে কি সম্বন্ধ? ফ্রান্সে আর জার্মাণিতে কি সম্বন্ধ? জার্মাণিতে আর বিলাতে কি সম্বন্ধ? এই সব সম্বন্ধ সমানে-সমানে হারা-জেতার সম্বন্ধ, পারস্পরিক সম্মানের সম্বন্ধ। কেউ অপরকে এক দম চিৎ ক'রে বুকের উপর ব'সে দাড়ি উপ্‌ড়াতে পারে না। চিৎ-হওয়া জাতটাও গা ঝেড়ে আবার দাঁড়াচ্ছে। এই যোগাযোগ সকল ক্ষেত্রেই বুঝ্‌তে হবে,—কি আর্থিক, কি রাষ্ট্রিক, কি আত্মিক।

ভারতবর্ষের সঙ্গে ফ্রান্সের এইরূপ সম্বন্ধই চাই। ভারতবর্ষের সঙ্গে বিলাতের এইরূপ সম্বন্ধই চাই। ভারতবর্ষের সঙ্গে জার্মাণির এইরূপ সম্বন্ধই চাই। পারস্পরিক সাম্য আর পারস্পরিক সম্মান,—এই হচ্ছে আমার টিট্ করা নীতির প্রাণের কথা। এই ধরণের টিট্ করা থেকেই দাঁড়িয়ে যায় যথার্থ সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব।

সতীশ মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ-নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগ

লেখক—আপনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর তাঁর "ডন সোসাইটি" সম্বন্ধে মাঝে-মাঝে দু এক কথা ব'লেছেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু ব'লবেন? (পৃষ্ঠা ৫২, ১৩৭, ১৬৯)

সরকার—সতীশ মুখোপাধ্যায় এখনো বেঁচে আছেন। কাশীতে থাকেন। মাস কয়েক হ'ল

তাঁর সঙ্গে আমার কাশীতে দেখা হ'য়েছে। তাঁকে সার্বজনিক কাজকর্মে বোধ হয় ১৯২১-২২ সনের গান্ধি-যুগের পর কেউ বড়-একটা দেখেনি। আজ কাল তিনি প্রকারান্তরে "সত্যি-সত্যিই কাশী-বাসী।" বিদেশ থেকে ফিরে আস্‌বার পর তাঁর সঙ্গে আমার মাত্র একবার দেখা হ'য়েছিল। তাও কয়েক মিনিটের জন্য কল্‌কাতায়। বোধ হয় ১৯২৭ সনে। তার পর এইবার মার্চ মাসে কাশীতে দেখা।

লেখক—তাঁর বয়স কত?

সরকার—বোধ হয় আশীর কাছা-কাছি। সতীশবাবু, বিবেকানন্দ, ব্রজেন শীল ইত্যাদি মনীষীদের প্রায় সমান-বয়সের লোক। এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বও তাঁর ছিল।

লেখক—আপনি তাঁকে প্রথম দেখেন কখন?

সরকার—১৯০২ সনে। তখন আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্র। সেই হিসাবে ইডেন হিন্দু হষ্টেলের বাসিন্দা। একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোককে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে যাওয়া-আসা কর্‌তে দেখ্‌তাম। তখন বোধ হয় তাঁর বয়স বছর চল্লিশেক। শুন্‌লাম তাঁর কারবার হচ্ছে ইস্কুল-কলেজের ভাল-ভাল ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা।

লেখক—ভাল-ভাল ছেলেদের সঙ্গে মেলা-মেশা করার মানে কী?

সরকার—প্রথম-প্রথম এই কথার মানে আমি বুঝেছিলাম কি না সন্দেহ। খবর পেয়েছিলাম তিনি হাইকোর্টের উকিল। কিন্তু উকিলি করেন না। উকিল হয়ে উকিলি ছেড়ে দেওয়া আমার অভিজ্ঞতায় একটা জবর-দস্ত নতুন কাণ্ড মনে হ'য়েছিল। তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় ইত্যাদি ছাত্রদেরকে বাড়ীতে-মেসে-হষ্টেলে গিয়ে পড়ানো? তাই বা কী? শুন্‌লাম,—কাউকে ইংরেজিতে রচনা লিখ্‌তে সাহায্য কর্‌তেন। অবশ্য এটা বুঝতে কঠিন লাগেনি। কারু সঙ্গে আবার দেশের কথা সম্বন্ধে তাঁর আলাপ হ'তো। ১৯০২ সনে "দেশের কথা" জিনিষটা আমার কাছে অতি নতুন ঠেকেছিল।

লেখক—কেন? "দেশের কথাটা"'র ভেতর নূতনত্ব কী আছে?

সরকার—এই ত মজা। "দেশ", "দেশের কথা", "স্বদেশ-সেবা", "দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ" ইত্যাদি শব্দ আমি আগে কখনো শুনিনি। শুন্‌লাম প্রথম সতীশ বাবুর সংস্পর্শে। তখন আমার বয়স বছর পনর। ১৯০১ সনে কল্‌কাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন দেখেছিলাম বটে। সুরেন ব্যানার্জির বক্তৃতাও শুনেছিলাম। কিন্তু তবুও কংগ্রেসটাকে স্বদেশ-সেবার কারখানা ব'লে মনে হয় নি। বস্তুতঃ স্বদেশ-সেবা শব্দটাই যেন শুনিনি। তোদের আজকালকার তুলনায় সে যুগের ছোকরারা কত আনাড়ি ছিল দেখ্‌ছিস্? অবশ্য হয়ত বা ছোকরাদের ভেতর আমিই একমাত্র আনাড়ি ছিলাম? যাক। "দেশ" আর "স্বার্থত্যাগ" এই দুটা পারিভাষিক আমি সতীশবাবুর আবহাওয়ায় দখল ক'রে নিলাম। স্বদেশ-নিষ্ঠা আর স্বার্থত্যাগ জীবন-দর্শনে ঠাই পেয়ে গেল। অন্ততঃ এক-মেটে' হিসাবে।

লেখক—প্রথম মোলাকাতের যুগে সতীশবাবুর কাছে আপনি আর কী নতুন জ্ঞান লাভ কর্‌লেন।

সরকার—শুনলাম লোকটা টাকা রোজগার করে না। পারে ত গরীব ছেলেদেরকে সাহায্যও করে। এই গেল "স্বার্থত্যাগের" দুই দফা। স্বার্থত্যাগ শব্দ তাঁর মুখে বেরুতো অহরহ। তার পর শুনা গেল,—তিনি অবিবাহিত। বিয়ে না করাটাও আমার মাথায় একটা প্রকাণ্ড নতুন জিনিষ মালুম হ'য়েছিল। স্বার্থত্যাগের তৃতীয় দফা হিসাবে এটা আমার মগজে

ঘর ক'রে বস্‌ল।

("জীবনের সাড়া ও স্বদেশ-সেবা", ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—কেন? বিয়ে না করা, ব্রহ্মচারী থাকা,—এতো সাধু-সন্ন্যাসীদের অতি মামুলি কথা। বাঙ্‌লা দেশের কে না জানে?

সরকার—তাই ত! কিন্তু সতীশবাবু যে সন্ন্যাসী, ফকীর বা সাধু তা কল্পনা কর্‌ব কী ক'রে? লোকটা হাইকোর্টের উকিল। জামা-জুতা, কাপড়-চোপড়, খাওয়া-দাওয়া, হাসি-ঠাট্টা, মিল-স্পেন্সার শেক্‌সপীয়ার-কার্লাইল ইত্যাদিতে তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো লিখিয়ে-পড়িয়ে বাঙালীর ফারাক কোথায়? সতীশবাবুকে মনে হ'ত যেন স্বার্থত্যাগী গৃহস্থ মাত্র। বিয়ে না করাটা আমার চিন্তায় স্বার্থত্যাগের অন্যতম লক্ষণ বা চিহ্ন মাত্র ছিল।

লেখক—কেন, তখন কি আপনি লিখিয়ে-পড়িয়ে বাঙালী সন্ন্যাসী দেখেন নি? বিবেকানন্দ'র দল আপনার অভিজ্ঞতায় আসে নি?

সরকার—না, ভায়া, সতীশ বাবুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার পূর্বে আমি বোধ হয় বিবেকানন্দ'র নাম পর্যন্ত শুনিনি।

লেখক—কী বল্‌ছেন আপনি? ১৯০২ সনে বিবেকানন্দ মারা গেলেন। তখন আপনি প্রেসিডেন্সি কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিকের ছাত্র। সেই সময়ে হিন্দু হস্টেলে থেকেও আপনি বিবেকানন্দ'র নাম শুনেন নি?

সরকার—সাধে কি লোকে আমাকে গরু বলে? আমার আহাম্মুকির কথা যত শুন্‌বি, তত তোর লজ্জা বাড়্‌তে থাক্‌বে। বিবেকানন্দ'র নাম আমি কোন্ ঘটনায় প্রথম শুনি জান্‌লে হাস্‌তে আরম্ভ ক'র্‌বি।

বিবেকানন্দ-দর্শনে হাতে-খড়ি

লেখক—বিবেকানন্দ'র নাম আপনি প্রথম কবে শুন্‌লেন?

সরকার—হিন্দু হস্টেলে আমাদের এক সহপাঠী বন্ধু থাক্‌ত। হঠাৎ দেখি সে হোস্টেল ছেড়ে দিয়েছে। কয়েক মাস পর তার সঙ্গে দেখা হ'লো। আমরা কয়েকজন মিলে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—"কি রে? এত দিন তোর টিকি দেখা যায় নি যে? কোথায় ছিলি?" জবাব দিলে—"আরে ভাই, কর্মভোগ। কয়েকটা ছোঁড়ার পাল্লায় প'ড়ে হস্টেল দিলাম ছেড়ে।" জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—"গেলি কোথায়?" বল্‌লে—"বিবেকানন্দ-বোর্ডিংয়ে।" 'তারপর?' জবাব—"এই ত দেখ্‌ছিস। আবার পুনর্মূষিকো হস্টেলে। সে বোর্ডিংয়ে বিবেকের আনন্দ হয় কিনা, ভাই, জানি না উদরানন্দ তো হ'লো না।" এই আমি প্রথম শুন্‌লাম বিবেকানন্দ'র নাম। অবশ্য ১৯০২ সনেই। তখন সতীশবাবুর আবহাওয়াও সুরু হয়েছে। বিবেকানন্দ-দর্শনে আমার হাতে-খড়ির পর্বটা দেখ্‌লি? কেমন মনে হচ্ছে?

লেখক—কী আশ্চর্য? যে-বিবেকানন্দ আপনার "রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্য" বা দ্বিতীয় "বৃহত্তর ভারতে"র প্রতিষ্ঠাতা সেই বিবেকানন্দ'র সঙ্গে আপনি নামে মাত্র পরিচিত হ'লেন এই ধরণের খোস-গল্পের ভেতর দিয়ে? কেন, তখন কি রামকৃষ্ণ-পন্থীদের নাম কল্‌কাতার ছাত্র-মহ্‌লে জানা ছিল না?

সরকার—আমি ত কখনো গেরুয়া-পরা আধুনিক সন্ন্যাসী দেখিনি। আমার বন্ধুরা

দেখেছিল কি না বল্‌তে পারি না, তবে বিবেকানন্দ'র মৃত্যুর সম সমকালে তাঁর দল গুন্‌তিতে ভারী ছিল না। বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ চ'ল্‌ত। রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ তখনো ছড়িয়ে পড়েনি। কাজেই আজকালকার মতন ১৯০২-০৩ সনে কল্‌কাতার যেখানে-সেখানে রামকৃষ্ণ-সন্তানদের গেরুয়া নজরে পড়্‌ত না।

লেখক—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'র দল কল্‌কাতায় আর বাংলাদেশে নামজাদা হ'লো কবে?

সরকার—১৯১০-১৪ সনে,—অর্থাৎ ১৯০৫-এর কয়েক বৎসর পর,—রামকৃষ্ণ মিশন যুবক বাঙ্‌লার ভেতর স্থায়ী ঘর বসাতে পেরেছিল। "গৃহস্থ" পত্রিকায় আর "বিশ্বশক্তি" বইয়ে (১৯১৪) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের ক্রমবিকাশটা বিশ্লেষণ ক'রেছি। দেখ্‌বি। কাজে লাগ্‌তে পারে।

লেখক—বিবেকানন্দ'র নাম তো শুন্‌লেন ১৯০২ সনে। তাঁর সম্বন্ধে আপনার প্রথম ধারণা কী হ'ল?

সরকার—সোজা কথায় বল্‌ব যে, বিবেকানন্দ'র "নাম" ছাড়া কিছুই তখন আমার জানা ছিল না। তার "কাম" সম্বন্ধে কিছুই শুনিনি। বিবেকানন্দ যে একটা অতি-বড় কিছু তা আমার মগজে ঢুকে নি।

লেখক—তা হ'লে বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অতি-প্রাথমিক জ্ঞান আপনি কবে কোথায় পেলেন?

সরকার—সতীশবাবুর মজলিশে শুন্‌তাম তাঁরই মুখে বিবেকানন্দ-কথা। ১৮৯৩-৯৭ সনের বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সতীশবাবু বলতেন,—"বিবেকানন্দ'র বক্তৃতা সম্বন্ধে আমেরিকা হ'তে খবর আস্‌ত। আর সে-সব আমি যেখানে-সেখানে বন্ধুবর্গের ভেতর প'ড়ে শুনাতাম।" এই সব কথায় মনে হ'তো,—তা হ'লে বিবেকানন্দ লোকটা একটা হাতী-ঘোড়া কিছু নিশ্চয়।

একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামি ও সর্বধর্ম-সমন্বয়

লেখক—বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সেই আবহাওয়ায় আর কিছু জান্‌তে পেরেছিলেন?

সরকার—সতীশবাবু বল্‌তেন,—"বিবেকানন্দ চায় কেবল ইন্‌স্পায়ার্ড ফ্যানাটিক" (একবগ্‌গা পাগল) লোক। যারা কোনো-কিছুর জন্য ক্ষেপে না উঠে তাদের দ্বারা বিবেকানন্দ'র মতে কোনো কাজ হয় না।

লেখক—এই সকল কথা আপনার কেমন লাগ্‌ত?

সরকার—মনে হ'তো বিবেকানন্দ একটা জবরদস্ত-কিছু বটে। চাই একবগ্‌গা ক্ষ্যাপা। ঠিক ব'লেছে। একটা নতুন দর্শন সন্দেহ নেই। মামুলি লোক দিয়ে বড়-কিছু ঘটানো সম্ভব নয়। শুন্‌বা মাত্র যেন একটা নয়া দুনিয়ায় প্রবেশ করা গেল।

লেখক—বিবেকানন্দ'র কাজকর্ম সম্বন্ধে আপনি তখনকার দিনে কী বুঝেছিলেন?

সরকার—সহপাঠী বন্ধুদের আড্ডায় গুল্‌তান চল্‌তো। বোধ হয় শুনে থাক্‌ব যে,—বিবেকানন্দ'র কাজ ছিল "সর্বধর্ম সমন্বয়।"

লেখক—সর্বধর্ম-সমন্বয়ের কাজটা আপনার কাছে কেমন মনে হ'য়েছিল?

সরকার—ওটা এমন বিশেষ-কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিজ মালুম হয় নি। তবে হাঁ, এও একটা

কাজ বটে। এই দিকে চিন্তাও যাওয়া সম্ভব। এই পর্যন্ত।

লেখক—সতীশবাবুর কাছে বিবেকানন্দ'র সর্বধর্ম-সমন্বয় সম্বন্ধে কিছু শুনেন নি? ধর্মের আন্দোলন তাঁর চিন্তায় কেমন ছিল?

সরকার—মনে পড়ছে না। সতীশবাবুর আবহাওয়ায় ধর্ম প্রধান কথা ছিল না। "সর্বধর্ম-সমন্বয়" পারিভাষিকটা আমি সতীশবাবুর মজলিশে পাই নি। সতীশবাবুর চিন্তায় ধর্মের আন্দোলন বড় ঠাঁই অধিকার করত কিনা সন্দেহ। অবশ্য শুনেছিলাম তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। এই হিসাবে তিনি বিপিন পালের, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতার আর অশ্বিনী দত্তের গুরুভাই। কিন্তু ধর্ম নিয়ে মাতামাতি করতে তাঁকে কখনো দেখিনি। ধর্ম-সংস্কার, ধর্ম-বিপ্লব, ধর্ম-প্রচার ইত্যাদি কাজ বা চিন্তার জন্য তিনি বোধ হয় বেশী সময় কাটাতেন না।

("ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্গ-বিপ্লব", ২২শে ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—আপনি বিবেকানন্দ'র "ইনস্পায়ার্ড ফ্যানাটিক" কথাটার খুব তারিফ করতেন অথচ তাঁর সর্বধর্ম-সমন্বয় কাজটা তত বেশী গ্রাহ্য করতেন না। এর মানে কী? অথবা এর কারণ কী?

সরকার—১৯০২ সনে এর মানে বা কারণ ভেবে দেখেছিলাম কিনা সন্দেহ। সত্যি কথা,—এই সব প্রশ্ন মাথায় উঠেই নি। বোধ হয় "সর্বধর্ম-সমন্বয়"কে জীবনের কর্মক্ষেত্র ক'রে নেবার দিকে মগজ খেলত না। অপর দিকে "একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামি"র দাম সহজেই বুঝা গিয়েছিল। চরিত্র-গঠনের জন্য এই ক্ষ্যাপামির আবশ্যকতা স্বীকার করা কঠিন নয়। ভবিষ্যতের জন্য জীবন তৈরি করার সময় এইরূপ এক-বগ্‌গা ক্ষ্যাপামির আদর্শ জেনে রাখা ভাল। কিন্তু জীবনটা চালানো হবে ধর্মের আন্দোলনে না অন্য কোনো আন্দোলনে তা প্রথম হ'তে অনেক সময়েই ঠিক করা হয়ত অসম্ভব। কর্মক্ষেত্র যাই হ'ক তার জন্য চাই একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামি। এই সূত্রটা সহজেই মগজে পশে। প'শেছিলও বোধ হয় তাই। একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামি ভেতরই পাওয়া যায় যে-কোনো কর্মক্ষেত্রের জন্য জীবন ঘুরাবার চাবী।

লেখক—সতীশবাবুর সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত যোগাযোগ কিরূপ ছিল?

সরকার—তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত মেলামেশা একদম ছিল না বলা যেতে পারে। অন্যান্য অনেকের সামনে তিনি কথা বলতেন। আমি আড্ডার অন্যতম হিসাবে শুনে যেতাম। এই বলছি ১৯০২ সনের কথা।

লেখক—১৯০২ সনের পর সতীশবাবুর সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত মেলামেশা বেড়েছিল?

সরকার—ব্যক্তিগতভাবে তিনি আমাকে কখনো কোনো কথা ব'লেছেন কিনা মনে পড়ছে না। ১৯০৫-০৯ সনে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (আজকাল রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল) ইত্যাদির মতন আমিও তাঁর সঙ্গে এক বাড়ীতে কাটিয়েছি। প্রথম মেস্‌টা ছিল পান্তের মাঠের পূর্বে—"ফীল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমি" ক্লাবের দোতলায়। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ছিল ঠিকানা। দ্বিতীয় মেসের ঠিকানা ৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের লেন। তখন চলছিল গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব। এমন কি একত্র বসবাসের সময়ও সতীশবাবু আমাকে একা ডেকে কোনো কথা ব'লেছেন কিনা সন্দেহ। আর আমিও বোধ হয় কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করিনি।

"ডন"-পত্রিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

লেখক—সেই সময়ে সতীশবাবুর কোনো বই আপনি প'ড়েছিলেন?

সরকার—১৯০২ সনে আমি সতীশবাবুর লেখা কোনো বইয়ের খবর পাই নি। বস্তুতঃ আজ পর্যন্ত তিনি কোনো বইয়ের গ্রন্থকার কিনা জানি না।

লেখক—তা হ'লে সে যুগে তাঁকে দেশের লোকেরা জান্‌ত কী ক'রে?

সরকার—শুনেছিলাম তিনি "বেঙ্গলী" আর "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় লিখ্‌তেন। তাঁর লেখাগুলা প্রায়ই বোধ হয় বেনামী। সম্পাদকদের সংগে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ ইত্যাদি সম্পাদক ও রাষ্ট্রনেতারা তাঁর বন্ধুবর্গের অন্তর্গত ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর নিজের এক কাগজ ছিল। সেটা মাসিক। ইংরেজিতে প্রকাশিত হ'তো। নাম "ডন" (উষা)।

লেখক—"ডন" পত্রিকায় কী রকম লেখা বেরুত?

সরকার—১৯০২ সনে আমি "ডন" প্রথম দেখি। তাতে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের একটা লেখা ছিল—কার্লাইল সম্বন্ধে। প্রবন্ধটা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্‌টিটিউটে পড়া হ'য়েছিল। তখনও বোধ হয় "ডন"-সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয় ছিল পত্রিকার প্রধানতম আলোচ্য বস্তু। ভারতের সংগে ইয়োরোপের তুলনা-সাধনের দিকে ঝোঁক থাক্‌ত। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" নামের বদলে যেন "ডন" নাম দেওয়া হ'য়েছিল। বোধ হয় ১৮৯৩ সনে পত্রিকাটা প্রতিষ্ঠিত।

লেখক—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনায় "ডন"-পত্রিকার মতিগতি কিরূপ ছিল?

সরকার—এক কথায় জবাব দিচ্ছি। প্রাচ্যে আর পাশ্চাত্যে প্রভেদ দেখানো ছিল "ডন"-পত্রিকার প্রাণের কথা। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা প্রচার করা হ'তো পাশ্চাত্যের জড়-নিষ্ঠার পাশে। এরই আনুষঙ্গিক আর একটা লক্ষ্য দেখ্‌তে পাই। খৃষ্ট-ধর্মের প্রভাব হ'তে হিন্দুত্বকে বাঁচাবার দিকে "ডন"-পত্রিকার প্রয়াস ছিল সজাগ। অধিকন্তু খৃষ্টধর্মকে নিন্দা করা হ'তো না। চ্যর্চ-নীতিকে ("চ্যর্চিয়ানিটী"কে) গালাগালি করা হ'ত। পাদ্রী-প্রাধান্য বা পাদ্রী-সাহি ছিল এই মাসিকের বিবেচনায় খাঁটি খৃষ্ট-নীতির দুস্‌মন-স্বরূপ।

এই সকল চিন্তাধারাকে সেকালের বাঙালী এবং অন্যান্য ভারতীয় সংস্কৃতি-নায়কদের প্রায়-সার্বজনিক চিন্তাধারা বল্‌তে পারি। মার্কিণ মুল্লুকে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ মোটের উপর প্রায় এই সকল চিন্তাধারারই প্রতিনিধি ছিলেন। "ডন"-সম্পাদক সতীশবাবুকে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতাদের সগোত্র ও পরমাত্মীয় সম্‌ঝে' রাখা উচিত। ১৯০২ সনে অবশ্য এসব আমি বুঝিনি। মনে রাখিস,—সতীশবাবু বিবেকানন্দ আর অভেদানন্দ এই দুইজনেরই প্রায় এক-বয়েসি লোক। এই দলের ভিতর ব্রজেন শীলকেও কল্পনার চোখে দেখ্‌তে ভুলিস্ না।

"ডন"-পত্রিকার সংখ্যাগুলা (১৮৯৩-১৯০২) বর্তমান যুগের ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে খুব মূল্যবান।

("১৯০৫ সনের পরবর্তী ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী", ১৪ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

ডন সোসাইটির সংস্কৃতি-শিক্ষালয়

২৪শে নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—এইবার "ডন সোসাইটি" সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—সতীশবাবু ১৯০২ সনের শেষের দিকে "ডন"-পত্রিকার নামে একটা সংস্কৃতি-শিক্ষালয় কায়েম করেন। তার নাম "ডন সোসাইটি"। প্রতিষ্ঠার সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউশনের (একালের বিদ্যাসাগর কলেজের)—দোতলায় সার্বজনিক সভা ডাকা হ'য়েছিল। সভাপতি ছিলেন জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে সতীশবাবুর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি "ইন্ডিয়ান নেশন" নামক সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন ক'র্‌তেন।

লেখক—"ডন সোসাইটি"কে সংস্কৃতি-শিক্ষালয় বল্‌ছেন কেন?

সরকার—এটা একটা টোল, মক্তব বা ইস্কুল-কলেজই বটে। কল্‌কাতার ভিন্ন-ভিন্ন কলেজেব ছাত্ররা এই সোসাইটির সভ্য হ'তো। চাঁদা দিতে হ'তো না। সপ্তাহে দু-দিন ক'রে ক্লাস বস্‌ত। রীতিমত ক্লাস। বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। সভ্যেরা বক্তৃতা শুনে' সেই সবের সংক্ষিপ্তসার লিখ্‌তে বাধ্য হ'তো। কাগজ ও পেন্সিল বিনা পয়সায় দেওয়া হ'তো।

লেখক—ডন সোসাইটির ক্লাসে ক'জন ছাত্র হ'তো?

সরকার—বোধ হয় পঁচাত্তর বা গোটা শ'য়েক সভ্য আমি অনেক সময় একসঙ্গে দেখেছি। আমিও অন্যতম ছিলাম। ১৯০৩ সনে আমি যোগ দিই,—রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। প্রথম-প্রথম বোধ হয় আমি প্রত্যেক ক্লাসে যেতাম না। হয়তো অন্যান্য আড্ডা মারার টান বেশী ছিল। কিন্তু অল্পদিনের ভেতরেই নিয়মিতরূপে যেতে সুরু করি। থার্ড ইয়ারের সময়েই কলেজের আর হস্টেলের বন্ধুরা আমাকে সতীশবাবুর চেলা ব'লে ডাক্‌ত বা ঠাট্টা ক'র্‌ত।

লেখক—ক্লাসগুলা চালানো হ'তো কী ক'রে?

সরকার—বক্তারা ব'কে যেতেন। ছেলেরা নিত বক্তৃতার চুম্বক। তারপর তারা বাড়ীতে ব'সে সে-সব প্রবন্ধের আকারে লিখ্‌ত। লেখাগুলা সতীশবাবু নিজে প'ড়ে দেখ্‌তেন।

লেখক—কী-কী বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল?

সরকার—হপ্তায় দুদিন ক্লাস হ'তো। বিকেল বেলায়। মঙ্গলবার ছিল "জেনার‍্যাল ট্রেনিং"য়ের (সাধারণ সংস্কৃতির) দিন। বক্তৃতা হ'তো ইংরেজিতে। সতীশবাবু নিজে বক্তৃতা ক'র্‌তেন। শুক্রবার ছিল "মর‍্যাল ট্রেনিং"য়ের (নৈতিক সংস্কৃতির) জন্য মার্কামারা। গীতার উপর বক্তৃতা হ'তো,—বাংলায়। বক্তা ছিলেন পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামী।

লেখক—"সাধারণ সংস্কৃতি"র ভেতর কী-কী আলোচ্য বস্তু ছিল?

সরকার—জাতীয় স্বার্থসমূহের বিশ্লেষণ ছিল আসল কথা। ব্যক্তির চেয়ে জাতি বড় এই ছিল মুদ্দা। পরিবারের চেয়েও দেশ বড় এই মন্তরই প্রচারিত হ'তো নানা আকারে। কোনো দিন স্পেন্সারের বাণী, কোনো দিন মিলের বয়েৎ, কোনো দিন কার্লাইলের বুখ্‌নি। কিন্তু যাই আলোচিত হ'ক না কেন,—ডাইনে-বাঁয়ে পাঁয়তারা কর্‌তে-কর্‌তে সতীশবাবু এসে দাঁড়াতেন তাঁর স্বদেশ-নিষ্ঠায়।

প্রত্যেক দিনই ঘুরে-ফিরে এসে হাজির হ'তাম স্বার্থত্যাগের দর্শনে। বুঝ্‌তে পার্‌তাম,—বিবেকানন্দ-বাঞ্ছিত "একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামি"র জ্যান্ত প্রতিমূর্তি সতীশ মুখোপাধ্যায়। সতীশবাবুর আবহাওয়ায় প'ড়েছিলাম ব'লে জীবন ধন্য হ'য়েছে।

লেখক—গীতার দিন কী পড়ানো হ'তো?

সরকার—গীতার শ্লোকগুলা ধ'রে-ধ'রে শব্দের পর শব্দ বুঝিয়ে দেওয়া হ'তো। পণ্ডিত নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যাগুলা কানে ঠেক্‌ত অতি-মধুর আর মিশে যেত রক্তের সঙ্গে। প্রত্যেকদিন শুন্‌তাম এক সুর। তা হচ্ছে ঃ—"শরীর কিছু নয়, প্রাণ কিছু নয়, মৃত্যু কিছু নয়। একমাত্র জিনিষ কর্তব্য-পালন।" সেই সুর আজও কানে বাজ্‌ছে। আর তারই জোরে বেঁচে র'য়েছি।

লেখক—কোনো বাইরের লোকের বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল?

সরকার—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভগ্নী নিবেদিতা, প্রিন্সিপ্যাল নগেন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ, পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ত-তীর্থ ইত্যাদি অনেকে বক্তৃতা ক'রেছেন। দীনেশ সেনের বক্তৃতাও শুনেছি। ১৯০৪ সনের কথা। তখনকার দিনে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-গ্রন্থের লেখক ব'লে তিনি ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় অতি-প্রিয় ছিলেন।

লেখক—সতীশবাবু বাংলা ভাষা বিষয়ক গবেষকের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখ্‌তেন?

সরকার—দীনেশ সেনকে আমরা প্রকারান্তরে বাঙালী জাতের সামাজিক ইতিহাসের উদ্ধারকর্তারূপে সম্মান করতাম। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার গবেষণার একদিকে আর দীনেশ সেন আর একদিকে,—এইরূপ ছিল ধারণা। তখনকার দিনে এই দুজনই ছিলেন ঐতিহাসিক গবেষণার পথ-প্রদর্শক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকে বোধহয় বেশী ছেলেরা জান্‌তো না। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইয়ের অনেক কপি আমি ১৯০৭-১৪ সনে কিনেছিলাম। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির ছাত্রদেরকে লেখাপড়ায় উৎকর্ষের জন্য বার্ষিক পুরস্কার দিতাম। দীনেশ সেনের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার যুগে আমার অন্যান্য যোগাযোগও ছিল। তাঁর কাছে ভাষা সংশোধনের সাহায্যও পেয়েছি।

("ভাষা-সাধনার কর্মকৌশল", ৫ই নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

ডন সোসাইটির পত্রিকায় ভারতীয় তথ্য ও সংখ্যা

লেখক—"ডন" পত্রিকার সঙ্গে ডন সোসাইটির কোনো যোগাযোগ ছিল?

সরকার—আগেই বলেছি,—"ডন" পত্রিকার নামে ডন সোসাইটি কায়েম হয়েছিল (১৯০২)। সোসাইটি কায়েম হবা মাত্রই পত্রিকাটাকে সতীশবাবু সোসাইটির মুখপত্র ক'রে দিলেন। কাজেই পত্রিকাটার নামকরণ হ'ল ডন সোসাইটি থেকে। এই অবস্থায় "দি ডন অ্যাণ্ড দি ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিন" দেখা দিল সাহিত্য-সংসারে। ১৯০২ হ'তে ১৯১৩ পর্যন্ত এই নামে পত্রিকাটা চ'লেছিল। তারপর আর কোনো সংখ্যা বেরোয়নি। ইতিমধ্যে ডন সোসাইটির কাজ বন্ধ হয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে। সে হচ্ছে ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি। কাজেই ডন সোসাইটি বল্‌লে ১৯০২ হ'তে ১৯০৬ পর্যন্ত বছর চারেকের মেয়াদওয়ালা সংস্কৃতি-শিক্ষালয়টা বুঝ্‌তে হবে।

এই চার বছরের ম্যাগাজিন বা পত্রিকাটাকে সোসাইটির সঙ্গে গাঁথা ভাবে দেখা কর্তব্য। সতীশ মুখোপাধ্যায়, ডন সোসাইটির বক্তৃতাসমূহ, আর ডন সোসাইটির মাসিক ম্যাগাজিন এই তিনে মিলে "সতীশ-মণ্ডল।" (পৃঃ ১৬৯)

লেখক—ডন সোসাইটির ম্যাগাজিনে কিরূপ রচনা প্রকাশিত হ'তো?

সরকার—আগেই বলেছি,—১৯০২ সনের পূর্ববর্তী অর্থাৎ প্রাক্-সোসাইটি ডন-

পত্রিকার গড়ন ছিল প্রধানতঃ সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক। প্রাচ্যে-পশ্চিমে তুলনা-সাধন ছিল তার অন্যতম বিশেষত্ব। ১৯০২-এর পরবর্তী অর্থাৎ ডন সোসাইটির মুখপত্রস্বরূপ ম্যাগাজিনের সূচীপত্র দেখা দিয়েছিল বিলকুল অন্য ঢঙের। সভ্যতার তুলনা, সংস্কৃতির বিশ্লেষণ, হিন্দু-খৃষ্টিয়ানের দোষগুণ-বিচার এই সব চিজ ম্যাগাজিন থেকে বিদায় নিল। তার বদলে এল বস্তুনিষ্ঠ ভারত-বৃত্তান্ত।

লেখক—পত্রিকার ভারত-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন?

সরকার—দেশের কথায় পত্রিকা ভরা থাক্‌ত। ভারতীয় ভাষাগুলার বিভিন্নতা বা ঐক্য দেখানো হ'ত। হিন্দু সমাজের জাত-পাঁতের সু-কু বুঝানো হ'তো। পল্লী-শহরের আকার-প্রকার বিবৃত করা হ'তো। আলোচনাগুলার ভেতর ঠাঁই পেত তথ্য আর সংখ্যা। ভারতের সামাজিক তথ্য, আর্থিক তথ্য, সাংস্কৃতিক তথ্য ইত্যাদি নানাপ্রকার তথ্য ছাড়া আর কোনো বিষয়ে জোর দেওয়া হ'তো না। পাঠকেরা সরকারী সেন্সাস রিপোর্টগুলার চুম্বক পেত ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিনের প্রত্যেক সংখ্যায়। নৃতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান, ইত্যাদি নানা বিদ্যার কুদরতি মাল ফি মাসে পাঠকদের পাতে পরিবেষণ করা হ'তো।

লেখক—এই রকম পত্রিকা পড়্‌বার লোক পাওয়া যেত?

সরকার—তুই ভেবে দ্যাখ্ না। মনে কর্, আজকে এই রকম একখানা কাগজ,—ধর্ "আর্থিক উন্নতি",—তোদের ক্লাসে দেওয়া গেল। তার গতি কী হবে? বুঝ্‌তেই পার্‌ছিস। এক সংখ্যা দেখ্‌লে আর দ্বিতীয় সংখ্যা কেউ দেখ্‌তে চাইবে না। পাঠকদেরকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হরেক-রকম বৃত্তান্ত তথ্য আর সংখ্যা মুখস্থ করানোই ছিল যেন সতীশবাবুর মতলব। এই মতলব-মাফিক প্রবন্ধ লেখার ভার ছিল প্রধানতঃ হারাণ চাক্‌লাদারের হাতে। হারাণবাবুকে দেখ্‌তাম নিত্য-নৈমিত্তিক ভাবে সেন্সাস রিপোর্টগুলা পড়্‌তে আব তাই থেকে মাল নিয়ে প্রবন্ধ লিখ্‌তে।

লেখক—সেন্সাস রিপোর্টে প্রতিষ্ঠিত রচনাগুলা আপনার কেমন লাগ্‌তো?

সরকার—সরকারী আদমসুমারীর বইগুলো যে গিল্‌তে হয় তা এই দেখ্‌লাম প্রথম। আর তা দেখে আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। সঙ্গে-সঙ্গে অঙ্কগুলা ছাড়া যে বস্তু-পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকে তাও ফি মাসে মগজে বস্‌তে পেরেছিল। ষ্ট্যাটিসটিক্‌স শব্দটা তখনও জানা ছিল কিনা জানি না। কিন্তু ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স মালটা যখন-তখন জীবনের অভিজ্ঞতার ভেতর এসে পড়তো। ডন সোসাইটির ম্যাগাজিন এক অদ্ভুত আত্মিক আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রেছিল। তার সুফল আজ পর্যন্ত সর্বদাই ভোগ করছি। ভারত-তত্ত্বে হাতেখড়ি তো হ'তোই। সঙ্গে-সঙ্গে মগজে ঘর কর্‌ত তথ্যনিষ্ঠা আর সংখ্যানিষ্ঠা।

পরবর্তীকালে সেলিগ্‌ম্যান ইত্যাদি মার্কিণ অর্থশাস্ত্রীদের আবহাওয়ায় সংখ্যানিষ্ঠা যারপর নাই বেড়ে গেছে (১৯১৪-২০)। আমেরিকায় চিত্ত-শাস্ত্রী, সমাজ-শাস্ত্রী, শিক্ষা-শাস্ত্রী, রাষ্ট্র-শাস্ত্রী ইত্যাদি পণ্ডিত-মহলেও ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্-প্রীতি দেখেছি জবরভাবে। যাই হ'ক,—"ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিনে"র সংখ্যানিষ্ঠাতেই এই অধমের সংখ্যা-প্রীতির সূত্রপাত। ভারতে ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্-আলোচনার অন্যতম প্রবর্তক সতীশ মুখোপাধ্যায়।

লেখক—১৯০২ হতে ১৯০৬ পর্যন্ত চার বছরের ভেতর আপনি কখনো ডন সোসাইটির ম্যাগাজিনে কিছু লিখেছিলেন? কারা কারা লিখ্‌তেন?

সরকার—না। ম্যাগাজিনে ছাত্রদের রচনা প্রকাশের জনাও একটা অধ্যায় নির্দিষ্ট ছিল।

তাতেও আমি কখনো কিছু লিখিনি। হারাণবাবুর পরেই লেখকদের মধ্যে প্রধান ছিলেন রবী ঘোষ ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। ১৯০৬-এর পরও এঁদের তিন জনেরই লেখা বেরুত। পরে বোধ হয় রবী ঘোষই ছিলেন সর্দার-লেখক। আমার ইংরেজি রচনা বোধ হয় একটা মাত্র বেরিয়েছিল (১৯০৭)। আর বাংলা রচনা গোটা দু-তিনেক। সবই ১৯০৭-০৮ সনে। তবে কোনোটাই ম্যাগাজিন-নির্দিষ্ট রীতির লেখা ছিল না। আমার বাংলা লেখাগুলা নাগরি হরপে ছাপা হ'য়েছিল। অবাঙালী পাঠকদের পড়বার সুবিধার জন্য। জজ সারদাচরণ মিত্র বাংলাদেশে নাগরি-লিপির প্রচারক ছিলেন। তাঁর সঙ্গে সতীশবাবুর যোগাযোগ ছিল।

লেখক—ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিনটা কল্‌কাতার বাহিরে প্রচলিত ছিল?

সরকার—বাঙ্‌লাদেশে এই পত্রিকার কাট্‌তি কতটা ছিল জানি না। তবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল নিবিড়। দূর-দূর পল্লী-শহরের ছেলেরা ম্যাগাজিনের লেখক হ'তো। সতীশবাবুর ব্যবস্থায় ভিন্ন-ভিন্ন প্রদেশের ছেলেরা পরস্পর চিঠি-লেখার সুযোগ পেত। ম্যাগাজিনের মারফৎ আন্তঃপ্রাদেশিক ভাব-বিনিময় কিছু-কিছু সাধিত হ'য়েছিল। ডন সোসাইটির নাম-ডাক সে-যুগে ভারতব্যাপী ছিল বলা যেতে পারে।

লেখক—ভারতব্যাপী কাট্‌তির কোনো চিহ্ন দেখ্‌তে পান?

সরকার—১৯৪০ সনে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিমন্ত্রণে বক্তৃতা কর্‌তে গিয়েছিলাম। এই উপলক্ষে সেখানে "আরিয়ান পাথ" ও "ইন্ডিয়ান পি-ই-এন" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়ার বাড়ীতে সান্ধ্য-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। উপস্থিত লোকজনের ভেতর একজন ব'ল্‌লেন,—"আমি আপনাকে ছেলেবেলা থেকে জানি। ডন সোসাইটির ম্যাগাজিনে আমার লেখা বেরুত। সেই সূত্রে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের কাজ-কর্ম আমার জানা ছিল।" এই ব্যক্তির নাম পোপৎলাল শা। ইনি গুজরাতী। বর্তমানে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনার‍্যাল।

প্রাক-স্বদেশী যুগের ছাত্র-সমাজ

২৬শে নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—কল্‌কাতার কলেজের ছাত্ররা ডন সোসাইটির সভ্য হ'তো কিসের জন্য? এতে তাদের কী লাভ হতো?

সরকার—বলা মুস্কিল। বোধহয় কেউ-কেউ ভাব্‌ত যে, ইংরেজি লেখার অভ্যাসটা ভাল। তাতে পরীক্ষায় পাশের সুবিধা হবে। হয়ত অনেকের চিন্তায় সতীশবাবু ঠিক যেন বিনা পয়সায় প্রাইভেট মাষ্টার গোছের লোক। ছেলেরা নিজেদের ভেতর এই সম্বন্ধে কী বলাবলি ক'র্‌ত আজকাল মনে পড়্‌ছে না।

লেখক—এই স্বার্থ ছাড়া আর কোনো মতলব ছেলেদের ছিল না?

সরকার—ভায়া, আর তো কিছু চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্ছি না। একটা কথা মনে হচ্ছে। তখনকার দিনে কল্‌কাতায় ছেলেদের জন্য আড্ডা, মজলিশ, সভা, বৈঠক, ক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ছিল না বল্‌লেই চলে। হষ্টেল আর মেসগুলাই ছিল গুলতানের একমাত্র কেন্দ্র। চায়ের দোকানও সেকালে ছিল না। কাফে, রেস্টরাণ্ট ইত্যাদির মরশুম দেখা দিয়েছে ১৯২০ সনের পর। স্বদেশী যুগে চা-যোগের সবে-মাত্র অ-আ-ক-খ। সেকালে হিন্দু হষ্টেলে

শ'-আড়াই ছেলের ভেতর বোধহয় মাত্র পঁচিশ জনও চা-খোর ছিল কিনা সন্দেহ। ঘটনাচক্রে এই অধম তাদের অন্যতম। আমার বন্ধু অঙ্কশাস্ত্রী নরেশ ঘোষ এই বিষয়ে আমার গুরু। যাক্।

লেখক—কল্‌কাতায় ছেলেদের কোনো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল না?

সরকার—সার্বজনিক বক্তৃতা, রাষ্ট্রিক আন্দোলন, মজুর-প্রীতি, সাংস্কৃতিক বাক-বিতণ্ডা ইত্যাদি অনুষ্ঠান সেকালে বড়-একটা দেখা দেয়নি। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান। কলেজের ছেলেদের সার্বজনিক জীবন এইখানে পুষ্ট হ'তো। এইটাই যাহ'ক কিছু-টিং-টিং করত। আজকাল এই আড্ডার কাজকর্ম নানাদিকে বেড়ে গেছে। তখনকার কল্‌কাতার আবহাওয়ায় ডন সোসাইটিতে ছেলেরা বোধ হয় যৌবন-বিকাশের কিঞ্চিৎ-কিছু সুযোগ পেত। যৌবন-শক্তির কেন্দ্র হিসাবে হয়ত বা অজ্ঞাতসারেই ডন সোসাইটি ছেলেদেরকে খানিকটা টেনে আন্‌ত। একটা সাংস্কৃতিক অভাব পূরণ হ'য়েছিল বল্‌তে পারি।

লেখক—ডন সোসাইটি ছাত্রদের সার্বজনিক জীবন-বিকাশের সুযোগ জোগাত কী উপায়ে?

সরকার—বছর চল্লিশ আগেকার অবস্থা আজ আমাকে বিশ্লেষণ ক'র্‌তে বল্‌ছিস। এসব আগে কখনো ভেবে দেখিনি। যারা ডন সোসাইটির সভ্য ছিল তাদের কাউকে-কাউকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখিস্। হয়ত নতুন-নতুন বিশ্লেষণ পেতে পার্‌বি। আসল কথা,—প্রত্যেক জিনিষের জন্যই নানা লোকের কাছে খবর নেওয়া ভাল। ভিন্ন-ভিন্ন চোখের "দেখা-শুনা" ভিন্ন-ভিন্ন রকমের হয়।

লেখক—ডন সোসাইটির সভ্যদের ভেতর আজকাল কে কোথায় কী কর্‌ছেন বল্‌তে পারেন?

সরকার—ডন সোসাইটি চ'লেছিল ১৯০২ হইতে ১৯০৬ পর্যন্ত। ১৯০৫-০৬ সনে বঙ্গ-বিপ্লব সুরু হয়। সেই বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম আত্মিক শক্তি ছিল ডন সোসাইটির চিন্তা ও কর্মরাশি। তাকেই আমি বলি "সতীশ-মণ্ডল"। ১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ কায়েম হয়। ডন সোসাইটির সতীশবাবু আর তাঁর পেটোআ বা চেলারাই এই শিক্ষা-পরিষদের প্রধানতম ধুরন্ধর বা ভারবাহী কর্মকর্তা ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ডন সোসাইটির কাজ শেষ হ'য়ে যায়। পরিষৎও প্রতিষ্ঠিত হ'ল আর ডন সোসাইটির স্বতন্ত্র অস্তিত্বও লোপ পেল। বলা যেতে পারে যে, সোসাইটি চ'লেছিল প্রায় সাড়ে তিন বা চার বৎসর। এই সময়ের ভেতর শ' দু-তিনেক যুবা সতীশবাবুর তদ্‌বিরে "স্বদেশ-নিষ্ঠা" ও স্বার্থত্যাগের বাণী শুনেছে। (পৃঃ ১৬৯)

"সতীশ-মণ্ডল"

লেখক—এই শ' দু-তিনেকের কয়েকজনের নাম ক'র্‌তে পারেন?

সরকার—বয়স হিসাবে সবচেয়ে বড় ছিলেন হারাণচন্দ্র চাক্‌লাদার। তিনি শেষ বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব-বিদ্যার অধ্যাপক হন। তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে পারিস্। বয়স হিসাবে পরবর্তী অগ্রণী ঐতিহাসিক অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। তারপর হচ্ছেন সাহিত্য-শাস্ত্রী রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। তিনি রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। এঁর সঙ্গে কথা বল্‌লে অনেক-কিছু পাবি। কবিরাজ কিশোরীমোহন গুপ্ত অঙ্কে পণ্ডিত। ইনিও বেশ-কিছু

ওয়াকিব্‌হাল। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকারের সঙ্গেও মোলাকাৎ চালানো ভাল। তিনি সতীশবাবু ও ডন সোসাইটি সম্বন্ধে খানিকটা লিখেছিলেন। তা আমি "আর্থিক উন্নতি"তে উদ্ধৃতও ক'রেছি। একালের সরকারী সচিব সন্তোষকুমার বসুও ডন সোসাইটিতে সতীশবাবুর চেলা। তাঁর অভিজ্ঞতাসমূহ কাজে লাগ্‌বে। কথা ব'লে দেখ্‌তে পারিস। বিহারের জন-নায়ক রাজেন্দ্রপ্রসাদও আমাদের "গুরু-ভাই"। বয়সে আমি এঁদের সকলেরই ছোট ছিলাম।

লেখক—বিহারী রাজেন্দ্রপ্রসাদ ডন সোসাইটিতে ঢুক্‌লেন কী ক'রে?

সরকার—ইডেন হিন্দু হষ্টেলে থাক্‌ত। প্রেসিডেন্সি কলেজে সে ছিল আমার এক বছর নিচের ক্লাসে। হিন্দু হষ্টেলের প্রায় সব বিহারী ছাত্রের সঙ্গে আমার মাখামাখি ছিল। তখনকার দিনেও আমি হিন্দিতে বক্‌তে অভ্যস্ত ছিলাম। ভাগলপুরে আমি এক বিহারী বন্ধুর বাড়ীতে অতিথিভাবে কয়েকদিন কাটিয়েও এসেছিলাম।

রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গেও খুব ভাব ছিল, এখনো আছে। আজও আমি তাকে "ভাইয়া রাজেন্দার" ব'লে ডাকি। সেও আমাকে "ভাইয়া বিনইয়া" বলে। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে বহুসংখ্যক বাঙালী ছাত্রের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিল। সেই সূত্রেই সতীশবাবুর সঙ্গে তার দেখা। আর যাঁহা দেখা, তাঁহা ডন সোসাইটিতে ভর্তি হওয়া। বোধ হয় রাধাকুমুদের নেতৃত্বেই রাজেন্দ্রপ্রসাদও আমারই মতন ডন সোসাইটিতে নাম লেখাতে যায়। যতদূর মনে পড়্‌ছে,—একদিনে বা একসঙ্গে নয়। হয়তো আমার পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদ জুটেছিল।

এবার মার্চ মাসে ক্রিপ্‌সের রাষ্ট্রিক প্রস্তাব আলোচনা কর্‌বার জন্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাটনা হ'তে দিল্লী যাচ্ছিল। পথে নেমেছিল কাশীতে। আমি ভাইয়া শিবপ্রসাদ গুপ্ত'র অতিথি ছিলাম। সেও ঐখানে দেখা কর্‌তে এসেছিল। সেই উপলক্ষ্যে ভাইয়া রাজেন্দারের সঙ্গে আমারও আলাদা কথাবার্তা হ'য়েছিল প্রায় ঘণ্টাখানেক।

লেখক—বাঙলাদেশের আর কারু নাম মনে পড়্‌ছে না?

সরকার—মফঃস্বল ও কল্‌কাতার উকিল, ডাক্তার, অধ্যাপক, ইস্কুল-মাষ্টার, ব্যবসাদার, কেরাণী ইত্যাদি শ্রেণীর লোকের ভেতর অনেকে ছেলে-বেলায় ডন সোসাইটিতে ঢুঁ মেরে গেছে। সতীশবাবুর বাথানে বিচিলি খেয়ে যুবক বাঙ্‌লার বহু-সংখ্যক ছোকরা "মানুষ" হয়েছে। বাঙ্‌লাদেশের কোনো জেলার ছেলে বাদ পড়েনি। কার নাম কর্‌বো? আগেই বলেছি, বোধ হয় শ' দু-তিনেক ছোকরা দু-চার-দশ সপ্তাহ অথবা বছর দু-তিন-চার সতীশবাবুর সাক্‌রেতি ক'রেছে। "সতীশ-মণ্ডলে"র দৌলতেই অনেকে স্বদেশ-লেখক হতে পেরেছে। তারা নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা বিবৃত কর্‌লে তুই যা জান্‌তে চাচ্ছিস্ বেরিয়ে আস্‌বে। কে কোন্ মতলবে ডন সোসাইটিতে ঢুকেছিল তা আর কোনো উপায়ে আবিষ্কার করা অসম্ভব। তা ছাড়া এই ধরণের অভিজ্ঞতা বা জীবন-স্মৃতি গোটা পঞ্চাশেক বেরুলে বঙ্গ-বিপ্লবের পূর্ববর্তী আর সম-সাময়িক কথা পাক্‌ড়াও কর্‌তে পার্‌বি।

লেখক—আপনি বল্‌ছেন, সতীশবাবুর সাক্‌রেতেরা অনেকে স্বদেশসেবক হ'তে পেরেছে। তা হ'লে তারা কি স্বদেশ-সেবার কর্ম-কৌশল শিখ্‌বার উদ্দেশ্যে ডন সোসাইটিতে নাম লেখায় নি?

সরকার—কে বল্‌তে পারে? পরবর্তী জীবনে কেহ-কেহ স্বদেশ-সেবক হ'য়েছে। ১৯০৫-০৬ সনের বঙ্গ-বিপ্লব ডন সোসাইটির সভ্যদের উৎসাহে ও কর্মদক্ষতায় বেশ-কিছু পুষ্ট হ'তে পেরেছে। কল্‌কাতায় ও মফঃস্বলে স্বদেশী আন্দোলনের সফলতার জন্য কোনো-

কোনো ক্ষেত্রে সতীশবাবুর চেলারাই দায়ী। আজ ১৯৪২ সনে বাঙলাদেশের জেলায়-জেলায় নানা কর্মক্ষেত্রে নানা কর্মবীর মোতায়েন রয়েছে। তাদের কেহ-কেহ ডন সোসাইটিতে আমাদের গুরু-ভাই ছিল। আজকাল এখানে-সেখানে সার্বজনিক মহোচ্ছবের হিড়িকে মাঝে-মাঝে তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। ঘটনা-চক্রে দুএকবার ডন সোসাইটির পুরাণা কথা বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তা ব'লে ১৯০২-০৬ সনের ছেলেরা ডন সোসাইটিতে স্বদেশনিষ্ঠা শিক্ষার মতলবে ঢুকেছিল, একথা বলা সম্ভব নয়। ডন সোসাইটিতে স্বদেশ-সেবার শিক্ষা পেয়েছিল সকলেই। কিন্তু এই শিক্ষা পাবার উদ্দেশ্য নিয়ে খুব কম ছেলেই হয়ত ঢুকেছিল। প্রশ্নটা জটিল।

আড্ডার দর্শন

লেখক—ডন সোসাইটি তা হ'লে ছেলেদেরকে টান্‌ত কিসের জোরে?

সরকার—ভায়া, আমি নেহাৎ বস্তুনিষ্ঠ লোক। মোটের উপর দেখ্‌তে পাচ্ছি যে,—প্রথম টানটা নতুন-নতুন জ্ঞানলাভ কর্‌বার আর রচনা লিখ্‌বার সাহায্য পাওয়া। দ্বিতীয় টান সার্বজনিক আড্ডার সুযোগ। এই আড্ডার সুযোগকে আমি খুব-বড় টান বিবেচনা করি। আড্ডার দর্শন আমার চিন্তায় যারপরনাই মহত্ত্বপূর্ণ।

লেখক—আড্ডার গুণ আপনি এত গাইছেন কেন?

সরকার—আড্ডায় মাথা ঠাণ্ডা হয়, মগজ পরিষ্কার হয়, মুখস্থ-করা বিদ্যাগুলা সত্যিকার হজম হয়, মেজাজ দিলদেরিয়া হয়। বুঝ্‌লি? আড্ডা বড় জিনিষ। আড্ডার ভেতর লোকেরা স্বাধীনতা চাখ্‌তে পায়। মানুষটার ব্যক্তিত্ব যাচাই হ'য়ে যায় আড্ডার হাসি-ঠাট্টায়, খোস-গল্পে আর বাক-বিতণ্ডায়। তর্কাতর্কির সুযোগে যেখানে, সেখানেই নরনারী স্বরাজ ভোগ করে। মানুষের নিজস্ব, চরিত্রবত্তা, বিদ্যার দৌড়, গুণপণা,—সব-কিছুই পরীক্ষিত হয় মজলিশে। আড্ডার জোরে বাঙালী জাত্‌টা বেঁচে রয়েছে, বেড়ে চ'লেছে। চাই আড্ডা।

লেখক—ডন সোসাইটিকে তো আপনি রীতিমত ইস্কুল-কলেজের সমান ইজ্জদ্ দিয়েছেন? তার আবহাওয়ায় তা দেখ্‌তে পাচ্ছি মিল, কার্লাইল, গীতা, বক্তৃতার সার-সংগ্রহ, কাগজ-পেন্সিল, বাড়িতে ব'সে লেখালেখি, পত্রিকা-সম্পাদন, সেন্সাস রিপোর্ট, ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স,—সবই তো গলদঘর্ম হবার ব্যবস্থা? এর ভেতর মজ্‌লিশি কোথায়?

সরকার—"সতীশ-মণ্ডল"টা চোখের সাম্‌নে রেখে বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্। খানিকটা কল্পনা চালাতে বল্‌ছি। ইস্কুল-কলেজের পাশ-ফেলের সঙ্গে ডন সোসাইটির লেখাপড়ার কোন যোগ নেই। এইটেই হ'লো আসল কথা। স্বাধীনভাবে ছেলেরা নতুন-নতুন কথা শিখ্‌ছে। নিজ-নিজ খেয়াল-মাফিক বক্তৃতাগুলার উপর ভর দিয়ে প্রবন্ধ লিখ্‌ছে। তা ছাড়া তর্কাতর্কি চালাতে পার্‌ছে। আত্মিক স্বাধীনতা এই আবহাওয়ায় খুব বেশী। তার কিম্মৎ লাখ টাকা। আর একটা বড় কথা আছে। তা হচ্ছে কল্‌কাতায় প্রায় সব-কয়টা কলেজের ছাত্র এই আবহাওয়ায় এসে জটলা কর্‌ছে। এই ধরণের কর্মক্ষেত্র বা কর্মমঞ্চ ছেলেদের সামাজিক জীবনের পক্ষে অতিমাত্রায় পুষ্টিকর। নিজ-নিজ হষ্টেলে-মেসে এইরূপ পুষ্টিকর কর্ম-মঞ্চ পাওয়া যায় সন্দেহ নেই। সেই কর্ম-মঞ্চই আরও বিস্তৃত আকারে পাওয়া যাচ্ছে ডন সোসাইটির ব্যবস্থায়। ভিন্ন-ভিন্ন জেলার ছেলেদের সঙ্গে পারস্পরিক বন্ধুত্ব এই আবহাওয়ায় পুষ্টও হচ্ছে, বেড়েও যাচ্ছে।

ডন সোসাইটির এই সামাজিক টানকে আমি আধ্যাত্মিক শক্তি বলি।

লেখক—ছাত্রদের সামাজিক জীবন পুষ্ট কর্‌বার জন্য ডন সোসাইটি কোনো স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কর্‌ত?

সরকার—হাঁ। এই উদ্দেশ্য বিশেষ ব্যবস্থাও করা হ'তো। মাঝে-মাঝে 'সোশ্যাল গ্যাদারিং''য়ের (সামাজিক মেলামেশার) আয়োজন করার দিকে সতীশবাবুর ঝোঁক ছিল। তা ছাড়া সরস্বতী পূজা ইত্যাদির উপলক্ষ্যেও মহোচ্ছব চল্‌ত। লেখা-পড়ার অতিরিক্ত এই সব মেলমেশের দাম আমার চিন্তায় খুব বেশী। এইসব হয়ত বছরে মাত্র দু-তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাতেই অনেকাংশে চরিত্র গঠিত হ'য়ে যায়। যুবক বাঙ্‌লার উপর ডন সোসাইটির প্রভাব এই কারণেই বেশ-কিছু ফুটে' উঠেছিল বল্‌তে পারি।

লেখক—ডন সোসাইটি কল্‌কাতার ছাত্রসমাজে লোকপ্রিয় ছিল কি?

সরকার—তা বলা ঠিক হবে না। আমার বন্ধুমহলে,—প্রেসিডেন্সি কলেজে আর হিন্দু হষ্টেলে,—ডন সোসাইটি নিয়ে হাসিঠাট্টা চল্‌ত। ইয়ারের দলে আমাকে ডাক্‌ত "ডন সোসাইটির চাঁই" ব'লে। মাঝে-মাঝে দুএকজন বন্ধু আমার সঙ্গে বক্তৃতা শুন্‌তে যেত। ফিরে এসে গীতার বাণী ঠাট্টা ক'রে বল্‌ত ঃ—"কিরে, বিনয় সরকার, সুখও যা দুঃখও তা, কি বলিস্? লাভও কিছু নয়, লোকসানও কিছু নয়। বাঃ। মানুষগুলা গাছপালা নাকি রে? জানোআরও নয়?" ডন সোসাইটিতে কখনো-কখনো পঁচাত্তর বা শ'-খানেক ছেলেও দেখেছি। কিন্তু একটা জনপ্রিয় সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান ছিল কিনা সন্দেহ।

ডন সোসাইটির স্বদেশী দোকান

লেখক—বক্তৃতা, প্রবন্ধ-রচনা, পত্রিকা-সম্পাদন ইত্যাদি ছাড়া ডন সোসাইটির ব্যবস্থায় অন্য কোনো অনুষ্ঠান ছিল?

সরকার—সতীশবাবু একটা স্বদেশী জিনিষের দোকান কায়েম করেন। ডন সোসাইটির অধীনে দোকানটা চল্‌ত। ১৯০৩-০৪ সনে তার প্রতিষ্ঠা।

লেখক—সংস্কৃতি-শিক্ষালয়ের সঙ্গে দোকান? সে আবার কী? দোকান কায়েম হ'ল কেন?

সরকার—ছোঁড়াদেরকে "কেজো লোকে" পরিণত করা ছিল সতীশবাবুর মতলব। এই দোকানের মারফৎ আমরা পাইকারি হিসাবে জিনিষপত্র কিন্‌তে শিখ্‌তাম। মালগুলা কোথায় পাওয়া যায় এই খবর রাখ্‌তে হ'তো। বাজার-দরের উঠা-নামা বুঝ্‌তে হ'ত। পাইকারি আর খুচরা দরের প্রভেদ সম্বন্ধে টন-ট'নে জ্ঞান জন্মাত। এই গেল মাল জোগানের দিক। তারপর দোকানে মাল মজুত রাখার ধান্ধা। কোন্ জিনিষের কত পরিমাণ দোকানে মজুত রাখা উচিত তার অভিজ্ঞতা লাভ ছিল একটা মস্ত কথা। বেচ্‌বার দাম ঠিক করাও সোজা ছিল না। বেঁচে টাকা-পয়সা জমা করা বেশ-কিছু কঠিন মালুম হ'তো। সব চেয়ে কঠিন ছিল বোধ হয় হিসাব রাখা। সতীশবাবু এই সব কাজের ভেতর দিয়ে চেলাদেরকে ডানপিটেরূপে গ'ড়ে তুল্‌তে চেয়েছিলেন। এরি নাম "হাতে-কলমে" কাজ শেখা।

লেখক—আপনি কখনো এই দোকানে কাজ ক'রেছেন?

সরকার—অতি সামান্য। ডন সোসাইটির সব সভ্যই সব কাজ পুরা মাত্রায় কর্‌ত না।

দোকানদারিতে শুধু আমিই ফেল মারি নি। হারাণ চাকলাদার, রাধাকুমুদ, রবী ঘোষ, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ইত্যাদি অনেকেই আমার মতন ম্যাড়াকান্ত প্রমাণিত হ'য়েছিল। কেহ-কেহ দোকানদারিটা বিশেষভাবে বেছে নিয়েছিল। তারা বোধ হয় এই দিকে পেকে উঠেছিলও। দোকানদারির আবহাওয়ায় আমি খানিকটা লাভবান্ হ'য়েছিলাম। কোন্ দিকে জানিস্?

লেখক—বলুন না কোন্ দিকে? আমি আন্দাজ কর্‌তে পার্‌ছি না।

সরকার—বুঝে নিলাম যে, ইচ্ছা করলেই যে-কোনো লোক দোকান চালাতে পারে না। দোকানদারির জন্যও সাধনা আবশ্যক। দোকান-যোগ অন্যান্য যোগের মতই কঠিন যোগ। আর একটা ধারণা মগজে ঢুকেছিল দোকানদারির আবহাওয়ায়। তা এই। প্রত্যেক ছোকরার পক্ষেই কোনো-না কোনো "হাতে-কলমে" কাজ করা জরুরি। কাজের সঙ্গে ছোঁআঁ-ছুঁয়ি না থাক্‌লে মানুষের মুড়োটা পাকে না। চরিত্র-গঠনের জন্যও চাই কাজ সুরু করা, কাজ ক'রে চলা, কাজের আবেষ্টনের ভেতর রোজ-রোজ কয়েক ঘণ্টা কাটানো। ডন সোসাইটির এই অভিজ্ঞতায় আমার পরবর্তী জীবন যারপরনাই প্রভাবান্বিত হ'য়েছে। "সতীশ-মণ্ডলে"র কাছে এই বিষয়ে আমি বেশ-কিছু ঋণী। ১৯০৩-০৪ সনের কথাই এখনো চল্‌ছে।

লেখক—দোকানদারিতে সতীশবাবুর নিজ খেয়াল কিরূপ ছিল?

সরকার—বোধ হয় আধ কাঁচ্চাও না। টাকা-পয়সার সংশ্রব হ'তে সতীশবাবু দূরে থাক্‌তেন। যুবক বাঙলার ব্যবসাবুদ্ধি গজানো আর বাড়ানো ছিল তাঁর একমাত্র ধান্ধা। ধর্মবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড অতি কোরা ও কড়াভাবে শেখানো ছাড়া তাঁর আর কোনো লক্ষ্য ছিল না। সঙ্গে-সঙ্গে মনে রাখ্‌তে হবে যে, দোকানটায় একমাত্র স্বদেশী জিনিষ রাখা হ'তো। এর মহত্ত্ব খুব বেশী।

লেখক—স্বদেশী দোকানের মহত্ত্ব এত বেশী দেখ্‌ছেন কোথ্‌থেকে?

সরকার—স্বদেশী দোকানটা ডন সোসাইটির তদবিরে কায়েম হ'ল কবে? গৌরবময় স্বদেশী আন্দোলন সুরু হবার বৎসর দেড়েক আগে (১৯০৩-০৪ সনে)। এইটাই সতীশবাবুর বিশেষত্ব ও গৌরব। বাঙালী জাত্ বয়কট ও স্বদেশী কায়েম করে ৭ই আগষ্ট ১৯০৫। তার আগে হ'তেই "সতীশ-মণ্ডল" স্বদেশী জিনিষের আত্মিক কেন্দ্র। ১৯০৫ সনে আমাদের নতুন ক'রে স্বদেশী মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে হয় নি। ডন সোসাইটির সভ্যেরা শহরে-মফঃস্বলে আপনা-আপনিই স্বদেশী-আন্দোলনের প্রচারক হ'তে পেরেছিল। এই হিসাবে সতীশবাবু স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম জন্মদাতা। ডন সোসাইটির তিন বৎসর (১৯০২-০৫) বঙ্গ বিপ্লবের জন্ম-বৃত্তান্তে যারপরনাই মূল্যবান্।

লেখক—ডন সোসাইটির স্বদেশী দোকানের খবর কল্‌কাতার বেশী লোকে জান্‌ত কি?

সরকার—ছেলেদের মেসে-হষ্টেলে খবরটা র'টেছিল। তবে দোকানটা আকারে-বহরে বড় কিছু নয়। জনসাধারণের নজর সে-দিকে যাবে কী ক'রে? তবে বছরে একবার ক'রে স্বদেশী জিনিষের প্রদর্শনী খোলা হ'ত। তাতে জনসাধারণ দেখ্‌তে আস্‌ত। ডন সোসাইটির সভ্যরাই প্রদর্শনীটা সাজাতো আর লোকজনকে দেখাত। প্রদর্শনীর জন্য মেট্রোপলিটান কলেজেরই দোতলার ঘরগুলা ব্যবহৃত হ'ত।

লেখক—দোকানের সঙ্গে ডন সোসাইটির অন্যান্য কাজের যোগাযোগ কিরূপ ছিল?

সরকার—দোকানদারিটা বক্তৃতা ও প্রবন্ধ-রচনার সমান ইজ্জদ্ পেত। ডন সোসাইটির নিয়মে ছেলেরা প্রত্যেক কাজ সম্বন্ধে পরস্পরকে ভোট দিয়ে নম্বর দিত। বৎসর শেষে পরীক্ষার ফল নির্ভর কর্‌ত ছেলেদের ভোটের উপর। সতীশবাবুর মতের দিকে তাকিয়ে

কেহ ভোট দিত না। তিনি নিজে পরীক্ষক হ'তেন না, ভোটও দিতেন না। সারা বৎসর কে কিরকম কাজ করেছে সব একসঙ্গে বিচার করা হ'ত। দোকানদারি কাজটাও উপস্থিতি, প্রবন্ধ-রচনা ইত্যাদির মতন একটা স্বতন্ত্র পরীক্ষণীয় বিষয় ছিল। প্রত্যেক বিভাগের কাজ সম্বন্ধে আমরা পরস্পর পরস্পরকে নম্বর দিতাম। বিভাগগুলাকে ছোট-বড় ভাগ করা হ'ত না। সভ্যদের সকল কাজ একত্রে যোগ ক'রে উঁচু-নীচু করা হ'ত। এমন কি, বৃত্তি দিবার ব্যবস্থাও ছিল। তাতে কোনো-কোনো ছাত্রের কলেজে মাইনে দিবার সাহায্য হ'ত।

লেখক—এই সব কাজের জন্য টাকা আস্‌ত কোথ্‌থেকে?

সরকার—টাকার জন্য সতীশবাবু দায়ী। মনে পড়ছে,—রাজা কৃষ্ণদাস লাহা সতীশবাবুকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন (১৯০৪-০৬)। কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীও সতীশবাবুর গুণগ্রাহী ছিলেন।

লেখক—সতীশবাবুর এই কার্য্যপ্রণালী হ'তে আপনি নিজে কিছু শিখেছেন?

সরকার—খুব বেশী। ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় ইহা আমার বোধ হয় সব-চেয়ে বড় শিক্ষা।

আমার মাথা ঢুকেছিল গোটা কয়েক কথা। দেশের কাজ করার প্রথম মানে,—নিজে টাকা রোজগার না করা। দ্বিতীয় মানে,—নানা প্রকার কাজের জন্য যেখানে-সেখানে বন্ধুদের নিকট টাকা ভিক্ষা করা। তৃতীয় মানে—সার্বজনিক চাঁদার উপর নির্ভর না করা। চতুর্থ মানে বিচিত্র। যে-টাকার হিসাব দিতে হয় রাস্তার লোককে,—সে-টাকা একদম স্পর্শ না করা।

সতীশ মুখোপাধ্যায়ের বন্ধুবর্গ

২৮শে নবেম্বর ১৯৪২

লেখক—ডন সোসাইটির ব্যবস্থায় শারীরিক উৎকর্ষের কোনো আয়োজন ছিল না?

সরকার—নিয়মিত কোনো আয়োজন ছিল না। তবে মেলামেশার উপলক্ষ্যে, মহোচ্ছবের দিন কুস্তী-কছরত ইত্যাদি দেখানো হ'ত। সতীশবাবু সেকালের নামজাদা খেলোআড়, কুস্তীগির, ব্যায়ামবীর ইত্যাদির দল ডেকে আন্‌তেন। ডন সোসাইটির তদ্‌বিরে খেলাধূলা দেখাবার ব্যবস্থা হ'ত। জনসাধারণও আস্‌ত। মেট্রোপলিটান কলেজেরই ভেতরকার উঠানে পালোয়ানির প্রদর্শনী দেখেছে সেকালের অনেকে।

লেখক—সতীশ মুখোপাধ্যায়ের কাজে বন্ধু ছিলেন কারা? তাঁর ডন সোসাইটির মুরুব্বিস্থানীয় অথবা সাহায্যকারী কে-কে ছিলেন? তার কাজে সহযোগিতা ক'র্‌তেন কোন্-কোন্ মনীষী বা স্বদেশসেবক?

সরকার—সতীশবাবুর বন্ধুবর্গ ছিল অসীম। হাইকোর্টের কোনো উকিল বা জজ তাঁর অ-চেনা ছিল না। ডাক্তার-বন্ধুও ছিল বহুসংখ্যক। কলেজের অধ্যাপকদের ভেতর তাঁর সঙ্গে আনাগোনা ছিল না কার জানি না। সংবাদপত্র-সেবীদের দলে তাঁর গতিবিধি ছিল ঘন-ঘন। রাষ্ট্রিক জননায়কদের সঙ্গেও মাখামাখি ছিল তাঁর গভীর। মনে হ'ত যে, তাঁর অ-চেনা কেউ নয় আর তাঁকে চিন্‌ত না এমনও কেহ নাই।

১৯০৫-এর আগেই এই অবস্থা। তার পরবর্তী যুগের বন্ধুসংখ্যা তো আরও বিশাল। তাঁর বন্ধুদের কাজ-কর্ম আমাদের সুপরিচিত ছিল। অনেকের সঙ্গে আলাপও ছিল। বস্তুতঃ ছোক্‌রা

বয়সেই কল্‌কাতার বহুসংখ্যক নেতার সঙ্গে এই অধমের চেনা-শুনা হ'য়ে গিয়েছিল। "সতীশ-মণ্ডলে"র নিকট এই ঋণটা খুব মহত্ত্বপূর্ণ।

লেখক—কেন? ১৯০৫ এর পরবর্তী কালের সতীশবাবুর বন্ধুবর্গ সম্বন্ধে একথা বল্‌ছেন কি বুঝে'? এই সময়ের বিশেষত্ব কী?

সরকার—১৯০৫-এর আগস্ট মাসে বিলাতী বয়কট চালু হ'ল কল্‌কাতায়। তারপর হ'তে দেশশুদ্ধ হৈ-হৈ রৈ-রৈ। তখন কে যে কাকে চেনে আর কে যে কাকে চেনে না ঠাওরাবার সাধ্য কার? দিন নাই রাত নাই,—চব্বিশঘণ্টা লোকের ভিড় সতীশবাবুর ঘরে। শুধু কি কল্‌কাতার লোকই আস্‌ত? কোথায় চাটগাঁ-কুমিল্লা? কোথায় আসাম? কোথায় বরিশাল-ময়মনসিংহ? কোথায় মেদিনীপুর-বীরভূম? কোথায় দিনাজপুর-বগুড়া? কেউ যাবে জাপানে-আমেরিকায়। ছুটো সতীশবাবুর কাছে। কেউ বসাবে গেঞ্জীর কল। ছুটো সতীশবাবুর কাছে। কেউ করাবে বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট। ছুটো সতীশবাবুর কাছে। যত রাজ্যের যত ছোঁড়া-বুড়ো,—সব এসে হাজির হ'ত সতীশবাবুর নিকট হদিশ নিতে।

লেখক— ১৯০৫-০৬ সনের যুগে কল্‌কাতার আর মফঃস্বলের আবহাওয়ায় বাস্তবিক একটা চাঞ্চল্য ও অশান্তি দেখা যেত কি?

সরকার—তাও বল্‌তে হবে? সে এক স্বর্গীয় ঘটনা। ঐ অভিজ্ঞতা জীবনে আর দ্বিতীয় বার হ'ল না।

গোটা বাঙালী জাত ১৯০৫ সনে মাতাল হয়ে প'ড়েছিল সেই বিবেকানন্দ-বাঞ্ছিত "একবগ্‌গা ক্ষ্যাপামি"তে। বুঝ্‌লি কাকে বলে আন্দোলন? কেবল ছুটা-ছুটি, হরদম চলাফেরা, হামেশা ঘোঁট-মঙ্গল। বুঝ্‌লি কার নাম ১৯০৫? বুঝেছিস্ বঙ্গ-বিপ্লব কী চিজ? এই সব উন্মাদনা, ছুটাছুটি, লাফালাফি কল্পনা করা যেত না ১৯০৫-এর পূর্বে।

বাঙালীর স্বদেশ-আত্মা কেটে-ছিঁড়ে ছুটে' বেরিয়ে এল। কোথ্‌থেকে এল কে জানে? কোথায় যাবে কে জানে?

বাংলার নরনারী চাখ্‌তে সুরু কর্‌ল "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ।" দেশ শুদ্ধ লোক "জগৎ প্লাবিয়া বেড়াতো গাহিয়া আকুল পাগল-পারা"। সবাই দাবী কর্‌ত অপর সকলের সময়ের উপর, মেহনতের উপর। কাজেই ১৯০৫-এর পরবর্তী সতীশবাবুর জীবনে ঘর আর পর ফারাক্ করা সম্ভব পর ছিল না। অবশ্য মামুলি হিসাবের ঘর তো সতীশবাবুর কোনো দিনই ছিল না।

ব্রহ্মবান্ধব ও ডন সোসাইটি

লেখক---সতীশবাবুর বন্ধুদের ভেতর ডন সোসাইটিতে কেহ আস্‌তেন কি? তাঁদের দু এক জনের নাম কর্‌বেন? যাঁদেরকে আপনি স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ডন সোসাইটিতে দেখেছেন সেই রকম লোকের নাম জান্‌তে চাচ্ছি।

সরকার—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের নাম করতে পারি। এঁকে আমি ডন সোসাইটিতে দেখি ১৯০৪ সনে। সতীশবাবু একদিন ব্রহ্মবান্ধবকে বক্তা ভাবে নিয়ে এসেছিলেন। "জেনার‍্যাল ট্রেনিং" বা সাধারণ সংস্কৃতি বিভাগে বক্তৃতা হ'ল।

লেখক—বক্তৃতার বিষয় কী ছিল?

সরকার—ব্রহ্মবান্ধব অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (১৯০২)। তার ফলে বিলাতে এই বিষয়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। ব্রহ্মবান্ধবের কাছে এই খবরটা পাওয়া গেল। তা ছাড়া তিনি বিলাতী বক্তৃতার কিঞ্চিৎ চুম্বকও দিলেন।

লেখক—বিলাতী বক্তৃতা সমূহের সারমর্মটার কিছু মনে আছে?

সরকার—ব্রহ্মবান্ধব হেগেলের তর্কপ্রণালীর সাহায্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনা সাধন ক'রেছিলেন। একালে আমি যাকে "দ্বন্দ্ব-মূলক বিশ্লেষণ" বলি ব্রহ্মবান্ধব তাকে "অপবাদ-ন্যায়" ব'লেছিলেন। বক্তৃতার বৃত্তান্ত বোধ হয় ডন-ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল।

লেখক—ব্রহ্মবান্ধব সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা হ'য়েছিল?

সরকার—ঐ প্রথম দেখ্‌লাম। গেরুয়া-পরা লোক। পায়ে ছিল না জুতা। কাছাখোলা সাধুর চেহারা। গায়ে জামা নাই,—গেরুয়া চাদর। এই মূর্তিতে আমি একটা নয়া দুনিয়ার খবর পেলাম। তখনও আমি বিবেকানন্দী দলের কোনো স্বামীজিকে দেখিনি। সতীশবাবু ফকীর বটে,—কিন্তু তাঁর কাপড়-চোপড়ে সাধুয়ানি ছিল না। ব্রহ্মবান্ধবই আমার অভিজ্ঞতায় সর্বপ্রথম আধুনিক বাঙালী সন্ন্যাসী। কাজেই আমি তাঁর হাব-ভাবে বিশেষ প্রভাবান্বিত হ'য়ে ছিলাম। মনে হ'য়েছিল,—ব্রহ্মবান্ধব সতীশবাবুর পরবর্তী ধাপ। অনুকরণযোগ্যও বটে। তাঁর চোখের আর হাঁটার ভঙ্গী দেখে মনে হ'য়েছিল যে, লোক্‌টা চব্বিশ-ঘণ্টা দুনিয়াকে কলা দেখাচ্ছে। মানুষের মতন মানুষ। এইরকম লোকই চাই।

লেখক—ব্রহ্মবান্ধবের বাণীটা কিরূপ মনে হ'য়েছিল?

সরকার—শুন্‌লাম,—পশ্চিমাবা কদর করে একমাত্র ভোগ। ত্যাগের ধার তারা ধারে না। হিন্দু-সংস্কৃতি একমাত্র ভোগপন্থীও নয় আবার একমাত্র ত্যাগপন্থীও নয়। ত্যাগ ও ভোগের সমন্বয় হচ্ছে ভারতীয় সনাতন আদর্শ। এইখানেই হেগেল-প্রচালিত "সিনথেসিস" (সমন্বয়)।

লেখক—ব্রহ্মবান্ধবের এই ব্যাখ্যা আপনার কেমন লেগেছিল?

সরকার—লেগেছিল চমৎকার। মাত্ হয়ে গিয়েছিলাম। তখন বয়স সতর মাত্র (১৯০৪)। চতুর্থ বার্ষিকের ছাত্র। এই ধরণের কথা ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় নতুন নয়, কিন্তু বল্‌বার ঢঙ্‌টা নতুন। কাজেই মনে হ'য়েছিল যেন একটা দার্শনিক তাজমহলের মালিক হ'য়ে গেলাম। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ (জুলাই, ১৯০৪) অনেকের মতন আমাকেও একদম ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। রোমান্টিক ভাবুকতায় হাবু-ডুবু খাচ্ছিলাম।

লেখক—এই বাণীর ভেতর কি এখনো আপনার নিজ-মত পেতে পারি?

সরকার—একদম নয়। পুরাপুরি উল্টা। প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে প্রভেদ আমি স্বীকার করি না। কিন্তু ব্রহ্মবান্ধবের ব্যাখাটা আমার চিন্তায় কয়েক বৎসর বেশ কাজ ক'রেছিল। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবুকতা আর আদর্শনিষ্ঠাও জুটে প'ড়েছিল। ১৯০৭ সনে মালদহে জাতীয় শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠার সময় আমি "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" প্রবন্ধ পাঠ করি। তাতে "সতীশ-মণ্ডল", ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্র-সাহিত্য ইত্যাদি সব-কিছু একসঙ্গে সজোরে আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল। কিন্তু তার ভেতরেই যৎ-কিঞ্চিৎ নিজস্বও ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। তবে ব্রহ্মবান্ধব ইত্যাদির প্রভাবই ফুটেছিল খুব-বেশী। ১৯১১ সনে শুক্রনীতি তর্জমা করার সঙ্গে-সঙ্গে সেই প্রভাব প্রায় লুপ্ত হ'য়ে যায়। তবে ১৯১৪ সনে বিলাতে গিয়ে "ইংরেজের জন্মভূমি" লিখ্‌বার সময়ও সেই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভেদমূলক ভারতীয় বাণী কিছু-কিছু বজায় ছিল। তারপর হ'তে

এই অধম আর সে-পথে বিচরণ করে নি। কাজেই ব্রহ্মবান্ধবের এক বক্তৃতার জের চ'লেছিল বছর দশেক বলা যেতে পারে।

("হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি", ৩০শে আগষ্ট, "১৯০৫ সনের পরবর্তী ভারতীয় দৃষ্টি-ভঙ্গী," ১৪ই অক্টোবর, "ডন-পত্রিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", নবেম্বর, "ভগ্নী নিবেদিতার আবহাওয়া," নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—ব্রহ্মবান্ধবের বক্তৃতায় আপনার আর কোনো উল্লেখযোগ্য কথা মনে হ'য়েছিল?

সরকার—ভাব্‌ছিলাম,—একটা দিগ্‌বিজয়ী বাঙালীর বাচ্চাকে স্বচক্ষে দেখা গেল। বিবেকানন্দও দিগ্‌বিজয়ী বটে। কিন্তু তাঁকে চোখে দেখি নি। ব্রহ্মবান্ধব বিলাতে গিয়ে কেম্ব্রিজ ও অক্‌সফোর্ডে বক্তৃতা দিয়েছেন। সেই বক্তৃতার ফলে বিলাতী সমাজে একটা আন্দোলনও রুজু হয়েছে। সতর বৎসরের এক ছোকরা আমি। এর চেয়ে বড় ঘটনা বাঙালীর জীবনের পক্ষে ভাব্‌তে পারি নি। বাপ্‌কা বেটা ব্রহ্মবান্ধব সন্দেহ নেই।

লেখক—আপনার সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধবের কোনো যোগাযোগ পরবর্তী কালে ঘ'টেছিল?

সরকার—১৯০৫ সনের জুন মাসে রাধাকুমুদ, আর রবী ঘোষের সঙ্গে আমিও ইডেন হিন্দু হষ্টেল ছেড়ে দিই। সতীশবাবুর তদ্‌বিরে আমরা তাঁর তিন পেটোআ নতুন এক মেসের ব্যবস্থা করি। সেই মেসের কর্মকর্তা হন ব্রহ্মবান্ধব। তখন ব্রহ্মবান্ধব সারস্বত আয়তন নামে একটা ইস্কুলে ছেলেদের পাঠশালা চালাতেন। তাঁর সঙ্গে এলেন পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী। এঁরা দুজনেই সতীশ-মণ্ডলের অন্তর্গত হ'য়ে গেলেন। পরবর্তীকালে সামাধ্যাযা ১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের অধ্যাপক বাহাল হ'ন। মনে রাখ্‌তে হবে যে, বিলাতী-বয়কট আর বঙ্গ-বিপ্লব খোলাখুলি সুরু হয় ৭ই আগষ্ট (১৯০৫)।

লেখক—ব্রহ্মবান্ধবের এই মেস কোথায় ছিল?

সরকার—কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে ছিল ঠিকানা। একটা বড় বাড়ী। নাম ছিল তাব রাজবাড়ী। ঢুক্‌তে হ'তো শিবনারায়ণ দাসের গলি দিয়ে। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উপর পূব্‌দিকে ছিল মাঠ,—বাড়ীটার সামনে বা পেছনে। তাকে লোকেরা বল্‌তো "পান্তের মাঠ"। মাঠের দক্ষিণেই মেট্রোপলিটান কলেজের পেছনটা। আমরা থাক্‌তাম দোতলায়। ঘর থেকে পশ্চিমে দেখ্‌তাম মাঠ আর কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, আর দক্ষিণেও মাঠ এবং মেট্রোপলিটন কলেজ।

লেখক—এই মেসে বস-বাসের কোনো কথা মনে আছে?

সরকার—মামুলি কথা নয়। সে-সব কথা যুগান্তরের কথা। নয়া বাঙলার আসল গোড়াপত্তনের কথা। বঙ্গ-বিপ্লবের অনেক-কিছু ঘ'টত এই বাড়ীর সামনের মাঠে। সবই আমরা ঘরে ব'সে দেখ্‌তাম। সভায় হাজির থাকার দরকার হ'তো না। তবে সভায় যা কিছু ঘটত তার বেশ-কিছু আমাদের বাড়ীরই ঘর-গুলায় আর এক-তলায় আগে থেকে তৈরি হ'য়ে থাক্‌ত। কেননা সতীশবাবু আর ব্রহ্মবান্ধব এই দুজনের শল্লা স্বদেশী আন্দোলনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে হামেশা জরুরি হ'তো। প্রকারান্তরে বলা চলে যে, বঙ্গ-বিপ্লবের "গ্রীণ রুমে" বা সাজঘরেই রাধাকুমুদ, রবী আর সামাধ্যায়ীর সঙ্গে আমি ১৯০৫-এর গৌরবময় দিন, সপ্তাহ বা মাসগুলা কাটিয়েছি। তখন আমাদের আত্মিক অভিভাবক সতীশবাবু আর ব্রহ্মবান্ধব। ১৯০৬ সনের জুন পর্যন্ত এইভাবে কাটে। তখন সতীশবাবুর সঙ্গে আমরা ৩৮।২ নং শিবনারায়ণ দাসের গলির বাড়ীতে উঠে যাই। সেখানে আর ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে মেসের সংশ্রব ছিল না।

লেখক—ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কে আর-কিছু বল্‌বেন?

সরকার—ব্রহ্মবান্ধব একজন জবরদস্ত স্বার্থত্যাগী ও নির্ভীক কর্মবীর। লোকটা ডান্‌পিটে, ত্যাঁদড় আর ভবঘুরে। যতগুলা গুণ আমার বিবেচনায় যুগ-প্রবর্তকের লক্ষণ সবগুলাই তাঁর ছিল। তাঁর সংস্পর্শে এসে যুবক বাঙ্‌লার অনেকে স্বদেশ-সেবার নানা কাজে মোতায়েন হ'তে পেরেছে। দেশের লোক তাঁকে "সন্ধ্যা" (১৯০৭) দৈনিকের সম্পাদক ব'লে জানে। বস্তুতঃ, ব্রহ্মবান্ধবের চিন্তাসম্পদে বাঙালী জাত্ ঐশ্বর্যশালী হ'য়েছে। তাঁর জীবন-কথা স্বতন্ত্রভাবে বড় আকারে আলোচিত হওয়া উচিত। তোরা বোধ হয় তাঁর কোনো খবর রাখিস্ না। ১৯০৫-এর পরবর্তী বঙ্গ-সমাজের বিভিন্ন আন্দোলনে ব্রহ্মবান্ধবের বিরাট ব্যক্তিত্ব জ্বল্-জ্বল্ কর্‌ছে। (পৃষ্ঠা ৩০৩)

ব্রহ্মবান্ধবের কাছে আমার আর একটা ঋণ স্বীকার ক'রে খতম কর্‌ছি। ডন সোসাইটির এক সভায়,—বোধ হয় ১৯০৫ সনে,—তাঁর সারস্বত আয়তনের কয়েকটা ছোকরা রবিবাবুর একটা গান গেয়েছিল। সেটা আজও আমি একা-একা আপন মনে গেয়ে থাকি। শোন্,—

"প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামি
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।"

সাঁইত্রিশ বছর ধ'রে এই সুরটা আমার গলায় বেরুচ্ছে। অবশ্য কেউ শুন্‌তে পায় না। বুঝ্‌তেই পার্‌ছিস তো কার গলা?

"সুবোধ-মণ্ডল"

লেখক—সতীশ-মণ্ডলের মেসের নিচের তলায় কি হ'তো?

সরকার—সেও বিপুল ঐতিহাসিক চিজ। নিচের তলায় ছিল "ফীল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী ক্লাব"। সেই ক্লাবের উদ্যোক্তাদের ভেতর ছিলেন সুবোধ মল্লিক, বিপিন পাল, ইত্যাদি নবীন-প্রবীণের দল। বিলিয়ার্ড খেলার ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গে-সঙ্গে আড্ডা, খোসগল্প, ঘোঁট-মঙ্গল, আর আন্দোলন। এই আবহাওয়ায়ই সুবোধ মল্লিক লা[illegible] টাকা দিয়ে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সূত্রপাত করতে রাজি হন। সেই থেকে বিপিন পাল সুবোধ মল্লিককে "রাজা" ব'লে ডাক্‌তে সুরু করেন। দেশের লোক আজও সুবোধ মল্লিককে "রাজা" ব'লে চেনে।

লেখক—সুবোধ মল্লিকের সম্বন্ধে আর-কিছু বল্‌বেন?

সরকার—অরবিন্দ'র অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন সুবোধ মল্লিক। স্বদেশী যুগের অনেক ছোক্‌রা তাঁর বাড়ীতে থাক্‌তো ও খেতো। তাঁর দেওয়া টাকা দিয়ে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে গবেষণা সুরু করে। অরবিন্দ হ'ন প্রথম অধ্যাপক (১৯০৬)। অরবিন্দ'র বোমার মামলার পর সেই পদে বাহাল হন রাধাকুমুদ (১৯০৮)। রাধাকুমুদের ভারতীয় সমুদ্রযাত্রা ও বৃহত্তর ভারত-বিষয়ক বইয়ের (১৯১১) উৎপত্তি এইখানে। দেখ্‌ছিস কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে ঠেক্‌ছে।

লেখক—ফীল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী ক্লাবের সঙ্গে কল্‌কাতার লোকজনের যোগাযোগ ছিল?

সরকার—এই আবহাওয়াই ব্রজেন শীলকে নিয়ে এসে পান খাওয়া[illegible] খাওয়াতে হেগেল ইত্যাদি যা-হ'ক-কিছু বকিয়ে ছাড়ানো হ'ত। এই আবহাওয়ায়ই রবীন্দ্রনাথ, হীরেন

দত্ত ইত্যাদির সঙ্গে ছোকরাদের দহরম-মহরম চল্‌তে পার্‌ত। উদীয়মান ব্যারিষ্টারদের ভেতর বিজয় চ্যাটার্জি, রজত রায় ইত্যাদির আনাগোনাও ছিল। অরবিন্দ'র অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু চারু দত্ত জজ্‌কেও "সুবোধ-মণ্ডলে" দেখা যেত।

লেখক—এই ক্লাবের সঙ্গে ডন সোসাইটির মেলামেশা ছিল কি?

সরকার—ক্লাবটাকে বল্‌তে পারি "সুবোধ-মণ্ডল"। নিচের তলায় ক্লাব চল্‌তো ক্লাবভাবে, আর দোতলায় "সতীশ-মণ্ডলে"র আমরা চল্‌তাম আমাদের পথে। কিন্তু ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল দস্তুর মতন। সতীশ-মণ্ডলের আকার-প্রকার আপনা-আপনিই বেড়ে গিয়েছিল। সতীশবাবুর পেটোআ হিসাবে আমরা নিজ-নিজ চৌকিতে ব'সেই কল্‌কাতার জন-নায়কগণকে মুঠোর ভেতর পাকড়াও কর্‌তে পার্‌তাম। এজন্য কারু উমেদারি করার দরকার হ'ত না। বিপিন পাল, হীরেন দত্ত ইত্যাদি সতীশবাবুর রসিক বন্ধুরা আমাদেরকে তাঁর "বাথান" ব'লে ঠাট্টা কর্‌ত। ইয়ারের দলে বলাবলি কর্‌ত ওটা 'সতীশবাবুর গোআল।"

ভগ্নী নিবেদিতার আবহাওয়া

লেখক—সতীশবাবুর আর কোনো বন্ধুর নাম কর্‌বেন? স্বদেশী আন্দোলনের পূর্বে ডন সোসাইটিতে আপনি দেখেছেন এমন লোক চাই।

সরকার—ভগ্নী নিবেদিতার নাম করতে পারি। ইনিও সতীশবাবুর জেনার‍্যাল ট্রেনিং বিভাগেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নিবেদিতা আইরিশ মহিলা—বিবেকানন্দ'র দীক্ষায় রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অন্যতম খাঁটি সেবক। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল "জাতীয়তা"।

লেখক—নিবেদিতার কথাগুলা কেমন লেগেছিল?

সরকার—তাঁকেও ঐ প্রথম দেখেছিলাম (১৯০৪)। আইরিশ বেটি,—ইংরেজি বলে ভাল। তা ছাড়া স্বদেশিকতার ঝাঁজ্‌ ত আছেই। তবে সতীশবাবুর চেলা হ'য়ে স্বদেশ-নিষ্ঠা আর স্বার্থত্যাগ বা কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে নতুন-কিছু পাওয়া সোজা কথা নয়। যাই হ'ক,—মনে হ'য়েছিল বিদেশিনী হ'য়েও নিবেদিতা ষোল-আনা ভারতীয় স্বার্থের প্রতিনিধি। এটা আমার পক্ষে সেই সময়ে একটা আবিষ্কার বিশেষ।

লেখক—কেন? এর ভেতর আবিষ্কার কি আছে?

সরকার—প্রেসিডেন্সি কলেজে গোটা কয়েক সাদা অধ্যাপক ছাড়া আর কোনো সাদা লোকের সংস্পর্শে তখনও আসি-নি। নিবেদিতা প্রথম সাদা লোক যার কথায় ভারতীয় স্বাধীনতার অকপট বাণী শুন্‌তে পেলাম। অধিকন্তু বুখ্‌নিগুলা বেশ জোরাল ও ঝাঁজাল। এই অভিজ্ঞতা যারপরনাই মূল্যবান্‌। মনে হ'য়েছিল তাঁকে ভগ্নী বলা যেতে পারে। অধিকন্তু তাঁকে দেখে মেম সাহেব মনে হয় নি। কেন না তাঁর চেহারায় বা চোখে বজ্জাতি ভাব ছিল না। মনে হ'য়েছিল যে, মেয়েটা একটা হৃদয়ওয়ালা সত্যিকার মানুষ। ঘটনাচক্রে রংটা তার সাদা।

লেখক—নিবেদিতার সঙ্গে এই সংস্পর্শে আর কিছু মনে হ'য়েছিল?

সরকার—দেখ্‌লাম,—নিবেদিতা রমেশ দত্ত'র গুণগ্রাহী। তাঁর গবেষণা ও লেখালেখির খবর দিলেন। রমেশ দত্তকে পয়লা নম্বরের স্বদেশ-সেবক তিনি বিবেচনা করেন। অথচ রমেশ দত্ত উঁচু দরের সরকারী চাক্‌রে। মনে হ'ল,—নিবেদিতা লোকগুলাকে বাজিয়ে দেখ্‌তে

জানেন. আর একটা কথা মনে পড়ছে। নিবেদিতা বল্‌লেন—যুবক ভারত স্বাধীনতার মাঠে দৌড়ের জন্য তৈয়ের হচ্ছে মাত্র। এখনো দৌড় সুরু করেনি। মন্তব্যটা খুব পাকা মাথা থেকে বেরিয়েছে ভেবেছিলাম। অবশ্য তখনও কথাটা বেশ নিরেটভাবে ধরতে পারিনি। তখন চ্যাংড়া বই ত নয়। আজ বল্‌ছি,—সে কথাটার দাম লাখটাকা।

লেখক—নিবেদিতার সঙ্গে পরবর্তী কালে আপনার যোগাযোগ কিরূপ ছিল?

সরকার—সতীশবাবুর দুই পেটোআ ছিল প্রধান। প্রথম রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় আর দ্বিতীয় রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ। যেখানেই সতীশবাবুর গতি সেখানেই এই দুয়েরও গতি। সব মহলেই এদের গতিবিধি, মেলামেশা আর দহরম-মহরম আমিও ভোগ ক'রেছি। ঘরের কোনে ইঁদুরের মতন ব'সে থেকে এই অধম সব-কিছু দেখেছে-শুনেছে। কাজেই নিবেদিতার আবহাওয়াটা আমার অজানা নয়।

লেখক—নিবেদিতার প্রভাব ভারতীয় সমাজে কিরূপ বিবেচনা করেন?

সরকার—সম্প্রতি ডন সোসাইটির তরফ হ'তে বল্‌ছি। ১৯০৬ সনে জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ। পবিষদের অধ্যাপক হিসাবে রাধাকুমুদ ঐতিহাসিক গবেষণা সুরু করেন। এই গবেষণার প্রধান মন্ত্রদাতা ছিলেন সতীশবাবু। অন্যান্য মন্ত্রদাতাব ভেতর দেখ্‌তে পাই ব্রজেন শীলকে আর নিবেদিতাকে। নিবেদিতার ডাক জাতীয়শিক্ষার আদর্শ-মাফিক্ লেখাপড়ার লাইনে খুব বেশী পড়্‌ত। নিবেদিতাকে আমরা ঘরের লোকই ক'রে নিয়েছিলাম। আমাদের বিচারে তিনি ছিলেন "সতীশ-মণ্ডলে"র অন্তর্গত।

লেখক—এর মানে কী? লেখাপড়ার কাজে নিবেদিতার ডাক পড়্‌ত কেন?

সরকার—নিবেদিতা তুখোর মেয়ে! মগজ্‌টা ছিল ভারী ধারালো। পাশ্চাত্য স্বাদেশিকতা, ভাব-নিষ্ঠা, রোমান্টিকতা ইত্যাদি রসে তাঁর চিন্তা-ভাণ্ডার ছিল ভরপুর। সেই চিত্ত আর ব্যক্তিত্ব তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'র মারফৎ ভারত, ভারতীয় জনসাধারণ আর ভারতীয় সংস্কৃতির পায়। ভারতীয় নরনারীর অতীত ব্যাখ্যা করা, বর্তমান বিশ্লেষণ করা আর ভবিষ্যৎ বাৎলানো তাঁর পক্ষে মুড়ি-মুড়কি খাওয়ার মতন সোজা কাজ ছিল। ঠিক যেন আদর্শনিষ্ঠ ও ভাবুক ভারতীয় স্বদেশ-সেবকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিবেদিতা সমগ্র ভারতের বিকাশ-ধারা দেখ্‌তে অভ্যস্ত ছিলেন। "দি ওয়েব্ অব ইন্ডিয়ান্ লাইফ" (ভারতীয় জীবনের বুনন), "স্টাডিজ্ ফ্রম অ্যান ঈস্টার্ণ হোম" (এক প্রাচ্য ভবন-বাসিন্দার অভিজ্ঞতা) ইত্যাদি বই এই সবের সাক্ষী। কোনো বিদেশী পণ্ডিত ভারতীয় নরনারীর জীবন-কথা এত গভীরভাবে বুঝ্‌তে পারে তা কল্পনা করা অসম্ভব। নিবেদিতার সঙ্গে কথাবার্তায় তাঁর এই বিশ্লেষণ-শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি সহজেই ধরা পড়্‌ত। এই সবের ভেতরকার ভারতীয় দরদটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লেখক—ভারতীয় সমাজে তাঁর প্রভাব কি এইজন্যই বেশী হ'য়েছিল?

সরকার—আমার বিশ্বাস তাঁর প্রভাবের প্রধান কারণ স্বাদেশিকতা ও বিপ্লব-নিষ্ঠা। তিনি যুবক ভারতকে স্বদেশ-নিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। স্বদেশ-সেবকের কাজে যে-লোকটা কাঠখড় জোগাতে পারে না যুবক বাঙলা তাকে বড়-একটা পুছে না। দ্বিতীয় কারণ তাঁর গবেষণা-শক্তি, সংস্কৃতি-বিশ্লেষণের কায়দা, জীবন-সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি আর ইংরেজি রচনা-কৌশল। এই দুই কারণে বহুসংখ্যক যুবা নিবেদিতার কাছে প্রেরণা পেয়েছে। আমার মনে পড়্‌ছে,—নিউইয়র্কের তারকনাথ দাশ "জাপান ও এশিয়া" নামক তাঁর প্রথম বই (১৯২২)

নিবেদিতার নামে উৎসর্গ ক'রেছেন। প্রবীণদেরকেও নিবেদিতার গুণমুগ্ধ দেখেছি। স-পত্নীক বিজ্ঞানবীর জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর অতি-আত্মীয় ছিলেন। ঘটনাচক্রে দার্জিলিঙের বসু-ভবনেই তাঁর মৃত্যু হয়। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার আর ব্রজেন শীলও নিবেদিতার গুণগ্রাহী ছিলেন।

লেখক—আপনি নিবেদিতার ভারত-বিষয়ক গ্রন্থাবলীকে কিরূপ মনে করেন?

("হিন্দুসমাজ-তত্ত্বের বাস্তবভিত্তি", ৩০শে আগষ্ট, "১৯০৫ সনের পরবর্তী ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী", ১৪ই অক্টোবর, "ডন-পত্রিকায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", ১৪ই নবেম্বর, "ব্রহ্মবান্ধব ও ডন সোসাইটি", নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—প্রথম-প্রথম খুব উঁচু দরের ভেবেছি। এমন কি ১৯১৫ সনে আমেরিকায় থাক্‌বার সময়ও বিদেশী-লিখিত ভারত-বিষয়ক এমন বই আর পেতাম না। মার্কিণ বন্ধুদেরকে ভারত সম্বন্ধে বিদেশীর লেখা বই উপহার দিতে হ'লে নিবেদিতার বই দিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল। আবার সেই শুক্রনীতির তর্জমার যুগে (১৯১১-১৩) ফিরে যাচ্ছি। ভারতীয় সংস্কৃতির এক নয়া মূর্তি আমার নজরে জোরের সহিত দেখা দিতে সুরু ক'রেছিল। সে হচ্ছে সমরনিষ্ঠ, অর্থনিষ্ঠ, রাষ্ট্রনিষ্ঠ, হিংসানিষ্ঠ, শক্তিনিষ্ঠ ভারত। তার পাশে নিবেদিতা-প্রচারিত ভারত-মূর্তি অতি-কাল্পনিক, অতি-অলীক, অতি-ভাবনিষ্ঠ, অতি আদর্শনিষ্ঠ মনে হচ্ছিল। অর্থাৎ হিন্দুসংস্কৃতিবিষয়ক নিবেদিতা-পরিচারিত ব্যাখ্যাগুলাকে আমি ডন সোসাইটির চিন্তাধারা, ব্রহ্মবান্ধবের বাণী, রবীন্দ্র-সাহিত্য ইত্যাদির মতন প্রায় একই দরের ভেবেছি। সবই একসঙ্গে বর্জনও ক'রেছি। এই সুপরিচিত ধারার প্রভাবে প্রাচ্য-গৌরব উজ্জ্বল আকারে দেখা দেয়। আর বুকটা বেশ-কিছু ফুলে' উঠে। কিন্তু ব্যাখ্যাগুলা অনেকটা তথ্যহীন ও বস্তুহীন।

লেখক—পরবর্তী কালে আপনি তাহ'লে সতীশ মুখোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব, রবীন্দ্রনাথ আর নিবেদিতাকে সম্মানযোগ্য বিবেচনা করেন নি?

সরকার—ঠিক উল্টা। আজ পর্যন্ত এই চারজনের একজনকেও আমার পূজাস্থান হ'তে একচুলও নামাইনি। মত-পথের অমিল থাকা সত্ত্বেও কোনো বীরকে আমি অ-বীর বিবেচনা করি না। আমি এঁদের সক'লেবই চেলা। এঁরা প্রত্যেকেই আমার গুরু। এমন কি, আমেরিকায় প্রবাসের সময়েই নিবেদিতা সম্বন্ধে একটা কী ঝেড়েছি দেখ্‌বি?

লেখক—কী? দেখি?

সরকার—এই দ্যাখ্‌। চোখ ঝল্‌সে যাবে না তো?

লেখক—এ যে একটা কবিতা?

সরকার—প'ড়ে দ্যাখ্‌ কিছু বুঝা যায় কিনা।

লেখক ঃ—

"স্বাধীনতার পূজারিণী, আইরিশ বালা নিবেদিতা,
ভারত পূজার উপলক্ষ্যে মানবসেবায়ই তোমার গীতা।
যৌবনের হিয়ায় তুমি পুষেছিলে আবেগ ভীষণ,
ঘর, জাতি, দেশ ভুলালো তোমায় মুহূর্তেরই মনোমিলন।
চামড়ায় বাঁধা মানব-প্রাণে চামড়া ছাড়াও তার বিকাশ,
হৃদয় দেখে না রঙের প্রভেদ, আত্মা ছিঁড়ে ভাষার পাশ।
শক্তিধর টুঁঢ়ে কর্মক্ষেত্র দুনিয়ার সব আকাশ তলে,
প্রাণের চাষ চায় প্রাণের বেপারী ধরার সকল জলে স্থলে।

দুর্বলতা আর দারিদ্র্য যেথায় বিরাজ করে ধরার উপর,
সেথায়ই ভাবুক বীরের ধর্ম সহজে গড়ে নিজের ঘর।
মুক্ত ক'রেছ আত্মা তোমার ভালবাসার ক্ষমতায়,
নিজের মুক্তি ছড়ালে তুমি যুবক-ভারতের আবহাওয়ায়।
শ্যামল "এরিণের" দুহিতা তুমি ঘুমালে হিমাদ্রি-কোলে,
ভারতের বাহিরে শিখুক মর্‌তে ভারত-সন্তান দলে-দলে।"

এটা লিখ্‌লেন কবে? কোথায়?

সরকার—দেখ্‌তেই পাচ্ছিস, নিউইয়র্কে। ১৯১৭ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি। ছন্দ ঝাড়িয়ে নিয়েছি হেমেন সেনকে দিয়ে।

ডিসেম্বর ১৯৪২

বঙ্গ-বিপ্লব কী?

১লা ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবের সঙ্গে ডন সোসাইটির যোগাযোগ কিরূপ?

সরকার—ডন সোসাইটি কায়েম হ'ল ১৯০২ সনে আর খতম হ'ল ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি। এই কয় বছরের সতীশবাবুর সংশ্লিষ্ট সব-কিছুই বঙ্গ-বিপ্লবের সঙ্গে সুজড়িত। বয়কট জারি হ'ল ১৯০৫-এর আগষ্ট মাসে আর জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ কায়েম হ'ল ১৯০৬-এর মার্চ মাসে। জাতীয় শিক্ষাপরিষৎকে দাঁড় করিয়ে দেওয়াই ডন সোসাইটির শেষ কাজ।

লেখক—আপনার চিন্তায় বঙ্গ-বিপ্লব তাহ'লে কী?

সরকার—বিলাতী মালের বয়কট ঘোষণা (৭ই আগষ্ট ১৯০৫) বঙ্গ-বিপ্লবের সূত্রপাত। ১৯১১-এর শেষ পর্যন্ত বাংলার নরনারী যা-কিছু ক'রেছে সবই বঙ্গ-বিপ্লবের অন্তর্গত।
("বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ" ৭ই নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—১৯১১ সনের শেষ দিকটায় দাঁড়ি টান্‌ছেন কেন?

সরকার—সেই সময়ে বৃটিশ-রাজ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ কর্‌তে বাধ্য হয়। দুটুক্‌রো-করা বাংলায় আবার জোড়া লাগে। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধেই বাংলার নরনারী বিলাতী বয়কট জারি ক'রেছিল। সুতরাং বঙ্গ-ভঙ্গের রদ হওয়াটা বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম মস্ত সার্থকতা। এই ঘটনাকে বঙ্গ-বিপ্লবের বড় খুঁটা বিবেচনা করা উচিত।

লেখক—১৯০৫ হ'তে ১৯১১ পর্যন্ত পাঁচ-ছয় বছর কি একটানা ভাবে আন্দোলন চ'লেছিল? এতদিন ধ'রে এই বিপ্লবের মেয়াদ টান্‌ছেন কেন?

সরকার—বিপ্লবের মেয়াদ বাস্তবিক পক্ষে আজ ১৯৪২ পর্যন্ত টানা চল্‌তে পারে। সফলতা-লাভের "ডোজ" বা মাত্রা আছে। ছোট হিসাবে ১৯১১ সনে মাত্র এক "ডোজ" সফলতা দেখ্‌ছি। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বঙ্গ-বিপ্লবের "আসল" সফলতা যা-কিছু তা ১৯২০-৪২ সনের মাল। কিন্তু আরও বড় হিসাবে ১৯৪২ সনেও সফলতার মাত্রা বেশী নয়। কাজেই মেয়াদের বহর বা পরিমাণ নানারূপ কল্পনা করা সম্ভব। ১৯৪২ সনের পরেও বঙ্গ-বিপ্লবের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার দরকার হ'তে পারে। অন্যান্য জিনিষের মতন বিপ্লব, যুগান্তর ইত্যাদি

চিজও আপেক্ষিক।

লেখক—সঙ্কীর্ণতর হিসাবে বঙ্গ-বিপ্লবের কোন পরিচয় দিতে পারেন?

সরকার—৭ই আগষ্ট (১৯০৫) এর বয়কট অথবা ছোট-মেয়াদের বঙ্গ-বিপ্লব বল্‌লে বুঝি মাত্র ১৯০৫-০৬ সনের চিন্তা ও কর্মরাশি। সেই ঘটনাবলীর প্রথম পারিভাষিক বয়কট, দ্বিতীয় স্বদেশী, তৃতীয় স্বরাজ, আর চতুর্থ জাতীয় শিক্ষা। এই চার শব্দের অন্তর্গত বস্তুগুলা নানা উপায়ে পাক্‌ড়াও কর্‌বার চেষ্টা হয়েছিল ১৯০৫-এর আগষ্ট হ'তে ১৯০৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের ভিতর। সফলতা লাভ হ'য়েছিল অতি-সামান্য। ১৯০৫-এর কংগ্রেস বসে কাশীতে আর ১৯০৬-এর বসে কল্‌কাতায়। কল্‌কাতার কংগ্রেস পর্যন্ত দেড় বৎসরের সময়টা সঙ্কীর্ণ অর্থে বঙ্গ-বিপ্লবের সময়। এই মাস আঠার'র ভেতর বাঙালী জাত্‌ ঐ চারটা পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি ক'রেছিল। গোটা ভারতে আর খানিকটা দুনিয়ার ভেতরও এই শব্দ ক'টা ছড়িয়ে প'ড়েছিল বাঙালীর অথবা ভারতবাসীর নয়া-সৃষ্টি হিসাবে। সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতি এই নয়া-নয়া শব্দের সম্পদে নবীনীকৃত হচ্ছিল।

লেখক—১৯০৫-০৬ এর বাংলার ঘটনাবলীকে বিপ্লব বল্‌ছেন কেন? বিপ্লব কী?

সরকার—১৯৪২-এর আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের ভারতীয় ঘটনাবলীকে বিলাতের চার্চিল-এমেরি হ'তে ভারত-গবর্ণমেন্টের বড়-কর্তারা পর্য্যন্ত সকলেই বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি ধরণের অবস্থা রূপে বিবৃত ক'রেছে কেন? দুই ক্ষেত্রেই এই বিবরণের কারণ একরূপ। নয়া অবস্থার সৃষ্টি অথবা অবস্থা-পরিবর্তন হচ্ছে বিপ্লবের প্রাণ। বিপ্লবের কয়েকটা প্রধান লক্ষণ দেখাচ্ছি। প্রথমতঃ, পরিবর্তনগুলা একদম নতুন ঢঙের হওয়া চাই। পূর্ববর্তী অবস্থা হ'তে নতুন অবস্থাটার ফারাক্‌ বেশ মালুম হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তনগুলা আকারে, বহরে, পরিমাণে যথেষ্ট ভারী বা পুরু হওয়া চাই। এই হ'ল বিপ্লবের আসল লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, পরিবর্তনগুলা বহুসংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলে সাধিত হওয়া চাই। আর চতুর্থতঃ, পরিবর্তনগুলা সোজা দৃষ্টিতে যেন খানিক্‌টা আকস্মিক বা হঠাৎ সাধিত হ'লো এইরূপ ধারণা হওয়া চাই।

লেখক—এই সব লক্ষণ বঙ্গ-বিপ্লবের ছিল?

সরকার—নিশ্চয়। প্রথমতঃ, বয়কট, স্বদেশী, স্বরাজ আর জাতীয় শিক্ষা এই চার বস্তু ১৮৫৭ সনের পরবর্তী বাঙালী জাত্‌ কল্পনা কর্‌তেও পার্‌ত না। এই বস্তু-বাচক শব্দগুলাও বাঙালীর অভিধানে পাওয়া যেত না। কাজেই ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট বিলকুল নয়া অবস্থার উৎপত্তি হ'ল। আর ঘটনাগুলা যেন একদম হঠাৎ এসে হাজির হ'য়েছিল। এরি নাম বঙ্গ-বিপ্লব। এই নয়া ঢঙের বা নয়া রঙের বঙ্গ-জীবন বিদেশীদেরও মগজে নয়া খেয়াল পায়দা ক'রেছিল। এ-সব দস্তুর-মাফিক "যুগান্তর" ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয়তঃ, বয়কট-স্বদেশী-স্বরাজ-জাতীয় শিক্ষা নামক কর্ম-চতুষ্টয় বা চিন্তা-চতুষ্টয় কোনো নামজাদা বাঙালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পল্লী বা শহরের কল্পনা বা কার্য মাত্র ছিল না। এই কর্ম ও চিন্তারাশির প্লাবনে তামাম বাংলার নবনারী ভেসে গিয়েছিল। কাজেই রবি-কণ্ঠে বেরিয়েছিল,—"মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা ব'লে ভাসা তরী"। শব্দই হ'ক আর বস্তুই হ'ক,—দুইয়েই ছিল লাখ-লাখ মানুষের স্বার্থ, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও ভাবুকতা আর কৃতিত্ব, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবত্তা ও স্বার্থত্যাগ মাখানো। এরি নাম আন্দোলন। বহরটা রীতিমত পুরু। অসংখ্য বাঙালীর সুরৎ বদ্‌লে' গেল। মেজাজ বদ্‌লে গেল। তা না হ'লে বঙ্গ-বিপ্লব বা বাংলার যুগান্তর এই পারিভাষিকটা চালানো যেত না।

লেখক—সেই যুগে আপনি সমসাময়িক ঘটনাগুলাকে "যুগান্তর" বা "বিপ্লব" মনে কর্‌তে পেরেছিলেন? আপনার কোন রচনায় তার চিহ্ন আছে?

সরকার—১৯০৭ সনের জুন মাসে মালদহে জাতীয় শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে "বঙ্গে নব-যুগের নূতন শিক্ষা" প্রবন্ধ পাঠ করি। তার দু-এক লাইন মনে আছে। এই শোন্:— "আমাদের এত আশার কারণ কী? হ'তে পারে,—আমাদের দেশের বিপ্লবের সময়েই জ'ন্মেছি ব'লে বোধ হয় আমরা ভবিষ্যতের অন্ধকার দেখি না। সবই যেন সুস্পষ্ট, দু-দুগুণে চারের মতো,—জলবৎ তরল,—যা ভাবি তাই কর্‌তে পারি। হ'তে পারে জাতীয় জীবনের কোনো বিষয়ে নিষ্ফলতা দেখিনি ব'লে হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হওয়া তো দূরের কথা এসব কাকে বলে তাও জানি না। কিছু দিন আগে জন্মগ্রহণ ক'র্‌লে হয়ত আগাপাছা ভাব্‌তে শিখ্‌তাম, দেশের লোককে গাল দিতাম, আর দেশের ও ধর্মের উন্নতিকে "মেলাঙ্কলি ড্রীম" (বিষাদপূর্ণ স্বপ্ন) বিবেচনা কর্‌তাম। * * * কিন্তু যখনই চক্ষু উন্মীলন করিলাম তখনই দেখিলাম আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন প্রভাতে অরুণিমা চারিধারে হাসিতেছে। সেই তরুণ রবির অরুণ কিরণচ্ছটায় সকলের মন প্রফুল্ল। কবিদের এখন গাইবার সখ হ'য়েছে। দাতাদের দানের ইচ্ছা হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আবার যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেছেন। আমরাও তাই প্রকৃতির সঙ্গে এক হ'যে মিল্‌বার জন্য মন খুলে' বেড়াতে শিখেছি। আমরা এই নূতন হাওয়া, নূতন আলোর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চাই।"

("১৯০৮ সনের বাঙালী," ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

ডন সোসাইটি ও বঙ্গ-বিপ্লব

লেখক—এইবার তা হ'লে বলুন ডন সোসাইটির যোগাযোগ এই বঙ্গ-বিপ্লবে কোথায় বা কতখানি?

সরকার—১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট হ'তে ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি পর্যন্ত ডন সোসাইটির অস্তিত্ব ছিল। সঙ্কীর্ণ অর্থে এটা স্বদেশী আন্দোলনের বা বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ। এই দশ-এগার মাস ধ'রে ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় চল্‌ত বিলাতী-বয়কট সম্বন্ধে বক্তৃতা, আলোচনা, তর্কাতর্কি আর বাক্-বিতণ্ডা। এজন্য সতীশবাবুকে বকাবকি কর্‌তে হ'ত চব্বিশ ঘণ্টা অনবরত। সাপ্তাহিক "জেনার‍্যাল ট্রেনিং" ক্লাসের সময় তো বটেই,—বাড়ীতেও চোপর দিনরাত।

লেখক—সতীশবাবুর স্বদেশী ও বয়কট বিষয়ক কথাবার্তায় আর বক্তৃতার ভেতর কোনো বিশেষত্ব ছিল?

সরকার—সতীশবাবু জোগাতেন বস্ত্রশিল্পের তথ্য ও অঙ্ক। বুঝানো হত,—বিগত বিশ বছরে বোম্বাই-গুজরাটে কাপড়ের কল কী অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিলাতী বয়কট চালালে সেই অবস্থার আরও উন্নতি হ'তে পারবে। বাঙালীরাও নতুন-নতুন কল কায়েম ক'রে শিল্পনিষ্ঠ হ'তে শিখ্‌বে। ডন সোসাইটির ঘরে-বাইরের আলোচনায় দেশলাইয়ের কারখানা, সাবানের ব্যবসা, পেন্সিল-ফ্যাক্টরি ইত্যাদি অনেক-কিছুই ঠাঁই পেত। বয়কট ও স্বদেশী বিষয়ক সতীশবাবুর লেখা প্রবন্ধ বিনা-নামে অমৃতবাজার-পত্রিকায় আর বেঙ্গলী কাগজে বেরুত। ডন সোসাইটির ম্যাগাজিনে তিনি পেটোআদের দিয়ে লিখতেন। তাঁর নিজের রচনা

আর মন্তব্যও থাক্‌ত।

লেখক—বয়কট ও স্বদেশী সম্বন্ধে ডন সোসাইটির আর কোন কাজ আছে?

সরকার—তা ছাড়া স্বদেশী জিনিষের মেলা বা প্রদর্শনীও ডন সোসাইটির তদবিরে খোলা হ'য়েছিল। কাপড়ের কলের তাঁত সেই আমি প্রথম দেখ্‌লাম। কলের তাঁতে কাজ দেখাবার জন্য সতীশবাবু বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল থেকে ওস্তাদ ও মিস্ত্রীদের ডেকে এনেছিলেন। সার্বজনিক বক্তৃতার আয়োজনও উল্লেখযোগ্য। এক সভায়, বোধ হয় সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে, রবীন্দ্রনাথ হাজির ছিলেন (১৯০৫)। তাতে ডন-সোসাইটির সভ্যেরাও প্রকাশ্য সভায় গলাবাজির সুযোগ পায়। এই অধমও কয়েক মিনিট ব'কেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ও ডন সোসাইটি

লেখক—ডন সোসাইটির এই সভার কথা আর কিছু মনে আছে?

সরকার—তখনকার দিনে যুবক বাংলার অন্যতম উদীয়মান কর্মবীর ছিল শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। সিটি কলেজে পড়্‌ত। সে ছিল বিলাতী বয়কটের খুব-বড় পাণ্ডা। ডন সোসাইটির সে সভ্য ছিল না। কিন্তু তাকে আমরা আমাদেরই একজন ভাব্‌তাম। এই সভায় সেও বক্তৃতা ক'রেছিল। তার একটা প্রস্তাব এখনো মনে আছে।

শচীন বল্‌লে,—"নতুন-নতুন কল কায়েম ক'রে ধুতী বাজারে ফেলা বাঙালীর পক্ষে বড়-শীগ্‌গির সম্ভব হবে না। স্বদেশী থানের কাপড় তৈরী করা সোজা। বাজারে পাওয়াও যায় যখন-তখন। যুবক বাংলা ধুতী ছেড়ে থানের পায়জামা পর্‌তে সুরু করুক। জুতা না থাকে,—কুছ্‌পরোআ নাই। খালি পায়েই পায়জামা-পরা বাঙালী চলা-ফেরা করুক।"

বাস্তবিক পক্ষে, শচীন একদিন কল্‌কাতার রাস্তায়-রাস্তায় একদল পায়জামা-পরা জুতাহীন বাঙালী ছোকরার শোভাযাত্রা বের ক'রেছিল। আমি কলেজ ষ্ট্রীটে হ্যারিসন রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে হাত-তালি দিয়েছিলাম।

লেখক—আপনি ধুতীর বদলে পায়জামা প'রেছিলেন?

সরকার—না, ভায়া। তবে খালি-পায়ে ছিলাম। খালি-পায়ে আর খালি-গায়ে (অর্থাৎ বিনা জামায়) ছিলাম মোটের উপর বছর দুই। শুধু চাদর দিয়ে গা জড়ানো থাক্‌ত (১৯০৬-০৮)।

লেখক—রবিবাবু সেই সভায় কী ক'রেছিলেন?

সরকার—প্রথমে ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা হ'ল। তবে সত্যিকার প্রধান কথা হচ্ছে, তিনি কয়েকটা গান গেয়েছিলেন। গানগুলা মনে আছে। শুধু গেয়েছিলেন না। সেই সঙ্গে ডন সোসাইটির ছোক্‌রাদেরকে গানের সাক্‌রেত ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁর তৈরী স্বদেশী গান শেখাবার ব্যবস্থা করা হ'ল। কয়েক সপ্তাহ ধ'রে তাঁর অন্যতম বড়-চেলা অজিত চক্রবর্তী নিয়মিত এসে আমাদেরকে গান শিখিয়ে যেতেন। মেট্রোপলিটান কলেজে চোআঁড় গলায়, গাধার গলায়, ফাটা গলায়, মিহি গলায়, সর্দি-গলায় অ-সুরেরা সুর সাধনা কর্‌ত।

লেখক—সেই সভায় রবিবাবু কোন্‌ কোন্‌ গান গেয়েছিলেন মনে আছে?

সরকার—প্রথম হচ্ছে ঃ—

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি

এ অপরূপ রূপে বাহির হ'লে জননি!"

আর একটা হ'ল ঃ—

"তোর আপন জনে ছাড়্‌বে তোরে
তা ব'লে ভাবনা করা চল্‌বে না।"

তৃতীয় গানটা নিম্নরূপ ঃ—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তা হ'লে একলা চল রে।"

লেখক—আপনি সেই সভায় কী ব'লেছিলেন?

সরকার—ব'লেছিলাম "নূন-চিনির স্বদেশী" ভাল। কিন্তু তাই সব নয়। ধুতী, গেঞ্জি, পেনসিল, সাবান, চীনের বাসন ইত্যাদি জিনিষের স্বদেশী চল্‌তে থাকুক। তার উপর,—আত্মিক স্বদেশীও চাই প্রচুর। তার ভেতর পড়ছে স্বদেশী শিক্ষা, জাতীয় সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রচারের আন্দোলন। এইজন্য চাই অসংখ্য কর্মী। বাস্তবিক পক্ষে ডন সোসাইটির চিন্তায় স্বদেশী আন্দোলন ছিল বিশ্বগ্রাসী দশ-মুখো আন্দোলন। আমরা বঙ্গ-বিপ্লবের হাজার-ভূজা মূর্তি পূজা কর্‌তাম।

"নূন-চিনির স্বদেশী"

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-০৬) "নূন-চিনির স্বদেশী" কতটা এগিয়ে ছিল?

সরকার বেশী নয়। অতি সামান্য। স্বদেশী জিনিষ তৈরী করা আর বাজারে ফেলা মুখের কথা নয়। খাঁটি-শিল্পনিষ্ঠ ও ব্যবসাদার লোক বাংলায় লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে তখন বোধ হয় একজনও ছিল না।

লেখক—সে কি? স্বদেশী আন্দোলনের যুগে শিল্প-বাণিজ্যে ওস্তাদ বাঙালী কেহ ছিল না? বঙ্গ-বিপ্লবের নেতারা এসব জিনিষ বুঝ্‌তেন না?

সরকার—সতীশবাবু, রবীন্দ্রনাথ, ব্রহ্মবান্ধব ইত্যাদি মনীষীরা ছিলেন সাংস্কৃতিক চিন্তাগুরু মাত্র। বিপিন পাল ছিলেন বাগ্মী ও প্রচারক। তাঁর বক্তৃতার ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবই ছিল দস্তুর মতন। সুরেন ব্যানার্জির প্রধান ধান্ধা ছিল বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে লোক তাতানো। খাঁটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা আলোচনা কর্‌বার মতন বিশেষজ্ঞ কেউ ছিল না। কল-কারখানা আর যন্ত্রপাতি বুঝে এমন-কোনো বাঙালী তখন দেখিনি। সবেমাত্র জাপান থেকে ফিরেছিল শ্রীহট্টের রমাকান্ত রায়। সে ছিল খাদের এঞ্জিনিয়ার। পাকা স্বদেশ-সেবক।

লেখক—স্বদেশী আন্দোলনের স্বপক্ষে লেখালেখি কর্‌তেন কারা? ধনবিজ্ঞানের অধ্যাপকেরা কী ক'র্‌তেন?

সরকার—কোনো অধ্যাপকের কাছে স্বদেশী আন্দোলনের অর্থকথা শুনি নি। সতীশবাবু ছিলেন আমাদের প্রায় একমাত্র অর্থশাস্ত্রী। একটা বড় কথা মনে রাখা আবশ্যক। জ্ঞানকাণ্ড সম্বন্ধে স্বদেশী আন্দোলনের অর্থ-নৈতিক খোরাক জুগিয়েছিলেন রমেশ দত্ত। তাঁর ঐতিহাসিক বইটা বগল-দাবা ক'রে সার্বজনিক সভায় বক্তৃতা করা চল্‌ত। পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা চল্‌ত। ঐ পর্য্যন্ত। কলকারখানা কায়েম করা আলাদা চিজ্‌। বাজারে মাল বিলি করা যে-সে কথা নয়। তার বিদ্যা রমেশ দত্ত'র সাহিত্যে পাওয়া যাবে কোথ্‌থেকে?

লেখক—তবুও জান্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, খাঁটি শিল্প-বাণিজ্যের দিকে মেজাজ ছিল কোন্‌

কোন্ জননায়কের?

সরকার—ব্যারিষ্টার যোগেশ চৌধুরী বৌবাজার ষ্ট্রীটে কায়েম করেছিলেন "ইণ্ডিয়ান স্টোর্স"। এইটেই ডন সোসাইটির ছোট দোকানটার পরবর্তী "স্বদেশী ভাণ্ডার"। কাজেই যোগেশ চৌধুরীকে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্যের "কেজো লোক" ভাবতাম। বোধ হয় ডন সোসাইটির তদবিরে তাঁকে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়ানোও হ'য়েছিল। তিনিই ছিলেন জন-নায়কগণের ভেতর এই বিষয় "সবে ধন নীলমণি"।

অর্থশাস্ত্রী অম্বিকা উকিল

লেখক—ধনবিজ্ঞান, বাণিজ্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞানে সুদক্ষ বাঙালী কেহই এ যুগে ছিল না? বড়ই বিস্ময়ের কথা।

সরকার—ক্রমশঃ একজন অর্থশাস্ত্রীর মূর্তি নজরে পড়্‌লো। সে হচ্ছে ঢাকার অম্বিকাচরণ উকিল। তাঁর ধন-দর্শনের মুদ্দা ছিল পুঁজিনিষ্ঠা, পুঁজি-সংগ্রহ, পুঁজির কেন্দ্রীকরণ। এই উপলক্ষে তাঁর মগজে ঘর কর্‌ত দুই মহত্ত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। একটা হচ্ছে ব্যাঙ্ক আর একটা হচ্ছে বীমা। দুই প্রতিষ্ঠানই তিনি কলকাতায় কায়েম ক'রেছিলেন। অম্বিকা উকিল স্বদেশী যুগের ব্যাঙ্ক-বীর ও বীমা-বীর।

প্রেসিডেন্সি কলেজের কোনো অধ্যাপকের কাছে এসব বিষয়ে হদিশ পাই নি। রাষ্ট্রিক জন-নায়কগণের ভেতরও আর কেহ এদিকে মাথা ঘামাতেন কি না মনে পড়্‌ছে না। অম্বিকা উকিল স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম উজ্জ্বল মূর্তি।

লেখক—অম্বিকা উকিলের ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক লেখালেখি কিরূপ ছিল?

সরকার—ধনদৌলতের কর্মকাণ্ড ছিল তাঁর বিশেষত্ব। তাঁকে বঙ্গবিপ্লবের মস্ত-বড় প্রতিনিধি বিবেচনা করি। অধিকন্তু সমবায়নীতির নেশায় ছিলেন তিনি মাতাল। কিন্তু লেখালেখি বেশী ছিল না। ব্যাঙ্ক, বীমা, সমবায়-নিয়ন্ত্রিত দোকান ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কায়েম করার জন্য মোসাবিদা করা ছিল তাঁর প্রধান রচনা। স্বদেশী যুগের কেজো ধনবিজ্ঞানসেবী হিসাবে অম্বিকা উকিলকে আমি গুরুস্থানীয় বিবেচনা করি। লোকটা বাঙালীর অর্থনৈতিক চিন্তায় ও কর্মে বাস্তবিক পক্ষে যুগান্তর-সাধক।

ব্রহ্মবান্ধবকে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে ডানপিটে, ভবঘুরে আর ত্যাঁদড়ের দৃষ্টান্ত ব'লেছি। অম্বিকা উকিল ধনবিজ্ঞানের জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডে ঠিক সেইরূপই ডানপিটে, ভবঘুরে আর ত্যাঁদড়। ব্রহ্মবান্ধব আর অম্বিকা উকিল ঠিক যেন যমজ ভাই। আজকাল ব্যাঙ্কে, বীমায়, বহির্বাণিজ্যে, ও ফ্যাক্টরিতে বহুসংখ্যক বাঙালী নামজাদা। তাঁদের অনেকেই অম্বিকা উকিলের ছেলে বা নাতি স্বরূপ। (পৃষ্ঠা ১৯৪-১৯৫)

লেখক—অম্বিকা উকিলের সঙ্গে আপনার প্রথম দেখা হয় কখন?

সরকার—১৯০৫-০৬ সনেই সতীশবাবুর মারফৎ অম্বিকা উকিলের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়। "ফীল্ড অ্যাণ্ড অ্যাকাডেমী" ক্লাবের দোতলায় তখন আমরা সতীশবাবুর 'গোআলেই" বস-বাস করি। মনে পড়্‌ছে—প্রথম মোলাকাতেই অম্বিকা উকিল তর্ক জুড়ে' দিয়েছিলেন। তর্ক হ'ল ক্যাপিট্যাল বা পুঁজি কাকে বলে এই নিয়ে। দাঁড়িয়ে গেল যে,—পুঁজি জিনিষটা কর্জ ছাড়া আর কিছু নয়। তখনই বুঝেছিলাম লোকটা তার্কিক। পরবর্তীকালে

"বাড়তির পথে বাঙালী" বইয়ে (১৯৩৫) আমি যাকে ত্যাঁদড় ব'লেছি সেই ত্যাঁদড়ের অন্যতম মূর্তি হচ্ছে তার্কিক।

লেখক—আপনি অম্বিকা উকিলের সঙ্গে কোনো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে এসেছিলেন।

সরকার—১৯১০-১১ সনে আমি পনর-ষোল জন "ছাত্র-শিক্ষক"কে মালদহ জাতীয় শিক্ষা-সমিতির তদবিরে আমেরিকায় পাঠাই। সেই সময় তাদের কয়েকজনকে অম্বিকা উকিলের সমবায়-পরিষদে রেখেছিলাম। তখন কলেজ ষ্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে ছিল অম্বিকা উকিলের কর্মকেন্দ্র। "ছাত্র-শিক্ষক"দেরকে পড়াবার জন্য বাহাল ছিলেন রমেশ চক্রবর্তী ইত্যাদি পাঁচ-ছয়জন অধ্যাপক। চক্রবর্তী, চাটার্জি কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রমেশ চক্রবর্তী। তাঁর কাছে খবর পাবি। অধ্যাপক বাণেশ্বর দাসের সঙ্গেও দেখা কর্‌তে পারিস্।

লেখক—আপনি অম্বিকা উকিল সম্বন্ধে কোথাও কিছু লিখেছেন?

সরকার—"একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৩৬) যৎকিঞ্চিৎ আছে। রমেশ দত্ত ও মহাদেও গোবিন্দ রাণাডেকে এক যুগের প্রতিনিধি ব'লেছি। স্বদেশী যুগের ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক প্রতিনিধি ক'রেছি সতীশ মুখোপাধ্যায় আর অম্বিকা উকিলকে।

"মণীন্দ্র-মণ্ডল", "ব্রজেন্দ্র-মণ্ডল" ও "নরেন্দ্র-মণ্ডল"

৩রা ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—"নূন-চিনির স্বদেশী"তে যাঁরা সাহায্য ক'রেছেন তাঁদের কারু-কারু নাম করবেন?

সরকার—স্বদেশী কারবারে টাকা ঢেলেছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। উকিল রাসবিহারী ঘোষ আর ডাক্তার নীলরতন সরকারও স্বদেশী কারখানার জন্য পুঁজি জোগাতেন। গৌরীপুর-ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর নাড়াজোল-মেদিনীপুরের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের বহুসংখ্যক লোকের নাম করা সম্ভব।

লেখক—স্বদেশী কারবারগুলার পরিচালনা কিরূপ হ'তো?

সরকার—১৯০৫-১৪ সনের ভেতর যত স্বদেশী কারবার কায়েম হ'য়েছিল তার প্রায় সবই বোধহয় অল্পকালের ভেতর পটল তুল্‌তে বাধ্য হয়। বাঙালী আমরা শিল্প-বাণিজ্যে তখন এতই ম্যাড়াকান্ত ছিলাম। কিন্তু এই আনাড়ি জাত্‌কে শিল্প-নিষ্ঠার পাঠশালায় হাতে-খড়ি দেওয়াবার জন্য এইসব পুঁজিপতিরা টাকা দিতেন। লোকসান হ'ত দেদার। তা জেনেশুনেও টাকা দিতে রাজি ছিলেন। এইখানেই বাঙালী জাতের মহত্ত্ব ও গৌরব। বঙ্গ-বিপ্লবের এক মস্ত লক্ষণই এখানে। "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" বইয়ে (১৯৩৪) জমিদারদের খবর পাবি।

লেখক—আজকাল অবস্থা কিরূপ দেখ্‌ছেন?

সরকার—সেই অবস্থার তুলনায় আজ ১৯৪২ সন যারপরনাই উন্নত। সাঁইত্রিশ বৎসরে 'বাড়্‌তির পথে বাঙালী" এগিয়েছে বেশ-কিছু দূর। কিন্তু সর্বদাই মনে রাখ্‌তে হবে,—"এত উচ্চে উঠেছি তবু উচ্চতমের অনেক দেরি।" অর্থাৎ উন্নতিটা উল্লেখযোগ্য নয়।

লেখক—স্বদেশী আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষকেরা সকলেই কি জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন?

সরকার—সকল পৃষ্ঠপোষকই জমিদার একথা বলা ঠিক হবে না। অ-জমিদার ধনীও পৃষ্ঠপোষকদের ভেতর অনেক। তবে জমিদারদের আর্থিক সহযোগিতা বেশ-কিছু উল্লেখযোগ্য। কোনো-কোনো জমিদার আবার "আন্দোলনের" সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।

শিল্প-বাণিজ্য আর ব্যাঙ্ক-বীমা-কৃষিকর্মের দালালেরা সেই যুগে মণীন্দ্রচন্দ্রের চারদিকে ঘিরে থাক্‌ত। একটা "মণীন্দ্র-মণ্ডল" দাঁড়িয়ে গিয়েছিল বলা যেতে পারে। স্বদেশী যুগের এইরূপ আর একটা মণ্ডলের নাম "ব্রজেন্দ্র-মণ্ডল"। মেদিনীপুরে একটা "নরেন্দ্র-মণ্ডল" ছিল।

এই সকল জমিদার-কেন্দ্রকে বাস্তবিক পক্ষে প্রাচীন ভারতীয় বিক্রমাদিত্য-সভার বংশধর ও জুড়িদার বিবেচনা কর্‌তাম। মণীন্দ্র নন্দী আমার পারিভাষিকে ছিলেন "মণীন্দ্র দি গ্রেট"। সম্প্রতি "নূন-চিনির স্বদেশী" প্রতিষ্ঠায় এই সকল "মণ্ডলে"র আর্থিক সহযোগিতা উল্লেখ কর্‌ছি মাত্র। বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যান্য বিভাগেও এঁদের কীর্তি জগদ্‌বরেণ্য।

("স্বদেশী আন্দোলনের শৈশব-কথা", ১৫ই ডিসেম্বর দ্রষ্টব্য)

"অশ্বিনী-মণ্ডল", "রবীন্দ্র-মণ্ডল" ও "সুরেন্দ্র-মণ্ডল"

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবের আর কোনো বিভাগের সঙ্গে ডন সোসাইটির সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লব প্রথমতঃ রাষ্ট্রিক, দ্বিতীয়তঃ আর্থিক, আর তৃতীয়তঃ, সাংস্কৃতিক। তা ছাড়া বঙ্গ-বিপ্লবের শারীরিক ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক, সামাজিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক মূর্তিও আছে। আগেই ব'লেছি, বহুসংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান স্বাধীনভাবে এই সকল অবস্থা-পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর পরস্পরকে বোধ হয় জান্‌তও না। এমন কি তাদের চিন্তা ও কর্মরাশি যে বিপ্লবাত্মক তাও হয়ত অনেকের ধারণায় ছিল না। ১৯০৫-০৬ সনের ঘটনাবলী দাঁড়িয়ে যাবার পর কেহ-কেহ বুঝেছিল যে, তারাও বিপ্লব-প্রবর্তক বা যুগান্তর-সাধক বটে। কাজেই ডন সোসাইটিকে বঙ্গ-বিপ্লবের একমাত্র কেন্দ্র বা জন্মদাতা বা আঁতুড়-ঘর সম্বন্ধে' রাখা ঠিক হবে না। কল্‌কাতার অনেক মনীষীই এই পদ দাবী কর্‌তে অধিকারী। মফঃস্বলেরও কেহ-কেহ এই ইজ্জৎ পাবার যোগ্য।

("১৯০৮ সনের বাঙালী", "উন্নতি-দর্শনে অনিশ্চিতের ঠাঁই", ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—মফঃস্বলের কারু নাম করুন না?

সরকার—বরিশালের অশ্বিনী দত্ত'র নাম প্রথমেই মনে আসে। তিনি সতীশবাবুর দরের লোক। বরিশালে,—এমন কি সারা পূর্ববঙ্গে একটা "অশ্বিনী-মণ্ডল" ছিল এরূপ বলা চল্‌তে পারে। তিন-রকম বা ছয়-সাত-রকম বিপ্লবের সব-কয়টাই হয়ত কোনো এক কেন্দ্রেই পুষ্ট হচ্ছিল। অনেক কেন্দ্রই বহুমুখী ছিল। বহুসংখ্যক মনীষীর চিন্তা একসঙ্গে নানা দিকে খেল্‌ছিল। ১৯০৫-০৬ সনের আন্দোলন চালু হবার সঙ্গে-সঙ্গে সকলে নানাদিক থেকে এক রাস্তায় বা এক বারোআরি-তলায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

লেখক—ডন সোসাইটিকে বঙ্গ-বিপ্লবের কোন্‌-কোন্‌ মূর্তির সঙ্গে আপনি সংযুক্ত কর্‌তে চান?

সরকার—প্রকারান্তরে বঙ্গ-বিপ্লবের সব-কয়টা মূর্তিই ডন সোসাইটির চিন্তা ও কর্মরাশির সঙ্গে সু-জড়িত। বঙ্গ-বিপ্লবের সকল প্রকার কাজ বা আন্দোলন বুঝ্‌বার জন্য একমাত্র "সতীশ-মণ্ডলের" ভেতর প্রবেশ কর্‌লেই চল্‌তে পারে। আমার বিশ্বাস,—ঠাকুর-বাড়ীর "রবীন্দ্র-মণ্ডল" সম্বন্ধেও এই কথাই বলা চলে। সতীশ-মণ্ডল হাজার-মুখো চিন্তা ও কর্মের উৎস ছিল। কিন্তু তাই ব'লে একমাত্র ডন সোসাইটির দৌলতে ১৯০৫-০৬ সনের বিপুল বঙ্গীয় উন্মাদনা ও কর্মতরঙ্গ সৃষ্ট হয় নি। এক সঙ্গে বহু স্ব-স্ব-প্রধান প্রতিষ্ঠানের ও ব্যক্তির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা কর্তব্য।

লেখক—রাষ্ট্রিক বিপ্লবে ডন সোসাইটির প্রভাব কতটা?

সরকার—স্বরাজ ও স্বাধীনতা-বিষয়ক চিন্তা সতীশবাবুর আর ডন সোসাইটির দৈনন্দিন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বিশেষ। কাজেই জ্ঞানকাণ্ডের তরফ হ'তে ১৯০৫-০৬ সনের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আন্দোলনে ডন সোসাইটির লোকজনের আত্মিক সহানুভূতি ছিল দস্তুর-মতন। সংবাদপত্রের লেখালেখিতেও যোগ ছিল মন্দ না। তবে সার্বজনিক সভায় রাষ্ট্রিক আন্দোলনের জন্য বক্তৃতা করার কাজ হয়ত ডন সোসাইটির লোকেরা বেশী করেন নি। কিন্তু সুরেন ব্যানার্জি (অথবা "সুরেন্দ্র-মণ্ডল"), মতিলাল ঘোষ, বিপিন পাল, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব, হীরেন দত্ত, মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা, চিত্তরঞ্জন দাশ ইত্যাদি রাষ্ট্রিক ও সাংবাদিক জননায়কগণের সঙ্গে সতীশবাবুর এবং তাঁর পেটোআদের দহরম-মহরম চল্‌ত সর্বদাই।

ভাগ্যকুলের রায় আর কল্‌কাতার লাহা

লেখক—সকল জমিদারই কি স্বদেশী আন্দোলনের মুরুব্বি বা পৃষ্ঠপোষক ছিলেন?

সরকার—একটা কথা জেনে রাখা ভাল। জমিদারদের ভেতর দুই শ্রেণীর স্বদেশী-পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এক শ্রেণী বয়কট-স্বরাজ আন্দোলনের সঙ্গে সুজড়িত। তাঁরা বেশ-কিছু রাজনীতি ঘেঁশা লোক। অন্য শ্রেণী স্বদেশী আন্দোলনের রাজনৈতিক বিভাগে বড়-একটা হিস্যা নিতেন না। তাঁরা পাকা ব্যবসাদার। শিল্প বাণিজ্যের কারবারে তাঁদের মেজাজ নতুন কিছু নয়। দু তিন পুরুষ ধ'রে তাঁরা আসল কারবারী লোক। প্রথম শ্রেণীর জমিদাররা বোধ হয় শিল্প বাণিজ্য কিছুই বুঝ্‌তেন না। তাঁদের দরদ ছিল দেশের লোককে শিল্প বাণিজ্যে পাকিয়ে তোলা। যন্ত্র-নিষ্ঠা আর "শিল্প-বিপ্লব" ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

লেখক—এই ধরণের পাকা ব্যবসায়ী জমিদার স্বদেশী যুগে কে কে ছিলেন?

সরকার—ভাগ্যকুল-ঢাকার রায় বংশ সেকালেও নামজাদা ব্যবসায়ী। একালেও বাঙালী শিল্পী বণিক ব্যাঙ্কার বল্‌লে যে কোনো লোকের প্রথমেই মনে আসে ভাগ্যকুলের রায়। রাজা জানকী রায়ের নাম ডাক বাঙালীর শিল্প বাণিজ্যে অনেক দিন থাক্‌তে বাধ্য। অই পরিবারের যদুনাথ ও রমেন রায় ইত্যাদি করিৎকর্মা ব্যবসায়ীরা আজও কোনো দলে ভিড়েন নি। কিন্তু সকলের সঙ্গেই যোগ রেখে চ'লেছেন।

লেখক—কল্‌কাতায় এই ধরণের কোনো জমিদার বণিক স্বদেশী-যুগে নামজাদা ছিলেন?

সরকার—লাহা পরিবার। রাজা কৃষ্ণদাস লাহার সঙ্গে "সতীশ-মণ্ডলে"র যোগাযোগের কথা ব'লেছি। "ব্রজেন্দ্র-মণ্ডলে"র যোগাযোগ ছিল রাজা হৃষীকেশ লাহার আর তাঁর ছেলেদের সঙ্গে। লাহারা পাকা কারবারী লোক। স্বদেশী আন্দোলনের ভেতর যতটুকু খাঁটি আর্থিক ততটুকু তাঁরা এক মিনিটেই চুম্‌ড়ে' নিয়েছিলেন।

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবের সঙ্গে লাহা পরিবারের যোগাযোগ কিরূপ?

সরকার—স্বদেশী আন্দোলনের দলে মেশামেশি তাঁদের ছিল না। তবে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সঙ্গে সুরেন লাহার ভাব। কাজেই স্বদেশী দলের সঙ্গে অসহযোগ ছিল বলা সম্ভব নয়। ঘটনাচক্রে বিদ্যাচর্চার দিকে প্রবীণ লাহাদের নজর ছিল খুব বেশী। ফলতঃ জাতীয় শিক্ষার বা শিক্ষা-স্বরাজের আন্দোলনের ভেতর লাহা-পরিবার এসে প'ড়েছিল।

লেখক—সে কী রকম? জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনের সঙ্গে লাহা-পরিবারের যোগ সাধিত হ'ল কী ক'রে?

সরকার—"ব্রজেন্দ্র-মণ্ডলে"র মারফৎ। যোগাযোগটা ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব। আজকালকার বঙ্গ-সংস্কৃতিতে নরেন ও বিমল লাহা সুপরিচিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গবেষকরূপে। সত্যচরণ লাহা পাখীর বিজ্ঞানে নামজাদা। ভবানীচরণ লাহা চিত্রশিল্পে ওস্তাদ। এঁরা সকলেই ১৯০৭-১০ সনের যুগে ইস্কুল-কলেজের ছাত্র। তখন জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সেবক হিসাবে রাধাকুমুদ ও এই অধম "ব্রজেন্দ্র-মণ্ডলে"র অন্তর্গত। ফলতঃ লাহা-পরিবারের সঙ্গে আমাদের আনাগোনার সূত্রপাত। তার জের আজও চল্‌ছে। সেকালের লাহাদের মতন একালের লাহাদের মেজাজেও দল বড় নয়, বন্ধুত্ব বড়। ছেলেবেলার বন্ধুত্ব আজও বজায় আছে। (পৃঃ ১০২, ১৩২)

সাংস্কৃতিক বিপ্লব

লেখক—সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজে ডন সোসাইটির হাত কতখানি ছিল?

সরকার—সাংস্কৃতিক বিপ্লব বিপুল কাণ্ড। তার ভেতর সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, স্থাপত্য, নাটক ইত্যাদি অনেক-কিছু আসে। ১৯০৫-০৬ সনের যুগে সব-দিকেই বিপ্লব সাধিত হচ্ছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্য তো ছিলই। গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ ইত্যাদি নাট্যকারদের রচনায় স্বাদেশিকতা মূর্তি পেয়েছিল জবরভাবে। এঁদের সকলের সঙ্গেই "সতীশ-মণ্ডলে"র যোগাযোগ ছিল। ১৯০৬-০৮ সনে ক্ষীরোদ প্রসাদ জাতীয় শিক্ষা-পরিষদে আমাদের সহযোগী ছিলেন।

তারপর সুকুমার শিল্পের কথা। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই দুজনে,—বিশেষতঃ অবনীন্দ্রনাথ—বিপ্লবী বাংলাকে প্রাণে ঘা লাগাচ্ছিলেন অতি সূক্ষ্মভাবে। ঠিক এই সময়েই জাপানী শিল্পসমালোচক কাকসু ওকাকুরার সঙ্গে এঁদের এবং অন্যান্য বাঙালী সুধীর বন্ধুত্ব কায়েম হ'য়েছিল। তার প্রভাবেও এশিয়ার শিল্প-স্বরাজ বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম মুদ্দায় পরিণত হয় ডন সোসাইটিতে ব'সে আর "সতীশবাবুর বাথানে অথবা গো-আলে" শুয়ে আমরা অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত "ভারতীয় শিল্প-কলা" নিয়ে খুব গুলতান চালাতাম। সেই গুল্‌তানে বঙ্গ-বিপ্লবের শিল্প-মূর্তি পরিস্ফুট হ'ত। রবিবাবুর বৈঠকখানায় আমরা এই দুই শিল্পী ঠাকুরকে প্রায়ই দেখ্‌তে পেতাম। (পৃঃ ২১১)

বাকী রইল শিক্ষা-স্বরাজ। বঙ্গ-বিপ্লবের এ এক বিপুল অধ্যায়। ডন সোসাইটির সঙ্গে শিক্ষা-স্বরাজের যোগাযোগ যারপরনাই নিবিড়।

লেখক—শিক্ষা-স্বরাজের সঙ্গে ডন সোসাইটির যোগাযোগ এত নিবিড় হ'ল কেন?

সরকার—বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করার আন্দোলনে ডন সোসাইটি ছিল অগ্রণী। সেই বয়কট আন্দোলনের ফলে জন্মগ্রহণ করে জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ।

লেখক—জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জন্মকথা কিছু বল্‌বেন?

সরকার—বিলাতী মাল বয়কটের কাজে ছেলেরা উঠে পড়ে লেগেছিল মফঃস্বলে। কল্‌কাতায় তো লেগেছিলই। ১৯০৫ সনের আগষ্ট মাসে মফঃস্বলের জেলায়-জেলায় গবর্ণমেন্ট ছাত্র-নির্যাতন সুরু ক'রে দিল। জারি ক'রেছিল "সার্কুলার' (১০ অক্টোবর, ১৯০৫)। তাতে বয়কট আন্দোলনে যোগ দিতে ছেলেরা হ'ল নিষিদ্ধ। যোগ দিলে ইস্কুল থেকে নাম কেটে দেওয়া হবে,—এই ছিল সাজা। পয়লা চাবুক পড়ল রংপুরের ইস্কুলের ছেলেদের উপর। অম্‌নি জ্বলে উঠলো আগুন। চালু হ'লো শিক্ষা-বিপ্লব।

রংপুর ও শচীন বসু

লেখক—আপনি বল্‌তে চাচ্ছেন যে, মফঃস্বলে সুরু হ'য়েছিল স্বাধীন শিক্ষার আন্দোলন বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের শিক্ষা-মূর্তি?

সরকার—তাই। রংপুর হচ্ছে বাংলার শিক্ষা-স্বরাজের প্রবর্তক। সেখানকার উকিলেরা এই আন্দোলনের জন্য যারপরনাই উঁচু দরের সৎসাহস আর স্বার্থত্যাগ দেখিয়েছিলেন। উমেশ গুপ্ত ছিলেন তাঁদের নেতা।

কল্‌কাতায় কায়েম হ'লো সার্কুলার-বিরোধী সমিতি (অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি, ২২ অক্টোবর, ১৯০৫)। "সঞ্জীবনী" সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র তার অন্যতম নেতা। শচীন বোস্‌ এই সোসাইটির প্রাণ। কল্‌কাতা থেকে মফঃস্বল আর মফঃস্বল থেকে কল্‌কাতা অনবরত যাওয়া-আসা। গবর্ণমেন্টের আওতা ছেড়ে জননায়কেরা স্বাধীন ইস্কুল কায়েম কর্‌তে লাগ্‌লেন। জেলার সদরে স্বাধীন ইস্কুল কায়েম হ'তো। সাব-ডিভিসনে, মায় পল্লীতে-পল্লীতেও স্বাধীন ইস্কুল মাথা তুল্‌তে লাগ্‌ল। এই আন্দোলনে হাওয়া দিতে লাগ্‌লেন সতীশবাবু কল্‌কাতার কাগজে-কাগজে। তাঁকে মফঃস্বলেও যেতে হয়েছিল, রংপুর-দিনাজপুরে।

লেখক—কল্‌কাতায় কী করা হ'য়েছিল?

সরকার—স্বাধীন ইস্কুলগুলার ভবিষ্যৎ কী?—সমস্যা দাঁড়াল এই। মীমাংসাও সহজ। স্বদেশী বিদ্যামন্দির ইত্যাদি নামে পরিচিত বিদ্যালয়গুলার জন্য চাই স্বাধীন, স্বদেশী বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। কাজেই সোজাসুজি আবশ্যক হ'ল প্রথমতঃ, সরকারী শিক্ষাবিভাগ বয়কট করার, আর দ্বিতীয়তঃ, সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করার। কল্‌কাতার সার্বজনিক সভায় শচীন বিশ্ববিদ্যালয়টাকে "গোলাম-খানা" উপাধি দিলে। সকলে মিলে সেই সুর চালালো।

ডন সোসাইটি ও বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কট

লেখক—দেখ্ছি স্বদেশী ইস্কুল-প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির কৃতিত্ব খুব-বেশী। ডন সোসাইটির সঙ্গে এর যোগ কোথায়?

সরকার—অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির জন্ম হ'ল পূর্ববঙ্গের সরকারী "সার্কুলার'টার সঙ্গে লড়্বার জন্য। এই সোসাইটির কাজ প্রধানতঃ রাষ্ট্রিক। মফঃস্বলে জাতীয় বিদ্যালয় চালানো অথবা কায়েম করা এঁদের মুখ্য কাজ নয়। ডন সোসাইটির কাজ হ'ল "স্বদেশী" ইস্কুলগুলাকে চালাবার ব্যবস্থা করা। সরকারী-আইনটার বিরুদ্ধে লড়া ডন সোসাইটির মুখ্য কাজ নয়। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলা চালাতে হ'লে জরুরি একটা স্বদেশী বা জাতীয় শিক্ষাবিভাগ অথবা/এবং একটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই দিকে নজর ফেলার কাজে ডন সোসাইটি মোতায়েন ছিল। ডন সোসাইটি না থাক্লে হয়ত অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটিকেই স্বদেশী শিক্ষবিভাগ অথবা/এবং স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম কর্তে হ'ত। অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে এই ঝুঁকি বইতে হ'ত। যা হ'ক,—সে অবস্থা হাজির হয় নি।

লেখক—বিশেষভাবে ডন সোসাইটির ঘাড়ে এই ঝুঁকি এসে পড়্ল কী ক'রে?

সরকার—একটা মজার কারণ আছে। ঠিক হ'ল যে, বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট করা আবশ্যক। কিন্তু কী উপায়ে? ১৯০৫-এর শীতকালে এম্-এ পরীক্ষার দিন ছিল। অতএব এম্-এ পরীক্ষাটা বয়কট করানো দাঁড়িয়ে গেল বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কটের প্রথম ধাপ। এইখানে আস্ছে ডন সোসাইটির সঙ্গে যোগ। এই সোসাইটির রবী ঘোষ ছিল এম্-এ পরীক্ষার্থী। সে হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় বি-এ পরীক্ষায় ফার্ষ্ট বয়। কাজেই এম্-এ বয়কটের আন্দোলনে নেতৃত্ব এসে পড়্ল আপনা-আপনিই রবীর ঘাড়ে। শেষ পর্যন্ত "সতীশবাবুর গোআলটা" পরিণত হ'ল এম্-এ বয়কটের কর্মকেন্দ্রে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস চব্বিশ ঘণ্টা হৈ-হৈ রৈ-রৈ। আওয়াজ শুধু,—এম্-এ "পিকেট' করো, এম্-এ "পিকেট" করো।

লেখক—বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কটের আন্দোলন কোথায় গিয়ে ঠেক্ল?

সরকার—আমাদের তে-তলার ছাদে এম্-এ পরীক্ষার্থীদের সভা হ'ল দু'রাত উপরা-উপরি। অ্যাটর্ণি হীরেন দত্ত সেই সভায় এসে হাজির হ'লেন। বল্লেন—"যেই সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় বয়কট হবে অমনি আমি উকিলি ছেড়ে স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈতনিক মাষ্টার হব।" এমন শাঁসাল বক্তৃতা খুব-কম শোনা যায়।

সভার সকলের তাক্ লেগে গেল। পাকা উকিল,—পশারওয়ালা নামজাদা উকিল। বয়সও প্রায় চল্লিশ। কোথায় ছোঁড়ারা গিয়ে তাঁকে ভজাবে না সেই নিজে এসে যেচে বল্ছে:—"ভাঙ্গো সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কায়েম করো স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়। আমি তার হব চাকর।" বক্তাকে এতটা স্বরাজ-নিষ্ঠ তখনও কেউ জান্তো না।

হীরেন দত্ত'র সঙ্গে এই আমাদের প্রথম মোলাকাৎ অথবা দূর হ'তে দেখা। সতীশবাবুর সঙ্গে তাঁর ভাব আগে হ'তেই ছিল। ডন সোসাইটির সাংস্কৃতিক স্বরাজ-কল্পনা খুব জোরাল হ'য়ে উঠ্ল। (পৃঃ ১০৬)

লেখক—হীরেন দত্ত'র বক্তৃতার কোনো কথা মনে আছে?

সরকার—হীরেন দত্ত'র একটা কথা মনে আছে। তিনি ব'লেছিলেন ঃ—"শ্যামের বাঁশরী বেজেছে। গোপিনীরা যে যেখানে আছে সেখান থেকেই ছুটে আস্বে।" ইত্যাদি।

লেখক—হীরেন দত্ত'র উৎসাহ পেয়ে ডন সোসাইটির খাঁটি লাভ কী হ'ল?

সরকার—শেষ পর্যন্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কট হ'ল না। কিন্তু স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম হ'ল। হীরেনবাবু উকিলি ছাড়্লেন না। তবে মাসিক ২৫০ টাকা ক'রে একজন অধ্যাপকের বেতন দিয়ে যেতে লাগ্লেন।

লেখক—এই বিচিত্র ঘটনা ঘট্‌লো কী করে?

সরকার—সতীশবাবু আর হীরেন দত্ত হাইকোর্টের উকিল-মহলে ঘুরা-ফিরা কর্‌লেন। ঝুনো উকিলদের রাজা রাসবিহারী ঘোষ তেতে উঠ্‌লেন। দুঁদে ব্যারিষ্টার তারক পালিতও ক্ষেপে গেলেন। ব্যারিষ্টার আব্দুল রসুল আর আশুতোষ চৌধুরী এবং অ্যাটর্নি দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীও দলে যোগ দিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন অবসর-প্রাপ্ত জজ্। তাঁর সহানুভূতিও জুট্‌ল। ডাক্তারদের ভেতর এলেন নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ও সুন্দরীমোহন দাস। অমৃতবাজার পত্রিকার মতি ঘোষ ষোল আনা এদিকে। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী সুবোধ মল্লিকের লাখ টাকার সঙ্গে নিজের লাখ তিনেক জুড়ে দিতে রাজি হলেন। তাঁর উপর ছিল গৌরীপুর-ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর পাঁচ লাখ। অনেক দিন ধ'রে ব্রজেন্দ্রকিশোরের দান "সতীশ মণ্ডলে" আলোচিত হচ্ছিল। তাঁর কর্মকর্তা মনোমোহন ভট্টাচার্য অম্বিকা উকিলের সঙ্গে এই দান নিয়ে সতীশবাবুর ঘরে বহুবার বকাবকি ক'রেছেন। উঁচু মহলে এই ধরণের উত্তেজনা, আন্দোলন ও সহানুভূতি। আর সঙ্গে-সঙ্গে জননায়কগণের সার্বজনিক সভা বস্‌ল বেঙ্গল ল্যাণ্ড-হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েসনে (১৬ নভেম্বর, ১৯০৫)।

লেখক—তবুও বিশ্ববিদ্যালয়-বয়কট হ'লো না?

সরকার—জমিন এত পরিষ্কার বটে। কিন্তু এম্-এ বয়কট করার প্রস্তাব গৃহীত হ'ল না। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শল্লায় কর্তারা বস্‌লেন—"বাবারা, পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ ক'রো না। জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ আমরা কায়েম কর্‌বই কর্‌ব।" এম্-এ পরীক্ষার্থীরা মাস দেড়েকের ভেতর তৈয়ের হ'য়ে পরীক্ষা দিয়ে দিল। যার ফার্ষ্ট হবার সে ফার্ষ্টই হ'ল। যার ফেল হবার সে আর পাশ হ'ল না।

যাই হ'ক, শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ সনের মার্চ মাসে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষাপ্রণালী বাজারে জারি হ'য়ে গেল। ১৯০৫এর সেপ্টেম্বরে সেহ সভায় হীরেন দত্ত'র ভাবুকতার ক্ষণ হ'তে ১৯০৬এর মার্চ পর্য্যন্ত সব-কিছুই প্রধানতঃ বা একমাত্র ডন সোসাইটির সতীশবাবুরই কাজ। এই জনাই বলতে চাই যে, শিক্ষা-স্বরাজ ডন সোসাইটির সন্তান।

লেখক—জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষা-বিষয়ক মোসাবিদাগুলায় কার-কার হাত ছিল?

সরকার—সতীশবাবুর বাথানে ব'সেই সব দেখেছি। প্রথম কর্তা ছিলেন সতীশবাবু নিজে। দ্বিতীয় কর্তা ব্রজেন শীল। আর তৃতীয় কর্তা গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিন জনের সমবেত মুড়ো হ'তে জাতীয় শিক্ষার পাঠ-ক্রম বেরিয়ে আসে। ১৯০৬-০৮ সনের জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পঞ্জিকাটা দেখ্‌বি। তাতে সব কথা পরিষ্কার ক'রে বুঝনো আছে।

লেখক—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ডন সোসাইটির ব্যক্তিগত যোগাযোগ কিরূপ ছিল? তাঁকে সতীশ-মণ্ডলের অন্তর্গত করা সম্ভব?

সরকার—যোগাযোগ খুব বেশী ছিল। রবীন্দ্রনাথকে আমরা সতীশ-মণ্ডলের অন্তর্গতই ভাব্‌তাম। ১৯০৫-০৮ সনের ভেতর আমরা চারজনে (সতীশবাবু, রাধাকুমুদ, রবী আর এই অধম) বহুবার সকালে রবিবাবুর বৈঠকখানায় গিয়ে নানা বিষয়ে আলোচনা ক'রেছি। (পৃঃ ২০৮)

লেখক—এই ধরণের মাখামাখি আপনাদের সঙ্গে এই যুগে আর কার-কার সঙ্গে ছিল?

সরকার—হামেশা যেতে হ'ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী আর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট। প্রায় প্রতিদিন খেতে বসে একয়জনের নাম মুখে আন্‌তাম। এঁদের ছাড়া দিন চল্‌ত না বলা যেতে পারে।

লেখক—খেতে বসে আলোচনা হ'ত—একথাটার মানে কী?

সরকার—ফীল্ড অ্যান্ড অ্যাকাডেমী ক্লাবের দোতলার মেসে সতীশবাবুর সঙ্গে রাধাকুমুদ, রবী আর এই অধম একত্রে খেতে বস্‌ত। বলা বাহুল্য,—খাবার সময় গুল্‌তান অবশ্যম্ভাবী। এই ছিল ১৯০৫-০৬ সনের মেস,—ব্রহ্মবান্ধবের পরিচালনায়।

লেখক—তারপরও একত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল?

সরকার—৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের লেনে সতীশবাবুর সঙ্গে ছিলাম আমরা তিন মূর্তি (১৯০৬-০৮)। এই মেসে ন্যাশন্যাল কলেজের ছেলেরাও থাক্‌ত। তখনও অনেক সময়ে একত্রে খাবার ব্যবস্থা ছিল।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ বনাম সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—জাতীয় শিক্ষাপরিষদের বিশেষত্ব কিছু ছিল কি? সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে এর প্রভেদ ছিল কোন্ কোন্ বিষয়ে?

সরকাব—প্রথম প্রভেদ রাষ্ট্রনৈতিক। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ষোল-আনা বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। ইহার সঙ্গে গবর্ণমেন্টের কোনো বিভাগের কোনো সম্পর্ক ছিল না। দাঁড়িয়ে গেল একট খাঁটি স্বরাজের কর্মকেন্দ্র। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের পক্ষে শিক্ষা-বিপ্লব অনুষ্ঠিত হ'ল। এইটেই চরম যুগান্তর।

লেখক—শিক্ষাবিষয়ক কোনো প্রভেদ ছিল?

সরকার—শিক্ষাবিষয়ক প্রভেদ ছিল বিস্তর। টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হ'ল সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক। পাঠশালায় ভর্তি হওয়া মাত্রই প্রত্যেক শিশুকে হাতে-কলমে কাজ শিখতে হ'ত। ম্যাট্রিকেব সমান ক্লাসের টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্বজনিক কবা হ'য়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে এ ছিল এক অদ্ভুত যুগান্তর বা বিপ্লব। তা ছাড়া কলেজ বিভাগেও টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার উপর জোর ছিল দস্তুর মতন। যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারিং হ'লো একটা নতুন পারিভাষিক।

লেখক—শিক্ষা সম্বন্ধে জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ আর কোনো নূতনত্ব এনেছিল?

সরকার—কয়েকটা বিশেষত্ব খুবই মূল্যবান। ইস্কুল-বিভাগে ভাষা, সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, ভুগোল ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রাণ-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যাগুলা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ইহাও শিক্ষাক্ষেত্রের বঙ্গ-বিপ্লব। ইস্কুল-বিভাগের সর্বনিম্ন শ্রেণী হ'তে কলেজ বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সব-কিছু শিখাবার জন্য বাংলা ভাষাকেই বাধ্যতামূলক ও সার্বজনিক বাহন করা হ'য়েছিল। ইস্কুল-বিভাগ আর কলেজ-বিভাগ দুই বিভাগ সম্বন্ধেই এরূপ বিপ্লব ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে

কখনো কল্পনা করা সম্ভব হয়নি। জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ব্যবস্থায় বিপ্লবটা বাংলাদেশের জেলায়-জেলায় মূর্তি গ্রহণ কর্‌ল। এত বড় যুগান্তর ভারতীয় নরনারীর পক্ষে স্বপ্নেরও বাইরে ছিল বলা চল্‌তে পারে।

লেখক—কলেজ বিভাগের শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে কোনো বিশেষত্ব ছিল কি?

সরকার—তিনটা বিশেষত্ব উল্লেখযোগ্য ঃ—(১) প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, সুকুমার-শিল্প, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে পঠন-পাঠন ও গবেষণার উপর জোর দেওয়া হ'ল। (২) পালি, হিন্দি ও মারাঠি ভাষা শেখবার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছিল। এই তিন ভাষার সাহায্যে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের সঙ্গে ছাত্রদের আত্মিক যোগাযোগ সুদৃঢ় কর্‌বার লক্ষ্য ছিল। (৩) ফরাসী এবং জার্মাণ ভাষা শেখবার ব্যবস্থাও ছিল। আধুনিক ইয়োরামেরিকার জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে ছাত্রদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কায়েম করানো পরিষৎ নিজ কার্য-তালিকার অন্তর্গত ক'রে নিয়েছিল।

লেখক—এত-বড় কল্পনা কাজে পরিণত কর্‌বার ক্ষমতা জাতীয় শিক্ষাপরিষদের ছিল কি?

সরকার—এই কল্পনা, আকাঙক্ষা বা স্বপ্নই তো শিক্ষাক্ষেত্রের বঙ্গ বিপ্লব। বস্তুতঃ এত-বড় মোসাবিদা নিয়ে কাজ কর্‌বার পক্ষপাতী কোনো-কোনো জননায়ক ছিলেন না। ঝগড়া হ'য়েছিল প্রথমেই। এমন কি, বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভায়ই (১৬ নভেম্বর, ১৯০৫) তারক পালিত, নীলরতন সরকার, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ইত্যাদি নেতারা স্বতন্ত্র ব্যবস্থার আন্দোলন রুজু করেন।

লেখক—কিরূপ স্বতন্ত্র ব্যবস্থা?

সরকার—তাঁদের মোসাবিদায় টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা ছাড়া অন্যকিছুর ব্যবস্থা ছিল না। ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় সরকারী-বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন চল্‌ছে চল্‌তে থাকুক। স্বদেশী-বিদ্যালয় কায়েম হোক্ একমাত্র টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাদানের জন্য। এই ছিল তাঁদের প্রস্তাব। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কায়েম করার কথা তাঁদের প্রস্তাবে ছিল না। তাঁরা বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট নামে কলেজ স্থাপন কর্‌লেন (১৯০৬)।

লেখক—জাতীয় শিক্ষাপরিষদের প্রস্তাবে সায় দিলেন কারা?

সরকার—"সতীশ-মণ্ডলে"র প্রায় সবাই। রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আবদুল রসুল, হীরেন দত্ত, মতি ঘোষ, বিপিন পাল, আশুতোষ চৌধুরী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ইত্যাদি অধিকাংশ জননায়কই ষোল-কলায় পূর্ণ নতুন ঢঙের বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ নিয়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ কায়েম কর্‌লেন (১৯০৬)। তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম হ'ল বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল। মফঃস্বলে তাঁদের অধীনে ১৯০৬-০৮ সনে বোধ হয় শ'-খানেক ইস্কুল ও পাঠশালা ছিল। সারা বাংলায় প্রায় হাজার-পাঁচেক ছাত্র হ'য়েছিল প্রথম বছর-দুয়েক।

লেখক—বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌স্টিটিউট আর বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ এই স্বদেশী প্রতিষ্ঠান দু'টার পরবর্তী অবস্থা কিরূপ? আজ তাদের কোন চিহ্ন আছে?

সরকার—মজার প্রশ্ন। জবাবও মজার। এই দুই স্বদেশী প্রতিষ্ঠান কয়েক বৎসর স্বতন্ত্র ভাবে চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু ১৯১০ সনে দুটা মিলে' গেল। নাম হ'ল বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড টেক্‌নিক্যাল ইনষ্টিটিউট। দু'টাকে একত্রে চালাবার জন্য কর্তা হ'ল জাতীয়

শিক্ষাপরিষদ। বর্তমানে যাদবপুরে র'য়েছে কলেজ অব এঞ্জিনিয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজি। লেখাপড়া হয় একমাত্র টেক্‌নিক্যাল। পরিচালন-কর্তার নাম আজও জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ। কিন্তু সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সঙ্গে টক্কর দিবার জন্য না আছে পরিষদের অধীনে ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি বিদ্যা শেখাবার ব্যবস্থা। আর না আছে প্রাচীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, সংস্কৃতি, সুকুমার শিল্প ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণার আয়োজন। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তারক পালিতের আদর্শ ও লক্ষ্যই জয়ী হ'য়েছে। আর ডন সোসাইটির ষোল-আনা বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্পনা অলীক স্বপ্নে পরিণত হ'য়েছে। দুনিয়ার গতিভঙ্গী বিচিত্র।
("জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ", ১৫ই অক্টোবর, ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

ডন ম্যাগাজিনে ভারত-গবেষণা

লেখক—জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হবার পর ডন সোসাইটির অবস্থা কিরূপ হ'ল?

সরকার—আগেই কয়েকবার ব'লেছি যে, জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জন্ম (মার্চ, ১৯০৬) দিয়েই ডন সোসাইটি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'ল। সতীশবাবু তাঁর প্রধান-প্রধান তিন-চার পেটোআ সহ বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুলের অধ্যাপক ও পরিচালক হ'লেন। নানা জেলা ও প্রদেশ ঝাঁটিয়ে অধ্যাপক সংগ্রহ করার ভার তাঁরই উপর পড়্‌ল। বড়োদা থেকে এসে হাজির হ'লেন অরবিন্দ ঘোষ। তাঁর সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগাযোগ কায়েম হ'ল "রাজা" সুবোধ মল্লিক ও হীরেন দত্ত'র মারফৎ। এখনো ১৯০৬ সনের কথা বল্‌ছি।

লেখক—সতীশবাবুর তিন-চার পেটোআ কে-কে?

সরকার—হারাণ চাক্‌লাদার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, কিশোরীমোহন গুপ্ত আর রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ।

লেখক—ডন ম্যাগাজিনের অবস্থা তখন কিরূপ?

সরকার—ডন সোসাইটি উঠে গেল বটে। কিন্তু ডন ম্যাগাজিনের আয়ু ফুরুলো না। বরং নতুন তেজে নতুন প্রাণ দেখাতে লাগ্‌ল।

লেখক—সে আবার কী?

সরকার—সতীশবাবু ডন ম্যাগাজিনকে জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনের মুখপত্ররূপে গড়ে' তুল্‌লেন। ১৯০৬-এর মাঝামাঝি হ'তে ডন ম্যাগাজিনের তৃতীয় যুগ সুরু হ'ল বলা যেতে পারে। ১৮৯৩ হ'তে ১৯০২ পর্যন্ত ছিল দার্শনিক ও সাংস্কৃতিক যুগ। ১৯০২ হ'তে ১৯০৬-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল ভারতীয় তথ্য-নিষ্ঠা ও সংখ্যা-নিষ্ঠার যুগ। এখন সুরু হ'ল জাতীয় শিক্ষার যুগ। দ্বিতীয় যুগের ভারত-নিষ্ঠাও বজায় রাখা হ'ল। বোধ হয় ১৯১৩ সনে "ডন" কাগজ উঠে যায়। শেষ দু-তিন বছর জাতীয় শিক্ষার সঙ্গে যোগ ছিল না।

লেখক—তৃতীয় যুগের কোনো বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন?

সরকার—১৯০৬ সনের মাঝামাঝি হ'তে ডন ম্যাগাজিনে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতির গবেষণা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের উপর জোর প'ড়েছিল। সতীশবাবু জাতীয় শিক্ষাপরিষদের খুব-বড় উদ্দেশ্যই দেখ্‌তেন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান-গবেষণা। তা ছাড়া জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন বিষয়ক সকল প্রকার সংবাদ ও মন্তব্য ছাপা হ'তো।

লেখক—ডন ম্যাগাজিনে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ক কোনো গবেষণা

প্রকাশিত হ'য়েছিল?

সরকার—সতীশবাবু লঙ্কা, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ইত্যাদি দ্বীপ সমূহে প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিশ্লেষণ সুরু ক'র্‌লেন ; ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে রাধাকুমুদ এই দিকে মন লাগালেন বেশী। পরবর্তী কালে এই সকল গবেষণা ডন ম্যাগাজিনে ক্রমশঃ প্রকাশিত হ'তে থাকে। ভারতীয় সমুদ্র-বাণিজ্যের ইতিহাস বিষয়ক বইয়ের (১৯১১) জন্য রাধাকুমুদ সতীশবাবুর প্রেরণার নিকট ঋণী। "গ্রেটার ইন্ডিয়া" বিষয়ক ঐতিহাসিক কল্পনা সতীশবাবুর মগজে প্রথম ঠাঁই পায়। রাধাকুমুদের বইয়ে তাই ফলাও করে দেখানো হ'য়েছে। "বৃহত্তর ভারত" শব্দটা এই অধম কায়েম করে। (পৃঃ ১৩৯)

লেখক—এই ধরণের আর কোনো প্রাচীন ভারত বিষয়ক গবেষণা ডন ম্যাগাজিনে বেরিয়েছিল?

সরকার—সতীশবাবু ভারতের সাংস্কৃতিক ঐক্য সম্বন্ধে খুব জোর দিতেন। এই সম্বন্ধে ডন ম্যাগাজিনেই তাঁর রচনাও বেরিয়েছিল। সতীশবাবুর হদিশ পেয়ে রাধাকুমুদ গবেষণা সুরু করেন। ডন ম্যাগাজিনে ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত "মডার্ণ-রিভিউ"য়ে কিছু প্রবন্ধ বেরোয়। পরে বই হ'য়েছে "দি ফাণ্ডামেণ্ট্যাল ইউনিটি অব ইণ্ডিয়া" নামে (১৯১৪)।

লেখক—"মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের যোগাযোগ কিরূপ?

সবকার—রামানন্দবাবুর প্রথম পত্রিকা "প্রবাসী"। স্বদেশী আন্দোলনের আগে সুরু হয় এলাহাবাদে। "মডার্ণ রিভিউ"য়ের জন্ম কল্‌কাতায়,—স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৬)। এই দুই কাগজের নিকট বঙ্গ-বিপ্লব (১৯০৬-১৪) বেশ-কিছু ঋণী। রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক,—সকল স্বরাজের দিকেই এই দুই পত্রিকার নজর থাক্‌তো। সংবাদ, তথ্যপ্রকাশ আর টীকা-টিপ্পনী,—এইসব সাহায্যে রামানন্দবাবু দেশের লোককে সজাগ রাখ্‌তে পেরেছিলেন। মাসিক দু'টা ঠিক যেন দৈনিকের কাজ কর্‌তো। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে অন্যতম আদর্শ-নিষ্ঠ, চৌকোস ও কর্মদক্ষ স্বদেশসেবক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

লেখক—সতীশ মণ্ডলের অন্তর্গত হিসাবে আপনার কী হ'ল? কিছু বল্‌লেন না তো?

সরকার—১৯০৭-এর প্রথম দিকে এই অধমও জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সেবক হ'ল। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজে ঢুকে গেলাম। জুন-অক্টোবর মাসে মালদহ জেলার নানাকেন্দ্রে গোটা সাত-আটেক মাধ্যমিক ও প্রাথমিক ইস্কুল কায়েম করা গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দু'একটা নৈশ পাঠশালাও খুলে দিলাম। প্রায় সাড়ে আট শ' ছেলে জুট্‌ল প্রথম বৎসর। সব কয়টা এক কেন্দ্র শাসনে রাখ্‌বার জন্য জেলাব্যাপী একটা জাতীয় শিক্ষা সমিতি খাড়া করা গেল। যথাসময়ে এই সমিতির সঙ্গে কল্‌কাতার পরিষদের যোগ স্থাপন ক'রে দিলাম।

লেখক—ডন ম্যাগাজিনের খবর আজকাল কার কাছে ভাল পাওয়া যেতে পারে?

সরকার—কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়-পত্রিকার কর্মকর্তা সতীশ গুহ "সতীশ-মণ্ডল" ও ডন ম্যাগাজিন সম্বন্ধে খুব বেশী খবর দিতে পার্‌বেন। সেকালে সতীশবাবুর তদবিরে আমাদেব সঙ্গে এক মেসে ছিল (৩৮।২ শিবনারায়ণ দাসের গলিতে)। তখন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের ছাত্র। "ডন সোসাইটি"র যুগ সে দেখেনি। ১৯০৭-১৪ সনের খবর তাঁর কাছে পাবি।

"শিক্ষাবিজ্ঞান"

লেখক—জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে আপনি ১৯০৫-০৭ সনে কিছু লিখেছিলেন?

সরকার—জীবনের প্রথম লেখাই জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধীয়। ১৯০৬ সনের জুন মাসে প্রথম রচনা-প্রকাশ। লেখাটা বেরোয় "মালদহ সমাচার" সাপ্তাহিকে। নাম ছিল 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ ও বঙ্গসমাজ"। সেইটার ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয় অমৃতবাজার পত্রিকায় (জুলাই-আগষ্ট ১৯০৬)। লেখকের নাম ছিল না। ১৯০৭ সনের জুন মাসে মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতি কায়েম করবার সময় লিখি "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা"। আগষ্ট মাসের ডন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির পরিচালনা-প্রণালী সম্বন্ধে ইংরেজি প্রবন্ধ।

লেখক—আপনার প্রাথমিক রচনাবলী সম্বন্ধে লোকজনের মতামত কিরূপ ছিল?

সরকার—ডন ম্যাগাজিনের ইংরেজি রচনাটা কিছু নাম ক'রেছিল। এই প্রবন্ধ প'ড়ে আগষ্ট মাসেই বড়-গোছের সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখেন অরবিন্দ ঘোষ তাঁর "বন্দেমাতরম্" নামক ইংরেজি দৈনিকে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধ বিপিন পালও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন তাঁর "নিউ ইণ্ডিয়া" সাপ্তাহিকে (সেপ্টেম্বর মাসে)। ১৯০৭ সনেরই কথা ব'ল্‌ছি। অরবিন্দ-বিপিনের তারিফ পাওয়াটা সেই বয়সে "কিঞ্চিৎ-কিছু" বটে।

লেখক—জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সংশ্রবে আপনি প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি অথবা বর্তমান ভারতের আর্থিক উন্নতি কিম্বা ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে কোনো গবেষণা ক'রেছিলেন?

সরকার—অনেক দিন পর্যন্ত আমার ধান্ধা এই সকল দিকে ছিল না। সেই যুগে আমার গবেষণার বস্তু ছিল শিক্ষাতত্ত্ব, শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষার ইতিহাস। লেখা বেরিয়েছিল অনেক। সবগুলাকে একত্রে নান দিয়েছিলাম "শিক্ষা-বিজ্ঞান"। নামটাকে লোকেরা বল্‌তো কিম্ভূত-কিমাকার।

তবে একাল-সেকালের রাষ্ট্রিক তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করার ঝোঁক ছিল। ন্যাশন্যাল কলেজে আমার অন্যতম পড়াবার বিষয় ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান (১৯০৭-১০)। সেই উপলক্ষ্যে "ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানব-জাতির আশা" প্রবন্ধ তৈরি হয়। বাংলায় ছাপা হ'য়েছিল "প্রবাসী"তে (১৯১১)। পরে সেটা বিলাতে ছাপা হয় বইয়ের আকারে ১৯১২)।

লেখক—"শিক্ষাবিজ্ঞান"-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত কয়েকটা বইয়ের নাম কর্‌তে পারেন?

সরকার—শিক্ষাবিজ্ঞানের ভূমিকা (১৯১০), প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা (১৯১০), ভাষাশিক্ষা (১৯১০), সংস্কৃতশিক্ষা (১৯১১), শিক্ষা-সমালোচনা (১৯১২) ইত্যাদি। প্রথম বইটার ইংরেজি তর্জমা লণ্ডনে প্রকাশিত হ'য়েছিল ('১৯১৩)। ইংরেজিতে আমার শিক্ষা-প্রণালীর এক চুম্বক খাড়া ক'রেছিলাম। নাম "শিক্ষা-সোপান" ("স্‌টেপ্‌স টু এ ইউনিভাবসিটি")। সেটা ১৯১২ সনের রচনা। তার ভেতর বয়স হিসাবে প্রত্যেক ছাত্রের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা বিশ্লেষণ করা আছে। তা ছাড়া, ১৯১২ সনেই বাংলায়, ইংরেজিতে ও হিন্দি'তে একটা "শিক্ষানুশাসন"ও ঝেড়েছিলাম। সে-যুগে ইয়ারের দলে আমাকে "শিক্ষাবিজ্ঞান সরকার" ব'লে ডাক্‌ত। (পৃঃ ১৬৬-৬৭)

লেখক—আজকাল ছেলেরা আপনাকে দেখ্‌লে বলে,—"ঐ দ্যাখ্‌, ১৯০৫ যাচ্ছে।"

সরকার—ঠিক বলে। বিদেশ (১৯১৪-২৫) আমার নাম ছিল কেনো-কোনো ভারতীয় মহলে—"হিন্দু কালচার (হিন্দু সংস্কৃতি) সরকার।" এই নামের সঙ্গে ঠাট্টা মাখানো।

লেখক—এই ধরণের আপনার আর কোনো নাম শুনেছেন?

সরকার—বিদেশীরা আমাকে কোথাও-কোথাও,—বিশেষতঃ ফ্রান্সে ও জার্মাণিতে—ডাক্‌ত "ইয়ং এশিয়া (যুবক এশিয়া) সরকার" ব'লে।

লেখক—এইরকম নামকরণ বা হাসিঠাট্টার কারণ কী?

সরকার—কোনো-একটা বিষয়ে হরদম লেখা বেরুতে থাক্‌লে পাঠকেরা অস্থির হ'য়ে পড়ে। বলে,—"ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।" প্রকাশকেরা বলে,—"বাজারে একটা হৈ-চৈ তো চ'লেছে। আর কী চাই? যা হ'ক, বইয়ের হাটে নতুন একটা বোল বা ডাক দাঁড়িয়ে গেল।" হাসি-ঠাট্টার দর্শন মজার জিনিষ!

নগেন রক্ষিত ও ধম্মানন্দ কোসাম্বি

৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজের প্রথম অধ্যাপকদের ভেতর বিশেষত্বশীল কাউকে দেখেছিলেন? আপনার ডন সোসাইটির চোখে কেউ নতুন মনে হ'য়েছিল?

সরকার—১৯০৭-০৮ সনের ন্যাশন্যাল কলেজে যাঁরা জুটেছিলেন তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বিশেষত্বশীল। সকলেরই কিছু-না-কিছু নতুন বল্‌বার বা কর্‌বার ছিল। বাঙ্গালী জাত্‌ যে কত-বড় তখনই বেশ মালুম হ'য়েছিল। ডন সোসাইটির চোখ দিয়েও এই সকল নূতনত্ব ও বিশেষত্ব আবিষ্কার ক'র্‌ছিলাম। স্বার্থত্যাগী, করিৎকর্মা, বিপ্লব-পন্থী অনেককেই মনে হচ্ছিল।

লেখক—এই যুগের আপনার কয়েকটা লোক-আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত দিন না?

সরকার—প্রথম আবিষ্কার অরবিন্দ। একমাত্র আমার আবিষ্কার নয়,—গোটা সতীশ-মণ্ডলেরই আবিষ্কার! ১৯০৬ সনের পূর্বে বোধ হয় সতীশবাবু অরবিন্দ'র নাম পর্যন্ত শুনেন নি। অন্ততঃ তাঁর কাছে আমরা অরবিন্দ'র নাম শুনেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ অরবিন্দ'র বয়স তখন বোধ হয় বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশেক। দূর বড়োদায় ছিলেন,—সত্যি কথা। কিন্তু তবুও বাঙালী তো? বুঝ্‌তে হবে,—সেকালে লোকজনের নাম যেন দেশের ভেতর বড়-একটা ছড়িয়ে পড়্‌ত না। এই জন্যই বল্‌ছি অরবিন্দ আমাদের সকলের পক্ষেই যেন একটা আবিষ্কার! গোটা বাঙালী জাত্‌ই ১৯০৬ সনে ন্যাশন্যাল কলেজের মারফৎ অরবিন্দকে আবিষ্কার কর্‌ল। (পৃঃ ২১৮)

("অরবিন্দ-দর্শন", "দার্শনিক সাম্য-সম্বন্ধ", ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—আর কোনো আবিষ্কার আপনার পক্ষে উল্লেখযোগ্য?

সরকার—নগেন্দ্রনাথ রক্ষিতের নাম কর্‌তে চাই সকলের আগে? ছোক্‌রা প্রায় আমার বয়েসি,—বোধ হয় এক আধ বছর ছোট বা বড় কিন্তু লোহালক্কড়, ষ্টীম এঞ্জিন, লেদ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি বুঝে। সে ছিল টেক্‌নিক্যাল বিভাগের লোক। অতএব পেশায় আমার বিলকুল উল্টা। এই জন্যেই তার সঙ্গে আমার বনিবনাও হ'তো ভাল। তাকে আমি যন্ত্রবীর বল্‌তাম। খুব পছন্দ ক'র্‌তাম। সে যুগে "ধোঁআ ওড়ানো" ছিল আমার বাতিক। আজকাল বাতিকটা আর নেই। তবে "ধোঁআ ওড়ানো" পারিভাষিকটা এখনো ছাড়ি নি। অর্থনৈতিক লেখা-পড়ায় যখন-তখন কাজে লাগে।

লেখক—এই বাতিকটার মানে কী?

সরকার—মফঃস্বলের পাড়াগাঁয়ে যন্ত্রপাতির কথা বলা ছিল আমার "স্বদেশী"-নিষ্ঠার প্রাণ। কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ছাড়া বাঙালী জাত আর্থিক জীবনে উন্নতি কর্‌তে পার্‌বে না। যেখানে-সেখানে চাই স্টীমের এঞ্জিন, তেলের এঞ্জিন ইত্যাদি। এই ছিল আমার বুখ্‌নি। "ধোঁআ ওড়ানো" বল্‌লে বুঝ্‌তাম "শিল্প-বিপ্লব।" মনে পড়্‌ছে—মালদহের কলিগ্রামে ন্যাশন্যাল ইস্কুল কায়েম কর্‌বার সময় এই ধরণের বুখ্‌নি ঝেড়েছিলাম (১৯০৭)। ইস্কুলটার সঙ্গে টেক্‌নিক্যাল বিভাগ খোল্‌বার উপলক্ষ্যে ব'লেছিলাম ঃ—"কয়েক মাস পরে এসে এই বিভাগে ধোঁআ ওড়াবো।" লোকেরা বুঝেছিল যে,—আমি একটা তেলের এঞ্জিন বসিয়ে টেক্‌নিক্যাল্ বিভাগের উন্নতি করাবো।

লেখক—আপনার "ধোঁআ ওড়াবার" বাতিক বা পারিভাষিকের সঙ্গে নগেন রক্ষিতের সম্পর্ক কী?

সরকার—এই "ধোঁআ ওড়াবার' বিদ্যায় ছিল নগেন রক্ষিত ওস্তাদ। এই জন্য যন্ত্রনিষ্ঠ নগেন রক্ষিতকে আমার মস্ত আবিষ্কার বলা চল্‌ত। তাকে আমি মালদহেও নিয়ে গিয়েছিলাম,—জনসাধারণকে একজন যন্ত্রবীরের চেহারা দেখাবার জন্য। নগেন রক্ষিত আজকাল টাটানগরে একটা লোহার কারখানার ওস্তাদ ও পরিচালক। অন্যান্য যান্ত্রিক কাজেও মোতায়েন আছেন। দেখা-সাক্ষাৎ হয়। বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম ছোকরা নায়ক হিসাবে নগেন রক্ষিত উল্লেখযোগ্য।

লেখক—সেই সময়কার আর কোনো লোক-আবিষ্কারের কথা বল্‌বেন?

সরকার—একজনের কথা বল্‌তে চাই। সে মারাঠা পণ্ডিত ধম্মানন্দ কোসাম্বি। তাঁর কাছে আমি পালি ও মারাঠি পড়্‌তে আরম্ভ করি। খাঁটি মারাঠার সঙ্গে এই প্রথম মোলাকাৎ। মারাঠা-জাতীয় সখারাম গণেশ দেউস্কর আর হিন্দি-শিক্ষক বাবুরাও পাড়াড়কারও আমাদের ভেতর ছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় বাঙ্গালী হ'য়ে গিয়েছিলেন। তখনও বালগঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে দেখা হয়নি। ১৯০৬ সনের কল্‌কাতা কংগ্রেসের সময় তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা ক'রে গিয়েছিলেন। তাতে চরম-পন্থী রাষ্ট্রিক দলের মোসাবিদা ছিল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ কায়েম হয়নি। কোসাম্বিই আমার জীবনের প্রথম মারাঠা। বোধ হয় ১৯০৭ সনের জুন-জুলাই মাসে প্রথম আলাপ। পরে তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন (১৯১০-১৩)। ১৯১৭-১৮) সনে তাঁর সঙ্গে নিউ-ইয়র্কে দেখা হ'য়েছিল। পরে ভারতেও দেখা হ'য়েছে। বর্তমানে তিনি সারনাথের নবীন বৌদ্ধ আশ্রমে বানপ্রস্থী। এই বছর মার্চ মাসে তাঁর সঙ্গে সারনাথে দেখা হ'ল।

অরবিন্দ ও বিপিন পাল

লেখক—ন্যাশন্যাল কলেজের আবহাওয়ায় অরবিন্দকে কেমন মনে হ'য়েছিল? অরবিন্দ'র নাম-ডাক তখন কিরূপ ছিল?

সরকার—১৯০৬ সনে ন্যাশন্যাল কলেজের আবহাওয়ায় আসল পারিভাষিক ছিল মাত্র এক। সে হচ্ছে স্বার্থত্যাগ আর স্বদেশ-সেবা। এই পারিভাষিকে অরবিন্দ পয়লা নম্বরেব বলাই বাহুল্য। কাজেই নাম-ডাক ছিল জবর। অরবিন্দ যে-কোনো বিষয়েই ওস্তাদ, সব-কিছুই কর্‌তে পারে। সে স্বার্থত্যাগী ব'লে এইরূপ ছিল দেশের লোকের ধারণা। "বন্দেমাতরম্" দৈনিক

বেরুল ১৯০৬ সনে। তার সঙ্গে সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দ'র নাম জড়ানো ছিল। লোকেরা ভাব্‌ত যে, "বন্দেমাতরম্‌" কাগজের সব-কয়টা সম্পাদকীয় রচনা,—কম-সে-কম সব্‌সে ঝাঁঝাল রচনাগুলা অরবিন্দ'র লেখা। মোটের উপর সার্বজনিক মতে অরবিন্দ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ১৯০৬-০৮ সনের বংগ-বিপ্লবের নেতা। নেতা শুধু নয়, একদম প্রতিমূর্তি। একেই বলে ভাবালুতা। (পৃঃ ২১৭)

লেখক—আপনি কী ভাব্‌তেন?

সরকার—স্বার্থত্যাগ সম্বন্ধে নতুন-কিছু বল্‌বার ছিল না। বিপ্লব-দার্শনিক হিসাবেও অরবিন্দ'র ইজ্জৎ কমাবার কোনো কারণ হয়নি। এই দুই বিষয়ে সে একদম পাকা সোনা। কিন্তু তা ব'লে অরবিন্দকে বঙ্গ-বিপ্লবের নেতা বা জনক বলা সম্ভবপর ছিল না। তাকে অন্যতম নেতা বল্‌তে অ-রাজি হ'তাম না। তবে "বঙ্গ-বিপ্লবের" জন্মদাতা তো তিনি ননই। কেন না ১৯০৫-০৬ সনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বাংলার সার্বজনিক জীবনে তাঁর উদয় হয় নি। কম্‌-সে-কম্‌ কোনো বাঙ্গালী খোলা চোখে অরবিন্দকে বঙ্গীয় সার্বজনিক সংস্কৃতির সঙ্গে সুজড়িতভাবে দেখেছিল কি না সন্দেহ।

লেখক—১৯০৬-০৮ সনে অরবিন্দকে বংগ-বিপ্লবের নেতা বল্‌তে আপনার আপত্তি কী ছিল?

সরকার—অরবিন্দ ব'ক্‌তে পার্‌তেন না। বকাবকি করার ক্ষমতা নেতৃত্বের প্রধান ভিত্তি। বহুসংখ্যক নানা মেজাজের লোককে ক্ষ্যাপাতে হ'লে চাই গলার জোর। একমাত্র বিদ্যা, একমাত্র বিচারশক্তি, একমাত্র স্বার্থত্যাগ, একমাত্র চরিত্রবল,—এইসব সদ্‌গুণের জোরে লাখ-লাখ লোকের হৃদয় দখল করা যায় না: তার জন্য চাই বাগ্মিতা। অরবিন্দ'র বাগ্মিতা ছিল না,—না ইংরেজিতে, না বাংলায়। বস্তুতঃ তখন তাঁর পক্ষে বাংলায় কথা বলাও বোধ হয় সহজ ছিল না। অরবিন্দ'র প্রভাব ছড়াতো ছোট-ছোট আসরে। এমন কি মাত্র দু-চার জন লোকের আবেষ্টন ছাড়া তাঁর পক্ষে কথা কওয়া পোষাতো না। সত্যি কথা,—লোকটা যেন বিলকুল বাক্যহীন। এমন নীরব লোক সংসারে থাক্‌তে পারে বিশ্বাস করা কঠিন। দেখেছি,—সার্বজনিক সভায় ব'সেও অরবিন্দ মুখ ফোটাতেন না। এই দুর্বলতা যার, তার পক্ষে দেশের নেতৃত্ব করা সম্ভবপর নয়।

লেখক—সে-যুগের আসল নেতা আপনি কাকে বলেন?

সরকার—আমার বিচারে সে-যুগের আসল নেতা বিপিন পাল। ১৯০৫-সনের আগষ্ট হ'তে ১৯০৮ সন পর্যন্ত বাঙালী জাত্‌কে তাতিয়ে তোল্‌বার ভার ছিল বিপিন পালের হাতে। বিপিন পালের গলায় আওয়াজ না শুন্‌লে যুবক বাংলার জন্ম হ'ত না। বিদ্যায়, দার্শনিকতায়, রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানে, বিপ্লব-যোগে, কর্তব্যনিষ্ঠায় বিপিন পালের ঠাঁই উঁচু ছিল। তার সঙ্গে গলার আওয়াজ জোড়া ছিল ব'লে বিপিন পালের কীর্তি। একমাত্র গলাবাজি ক'রে কেহ দেশ মাতাতে পারে না।

লেখক—আপনি সুরেন ব্যানার্জিকে বিপিন পালের চেয়ে ছোট বিবেচনা কর্‌ছেন?

সরকার—ঘটনা-চক্রে তাই কর্‌তে হচ্ছে। সুরেন বাবুর বাগ্মিতা ছিল, স্বদেশনিষ্ঠাও ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে ও বিলাতী-বয়কটের স্বপক্ষে তাঁর প্রচারিত উদ্দীপনার কিম্মৎ ছিল ঢের। কিন্তু ১৯০৫-০৮ সনের যুগে তাঁকে বিপ্লব-পন্থী বলা সম্ভবপর ছিল না। ষোল আনা রাষ্ট্রিক স্বরাজ, ষোল আনা সাংস্কৃতিক স্বরাজ, ষোল আনা শিক্ষা-স্বরাজ ইত্যাদি চরম স্বাধীনতার বাণী সুরেন বাবু প্রচার কর্‌তে পারেন নি। কাজেই তাঁকে নরম বা মডারেট দলের নেতা

বলা হ'তে লাগল। পশার জমলো বিপিন পালের। এই জন্য আমি বিপিন পালকে বঙ্গ-বিপ্লবের জন্মদাতা ও নেতা ব'লে সম্বর্ধনা ক'রে থাকি। অরবিন্দ'কে এই আসনে বসানো চলবে না। তবে নানা কারণে অরবিন্দ'র নামডাক ছিল। এই জন্য কোনো-কোনো সময়ে বঙ্গ-বিপ্লবকে (১৯০৫-০৮) বিপিন-অরবিন্দ'র যৌথ সৃষ্টি ব'লতেও অ-রাজি হই না।

লেখক—তখনকার দিনে চিত্তরঞ্জন দাশকে আপনি কিরূপ ভাবতেন?

সরকার—১৯০৮ সনে অরবিন্দ'র বোমার মামলায় চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্যারিষ্টার। এই জন্য তাঁর নাম-ডাক সুরু। আমরা তাঁকে বিপিন পালের বন্ধু ব'লেও জানতাম। রাষ্ট্রিক "বাজারে" তাঁর সঙ্গে দেখাশুনা হ'তো কম। দেশ-বিদেশের সঙ্গে ভারতীয় যোগাযোগ কায়েম করা সম্বন্ধে একবার তাঁর সঙ্গে কথা হ'য়েছিল (১৯১২)। দেখলাম তিনি লণ্ডনের আইরিশ দলের সঙ্গে ভারতীয় কংগ্রেসের বন্ধুত্ব পছন্দ করেন। এটুকুও সেকালের ভারতীয় রাষ্ট্রিকেরা সাধারণতঃ বুঝতো না।

লেখক—অরবিন্দ'র পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা ছিল?

সরকার—ফরাসী ও গ্রীক সাহিত্যে পণ্ডিত ব'লে মনে হয়েছিল। সংস্কৃতেও পাণ্ডিত্য দেখতাম। ইংরেজি রচনায় জোর দেখা যেত। তাঁর "প্যার্সিয়াস দি ডেলিভারার" (মুক্তিদাতা প্যার্সিয়াস) নামক ইংরেজি কাব্য আমার খুব পছন্দ-সই ছিল। গ্রীক গল্প তার কথা-বস্তু। তাঁর "বিক্রমোর্বশীর" ইংরেজি অনুবাদ অতি-চোস্ত ও মধুর। এই তর্জমা ব্যবহার ক'রেছি "লাভ ইন হিন্দু লিট্‌রেচার" বইয়ে (তোকিও ১৯১৬)।

লেখক—অরবিন্দকে লোকেরা বঙ্গ-বিপ্লবের জনক বা নেতা বলতো কেন?

সরকার—অরবিন্দর'র স্বার্থত্যাগের কথা আগেই ব'লেছি। পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে জনসাধারণ আন্দাজে মনে করত অরবিন্দ যাহ'ক-কিছু, কেষ্ট-বিষ্টু একটা-কিছু হবেই-হবে। "বন্দেমাতরম্"-দৈনিকে অরবিন্দ'র নিজের লেখা ক'টা বেরিয়েছে কেই বা জানে? কিন্তু লোকেরা মনে করত,—সবই বুঝি অরবিন্দ'র রচনা। অরবিন্দ'র আসল নাম-ডাকের কারণ এসব নয়।

লেখক—অরবিন্দ'র আসল নাম-ডাকের কারণ তা হ'লে কী?

সরকার—১৯০৮ সনের মে মাসে বোমার মামলায় অরবিন্দ পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন। তৎক্ষণাৎ লোকেরা ১৯০৫ সনের আগস্ট হ'তে সব কিছুই অরবিন্দ'র সঙ্গে জড়িয়ে ফেলল। এমন কি বিপিন পালও তলিয়ে গেল। অরবিন্দ-দিগ্‌বিজয়ের আসল দর্শন বোমা। বোমা-হীন অরবিন্দ স্বার্থত্যাগী ও স্বদেশ-সেবক পণ্ডিত মাত্র র'য়ে যেতেন,—জগৎ-প্রসিদ্ধ দিগ্‌বিজয়ী ভারত-বীররূপে পূজা পেতেন না। আর তা হ'লে একালের অরবিন্দ-দর্শনকেও কোনো লোকে পুছত কিনা সন্দেহ।

লেখক—সে যুগের অরবিন্দ সম্বন্ধে আপনি কখনো কিছু লিখেছেন?

সরকার—অরবিন্দ প্রথম ধরা পড়েন ১৯০৭ সনে। তখন ইডেন হিন্দু হস্টেলের বিভিন্ন ওআর্ডে কয়েকবার গলাবাজি করি। সেই গলাবাজিতে প্রবন্ধ পায়দা হয়। দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী-সম্পাদিত 'নব্য ভারত" মাসিকে প্রবন্ধটা বাহির হ'য়েছিল। নাম "বীরপূজা"। গ্রেপ্তারের কারণ হচ্ছে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় "ইণ্ডিয়া ফর ইণ্ডিয়ান্‌স্" প্রবন্ধ-প্রকাশ (২৭ জুন)। অরবিন্দ'র সেই গ্রেপ্তার উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাই ঃ—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নম নমস্কার।" ("বন্দে-মাতরম্", ৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৭)

লেখক—প্রথম মামলার অরবিন্দ সম্বন্ধে কিছু মনে আছে?

সরকার—ন্যাশন্যাল কলেজ থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়া হ'লো (২১ আগস্ট ১৯০৭)। মোক্ষদা সমাধ্যায়ী বেদ গেয়ে তাঁর মঙ্গল কামনা ক'র্‌লেন। ছেলেরা কান্নাকাটি কর্‌লো। অরবিন্দ'র বাণী হ'লো ঃ—"ওয়ার্ক্ দ্যাট্ শী মে প্রস্পার, সাফার দ্যাট্ শী মে রিজয়েস্ (কাজ ক'রে চলো যাতে মা'র সম্পদ বাড়্‌তে পারে।" এই বাণীই অরবিন্দ'র আসল বাণী। ১৯০৭-এর জুন হ'তে ১৯০৮-এর মে পর্যন্ত বছর খানেকের ভেতর অরবিন্দ দেশ-বিদেশে "বাপ্‌কা বেটা" নামে ঠিকানা কায়েম করেন।

"জাতীয় শিক্ষা" ও আশুতোষ

১১ই ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবের অন্তর্গত জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাজ কিরূপ ছিল?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লব ছিল গবর্ণমেণ্ট-বিরোধী। "জাতীয় শিক্ষার" লক্ষ্য ছিল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে আর সরকারী শিক্ষা-বিভাগকে ধ্বংস করা। এদিকে সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে অতি-মাত্রায় জড়িত ছিলেন আশুতোষ। কাজেই তাঁর পক্ষে বঙ্গ-বিপ্লবের কাজে খোলাখুলি যোগ দেওয়া চল্‌তেই পার্‌ত না। আর সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুকুটহীন রাজাই ছিলেন তিনি। সুতরাং তার শত্রু জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের সঙ্গে আশুতোষের সহযোগিতা চালানো অসম্ভব ছিল। এমন কি জাতীয় শিক্ষা যতদিন প্রস্তাবের ও আলোচনার বস্তু মাত্র ছিল (১৯০৫-০৬) তখনও এর আবহাওয়ায় তাঁর পক্ষে হাজির থাকা শোভা পেত না।

লেখক—তাহ'লে জজ্ গুরুদাস আর অধ্যাপক ব্রজেন শীল ডন সোসাইটি অথবা সতীশ-মণ্ডলের সঙ্গে মেলামেশা ক'র্‌তেন কী ক'রে?

সরকার—গুরুদাস তখন অবসর-প্রাপ্ত আর ব্রজেন শীল সরকারী চাক্‌রে ছিলেন না। তা ছাড়া সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব ছিল অতি-কিছু, তার অতি-সামান্য অংশও ছিল না গুরুদাস এবং ব্রজেন শীলের। এই সকল কারণে বঙ্গ-বিপ্লব আর সাংস্কৃতিক যুগান্তর ও শিক্ষা-স্বরাজ সম্বন্ধে এই দুইজনের গতিবিধি যতটা স্বাধীন ছিল ততটা আশুতোষের ছিল না।

লেখক—ডন সোসাইটির যুগে অথবা জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সেবক হবার পর আপনি আশুতোষের সঙ্গে কখনো দেখা ক'রেছিলেন? তাঁর মতামত কী বুঝ্‌তে পার্‌তেন?

সরকার—১৯০১ সনের জুন মাসে আশুতোষের সঙ্গে আমার প্রথম প্রণাম-দর্শন। মালদহ হ'তে তখন কল্‌কাতায় আসি,—প্রেসিডেন্সি কলেজে ঢুক্‌বার জন্য। যোগাযোগটা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক। সেই সূত্রে অনেকবারই তাঁর বাড়ীতে গিয়ে ঢুঁ মেরেছি। ১৯০৪-০৫ সনেও দেখা হ'য়েছে। ন্যাশন্যাল কলেজের সেবক হবার পরও ১৯০৭ সনে দেখা করি। বোধ হয় জুলাই মাসে।

লেখক—সেই সময় তাঁকে কেমন পেয়েছিলেন?

সরকার—ব্যক্তিগত ভাবে যা-কিছু পাবার পেয়েছিলাম। অর্থাৎ গাল খেয়েছিলাম চরম। কিন্তু বঙ্গীয় যুগান্তরের জাতীয় শিক্ষা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও শিক্ষা-বিপ্লব আশুতোষের অ-পছন্দসই ছিল না। বেশ বুঝা গিয়েছিল।

লেখক—কিসে বুঝ্‌লেন?

সরকার—এই সময়কার আশুতোষের কথাবার্তার কিম্মৎ লাখ টাকা। অন্যান্য জিনিষ বাদ দিয়ে যাচ্ছি। তাঁর শুধু একটা যুক্তি উল্লেখ কর্‌বো।

লেখক—সেই যুক্তিটা কী?

সরকার—আশুতোষ জিজ্ঞাসা করলেন,—"একটা বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে কত টাকা লাগে জানিস্?" আমি তঁ্যাদড়। জবাব দিলাম,—"পাঁচ কোটি।" দেখ্‌লাম চোখের কোনে একটু হাসি বেরুলো। কিন্তু তার পরেই কী বল্‌লেন জানিস্?

লেখক—বলুন শুনি।

সরকার—তাঁর বাণী নিম্নরূপ ঃ—"মনে কর্‌,—পাঁচকোটি টাকার স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তা হ'য়ে ব'স্‌লাম। তারপর ছেলেদেরকে সার্টিফিকেট দিতে লাগ্‌লাম। কিন্তু এই সব সার্টিফিকেটের দাম কত হবে জানিস্? কিছুই না।" আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম: 'কেন কিছুই না? আপনি সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়েও সার্টিফিকেটের উপর নাম সই কর্‌ছেন। স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়েও তাই কর্‌বেন। একই লোক, একই সই? তফাৎ কোথায়?"

তাঁর পাল্টা জবাব—"তফাৎ কোথায়? আমি লোকটা কে? কিছুই নই? গবর্ণমেণ্টই সব। চাই গবর্ণমেণ্টের ছাপ। গবর্ণমেণ্ট পেছনে আছে ব'লে আমার সইয়ের দাম। এই হ'লো ভারতবাসীর অবস্থা। একমাত্র দেশের লোকের ক্ষমতায় দেশের কাজ করা সম্ভব নয়।"

লেখক—আপনি এই জবাবকে লাখ টাকার কিম্মৎ দিচ্ছেন?

সরকার—হাঁ। সব-চেয়ে উঁচু সরকারী পদ-পদবী পেয়ে এমন বুক-ফাটা দুঃখের কথা আর কে ব'লেছে রে? কম্‌-সে-কম্‌ আমি তো কারু মুখে শুনি নি। ভারত-সন্তানের কিম্মৎ ভারতে এক দামড়িও নয়,—যত-বড়ই সে হো'ক্‌ না কেন বিদ্যায়, চরিত্রে, কর্তব্য-নিষ্ঠায়। আশুতোষ ঐ এক কথায় আমাকে বুঝিয়ে দিলেন। আমি আর সে-বিষয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করিনি।

লেখক—আপনি জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ ছেড়ে দিলেন?

সরকার—রাধামাধব! জাতীয় শিক্ষার সেবক যেমন ছিলাম তেমনই র'য়ে গেলাম। বরং আশুতোষের কথায় জিদ্‌ যেন আরও বেড়ে গেল। তখন আমার বয়স বছর বিশেক। বাধা-বিঘ্নের বহর খুব-বড় দেখে হ'ঠে যাওয়া বেআকুবি। যাতে যত বেশী বাধা বিঘ্ন, তাতেই তত-বেশী কাজের আনন্দ। সরকারী সাহায্যে বড়-কাজ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু বিনা সরকারী সাহায্যে অকৃতকার্য হওয়াও আসল বিজয়-লাভ।

এই পঁয়ত্রিশ বছরের কোনো দিনই জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক কাটা হয় নি। বিদেশেও ছিলাম এরি সেবক হিসাবে।

লেখক—জাতীয় শিক্ষার সাংস্কৃতিক বিপ্লব আশুতোষের অ-পছন্দ-সই ছিল না ব'ল্‌ছেন কিসের জোরে?

সরকার—জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষা প্রণালীর কোনো দফার বিরুদ্ধে তিনি টুঁ শব্দ পর্যন্ত করেন নি। প্রত্যেক অনুষ্ঠানই তাঁর মেজাজ-মাফিক্‌ ছিল বুঝা গেল। একথা সোজাসুজি বল্‌তেও তিনি কসুর করেন নি। তা ছাড়া তাঁর মেজাজ সম্বন্ধে আর একটা সাক্ষ্য দেওয়া যায়।

লেখক—সে সাক্ষ্যটা কী?

সরকার—১৯০৭ হতে ১৯১৪ পর্যন্ত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসাবে

আশুতোষের বক্তৃতা আছে। সেগুলা প'ড়েছিস্? পড়্ গিয়ে। দেখ্‌বি সবই যেন "পান্তের মাঠ" (পৃঃ ১৯৪) আর গোলদীঘির বক্তৃতা। গোলদীঘিতে জনসাধারণ গুল্‌তান কর্‌তে-কর্‌তে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে গাল দিচ্ছে গোলাম-খানা ব'লে। সেই গোলদীঘিরই জনসাধারণের বাণী বেরুচ্ছে আশুতোষের কণ্ঠ থেকে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনুষ্ঠানে। আর কী চাস্?

লেখক—আরও কিছু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

সরকার—দেখ্‌ছি তুই কোনো-মতেই সোজা কথাগুলাও বুঝ্‌তে রাজি ন'স্? ১৯০৫-০৬ সনের জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাবে যতগুলা কথা ছিল প্রায় সব কথাগুলাই ১৯০৭ সনের পরবর্তী আশুতোষের মুখ থেকে বেরিয়েছে চোপর দিন-রাত। আজ ১৯৪২ সনে সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়টার মূর্তি কিরূপ জানিস্? ১৯০৫-০৬ সনের বঙ্গ-বিপ্লব বা বঙ্গীয় যুগান্তর জাতীয় শিক্ষাপরিষদের মারফৎ যে সকল লেখাপড়া ও অনুসন্ধান-গবেষণা আদর্শরূপে প্রচার ক'রেছিল তার প্রায় সব-কিছুই এই "গোলামখানায়" কাজের ভেতর মজুদ র'য়েছে। আর এই সব সম্ভব হ'য়েছে আশুতোষের চেষ্টার ফলে। এইজন্যই ব'ল্‌ছি, আশুতোষের পক্ষে জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন অ-পছন্দসই ছিল না। ১৯০৭ সনের জুলাই মাসের মোলাকাতেই তার প্রমাণ পেয়েছিলাম।

এইজন্যই মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির বিপিনবিহারী ঘোষ, রাধেশচন্দ্র শেঠ আর হরিদাস পালিতকে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। এঁরা কল্‌কাতায় এলেই একবার ক'রে আশুতোষের বৈঠকখানায় মুখ দেখিয়ে যেতেন।

লেখক—আজকালকার কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৫-০৬ সনের জাতীয় শিক্ষার প্রায় সব আদর্শই কাজে পরিণত হ'য়েছে। বল্‌ছেন? ঠিক কি? (পৃঃ ২১২-২১৪)

সরকার—দুটো জিনিসের অভাব আছে এখনো। প্রথমতঃ টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা আজ পর্যন্ত ইস্কুল-পাঠশালায় সার্বজনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয় নি। আর কলেজ-বিভাগে যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক ও রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা প্রচারের ব্যবস্থা নেই। এই হচ্ছে কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্ত দুর্বলতা। দ্বিতীয়তঃ, কল্‌কাত' বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী প্রতিষ্ঠান। বাঙালী স্বরাজের স্বাধীনতা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরেরা আজও চাখতে পায় না। বাঙালী জাতের এই দুর্বলতার ও দুর্দশার বিরুদ্ধে ল'ড়েছিল জাতীয় শিক্ষার ধুরন্ধরেরা। সেই লড়াইয়ে বাঙালী জাত্ আজও বিজয়ী হতে পারে নি।

("বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ" ১১ই নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চা'ন যে, আশুতোষকে বঙ্গ-বিপ্লব, বঙ্গীয় যুগান্তর, স্বদেশী আন্দোলন আর সাংস্কৃতিক স্বরাজের অন্যতম প্রবর্তক বা প্রতিনিধি বলা যেতে পারে?

সরকার—আল্‌বৎ। সেই ১৯০৬-১৪ সনের যুগেই সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তা থাকা সত্ত্বেও আশুতোষ প্রাণে-প্রাণে বে-সরকারী। বিপিন পাল, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, হীরেন দত্ত, সতীশ মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ ইত্যাদি যে-কোনো বিপ্লব-নায়কের বা যুগান্তর-সাধকের চরিত্র, ভাবুকতা ও স্বদেশ-নিষ্ঠা আশুতোষের দেখেছি। এ বিষয়ে গোঁজামিল রাখ্‌লে বঙ্গ-বিপ্লবটা বুঝ্‌তে পার্‌বি না।

লেখক—বাধা-বিঘ্নের বহর খুব-বড় দেখে হ'ঠে যাওয়া উচিত নয় বল্‌ছেন। এইরূপ চিন্তা কি আপনার সেই যুগেও ছিল? তখনকার কোনো লেখায় এর চিহ্ন আছে?

সরকার—১৯০৭ সনের জুলাই-আগষ্ট মাসে "নব্য-ভারত" মাসিকে আমার "স্বদেশ-

সেবক" প্রবন্ধ বেরোয়। পুস্তিকাকারেও পাওয়া যেত। এটা মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সার্বজনিক সভায় প'ড়েছিলাম। তার ভেতর ব'লেছি ঃ—"কষ্টকে আলিঙ্গন ক'রে দারিদ্র্যকে মস্তকে ধারণ ক'রে নৈরাশ্যের ভীতিকেই একমাত্র সহায় ক'রে জীবনের কঠোর কর্তব্যময় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হবে।" ভবিষ্য দুঃখ-দারিদ্র্যের সম্ভাবনা আমাকে বিশ বছর বয়সেও ভয় দেখাতে পারে নি। আর আজও দুঃখ-দারিদ্র্যের দৌরাত্ম্যে চিৎ হ'য়ে পড়িনি। অকৃতকার্য হওয়া নিন্দনীয় নয়। কিছু না-করাটাই আসল দুঃখের কথা।

সাধনা কী চিজ?

১২ই ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—আমার একটা খট্‌কা কোনো মতেই যাচ্ছে না। সেজন্যই আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছি,—দর্শনের আলোচ্য বিষয়গুলা কি ইতিহাস ও অন্যান্য বিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের চেয়ে মহত্তর নয়? (পৃঃ ১৩৬-১৩৭)

সরকার—না। কোনো মতেই মহত্তর নয়। আগেই কয়েকবার ব'লেছি,—যে-কোনো বিষয়ের বিশ্লেষণকে দর্শন বলে। দৈত্য-বিশ্লেষণও দর্শন, দারিদ্র্য-বিশ্লেষণও দর্শন। কাল-বিশ্লেষণও দর্শন, কারণ-বিশ্লেষণও দর্শন। দেশ-বিশ্লেষণও দর্শন, প্রকৃতি-বিশ্লেষণও দর্শন। জল-বিশ্লেষণও দর্শন, বায়ু-বিশ্লেষণও দর্শন। উদ্ভিদ্-বিশ্লেষণও দর্শন। জানোআর-বিশ্লেষণও দর্শন। চিত্ত-বিশ্লেষণও দর্শন, মগজ-বিশ্লেষণও দর্শন। কয়লা-বিশ্লেষণও দর্শন, লোহা-বিশ্লেষণও দর্শন। সূর্য-বিশ্লেষণও দর্শন, পাহাড়-বিশ্লেষণও দর্শন। মানুষ-বিশ্লেষণও দর্শন, ভগবান-বিশ্লেষণও দর্শন।

লেখক—বিশ্লেষণটা কী?

সরকার—কোনো বস্তুর প্রকৃতি নিরূপণ। জিনিষটা কী? কোনো জিনিষের সঙ্গে অপর কোনো জিনিষের সম্বন্ধ কিরূপ? এই সব বিচার বিশ্লেষণের অন্তর্গত। জিনিষে-জিনিষে যোগাযোগ খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে বের করা বিশ্লেষণের ভেতর পড়ে। বস্তুতে-বস্তুতে কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে কিনা তার হদিশ দেওয়াও বিশ্লেষণের কাজ। বস্তুর "বস্তুত্ব"কে জার্মাণ দার্শনিক কাণ্ট্ (১৭২৪-১৮০৪) বলেন "ডিং-আন্-জিখ্"। ইংরেজিতে তার নাম "থিং ইন ইট্-সেল্‌ফ"। এই বস্তুত্ব আবিষ্কারেব প্রণালী আর প্রয়াসও বিশ্লেষণ ছাড়া আর কিছু নয়।

লেখক—ব্রজেন শীল ব'লেছেন যে, ভারতবর্ষের খাঁটি দার্শনিকেরা মামুলি চিন্তাশীল পণ্ডিতমাত্র নন, তাঁরা আধ্যাত্মিক হিসাবে উন্নত ব্যক্তি। তাঁরা সত্যদ্রষ্টা। এ সম্বন্ধে আপনার কী মত?

সরকার—ব্রজেন শীলের এই কথাটা তুই পেলি কোথায়?

লেখক—বছর তিনেক আগে "বিশ্ববাণী" পত্রিকায় "আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের মহাপ্রয়াণে" শীর্ষক প্রবন্ধ বেরোয় (ফাল্গুন ১৩৪৬)। লেখক অভেদানন্দ-শিষ্য স্বামী বেদানন্দ। বেদানন্দ তাতে এই মত উদ্ধৃত ক'রেছেন। আমার "নবযুগের মানুষ" বইয়ে (১৯৪১) ব্রজেন শীল বিষয়ক বেদানন্দের উক্তিটা ব্যবহার ক'রেছি।

সরকার—এই মতটা শুধু ব্রজেন শীলের নয়। ভারতবর্ষের যে-কোনো পণ্ডিতের মতই এইরূপ। পণ্ডিতই বা বলি কেন, যে কোনো ভারত-সন্তানের মতই এইরূপ। রামা-শ্যামা,

আব্দুল-ইস্‌মাইল, হেলে-জেলে, মুচি-মেথর, সাক্ষর-নিরক্ষর,—সব মিঞাই এই বুখ্‌নি ঝেড়ে থাকে। শুধু তাই নয়। ভারতের সকলেই দার্শনিক সম্বন্ধে আর-একটা কিম্ভুত-কিমাকার মতও চালাতে অভ্যস্ত। ভারতীয় উচ্চ-শিক্ষিত নরনারীর বিশ্বাস যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা দার্শনিকই নয়। ভারতীয় দার্শনিকেরাই একমাত্র দার্শনিক। অধিকন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা কতকগুলা কথা কপ্‌চায় মাত্র। তারা যা কিছু লেখে একমাত্র মগজ দিয়ে লেখে। আর ভারতীয় দার্শনিকেরা কথা কপ্‌চাবার জন্য বই লেখে না। তারা দর্শনগুলা জীবনে উপলব্ধি করে। পশ্চিমের দার্শনিকেরা মগজের কছ্‌রত স্বরূপ নানা বিষয়ের গবেষণা ক'রে থাকে মাত্র। ভারতের দার্শনিকেরা আসলে সাধক। সাধনা হচ্ছে তাদের জীবন। পশ্চিমা দার্শনিকেরা সাধনা কাকে বলে জানে না। "সাধক" শব্দ তাঁদের সম্বন্ধে কায়েম করা চলে না।

লেখক—আপনি কি এই সার্বজনীন ভারতীয় মতের স্বপক্ষে নন? আপনি কি বিবেচনা করেন যে, পাশ্চাত্য দার্শনিকের দলে সাধক দেখ্‌তে পাওয়া যায়? কথা কপ্‌চানো অথবা মস্তিষ্কের ব্যায়াম কি ভারতীয় দার্শনিক মহলেও দেখা সম্ভব?

সরকার—দার্শনিক সম্বন্ধে সার্বজনিক ভারতীয় মতটা আমার বিচারে ষোল আনা ভুলে ভরা। ভারতীয় দার্শনিকের দলে মুড়োর লাঠিখ্যালা ও তর্কের কচ্‌কচানি চলে খুব জবর ভাবে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও সাধনা বোঝে। "সাধক" শব্দ যদি কোনো ব্যক্তির সম্বন্ধে কায়েম করা চলে, তা হ'লে তা পাশ্চাত্য দার্শনিক সম্বন্ধেও কায়েম কর্‌তে হবে। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও জ্যান্ত দর্শন। তারাও নিজ-নিজ দর্শনটা জীবনে উপলব্ধি ক'রে থাকে। নিজ জীবনের কাজে দর্শনে লাগানো ভারতীয় পণ্ডিতদের পক্ষে একচেটিয়া কারবার নয়। "সত্যদ্রষ্টা" নামক ব্যক্তি ইয়োরামেরিকান সুধীসমাজে আজও মেলে হাজার-হাজার। সেকালের ভারতীয় দার্শনিক মহলে সত্যদ্রষ্টা কত হাজার ছিল জানি না। বিষয়টা গবেষণার বস্তু সন্দেহ নেই। একালেই বা ভারতের টোলে-টোলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে-বিশ্ববিদ্যালয়ে, আশ্রমে-আশ্রমে, পরিষদে-পরিষদে কত হাজার সত্যদ্রষ্টা দেখ্‌তে পাওয়া যায়? স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ অর্থাৎ সংখ্যাশাস্ত্রে বেপারীরা এই প্রশ্নটার জবাব দিতে অগ্রসর হ'লে ভাল হয়।

লেখক—আপনার এই বিশ্লেষণে সাধারণ ভারতবাসী সন্তুষ্ট হবে না। সাধনা জিনিষটা পাশ্চাত্য সমাজে আছে,—একথা বিশ্বাস কর্‌বার মতন লোক আমাদের দেশে বোধ হয় একজনও নেই! পাশ্চাত্য দেশে দর্শন উপলব্ধি কর্‌বার মতন লোক আছে তা কল্পনা করা ভারত-সন্তানের পক্ষে স্বপ্নেরও অতীত।

সরকার—তুই যখন অঙ্ক কষ্‌তে বসিস্ তখন সাধনা করিস্ কি না? জবাব দিবি,—"নিশ্চয়"। সাদা চামড়ার ছেলে-মেয়েরা যখন অঙ্ক কষে তখন তাহ'লে তারা সাধক কি না? ছয়-আট-দশ ঘণ্টার রোজে কারখানায় দাঁড়িয়ে যে-সকল মিস্ত্রী, মজুর বা এঞ্জিনিয়ার বিজলীর গতি জরিপ করে তারা সাধক নয় কি? দিন নেই, রাত নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই,—এরূপ ভাবে বনে-জঙ্গলে, নদী-পাহাড়ে পশ্চিমারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এরা কি কম সাধক?

বর্তমান লড়াইয়ের দু'এক বৎসর পূর্বে কয়েকজন জার্মাণ হিমালয় উৎরাবার জন্য ব্রতবদ্ধ হ'য়েছিল। তাদের একজন সঙ্গী পথে মারা যায়। তখন অনেকে বেশ-উঁচুতে উঠে গেছে। কিন্তু উপযুক্ত স্থানে একটা পছন্দ-সই জায়গায় সেই মৃত-সঙ্গীটিকে কবর দেবার জন্য তারা

খানিকটা নীচে নেমে এল। তারা জানে যে, একবার নীচে নেমে এলে আবার উঁচুতে উঠা এবারকার মত একপ্রকার খতম। প্রত্যেক মুহূর্ত তাদের কাছে মূল্যবান্। তবুও তারা নীচে নেমে এসে মৃত সঙ্গীটির যথোচিত কবর দিল। শেষ পর্যন্ত এতে তাদের হিমালয়-উৎরাবার অভিযান বাধা পেয়ে গেল।

লেখক—এই গল্পটা বল্‌ছেন কী বুঝাবার জন্য?

সরকার—প্রথমতঃ, হিমালয় টপ্‌কাবার প্রয়াসটা বিপুল সাধনা। হিমালয়-যাত্রীরা সবাই সাধক। দ্বিতীয়তঃ, এঁদের মানুষ-নিষ্ঠা ও বন্ধু-নিষ্ঠা চূড়ান্তভাবে আধ্যাত্মিক। এই মনুষ্যত্ব ও বন্ধু-প্রীতির ভেতরও সাধনা দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই দ্বিতীয় সাধনাটা আমি বর্তমান ক্ষেত্রে সমর্থন কর্‌তে রাজি নই। তাদের বৃহত্তর কর্তব্য ছিল হিমালয় টপ্‌কাবার কাজে লেগে থাকা। তথাপি রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে তাদের বন্ধু-নিষ্ঠার সাধনাটা তারিফ কর্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

লেখক—আপনি সাধনার একদম নয়া ব্যাখ্যা দিচ্ছেন না কি?

সরকার—তোরা ভেবে রেখেছিস্ যে, পরলোক, ব্রহ্ম, আত্মা, অবতার ইত্যাদি বুলি না আওড়ালে কেহ সাধক হয় না। তিলক-কাটা সাধু-সন্ন্যাসীর ভেক্ না নিলে সাধনা করা সম্ভব নয়। এই জন্যেই তোরা সাধারণতঃ ইয়োরামেরিকায় সাধক দেখ্‌তে পাস্ না। বুঝে রাখ্,—মামুলি পোষাকে, মামুলি খাওয়া-পরা চালিয়ে, মামুলি কাজ কর্‌তে-কর্‌তে হাজার-হাজার পশ্চিমা নরনারী খাঁটি-সাধনায় লেগে র'য়েছে। আর সাধু-সন্ন্যাসীর ভেক্‌ওয়ালা স্ত্রী-পুরুষই কি ইয়োরামেরিকার খৃষ্টিয়ান সমাজে নেই? ভারতীয় ফকীর-মোহন্ত-সাধু-বাবাজীদের মতন হাজার-হাজার ফ্রান্সিস্-পন্থী, আন্তনিয়-পন্থী ইত্যাদি নানা-পন্থী সন্ন্যাসী ওসব দেশে আছে। সাধনা নিয়ে পূর্বে-পশ্চিমে ফারাক্ কর্‌তে বসা চল্‌বে না।

লেখক—আপনি ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিকের গবেষণাটাকে সাধনা বলেন?

সরকার—শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন, যে কোনো মেহনৎই আমার চিন্তায় সাধনা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা মাত্রই সাধনা। মজুরের কাজ সাধনা, মেথরের কাজ সাধনা, মিস্ত্রীর কাজ সাধনা, চাপ্‌রাশির কাজ সাধনা। দেশের জন্য দহরম-মহরম চালানো সাধনা। মজুর আন্দোলনে লেগে থাকা সাধনা। লড়াইয়ে প্রাণ দেওয়া সাধনা। চোখ উল্‌টিয়ে নাক টিপে পদ্মাসনে বসাই একমাত্র সাধনা নয়।

("আত্মা, পরকাল, ভগবান", পৃঃ ১৫৩-১৫৫। ভুলক্রমে ৭ই নবেম্বর ছাপা হ'য়েছে। ১৬৩ পৃষ্ঠায়ও ৭ই নবেম্বর আছে।)

বিজ্ঞান ও দর্শন

১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪২

লেখক—আপনি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কাজের ভেতর কোনো পার্থক্য টানেন না?

সরকার—না। আগেই বোধ হয় কয়েকবার ব'লেছি। অণু-পরমাণুর বিশ্লেষণ ও গবেষণা থেকে পরমাত্মার বিশ্লেষণ ও গবেষণা পর্যন্ত সব বিশ্লেষণ-গবেষণাই একসঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক কাজ। বিজ্ঞানে-দর্শনে কোনো পার্থক্য নেই। যাঁহা বিশ্লেষণ তাঁহা দর্শন : যাঁহা বিশ্লেষণ তাঁহা বিজ্ঞান। গণিত-শাস্ত্রী, পদার্থ-শাস্ত্রী, রসায়ন-শাস্ত্রী, উদ্ভিদ্-শাস্ত্রী, প্রাণ-শাস্ত্রী, চিত্ত-শাস্ত্রী, নীতি-শাস্ত্রী, অর্থ-শাস্ত্রী, তর্ক শাস্ত্রী, ধর্ম-শাস্ত্রী, কাম-শাস্ত্রী, মোক্ষ-শাস্ত্রী, ব্যক্তি-

শাস্ত্রী, সমাজ-শাস্ত্রী ইত্যাদি সকল শাস্ত্রীই বৈজ্ঞানিকও বটে, দার্শনিকও বটে। রসায়নের অণু-তত্ত্ব সাধারণতঃ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব'লে পরিচিত। আমি তাকে দার্শনিক তত্ত্বও ব'লে থাকি।

লেখক—এই ধরণের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাতে পারেন যে, একই সঙ্গে সে-সব দার্শনিক গবেষণাও বটে?

সরকার—অতি সোজা কথা। যে কোনো বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক অনুসন্ধান, সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব সম্বন্ধেই এইরূপ বলা চলে। জানিস্ই তো, চাপের সঙ্গে তাপের নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধটা অঙ্ক ক'ষে সূত্রাকারে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে বৈজ্ঞনিক ল্যাবরেটরিতে। এই সূত্রটাকে পদার্থ-বিদ্যার সেবকেরা বৈজ্ঞানিক সূত্র বলে। আমি একে দার্শনিক সূত্র বল্‌তে রাজি আছি। অঙ্কের সাহায্যে যা মাপাজোকা যায় তাকে দার্শনিক তত্ত্ব বল্‌তে আপত্তি কর্‌বো কেন? তাকে একমাত্র বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলা হবে কিসের জোরে?

লেখক—ভগবান সম্বন্ধে আলোচনা কি বৈজ্ঞানিক না দার্শনিক?

সরকার—ভগবান বিশ্লেষণের বস্তু সন্দেহ নেই। এই বিশ্লেষণে নানা মুনির নানা মত। মতগুলাকে লোকে দার্শনিক মত বলে। কেন? ভগবানকে গজ-কাঠি দিয়ে জরিপ করা যায় না ব'লে? ভগবানের প্রকৃতি বা স্বরূপ অঙ্ক দিয়ে মাপাজোকা যায় না এই জন্যে? এই বিচার যুক্তি-সঙ্গত নয়।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, ভগবানকে মাপাজোকা যায়?

সরকার—জবাব শুনলে চম্‌কে যাবি। মাপাজোকা, ওজন করা, জরিপ করা ইত্যাদি কাজ ভগবান সম্বন্ধে হয়ত "পুরাপুরি" সম্ভব নয়। কিন্তু মজার কথা, ভগবানকে মাপাজোকাব চেষ্টা চ'লেছে দুনিয়ায় লাখ বছর ধ'রে। "ভগবান" শব্দটাই ভগবান বস্তুকে মেপে-জুকে দাঁড় করাবার একটা যন্ত্র বা কৌশল; ভগবান সম্বন্ধে পৃথিবীর নরনারী আজ পর্যন্ত ক'-শ' বিশেষ্য ও বিশেষণ কায়েম ক'রেছে? তার প্রত্যেকটাই ভগবানকে ওজন করার, জরিপ করার প্রয়াস নয় কি? যাঁহা বিশেষণ, তাঁহা জরিপ। যাঁহা উপাধি, তাঁহা মাপাজোকা। আমার কাছে ভগবান সম্বন্ধে যে-কোনো বিশ্লেষণ বা গবেষণাই খাঁটি বৈজ্ঞানিক কাজ।

লেখক—ধরা ছোঁআ যায় না এমন জিনিষের বিশ্লেষণ বা গবেষণা কি বৈজ্ঞানিক কাজ হ'তে পারে?

সরকার—আমার বিচারে হ'তে পারে। ভগবানের চেয়ে বেশী "ধরা ছোঁয়া যায় না" এমন বস্তু কোথায়? সেই ভগবানই যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার চিজ্ তখন অন্যান্য চিজের কথা পেড়ে লাভ কী? ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দুনিয়া একটা আছে। সকলেই তা বুঝি। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয় এমন একটা দুনিয়া কল্পনা করা প্রায় সকলের পক্ষেই সম্ভব। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যের বিশ্লেষণ যতটা বৈজ্ঞানিক ততটা দার্শনিক। ইন্দ্রিয়াতীতের বিশ্লেষণও যতটা দার্শনিক ততটা বৈজ্ঞানিক। অধিকন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আর ইন্দ্রিয়াতীতের যোগাযোগ নির্ণয় করাও একই সঙ্গে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। বিদ্যা হিসাবে দর্শন আর বিজ্ঞানে প্রভেদ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই দুইটা শব্দ মাত্র। ঘটনা-চক্রে কোনো বিদ্যাকে দর্শন বলা হয়, কোনোটাকে বিজ্ঞান বলা হয়।

("দর্শনের আলোচ্য বিষয়," ২৭শে আগষ্ট ১৯৪২)

তথাকথিত সত্যদ্রষ্টারা কী দেখেছেন?

লেখক—ভারতবর্ষের মুনি-ঋষিরা যোগ-সাধনায় সত্যকে "দেখ্‌তে" পান। তাঁরা "সত্য-দ্রষ্টা", কাজেই তাঁরা দার্শনিক। আপনি কি বল্‌তে চান যে, পাশ্চাত্য "ফিলজফার"গণ আমাদের মুনি-ঋষিদের মতন "সত্য-দ্রষ্টা", সাধক ও দার্শনিক।

সরকার—আলবৎ। তুই আমাকে দেখা,—পাঁচ হাজার বছরের ভেতর ভারতের কোন্ ঋষি, কোন্ মুনি, কোন্ যোগী, কোন্ সাধক, কোন্ ভক্ত, কোন্ পণ্ডিত, কোন্ দার্শনিক কোন্ সত্যটা দেখেছেন? তাঁদের দেখা সত্যগুলা কোথায় পাওয়া যায়? তথাকথিত "সত্যদ্রষ্টা"দের সাধনার, যোগের বা ধ্যানের ফলসমূহ কোন্-কোন্ মূর্তিতে বিরাজ কর্‌ছে? ব্রহ্মাকে, পরমাত্মাকে, ভগবানকে দেখার পর বা জীবনে উপলব্ধি করার পর এই "দাগ-দেওয়া" সাধকদের কে কোথায় কোন্ দৃশ্য বা অদৃশ্য দুনিয়া সৃষ্টি ক'রেছে? সাংখ্য-ওয়ালাদের কোন্ কথাটা এই ধরণের "সত্য দেখা"র সাক্ষী? বেদান্তীদের কোন্ বাণীতে ব্রহ্মোপলব্ধির চিহ্নোৎ র'য়েছে? ন্যায়-বৈশেষিক লেখকরা কোন্ শব্দটা ভগবান্‌কে দেখার পর আবিষ্কার ক'রেছেন? কোন্ বৌদ্ধ বুখ্‌নি, কোন্ জৈন সূত্র, কোন্ বৈষ্ণবপদ "সত্য দেখা"র ফল?

লেখক—কেন? আপনি কি মনে করেন না যে, বিপুল সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যের ভেতরেই তো আমাদের যোগী, সাধক ও সত্যদ্রষ্টাদের বাণী মূর্তিমন্ত হ'য়ে রয়েছে? মধ্যযুগের ভারতীয় সাধনা কি বাংলা, হিন্দী, মারাঠি ইত্যাদি সাহিত্যে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না?

সরকার—ভাল কথা। সেই জন্যই সাংখ্য ইত্যাদি দর্শন-সাহিত্যের নাম ক'রেছি। তুই স্বীকার কর্‌ছিস্ যে,—যোগই বল, সত্যদৃষ্টিই বল্, ব্রহ্মোপলব্ধিই বল্, সবই কতকগুলা বইয়ের ভেতর খোদা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত বই লেখা-লেখিই ভারতীয় যোগীদের, সাধকদের, সত্য-দ্রষ্টাদের, দার্শনিকদের কীর্তি। যাঁরা নিজের অভিজ্ঞতাগুলা লেখেন নি তাঁদের অভিজ্ঞতাগুলা তাঁদের চেলারা লিখেছেন অথবা কোনো ব্যাস-মুনি সঙ্কলন ক'রেছেন। যাঁরা বই লিখে যান নি অথবা যাঁদের বাণী কোনো-না-কোনো বইয়ে ধ'রে রাখা হয় নি তাঁদেরকে হিসাবের ভেতর আনা সাধারণ লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের পক্ষে অসম্ভব। যাই হোক,—বইগুলাই, বইয়ের বচনসমূহই ভারতীয় সত্যদ্রষ্টাদের প্রধানতম সাক্ষী। ব্যস্। পশ্চিমা দার্শনিকদের বেলায় আর কোনো নতুন কথা বলা যায় কি? কখনই না। অর্থাৎ পশ্চিমা বইগুলাও পশ্চিমা ঋষিদের "সত্য দেখার"ই সাক্ষী।

লেখক—আপনি তা হ'লে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় দর্শনিকদের তুলনার ফলে কী বল্‌তে চাচ্ছেন?

সরকার—নেহাৎ মামুলি কথা। বল্‌ছি যে, পশ্চিমা বইগুলার সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে ভারতীয় বইগুলা। মেপে নেও,—যার যেমন মর্জি ও মুরোদ, পশ্চিমা বচনের দৌড় আর ভারতীয় বচনের দৌড়। তুলনা মানে জরিপ করা, ওজন করা, গণনা করা ইত্যাদি। বর্তমান ক্ষেত্রে মামলা,—দুই তরফের বুখ্‌নির জরিপ, দুই তরফের বয়েতের ওজন, দুই তরফের বাণীর গণনা।

লেখক—দুই তরফের জরিপ চালিয়ে আপনি কিরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন?

সরকার—আমি কোনো সিদ্ধান্তে এসেছি কিনা জানি না। কেবল আমাদের সেকেলে পণ্ডিতদের গবেষণার আকার-প্রকার বিশ্লেষণ কর্‌ছি। ধ'রে নিলাম যেন ভারতীয় মুনি-ঋষি-

যোগী-সাধক দার্শনিকেরা ব্রহ্মকে উপলব্ধি ক'রেছেন আর ভগবানকে দেখেছেন কিম্বা পরমাত্মার সঙ্গে মিশে গেছেন। এই সব দেখাদেখির পর নামজাদা "দাগী" সত্যদ্রষ্টারা তাঁদের আবিষ্কারগুলা জগতে প্রচার সুরু কর্লেন। সেই প্রচারে পয়দা হ'ল সাহিত্য। এই সাহিত্যটাই হচ্ছে ব্রহ্মোপলব্ধি ইত্যাদির একমাত্র প্রমাণ।

লেখক—আপনি কি মনে করেন না যে, এই সব ভারতীয় সাহিত্য পাশ্চাত্য দার্শনিক সাহিত্যের চেয়ে উঁচু দরের জিনিষ?

সরকার—ভায়া, আমাকে তোরা জবাই কর্লেও আমার মুখ থেকে সে কথা বেরুবে না। আমি একে মুখ্খু ও গরীব, তার ওপর পাষণ্ড। আমার মতের দাম কিছুই নয়। আমার মত জাহির কর্বার জন্য আমি লালায়িতও নই। ব'লে যাচ্ছি সোজা কথা। ভারতীয় দর্শন-সাহিত্য যদি ভগবান দেখার অথবা পরমেশ্বরে মিশে যাওয়ার চরম ফল হয় তা হ'লে ভগবান দেখাদেখির কারবারটা হাতীঘোড়া কিছু-নয়। এই সব আবিষ্কারের তুলনায় পিথাগোরাস, সক্রেটিস, প্লেটো, আরিস্টটল, প্লটিনুস ইত্যাদি হ'তে একালের বুক্র, দেল্‌ভেক্কিয়, ডুয়ী, ফ্রয়েড্‌, ফাইহিঙ্গার, হবহাউস, লেনিন ইত্যাদি দার্শনিকদের সৃষ্ট সাহিত্য বেশ-কিছু উঁচু দরেরই বটে। শুধু তাই নয়। অধিকন্তু দেখ্তে পাচ্ছি যে, কুল-কুণ্ডলিনী ভোগ করার পরও ভারতীয় মহা-মহা দার্শনিকদের জন্য কাণ্ট-ফিখ্টে-হেগেলের সার্টিফিকেট জরুরি হয়। অতএব বুঝ্তে হবে যে, মামুলি গেরস্থালি ক'রেও,—ব্রহ্মোপলব্ধি কথাটা না কপ্‌চিয়েও,—পশ্চিমা দার্শনিকেরা সত্য-দ্রষ্টাও বটে, সাধকও বটে, যোগীও বটে। তথাকথিত "দাগী" সত্য-দ্রষ্টারা অতি-কিছু দেখেনও নি, বুঝেনও নি,—অতি-কিছু দেখাতেও পারেন নি, বুঝাতেও পারেন নি।

তুইও সত্য-দ্রষ্টা, আমিও সত্য-দ্রষ্টা। মেথরও সত্য-দ্রষ্টা, মজুরও সত্য-দ্রষ্টা। অল্প-বিস্তর সত্য-দ্রষ্টা রক্তমাংসের নরনারীর সকলেই। যখন-তখন সত্যদ্রষ্টামি নিয়ে লাফালাফি করা ঝক্‌মারি।

("আত্মা, পরকাল, ভগবান", পৃষ্ঠা ২০৮-১১ দ্রষ্টব্য)

বিদেশে "নাম করা"

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪২

লেখক—বিদেশে ভারতবাসীর "নাম করা" সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা কর্তে চাই। কারু-কারু সম্বন্ধে বলা হ'য়ে থাকে যে, তাঁদের আগে বিদেশে কেহ সম্বর্ধনা পায় নি। এই রকম মন্তব্যের কারণ কী?

সরকার—এই সব মন্তব্য-প্রচারকেরা বোধ হয় সন তারিখের তোআক্কা রাখেন না। তবে এই ধরণের কথা ১৮৫০ সনের পূর্ববর্তী কোনো ভারতসন্তান সম্বন্ধে হয়ত বলা চল্‌তে পারত। কিন্তু ১৯২৫-৩০ সনের পরবর্তী কোনো ভারত-সন্তান সম্বন্ধে এরূপ বলা নেহাৎ ছেলেমি।

লেখক—কেন? আপনি কি মনে করেন যে বহুসংখ্যক ভারত-সন্তান অনেকদিন ধ'রে বিদেশে নাম ক'র্‌ছেন?

সরকার—কয়েকদিন আগে তা হ'লে ব'লেছি কী? বৃহত্তর ভারত বা রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের

কর্ম্মিবৃন্দের ভেতর কি দু-চার-দশজন গুণী লোকের চেহারা দেখ্‌তে হবে? তবুও তো ১৮৯৩ সনের পেছনে তাকাই নি!

লেখক—বিদেশের উচ্চ-শ্রেণীর গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠানে বহু-সংখ্যক ভারতবাসীর কৃতিত্ব সপ্রমাণ করা যায় কি?

সরকার—আলবৎ যায়। গণ্যমান্য কাকে বলে? নাচ-গানের শিল্পে কতকগুলা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও পত্রিকা গণ্যমান্য। সেই সকল প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি ও পত্রিকার মহলে ভারতীয় নাচ-গান-বাজনার ওস্তাদেরা নামজাদা হচ্ছে আজ কম-সে-কম পঞ্চাশ বছর ধ'রে। খেলাধূলার কারবারে কতকগুলা পত্রিকা, ব্যক্তি ও কর্ম্মকেন্দ্র গণ্যমান্য। ভারতীয় খেলোআড়েরাও বিদেশের আখড়ায়-আখড়ায় কম খ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছে কি? বিংশ শতাব্দীর আগে হ'তেই এই বিভাগে ভারতীয় যশ ইয়োরামেরিকায় র'য়েছে। ধর্মপ্রচারের আসর হিসাবে কতকগুলা প্রতিষ্ঠান গণ্যমান্য। সেই সকল প্রতিষ্ঠানের মারফৎ ভারত-সন্তানদের কীর্তি ইয়োরামেরিকায় কম ছড়ায় নি। সুকুমার শিল্পের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি দেখা যায়। সেই সকল প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কষ্টিপাথরে একাধিক ভারতীয় চিত্রশিল্পী বিংশ শতাব্দীতে বিদেশে যশস্বী হ'য়েছেন।

তা ছাড়া রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বারোআরি-তলাও আছে। সেই সকল মহলে ভারত-সন্তানেরা বেশ কিছু নাম ক'রে আস্‌ছেন উনবিংশ শতাব্দী হ'তেই। আর আজকাল তো কথাই নেই। ১৯১৪-৪২ সনের যুগে ইয়োরামেরিকার ও জাপানের রাষ্ট্র-ধুরন্ধরেরা ভারতীয় রাষ্ট্রিকদের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন কর্‌তে বেশ-কিছু উৎসুক। বিদেশে "নাম করা"র কারবারে যুবক ভারতের রাষ্ট্রিক বিভাগ দস্তুরমাফিক পাকা।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই "নাম করা" কাণ্ড আজ পর্য্যন্ত প্রাথমিক অবস্থায় র'য়েছে। ভারতীয় নরনারীর সংখ্যা মনে রাখ্‌লে এই সকল আন্তর্জাতিক নামওয়ালা ভারত সন্তানের সংখ্যা নগণ্য। কিন্তু ভারতবর্ষ এই দিকেও "বাড়্‌তির পথে" চ'লেছে। আর এই গতি সুরু হ'য়েছে কম-সে-কম পঞ্চাশ বছর আগে।

লেখক—বিজ্ঞান-পরিষৎ, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক সম্মেলন ইত্যাদি জ্ঞান-কেন্দ্রে ভারতীয় পণ্ডিতদের অনেকে কীর্তি লাভ ক'রেছেন কি?

সরকার—আমি জবাব দিব—হাঁ, অনেকে। বলা বাহুল্য, "অনেক" শব্দটা আপেক্ষিক। প্রথমতঃ, ভারতীয় ছাত্রেরা ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সত্তর-আশী বছর ধ'রে নামজাদা। জানিস্‌ বোধ হয়,—অরবিন্দ বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজ ছোকরাদেরকে হারাতে পেরেছিল? এই রকম কতকগুলা দৃষ্টান্ত বিলাতে তো আছেই। আমেরিকায়, জার্মাণিতে, ফ্রান্সেও আছে। "ফার্ষ্ট বয়" হওয়ার কারবারে ভারতীয় ছাত্রেরা বিদেশে বেশ কিছু সুপরিচিত। ছোক্‌রা ভারতের কীর্তি ফেলিতব্য চিজ্‌ নয়।

লেখক—অধ্যাপক, গ্রন্থকার, গবেষক ইত্যাদি শ্রেণীর ভারতবাসীর ভেতর ইয়োরোপ-আমেরিকায় নাম ক'রেছেন বেশী লোক কি?

সরকার—বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার জন্য নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন "অনেকে"। বিংশ শতাব্দীর আগে হ'তেই এই ধারা টান্‌তে হবে। নিমন্ত্রণগুলা এসেছেও প্রতিষ্ঠানিক কায়দায়। বিদেশের কোনো-কোনো আসরে "দক্ষিণা" দেবার ব্যবস্থা আছে। গণ্ডা-কয়েক ভারতীয় অধ্যাপক সেই সকল আসরে গেয়ে দক্ষিণাও পেয়েছেন। এইরূপ নিমন্ত্রিত ও দক্ষিণা-প্রাপ্ত ভারত-সন্তানের ভেতর কাল হিসোবে একদম প্রথম কে বা কারা আমার জানা নেই।

আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সম্বন্ধে গবেষণাকারীরা খোঁজ সুরু কর্‌লে মন্দ হয় না।

বহুসংখ্যক ভারতীয় গবেষকের রচনা ইয়োরামেরিকান পরিষৎ পত্রিকায় ছাপা হ'য়েছে। এর সূত্রপাতও উনবিংশ শতাব্দীতে। ভারতীয় গ্রন্থকারদের ডজন ডজন বই বা পুস্তিকা ও প্রবন্ধ বিলাতী, মার্কিন, ফরাসী, জার্মাণ ও ইতালিয়ান পত্রিকায় খুব উঁচু প্রশংসা পেয়েছে। বিদেশে যে সকল ভারতীয় পদার্থ-শাস্ত্রী রসায়ন-শাস্ত্রী ঐতিহাসিক, দর্শন-লেখক ইত্যাদি পণ্ডিত মুসাফিরি কর্‌তে পারেন নি তাঁদেরও অনেকে ঘরে ব'সেই বিদেশী পত্রিকায় নাম ক'রেছেন।

এই সকল দিকে ভারতবাসীর "নাম করা' কাজটা বিশ-বাইশ বছরের ভেতর বেশী দেখা যাচ্ছে। ১৯২০ সনের পরবর্তী কালকে "বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ" ব'লেছি। বিদেশে "নাম করা" এই সময়ের অন্যতম প্রধান লক্ষণ। কিন্তু সন-তারিখ খতিয়ে দ্যাখ্‌। বিংশ শতাব্দীর আগা পর্যন্ত আর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের সুরু পর্যন্ত নজর ফেল্‌তে শেখ্‌। কী বল্‌ছি বুঝতে পার্‌বি।

প্রায় ত্রিশ বছর হ'লো,—১৯১৩ সনে,—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও ব্রজেন্দ্রনাথকে একটা বুখ্‌নির ভেতর ভারতীয় ইয়োরোপ-বিজয়ের প্রথম সেনাপতি ব'লেছি। (পৃঃ ৫৩, ১৬০)। মনে আছে তো? সে আজকের কথা নয়!

(পৃঃ ১৯৭, "বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ", ১১ই নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—বিদেশে ভারতীয় গুণী ব্যক্তিদের ভেতর অনেকেই সার্বজনিক নাম কর্‌তে পেরেছেন কি?

সরকার—সার্বজনিক নাম করা কী চিজ্‌? সার্বজনিক নাম-যশ হয় কুস্তীগিরদের, পালোআন-খেলোআড়দের, নট-নটী গায়ক-গায়িকাদের। তা ছাড়া বাদশা, রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট, পররাষ্ট্র-সচিব ইত্যাদি শ্রেণীর রাষ্ট্র-নায়ক দেশ-বিদেশে সার্বজনিক নাম-ডাক ভোগ করে। ঘটনাচক্রে আমাদের গান্ধিরও ঐ নাম। আর ক্বচিৎ-কখনো নোবেল প্রাইজওয়ালা সাহিত্যবীরদের সার্বজনিক নাম-ডাক দেখা যায়,—যথা রবীন্দ্রনাথের।

আর সব গুণীদের নাম-যশ সাধারণতঃ নিজ-নিজ জ্ঞান ও কর্মবিভাগের ভেতর আবদ্ধ থাকে। রাসায়নিককে চেনে রসায়ন-শাস্ত্রীরা, অঙ্ক-শাস্ত্রীকে চেনে অঙ্ক-শাস্ত্রীরা, নৃতত্ত্ব-সেবীদেরকে চেনে নৃতত্ত্ব-সেবীরা। এমন কি নোবেল প্রাইজওয়ালা পদার্থ-শাস্ত্রীদেরকেও প্রধানতঃ বা একমাত্র চেনে পদার্থশাস্ত্রীরা। বিদেশে মান্দ্রাজী রামণের মক্কেল প্রধানতঃ পদার্থশাস্ত্রীদের দলের অন্তর্গত। কুস্তীগিরদের নাম যতটা সার্বজনিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে নোবেল প্রাইজওয়ালা রসায়ন-শাস্ত্রীদের নাম ততটা ছড়িয়ে পড়ে না।

ফ্রান্সে বা জার্মাণিতে মার্কিণ গুণীদের নাম-ডাক সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। ফ্রান্সে, বিলাতে বা আমেরিকায় জার্মাণ গুণীদের নাম করা কাণ্ডেও এই সূত্র প্রযোজ্য।

আর একটা কথা জেনে রাখা ভাল। কোনো ভারতীয় পণ্ডিতের নাম হয়ত বিলাতী পণ্ডিত-সমাজে পরিচিত। তার নাম হয়ত ফ্রান্সে, ইতালিতে বা আমেরিকায় কেহ জানে না। আবার কেহ হয়ত আমেরিকায় বা ফ্রান্সে পরিচিত। তার কাজ-কর্ম হয়ত বিলাতে অজ্ঞাত ইত্যাদি। কাজেই সার্বজনিক নাম সাধারণতঃ অসম্ভব।

লেখক—একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে বুঝ্‌তে চাচ্ছি। মনে করুন,—কোনো প্রসিদ্ধ ভারতীয় ভূতত্ত্ব-শাস্ত্রী আমেরিকায় বা ইতালিতে গেলেন। তাঁরা সে-সব দেশে ভারতবাসীর নাম-ডাক সম্বন্ধে কী দেখ্‌তে পাবেন?

সরকার—প্রধানতঃ বা একমাত্র মার্কিণ বা ইতালিয়ান ভূতত্ত্ব-শাস্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের আলাপ-পরিচয় হবে। সেই মহলে তাঁরা কোনো প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের তর্জমাকারী বা সার-সংগ্রাহকের নাম শুন্‌তে পাবেন না। তাঁরা দেখ্‌তে পাবেন যে, তাঁদের পরিচিত ভূতত্ত্ব-শাস্ত্রীদের প্রায় কেহই কোনো ভারতীয় চিত্ত-শাস্ত্রীর, অঙ্ক-শাস্ত্রীর, চিত্র-শিল্পীর, ঐতিহাসিকের বা ধর্ম-প্রচারকের নাম শুনেন নি। মনে কর্,—তাঁরা দেশে ফিরে এসে বল্‌লেন যে, আমেরিকায় বা ইতালিতে কোনো ভারতীয় অঙ্ক-শাস্ত্রীর, চিত্র-শিল্পীর, ঐতিহাসিকের বা চিত্তশাস্ত্রীর নাম নেই। তা হ'লে খবরটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য? বিশ্বাস কর্‌বে হয়ত একমাত্র তাঁদের পেটোআরা আর চাপ্‌রাশিরা। (পৃঃ ১৪৭)

লেখক—মনে করুন, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন, বা সাহিত্য সম্বন্ধে কোনো প্রসিদ্ধ ভারতীয় গ্রন্থকার ফ্রান্সে মাস কয়েক কাটালেন। তাহ'লে তিনি বর্তমান ভারতীয় অধ্যাপক, গবেষক ও গ্রন্থকারদের কাজকর্ম সম্বন্ধে ফরাসী সমাজের মতামত কতটা ধর্‌তে পার্‌বেন?

সরকার—ধরা যাক্ এই প্রসিদ্ধ ভারতীয় গ্রন্থকারের নাম আব্দুল। ফরাসী সমাজের কোন্ শ্রেণীর পণ্ডিতদের সঙ্গে তার চেনাশুনা বেশী হবে জানিস্? যারা প্রাচীন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব, দর্শন, ধর্ম, হাঁচি-টিক্‌টিকি, শূদ্র-ব্রাহ্মণ, ঈদ-মহরম, গোপূজা, কোর্বাণি, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে গবেষণা কর্‌তে অভ্যস্ত প্রধানতঃ তাদের সঙ্গে। অন্য-কোনো শ্রেণীর ফরাসী পণ্ডিতদের সঙ্গে আব্দুলের মোলাকাৎ হবে কিনা সন্দেহ। ফবাসী পদার্থ-শাস্ত্রী, রাসায়নিক, ভূতত্ত্ববিৎ, চিকিৎসা-শাস্ত্রী, অর্থ-শাস্ত্রী, শিক্ষা-শাস্ত্রী, চিত্ত-শাস্ত্রী, দার্শনিক ইত্যাদি শ্রেণীর বিজ্ঞান-সেবকদের প্রায় কেহই হয়ত তার জানা-শোনা লোকের ভেতর পড়্‌বে না। অথচ এই সকল শ্রেণীর ফরাসী পণ্ডিতদের কেহ-কেহ হয়ত কোনো-কোনো ভারতীয় পদার্থ-শাস্ত্রীর, অর্থ-শাস্ত্রীর, চিত্ত-শাস্ত্রীর বা চিকিৎসা-শাস্ত্রীর কাজকর্ম বেশ তারিফ-যোগ্য বিবেচনা করে। আব্দুল দেশে ফিরে এসে প্রচার কর্‌ছে যে, ফ্রান্সে কোনো লোক তাকে ছাড়া আর কোনো ভারত-সন্তানকে চেনে না। অথচ ঠিক সেই সময়েই আরও দশ-বিশ জন ভারতীয় গবেষক-গ্রন্থকার ফরাসী সুধীসমাজের ও পরিষৎ-পত্রিকার মারফৎ বিজ্ঞান-জগতের বিভিন্ন মহলে প্রচারিত হচ্ছে।

কাজেই বিদেশে ভারতবাসীর নাম করা কারবারটা বেশ-কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল। নেহাৎ সহজে বুঝা যাবার জিনিষ নয়। যারা এক কথায় সূত্রাকারে বুঝ্‌তে চায় তারা ভুল বুঝ্‌তে বাধ্য। এই সব কথা "বর্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর নানা ঠাঁইয়ে আলোচনা ক'রেছি।

("রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের লক্ষ্য", ৪ঠা নবেম্বর, "বৃহত্তর ভারতের কর্মিবৃন্দ", ৭ই নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

স্বদেশী আন্দোলনের শৈশব-কথা

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম কয়েক সপ্তাহের দু'একটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিবৃত কর্‌বেন? আপনি ঐ আন্দোলনটাকে কী চোখে দেখ্‌তেন? ("নূন-চিনির স্বদেশী", ১লা ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সরকার—মজার কথা। ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্ট টাউন হলের সভায় বিলাতী মালের বয়কট জারি হ'ল। কিন্তু "স্বদেশী" শব্দটা বোধ হয় ব্যবহার করা হয় নি।

লেকক—"স্বদেশী" শব্দ ব্যবহৃত হ'লো প্রথম কবে বা কোথায়?

সরকার—ঠিক মনে পড়্ছে না। ১৯০৪ সনের জুলাই মাসে রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" বক্তৃতা থেকে আমরা "স্বদেশী" শব্দে অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু এটা যে একটা বিপুল পারিভাষিক শব্দে পরিণত হবে তা ভাব্তে পারি নি ১৯০৫ সনের ৭ই আগষ্টের টাউন হল-সভায় আমি যাই নি। সভায় যাওয়া অভ্যাস আমার কম ছিল। যারা গিয়েছিল তারা স্বদেশী শব্দ নিয়ে ফিরে আসে নি। কয়েকদিন পরে সুরেন ব্যানার্জির "বেঙ্গলী" দৈনিকে একটা ছোট্ট সম্পাদকীয় টিপ্পনী দেখ্লাম। সেই টিপ্পনীর নাম ছিল "দি স্বদেশী মুভ্‌মেণ্ট"। ছাপার হরপে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

এই বিষয়ে আরও অনেকের সঙ্গে মোলাকাৎ চালানো উচিত। আমি বোধ হয় ঠিক খবর দিচ্ছি কিনা সন্দেহ। অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভিন্ন-ভিন্ন লোকের কথা শোনা উচিত। (পৃঃ ১৮৬, ১৮৭)

লেখক—স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে আপনার কোনোরূপ ধারণা জন্মেছিল?

সরকার—আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আমি স্বদেশী আন্দোলনকে "তথাকথিত" স্বদেশী আন্দোলন বল্তাম,—মনে পড়ছে। এই আন্দোলন টেক্‌সই হবেনা ভেবেছিলাম। স্বদেশী "শব্দটা" ব্যবহার করার জোরে দেশে স্বদেশী "মাল" আস্‌বে না,—এইরূপ ভাব্তাম। তখন আমার বয়স বছর সতর-আঠার।

লেখক—কী আশ্চর্য? আপনি স্বদেশী আন্দোলনেরও বিরুদ্ধে ছিলেন? ডন সোসাইটিতে সতীশবাবুর চেলা হ'য়েও? কারণ কী?

সরকার—তাই তো দেখ্ছি। ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধও লিখে ফেলেছিলাম। সেটা অবশ্য ছাপা হয় নি। যুক্তিগুলা আজ মনে নেই। কিন্তু একটা কথা মনে পড়্ছে। ব'লেছিলাম—স্বদেশী শব্দটা ব্যবহার কর্তে-কর্তে আমাদের মেজাজটা দেশের দিকে যাবে। আমরা আস্তে-আস্তে আত্মিকভাবে স্বদেশ-ভক্ত হ'তে পারবো। একটা আকাঙ্ক্ষা তৈরি হ'য়ে থাক্‌ছে! কিন্তু প্রাণে-প্রাণে স্বদেশভক্ত হ'লেও স্বদেশী "জিনিষ" তৈরি করা সম্ভব না হ'তেও পারে। স্বদেশী মিল, ফ্যাক্টরী, কারখানা ইত্যাদি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলা একমাত্র স্বদেশী চিত্ত, প্রাণ বা ভাবুকতার উপর নির্ভর করে না। তার জন্য চাই মূলধন বা পুঁজির জোগান। এই পুঁজি আস্‌বে কোথ্-থেকে? আমি স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী ছিলাম না। স্বদেশী আন্দোলনের সফলতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল মাত্র।

এখন দেখ্ছি, সেই ছোক্‌রা বয়সেও আমার মগজটা কিছু কুচুটে ঢঙের ছিল। সকলে মিলে যা নিয়ে মাতামাতি করে তা নিয়ে ঢ'লে পড়ার দিকে সহজে মাথা ঝুঁক্‌তো না।

লেখক—শেষ পর্যন্ত স্বদেশী আন্দোলনের দিকে আপনার মেজাজ ঝুঁকেছিল?

সরকার—হাঁ। ডন সোসাইটির সভায় সতীশবাবু একদিন বক্তৃতা কর্‌লেন। বোধ হয় সেপ্টেম্বর মাসে। তাতে তিনি দিলেন তথ্যের পর তথ্য আর সংখ্যার ওপর সংখ্যা। দেখা গেল যে, বোম্বাইয়ে আর আহম্মদাবাদে কাপড়ের কল বিশ-পঁচিশ বছর ধরে কেবল বেড়েই চ'লেছে। বক্তৃতাটা অবশ্য একমাত্র আমার মতন ম্যাড়াকান্তকে বুঝাবার জন্য দেওয়া হয়নি। স্বদেশী কারখানার উন্নতি সম্বন্ধে সেটা ছিল সার্বজনিক বক্তৃতা। আমি আমার তরফ্ হ'তে বুঝে নিলাম যে,—পুঁজি-সংগ্রহ একদম অসম্ভব নয়। মালের জন্য টান সুরু হ'লে দেশের

লোক নয়া-নয়া কারখানা বসাবার মতলবে নতুন-নতুন পুঁজি জোগাতে রাজি হয়। সংখ্যা-শাস্ত্রের সাহায্য না থাক্‌লে সতীশবাবুর বক্তৃতায় এই শুক্‌নো চিঁড়ে ভিজ্‌ত কি না আজ বল্‌তে পারি না। বস্তুনিষ্ঠভাবে স্বদেশী আন্দোলনের শৈশবটা দেখ্‌তে থাক্‌লাম। যা হ'ক,—স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোথাও কোনো দিন বক্তৃতাও দিই নি বা প্রবন্ধও প্রকাশ করিনি।

("ডন-সোসাইটি ও বঙ্গ-বিপ্লব", ১লা ডিসেম্বর, "মণীন্দ্র-মণ্ডল, ব্রজেন্দ্র-মণ্ডল ও নরেন্দ্র-মণ্ডল", ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লাঠি-সেনাপতি পুলিন দাশ

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবের অন্তর্গত শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যবিষয়ক আন্দোলন সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলুন।

সরকার—ডন-সোসাইটির তদবিরে কুস্তী, পালোয়ানি ইত্যাদি খেলা দেখাবার ব্যবস্থা ছিল ব'লেছি। (পৃঃ ১৯১) ১৯০৫ সনের এক সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন মনে পড়্‌ছে। তখন বিলাতী-বয়কট চালু হ'য়েছে। সেই সভায় শচীন বোস্‌ বক্তৃতা কর্‌তে-কর্‌তে রবিবাবুকে ব'লেছিল—"এইবার কবির কলঙ্ক-ভঞ্জন হ'ল। লিখুন,—'এসেছে সেদিন এসেছে'।" রবীন্দ্রনাথের "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক" গানে ছিল,—"এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।" সেই গানটার নতুন সংস্করণ চাচ্ছিল শচীন। তার দু'একদিনের ভেতরই একটা ছোট্ট গানের বইয়ে দেখ্‌লাম শচীনের পাঁতি মাফিক্‌ গানটা শুধ্‌রাণো হ'য়ে গেছে! অবশ্য কবির হুকুম মাফিক নয়। প্রকাশকের গায়ের জোরে! এরি নাম ভাবালুতা।

১৯০৬-০৮ সনে বেঙ্গল ন্যাশন্যাল কলেজেও কুস্তী, ব্যায়াম ইত্যাদির উপর জোর দেওয়া হ'ত। এদিকে সতীশবাবুর নজর ছিল তীক্ষ্ণ।

শারীরিক শক্তি বিকাশের জন্য একটা স্বতন্ত্র আন্দোলনই দেশের ভেতর নানা কেন্দ্রে দেখা দিয়েছিল। কল্‌কাতায় কায়েম হ'য়েছিল "আত্মোন্নতি সমিতি" আর ঢাকায় "অনুশীলন সমিতি"। ফরিদপুরের "ব্রতী" সমিতি, ময়মনসিংহের "সুহৃৎ" সমিতি আর বরিশালের "বান্ধব" সমিতিও কল্‌কাতায় নামজাদা হ'য়েছিল। এই ধরণের আরও শক্তি-সমিতি ছিল। সবই কোস্তাকুস্তি, পালোয়ানি, শারীরিক কছরতের আখড়া। ১৯০৫ সনের মাঝামাঝি এই গুলার জন্ম।

লেখক—কোনো আখ্‌ড়ার কথা কিছু মনে আছে?

সরকার—ঢাকার অনুশীলন-সমিতির প্রবর্তক ও সেনাপতি ছিলেন পুলিনবিহারী দাশ। তাঁর সঙ্গে দেখা করিস্‌। অনেক মাল পাবি। স্বদেশী যুগে যাঁরা বিশ-পঁচিশ বছরের যুবা তাঁরা আজকাল পঞ্চান্ন-ষাট-পঁয়ষট্টি বছরের লোক। তাঁদের জীবন-স্মৃতিগুলা সংগ্রহ করা জরুরি। কারু স্মৃতিতে পাবি শিল্প-কারখানা তৈরীর কথা। কেউ বল্‌তে পার্‌বে বঙ্গ-জীবনে থিয়েটারের প্রভাব। কোনো-কোনো স্মৃতিতে বেরুবে যৌবনের দল-গঠন। কারু কাছে পাওয়া যাবে বিদেশ-পর্যটনের অভিজ্ঞতা। এই স্মৃতিসমূহ যারপরনাই মূল্যবান্‌। (পৃঃ ১৮৬, ১৮৭)

লেখক—পুলিন দাশের কাজকর্ম সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন?

সরকার—তামাম পূর্ববঙ্গ আর উত্তর-বঙ্গের যুবক বাংলাকে চালাতেন পুলিন দাশ একা।

এক সঙ্গে লাখ ছোকরার দল খাড়া করা তাঁর পক্ষে ছিল অতি সোজা কাজ,—জলবৎ তরল। বাঙালীর বাচ্চার জীবনে এই অবস্থা এক খাঁটি নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক যুগান্তর। লাঠি-খেলার ওস্তাদিতে তাঁর বীরত্ব যে-কোনো লোককে মুগ্ধ কর্‌তো। আর শারীরিক শক্তির আকাঙক্ষা ছড়িয়ে এই লাঠি-সেনাপতির বাংলার নরনারীর ভেতর প্রকাণ্ড বিপ্লব এনে হাজির ক'রেছিলেন। অনুশীলন-সমিতিকে সে-যুগে আমরা জাতীয়-ব্যায়াম-পরিষৎ বিবেচনা কর্‌তাম। লাঠি-সেনাপতি পুলিন দাশ বঙ্গ-বিপ্লবের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মবীরদের অন্যতম। এই স্বার্থত্যাগী, ভবিষ্য-দ্রষ্টা, স্বদেশ-সেবক বাঙালীর বাচ্চা নবীন এশিয়ার জগদ্‌বরেণ্য সেনাপতিদের সমশ্রেণীভুক্ত। তাঁর জীবন-কথা যুবক বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৯৪২ সনের পরবর্তী বাঙালী জাত্‌ নিজেকে পুলিন দাশের সন্তান ভেবে গৌরব বোধ ক'র্‌বে।

লেখক—স্বদেশী-যুগের লাঠিখেলা, কুস্তী-পালোয়ানি ইত্যাদি শারীরিক শক্তি বিষয়ক আন্দোলনের কিছু আজকাল আছে কি?

সরকার—স্বদেশী-যুগের ব্যায়াম-বীরগণকে আজকাল হয়ত অনেকে জানে না। তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলাও বোধ হয় পটল তুলেছে। কিন্তু সেই আন্দোলনের সব-কিছুই আজ পর্যন্ত বজায় আছে। মরে নি কিছুই। একালের কলকাতায় ও মফঃস্বলে গণ্ডা-গণ্ডা খেলার আখ্‌ড়া দেখা যায়। ইস্কুল-পাঠশালা-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরিক কছ্‌রত, সাঁতার-টক্কর, দৌড়-টক্কর, ব্যায়াম-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি বেশ-মোটা আকারে ফুটে উঠেছে। ছয়-কোটি বাঙালীর জন্য স্বাস্থ্যোন্নতির পক্ষে এসব এখনো বেশী-কিছু নয়। কিন্তু বাহুবলের পুষ্টি-সাধনের জন্য আড্ডা, মজলিশ, আখ্‌ড়া, ক্লাব ইত্যাদি কর্মকেন্দ্র বেড়ে চ'লেছে। এই সকল শক্তি-কেন্দ্র, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, ব্যায়াম-কেন্দ্র, কুস্তী-কেন্দ্র, সাঁতার-কেন্দ্র, দৌড়-কেন্দ্র, ঝাঁপ-কেন্দ্র প্রায় সবই পুলিন দাশ কর্তৃক প্রবর্তিত আন্দোলনেব বংশধর-স্বরূপ। তাঁর সমান দরের অন্যান্য ব্যায়াম-বীর গণের কর্মকেন্দ্র হ'তেও একালের আখ্‌ড়া-সমূহ প্রেরণা পেয়েছে। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ আজকালকার বে-সরকারী আর সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহের আবহাওয়ায় অমরতা লাভ ক'রেছে। এমন কি,—গুরুসদয় দত্ত-প্রবর্তিত ব্রতচারী আন্দোলন পুলিন দাশের কায়েম-করা অনুশীলন-আন্দোলনেরই আত্মিক সন্তান ও উত্তরাধিকারী।

গুরুসদয়ের নাচানাচি

লেখক—সে কী? আপনি সরকারী ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুসদয় দত্তকেও পুলিন দাশের উত্তরাধিকারী ভাব্‌ছেন?

সরকার—ভায়া, দুনিয়া বড়ই বিচিত্র। দুনিয়া চায় কেবল কাজ। আবদুলের কাজ না ইস্‌মাইলের কাজ সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। দরদ তার কাজের। কাজটা যে-ই করুক না কেন,—সেটা কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। কাজের গায়ে সরকারী, বে-সরকারী দাগ দেওয়া নেই। কোনো মার্কামারা কাজের পেছনে সংসারের লোক ছোটে না। মানুষ চায় অভাব-মোচনের নতুন-নতুন কায়দা। নয়া-নয়া চাহিদার জন্য জরুরি নতুন-নতুন জোগান। অধিকন্তু কয়েক বছর যেতে-না-যেতেই সরকারী লোকই বা কে আর বে-সরকারী লোকই বা কে? সবই একাকার। বিশেষতঃ মর্‌বার পর কার চেহারা কে মনে রাখে? র'য়ে যায় শুধু কাজটা,

চিন্তাটা, বচনটা। চাক্‌রিটাও অমর নয়, পদটাও অমর নয়, পয়সাটাও অমর নয়, পদবীটাও অমর নয়। অমর মাত্র এক চিজ্‌—সে হচ্ছে মানুষের রক্তে-মাংসে তৈরি কাজটা, দরদে-ভেজানো চিন্তাটা বা বুখ্‌নিটা! এক জায়গা ব'লেছি "হাত-পা'র জোরে মাথার জোরে শক্তিমানের পূজা পায়।" গুরুসদয় (১৮৮২-১৯৪১) ছিলেন সত্যিকার দেশ-পাগ্‌লা লোক। প্রাণে-প্রাণে সে স্বদেশ-সেবক,—বঙ্গ-বিপ্লবের (১৯০৫-১৪) অন্যতম সুফল। তাঁর কাজকর্ম অবশ্য একালের (১৯৩২-৪১)।

লেখক—আপনি বাঙালী সরকারী চাক্‌রেদের কাজ ও চিন্তাকে বে-সরকারী স্বদেশ-সেবকদের কাজ ও চিন্তার সমান বিবেচনা করেন?

সরকার—বুঝ্‌তেই পারছিস। আমি লোকটা মুখ্‌খু ও গরীব, তার ওপর বে-খাপ্পা, বে-সুরো, বেআকুব। লোকের পছন্দসই বুখ্‌নি এই পোড়া-মুখে বেরোয় না। আমার মতটা কোনো দিনই লোকপ্রিয় হ'লো না। কী কর্‌বো? আচ্ছা শোন্‌। বিলাতী-বয়কট্‌ আন্দোলনের আত্মিক জন্মদাতা কে? রমেশ দত্ত। কত বড় সরকারী চাক্‌রে সে ছিল জানিস্‌? বন্দে মাতরং মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিম চাক্‌রে হিসাবে এতবড় ছিল না ঠিক,—কিন্তু সরকারী লোক তো বটে।

"দেবি আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ!"—কে শিখিয়েছে? দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলালের গান আর নাটকগুলা না থাক্‌লে বাংলার নরনারী ১৯০৫-০৮ সনের যুগে বেশী মাতামাতি কর্‌তে পার্‌ত কি? দ্বিজু কবি বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম প্রবর্তক। জানিসই তো তিনি বঙ্কিমেরই দরের সরকারী চাক্‌রে?

তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপ্লব-প্রবর্তক আশুতোষ কি ছোটখাটো চাক্‌রে? জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র ইত্যাদি মার্কামারা বিজ্ঞানবীরেরাও সরকারী লোক। এই সব কথা মনে রাখিস্‌। তাহ'লে সহজে বুঝ্‌বি—গুরুসদয়ের পক্ষে রমেশ দত্ত'র দরের সরকারী চাক্‌রে থাকা সত্ত্বেও পুলিন দাশের আত্মিক উত্তরাধিকারী হওয়া সম্ভবপর হ'য়েছে। (পৃঃ ২২৩)

লেখক—বে-সরকারী লোকজনের কাছে আপনি বেশী স্বদেশসেবা আশা করেন না?

সরকার—প্রশ্নটা গোলমেলে। আমি বল্‌ছি অন্য ধরণের কথা। বে-সরকারী লোকেরা সবাই কি দেশ-পাগ্‌লা না স্বদেশ-সেবক? অধিকাংশই তা নয়। সরকারী লোকগুলার রক্তমাংসও তো বাঙালীই বটে। কাজেই তাদের ভেতর দু-একজন দেশ-পাগ্‌লা লোক নেই কে বল্‌লে? দুএকজন খাঁটি স্বদেশ-সেবকও যে সরকারী চাক্‌রের দল থেকে মাঝে-মাঝে বেরুবে না তাই বা কী ক'রে বলা যায়? জানিস্‌ আজকালকার ঝাঁঝাল, শাঁসাল, জোরাল লেখকদের ভেতর অন্নদাশঙ্কর রায় গুরুসদয়ের মতনই বড় চাক্‌রে?

লেখক—আপনি গুরুসদয় দত্ত'র ব্রতচারী আন্দোলনকে এত প্রশংসা কর্‌ছেন কেন?

সরকার—গুরুসদয় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের "বুড়ো" বাঙালীকে নাচাতে পেরেছেন। রাস্তায়-ঘাটে, হাটে-মাঠে, বারোয়ারী-তলায় যেখানে পেয়েছেন সেখানে এই বুড়োগুলোকে নাচিয়ে ছেড়েছেন। এই কাজটাকে আমি নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লবের ইজ্জদ দিতে অভ্যস্ত। আরও খুশী হ'তাম যদি জেলায়-জেলায় হাজার-হাজার "বুড়োরা" নাচানাচি সুরু কর্‌তো। গুরুসদয়ের হিড়িকে আন্দোলনটা সুরু হ'য়েছে মাত্র। এখনও সংখ্যা হিসাবে বেশী ফল লাভ হয় নি।

লেখক—কেন? নাচানাচির ভেতর বিপ্লব কোথায়?

সরকার—চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের বুড়োগুলো যদি হপ্তায় একঘণ্টাও খোলা মাঠে দলবেঁধে নাচানাচি করে তা'হলে প্রত্যেকের আয়ু বেড়ে যাবে দশ বছর। বুঝ্‌লি?

ডাক্তারের আর ওষুধপত্রের পয়সা বেঁচে যাবে ঢের! আর বুড়ো বাঙালীর বাচ্চারা জ্যান্ত মানুষের মতন দু'বেলা চলাফেরা কর্‌তে পার্‌বে। ঘাড় খাড়া ক'রে চল্‌বে। লোকগুলার চোখের চাহনি হবে অন্য ধরণের। চেহারা যাবে ব'দ্‌লে। মায় সুন্দরও দেখাবে। অ্যাঁ? জানিস্ "অ্যাথ্‌লেটিক্‌স্"কে আমি বলি "এস্‌থেটিক্‌স্"? খেলাধূলা, নাচানাচি, লাফা-লাফি হচ্ছে সৌন্দর্যের অন্যতম আসল জনক। এক জায়গায় ব'লেছি,—

যৌবনে ভরা পুরুষ-নারী শক্তি-স্বাস্থ্যের অবতার,

একবার তাদের দেখ্‌লে পরে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় আবার।

নাচানাচির দৌলতে বুড়োগুলারও যৌবন আর সৌন্দর্য আবার ফিরে আস্‌বে। যারা ছেলেবেলায় জোআন আর সুন্দর ছিলনা তারা জীবনে এই প্রথম জোআন আর সুন্দর ব'নে যাবে। কথাটা মাথায় ঢুক্‌লো? অতিমাত্রায় কিম্ভুতকিমাকার কথা বল্‌ছি?

লেখক—বুড়োদের নাচানাচির মূল্য এত দিচ্ছেন?

সরকার—হাঁ। নাচানাচি প্রথমতঃ শারীরিক কছ্‌রৎ। এতে ফুটে উঠে হাত-পার জোর ও ফুর্তি। সকলেই এটা দেখ্‌তে পায়। কিন্তু দ্বিতীয়তঃ, আর একটা বড়-কথা আছে। বাহির হ'তে তা অনেকে দেখ্‌তে পায় না। সেটা হচ্ছে মনের ফুর্তি। সোজা কথায়,—আনন্দ। বাঙালীর বাচ্চা আনন্দ চাখেনা, চাখ্‌তে জানে না, চাখ্‌তে পারে না। বাঙালীরা যতই পয়সাওয়ালা, পদবীওয়ালা আর পদওয়ালা হ'ক না কেন, প্রায় সবাই খিট্‌খিটে মেজাজের দৈত্য-গোছের জানোআর। মানুষের মন, মানুষের খেয়াল, মানুষের হাসি, মানুষের ঠাট্টা বাঙালীর সুরতে বড়-একটা দেখা যায় না। সেই আনন্দের দুএক পশলা ছড়ানো সম্ভব নাচানাচির খেলায় বা কছ্‌রতে। গুরুসদয়ের নাচানাচির ভেতর দিয়ে সেই মনের ফুর্তি বাঙালী বুড়োরা পেতে পার্‌বে। "বারেক যদি করিস্ পণ!"

লেখক—আপনি যা চাচ্ছেন তা তো ব্যায়াম চর্চা কর্‌লেই চল্‌তে পারে। তার জন্য নাচানাচির দরকার কৈ?

সরকার—নাচানাচিকে একদম কুস্তী-ব্যায়াম-লাঠিখেলার সমান কোঠে এনে ফেলি নি। শারীরিক কছ্‌রতের সঙ্গে-সঙ্গে,—শারীরিক কছ্‌রতের ওপরে,—আর একটা জিনিষ নাচানাচির ভেতর আছে। সেটা হ'ল আত্মিক আনন্দ। তার কিম্মৎ লাখ টাকা। গুরুসদয়ের কাছে বাঙালী জাত সেই আত্মিক আনন্দও পেতে পারে। বাঙালীর বাচ্চাকে রক্ত-মাংসের মানুষের বাচ্চায় পরিণত করা সম্ভব গুরুসদয়ের পাঁতিতে।

লেখক—আজকাল ইস্কুল-কলেজে, ক্লাবে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে মেয়েরা নাচ-গান-বাজনা শিখ্‌ছে। আপনি গুরুসদয় দত্ত'র ব্রতচারী প্রতিষ্ঠানকে সেই সবের অন্যতম মনে করেন?

সরকার—না। গুরুসদয়ের আন্দোলন অন্য শ্রেণীর ও অন্য দরের জিনিষ। মেয়েদের নাচ-গান-বাজনা বিষয়ক আন্দোলন আমি পছন্দ করি। তার জন্য নানা প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠ্‌ছে। সে সব তারিফযোগ্য। এই সবের উন্নতি সাধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। গুরুসদয়ের ব্রতচারীতে মেয়েদের জন্যও ব্যবস্থা আছে। তাও সমর্থন-যোগ্য। গুরুসদয়ের মহিলা-সমিতি গুলায় নানা উপায়ে মেয়েদের "পুরুষ-সাম্য" কায়েম হচ্ছে। আমি তার স্বপক্ষে। কিন্তু সম্প্রতি আমি ইস্কুল-কলেজের মেয়েদের কথা বল্‌ছি না। বল্‌ছি প্রবীণ পুরুষদের কথা। এরা নাচ্‌তো না। তাদেরকে গুরুসদয় নাচিয়ে ছেড়েছেন। এইটে জবর বাহাদুরি। এরি নাম সত্যিকার বিপ্লব।

লেখক—বাঙালী প্রবীণেরা কি নাচ্‌তো না?

সরকার—তুই-ই বল্‌না? কোনো বাঙালী প্রবীণকে কোথাও নাচ্‌তে দেখেছিস্? তথাকথিত ভদ্রলোকের প্রবীণ পুরুষেরা সঙ্কীর্তনের নাচে যোগ দিত। পূজা-পার্বণের সময় ঢাক পিটাবার সঙ্গে-সঙ্গে বুড়োরা নাচ্‌তে অভ্যস্ত ছিল। বামুন-কায়েথ-বৈদ্যরাও নেচেছে। আজকাল তাদের কেউ কোথাও সঙ্কীর্ত্তনের সময়ে নাচে কি? পূজার সময় নাচে কি? বোধ হয় নেহাৎ পাড়া-গাঁয়ে এখনো দু-চার-দশ-বিশ জন সাবেকি নাচের রেওয়াজ বজায় রেখে চ'লেছে। কিন্তু মফঃস্বলের পল্লীতে, সদরে, কল্‌কাতায় নাচের অভ্যাস কোনো পুরুষের আছে কি? এই অভ্যাস তামাম বাংলার কোথাও নেই এ কথা বলা হয়ত ঠিক হবে না। বাঙালী পুরুষের নাচ এখনো দেখা যায় কোথায় জানিস্? তথাকথিত "ছোট লোকদের" সমাজে। তাও আবার পাড়াগাঁয়ে।

লেখক—গুরুসদয়ের ব্রতচারী নাচের বিশেষত্ব তা হ'লে কী-কী?

সরকার—গুরুসদয়ের বাহাদুরি দেখ্‌তে পাচ্ছিস্ না? "গুরুসদয়" সেই পাড়াগেঁয়ে ও "ছোট-লোকদের" নাচ তথাকথিত বড়, উঁচু ও শিক্ষিত সমাজের এখানে-ওখানে অল্প-বিস্তর চালু কর্‌তে পেরেছেন। বাঙালী বুড়োরা,—উকিল, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যাঙ্কার, অধ্যাপক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক,—নাচ্‌ছে। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। কোন্ নাচ? রায়বেঁশে নাচ, গাজনের নাচ, গম্ভীরার নাচ। এই নাচের সঙ্গে বাজে কোন্ বাজনা জানিস্? ঢাক, ঢোল। ব্যস্। আর কী চাস্? এরি নাম যুগান্তর। একেই বলে বিপ্লব।

লেখক—আপনি গুরুসদয় দত্ত-প্রবর্ত্তিত রায়বেঁশে ইত্যাদি নাচের তারিফ্ কর্‌ছেন। নিজে এই নাচে যোগ দিয়েছেন?

সরকার—না, ভায়া। আমি তো দুনিয়ার লাখ জিনিস তারিফ্ করি। তার ক'টা নিজে কর্‌তে পেরেছি বা পারি? স্বদেশীযুগে পুলিন দাশের (১৯০৫-১০) লাঠিয়ালও হ'তে পারিনি। আর একালের গুরুসদয়ের (১৯৩২-৪১) ঢাকীর তালে-তালেও পা ফেল্‌তে পারিনি। আমি তো ম্যাড়াকান্ত জানিস্‌ই।

লেখক—উদয়শঙ্করের নাচে আর গুরুসদয়ের ব্রতচারী নাচের আপনি কোনো প্রভেদ করেন?

সরকার—উদয়শঙ্করেব উদ্ভাবিত নাচটা থিয়েটারে বা আর কোথাও ব'সে দেখ্‌বার জিনিষ। এই সব নাচ দলে-দলে নাচা যায় না। আজকাল মেদিনীপুরের বিমলেন্দু বসুও নাচ সৃষ্টি ক'রে ভারত-প্রসিদ্ধ হ'চ্ছেন। এই নাচগুলাও দেখ্‌বার জিনিষ! এ সার্ব্বজনিক নাচ নয়। কিন্তু আমি গুরুসদয়ের নাচগুলাকে দেখ্‌বার জিনিষ হিসাবে প্রচার কর্‌ছি না। লোকজনকে দল বেঁধে নাচাবার জন্য ব্রতচারী নাচের উদ্ভব। চাই এক-সঙ্গে পঁচিশ পঁয়ত্রিশ-পঞ্চাশ জন লোকের নাচানাচি, লাফালাফি। বাংলার জনসাধারণ এই ধরণে নাচানাচি ও লাফালাফি কর্‌তো এবং এখনো পাড়া-গাঁয়ে কিছু-কিছু কর্‌ছে। গুরুসদয় তার পুনরুদ্ধার কর্‌লেন।

লেখক—গুরুসদয় দত্ত'র সঙ্গে আপনার কাজের কোনোরূপ যোগাযোগ ছিল?

সরকাব—এই অধমের কথাগুলা বেআড়া রকমের,—কিন্তু মেজাজটা অনেকের পছন্দসই। আমার "চোপা" খানা খারাপ ব'লে লোকটাকে অনেকে খারাপ মনে করে না। বরাতের জোর! সেই জন্য নানা মজ্‌লিশে পংক্তি-ভোজনের কপাল নিয়ে জন্মেছি। লোকে ডাকে। গরীব মানুষ,—যাই। গুরুসদয়ের সঙ্গেও দহরম-মহরম ছিল। একদিন,—বোধ হয় ১৯৩২ সনে,—বল্‌ছিলেন,—"বিনয় সরকার, কেবল বই লিখেই ম'লে, বাবা? একবার কাজে নেমে পড়ো না। দেখি কতখানি ক্যার্‌দানি!" "আর কদ্দিন থাক্‌বে নিষ্কর্ম্মা মানুষ?"

জবাব আর কীই বা দিতে পারি? চুপ ক'রে রইলাম। "তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে!"

লেখক—তারপর গুরুসদয় কী বল্‌লেন?

সরকার—বল্‌লেন,—"একদিন কলেজ স্কোয়ারে পুরাণা বইয়ের দোকানে বিনয় সরকারের "ফোক্-এলিমেন্ট ইন হিন্দু কাল্‌চার" (হিন্দু সংস্কৃতিতে জনসাধারণের দান, লণ্ডন ১৯১৭) শস্তা দরে বিক্রী হচ্ছিল। পনর টাকার বই কিনে নিলাম দেড় টাকায়। খুলে দেখি তার ভেতর আছে মালদহের গম্ভীরা আর বাংলার অন্যান্য জেলায় প্রচলিত লোক-নৃত্য, লোক-বাদ্য ও লোক-গীতের বৃত্তান্ত। ঠিক সেই সময়েই আমি সুরু কর্‌ছিলাম বীরভূমে প্রচলিত রায়-বেঁশে নাচের গবেষণা। তাতেই সূত্রপাত হ'লো ব্রতচারী-নাচানাচির। বইটা কাজে লেগেছে।"

লেখক—আপনি কী বল্‌লেন?

সরকার—যেই শুনলাম, "বইটা কাজে লেগেছে", অমনি বাগে পেয়ে ব'লে ফেল্‌লাম—"দেখ্‌ছি নেহাৎ নিষ্কর্মা নই! বইও কাজে লাগে? কী বলো, দাদা? আমার অ্যান্‌থ্রপলজি (নৃতত্ত্ব) চর্চাটা ছিল নেহাৎ পণ্ডিতি-ধরণের, পারিষদিক বা তত্ত্ব-মাফিক্। গুরুসদয়ের হাতে সেই নৃতত্ত্বই হ'য়ে গেল আপ্লায়েড (কাজের সহায়)।"

জ্ঞান-কাণ্ডে আর কর্মকাণ্ডে যে-যোগাযোগ,—অন্ততঃ একক্ষেত্রে সেই যোগাযোগ ছিল এই অধমের সঙ্গে গুরুসদয়ের।

হরিদাস পালিত ও মালদহের গম্ভীরা

লেখক—"ফোক-এলিমেন্ট ইন্ হিন্দু কালচার" বইটা সম্বন্ধে আরও কিছু খবর দেবেন?

সরকার—এই বইয়ের ইতিহাস কিছু বিচিত্র। ১৯০৭ সনের জুন মাসে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি কায়েম হ'ল। তার সঙ্গে-সঙ্গেই জেলার ভেতর ঐতিহাসিক গবেষণার ব্যবস্থা করি। স্বদেশী-যুগে "ঐতিহাসিক অনুসন্ধান" শব্দটার ইজ্জৎ ছিল খুব বেশী। মালদহের সদরে ও পল্লীতে বৈশাখ মাসে শিবপূজার ধুম পড়ে। সেই উপলক্ষে তিনদিন চলে নাচ-গান-বাজনা। একদিন রাস্তায়-রাস্তায় সঙের মিছিল। সেই মিছিলটা নাচ-গান-বাজনার হৈ-হৈ আর লাফালাফি ছাড়া আর কিছু নয়। পূজাই বল্, উৎসবই বল্, নাচানাচিই বল্ আর লাফালাফিই বল্—এ সবের সার্বজনিক নাম গম্ভীরা।

জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনকে আমি "জনসাধারণের আন্দোলন" মনে কর্‌তাম। স্বদেশী-স্বরাজ ইত্যাদি বঙ্গ-বিপ্লবের আন্দোলন আমার চিন্তায় ছিল "গণ"-শক্তির অভিব্যক্তি। এর ফলে নিরক্ষর ও গরীবের উন্নতি আশা কর্‌তাম। ছেলেবেলা থেকেই দেখ্‌তাম গম্ভীরা বারোআরী জিনিষ। কাজেই এই সার্বজনিক গম্ভীরার ইতিহাস লেখাবার জন্য বাতিক লেগে গেল। সেপ্টেম্বর মাসে "মালদহ সমাচার" পত্রিকায় পঁচিশ টাকার পুরস্কার ঘোষণা ক'রে দিলাম। বছর-খানেকের ভেতর এক প্রকাণ্ড লেখা এসে হাজির হ'লো।

লেখক—প্রবন্ধ-লেখকের নাম কী?

সরকার—হরিদাস পালিত। পেশায় তিনি ডাক্তার। মালদহ জেলার নদী-জঙ্গল-খামার-পুকুর সবই তাঁর তন্ন-তন্ন ক'রে দেখা আছে। "ছত্রিশ জাতের" খবর তিনি রাখেন। লোকটা

বাংলা পুঁথি সম্বন্ধে যারপরনাই ওয়াকিব্-হাল। হাতের লেখা পুঁথি পড়্বার ক্ষমতা তাঁর অসীম।

লেখক—প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কিছু বল্বেন?

সরকার—প্রবন্ধটা হাতে এলো (১৯০৮)। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সেটা ছেপে দিলেন (১৯০৯)। বুঝ্লাম,—মালটা নেহাৎ ছেলেখেলার সামগ্রী নয়। হরিদাস পালিতকে মালদহ্ জাতীয় শিক্ষা সমিতির স্থায়ী "অনুসন্ধানকারী" বা গবেষক বাহাল করা গেল। তারপর প্রবন্ধটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে একটা বই করা হ'লো। "আদ্যের গম্ভীরা" নামে বই প্রকাশিত হ'লো (১৯১২)। ব্রজেন শীল, আশুতোষ, গুরুদাস, বিজয় মজুমদার, শরৎ রায় (রাঁচি), হীরেন দত্ত, দীনেশ সেন, নগেন বসু (বিশ্বকোষ), সারদা মিত্র ইত্যাদি পণ্ডিতেরা এই বইয়ের তারিফ্ ক'রেছিলেন। হরিদাস পালিতের মাল সামাজিক নৃতত্ত্বের অন্তর্গত। সেকালে ঐ ধরণের বই বেশী ছিল না।

লেখক—হরিদাস পালিতের আর কোন রচনা আছে?

সরকার—বাংলা ভাষা, জাতি, লোকাচার, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পরবর্তী কালে হরিদাস বাবুর অনেক রচনা রংপুর সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, "কায়স্থ-সমাজ", "আর্থিক উন্নতি" ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছে। একখানা নতুন বইয়ের নাম "বাংলা ও সংস্কৃত ধাতুর গোড়া এক" (১৯৩৭)। অমূল্য বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত "বঙ্গীয় মহাকোষে" তাঁর কয়েকটা রচনা আছে। আজকাল ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের ঘরে পুঁথি-বিভাগের কাজে মোতায়েন আছেন।

সেকালে আশুতোষের সঙ্গে (পৃঃ ২২৩) পালিতের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর, দীনেশ সেন ইত্যাদি পণ্ডিতগণের সঙ্গে ও হরিদাস বাবুর যোগাযোগ কায়েম ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল। তখন তিনি মালদহে থাক্তেন। কলিগ্রামের জাতীয় বিদ্যালয়ে কৃষ্ণচরণ সরকার ও নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী সঙ্গে একত্রে কাজ কর্তেন (১৯১০-১৫)।

লেখক—"আদ্যের গম্ভীরা"র সঙ্গে "ফোক-এলিমেন্ট"-বইয়ের যোগ কোথায়?

সরকার—"আদ্যের গম্ভীরা"র ভেতর জনসাধারণের জীবন বিষয়ক বিস্তর তথ্য আছে। যা চেয়েছিলাম তাই পাওয়া গিয়েছিল। লোক-সাহিত্য, লোক-প্রবাদ, লোক-গীতি, লোক-শিল্প, লোকাচার, লোক-নীতি, লোক-নাট্য, লোক-নৃত্য ইত্যাদি ছাড়া এই রচনার ভেতর আর কিছু নেই। ১৯০৮-১০ সনে আমি ইয়োরোপীয় লোক-সাহিত্য, লোক-নাট্য, লোক-নৃত্য ইত্যাদির চর্চা কর্তাম। সেই আলোচনায় প্রাচীন গ্রীক মালও থাক্ত আর মধ্যযুগের ইংরেজি মালও থাক্ত। ঘটনাচক্রে সেই সময়ে জার্মাণ সাহিত্যের ইতিহাস হার্ডারের (১৭৪৪-১৮০৩) সঙ্গে মোলাকাৎ। হার্ডার ছিলেন "ফোল্ক্" দর্শনের ঋষি। জনসাধারণের আত্মা, জাতিগত চেতনা, জাতীয় চিত্ত ইত্যাদি জিনিষ তিনি দেখ্তে পেতেন লোক-সাহিত্যে, লোক-শিল্পে, লোকাচারে, লোক-সঙ্গীতে। (পৃঃ ৮০-৮১)

লেখক—স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেখ্ছি আপনি বিদেশী সংস্কৃতি নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি কর্তেন?

সরকার—সেই সময়ে আমার "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা" সাহিত্য-পরিষদের অন্তর্গত হ'য়ে বেরুচ্ছিল (১৯১০)। কাজেই গ্রীক্ প্রীতি। তা ছাড়া ইংরেজ লেখক চেম্বার্স-প্রণীত "মিডীভ্যাল ষ্টেজ" (মধ্যযুগের নাট্য-সাহিত্য) বইয়ের দুই খণ্ডে মস্‌গুল্ ছিলাম।

জার্মাণ সাহিত্যের ইতিহাসে সেই আমার অ-আ-ক-খ। অবশ্য জার্মাণ ভাষায় তখনো হাতে খড়ি হয় নি। তখন আমার বয়স বছর তেইশেক।

লেখক—আপনি জার্মাণ সুরু কর্‌লেন কবে? কোথায়?

সরকার—জার্মাণ শিখি অনেকদিন পর,—আমেরিকায় ১৯১৭ সনে। তখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল লাইব্রেরিতে ব'সে "হিন্দু অ্যাচীভ্‌মেন্ট্‌স্ ইন একজ্যাক্ট সায়েন্স" (হিন্দু জাতির বিজ্ঞান-চর্চা) নামক ছোট্ট বই তৈরি কর্‌ছি।

লেখক—এই বিদেশী সংস্কৃতি-চর্চার সঙ্গে মালদহের "বারোআরী" গম্ভীরাকে জুড়ে, দিলেন কী ক'রে?

সরকার—মানুষের মগজটার খেয়াল বুঝা ভারী কঠিন। দেখ্‌লাম,—১৯০৭ সনে যে-ধরণের অনুসন্ধান-গবেষণার সূত্রপাত ক'রেছি, সেই ধরণের কাজের জন্মদাতা জার্মাণ বাচ্চা হার্ডার। আর হার্ডারের পথে চ'লে দুনিয়ার বহুসংখ্যক জাত্ স্বদেশী-স্বরাজ-স্বাধীনতার কেল্লা দখল ক'র্‌তে পেরেছে। কাজেই "লোক-চর্চা" জীবনে আরও চেপে বস্‌লো। "ফোক্" (জার্মাণ ফোল্‌কের ইংরেজি) বা "লোক" একটা পারিভাষিকে দাঁড়িয়ে গেল। "আদ্যের গম্ভীরা" বইয়ের ভূমিকায় এই "লোক" পারিভাষিকের ছায়া আছে। মনে হ'তে লাগ্‌ল,—এই ধরণের ইংরেজি রচনা থাক্‌লে ভারতের সর্বত্র "লোক-আন্দোলন" সুরু হ'তে পার্‌বে। কাজেই "আদ্যের গম্ভীরা"'র মালটা ইংরেজিতে দাঁড় করাবার খেয়াল পেকে উঠ্‌লো।

লেখক—শেষ পর্যন্ত কী হ'ল?

সরকার—দেখ্‌তেই পাচ্ছিস,—"ফোক" নামওয়ালা ইংরেজি বই। ১৯১৪ সনের এপ্রিল মাসে কাশীর "ভাইয়া" শিবপ্রসাদ গুপ্ত'র সঙ্গে বোম্বাইয়ের ফরাসী জাহাজে সওয়ারি হই। সেই সময়ে বাক্‌স'র ভেতর ছিল দুই পাণ্ডুলিপি। একটা হচ্ছে ব্রজেন শীলের সেই "পজিটিভ সায়েন্সেজ" (পৃঃ ৫৩)। আর একটা এই "আদ্যের গম্ভীরা"'য় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি রচনা। দুটোই লণ্ডনে লংম্যান্‌স্ কোম্পানীকে প্রকাশের জন্য দিই,—একই দিন। ব্রজেন শীলের বই বেরুলো ১৯১৫ সনে। আমারটা এলো ১৯১৭ সনে বেরিয়ে। নাম হ'ল "দি ফোক্ এলিমেন্ট ইন হিন্দু কালচার।" "আদ্যের গম্ভীরা"'র ভেতর যে-সব মাল আছে তা ছাড়া নতুন তথ্যও ঢুকিয়েছি। অধিকন্তু টীকা-টিপ্পনী, ব্যাখ্যা, সমালোচনা ইত্যাদি তো আছেই।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, "ফোক্-এলিমেন্ট"-বইয়ের ফল বাঙালী সমাজের ভেতর পাওয়া গেছে?

সরকার—দেশের ভেতরকার কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনকে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা আন্দোলনের কার্য-ফল সমঝে' রাখা আহাম্মুকি। কিন্তু বাংলাদেশে আর গোটা ভারতে সামাজিক নৃতত্ত্বের চর্চা বেশ চল্‌ছে। শরৎ রায়ের "ম্যান্ ইন্ ইণ্ডিয়া" (ভারতের মানুষ) পত্রিকা (রাঁচি) তার সাক্ষী। অধিকন্তু বারোআরী-উৎসব, সার্বজনি দুর্গা পূজা, গণশক্তি বা জনসাধারণের আন্দোলন, মফঃস্বলের বাণী, সমাজ-তন্ত্রের (সোশ্যালিজ্‌মের) আবহাওয়া,—সব-কিছুই একালে গুল্‌দার। এসবের ভেতর কিঞ্চিৎ-কিছু দস্তুল যে হরিদাস পালিতের "আদ্যের গম্ভীরা" জোগায় নি,—তা কে বল্‌তে পারে? গুরুসদয় দত্ত "ফোক্-এলিমেণ্ট" বইটাতে এক-আধ কাঁচ্চা হদিশ পেয়েছিলেন,—নিজেই ব'লেছেন (পৃঃ ২৩৯)। অন্যান্য অনেক-কিছু—যার যেমন মর্জি আন্দাজ কর্‌তে অধিকারী।

গম্ভীরার সামাজিক মূল্য

লেখক—বাঙালী সমাজের তো অনেক অনুষ্ঠানই সার্বজনিক। আপনি মালদহের গম্ভীরাকে গবেষণার বস্তু বেছে নিলেন কেন?

সরকার—জন্ম আমার মালদহের মুকদুমপুরে। বছর নয়-দশ থেকে বছর তের-চোদ্দ পর্যন্ত ছেলেবেলার পুরাপুরি বৎসর পাঁচেক মালদহের পুড়াটুলি পাড়ায় কেটেছিল (১৮৯৬-১৯০০)। বাড়ীর কাছেই ছিল একটা জামগাছ। আর জামতলায় অনুষ্ঠিত হ'তো গম্ভীরার পূজা-পার্বণ, নাচানাচি আর গান-বাজনা। পাড়ার লোকেরা সেটাকে বল্‌তো জামতল্লীর গম্ভীরা। ফি বছর ঢাকে ঘা পড়্‌বামাত্রই ঘর থেকে ছুটে বেরুতাম। আর পাড়ার চুনিয়া, নুনিয়া, কামার, কুমোর, তেলি, পোদ্দার, শাউ ইত্যাদি "ছত্রিশ জাতে"র ছোঁড়াদের সঙ্গে লাগিয়ে দিতাম গুল্‌তান। তার সঙ্গে জড়ানো থাক্‌তো একটু-আধটু লাফালাফি, নাচানাচি,—কম্‌-সে-কম হুড়াহুড়ি, দৌড়-ঝাঁপ।

লেখক—এই গুল্‌তান থেকেই গম্ভীরা-গবেষণার সুরু নাকি?

সরকার—অবিকল তাই। এই বারোআরি-তলায় যে নাচ-গান-বাজনা দেখেছি তাতেই নাট্য-কাব্য-নৃত্য-সুকুমার শিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানের সূত্রপাত। জীবনে দুনিয়ার হরেক-রকম নাচ-গান-বাজনার আবহাওয়ায় প'ড়েছি। আর আজ নিজ ঘরেই বেঠোফেন, শুবার্ট, ষ্ট্রাউস আর লেহারের রাগ-রাগিণীর ফোআরা ছুট্‌ছে। কিন্তু সেই গম্ভীরার নাচ-গান-বাজনার সঙ্গেই গেঁথে যাচ্ছে এই সব নয়া-নয়া তাল-মান-লয়। গম্ভীরা অমর,—গম্ভীরাই জীবনের আসল বনিয়াদ।

লেখক—পুড়াটুলির গম্ভীরা থেকে আপনি আর-কিছু পেয়েছেন?

সরকার—জামতল্লীর গম্ভীরাতে যে-সব লোকজন দেখেছি সেই সব লোকজনের সঙ্গে তুলনা ক'রেই অন্যান্য লোকজনকে চিনেছি। গম্ভীরার লোকজনের জুড়িদারই পেয়েছি দুনিয়ার নানা পল্লী-শহরে। যে-সব রক্তমাংসের মানুষ জাপানে, চীনে, মিশরে আর ইয়োরামেরিকায় ছুঁয়েছি তারা সবাই মনে হ'য়েছে পুড়াটুলির বারোআরি-তলার লোক-জনেরই মাস্‌তুত ভাই।

গম্ভীরার আড্ডাধারীদের চোখেই দেখেছি গোটা জগৎ। আর-কোনো চোখ তো ছিল না। গম্ভীরায় নাচানাচি যে-চোখে দেখেছি সেই-চোখেরই বিকাশ হ'য়েছে পরবর্তী কালের দেখা-শুনায়। সে-চোখ যে আজও র'য়েছে।

লেখক—গম্ভীরার সামাজিক মূল্য কিরূপ?

সরকার—একালে গণ-তন্ত্র বকি। সেই গণতন্ত্রই জীবনে প্রথম চেখেছি জামতল্লীর গম্ভীরার শাসন-কায়দায়। আজকাল সমাজ-তন্ত্রও কপ্‌চাই। সেই সমাজ-তন্ত্রের দম্ভল জীবনে প্রথম প্রবেশ ক'রেছিল,—চুনিয়া-নুনিয়া-পাঝ্‌রা-কাঁসারি ইত্যাদি জাতীয় ভাইদের সঙ্গে নাচানাচি আর লাফালাফির আবেষ্টনে।

লেখক—গম্ভীরা ঠিক কেন গবেষণার বস্তু হ'লো?

সরকার—১৯০৫-০৭ সনের ব্যক্তিত্বের ভেতর খুব-জবরদস্ত্‌ আধ্যাত্মিক শক্তিই ছিল পুড়াটুলির বারোআরি-তলা আর জামতল্লীর গম্ভীরা। কাজেই মালদহের তরফ হ'তে গবেষণার বস্তু গম্ভীরার চেয়ে আর কোনটাই বা বড় বিবেচিত হ'তে পারে?

লেখক—ছেলেবেলার অভিজ্ঞতাকে আপনি খুব-বেশী মূল্য দিচ্ছেন না কি?

সরকার—তা হ'তে পারে। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটা কথা বল্‌তে চাই। ১৯১০ সনে "ফোক-এলিমেণ্ট" বইটা বেরুলো। তখন আমি আমেরিকার হার্ভার্ডে। তারপর ইয়োরামেরিকার নানা দেশের বড়-বড় লাইব্রেরিতে এই বইয়ের এক-একটা কপি দেখেছি। যখনই দেখেছি, বুকটা চেঁড়ে উঠেছে ; আর তখনই পেয়েছি জীবনের বিপুল ধাক্কা। ভেবেছি,—এই আমার জামতল্লীর গম্ভীরার দিগ্‌বিজয়। মনে হ'য়েছে,—এই আমার পুড়াটুলির দিগ্‌বিজয়। কল্পনা ক'রেছি,—এই আমার মালদহের দিগ্‌বিজয়,—আমার চুনিয়া-নুনিয়া ভাইদের দিগ্‌বিজয়।

লেখক—এই ধরণের দিগ্‌বিজয় কল্পনা করার কারণ কী?

সরকার—ছেলেবেলার অভিজ্ঞতার কেন্দ্রস্থলে ছিল মালদহের গম্ভীরা। সেই-গম্ভীরা-বিষয়ক বইয়ের সঙ্গে আমার নাম জড়ানো। সেই-বই প্রকাশিত হ'লো লণ্ডনে। আর সেই-বই দেখ্‌ছি নিজ চোখে নিউ-ইয়র্ক, প্যারিস্ বার্লিন, লণ্ডনের সেরা-সেরা গ্রন্থাগারে। এর চেয়ে বেশী আনন্দ জীবনে আর-কোনো কাজ থেকে পেয়েছি কি না সন্দেহ। খাঁটি সত্যি কথা।

বোধ হয় এটা দুর্বলতা। কী কর্‌বো বল্? গরীব আর মুখ্‌খু ব'লেই হয়ত এইসব ছোট-খাটো চিজ্ নিয়ে মাতামাতি করি। পয়সাওয়ালা আর পণ্ডিত মানুষ হ'লে হয়ত লাফালাফি কর্‌বার উপযুক্ত অনেক বড়-বড় জিনিষ পেতাম।

মেয়েদের পুরুষ-সাম্য

১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—আজকাল দেশে তো অনেক রকমের আন্দোলন চল্‌ছে। এই সবই কি বঙ্গ-বিপ্লবের সময়ে সুরু হয়েছে?

সরকার—অনেকগুলার জন্ম সেই সময়ে। সব ক'টার নয়।

লেখক—কয়েকটার নাম করতে পারেন যা বঙ্গ-বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত নয়? (পৃঃ ১৯৯-২০১, ২০৬, ২০৮, ২৩৪)

সরকার—আজকাল মেয়েদের আন্দোলন চল্‌ছে। ১৯০৫-১৪ সনের স্বদেশী আন্দোলনে এর সূত্রপাত নয়। তখনকার দিনে দু'একজন মেয়ের ছায়া হয়ত কোনো-কোনো সভায় বা সার্বজনিক প্রতিষ্ঠানে দেখা যেত। তাকে মেয়েদের "আন্দোলন" বল্‌তে পারি না। ব্রাহ্ম সমাজের কাজের ফলেও একটা যথার্থ মেয়ে-আন্দোলন দেখা দেয় নি। বঙ্গ-বিপ্লব সোজাসুজি পুরুষের আন্দোলন ছিল। স্ত্রী-স্বাধীনতার সঙ্গে তার কোনো সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল না। আমি এই স্বাধীনতাকে বলি মেয়েজাতির "পুরুষ-সাম্য"। একে "নারীত্বের" আন্দোলন বলা যেতে পারে। ইংরেজিতে নাম দিয়েছি 'ম্যাস্কুলিনিজেশন"। পুরুষরা যা-কিছু করে মেয়েরাও তার সব-কিছুই কর্‌তে সমর্থ কর্মক্ষমতায়, মুড়োর শক্তিতে, চরিত্র-বলে মেয়েতে-পুরুষে কোনো তফাৎ নেই। এই হ'লো আমার মতে মেয়ে-আন্দোলনের আসল কথা।

("মজুর-আন্দোলন ও সোশ্যালিজ্‌ম্" দ্রষ্টব্য)

লেখক—আপনি বাংলা দেশে স্ত্রীজাতির পুরুষ-সাম্য আজকাল খুব বেশী দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—"খুব-বেশী" নয়। তবে ১৯০৫-১৪ সনের তুলনায় বেশ-কিছু বটে। আর ১৮৮৫-৯৫ যুগের মাপে অনেক-কিছু সন্দেহ নাই। এসব আপেক্ষিক বিচারের কথা। "ডোজ" বা মাত্রার উনিশ-বিশ বুঝতে হবে।

লেখক—"ম্যাস্কুলিনিজেশন" বা মেয়েদের পুরুষ-সাম্য সম্বন্ধে দু-একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—মেয়েরা সরকারী আইন-সভায় গিয়ে ব'সেছে। পুরুষের সঙ্গে সমানে-সমানে কাজ চালাচ্ছে। মেয়েরা রাষ্ট্রিক কাজের জন্য জেলে যাচ্ছে,—অনেক দিন পর্যন্ত জেল খাট্ছে। মেয়েরা সার্বজনিক সভায় আর রাস্তার মিছিলে নেতৃত্ব ক'রছে। মেয়েদের জন্য ইস্কুল হ'য়েছে অনেক—কলেজও হ'য়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ছে ছেলেদের সঙ্গে বেশ-কতকগুলা মেয়ে। মেয়েরা চাক্‌রি কর্‌ছে,—টাকা রোজগার কর্‌ছে। শুধু সখের রোজগার নয়। মেয়েদের রোজগারের ওপর বাপ-মা খেয়ে বাঁচ্ছে। মেয়েরা রোজগার ক'রে ভাই-বোন্‌কে ইস্কুল-কলেজে পড়াচ্ছে।

এই সব হ'চ্ছে মেয়েদের পুরুষ-সাম্য। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে এ-সব দৃশ্য দেখা যেত না। এক-আধটা হয়ত নজরে পড়্তো। কিন্তু গণ্ডা-গণ্ডায়, ডজনে-ডজনে, এমন কি শ'য়ে-শ'য়ে মেয়েদের এই-সব নং -ঢঙের কৃতিত্ব হালের জিনিষ।

গুরুসদয় দত্ত'র "সরোজনলিনী মহিলা-সমিতি"গুলা জেলায়-জেলায় অনেক মেয়ের অন্নসংস্থানে সুবিধা ক'রে দিচ্ছে। কল্‌কাতায়ও প্রধান কর্মকেন্দ্রে বেশ-কিছু কাজ হচ্ছে। তা'ছাড়া মেয়েদের ক্লাব, সমিতি, সঙ্ঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও অল্প-বিস্তর দেখা দিয়েছে। এই সবে মেয়েদের আত্মশক্তি ফুটে উঠ্ছে। পুরুষ-সাম্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

লেখক—নারীত্ব বা মেয়েদের পুরুষ-সাম্য কবে সুরু হ'য়েছে আপনি মনে করেন?

সরকার—"আন্দোলন" হিসাবে মেয়েদের পুরুষ-সাম্য সুরু হ'য়েছে বোধ হয় ১৯৩০-৩১ সনের রাষ্ট্রিক "অসহযোগ"-আন্দোলনে। তখন আমি দ্বিতীয়বার বিদেশে। বোধ হয় অসহযোগ-আন্দোলনে মেয়েদের জেলে-যাওয়াই পুরুষ-সাম্যের আন্দোলন পায়দা করেছে। আমি ১৯৩১ সনের শেষে ফিরে এসে প্রথম দেখি,—ট্রামে-বাসে "মেয়ের দল", রাস্তায়-ঘাটে "মেয়ের দল", বিশ্ববিদ্যালয়ে "মেয়ের দল"। ১৯২৫ সনের শেষে প্রথমবার বিদেশ থেকে ফির্‌বার পর এই সব দৃশ্য দেখিনি। এই সকল আবহাওয়ায় বা কর্মক্ষেত্রে তখন "দলে-দলে" মেয়েদের দেখা যেত না। জেনে রাখা ভাল যে, ১৯৩১-এর পরবর্তী মেয়ে-আন্দোলনটা ব্রাহ্ম সমাজের মেয়ে-আন্দোলনের ভাই-বোন্ নয়। এটা ছত্রিশ জাতের বাঙালী নরনারীর সার্বজনিক জীবন-স্পন্দন।

লেখক—আজকালকার মেয়ে-আন্দোলনের বিশেষত্ব কী?

সরকার—কোনো জাতের বা সম্প্রদায়ের ভেতর এটা আবদ্ধ নয়। তা ছাড়া এটা খাঁটি রাষ্ট্রিক ও আর্থিক আন্দোলন। মেয়েদের গোটা মনুষ্যত্ব নয়া গড়ন পেতে চ'লেছে। মানুষ হিসাবে মেয়েরা নতুন ব্যক্তিত্ব লাভ কর্‌ছে। পুরুষরা যেমন মানুষ, মেয়েরাও ঠিক তেমনি মানুষ,—এই খেয়াল অনুসারে হাজার-হাজার পরিবারে মেয়েরা আর পুরুষেরাও জীবন গ'ড়ে তুল্‌ছে। খেয়ালটা আজও সব ক্ষেত্রেই সজ্ঞান নয়। কিন্তু বাঙালী জাতের মেজাজটায় এই খেয়াল পাকা ঘর ক'রে বস্‌ছে।

লেখক—আপনি এই ধরণের নারীত্ব বা মেয়েদের পুরুষ-সাম্য পছন্দ করেন?

সরকার—হাঁ, খুব বেশী। আমি একে অন্যতম নয়া নীতির ইজ্জৎ দিতে অভ্যস্ত। একটা

নতুন পারিবারিক নীতি গজাচ্ছে। নর-নারীর ভেতর একটা নবীন আধ্যাত্মিকতা দেখা দিচ্ছে। যারপরনাই আনন্দের কথা।

লেখক—এতে আনন্দের কী আছে?

সরকার—মেয়েরা এতদিন খাওয়া-পরা সম্বন্ধে পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে থাক্‌তো। বিয়ে করাটাই ছিল তাদের ভাত-কাপড়ের একমাত্র সম্বল বিধবা হ'লে তারা গতিহীন হ'তো। এই কারণে পুরুষেরা চব্বিশ ঘণ্টা মা-বোন-স্ত্রী-মেয়েদের ভাবনায় অস্থির থাক্‌তো। কোনো সৎসাহসের কাজে মেজাজ লাগাতে পার্‌তো না। ঝুঁকি পূর্ণ কারবার পুরুষদের প্রায় অজ্ঞাত ছিল। পুরুষেরা কাপুরুষে পরিণত হচ্ছিল। মেয়েরা পুরুষ-সাম্যের প্রভাবে আর্থিক হিসাবে স্বাধীন হো'ক্‌। তাহ'লে পুরুষেরা হাপ ছেড়ে বাঁচ্‌বে। সাহসের সহিত দুনিয়ায় চলাফেরা কর্‌তে পার্‌বে। মহত্ত্বপূর্ণ কাজে প্রাণ দিতে ভয় পাবে না। মেয়েদের আর্থিক স্বাধীনতা পুরুষদের আধ্যাত্মিক জীবনের মস্ত সহায়।

নয়া পারিবারিক নীতি

লেখক—ডাইভোর্স বা বিবাহ-ভঙ্গ সম্বন্ধে আপনার কী মত? আপনি বিধবাদের পুনর্বিবাহ চান?

সরকার—ভারতবর্ষে ডাইভোর্স যারপরনাই জরুরি। এতে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই মঙ্গল। মেয়েরা পুরুষদেরই মতন যতবার ইচ্ছা বিয়ে কর্‌তে অধিকারী। বিধবাদের পুনর্বিবাহও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই বাঞ্ছনীয়। এ-সব বিষয়ে অবশ্য জোর-জবরদস্তি চলে না। যে-মেয়ে বিবাহ-ভঙ্গ চায় তার পক্ষে বিবাহ-ভঙ্গ সহজ-সাধ্য হওয়া উচিত। যে-বিধবা স্বাধীনভাবে পুনর্বিবাহে রাজি তার পুনর্বিবাহে সাহায্য করা কর্তব্য। যে-মেয়ে একদম বিয়ে কর্‌তে চায় না তার পক্ষে অবিবাহিত থাকা মারাত্মক-কিছু নয়। পুরুষেরা বিবাহ, অবিবাহ, পুনর্বিবাহ ইত্যাদি সম্বন্ধে যা-কিছু করে মেয়েরা এই সব সম্বন্ধে ঠিক সেই সকল কাজের অধিকারী।

লেখক—মেয়েদের পুরুষ-সাম্য হ'তে নয়া পারিবারিক নীতি গজাচ্ছে বল্‌লেন। দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন?

সরকার—ধর্‌,—পঁচিশ-আঠাশ বছরের মেয়ে টাকা রোজগার ক'রে,—মা-বাপ-ভাই-বোনের সংসার চালাচ্ছে। সেই মেয়ের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে মা, বাপ, বা দাদা-ভাইয়েরা হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে অধিকারী নয়। সে নিজের মালিক, নিজের অভিভাবক। এইরূপ রোজগারশীল পরিবার-পালক মেয়েরা (বিবাহিত, বিধবা অথবা অবিবাহিত),—লোকজনের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে—যা-কিছু করে তা-ই নীতি, তা-ই ধর্ম। তাদের কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে উপদেষ্টা সাজ্‌তে যাওয়া হাম্‌বড়ামি ছাড়া আর কিছুই নয়। কর্তামি চালানো চরম ধৃষ্টতা। এরা অবোধ-বালিকা নয়। ঘোমটার আধ্যাত্মিকতা এদের কাছে কপ্‌চানো লজ্জার কথা। বাপ্‌-মারা চোখ বদ্‌লাতে সুরু করুন।

একেই বলি নয়া পারিবারিক নীতি। এই মত বাঙালী সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। বর্তমানে অতি সামান্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে।

লেখক—যা করে তা-ই নীতি, তা-ই ধর্ম। এ কথার মানে কী?

সরকার—পুরুষদের সম্বন্ধে যে-মানে, মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই-মানে। তফাৎ-কিছু

নেই। পুরুষের বেলায় যে নীতি বা ধর্ম, মেয়ের বেলায়ও ঠিক তাই। নতুন-কিছু বল্‌ছি না। ভাল-মন্দ'র কথা তুল্‌ছি না।

লেখক—এই সব মত বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে বাঙালী সমাজে ছিল কি? ডন সোসাইটিতে কিরূপ মত ছিল?

সরকার—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে বাংলার নরনারী সাধারণতঃ এই সব মতের চরম বিরোধী ছিল। ডন-সোসাইটিতে এই সব বিষয় আলোচিত হ'ত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তার আবহাওয়া এই সব মতের স্বপক্ষে ছিল না। আমিও ১৯০৫-১৪ সনের যুগে দরকার হ'লে এই সব মতের বিরুদ্ধেই পাঁতি দিতাম। ব্রাহ্মরা এই মত খানিকটা বরদাস্ত ক'র্‌তে পার্‌তো।

লেখক—আপনি আজ যে-সব কথা বল্‌ছেন তার সূত্রপাত কবে?

সরকার—ইয়োরামেরিকায় আর জাপানে। বিদেশী সমাজে বার-চোদ্দ বছর কাটাবার ফলে আমি নিজের মগজকে নল-নল্‌চে বদ্‌লাবার মতন ব'দ্‌লে ফেলেছি। ইয়োরামেরিকান আর জাপানী নরনারীর সমাজে এই সকল বিবাহ-ভঙ্গ, অবিবাহ, বিধবা পুনর্বিবাহ বেশ-কিছু চলে। তাতে মোটের উপর তাদের ক্ষতি হয় নি। ভারতীয় নরনারীর চেয়ে তারা সামাজিক সুনীতিতে ও আধ্যাত্মিকতায় খাটো নয়। এই সব নিজের চোখে দেখেছি। আর বুঝেছি যে, ১৯০৫-১৪ সনের যুগে আমরা গোঁড়া বা প্রাচীনপন্থী হিন্দুভাবে মানুষের সুখ-দুঃখ মানুষের কলিজা দিয়ে,—মানুষের চোখ দিয়ে,—দেখ্‌তাম না।

লেখক—আপনি বর্তমানে যে-ধরণের মত প্রচার কর্‌ছেন তার প্রতিনিধি বাংলা দেশে আর-কাউকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন? আপনার কোন্ বইয়ে এসব কথা পাবো?

সরকার—"ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউন্‌স" বইয়ে (১৯৪১) বিস্তৃত আলোচনা ক'রেছি। মনে হচ্ছে যেন "আনন্দবাজার পত্রিকা"র সাপ্তাহিক মেয়ে-মজলিশে আমার কথাগুলার খানিকটা জুড়িদার পাচ্ছি। মেয়েরাই কেহ কেহ এই পুরুষ-সাম্যের স্বপক্ষে তথ্য ও যুক্তি জোগাচ্ছে। একজন মেয়ে-অধ্যাপকের নামও কর্‌তে পারি। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের শান্তিসুধা ঘোষ তাঁর "নারী" বইয়ে (১৯৪০) মেয়েদের পুরুষ-সাম্য, নারীত্ব, স্ত্রী-স্বাধীনতা ইত্যাদি জিনিষ বেশ বিচক্ষণভাবে আলোচনা ক'রেছেন।

এঁদের সকলেই আমার মতে সায় দেবেন কিনা বল্‌তে পারি না। বোধ হয় অনেকেই এখনো রাজি হবেন না। আমি চরমভাবে কথা ব'লে যাচ্ছি। খোলাখুলি আমার স্বপক্ষে মত দেওয়া সোজা কথা নয়। প্রাণে-প্রাণে হাজার-হাজার স্ত্রী-পুরুষ আমার দিকে র'য়েছে।

লেখক—আপনি মেয়েদের পুরুষ-সাম্য উপলক্ষে দু-একবার ব্রাহ্ম সমাজের নাম ক'রেছেন। এই সম্বন্ধে আর কিছু বল্‌বেন?

সরকার—বলেছি যে,—১৯৩০-৩১ সনের পরবর্তী মেয়ে-আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজের "সমাজ-সংস্কার" আন্দোলনের সংগে সংযুক্ত নয়। কিন্তু বাংলার নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন সুরু হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তার প্রবর্তক ব্রাহ্ম সমাজ। কবিদের ভেতর হেম ব্যানার্জি, বিহারী চক্রবর্তী ও নবীন সেন বিবেকানন্দ-যুগের (১৮৯৩-১৯০২) পূর্ববর্তী কালে মেয়েদের পুরুষ-সাম্য প্রচার ক'রেছেন। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্ম-ঘেঁষা সংস্কার-পন্থী হিন্দু। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজের কিম্মৎ খুব বেশী। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে আমরা ব্রাহ্মসমাজের ইজ্জৎ স্বীকার কর্‌তাম না। বোধ হয় ব্রাহ্ম-প্রথাকে নিন্দা করা হ'তো।

মজুর-আন্দোলন ও সোশ্যালিজ্‌ম্

লেখক—আজকাল দেশে আর কোনো আন্দোলন দেখ্‌তে পাচ্ছেন যা বঙ্গ-বিপ্লবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে সংযুক্ত নয়? (পৃঃ ২৪৫)

সরকার—মজুর-আন্দোলন ও সোশ্যালিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বল্‌তে পারি।

("মেয়েদের পুরুষ-সাম্য" দ্রষ্টব্য)

লেখক—কেন? ১৯০৫-১৪ সনের যুগে বাংলাদেশে অথবা ভারতের আর কোথাও মজুর-আন্দোলন আর সোশ্যালিজ্‌ম্ কি ছিল না?

সরকার—না। "আন্দোলন" বল্‌বার উপযুক্ত অবস্থায় মজুর বিষয়ক কোনো কাজ স্বদেশী যুগে বাঙালীর বা অন্যান্য ভারতবাসীর জীবন-বৃত্তান্তে ছিল না। ভারতের অন্যত্র—বিশেষতঃ বোম্বাইয়ে—দুচারজন স্বদেশসেবক মজুর-মঙ্গলের কাজে মেতেছিলেন। সোশ্যাল সার্ভিস্ লীগ (সমাজ সেবা সমিতি) নামক প্রতিষ্ঠান তার সাক্ষী। বাংলাদেশে এই ধরণের কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। এমন কি দুএকজন স্বদেশ-সেবককে ব্যক্তিগত ভাবেও মজুরজীবন-বিষয়ক চিন্তায় বা কর্মে লিপ্ত হ'তে দেখিনি। কম্-সে-কম্ তাঁদের কাজকর্ম উল্লেখযোগ্য আকারে দেখা দেয় নি। এই বিষয়ে অন্যান্য লোকের সঙ্গেও মোলাকাৎ চালিয়ে দেখ্‌বি। হয়তো নতুন-নতুন তথ্য পাওয়া যাবে। (পৃঃ ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ২৩৩)

লেখক—ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় মজুর-কথা আর সোশ্যালিজ্‌ম্ ঠাঁই পেত না কি?

সরকার—না। এমন কি ১৯০১-০৬ সনের গোটা ছাত্র-জীবনে,—প্রেসিডেন্সি কলেজের আবহাওয়ায়,—এসব চিজ্ ছিল না। হিন্দু হষ্টেলের বাসিন্দারূপেও কখনো এসব শব্দ বা বস্তুর সঙ্গে মোলাকাৎ হয় নি। মার্ক্‌সের নাম তখনকার দিনে কোনো টেক্‌স্‌ট-বুকে হয়তো প'ড়ে থাক্‌ব। কিন্তু মার্ক্‌সের দাগ নিজ চিন্তার ওপর পড়েনি। সোশ্যালিজ্‌ম্ শব্দটা অবশ্য ধনবিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে কয়েক পৃষ্ঠায় পেয়েছি। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। মজুর, মজুরি, মজুর-সমিতি ইত্যাদি বিষয়ে টেক্‌স্‌ট-বুকের ভেতর আলোচনা খুব কম থাক্‌তো। সেদিকে নজর পড়্‌ত না বল্‌লেই চলে।

লেখক—আপনি তাহ'লে কবে প্রথম মজুর-আন্দোলনের কথা শুন্‌লেন?

সরকার—পরিষ্কারভাবে বুঝাবার জন্য বল্‌ছি যে, "আন্দোলন" শব্দে অনেকগুলা লোকের অনেকদিনব্যাপী সমবেত কাজ বুঝায়। বিশিষ্ট কোনো লোকের ব্যক্তিগত ও সাময়িক কাজকে আন্দোলনের অন্তর্গত কর্‌তে আমি রাজি নই। ১৯০৫-০৬ সনের বিলাতী-বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে আমি কল্‌কাতায় ধর্মঘট প্রথম দেখি। হাবড়ার বার্ণ কোম্পানীর কুলী-কেরাণীরা ধর্মঘটী হ'য়ে কল্‌কাতার রাস্তায়-রাস্তায় মিছিল ক'রেছিল মনে আছে।

লেখক—ধর্মঘট সম্বন্ধে এই অভিজ্ঞতা কিরূপ মনে হয়েছিল?

সরকার—এই দৃশ্য আমার চোখে নতুন ঠেকেছিল। এর প্রভাবও চিন্তার ওপর প'ড়েছিল। ১৯০৭ সনের জুন মাসে মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির জন্য "বঙ্গে নবযুগের নূতন শিক্ষা" প্রবন্ধে ধর্মঘটের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রেছি। কিন্তু সেই ধর্মঘটে মজুর-আন্দোলনের মূর্তিও দেখিনি অথবা সোশ্যালিজ্‌মের অভিব্যক্তিও তাতে পাইনি। লোকেরা দলবদ্ধ-ভাবে

কাজ করছে। সংঘবদ্ধ কাজের ফলে ওপরওয়ালারা কাবু হচ্ছে। ধর্মঘটের ভেতর এই দুই বাণী পেয়েছিলাম। অধিকন্তু এই বাণীকে মোটের ওপর বিদেশী-বিদ্বেষে মন্তর বলা যেতে পারে। একে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা (ন্যাশন্যালিজ্‌ম্) বলা উচিত। সোশ্যালিজ্‌মের ঝাঁজ অন্য ধরণের। তার ভেতর দেখ্‌তে হবে "শ্রেণী-বিবাদ",—জাতিগত ঐক্য নয়।

স্বদেশীযুগ ও সমাজ-তন্ত্র

লেখক—মজুর-জীবনের সঙ্গে স্বদেশীযুগের জন-নায়কগণের যোগাযোগ আপনি কিরূপ দেখেছেন?

সরকার—সত্যিকার মজুর-জীবন হচ্ছে শিল্প-কারখানা বা ফ্যাক্টরি-কারবারের কুলী-জীবন। ১৯০৫-১৪ সনের বঙ্গ-বিপ্লবের জন-নায়ক-গণের সঙ্গে সত্যিকার মজুর-জীবনের সংশ্রব বোধ হয় ছিল না। বঙ্গ-বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ বা একমাত্র দেশনিষ্ঠ, জাতি-নিষ্ঠ, ন্যাশন্যালিষ্ট-ধর্মী। এর ভেতর শ্রেণী-বিবাদের দর্শন কোনো প্রভাব ছড়াতে পারে নি। বার্ণ্-কোম্পানীর ভেতরকার গণ্ডগোলকে জন-নায়কেরা বিদেশী-বয়কটের অন্তর্গত ক'রে নিতেন। তার ভেতর মজুর বনাম পুঁজিপতি সমস্যা দেখ্‌বার মতন কোনো জন-নায়ক ছিলেন কিনা সন্দেহ। দেশের জনসাধারণকে স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনের ভেতর আন্‌বার অন্যতম উপায় ভাবে ধর্মঘট ইত্যাদি ইজ্জদ্ দেওয়া হ'ত।

লেখক—জনসাধারণকে স্বদেশী ও স্বরাজ আন্দোলনের ভেতর আন্‌বার জন্য আর কোনো প্রণালী অবলম্বিত হ'য়েছিল?

সরকার—জায়গায়-জায়গায় নৈশ পাঠশালা, মজুর-বিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হ'য়েছিল। মালদহ জাতীয় শিক্ষাসমিতির অধীনেই (পৃঃ ২১৫) সদরে ও পাড়াগাঁয়ে গোটা দু-তিনেক নৈশ পাঠশালা খুলেছিলাম (১৯০৭)। অন্যান্য জেলায়ও নৈশ-পাঠশালা কায়েম হ'য়েছিল। কল্‌কাতায় শ্রমজীবী-বিদ্যালয় কায়েম হ'য়েছিল (১৯০৮)। তার সঙ্গে সত্যানন্দ রায় (কর্পোরেশন টীচার্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল), জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী (কর্পোরেশন মিউজিয়ামের কর্মকর্তা), বিধানচন্দ্র রায় (ডাক্তার ও বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলার) ইত্যাদি একালের মনীষীদের যোগ ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় আমার বন্ধু রাধাকমল মুখোপাধ্যায় (লক্ষ্ণৌয়ের সমাজশাস্ত্রী) কয়েকটা নৈশ-পাঠশালা খাড়া ক'রেছিলেন।

লেখক—নৈশ পাঠশালার আবহাওয়ায় সোশ্যালিজ্‌ম্ ছিল কি?

সরকার—না। সমাজ-তন্ত্র অত সোজা চিজ নয়। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানে সত্যিকার মজুর একটাও ছিল না। ছাত্রেরা মুচী, চামার, বাগ্দি, চাষী, জোল্‌হা ইত্যাদি জাতের পরিবার হ'তে আস্‌ত। গরীব মুসলমানদের ছেলেদেরকেও নৈশ-পাঠশালায় নিয়ে এসে লেখাপড়া শেখানো হ'তো। নৈশ-পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতারা কাজগুলাকে শিক্ষকদের নৈতিক চরিত্র-গঠনের সহায় স্বরূপ দেখ্‌তেন। এর ভেতর বড়-জোর সমাজসেবা ও সমাজ-সংস্কারের লক্ষ্য দেখা যেত। জনসাধারণের সঙ্গে মাখামাখি হ'লে জাতীয় ঐক্য গ'ড়ে উঠ্‌বে,—এইরূপ মতিগতি ছিল। এসবকে মজুর-আন্দোলন আর সোশ্যালিজ্‌মের ভেতর ফেলা সম্ভবপর নয়।

লেখক—সমাজসেবাকে আপনি সোশ্যালিজ্‌ম্ (সমাজ-তন্ত্র) বলেন না?

সরকার—না। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্য সেই যুগে খানিকটা সুপরিচিত হ'তে থাকে।

তাও সোশ্যালিজ্‌মের সামিল নয়। সে ছিল দুনিয়ায় সুপরিচিত "দরিদ্র-নারায়ণের" সেবা মাত্র। খাঁটি সমাজ-তন্ত্র জিনিষটা দান-খয়রাতের বা সমাজ-সেবার মামলা নয়।

"বর্তমান জগৎ" ও মজুর-আন্দোলন

লেখক—আপনি তাহ'লে কবে প্রথম ভারতীয় চিন্তায় মার্ক্‌স্ বা সোশ্যালিজ্‌মের আবির্ভাব দেখ্‌লেন?

সরকার—১৯১১ সনে পাঞ্জাবী বিপ্লব-নায়ক হরদয়াল মার্কিণ মুল্লুক থেকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত কল্‌কাতার "মডার্ণ রিভিউ" মাসিকে মার্কস্ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বোধ হয় সেইটাই মার্কস্ বিষয়ক প্রথম ভারতীয় রচনা। কিন্তু তার প্রভাবে ভারতীয় সুধীগণের চিন্তা নতুন দিকে গিয়েছিল কি না বল্‌তে পারি না। বাংলা দেশে তার কোনো চিহ্নোৎ দেখিনি। কম্-সে-কম্ আমি তো ভজিনি। তবে লেখাটাকে নতুন-কিছু ভেবেছিলাম।

লেখক—আপনার সঙ্গে মজুর-আন্দোলন, মার্ক্‌স্ বা সোশ্যালিজ্‌মের যোগাযোগ তাহ'লে প্রথম কায়েম হ'লো কবে?

সরকার—বিলাতে। ১৯১৪ সনের মে-নবেম্বর মাসে। বিলাতী সমাজের আগাগোড়া সর্বত্র মজুর-নিষ্ঠা নজরে প'ড়েছিল। ঘটনাচক্রে সেকালের বিলাতী মজুর-নেতা র‍্যামজে-ম্যাকডোন্যাল্ড বিলাতে আমার অন্যতম পথ-প্রদর্শক ছিলেন। ইংল্যাণ্ড আর আয়ার্ল্যাণ্ডের নানা কেন্দ্রে র‍্যামজে-ম্যাকডোন্যাল্ড আর তাঁর বন্ধুবর্গের সাহচর্যে বিলাত "দেখার" সুযোগ ঘ'টেছিল। কাজেই সোশ্যালিষ্ট চোখ গজাতে সুরু করে।

লেখক—বিলাতী সোশ্যালিজ্‌মের প্রভাব আপনার রচনাবলীর ভেতর পাওয়া যায়?

সরকার—"বর্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "ইংরেজের জন্মভূমি" বইয়ে (১৯১৫) মজুর-আন্দোলন আর সোশ্যালিজ্‌মের ছায়া অতি সুস্পষ্ট। এই বইয়ের অধ্যায়গুলা ১৯১৪-১৫ সনে "গৃহস্থ", "প্রবাসী" ইত্যাদি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। কাজেই মার্ক্‌স্-দর্শনে, মজুর-আন্দোলনে আর সোশ্যালিজ্‌মে আমার সঙ্গে-সঙ্গে বহুসংখ্যক বাঙালী পাঠকের হাতে-খড়ি একত্রে সাধিত হচ্ছিল বলা যেতে পারে।

লেনিন-রাজ

লেখক—মজুর-আন্দোলন ও সোশ্যালিজ্‌মের সঙ্গে ১৯১৪ সনের পর আপনার যোগাযোগ কিরূপ ছিল?

সরকার—যোগাযোগটা চিরকালই আত্মিক মাত্র। আমি কখনো কোনো রাষ্ট্রিক আন্দোলনে অথবা মজুর-সমিতিতে নাম লেখাই নি। যে-ক'টা দেশে গিয়েছি সর্বত্রই অন্যান্য অনেক-কিছুর সঙ্গে এই সবের সন্ধানও নিয়েছি। "বর্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর (১৯১৪-৩৫) হাজার সাড়ে-চার-পাঁচেক পৃষ্ঠার (১৩ খণ্ড) যেখানেই কামড়াবি সেখানেই মজুর, সোশ্যালিজ্‌ম্ আর মার্কস্ ও লেনিনের অল্প-বিস্তর অথবা বেশকিছু চিবুতে হবেই হবে।

লেখক—সোশ্যালিজ্‌মের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে আপনার মত কোনো দিন পুষ্ট হয়েছে

কি?

সরকার—সোশ্যালিজ্‌মের খুব-বড় "ডোজ" গিলেছিলাম ১৯১৭ সনের শেষাশেষি। তখন আমি চীন-জাপান হয়ে মার্কিণ-মুল্লুকে ফিরে এসেছি। রুশিয়ায় চালু হ'লো লেনিন-রাজ। এক হাতে লেনিন রুশিয়ার ভেতর বিপ্লব সুরু কর্‌লেন। আর এক হাতে ইরাণ, আফগানিস্তান আর চীন দেশ থেকে রুশ সাম্রাজ্যের পল্টন ও অন্যান্য বাদশাহীর চিহ্লোৎ সরিয়ে নিলেন। এশিয়াকে সোভিয়েট রুশিয়া স্বাধীন ক'রে দিলে। তখনই মনে হ'লো,—লেনিন মার্কস্‌সেরও পরবর্তী ধাপ। বিংশ শতাব্দীর সত্যিকার যুগাবতার লেনিন। এতদিনে আমি সমাজ-তন্ত্রী হ'লাম (১৯১৭-১৮)।

লেখক—লেনিনকে আপনি যুগাবতার বলেন কেন?

সরকার—লেনিনের এশিয়া-বিষয়ক কাজ না দেখ্‌লে সোশ্যালিজ্‌ম্ বা কমিউনিজ্‌মের গর্তে পড়া সম্ভব হ'তো কি না বলা কঠিন। একমাত্র মার্ক্‌স্‌-প্রবর্তিত শ্রেণী-বিবাদের দর্শন অর্থাৎ মজুর-স্বরাজের নীতি আমাকে ভজাতে পারেনি। মার্ক্‌স্‌-পন্থী শ্রেণী-বিবাদের আর মজুর-স্বাধীনতার যথোচিত ইজ্জদ আমি সর্বদাই দিতে রাজি। (পৃঃ ১৭৪) কিন্তু বিভিন্ন পরাধীন দেশের জাতিগত রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য লেনিনের দরদ আছে। লেনিন-নীতি প্রথম দিন হ'তেই প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে গাঁথা রয়েছে জাতীয় স্বরাজের সঙ্গে। এই দৃশ্যে আমার চিন্তায় যুগান্তর সাধিত হ'য়েছে। মনিব-গোলামের সম্বন্ধে লেনিন যুগান্তর-সাধক।

বাংলায় সোশ্যালিজ্‌ম্‌-নিষ্ঠা

লেখক—"বর্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত অধ্যায় সমূহ ছাড়া আপনি আর কোথাও সোশ্যালিজ্‌ম্‌-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন?

সরকার—১৯১৯ সনের ভার্সাই-সন্ধি সইয়ের সময় ইংরেজিতে একটা প্রবন্ধ লিখি। "লীভিংস অব দি গ্রেট ওয়ার" (মহালড়াই কী রেখে গেল?) নামে সেই প্রবন্ধ "সোশিঅলজি অব রেসেজ" বইয়ে (১৯২২, ১৯৩৯) পাওয়া যায়। তাতে লেনিন-নিষ্ঠার পাকা পরিচয় আছে। ১৯১৮-২০ সনের ইংরেজি ও বাংলা সকল রচনায়ই এই নয়া আধ্যাত্মিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। "প্যারিসে দেশ মাস" বইয়ের অধ্যায়গুলা ১৯২০-২১ সনে লিখিত। তার ভেতরও লেনিন-গীতার জবর প্রশস্তি আছে।

১৯২৩-২৫ সনে মার্ক্‌স্‌-সাহিত্যের দুটা বড়-বড় বই (জার্মাণ ও ফরাসী) বাংলায় তর্জমা ক'রেছি। তর্জমাগুলা প্রথমে কল্‌কাতার নানা মাসিক ও সাপ্তাহিকে বেরোয়। তারপর "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" এবং "ধনদৌলতের রূপান্তর" নামে বইয়ের আকারে বেরিয়েছে। প্রায় শ'-ছয়েক পৃষ্ঠার মাল। সেই যুগে ইংরেজিতে মজুর-জীবন, মজুর-আইন, ব্যাধি-বার্ধক্য-দৈব-বীমা, মজুর-রাজ ইত্যাদি বিষয়ে নানা আলোচনা প্রকাশ ক'রেছি (১৯২১-২৫)।

লেখক—বিদেশ হ'তে ফেরার পর আপনি সমাজতন্ত্র-নিষ্ঠার কোনো পরিচয় দিয়েছেন?

সরকার—হাঁ। সমাজতন্ত্র-নিষ্ঠা সর্বদাই বজায় আছে। তবে একদম নির্দল ভাবে। কোনো রাষ্ট্রিক আন্দোলনেই আমার যোগ নেই। ১৯২৫ সনের পরবর্তী রচনার ভেতর "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" বইয়ের (১৯৩২) প্রবন্ধগুলা সোশ্যালিজ্‌মে ভরপুর। "বাড়্‌তির পথে বাঙালী"ও (১৯৩৪) তাই। "সোশ্যাল ইন্‌শিওর‍্যান্স্‌" (সমাজ-বীমা) নামক বইটা (১৯৩৬)

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "পোলিটিক্যাল ফিলজফির সিন্স ১৯০৫" বইয়ের প্রথম খণ্ডে (১৯২৮) আর দ্বিতীয় খণ্ডের তিন ভাগে (১৯৪২) মজুর-আন্দোলন আর সমাজ-তন্ত্রের নানা তত্ত্ব খুব জোরের সহিতই দেখানো হ'য়েছে।

ব'লে রাখা উচিত যে মার্ক্‌স্‌-প্রচারিত শ্রেণী-বিবাদের দর্শন আমার খানিকটা পছন্দসই বটে। কিন্তু মার্ক্‌সের অর্থনৈতিক অদ্বৈতনিষ্ঠার আমি কট্টর বিরোধী। (পৃঃ ৮০, ১৭৪)

লেখক—বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশ্যালিজমের চর্চা আছে?

সরকার—১৯২৬ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ডাল-ভাতের সম্বন্ধ কায়েম হয়। তখনই ধন-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের তদবিরে মজুর-শ্রেণীর অর্থকথা, আইনকানুন ও সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখাপড়ার ব্যবস্থা কর্‌বার জন্য প্রস্তাব তুলেছি। এই সময়কার এই "মেমোর‍্যাণ্ডাম্‌" বা মন্তব্যের ইস্তাহার দেখ্‌তে পারি "গ্রীটিংস্‌ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" বইয়ে (১৯২৭)। আমার নিত্য-নৈমিত্তিক বকাবকির ভেতর কম্‌সে-কম্‌ আনা-ছয়েক মাল থাকে মজুর-দর্শন ও সমাজতন্ত্র বিষয়ক।

মজুর-আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রের দর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় প্রবেশ ক'রেছে। অবশ্য কোনো রাষ্ট্রিক বা সমাজ্‌তান্ত্রিক দলাদলি আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দিতে কোনো দলাদলি থাকা বাঞ্ছনীয়ও নয়।

লেখক—"আর্থিক উন্নতি"তে মজুর-আন্দোলন ও সোশ্যালিজ্‌মের চর্চা হয়?

সরকার—বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের অবৃত্তিক গবেষকদের দিয়ে এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়েছি অনেক। শিবচন্দ্র দত্ত, সুধাকান্ত দে. রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কামাখ্যাচরণ বসু, মন্মথ নাথ সরকার, পঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্লরতন বিশ্বাস ইত্যাদি গবেষকদের রচনায় মজুর-নিষ্ঠার সাক্ষ্য আছে। আমিও ১৯২৬ সনের "আর্থিক উন্নতি"তে লিখেছি "শিল্প-কারখানায় মজুর-রাজ", আর ১৯৪২ সনে "অথাতো দারিদ্র্য-জিজ্ঞাসা", "মজুরি-বিজ্ঞান", "দারিদ্র্য-দর্শন" ইত্যাদি প্রবন্ধ। "আর্থিক উন্নতি"র সমাজতন্ত্র-নিষ্ঠা বরাবর চ'লেছে।

লেখক—আপনি ইস্কুল-কলেজের ছেলেদের ভেতর মজুর-প্রীতি আর সোশ্যালিজ্‌ম্‌-নিষ্ঠার আন্দোলন পছন্দ করেন?

সরকার—হাঁ। খুব-বেশী পছন্দ করি। এমন কি, আমি চাই যে, ছেলেরা রকমারি মজুর-দলে বা সমাজ-তান্ত্রিক দলে ঢুকে যা'ক। নিজে আমি কোনো দলের লোক নই। কিন্তু কোনো-না-কোনো দলে না ঢুক্‌লে ছেলেদের মাথা পরিষ্কার হবে না। দুনিয়াখানাকে শক্ত মুঠার ভেতর পাকড়াও করার জন্য আবশ্যক দলের ভেতর ঢুকে' কাজে লেগে যাওয়া। আমাদের সেকেলে ভারতীয় গীতা আর একালের বন্দে মাতরম্‌ রক্ষা করা চাই-ই-চাই। তার সঙ্গে জরুরি এক ডোজ মার্ক্‌স আর পাঁচ ডোজ লেনিন। এই পাঁতি-মাফিক গ'ড়ে উঠ্‌বে বা উঠ্‌ছে আমার নয়া বাংলা। বুঝেছিস্‌?

মানব রায় হ'তে সুরেশ ব্যানার্জি

লেখক—বাংলা দেশে মজুর-আন্দোলন ও সোশ্যালিজ্‌মের আবির্ভাব কবে হ'ল?

সরকার—মানব রায় (নরেন ভট্টাচার্য) আর অবনী মুখোপাধ্যায় দুজনে মিলে "ইণ্ডিয়া ইন ট্র্যানজিশন" (পরিবর্তনের পথে ভারতবর্ষ) নামক বই লেখেন (বার্লিন ১৯২২)। এই

বইয়ে মার্ক্‌স্‌-পন্থী ব্যাখ্যা আছে। সেই সময়েই আমেরিকা-প্রবাসী রজনী দাশ বার্লিনে এসে কয়েকখানা মজুর-বিষয়ক বই প্রকাশ করেন। বিদেশ হ'তে আমি ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে কল্‌কাতায় ফিরে এসে দেখি এক নতুন দৃশ্য। জেল-ফের্‌তা ন্যাশন্যালিষ্ট স্বদেশ-সেবকেরা অনেকেই মজুর-বিষয়ক কথা বল্‌ছে। সোশ্যালিজ্‌ম্‌ শব্দটা তাদের সুপরিচিত। "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" আর "ধনদৌলতের রূপান্তর" বইয়ের প্রবন্ধগুলাও তাদের বেশ-জানা। বুঝ্‌লাম,—সমাজতন্ত্রী সাহিত্যে তাদের হাতে খড়ি হ'য়েছে। ১৯২৬ সনে মুজঃফর আহম্মদ আর সৌম্যেন ঠাকুর "লাঙল" আর "গণবাণী" ইত্যাদি সাপ্তাহিক পত্রিকায় মার্ক্‌স্‌-নীতির প্রচার কর্‌তে থাকেন। কিন্তু এই সব লেখালেখিকে আমি খাঁটি মজুর-আন্দোলন বা সোশ্যালিষ্ট আন্দোলন বল্‌ব কি না সন্দেহ। তবে ১৯১৪ সনে দেশত্যাগী হবার সময় এসবের কিছুই ছিল না। তার তুলনায় এই অবস্থা একটা যুগান্তর।

লেখক—খাঁটি মজুর আন্দোলনে আর এই সব লেখালেখিতে প্রভেদ কী?

সরকার—"বর্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলীর বিলাত-খণ্ড (১৯১৪) হ'তে "গণবাণী" সাপ্তাহিক (১৯২৬) পর্যন্ত লেখালেখির প্রায় ষোল-আনাই লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের চিন্তা, আদর্শ বা আকাঙক্ষা মাত্র। এই ধরণের সাহিত্যকে সোশ্যালিজ্‌ম্‌-বিষয়ক লোকশিক্ষার সহায় বিবেচনা করা যেতে পারে। এসবের দ্বারা দেশের ভেতর সার্বজনিক মত গঠন করবার ব্যবস্থা হ'তে পারে। সরকারী আইন তৈরীর কাজের জন্য পথ পরিষ্কার করা যেতে পারে। কিন্তু শ'য়ে-শ'য়ে বা হাজারে-হাজারে সঙ্ঘবদ্ধ মজুরের আন্দোলন আলাদা জিনিষ। আমার বিশ্বাস,—১৯৩০-৩১ সনের পরবর্তী ট্রেড-ইউনিয়ন (মজুর সমিতি) বিষয়ক বাঙালীর কাজকর্মকে মজুর-"আন্দোলন" বলা চল্‌তে পারে। ১৯৩৫ সনের ভারত-শাসন বিষয়ক আইনে মজুরদেরকে স্বতন্ত্র ইজ্জদ দেওয়া হ'য়েছে। এই বৎসরকে বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য বৎসর বলা চলে।

যারা নিজে মজুর বা মজুর-সমিতির নায়ক অথবা যারা রাষ্ট্রিক আন্দোলনে লিপ্ত তারা নিজ-নিজ অভিজ্ঞতা বিবৃত কর্‌লে অনেক নতুন কথা জানা যাবে। মজুর-সেবক ও মজুর-নায়কদের সঙ্গে তোর মোলাকাৎ চালানো উচিত। (পৃঃ ৮০, ১৮৭, ২৩৩, ২৪৮)

লেখক—১৯৩০-৩৫ সনের পূর্ববর্তী মজুর-বিষয়ক বাঙালী চিন্তা ও কাজের কোনো দাম নেই।

সরকার—দাম আছে বৈ কি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সব-কিছুই বঙ্গীয় সমাজতন্ত্রের ও মজুর-আন্দোলনের সূত্রপাতের অন্তর্গত। ১৯২০ সনে সমগ্র ভারতের জন্য মজুর-কংগ্রেস বসে বোম্বাইয়ে। বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলনে সেই কংগ্রেসের দামও কি কম? ১৯২৬ সনে সরকারী আইন জারি হয় ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সম্বন্ধে। তার দামও বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলনে বেশ-কিছু আছে। কতকগুলা কাজের ফলে মজুর-জীবন সম্বন্ধে জননায়ক ও লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের মগজ ও হৃদয় গঠিত হ'য়েছে। আর কতকগুলা কাজের ফলে খাঁটি মজুরদের সঙ্গে মিলে-মিশে তাদেরকে সঙ্ঘবদ্ধ করা হ'য়েছে আর সঙ্ঘবদ্ধতার উপকার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হ'য়েছে। ১৯৩০-৩৫ পর্যন্ত কাজগুলা প্রধানতঃ এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত।

অবশ্য সর্বদাই মনে রাখ্‌তে হবে যে,—"আন্দোলন" শব্দটা আপেক্ষিক। যে-অবস্থানকে "আন্দোলন' বল্‌ছি না তাকেও কখনো-কখনো আন্দোলন বলা সম্ভব। আবার যাকে আন্দোলন বল্‌ছি তাও হয়ত সত্যিকার আন্দোলন নয়। মাপকাঠি অনুসারে আন্দোলনের গুরুত্ব বা

অস্তিত্ব বুঝ্‌তে হবে।

লেখক—আন্দোলনকে "আপেক্ষিক" ব'লে আপনি কী বুঝাতে চাচ্ছেন?

সরকার—চিন্তার বহর ও কর্মের আকার-প্রকার দেখে আন্দোলন শব্দটা কায়েম করা উচিত। কিন্তু এই বহর আর আকার-প্রকার কতখানি হ'লে কোনো চিন্তা বা কর্মকে আন্দোলন বলা যেতে পারে? এ সম্বন্ধে কোনো বাঁধাবাঁধি নেই।

দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাচ্ছি। ১৯৪২ সনে মজুরেরা বাংলাদেশে কিছু-কিছু সঙ্ঘবদ্ধ। তারা মাঝে-মাঝে ধর্মঘটও করে। মজুরদের নেতা কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মজুরেরা নিজেই। লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা তো অনেক ক্ষেত্রে মজুরদের নেতা র'য়েছেই। আজ পর্যন্ত সুরেশ ব্যানার্জি মতন ব্রাহ্মণ ডাক্তার ভারতীয় মজুর-আন্দোলনের সভাপতি। তা ছাড়া মজুর-আইন, সোশ্যালিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌ ইত্যাদি সম্বন্ধে বাংলা ও ইংরেজিতে লেখালেখি আর বকাবকি চ'লেছে উল্লেখযোগ্য রূপে।

কিন্তু তবুও এ-সবকে একটা আন্দোলনের মতন আন্দোলন বলা চলে কি? আমি তো বল্‌তে রাজি নই। কেন? ছয় কোটি বাঙালীর পক্ষে কয়েক হাজার মজুরের এই সব কাজ ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। বিলাতী ও জার্মাণী মাপে বল্‌ছি। জাপানী মাপেও বাঙালীর মজুর-আন্দোলন শোচনীয়। রুশ মাপ তো দেওয়া চল্‌বেই না। এই গেল এক সীমানা,—বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলনের চরম বিকাশের অবস্থা। তাকেও আন্দোলন বলা চলে না।

লেখক—অন্য সীমানায় কী বলা যেতে পারে?

সরকার—১৯২০ সনের বোম্বাইয়ের অনুষ্ঠিত ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসেও বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলনের চিহ্নোৎ ছিল বলা যেতে পারে। ১৯১১ সনে বাঙালী-পরিচালিত "মডার্ণ রিভিউ" পত্রিকায় পাঞ্জাবী হরদয়ালের মার্ক্‌স্‌-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেটাও বঙ্গীয় সোশ্যালিজ্‌ম্‌ আন্দোলনের গৌণ চিহ্নোৎ। ১৯০৫-১৪ সনে বাঙালী স্বদেশ-সেবকগণের প্রতিষ্ঠিত নৈশ-পাঠশালা সমূহকেও বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলনের সাক্ষী বলা চলে। অর্থাৎ দরকার হ'লে নেহাৎ কতকগুলা বাক্য বা ছেলেখেলাকেও আন্দোলন বলা যুক্তিহীন নয়। হয়ত সেগুলাকে মজুর-প্রীতি বা মজুর বোধ বলা উচিত।

সেবাব্রত শশীপদ

লেখক—এইরূপে পেছন দিকে হঠ্‌তে-হঠ্‌তে আপনি কোথায় গিয়ে ঠেক্‌তে চান?

সরকার—বিবেকানন্দ-যুগের (১৮৯৩-১৯০২) ও পূর্ববর্তী কালে। সে-কালেও বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলন ও সমাজতন্ত্র-নিষ্ঠার চিহ্নোৎ আবিষ্কার করা সম্ভব। কম্‌-সে-কম্‌ মজুর-প্রীতি অথবা মজুর-বোধ সেই যুগে সুরু হ'য়েছিল বল্‌তে পারি।

লেখক—সত্যি বল্‌ছেন?

সবকার—হাঁ। ১৯৩২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বরাহনগরে শশীপদ-বিদ্যালয়ে আমাকে একটা বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতি ক'রে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে শুনলাম যে,—সেবাব্রত শশীপদ ব্যানার্জি ১৮৯০-৯৫ সনের যুগে বাংলায় একটা মজুর-সাপ্তাহিক চালাতেন। তাঁর সঙ্গে মজুর সমিতির যোগাযোগ ছিল। ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বের গবেষণায় এই সংবাদটা যারপরনাই চিত্তাকর্ষক। শুনেই আমার তাক্‌ লেগে গেল।

লেখক—কেন? আশ্চর্যের কী আছে?

সরকার—আমার চোখ খুলে গিয়েছিল। যখন-তখন যাকে-তাকে সর্ব-প্রথম বা প্রবর্তক বল্‌বার ইচ্ছা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হ'লো। শশীপদ'র পূর্ববর্তী মজুর-সেবক, মজুর-সাধক, মজুব-নায়ক কোনো বাঙালী ছিল কিনা জানি না। মজুর-প্রীতির বা মজুর-বোধের তরফ থেকে কেশব সেনকে বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলন আর সোশ্যালিজ্‌মের অন্যতম প্রবর্তক বলা উচিত নয় কি?

কেশব সেনের মজুর-প্রীতি

লেখক—আপনি কি বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলন কেশব সেন পর্যন্ত টান্‌তে চাচ্ছেন?

সরকার—খুব জোরের সহিত। সে অনেক দিনের কথা। বিলাত থেকে ফিরে এসেই কেশব সেন ১৮৭২ সনে কল্‌কাতায় "ওয়ার্কিং মেন্‌স্ ইন্‌ষ্টিটিউট" কায়েম করেন। তাতে ছিল মজুর-আন্দোলনের কর্মকেন্দ্র। সমাজ-তন্ত্রের ঝাঁজাল মগজ নিয়ে কেশব সেন বাংলায় ফিরে এসেছিলেন। তার আর এক সাক্ষী পয়সা-পয়সা "সুলভ" সাপ্তাহিকের প্রচার। মজুরদের স্বার্থই তাতে প্রচারিত হ'ত প্রধান ভাবে। জিজ্ঞাসা ক'রে দেখিস্ একালের সার্বজনিক "জ্ঞান্-দা"কে। চিনিস্ না বুঝি? সে হচ্ছে কর্পোরেশন কমার্শ্যাল মিউজিয়ামের জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী। কেশব সেনের মজুর-প্রীতি সম্বন্ধে তাঁর কাছে খবর পাবি।

লেখক—কেশব সেনের "ওয়ার্কিং মেন্‌স্ ইন্‌ষ্টিটিউটে"র কী হ'ল শেষে?

সরকার—হবে আর কী? আমাদের ভারতীয় অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের যা হ'য়ে থাকে তাই হ'লো। কেশব সেনের মজুর-প্রতিষ্ঠানও যথাসময়ে প্রতিষ্ঠান-লীলা সংবরণ কর্‌লো। অনেকদিন কেউ তার টিকি দেখ্‌তে পায় নি। হঠাৎ এল বঙ্গ-বিপ্লব। (পৃঃ ১৯৯) সেই যুগে কেশব সেনের ভক্তদের ভেতর কেউ-কেউ প্রতিষ্ঠানের নামটা জাগিয়ে তুল্‌লো। ১৯০৮ সনের শ্রমজীবী-বিদ্যালয়ের ইংরেজি নাম ছিল "ওয়ার্কিং মেন্‌স্ ইন্‌ষ্টিটিউট"। এই শ্রমজীবী-বিদ্যালয়ের অন্যতম মুরুব্বি ছিলেন আমার প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস ও ধনবিজ্ঞানাধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন। তাঁব কাছে এই অধম "প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা" বইয়ের ভূমিকার জন্য ঋণী। বিনয়েন্দ্রনাথ ছিলেন কেশব সেন-প্রতিষ্ঠিত নববিধানের ব্রাহ্ম। সত্যানন্দ রায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, বিধান রায় ইত্যাদি ১৯০৮ সনের ছোক্‌রারা সকলেই নববিধানের কেশব-ভক্ত। দেখা যাচ্ছে যে, ১৮৭২ সনের চিন্তা বা কাজ শেষ পর্যন্ত ম'লো না। মানুষ মরে যায়,—চিন্তা আর কাজ মরে না।

ভূপেন দত্ত

লেখক—আজকালকার সংস্কৃতি-নায়ক, রাষ্ট্র-নায়ক, মজুর-নায়ক, সমাজতন্ত্র-নায়ক ইত্যাদি শ্রেণীর নেতারা দেখ্‌ছি অনেক সময় অবিবেচকের মতন নিজেকে "সর্বপ্রথম" বা "একমাত্র" বা "সর্বশ্রেষ্ঠ" পথপ্রদর্শক বা কর্মবীররূপে বিবৃত করেন! সামান্য খোঁজ সুরু কর্‌লেই প্রত্যেক জ্ঞানবিজ্ঞানের ও আন্দোলনের সমসাময়িক মনীষী ও কর্মীদের ভেতর

একাধিক বা এমন কি বহুসংখ্যক কৃতী বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া পাঁচ-দশ-বিশ-ত্রিশ বৎসর আগেকার দিনেও প্রায় এই ধরণেরই একাধিক মনীষী ও কর্মীর চিন্তা ও কর্ম স্পর্শ কর্‌তে পারি।

সরকার—যা হ'ক,—এইবার তা হ'লে তুই আমার বহুত্ব-নিষ্ঠার এক ডোজ অমৃতে চুমুক লাগালি। দেখিস্‌,—পরকাল ঝর্‌ঝ'রে না হ'য়ে যায়!

("বিদেশে নাম-করা", ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—বঙ্গীয় সমাজতন্ত্র ও মজুর-আন্দোলন সম্বন্ধে কা'র কাছে খবর পেতে পারি?

সরকার—এইখানে ভূপেন দত্ত'র নাম কর্‌তে চাই। তাঁর সঙ্গে মোলাকাৎ চালালে বঙ্গীয় মজুর-আন্দোলন আর সমাজতন্ত্র-নিষ্ঠার রকমারি খবর পাবি। ভূপেন দত্ত সেকালেরও করিৎকর্মা লোক আর একালেরও করিৎকর্মা লোক। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে ন্যাশন্যালিজম্‌ বা জাতীয়তার আন্দোলনে তাঁর নাম লেখানো ছিল দস্তুর-মতন। আর হালের সমাজ তন্ত্র, সোস্যালিজম্‌ এবং মজুর-নিষ্ঠার সঙ্গেও তাঁর হাতে কলমে যোগাযোগ আছে। তা ছাড়া বৃহত্তম ভারতের জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্র,—দুই ধারাই ভূপেন দত্ত'র নিকট বেশ-কিছু ঋণী।

লেখক—ভূপেন দত্ত কোনো দলের সভ্য কি?

সরকার—হাঁ। সেই জন্যই খাঁটি রাষ্ট্রিক আন্দোলনের আর মজুর-সমিতি-বিষয়ক অনেক কথাই নিরেটভাবে তাঁর জানা আছে। ভূপেন দত্ত দলাদলি বেশ বুঝেন,—কোনো-না-কোনো দলের লোক। কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে,—বিশেষতঃ বেপরোআ ভাবে,—তথ্য দেবার ক্ষমতা ও চরিত্র তাঁর আছে। দত্ত নৃতত্ত্ব-বিদ্যাটায় বিজ্ঞান-গবেষণার মেজাজ নিয়ে লেগে আছেন। এই জন্য নানাক্ষেত্রেই বস্তুনিষ্ঠা আর সংখ্যানিষ্ঠা তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ। (পৃঃ ৪৬-৪৭)

বিজ্ঞানবীর জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র

২০শে ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবের কর্মে ও চিন্তায় বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু আর প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দান কিরূপ ছিল?

সরকাব—বঙ্গ-বিপ্লবকে ১৯০৫-১৪ সনের আন্দোলন ধ'রে নিয়েছি। কখনো-কখনো বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের শেষ অর্থাৎ ১৯১৮-১৯ পর্যন্ত বঙ্গ-বিপ্লবের সীমানা টেনে থাকি। এই যুগে জগদীশচন্দ্র আর প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অর্থাৎ তখন তাঁরা সরকারী চাক্‌রে। কাজেই বয়কট-স্বদেশী-স্বরাজ-জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন তাঁরা সোজা-সুজি নাম লেখাতে পারেন নি। তবে এঁদের দুজনের কাছ থেকেই বঙ্গ-বিপ্লবের সেবক, প্রবর্তক, কর্মকর্তা, জন-নায়ক ইত্যাদি লোকেরা উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছে। (পৃঃ ১৬৪-১৬৫)

লেখক—কিসের জোরে আপনি একথা বল্‌ছেন?

সরকার—রবীন্দ্রনাথের সংগে এঁদের দুজনেরই বন্ধুত্ব ছিল। ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধায়ও এঁদেরকে বন্ধুবর্গের ভেতর গুন্‌তেন। অধিকন্তু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের "মডার্ণ রিভিউ" আর "প্রবাসী" পত্রিকা এই দুই বিজ্ঞানবীরের চিন্তা ও কর্মের প্রচার-কার্যে মোতায়েন ছিল। কাজেই যুবক বাংলা এঁদেরকে নিজেদেরই দলের লোক বুঝ্‌তে পার্‌তো।

লেখক—আপনি সেই যুগে জগদীশচন্দ্র আর প্রফুল্লচন্দ্রের সংগে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এসেছিলেন কি?

সরকার—১৯০১-০২ সনে প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিকে আমি এই দুজনেরই ছাত্র। তখন জগদীশচন্দ্রকে জান্‌তাম বর্তমান ভারতের একমাত্র বৈজ্ঞানিক ব'লে। আর প্রফুল্লচন্দ্র সেকালের ছেলে-মহলে পরিচিত ছিলেন "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস"-লেখক বলে। দু-জনকে আমরা বংগ-জননীর "সবে ধন নীলমণি"রূপে পূজা করতাম। সে রীতিমত "পূজা"। নাম কর্‌বা মাত্র জিভের জল পড়্‌ত।

লেখক—ছাত্র হিসাবে এঁদের সম্বন্ধে নতুন-কোনো ধারণা হ'য়েছিল?

সরকার—জগদীশচন্দ্রের কাছে প'ড়েছিলাম পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্তর্গত আলোক-বিদ্যা। দেখ্‌তাম মাষ্টারের সময়ই হয় না ক্লাশে আস্‌বার। ভাব্‌তাম,—গবেষক-আবিষ্কারক হ'লে বুঝি ক্লাশ ফাঁকি দেওয়া মাষ্টারদের অন্যতম স্বধর্মে দাঁড়ায়। যেটুকু তাঁর সংগে দেখা হ'ত সেটুকু সময় তাঁর মুখ ও চোখ থাক্‌তো চিন্তায় ভরা। মিনিট দশ পনর'র বেশী কোনো দিন বক্তৃতা কর্‌তেন না। কিন্তু সেই ক'টা মিনিটের ভেতর যা শুন্‌তাম তাতে মনে হ'তো এমন মাষ্টার আর হয় না। বিশ্লেষণ ছিল জলের মতন সোজা। জগদীশচন্দ্র আমাদেরকে তিন-চার দিনের বেশী পড়িয়েছিলেন কি না মনে পড়্‌ছে না। কিন্তু তাতেই যত মাল পেয়েছিলাম তার চেয়ে বেশী মাল কোনো টেক্‌স্‌ট্‌-বুকে ছিল না। বক্তৃতা শেষ ক'রেই ছেলেদেরকে বল্‌তেন,—"এক্‌স্‌পেরিমেন্ট দেখ্‌তে চাস্‌?" সকলেই এক স্বরে বল্‌তাম—"হাঁ দেখ্‌বো, নিশ্চয়।" ব্যস্‌। তিনি সহকারীকে ব'লে দিতেন ঃ—"দরজা বন্ধ ক'রে অন্ধকার ঘরে আলোর রকমারি মূর্তি দেখাও।" এই ব'লেই তিনি নিতেন ছুটি।

লেখক—প্রফুল্লচন্দ্রের ক্লাশে কী দেখ্‌তেন?

সরকার—প্রফুল্লচন্দ্রের হাবভাব সম্পূর্ণ আলাদা। এসেই এদিকে তাকানো, ওদিকে তাকানো। সামনের বেঞ্চের ছেলে-গুলার সংগে একটু-আধটু হাসি-ঠাট্টা। তারপর রাসায়নিক পরীক্ষা দেখাতে-দেখাতে খানিক্‌টা লাফালাফি, চেঁচামেচি ও ছেলেমি। মাঝে-মাঝে বৈজ্ঞানিক গবেষণার গল্প হ'তো। বিশেষতঃ প্রশ্ন হ'তো ঃ—"রসায়নে জীবন উৎসর্গ কর্‌তে চায় কে-কে?" তার কোনো জবাব মিল্‌তো না,—বলাই বাহুল্য। তাঁর ছিল আর এক বাণী ঃ—"বিয়ে কর্‌বি? তো রসায়ন বিয়ে কর্‌।"

লেখক—এই দুই বিজ্ঞানবীরের কাছে আপনার সঙ্গে এক ক্লাশে প'ড়েছে এমন কয়েকজনের নাম কর্‌তে পারেন?

সরকার—উকিল অতুল গুপ্ত, গণিতশাস্ত্রী ৺নরেশ ঘোষ, ডাক্তার সত্যেন রায় ও দবিরুদ্দিন আহম্মদ, জমিদার অমল ও সৌরেন রায় (বেহালা), চা-ব্যবসায়ী শান্তিনিধান রায় (জলপাইগুড়ি), ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ৺মনোরঞ্জন মৈত্র ইত্যাদি।

লেখক—১৯০৫-০৭ সনের স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে থেকে বাঙালী জাত্‌ কিছু পেয়েছিল কি?

সরকার—প্রফুল্লচন্দ্র আর রাসায়নিক চন্দ্রনাথ ভাদুড়ীকে আমরা জান্‌তাম "বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল" কারখানার অন্যতম প্রবর্তক ও রাসায়নিক ওস্তাদরূপে। এই হিসাবে বিজ্ঞানবীর প্রফুল্লচন্দ্রকে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রতিমূর্তি ও কর্মবীর বল্‌তাম। শিল্পবীরের ইজ্জদ তাঁকে দেওয়া হ'তো। এই নাম-ডাক বংগ বিপ্লবের যুগে যুবক বাংলায় খুব বেশী সাহস ও উদ্দীপনা জোগাতো। জগদীশচন্দ্র কোনো শিল্প-বাণিজ্যের সংগে

সংযুক্ত ছিলেন না। তাঁকে আমরা একমাত্র গবেষণা-বীর ব'লেই জান্‌তাম। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে একালের ভারতবর্ষ দুনিয়ায় দিগ্‌বিজয়ী হচ্ছে। এই ছিল ধারণা। বৈজ্ঞানিক দিগ্‌বিজয়ের কথায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রত্যেক কর্মী সাহস ও উদ্দীপনা পেত।

লেখক—জন-সাধারণের সংগে এই দুই বিজ্ঞানবীরের যোগাযোগ কিরূপ ছিল?

সরকার—জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে সাধারণতঃ লোকজনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে—এমন কি ছাত্র ও যুবাদের—মাখামাখি ছিল না। তবে রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা ইত্যাদি বিপ্লব-প্রবর্তকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল অতি-ঘনিষ্ঠ। এই হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্রকে দেখ্‌তাম জগদীশচন্দ্র হ'তে বিলকুল আলাদা চরিত্রের লোক। প্রফুল্লচন্দ্র চিরকালই মিশুক লোক। তাঁর বাড়ীতে (অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার দোতলার এক ঘরে) ছেলেদের যাওয়া-আসা ছিল। তাঁর থালা হতে রসগোল্লা তুলে খেয়েছে আমার মতন বহুসংখ্যক ছোক্‌রা। জন-নায়কদের সঙ্গেও তাঁর মেলামেশা ছিল। বণিক-শিল্পীরাও যাওয়া-আসা কর্‌তো। হরেক-রকমের লোক তাঁর কাছে শল্লা পেয়েছে, আর্থিক সাহায্যও পেয়েছে। স্বার্থত্যাগী স্বদেশ-সেবকেরা তাঁকে নিজেদেরই একজন ভাব্‌তে পার্‌তো। তিনি অনেক স্বদেশ-সেবক সৃষ্টি ক'রেছেন। খাদি-প্রতিষ্ঠানের গান্ধি-শিষ্য সতীশ দাশগুপ্ত তাঁদের অন্যতম।

লেখক—আপনার জীবনে এই দু'জনের প্রভাব কিছু আছে?

সরকার—বিজ্ঞানবীর রূপে আমার পূজাস্থান ছিল এঁরা দুজনেই। অন্যান্য বাঙালীর মতন এই অধমও দু'জনকেই সর্বদা গবেষণার ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত ও আদর্শ মেনে নিয়েছিল। এই হ'ল প্রধান কথা। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্র রাসায়নিক, আর জদীশচন্দ্র পদার্থশাস্ত্রী বা প্রাণশাস্ত্রী। এঁদের বিদ্যার সঙ্গে আমার কাজকর্মের সোজাসুজি যোগ একদম নেই। কাজেই লেখাপড়ার লাইনে এঁদের কাছ থেকে বেশী-কিছু পাবার সম্ভাবনা ছিল না। তবে ১৯১০ সনের পর প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা সুরু করি। সেই সময় হ'তে প্রফুল্লচন্দ্রের "হিন্দু রসায়ন" যারপরনাই জরুরি মনে হ'য়েছে। "পজিটিভ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড" রচনার যুগে (১৯১২-১৪) প্রফুল্লচন্দ্রের বই সর্বদা কাজে লাগ্‌তো।

লেখক—জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সাধনা থেকে আপনি কোনো প্রেরণা পেয়েছেন?

সরকার—খুব বেশী। জগদীশচন্দ্রের কোনো গবেষণা আমার কোনো "রচনায়" ব্যবহার কর্‌বার সুযোগ পেয়েছি কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁর গবেষণা আমার "জীবনে" চরম উদ্দীপনা জুগিয়েছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলার ভেতর আমার আসল "দর্শন" র'য়েছে। আমার জীবনের "সাধনা" আগাগোড়া জগদীশ-ময়।

লেখক—বড়ই আশ্চর্যের কথা। পদার্থ-শাস্ত্রী ও প্রাণ-শাস্ত্রী জগদীশচন্দ্রের কোনো আবিষ্কার আপনি নিজের কোনো বইয়ের ভেতর কাজে লাগাতে পারেন নি বল্‌ছেন। অথচ জগদীশচন্দ্রকে আপনি জীবনের উদ্দীপনায় উঁচু ঠাঁই দিচ্ছেন? তাঁকে আপনার "দার্শনিক" বল্‌ছেন?

সরকার—জগদীশচন্দ্রের গবেষণাসমূহ থেকে আমি যে-দরের উদ্দীপনা পেয়েছি সে-দরের উদ্দীপনা আর কোনো গবেষক জোগাতে পারেন নি। এর কারণ,—জগদীশচন্দ্রের প্রাণ-তত্ত্ব। তাঁর গবেষণাগুলার আসল মুদ্দা জীবনের সাড়া। জীবন-বিকাশের লক্ষণগুলা বিশ্লেষণ করা তাঁর আসল বৈজ্ঞানিক কাজ। এই বিশ্লেষণের ভেতর দুনিয়ার সঙ্গে জ্যান্ত জিনিষের যোগাযোগ আর তার নিয়মগুলা ধরা দিয়েছে। জগদীশচন্দ্র-প্রচারিত জীবনের সাড়া-তত্ত্বও যারপরনাই দামী। আমি মরা মানুষের বা মৃতপ্রায় জাতের নবজীবন-বিকাশের

বেপারী।

লেখক—জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে আপনার আত্মিক যোগাযোগ কোথায়?

সরকার—১৯০৭-১৪ সনের যুগে আমার পেশা ছিল শিক্ষা-বিজ্ঞান আর সংস্কৃতি-বিজ্ঞান। দুইই ব্যক্তিগত, সঙ্ঘগত, জাতিগত, দেশগত জীবনের আলোচনা। আমার মুদ্দা ছিল স্বদেশ-সেবা। "স্বদেশ-সেবক" ছাড়া তখনকার দিনে আমার মুখে অন্য কোনো আওয়াজ বেরুত না। ১৯০৭ সনে "নব্য-ভারত" মাসিকে আমার "স্বদেশ-সেবক" প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। যতগুলা চিন্তা আমার মগজে কিল্‌বিল্‌ কর্‌তো তার সবই "স্বদেশ-সেবক" শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাক্‌তো। দেশকে বাঁচানো, দেশকে জাগানো, দেশকে বাড়ানো,—এই ছিল একমাত্র কথা।

কাজেই জগদীশচন্দ্রের জীবন-বিশ্লেষণ, জগদীশচন্দ্রের সাড়া-দর্শন আমার লেখা-লেখির আবহাওয়ায় ছিল অহরহ। তা ছাড়া মরা ভারত আবার জ্যান্ত হচ্ছে, আবার জ্যান্ত হবে,—এই চিন্তার বা স্বপ্নের সঙ্গে সর্বদাই মাখা থাক্‌তো জগদীশচন্দ্রের বিবৃত জীবনের সাড়া-প্রণালী।

শুনে' আশ্চর্য হচ্ছিস্‌ বোধ হয়? বিশ্বাস করা কঠিন! কোথায় জগদীশচন্দ্রের জগদ্‌বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গবেষণা? আর কোথায় আমার মতন অকিঞ্চিৎকর ছোক্‌রার ছেলেমি? এই দু'য়ে যোগাযোগ কল্পনা করা অসম্ভব। ভাব্‌ছিস্‌ বোধ হয় ছোট মুখে বড় কথা? কী ক'র্‌বো? গরীব মানুষ আর মুখ্‌খু লোক।

লেখক—সাড়া-তত্ত্ব কি আর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রচার করেন নি?

সরকার—হাঁ। অনেকেই ক'রেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলেই বিদেশী। জগদীশচন্দ্র বাঙালী সাড়া-বিজ্ঞানের প্রবর্তক।

জগদীশ-সম্বর্ধনা

লেখক—জগদীশচন্দ্র-বিষয়ক আপনার এই ধরণের মতিগতি সম্বন্ধে কোনো চিহ্ন দেখাতে পারেন?

সরকার—১৯১৩ সনের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল প্রাইজ। তৎক্ষণাৎ ঝেড়ে দিলাম "গৃহস্থ" মাসিকের "রবীন্দ্র-দিগ্‌বিজয়"-সংখ্যা। তার ভেতর চার দিগ্‌বিজয় বাঙালীর প্রশস্তি ছিল। অন্যতম জগদীশচন্দ্র। "বিশ্বশক্তি" বইয়ে (১৯১৪) বুখ্‌নিটা পাবি। ব্রজেন শীলের সঙ্গে নামটা গাঁথা আছে। (পৃঃ ৫২-৫৩, ১৬৪-১৬৫, ২৩০-২৩১)

লেখক—জগদীশের প্রশস্তিটা আর একবার বলুন শুনি।

সরকার—এক জায়গায় ব'লেছিলাম,—"আমরা বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রকে পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম গুরুরূপেই ভারতবাসীর গৌরব, বাঙালীর গৌরব, হিন্দুর গৌরব মনে করি।" প্রফুল্লচন্দ্রকে তখনকার দিনে ঠিক এই দরের বিজ্ঞানাচার্য মনে কর্‌তাম না। তাঁকে প্রাচীন হিন্দু-রসায়নের "ঐতিহাসিক" ভাবে দেখ্‌তাম। বর্তমান জগতের রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর গবেষণাসমূহ সম্বন্ধে ১৯১৩ সনেও আমার ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। কাজেই জগদীশচন্দ্রকে "পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম গুরু" ব'লেছি। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রকে "পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম গুরু" বল্‌তে সাহসী হ'তাম কি না সন্দেহ। (পৃঃ ৫১)

লেখক—ব্রজেন শীলের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রকে গেঁথেছেন কোথায়?

সরকার—১৯১৩ সনের বুখ্‌নিটা ভুলে গিয়েছিস্? তবে শোন্ আবার ঃ—"বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ,—সকলেই এক ভাবের ভাবুক, একই মন্ত্রের দ্রষ্টা, একই বাণীর প্রচারক। ভারতবাসীর ইয়োরোপ-বিজয়ের ইঁহারাই প্রথম সেনাপতি।"

লেখক—জগদীশচন্দ্র আপনাকে এতটা প্রভাবান্বিত ক'রেছিলেন একথা স্বপ্নেও ভাবা কঠিন। এই প্রভাবের আর কোনো চিহ্ন আছে?

সরকার—আরও চাস্? আচ্ছা, শোন্ ঃ—

"দুনিয়ারে কোন্ তত্ত্ব শিখায়ে গেলে তুমি?
গুরুদেব! বুঝিতে পারি না তাহা মূর্খ আমি।
জানি,—বাইরের আঘাতে পেলে জীবন দেয় সাড়া,
সেই সাড়া কি তারাও দেয় চেতনাহীন যারা?
মানুষের মতনই নাড়ী-স্নায়ু, ক্লান্তি, স্মৃতি, রোগ
দেখায় কি ধাতু-লতা-পত্রে তোমার যন্ত্রের যোগ?
সাক্ষী তোমার 'বন চাঁড়াল' ঐ ঘুর্‌ছে তোমার সাথে-সাথে?
জাগা, ঘুম, নেশা তাহার লিখায়েছ কি তারি হাতে?
অচেতন দেশটি তোমার, তাই অচেতনের বেদনা
হ'য়েছে কি বাঙালীর একমাত্র বিজ্ঞান-সাধনা?
যন্ত্রে ধ'রেছ, হে যন্ত্রবীর, অচেতনের স্পন্দন-সুর,
তোমার দেশের সাড়াও তাই বিশ্ববাসী পাচ্ছে দূর।
এক জগদীশ নও ভারতের তুমি সে সাড়ার ফলে,
হাজার জগদীশ আজ মায়ের কোলে আধ'-আধ' কথা বলে।"

লেখক—আপনি জগদীশচন্দ্র সম্বন্ধে কবিতাও লিখেছেন? কবে কোথায় লেখা হ'ল? "শিখায়ে গেল তুমি",—কথাটার মানে তো বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে না? তিনি কাকে শেখালেন? কোথায় যাচ্ছেন?

সরকার—এই কবিতাটার আবহাওয়া হচ্ছে আট্‌লান্টিক সাগরের এক মার্কিণ জাহাজ। মাস নবেম্বর ১৯১৪ সনের। সেই জাহাজে সওয়ারি ছিলেন সপত্নীক জগদীশচন্দ্র। ঘটনাচক্রে এই মুখ্‌খু অধমও ছিল। পাঞ্জাবের লাজপত রায় আর কাশীর "ভাইয়া" শিবপ্রসাদ গুপ্ত ছিলেন বন্ধুবর্গের অন্তর্গত। জগদীশচন্দ্রের সহকারী ছিলেন বশীশ্বর সেন। জাহাজের বেল্‌জিয়ান, ফরাসী, অষ্ট্রিয়ান ও মার্কিণ সহযাত্রীদের অনুরোধে জগদীশচন্দ্র একদিন তাঁর যন্ত্রপাতির খেলা দেখালেন। জগদীশচন্দ্র বিলাতের বক্তৃতা সেরে আমেরিকায় বক্তৃতা দিবার জন্য যাচ্ছিলেন। এই জন্যই "দুনিয়ারে কোন্ তত্ত্ব শিখায়ে গেলে তুমি?" সেই দৃশ্য মনে রেখে কবিতা লেখা হ'য়েছে চীনে প্রবাসের সময়,—১৯১৬ সনের ৩০শে জুন (শাংহাই)। কবিতাটা ছাপা হয়েছে ১৯২৮ সনের ডিসেম্বর,—কলিকাতায় জগদীশ-সম্বর্ধনা উপলক্ষে। বসু ইন্‌ষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত উৎসবের সময়ে আর একটা কবিতার সঙ্গে এটাও প'ড়েছিলাম।

লেখক—জগদীশ-সম্বর্ধনার জন্য দ্বিতীয় কবিতাটা কোথায় পাওয়া যায়?

সরকার—জগদীশ-সম্বর্ধনার জন্য লিখিত রচনাটা পাবি "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৩২)। তার ভেতর দ্বিতীয় কবিতাটাও আছে।

লেখক—দ্বিতীয় কবিতাটাও এই সঙ্গে ব'লে যান।

সরকার—তবে কান খাড়া কর্। আওড়িয়ে যাচ্ছি ঃ—

'গম্ভীর বদন তোমার স্থির-নেত্র জগদীশ,
প্রশান্ত হাসিতে তোমার দেখিনা হরিষ।
বেদনার মূর্তি তুমি, ওহে সেনাপতি,
সৃষ্টিকর্তার অহঙ্কারে ভরা তোমার মতি।
বাড়াতে চেয়েছে তুমি সীমানা এ দুনিয়ার,
ডেকেছে মল্লযুদ্ধে অন্ধকারে বসুধার।
ঘোর বিপদেরে তুমি বরিয়াছ সাথী,
নির্ভয়ে আকুল হিয়া বাঁখিয়াছ তায় গাঁথি।
জয়ের জন্য লালায়িত নও, চাও পরাজয়,
বিফলতা-নৈরাশ্যেই শক্ত যে হৃদয়।
ধ্যান-মগ্ন আঁখি তোমার, উদ্বিগ্ন অন্তর,
শোকে ভরা মহানন্দ প্রাণের সহচর।
ছড়াও স্বদেশে সংগ্রাম, শক্তিযোগ ধীর,
আর বেদনা বিরাট তোমার, হে বিজ্ঞানবীর।"

লেখক—এই রচনাটা কবেকার?

সরকার—১৯২১ সনের প্রথম দিকে সপত্নীক জগদীশচন্দ্র প্যারিসে ছিলেন। সেই সময়ে এই অধমও তাঁদের ছায়ায় একটু-আধটু এসেছিল। লেখাটা তারি সাক্ষী।

"জীবনের সাড়া" ও স্বদেশসেবা

লেখক—জগদীশচন্দ্র আর প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে আপনি একটা মস্ত প্রভেদ ক'রেছেন দেখ্তে পাচ্ছি। কিন্তু এই প্রভেদের কারণটা এখনো যেন পরিষ্কার হচ্ছে না। প্রফুল্লচন্দ্রকে আপনি স্বার্থত্যাগী স্বদেশ-সেবক বিবেচনা ক'র্তেন। ১৯০৭-১৪ সনে আপনার বিচারে স্বদেশ-সেবা আর স্বার্থত্যাগই ছিল সবচেয়ে বড় ধর্ম বা নীতি। তাহ'লে আপনার জীবনে প্রফুল্লচন্দ্রেরই বেশী প্রভাবশালী হওয়ার কথা। তাই নয় কি?

সরকার—না। উল্টা বুঝিলি, রাম! আচ্ছা,—একটা সোজা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। জানিস্,—ময়রা কখনো সন্দেশ খায়? সন্দেশের ওপর তার দরদ হ'তেই পারে না। তেমনি স্বদেশ-সেবা আর স্বার্থত্যাগের বেপারীর চোখে কোনো স্বার্থত্যাগী স্বদেশ-সেবক বিশেষত্বশীল নতুন-কিছু মালুম হয় না। প্রফুল্লচন্দ্র স্বার্থত্যাগী স্বদেশ-সেবক। ভাল কথা। অতএব তাঁকে পূজা ক'রেছি। কিন্তু তাঁর কাছে ১৯০৭-১৪ সনে "নতুন" কোনো প্রেরণা পেলাম কোথায়? ১৯০২-০৬ সনের যুগে ডন সোসাইটির আবহাওয়ায় সতীশ বাবুর কাছেই তো স্বদেশ-সেবা আর স্বার্থত্যাগের বাণী চরম মাত্রায় পেয়েছি। তার ওপর বেশী-কিছু পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। প্রফুল্লচন্দ্র সতীশচন্দ্রেরই জুড়িদার। তা ছাড়া ১৯০৭-১৪ সনের যুগে এই অধমের নিজের বল্তে কিছুই ছিল না। সে-জীবন সুরুই হ'য়েছিল সর্বত্যাগের পর। কাজেই প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে "নতুন" পেলাম প্রাচীন হিন্দুজাতির রসায়ন। যা পাওয়া গেল তাই সই। সেইটা আমার কাজে লাগ্লো "হিন্দু সমাজ-তত্ত্বের বাস্তব ভিত্তি" গড়্বার পেশায়।

(পৃঃ ২৫৭) কিন্তু জগদীশচন্দ্রের কাছে পেলাম বিলকুল আলাদা চিজ! সে অতি-উঁচুদরের মাল। তার তুলনা মেলা ভার।

লেখক—সেই আলাদা চিজটা কি?

সরকার—আগেই ব'লেছি জীবন-দর্শন আর সাড়া-বিজ্ঞান। এই চিজটা যে-কোনো লোকের কাজে লাগে,—যে-কোনো যুগে কাজে লাগে,—যে-কোনো অবস্থায় কাজে লাগে। সাড়া-তত্ত্বের একটা মস্ত কথা হচ্ছে সংগ্রাম, লড়াই। আর একটা মস্ত কথা বাধা-বিঘ্ন। জগদীশচন্দ্র যখন-তখন বাধা-বিঘ্নের কথা ব'লেছেন। আর সেই বাধা-বিঘ্ন ভেঙে-চুরে জীবন-পথে ছুটে' বেরুবার জন্য বাণী ছড়িয়েছেন। লড়াই, লড়াইয়ে, বিজয়লাভ, লড়াইয়ে পরাজয়, কিন্তু মোটের উপর সর্বদাই লড়াই, আর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকা,—এই হ'লো জগদীশ-প্রবর্তিত সাড়া-বিজ্ঞানের বনিয়াদ। সুতরাং জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান-সেবা, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বা বৈজ্ঞানিক দর্শন এই অধমকে "মাত্" ক'রে রেখেছিল। আর-কোনো গবেষণায় আমি এতটা উদ্দীপনা পাই নি। খাঁটি বিজ্ঞান-গবেষকেরা আমার গরুমি আর আহাম্মুকি দেখে হয়ত হাস্‌বেন। হাসুন।

তাঁরা ভাব্‌বেন আমি লোকটা কী আহাম্মুক। পদার্থ-শাস্ত্রী, আলোক-শাস্ত্রী, বিজলী-শাস্ত্রী, উদ্ভিদ্-শাস্ত্রী আর প্রাণ-শাস্ত্রী জগদীশচন্দ্রের ঝুলির ভেতর আবিষ্কার কর্‌লাম একমাত্র দর্শন!

প্রফুল্লচন্দ্রেব চেলার দল

লেখক—প্রফুল্লচন্দ্রের চেলাদের ভেতর কে-কে আজকালও তাঁর কাজে বা আদর্শে লেগে আছেন?

সরকার—১৯০৭-১৪ সনে প্রফুল্লচন্দ্রের কাজ বা আদর্শ বল্‌লে বুঝ্‌তাম প্রধানতঃ রাসায়নিক লেখা-পড়া ও গবেষণা। কাজেই তাঁর চেলারাও ছিলেন রাসায়নিক। কিন্তু প্রথমেই একটা অ-রাসায়নিক কথা ব'লে রাখ্‌ছি। চক্রবর্তী, চাটার্জি কোম্পানীর নাম শুনেছিস্ তো? এই বইয়ের দোকানের প্রতিষ্ঠাতা তিনজন রাসায়নিক। সকলেই প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র। রমেশ চক্রবর্তী, মুকুন্দ চক্রবর্তী আর অহীন চ্যাটার্জি ১৯১১ সনে এম্-এস্-সি পাশ ক'রেই বইয়ের ব্যবসায় মন দিলেন। এঁদের মন্ত্রদাতা গুরুদেব প্রফুল্লচন্দ্র (মৃত্যু ১৬ই জুন, ১৯৪৪)।

লেখক—অ-রাসায়নিক কারবারে প্রফুল্লচন্দ্রের আর কোনো চেলাকে আজকাল দেখা যায়?

সরকার—রসায়নের বহির্ভূত ব্যবসাক্ষেত্রে আজকাল র'য়েছেন আর্যস্থান ইন্‌শিওর‍্যান্স কোম্পানীর সুরেশ রায়। বহির্বাণিজ্যে লেগেছেন ইণ্ডো-সুইস্ ট্রেডিং কোম্পানীর সতীন দাশগুপ্ত। সুরেশ রায় রাসায়নিক নন। কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট প্রেরণা-পাওয়া লোক। সতীন দাশগুপ্ত'র মারফৎ প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যান্য ছাত্রও ব্যবসায় আর শিল্পকর্মে মন দিয়েছে। জিতেন দত্ত (কল্‌কাতার ষ্টক এক্‌সচেঞ্জ), দেবপ্রসাদ ঘোষ (রংপুর), পবিত্র দত্ত (লণ্ডন) ইত্যাদি প্রফুল্লচন্দ্রের রসায়ন-শিষ্যেরা একালে অ-রাসায়নিক কর্মক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ। একালের বাঙালী শিল্পী-বণিকেরা সকলেই অবশ্য রাসায়নিক কারখানা বা ব্যবসার লোক নন।

অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট প্রেরণার জন্য ঋণী। এ সম্বন্ধে সরকারী ট্যানিং ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টার চামড়ার রাসায়নিক বিরাজমোহন দাস খবর দিতে পারেন।

তাঁর ছাত্রদের ভেতর থেকে বেরিয়েছেন ১৯২০ সনের পরবর্তী বহুসংখ্যক শিল্পী ও বণিক্। যে সকল বাঙালী রাসায়নিক ও এঞ্জিনিয়ার এ-যুগের স্বদেশী কারখানা চালাচ্ছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র ও শিষ্য। আর অধিকাংশই বোধ হয় কোনো-না-কোনো ক্ষেত্রে তাঁর প্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছেন। যে-কোনো বাঙালী কারখানার ওস্তাদকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্‌লেই শিল্প-বাণিজ্যে প্রফুল্লচন্দ্রের দানটা বুঝ্‌তে পার্‌বি।

লেখক—এই গেল শিল্প-বাণিজ্যের কথা। প্রফুল্লচন্দ্রের চেলাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কিছু বল্‌তে পারেন?

সরকার—রসায়নে আমার দৌড় কিছুই নয়। কাজেই রাসায়নিক গবেষক হিসাবে প্রফুল্লচন্দ্রকে জরিপ কর্‌তে ঝুঁক্‌বো না। প্রফুল্লচন্দ্র ১৯০৭-১৪ সনে অথবা ১৯১৫-৪২ সনে রাসায়নিক রূপে দিগ্‌বিজয়ী কিনা পঞ্চানন নিয়োগী, রসিক দত্ত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, কুদ্‌রতি খোদা ইত্যাদি রাসায়নিকদেরকে জিজ্ঞাসা করা ভাল। আমি অন্য ধরণের কথা বল্‌ছি। তা হচ্ছে প্রফুল্লচন্দ্রের চেলাদের প্রেরণা সম্বন্ধে। ১৯১৪-১৫ সন পর্যন্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ছিলেন তাঁর ল্যাবরেটরির ছাত্র। এই তিনজনকে তিনি "জ্ঞান-ত্রয়" ব'লে ডাক্‌তেন। তিনজনেই রাসায়নিক। পদার্থ-বিজ্ঞানের ছাত্র মেঘনাদ সাহা আর সত্যেন বসুও তাঁর প্রিয় চেলাদের অন্তর্গত ছিলেন। তাঁর পাতের রসগোল্লা খাইয়েদের ভেতর এঁরা তো ছিলেনই। আর ছিলেন একালের সুপরিচিত নীলরতন ধর (এলাহাবাদ), বিমান দে (মান্দ্রাজ), ধীরেন চক্রবর্তী (রিপণ কলেজ), প্রফুল্ল রায় (কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ) ইত্যাদি। এই ধরণের আরও অনেকে প্রফুল্লচন্দ্রের প্রীতি, স্নেহ, পিঠ-চাপড়ানো, বুক্-থাবড়ানো, গালাগালি, আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি পেয়েছিলেন। এঁদেরকে প্রফুল্লচন্দ্র নিজ ছেলের মতনই দেখ্‌তেন। হাজার হ'লেও মানুষ তো। নিজের যখন বাড়ীঘর-ছেলেমেয়ে নেই তখন এই সব শিষ্য-চেলারাই ছিলেন তাঁর একমাত্র ভরসাস্থল। একেই বলে কালিদাসের বুখ্‌নিতে,—"স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ" (তিনিই আসল পিতা, বাপেরা কেবল জন্মদাতা মাত্র)।

সুখের কথা, ১৯০৭-১৪ সনের চেলাদের ভেতর কেহ কেহ ১৯১৫-২০ সনে আর পরবর্তীকালে দেশ-বিদেশের বিজ্ঞান পত্রিকায় গবেষণা প্রকাশ ক'রে দিগ্‌বিজয়ী হ'তে পেরেছেন। ইয়োরামেরিকার যে-দেশেই গিয়েছি সেই দেশেই রাসায়নিক ল্যাবরেটরিতে টুঁ মার্‌বার সুযোগ জুটেছে। আর প্রায় সর্বত্রই রাসায়নিকদের মুখে শুনেছি প্রফুল্লচন্দ্রের নাম। (পৃঃ ২৬৩)

লেখক—কেন? প্রফুল্লচন্দ্রের নাম রাসায়নিকদের মুখে শুনেছেন কী জন্য? তাঁর রাসায়নিক রচনাবলী কি বিদেশী পত্রিকায় বেরুতো?

সরকার—ভায়া, রাসায়নিক গবেষক হিসাবে বিদেশী রাসায়নিকেরা প্রফুল্লচন্দ্রকে জান্‌তো কিনা জানি না। ওস্তাদেরা বল্‌তে পার্‌বে। কিন্তু বিদেশীদের মুখে শুন্‌তাম যে,—বাঙালী ছাত্রদের দৌলতে কল্‌কাতার নাম আর ভারতের নাম রাসায়নিক দুনিয়ায় ছড়িয়ে প'ড়েছে। তার ভেতর উজ্জ্বলতম শব্দ ছিল যুবক বাংলার রসায়ন-গুরু "প্রফুল্লচন্দ্র"। এই হিসাবে আমি প্রফুল্লচন্দ্রকেও দিগ্‌বিজয়ী বলি। জানিস্‌ই তো কথা

আছে,—"পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।' গবেষক হিসাবে চেলাদের নাম হয়ত গুরুর চেয়ে বেশী কিন্তু এইরূপ চেলা রেখে যাওয়ার চেয়ে মহত্তর কাজ আর-কিছু হ'তে পারে না। প্রফুল্লচন্দ্রের চেলারা কেহই নিমকহারাম নন। সকলেই দেশ-বিদেশে প্রফুল্লচন্দ্রকে সেলাম ঠুকে কাজ সুরু ক'রেছেন,—নয়া-নয়া গুরুর সাক্‌রেতি চালিয়েছেন।

লেখক—একালের প্রফুল্লচন্দ্র সম্বন্ধে কার-কার কাছে খবর পাওয়া যাবে?

সরকার—একালের লুঙ্গী-পরা প্রফুল্লচন্দ্র ১৯২০-২১ সনের পরবর্তী লোক। গান্ধি-যুগে তাঁর আবির্ভাব। সেই সময়ে তিনি সরকারী চাক্‌রী হ'তে অবসর পেয়েছেন। এই বিশ-বাইশ বৎসর প্রফুল্লচন্দ্র মোতায়েন আছেন দেশ ও দশের অগণিত কর্মক্ষেত্রে। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক সুবোধ মজুমদার ইত্যাদি রাসায়নিকেরা তাঁর হালের ছাত্র। এঁদের সঙ্গে দেখা কর্‌বি। তা ছাড়া রমেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ কর্‌বি। বর্ষাকালে কল্‌কাতার রাস্তায় হাঁট্‌তে-হাঁট্‌তে চটি-হাতে-করা প্রফুল্লচন্দ্র এঁদের দোকানে এসে খোস-গল্প ক'রেছেন অনেকবার।

বোস্ ইন্‌ষ্টিটিউট

লেখক—জগদীশচন্দ্রের শিষ্যদের সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা-শোনা আছে?

সরকার—জগদীশচন্দ্রের কোনো যথার্থ শিষ্য ছিল কিনা জানি না। তাঁর শিষ্য আজকালও কেহ আছে কিনা বলা কঠিন। বোস্-ইন্‌ষ্টিটিউটের (বসু-পরিষদের) ভূতপূর্ব কর্মকর্তা নগেন নাগ সংবাদ দিতে পার্‌বেন। খবর নিয়ে রাখা মন্দ নয়।

লেখক—জগদীশচন্দ্রের পর বোস্-ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর হ'য়েছেন দেবেন বোস্। তিনি জগদীশচন্দ্রের শিষ্য নন কি?

সরকার—বৈজ্ঞানিক গবেষণার ওস্তাদেরা এই প্রশ্নের জবাব দিতে পার্‌বে। তবে দেবেন্দ্রমোহন বসুকে জগদীশচন্দ্রের চেলা বলা কোনো মতেই ঠিক হবে না। এইরূপ আমার ধারণা। জগদীশচন্দ্রের কাজকর্ম ও দেবেন বসুর কাজকর্ম দুই বিলকুল আলাদা জগতের জিনিষ। দেবেন বসু জগদীশচন্দ্রের ভাগ্‌নে বটে। কিন্তু তা ব'লে বিজ্ঞান-গবেষণায় জগদীশচন্দ্রের পথে তিনি চ'লেছেন কোনো ওয়াকিব-হাল লোক একথা স্বীকার কর্‌বে না। যা হ'ক, একটা নতুন কথা হচ্ছে যে, দেবেন বসুর গবেষণা প্রধানতঃ জার্মাণ ভাষায় জার্মাণিতে ছাপা হয়। আমাদের দেশী লোকেরা তার খবর রাখে কিনা সন্দেহ। তাঁর সঙ্গে যারা কাজ করে তারা বোধ হয় এই সবের কিস্মৎ বুঝে। তাতে জনসাধারণের দন্তস্ফুট করা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাল দৈনিক পত্রে আলোচনা সমালোচনার সামগ্রী নয় রে ভায়া। কাজেই গবেষকদের নাম হয়তো অনেকে জানেই না।

লেখক—পদার্থ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিদ্যার ক্ষেত্রে ভারতীয় গবেষকেরা বিদেশে নামজাদা কি?

সরকার—দিগ্‌বিজয় কাকে বলি জানিস্ তো? মেঘনাদ, সত্যেন বসু, প্রশান্ত মহালানবিশ ইত্যাদির মতন দেবেন বসুও দিগ্‌বিজয়ী। বিজ্ঞানজগতের এখানে-ওখানে এঁদের ঠিকানা কিছু-কিছু কায়েম হ'য়েছে। সকলেই মান্দ্রাজী চন্দ্রশেখর রামণের মতন

নামজাদা নন। কিন্তু এঁদের মতন কয়েকজন বাঙালী পদার্থ-শাস্ত্রীয় ও অঙ্ক-শাস্ত্রীর কাজ দেশবিদেশের বৈজ্ঞানিক মহলে আলোচিত হয়।

("দিগ্‌বিজয়ী কাকে বলে?" ৪ঠা নবেম্বর, "বৃহত্তর ভারতের কর্মিবৃন্দ", ৭ই নবেম্বর, "টিট্ করার অর্থ কী?" ১৪ই নবেম্বর, "বিদেশে নাম করা" ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

ব্রাহ্মসমাজ ও বঙ্গ-বিপ্লব

২২শে ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবে ব্রাহ্মসমাজের দান কিরূপ?

সরকার—খুব বেশী। ১৯০৫-১৪ সনে বঙ্গ-বিপ্লবের রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ফিরিস্তি নিয়ে দ্যাখ্। দেখ্‌বি সব ক'টা বিভাগের বহুসংখ্যক নেতা হয় পাকা ব্রাহ্ম না-হয় ব্রাহ্ম-ঘেঁশা হিন্দু। আমার ১৯১৩ সনের বুখ্‌নিটা মনে আছে তো? "বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, এঁরা সকলেই ভারতবাসীর ইয়োরোপ-বিজয়ের প্রথম সেনাপতি।" (পৃঃ ৫৩, ১৬৫, ২৩১, ২৫৮) এঁদের ভেতর অ-ব্রাহ্ম কে? বিবেকানন্দ? তাঁর ছেলেবেলার খবর নিয়ে দেখিস্। বুঝ্‌বি,—বিবেকানন্দও ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্ম-ঘেঁশা হিন্দু। বিপিন পাল আর অরবিন্দও ব্রাহ্ম, হিন্দু-ব্রাহ্ম অথবা ব্রাহ্ম-হিন্দু। সতীশ মুখোপাধ্যায়, বিপিন পাল, মনোরঞ্জন গুহ আর অশ্বিনী দত্ত'র গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। বিজয়কৃষ্ণকে ব্রাহ্ম বলা যাবে, না ব্রাহ্ম-ঘেঁশা হিন্দু বলা যাবে? উকিলেরা তর্ক করুন আর জজ সাহেব বিচার করুন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আর কৃষ্ণকুমার মিত্র তো পাকা ব্রাহ্ম। স্বদেশী যুগের ভেতর তিনজন ডাক্তারকে অনেক কর্মক্ষেত্রে দেখ্‌তে পাই। নীলরতন সরকার, সুন্দরীমোহন দাশ আর প্রাণকৃষ্ণ আচার্য। এঁরা তিনজনেই ব্রাহ্ম। প্রফুল্লচন্দ্র তা ব্রাহ্মই। সুরেন ব্যানার্জিকে কী বল্‌তে চাস্? ব্রাহ্ম? না ব্রাহ্ম-হিন্দু না হিন্দু ব্রাহ্ম? যা ইচ্ছা বল্। তারক পালিত ব্রাহ্ম, আনন্দমোহন বসু ব্রাহ্ম। আরও উজিয়ে যেতে চাস্? উজিয়ে দ্যাখ্ না। বঙ্কিম, হেম, নবীন, বিহারীলাল—নামজাদা যুগ-প্রবর্তক সাহিত্য-বীরেরা সব কী? হয় ব্রাহ্ম,, না-হয় ব্রাহ্ম-হিন্দু বা হিন্দু-ব্রাহ্ম।

লেখক—তা হ'লে কি বল্‌তে চাচ্ছেন যে, ব্রাহ্ম সমাজই বঙ্গ-বিপ্লব এনেছে?

সরকার—প্রায় তাই। একথা শুন্‌বামাত্র তোরা আমাকে মেরে ফেল্‌বি বোধ হয়? কিন্তু কারবারটা দাঁড়াচ্ছে মোটের ওপর অনেকটা এইরূপই। তবে আমি তো কখনো কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সঙ্ঘকে কোনো আন্দোলনের একমাত্র কারণ, জনক বা প্রতিনিধি সমঝিতে অভ্যস্ত নই। হাড়ে-হাড়ে আমি বহুত্ব-নিষ্ঠ। সুতরাং অব্রাহ্ম হিন্দু আর অ-হিন্দু মুসলমান এবং হিন্দু-মুসলমানের বহির্ভূত খৃষ্টিয়ানের দানও বঙ্গ-বিপ্লবের ভেতর দেখ্‌তে পাই। হীরেন দত্ত, গুরুদাস, আশুতোষ, রামেন্দ্রসুন্দর, অম্বিকা উকিল, রাসবিহারী ঘোষ ইত্যাদি মনীষীরা ব্রাহ্ম নন। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় খৃষ্টিয়ান-হিন্দু না হিন্দু-খৃষ্টিয়ান?

লেখক—ব্রাহ্ম সমাজের এত প্রভাব হ'ল কী ক'রে?

সরকার—ব্রাহ্ম সমাজটাকে অ-হিন্দু, হিন্দু-বিরোধী অথবা হিন্দু-বহির্ভূত ভেবেই তো বাঙালী যত গণ্ডগোলে প'ড়েছে। তোর এই প্রশ্নটাই উঠ্‌ছে সেই গণ্ডগোলের দরুন। আমার মুড়োয় এই ধরণের প্রশ্ন হাজিরই হয় না। একবার কল্পনা কর্ না যে,—গোটা

কয়েক পাকা-মাথাওয়ালা বাঙালী-হিন্দু বাংলা-দেশটাকে বর্তমান জগতের উপযোগী ক'রে তুল্‌বার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছে। আধুনিক সংস্কৃতি, আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থা, আর আধুনিক আইন-কানুন আমদানি করা তাদের একমাত্র বা প্রধান পেশা। এই ধরণের দরদশীল স্বদেশনিষ্ঠ লোকের নাম বাঙালী ব্রাহ্ম। ব্যস্‌।

আমার পরিভাষায় ব্রাহ্ম=বর্তমান-নিষ্ঠ হিন্দু বাঙালী। লোকটার আগে বাঙালী হওয়া চাই। তারপর হিন্দু হওয়া চাই। তারপর বর্তমান-নিষ্ঠ হওয়া চাই। তা হ'লেই সে হ'য়ে গেল ব্রাহ্ম। এই ব্যক্তিকে সহজে বল্‌বো বর্তমান জগতের সংস্কৃতিওয়ালা লোক। দেখ্‌লি কেমন "ইকুয়েশন" (সাম্য-সম্বন্ধ)?

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চাচ্ছেন যে, ব্রাহ্ম আব অ-ব্রাহ্ম হিন্দু প্রাণে-প্রাণে এক?

সরকার—পুরাপুরি এক। বুঝাবার জন্য গলদ্‌ঘর্ম হ'তে হবে না। কথাটা ঠিক যে, ১৯০৫-১৪ সনের বঙ্গ-বিপ্লবের যুগেও প্রাচীন-পন্থী হিন্দুরা বর্তমান-নিষ্ঠ হিন্দুদের (অর্থাৎ ব্রাহ্মদের) সংস্কৃতি সহ্য কর্‌তে পার্‌তো না। রামমোহনের মৃত্যুর পর থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ব্রাহ্মরা ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়ক গোটা কয়েক জিনিষ মাত্র চেয়েছে। কিন্তু সেগুলাকে স্বদেশীযুগেরও সনাতনী-হিন্দুরা পছন্দ কর্‌তো না। অথচ আজ ১৯৪২ সনে কী দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌? আজকাল প্রাচীনপন্থী বাঙালী-হিন্দুরা বিলকুল সেই সব চিজই চায়। চায় শুধু নয়,—আমদানি ক'রেছে। গিলেছে,—গিল্‌ছে,—আরও গিল্‌তে চাচ্ছে। যারা গিলতে পাচ্ছে না তারা সুখী নয়, তারা পস্তাচ্ছে। সনাতনী-হিন্দুরা আজকাল যা-কিছু চায় তার অতিরিক্ত আধ-কাঁচ্চাও একালের ব্রাহ্মরা চায় না। অতএব বুঝা গেল যে, ব্রাহ্মরা সনাতনী-হিন্দুদের পঞ্চাশ-পঁচাত্তর-শ' বছর আগে আগে চ'লেছে। আজ দুই-ই একাকার। ব্রাহ্মতে হিন্দুতে কোনো ফারাক নেই। ব্রাহ্মসমাজের সংস্কার-সাধনা প্রকারান্তরে চরম সিদ্ধিলাভ ক'রেছে। বাঙালী হিন্দুগুলা অনেকটা "মানুষ" হ'য়েছে।

লেখক—তবুও দুটা একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিন না?

সরকার—মেয়েরা জুতো পায়ে দিলে সনাতনী-হিন্দুরা চট্‌তো। বল্‌তো ব্রাহ্মামি হচ্ছে। আজ জুতা পায় দেয় না কোন্‌ হিন্দু মেয়ে? একমাত্র যে-বেচারার পয়সা নেই। মেয়েরা ইস্কুলে-কলেজে গেলে সনাতনীরা বল্‌তো ব্রাহ্মামি। মেয়েরা রাস্তায় বেরুলে হিন্দুরা বল্‌তো ব্রাহ্মামি। মেয়েরা চাক্‌রি কর্‌লে হিন্দুরা বল্‌তো ব্রাহ্মামি। মেয়েরা স্বামী মর্‌বার পর বিয়ে কর্‌লে হিন্দুরা বল্‌তো ব্রাহ্মামি। মুখে বল্‌তো ব্রাহ্মামি। প্রাণে-প্রাণে বুঝ্‌তো খৃষ্টিয়ানি-বা পাশ্চাত্যামি। আজকালকার হিন্দু মেয়েদের কেহ-কেহ কলেজে যায়, চাক্‌রি করে, যে-কোনো জাতের স্বামী চায়, ডাইভোর্সে মসগুল হয়, স্বামী ম'লে আবার বিয়ে করে। যে-কাজটা তুই আজ কর্‌ছিস, মনে কর্‌,—সেই কাজটা তোর মাস্‌তুতো ভাই কর্‌ছে পঞ্চাশ বছর ধ'রে। তা হ'লে তোর মাস্‌তুতো ভাই তোর পথপ্রদর্শক নয় কি? তোর চেয়ে বেশী মগজওয়ালা বা হুঁসিয়ার নয় কি? তোর চেয়ে বেশী জীবন-নিষ্ঠ নয় কি? তোর চেয়ে বেশী বর্তমান-নিষ্ঠ নয় কি? অবশ্য তুই তাকে একঘ'রে ক'রে রেখেছিস্‌। তোর-ই আহাম্মুকি।

যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দু-ব্রাহ্ম

লেখক—সমাজ সম্বন্ধে বুঝা যাচ্ছে যে,—প্রাচীন-পন্থী বা সনাতনী হিন্দুরা আজকাল সবাই ব্রাহ্ম। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে সেকথা বলা চলে কি?

সরকার—জবর ভাবেই বলা চলে। জানিস্,—একালের সনাতনীরা হিন্দুত্ব সম্বন্ধে অহিন্দুদেরকে কী বৃত্তান্ত দেয়? ব্রাহ্মরা এতদিন ধ'রে হিন্দুত্বের আসল আদর্শ সম্বন্ধে যা-কিছু ব'লেছে। হাঁচি-টিক্‌টিকির গৌরব প্রচার ক'রে একালের হিন্দু সুখী হয় না। টিকি-মাহাত্ম্য এ বাজারে টেঁকসই নয়। "বার রাজপুতের তের হাঁড়ী,—" অর্থাৎ জাত্-পাঁতের বাঁধাবাঁধি নিয়ে কোন্ হিন্দু মাতামাতি করে? কেউ নয়। এ-সবের কথা উঠ্‌বা মাত্রই একালের হিন্দুরা "ভদ্রলোকের" আসরে মাথা হেঁট ক'রে থাকে। হিন্দুত্বকে "ভদ্রলোকের পাতে" দেবার সময় তার নতুন মূর্তি দেখানো হয়। একালে হিন্দুত্বের বনিয়াদ বুঝানো হচ্ছে উপনিষদের আত্ম-জ্ঞান দিয়ে। পৌরাণিক দেবদেবীর বহুত্বকে ব্যাখ্যা করা হয় দার্শনিক অদ্বৈত-সিদ্ধির সাহায্যে।

বাবা, ব্রাহ্মরা রামমোহনের শিষ্যরূপে হিন্দুত্বের আর কোন্ রূপ পূজা ক'রেছে। তারা তো এই মূর্তিটাই বাংলার নরনারীকে দেখ্‌তে ব'লেছে একশ' বছর ধ'রে। আজ রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের মারফৎ একটা নয়া হিন্দুত্ব বিশ্ববিজয়ী হ'চ্ছে। সেই নয়া বিবেকানন্দী হিন্দুত্বটা কি প্রাচীন-পন্থী সনাতনী হিন্দুদের হিন্দুত্ব? একদম নয়। বিংশ শতাব্দীর দিগ্‌বিজয়ী হিন্দুত্ব হচ্ছে ষোল-আনা রামমোহনের "আবিষ্কার-করা" মাল। তাকে ব'ল্‌বো,—ব্রাহ্ম-সেবিত উপনিষদের হিন্দুত্ব। ব্রাহ্মসমাজের দান কত বেশী দেখ্‌ছিস্? (পৃঃ ১২১-১২২, ১২৪, ১২৬-১২৭, ১৩৯-১৪১, ১৪৬, ২৮০)

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান্ যে, সব হিন্দুই ব্রাহ্ম হ'য়ে গেছে?

সরকার—কোটি-কোটি লোকের সমাজ-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি আর ধর্ম দু-চার-দশ-বিশ বছরে বদলায় না। তবে ১৯২০ সনের পরবর্তী হিন্দুদের মগজওয়ালা লোকেরা ব্রাহ্ম-বাঞ্ছিত সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের পথে এসে দাঁড়িয়েছে। অনেকে সজ্ঞানে,—অন্যান্যেরা অজ্ঞানে গড্ডালিকার মতন। একমাত্র ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলনের ফলে এই যুগান্তর ঘ'টেছে বল্‌লে ভুল বুঝা হবে। (পৃঃ ২৪৩, ২৪৪, ২৪৬) কিন্তু ব্রাহ্মরা অনেকদিন আগে হ'তে এই যুগান্তেরের পথে এসেছে। এইটাই ব্রাহ্ম মগজের বাহাদুরি।

("মেয়েদের পুরুষ-সাম্য", ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

লেখক—ব্রাহ্ম সংস্কৃতির এমন-কোনো জিনিষ দেখ্‌তে পান যা প্রাচীন-পন্থী হিন্দুরা আজও নিজেদের কাজে লাগাতে পারে নি?

সরকার—ব্রাহ্মদের বিবাহ অথবা শ্রাদ্ধ সম্পর্কিত উৎসব দেখেছিস্? এই সবে ঢাক-ঢোল নেই, হৈ-চৈ নেই, ফুল-বেলপাতা নেই, নোংরামি নেই। অথচ হিন্দুর আসল হিন্দুয়ানি আছে,—উপনিষদের মন্তর আওড়ানো আছে, সেকাল-একালের বৈদিক গান গাওয়া আছে, উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতা-মাফিক বাংলা বক্তৃতা আছে। আর বাঙালীর অতিপ্রিয় চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সবই আছে। প্রাচীন-পন্থী হিন্দুরা ব্রাহ্মদের কাছ থেকে এই নবীনীকৃত পূজা-বিবাহ-শ্রাদ্ধের উৎসব সার্বজনিক ক'রে নিতে শিখুক। লাখ-লাখ লোকের উপকার হবে। ঢাক-ঢোলশূন্য, ফুল-বেলপাতা-হীন, আবর্জনা-বর্জিত হিন্দুর নাম ব্রাহ্ম। বুঝ্‌লি?

লেখক—আপনি পৌরাণিক দেব-দেবী সমূহ আর রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীগুলা হিন্দু সমাজ থেকে বয়কট কর্‌বার পাঁতি দিচ্ছেন?

সরকার—কোনো দিনই সে কথা বল্‌বো না। দেবদেবীর দরকার আছে লাখ-লাখ লোকের। তারা তাই নিয়ে থাক্। ক্ষতি কী? ছবি চাই, মূর্তি-চাই। গল্প চাই, আখ্যায়িকা চাই। গান চাই, বাজনা চাই, নাচ চাই। সঙ্কীর্তন চাই, হরির লুট চাই। কিছুই বাদ দিতে বল্‌ছি না। সার্বজনিক দুর্গাপূজাও থাক্‌বে আর সরস্বতী-পূজার ভাসানের মিছিলও থাক্‌বে। তবে সকলের জন্য,—সকল অবস্থায়,—সকল বয়সে,—এই সব জরুরি নয়। উপনিষদ্-বেদান্ত-গীতা দিয়েই অসংখ্য লোকের পেট ভর্‌তে পারে। এই ধরণের নরনারীর দল যত বেড়ে যায় ততই ভাল। তাদের কাছে দেব-দেবী প্রধানতঃ সুকুমার-শিল্পের চিজ হ'তে বাধ্য। আর রামায়ণ-মহাভারত? সে তো সাহিত্যের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়। এতে আছে আদর্শ, এতে আছে নীতি, এতে আছে দৃষ্টান্ত। এতে আছে চরিত্র-সৃষ্টির বাহাদুরি, এতে আছে অবস্থা-সৃষ্টির ক্যারদানি। এইসব মর্ম-কৌশল অমর। তাতে লাভ ছাড়া লোকসান নেই।

লেখক—আপনি বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ তুলে দিতে চান?

সরকার—এই মুহূর্তে,—যদি ক্ষমতা থাকে বা ক্ষমতা পাওয়া যায়। কমাল পাশা তুর্কীতে কী ক'রে গেছেন জানিস্? খিলাফৎকে মক্কায় পাঠিয়েছেন আর ইস্‌লামের মুণ্ডুপাত ক'রেছেন। নিত্য-নৈমিত্তিক তুর্ক-জীবন ইস্‌লাম-হীন হ'য়ে প'ড়েছে। তা ব'লে ব্যক্তিগত জীবনের যেখানে-যেখানে যতটুকু ধর্মের দরকার ততটুকু ধর্মের জন্য ইস্‌লাম আজও তুর্কীতে বজায় আছে। কমাল পাশার মতন ঝানু-মগজওয়লা, দুঁদে ধর্ম-মেরামতকারী আর জবরদস্ত সমাজ-সংস্কারক ভারতের হিন্দু-মুসলমান আজও পায়দা করতে পারেনি। কমাল পাশার মতন বাপ্-কা-বেটা হিন্দু আমি বাঙালী সমাজের জন্য আজই চাই।

লেখক—ব্রাহ্মবিষয়ক আপনার "ইকুয়েশন" বা সাম্য-সম্বন্ধ সম্পর্কে আর কিছু বল্‌বেন?

সরকার—দেখ্‌তেই পাচ্ছিস ইকুয়েশনটা খুবই সোজা। এই দ্যাখ্ ঃ—

ব্রাহ্ম=গতিশীল, উন্নতি-নিষ্ঠ, প্রগতি-পন্থী।

কোনো-কোনো সময়ে সহজে ইংরেজিতে ব'লে থাকি ঃ—

ব্রাহ্ম=কাল্‌চার্ড (অর্থাৎ সংস্কৃতিসম্পন্ন)

=মডার্নিষ্ট (অর্থাৎ আধুনিক-মেজাজী)।

এই সবই আর এক তরফ থেকে দাঁড়িয়ে যায় নিম্নরূপ ঃ—

ব্রাহ্ম=র‍্যাশন্যালিষ্ট (যুক্তি-নিষ্ঠ)।

মুসলমান না ব্রাহ্মণ?

লেখক—আপনি কি ব্রাহ্ম?

সরকার—কেন্? কী দেখ্‌তে পাচ্ছিস্? কেহ-কেহ আমাকে মুসলমান বলে। কেন জানিস্? আমার মুখে এই ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বছর ধ'রে মুসলমানদের স্বপক্ষে কথা বেরিয়েছে ব'লে। নিউইয়র্কে থাক্‌বার সময় লাজপত রায় আমাকে খৃষ্টিয়ান মনে

কর্‌তেন। আমি পাশ্চাত্য সভ্যতার ভেতর অনন্ত-নিষ্ঠা, অধ্যাত্ম-বোধ, ভগবদ্‌-ভক্তি ইত্যাদি রস দেখ্‌তে পাই ব'লে। আমাকে বাঙালী চিত্র-সমালোচক কেউ-কেউ ফরাসী-প্রেমিক ব'লে গালাগালি ক'রেছে। মার্কিণ-প্রেমিক ব'লে আমার খ্যাতি বা অখ্যাতি আছে কোনো-কোনো লিখিয়ে-পড়িয়ের আসরে। জেনে-না-জেনে অনেকে আমাকে জার্মাণ-প্রেমিক বলে। তা ছাড়া বৃটিশ সংস্কৃতির গুণগান করি ব'লে ছোক্‌রাদের মহলে আমি আবার ইংরেজ-প্রেমিক। চীনারা আমাকে চীন-প্রেমিক ব'লে জানে। জাপানী-প্রেমিক নামও আমার আছে।

ভাব্‌ছি,—লোকে আমাকে ইতালিয়ান-প্রেমিক বলে না কেন? অনেক দিন ধ'রেই ভার্জিল-ভক্ত আর দান্তে-দরদী র'য়েছি। আর মাৎসিনিকেও ঊনবিংশ শতাব্দীর যীশুখৃষ্ট ব'লেছি। তা ছাড়া কেনই বা আজ পর্য্যন্ত রুশ-প্রেমিক নাম পেলাম না। কেন-না লেনিনকে ব'লেছি বিংশ শতাব্দীর যুগাবতার (১৯১৭-১৮)। অধিকন্তু "নবীন রুশিয়ার জীবন-প্রভাত" নামে একটা বইও ঝেড়েছি। (১৯২৩-২৫)। তাতে আছে ট্রট্‌স্‌কি-প্রীতি। (পৃঃ ২৪৯-২৫০)

লেখক—আপনাকে কেহ ব্রাহ্ম বলে নি?

সরকার—নিশ্চয়। কোনো-কোনো সভায় ব'কে বেরিয়ে আস্‌ছি এমন সময়ে দুএকজন জিজ্ঞাসা ক'রেছে ঃ—"আপনি কি ব্রাহ্ম-সমাজের লোক?"

লেখক—লোকেরা আপনাকে আর-কিছু মনে করে না?

সরকার—একটা খবরের কাগজে আমাকে তিলি ব'লেছিল। কোনো তপসিল-ভুক্ত জাতিসমূহের বার্ষিক সম্মেলনে বক্তৃতা ক'রেছিলাম ব'লে। বস্তুতঃ স্বদেশী যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বহুসংখ্যক তিলি আমার বন্ধু। তিলি বন্ধুদের সহযোগিতা না পেলে বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে আমি বেশ-কিছু অকেজো হ'য়ে পড়্‌তাম। আজকাল অনেকে আমাকে সুবর্ণবণিক মনে করে। "সুবর্ণবণিক সমাচার" পত্রিকার মালিক আমার "আর্থিক উন্নতি"'র পরিচালক ব'লে। সত্যিকার কথা,—এ যুগে সুবর্ণবণিক বন্ধুদের সুবর্ণ হৃদয় না পেলে এই অধমের অনেক-কিছুই মাঠে মারা যেত।

লেখক—ব্রাহ্মণরা আপনাকে কী চোখে দেখে?

সরকার—মজার প্রশ্ন। ব্রাহ্মণরাও এই পাপিষ্ঠকে একাল-সেকালের কোনো কালেই বয়কট করেনি। বরাত্‌ ভাল। স্বদেশী যুগে মনোমোহন ভট্টাচার্য, অম্বিকা উকিল ইত্যাদি "ব্রাহ্মণ সভার" মাতব্বরেরা রসিকতা ক'রে আমাকে মাঝে মাঝে বামুন ক'রে নেবার কথাও পাড়্‌তেন। তখনকার দিনে (১৯০৭-১৪) আমি এঁদের আর সতীশ মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ ও রাধাকমল ইত্যাদি ব্রাহ্মণদের সাহচর্যে বামুন-ঘেরাও হ'য়েছিলাম। কাশীর ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডল হ'তে এই পাষণ্ড "বিদ্যা-বৈভব" উপাধি পর্যন্ত পেয়েছিল (১৯১২)।

দেখে-শুনে বন্ধুরা ঠাট্টা ক'রে বল্‌তো ঃ—"কিরে বিনয় সরকার. তোকে চেনা ভার। দুনিয়ার সকলেই তোকে অন্তরঙ্গ ভাবে। ব্যাপার কী বল্‌তো? তুই যে প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু! যে-কোনো লোককে তোর সঙ্গে দেখি সেই তোর সঙ্গে বেশ ঘরোআ লোকের মতন ব্যবহার করে। তোব কাছে ঘর-স্থ অনুভব করে এমন-এমন লোক,—যারা পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখে না!"

বাঙালীজাতের ভবিষ্যৎ

২৬শে ডিসেম্বর ১৯৪২

লেখক—বাঙালী জাতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা? দু-এক কথায় বল্‌তে পারেন?

সরকার—ভাল প্রশ্ন। এতদিন ধ'রে ১৯৪২ সনে তুই আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিস্ ১৯০৫ সনের বাঙালী জাতের কথা। ১৯০৫ সনের কোনো বাঙালী ১৯৪২ সনের বাংলা দেশ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্‌বাণী কর্‌তে পার্‌তো কি? সাঁইত্রিশ বৎসর ফুঁড়ে' দেশ ও দুনিয়ার হালচাল কল্পনা করা সোজা কথা নয়। দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, ১৯০৫ সনের কোনো বাঙালী মনীষী ১৯৪২ সনের বাঙালী জাত ও বাংলা দেশ সম্বন্ধে কোনো ছবি এঁকে যান নি। আজ আমাকে তুই ঠিক যেন আগামী সাঁইত্রিশ বৎসরের পরবর্তী বাংলাদেশের ছবি আঁক্‌তে তলব কর্‌ছিস। যেন হাতের পাঁচ আর কি?

লেখক—তাই তো দেখ্‌ছি, এ কাজটা কঠিনই বটে। ১৯৪২ সম্বন্ধে ১৯০৫-এর লোকেরা কিছু কল্পনা রেখে যেতে পারে নি কেন? কারবারটা এত কঠিন কী জন্য?

সরকার—আজ সাঁইত্রিশ বৎসর আগেকার বাঙালী জাত্‌কে মনে আন্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি। দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, ১৯০৫-এর অনেক জিনিষই আর এ-কালে নেই। বাঙালী জাত্ বদ্‌লে' গেছে বেশ। এইসব বদ্‌লে' যাওয়ার কাণ্ড অত-আগে কল্পনা করা অসম্ভব। বড়-জোর অতি-সাধারণ ও ভাসা-ভাসা ইঙ্গিত করা যেতে পার্‌তো মাত্র। স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের জোরে গতির ঝোঁক বেশী-কিছু দেখা সম্ভব নয়।

লেখক—আপনি আগামী সাঁইত্রিশ বৎসরের পরবর্তী বাংলাদেশ ও বাঙালী জাত্ সম্বন্ধে অতি-সাধারণ আর ভাসা-ভাসা ইঙ্গিতই করুন না?

সরকার—আচ্ছা কল্পনা কর্ যেন ১৯৮০ সনে তোকে ১৯৪২ সনের বাঙালী জাতের স্মৃতি নিয়ে একটা কিছু বক্‌তে বা লিখ্‌তে হচ্ছে। আর তোকে বুঝাতে হচ্ছে ১৯৪২ সনের বাঙালী হ'তে ১৯৮০ সনের বাঙালীর কত ফারাক আর কোন্-কোন্ বিষয়ে ফারাক্।

লেখক—আচ্ছা। তাই কল্পনা করা যাক্। ১৯৮০ সনে ১৯৪২ সনের তুলনায় বাঙালী জাতের নতুন কী-কী দেখ্‌তে পাবো?

সরকার—কল্পনায় বস্তুনিষ্ঠা চালানো উচিত। কিন্তু আবার একমাত্র বস্তুনিষ্ঠার উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। বস্তুতঃ মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে বর্তমান অবস্থা দেখে' ভবিষ্যৎ ঠাওরাতে বসা অনেক সময়ে নেহাৎ দুঃসাহসের কাজ। আর অতীতের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোষ্ঠী তৈরি করা তো বিলকুল আহাম্মুকি। বস্তুনিষ্ঠার সীমা আছে। প্রতি মুহূর্তেই মানুষের জীবনে নতুন-নতুন লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। নয়া-নয়া চরিত্র যখন-তখন নরনারীর ব্যক্তিত্বের ভেতর ফুটে উঠ্‌তে পারে। অধিকন্তু চার-দিককার আবহাওয়া হামেশা বদ্‌লে যাচ্ছে। তার ফলে নয়া-নয়া সুযোগ-সুবিধা অনবরত এসে জুট্‌ছে প্রত্যেক নরনারীর দুয়ারে। এই কারণেই দুনিয়ার সর্বত্র আজকের পারিয়া কাল হ'য়েছে ব্রাহ্মণে পরিণত। আজকের গরীবের হাতে কাল এসেছে ধনসম্পদ। আজকের কাপুরুষ কাল হয়েছে গুণ্ডা। আজকে যে গুণ্ডা কাল সে সেনাপতি। জীবন-বিকাশের কোনো ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই। সংসার চলে আঁকা-বাঁকা পথে। এই সব অনিশ্চিত শক্তি ও সুযোগগুলা বস্তুনিষ্ঠার সংখ্যাশাস্ত্রে পাকড়াও করা যায় না। অথচ এই সব চিজ বর্জন কর্‌লে কল্পনাটা

নেহাৎ হাল্‌কা হ'য়ে যেতে বাধ্য।

লেখক—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কল্পনা কর্‌বার সময় আপনি অনিশ্চিত শক্তি ও সুযোগের মূল্য খুব বেশী দিতে চান?

সরকার—"খুব-বেশী" কিনা জানি না। তবে অনিশ্চিত, অজ্ঞাত, অপরিচিত শক্তি ও সুযোগগুলার দিকে সর্বদাই নজর রাখা উচিত। ১৮৭২ সনে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জাতের ভবিষ্যৎ খানিকটা কল্পনা ক'রেছিলেন। তিনি তাঁর সময়কার বাংলাদেশের অবস্থা দেখে' "অতি-বস্তুনিষ্ঠ"ভাবে ভবিষ্য-বাঙলার মূর্তি দাঁড় করিয়েছিলেন। তাই তাঁর ভবিষ্য-কল্পনায় গলদ র'য়ে গেছে। বাঙালী জাতের ভবিষ্যতে তিনি কর্মযোগ, শক্তিযোগ ইত্যাদি মনুষ্যত্বের বিকাশ আশা করেন নি। ১৯০৫ সনের পরবর্তী বঙ্গ-কৃতিত্ব ও বঙ্গ-কীর্তিগুলা তাঁর কল্পনায় ঠাঁই পায় নি। কাজেই ভবিষ্যদ্বাণী ভুলের খিঁচুড়িতে পরিণত হ'য়েছে। বঙ্কিম-বিষয়ক এই সমালোচনা "পোলিটিক্যাল্ ফিলজফিজ সিন্স ১৯০৫" বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় ভাগে বড় আকারে প্রকাশ ক'রেছি। এই ধরণের ভুল এড়িয়ে চল্‌তে চাস্? তা হ'লে বর্তমান আর অতীতের ওপর অতি-বেশী জোর না দেওয়াই উচিত।

লেখক—অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আর অপরিচিত শক্তি ও সুযোগের দৃষ্টান্ত দেখাতে পারেন,—কোনো বড় বহরের সমাজ, রাষ্ট্র বা দেশের অবস্থা থেকে?

সরকার—১৮৫০-৬৫ সনের জার্মাণি রাষ্ট্রিক হিসাবে "পারিয়া' ছিল ইয়োরোপের ভেতর। আজ ইয়োরোপে সে একমেবাদ্বিতীয়ম্ আর হর্তা-কর্তা-বিধাতা হ'য়ে ব'সেছে (১৯৪১-৪২)। কবি হেমচন্দ্র সেদিনও ভারতীয় কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার যুগে (১৮৮৫-৯০) "অসভ্য জাপান" লিখ্‌তে লজ্জা বোধ করেন নি। আজ সেই জাপান তাবিফ খাচ্ছে কার? বৃটিশ সাম্রাজ্য-বীর চার্চিলের। ১৯১৭ সনেও রুশিয়াকে ইয়োরামেরিকা জান্‌তো চাষীর মুল্লুক, নিরক্ষরের বাথান, কুসংস্কারের নরক-কুণ্ড। আজ রুশ নরনারী ট্যাঙ্ক-বীর ট্র্যাক্টর-বীর, বিজ্ঞান-বীর, লড়াই-দক্ষ, সমাজ-দক্ষ, রাষ্ট্র-দক্ষ মানুষ। এশিয়ায় ও আফ্রিকায় বৃটিশ সাম্রাজ্যের আয়ু বাড়িয়ে দিচ্ছে কে? সোভিয়েট রুশিয়া।

লেখক—আপনি বাঙালী জাতের ভবিষ্য-গঠনে অনিশ্চিত, অজ্ঞাত ও অপরিচিত শক্তি এবং সুযোগের প্রভাব সম্বন্ধে জোর দিতে চান?

সরকাব—জোব দিতে রাজি আছি বেশ-কিছু। ১৯০৫ সনের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী জাতের কতকগুলা সদ্‌গুণ ছিল না। সেই সকল সদ্‌গুণ ১৯০৫-এর পরবর্তী যুগে দেখা দিয়েছে। এসব নিজের চোখে দেখেছি। কানে শোনা কাহিনী নয়। সেইরূপ ১৯৪২ সনে বাঙালী চরিত্রে কতকগুলা সদ্‌গুণ নেই। সেই সকল সদ্‌গুণ ১৯৮০ সনের ভেতর হয়ত দেখা দেবে। এই কথা বিশ্বাস করতে হচ্ছে। সকলকে বিশ্বাস কর্‌তে বল্‌ছি না। আমার মতে কাউকে ভিড়াতে চাই না.—জানিস্ই তো? সুতরাং বাঙ্‌লার নরনারী কয়েক দশকের ভেতর জার্মাণ নরনারীর চরিত্র লাভ কর্‌বে কি না,—তা আজ কে বল্‌তে পারে? রুশ নরনারীর চরিত্রই যে বাংলায দেখা দেবে না,—তাও জোরের সহিত বলা যায় কি? অধিকন্তু বঙ্গ-সমাজ যে জাপানী সমাজের চরিত্রলাভ করবে না,—তাই বা বল্‌তে সাহসী কোন্ মিঞা? সর্বদাই যে-কোনো পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকা যুক্তিসঙ্গত। তবে বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্তমানেব অবস্থাটা সম্বন্ধে সজাগ থাকা কর্তব্য। আমি বস্তুও ছাড়ি না, অনিশ্চিতও ছাড়ি না। আবার আমাব বহুত্ব-নিষ্ঠ বেরিয়ে প'ড়্‌লো , সামাজিক "ঝোঁক্" বিষয়ক সংখ্যাশাস্ত্রে।

উন্নতি-দর্শনে অনিশ্চিতের ঠাঁই

লেখক—আপনি আগে কখনো লেখালেখির ভেতর অনিশ্চিত শক্তি বা সুযোগের কথা ব'লেছেন কি? আপনার মুখে তো সাধারণতঃ মানুষের সজ্ঞান কর্মশক্তির কথাই শুনা যায়?

সরকার—মানুষের জীবনে অনিশ্চিত বা সুযোগের ঠাঁই আমি কোনো দিনই অগ্রাহ্য করিনি। তবে এ সম্বন্ধে বেশী লিখেছি কি না বল্‌তে পারি না। কিন্তু আমার উন্নতি-নিষ্ঠায় আর প্রগতির "ঝোঁক"-বিজ্ঞানে অনিশ্চিত কিছু-না-কিছু সর্বদাই র'য়েছে।

লেখক—এক-আধটা লেখা মনে প'ড়্ছে?

সরকার—বছর ছাব্বিশেক আগেকার একটা লেখা দেখাচ্ছি। ১৯১৬ সনের ২২শে আগষ্ট এই রচনাটা তৈরি হ'য়েছিল। তখন আমি জাপানের তোকিও শহরে. ১৯৪০ সনের ১৫ই মে তারিখে কল্‌কাতায় প্রথম ছাপা হয়। সেই সময় কবি হেমেন্দ্রবিজয় সেনকে দিয়ে ছন্দটা মেরামত করিয়ে নিয়েছিলাম।

লেখক—দেখি :—

"পতিত জমি

আজকে যাকে মূর্খ দেখ, মাথা যে তাদের খুল্‌বে কাল,
আজ যে কৃপণ ধর্‌বে কষে' দান-সাগরে সে তরীর হাল।
মুখ ফোটে না আজও যাহার তাহার বাণীতে ফাট্‌বে ব্যোম,
ব্যস্ত যে আজ মরণ-ভয়ে সাহসে তার কাঁপ্‌বে সোম।
লুকিয়ে যে আজ ঘরের কোনে, কাল চেঁচাবে সে রাস্তায়,
কাপুরষ আজ পঙ্গু হ'লেও কাল দাঁড়াবে নিজের পায়।
জানের মায়া আজ বেশী যার কাল তারই প্রাণ ছেলেখেলা,
স্বার্থসুখে মগ্ন যে আজ কাল দেখি সে ত্যাগের চেলা।
শূকর-বিষ্ঠা কাল তবে তা, যে-প্রতিষ্ঠা আজ চায় প্রাণ,
আজকে কামে মুগ্ধ মানব কাল দেখাবে যোগের ধ্যান।
চোক-কান-মাথা হাত-পা-হৃদয় ফুটবেই একদিন মানুষের,
অজ্ঞান-আঁধার মূর্খতা-ভার চিরস্থায়ী নয় বিশ্বের।
পতিত্ জমি অনেক দেখেও দিই না ছেড়ে চাষের কাজ,
সকল ভূঁয়েই ফল্‌বে সোনা, সবাই সেবক কাল কি আজ।"

আপনি কি বল্‌তে চাচ্ছেন যে, এই সুর আপনার পক্ষে নতুন-কিছু নয়?

সরকার—না। নতুন-কিছু এর ভেতর নেই। এই আমার চোপর দিনরাতের উন্নতি-দর্শন, ভবিষ্যনিষ্ঠা, আশা-তত্ত্ব। একে আমার আটপৌরে সুর বল্‌তে পারি। "সোশিঅলজি অব পপিউলেশন' (লোক-সংখ্যার সমাজশাস্ত্র) বইয়ে (১৯৩৬) অনুন্নতের উন্নতি-বিধান সম্বন্ধে এই মেজাজই দেখানো আছে। এমন কি, 'ইতিহাস-বিজ্ঞান ও মানবজাতির আশা" নামক বাংলা আর ইংরেজি রচনায়ও (১৯১১, ১৯১২) "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার"উপলক্ষ্যে অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আর অপরিচিত সুযোগ ও শক্তির কথা ব'লেছি। সে একত্রিশ বছর আগেকার কথা।

লেখক—অনিশ্চিতের ওপর নির্ভর কর্‌লে মানুষ খানিকটা দুর্বলচিত্ত হ'য়ে পড়ে না

কি?

সরকার—আমার অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আর অপরিচিত শক্তি ও সুযোগ শব্দে দৈব, বরাত্, ভাগ্য, ভগবৎ-কৃপা ইত্যাদি বুঝ্‌তে হবে না। অনিশ্চিত, অপরিচিত, অজ্ঞাত ইত্যাদি সুযোগ-শক্তিগুলাও মানুষেরই সৃষ্টি। এই-সব মানুষের সজ্ঞান ক্রিয়ারই ফল। এক সঙ্গে নানা লোক নানা কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরণের কাজ ক'রে চ'লেছে। এই রকমারি কাজগুলা হয়ত পরস্পর-সংযুক্ত নয়। ঘটনাচক্রে একজন কর্মী অপর কর্মী অথবা তার কর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিব্-হাল নয়।

লেখক—একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাবেন?

সরকার—১৯০৪ সনের বাঙালী জানতো না যে,—১৯০৫ সনে একটা বঙ্গ-বিপ্লব ঘ'ট্‌বে। অথচ বঙ্গ-বিপ্লবের পূর্ববর্তী সব-কিছুই বাংলার নরনারীর সজ্ঞান কাজ ও চিন্তার ফল। কপালের জোরে, ভগবানের কৃপায়, বুজরুকি বা তুকমুকের ফলে বাঙালীরা বিপ্লব সুরু করে নি। আর তখন হ'তে আজ পর্যন্ত সাঁইত্রিশ বছরব্যাপী বিপ্লবের আগাগোড়া সবই মানুষের হাত-পা'র জোরে আর মানুষের মাথার জোরে গড়া হ'য়েছে। অথচ বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার পাঁচ বৎসরের কোনো বাঙালী, কোনো ভারত-সন্তান, কোনো এশিয়ান বা কোনো ইয়োরামেরিকান বঙ্গ-বিপ্লবের ইসারা বা ইঙ্গিত পর্যন্ত পায় নি। বঙ্গ-বিপ্লব এই হিসাবে অনিশ্চিত, অজ্ঞাত ও অপরিচিত শক্তি ও সুযোগের সদ্ব্যবহার থেকে জগতে দেখা দিয়েছে।

লেখক—আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে, আজ হতে ১৯৮০ সনের ভেতরও বাঙালী সমাজে এই ধরণের রকমারি শক্তি ও সুযোগ অজ্ঞাত বা অপরিচিতরূপে থাকতে পারে?

সরকার—ঠিক তাই। সেই সমুদয়ের সদ্ব্যবহার ও বাঙালীর হাত-পা ও মাথার জোরে সাধিত হওয়া খুবই সম্ভব। কাজেই অনিশ্চিত শক্তি ও সুযোগ সমূহকে আমি উন্নতি-দর্শনের জন্য অন্যতম খুঁটারূপে স্বীকার ক'র্‌তে অভ্যস্ত। আগেকার মতন ভবিষ্যতেও বাংলার নরনারী সর্বদাই তাকে-তাকে থাক্‌বে,—ওঁৎ পেতে রইবে। নিত্যি-নতুন সুযোগ টুঁঢবার ফিকির তার মগজে স্থায়ী ঘর ক'রে ব'সেছে। কোথাও বিশ্বশক্তির জবর রূপান্তর ঘট্‌বা মাত্র তা' থেকে বাঙালীর বাচ্চারা স্বদেশেব জন্য মস্ত দাঁ মেরে নিতে পার্‌বে। উন্নতির "ঝোঁক"-বিষয়ক সংখ্যাশাস্ত্রে একথা বিশ্বাস করা আজগুবিও নয়, কঠিনও নয়।

১৯৮০ সনের বাঙালী

লেখক—ত হ'লে অনিশ্চিতের কথা বাদ দিচ্ছি। একমাত্র বস্তুনিষ্ঠার জোরে ভবিষ্যতের বাংলা দেশ সম্বন্ধে কী দেখ্‌তে পাবো?

সরকার—নতুন-নতুন চিজ দেখতে পাবি ঢের। ১৯০৫-এর পরি প্রেক্ষিতে ১৯৪২ সন বাঙালী জাতের ভেতর অনেক-কিছু নতুন এনে হাজির ক'রেছে। সেই সবেরই জের দেখ্‌তে পাবি তুই ১৯৮০ সনে। নতুন-কিছুগুলা সংখ্যাশাস্ত্রের হিসাবে হবে অনেক। আর আকার-প্রকারে হবে সে-সব রকমারি। ১৯৪২ সনের বাঙালীই যে ১৯৮০ সনের বাঙালীতে গিয়ে ঠেকেছে তাই বিশ্বাস করা কঠিন মনে হ'তে পারে। বিপ্লব, রদ-বদল, পরিবর্তন, রূপান্তর গুলা দেখাবে খুব জবরদস্ত।

লেখক—কোন্ কোন্ দিকে পরিবর্তন, রদ-বদল বা বিপ্লব দেখ্‌তে পাবো বেশী-বেশী?

সরকার—"নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" (দুই খণ্ড ১৯৩২) আর "বাড়্‌তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) এই দুই বইয়ে বিপ্লব বা রূপান্তর গুলার "ঝোঁক", গতি ও ধারা দেখিয়ে দিয়েছি। এই আট-দশ বছরে আমার মত বড়-একটা বদলায় নি। ১৯৩৯ সনের পরবর্তী বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের আবহাওয়ায়ও একপ্রকার বদ্‌লায়নি।

লেখক—এত-বড় লড়াইয়ের প্রভাবেও আপনি আপনার ১৯৩২-৩৪ সনের মত বদ্‌লাচ্ছেন না?

সরকার—না। মাস দেড়েক ধ'রে চাটগাঁয় আর আসামের উত্তর-পূর্ব কোনে জাপানী বোমা পড়্‌ছে। এমন কি এই সেদিন,—২০শে তারিখে—কল্‌কাতায়ও জাপানী বোমা প'ড়েছে। আজ পর্য্যন্ত চার রাত্ বোমা পড়্‌লো। দেখ্‌ছিস তো লোকজনের মাথা ঠিক নেই। কল্‌কাতা ছেড়ে চ'লেছে অগণিত লোকের সার। তবুও দেশোন্নতির কর্ম-কৌশল, ধারা ও পথ সম্বন্ধে নতুন-কিছু পাচ্ছি না। সমাজের ক্রমবিকাশের প্রণালী সম্বন্ধে বছর কয়েক আগে যা ভেবেছি তাই এখনো ভাব্‌ছি। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে দশ বছরের কাজ হয়ত তিন বছরে শেষ হ'তে পারে। কিন্তু দেশোন্নতির উপায় আর ধাপ গুলা বদ্‌লাতে পারে না। এই হচ্ছে আমার উন্নতি-তত্ত্বের বা "ঝোঁক-দর্শনের" আসল কথা। ১৯৮০ সনের বাঙালীকে আজ হ'তে শেষ পর্যন্ত সবক'টা প্রণালীই কাজে লাগাতে হবে। কোনো পথ এড়িয়ে শেষ ধাপে পৌঁছানো সম্ভবপর হবে না।

লেখক—আচ্ছা ১৯৪২ হতে ১৯৮০ সনের ভেতরকার প্রণালীগুলা বলুন। শেষ ধাপে বাঙালী জাতের অবস্থা কিরূপ দেখ্‌তে পাবো?

সরকার—প্রথমেই বল্‌বো যে,—বাঙ্‌লাদেশের চৌহদ্দি বদ্‌লে যাবে। যে-চার সীমানার ভেতর আজ বাঙ্‌লা দেশ র'য়েছে সেই চার-সীমানা থাক্‌বে না। নতুন-নতুন সীমানা কায়েম হবে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে,—বাঙালী জাতের ভেতর নয়া-নয়া হাড়-মাসের নরনারী খানিকটা মাথা চেঁড়ে তুলবে। বাঙালী-জাতের কৃতিত্ব বল্‌লে নতুন-নতুন চেহারার অনেক লোকের কৃতিত্ব বুঝা হবে। আজকাল যে-সব জাত বাঙলার নরনারী হিসাবে অনেকটা নগণ্য তাদের অনেকে বেশ-কিছু গণ্যমান্য হ'তে থাক্‌বে।

তৃতীয় কথা—বাঙলা ভাষার ভেতর এই সব নয়া-নয়া হাড়মাস-ওয়ালা লোকজনের হরেক-রকম শব্দ ঢুকে' যাবে। বাংলা ভাষার সুরৎ যারপরনাই বদ্‌লাবে। ১৯০৫-এর তুলনায় ১৯৪২ সনে বাংলা ভাষায় যতটা রূপান্তর ঘ'টেছে। ১৯৪২-এর তুলনায় ১৯৮০ সনে তার চেয়ে বেশী রূপান্তর ঘ'ট্‌বে। আবার সংখ্যার কথাই ব'ল্‌ছি।

("দেশী বা গ্রাম্য শব্দের রেওয়াজ", ৫ই নবেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

চতুর্থ দফায় বল্‌বো যে,—বিয়ের লেনদেনে একালের জাত-পাঁত অনেকটা ক'মে আস্‌বে। অনুলোম প্রতিলোমের পাঁতি ভেঙে যাবে বেশ উল্লেখযোগ্য ভাবে। বংশ-গৌরব, ঠিকুজি-মাহাত্ম্য, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, জলচল ইত্যাদি পারিভাষিকের আধিপত্য বড়-একটা দেখা যাবে না। জাতিভেদহীন হিন্দুত্ব হিন্দু-সমাজের ভেতর সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে সুরু কর্‌বে। বিবাহের বন্ধনে হিন্দু-মুসলমানের মিলনও চল্‌তে থাক্‌বে খানিকটা বিস্তৃতরূপে।

লেখক—বঙ্গ-সংস্কৃতির আকার-প্রকার কিরূপ দেখাবে?

সরকার—দেশী-বিদেশী আদর্শ নিয়ে ১৯৮০ সনের বাঙালী বেশী-কিছু মাথা ঘামাবে

না। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মামলা একপ্রকার উঠে যাবে। হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক লেনদেন ও সমঝৌতা দেখা দিবে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ-কর্মে। সর্বত্রই সকল কর্মক্ষেত্রেই মালুম হবে সংস্কৃতিসমন্বয়, সংস্কৃতির মেল-মেশ, সাংস্কৃতিক বর্ণসঙ্কর। বাঙালীরা সাংস্কৃতিক সর্বভুকরূপে দুনিয়ায় পরিচিত থাক্‌বে।

("১৯০৫ সনের পরবর্তী ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী", ১৩ই অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য।)

লেখক—সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের কিছু ইঙ্গিত কর্‌তে পারেন?

সরকার—সংস্কৃতি সম্বন্ধে সর্বভুকের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি সুকুমার শিল্পের তরফ থেকে। ১৯০৫-১৪ সনের যুগে "ভারতীয় শিল্প-কলা"র ভাবুকতায় যুবক বাংলা মস্‌গুল ছিল। "অবনীন্দ্র-মণ্ডলে"র নন্দলাল বসু সেই ধারার অন্যতম বর্তমান প্রতিনিধি। কিন্তু তথাকথিত "ভারতীয় শিল্পকলার" ভাবুকতা দিয়ে আর বাঙালী জাতের পেট ভর্‌বে না।

লেখক—তার কোনো চিহ্ন বর্তমানে দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—নিশ্চয়। তার নমুনা ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে। যামিনী রায়ের হাতে বাংলার পটশিল্প বাংলা ও ভারত ছাড়িয়ে একালের ভবিষ্যপন্থী ইয়োরোপেরও সাক্‌রেতি কর্‌তে অভ্যস্ত। অতুল বসুর প্রতিকৃতি-চিত্রণে দেশী-বিদেশীর মামলা নেই। এই শিল্প সোজাসুজি ও আন্তরিকভাবে পাশ্চাত্য। মুকুল দে-প্রবর্তিত এচিং (তক্ষণ) গুলাও বিনা বাক্য-ব্যয়ে বিদেশী কায়দার মাল। ভবানী লাহার কাজে ফরাসী রূপ-রং গুলজার। বছর দশেক ধ'রে কল্‌কাতার সুকুমার শিল্প-প্রদর্শনীতে হরেক-রকম রীতি দেখা যাচ্ছে। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর-প্রবর্তিত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট্‌স (সুকুমার শিল্প পরিষৎ) ফি বছর মিউজিয়ামে দেশী ও বিদেশী দুই রীতির কাজ একসঙ্গে দেখিয়েছে। ১৯৮০ সনের বঙ্গ-শিল্পীরা এইরূপ সর্বভুকের আদর্শেই বেশী-বেশী প্রেরণা পাবে।

লেখক—আর্থিক ক্ষেত্রে ১৯৮০ সনের বাঙালী জাতের অবস্থা কিরূপ মনে হচ্ছে?

সরকার—যন্ত্রনিষ্ঠ শিল্পের কারবারে বাঙালী জাতের হাত-পা ও মগজ কিছু-কিছু পেকে উঠবে। ব্যাঙ্ক, বীমা, বহির্বাণিজ্যও খানিকটা বড়-বহরে বাঙালীর হাতে আস্‌বে। কিন্তু মোটের উপর বাঙালী জাত্‌ কৃষি-সম্বলই র'য়ে যাবে। মাথা-পিছু দারিদ্র্য বাংলার নর-নারীর বড়-বেশী কমবে না। আর্থিক উন্নতির মাত্রা থাক্‌বে যৎসামান্য মাত্র।

তবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সার্বজনিক স্বাস্থ্যের দিকে বাঙালী জাতের নজর যাবে। বিধান রায় ও অমূল্য উকিল আর সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগের অনিল চ্যাটার্জি ইত্যাদি ডাক্তারদের প্রচারিত পথে বাঙালী জাত্‌ স্বাস্থ্যের আন্দোলনে নজর দিতে সুরু কর্‌বে। ফলতঃ মৃত্যুহার ক'মে আস্‌বে। জন্মহার কিছু কম্‌তে পারে। মোটের উপর বৃদ্ধি-হার নিচু, খাটো বা অল্পমাত্র থাক্‌বে।

লেখক—বাঙালী সমাজে সোশ্যালিজ্‌মের প্রভাব কিরূপ হবে?

সরকার—একালে সমাজ-তন্ত্র (সোশ্যালিজ্‌ম্‌) গোটা দুনিয়ার আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থায় প্রথম স্বীকার্য বা হাতের পাঁচ বিশেষ। বাংলাদেশেও সেই অবস্থা প্রায় আস'-আস' হ'য়েছে। বাঙালী সমাজে সমাজ-তন্ত্রের দিগ্‌বিজয় সম্বন্ধে নতুন-কিছু বল্‌বার নেই। তবে জেনে রাখা উচিত যে, এই সমাজ-তন্ত্র হবে একালের জার্মাণ ইংরেজ সমাজ-তন্ত্রের মাস্‌তুতো ভাই। সোভিয়েট রুশিয়ার অন্য ঢঙের সমাজ-তন্ত্র কায়েম হয়েছে। তাকে বলি কমিউনিজ্‌ম্‌। রুশ সমাজ-তন্ত্র বিলাতেও নেই আর জার্মাণিতেও নেই। বাঙালীর চরিত্রে আর ক্ষমতায় আজ পর্যন্ত এমন কিছু দেখা যাচ্ছে না যার ফলে ১৯৮০ সনের যুগে রুশ

কায়দার সমাজ-তন্ত্র কায়েম হ'তে পারে। তবে "অনিশ্চিত" শক্তি ও সুযোগের কার্যফল আলাদা।

লেখক—বিদেশে বাঙালীর নাম-ডাক ১৯৮০ সনে কিরূপ থাক্‌বে?

সরকার—১৯০৫ সনে বাঙালীর নামডাক বিদেশে ছিল কতটা? ধরা যাক্ তার কিম্মৎ হ'চ্ছে "ক"। ১৯৪২ সনে এই নামডাকের কিম্মৎ কত? আমার বিবেচনায় কম্‌সে-কম্ পঁচিশ গুণ অর্থাৎ ২৫ ক। তাহ'লে ১৯৮০ সনে দেখ্‌তে পাচ্ছি কিম্মতের পরিমাণ ২৫০০ ক। বাংলার নরনারী বিদেশের সঙ্গে আনাগোনায়, মেলামেশায়, কাজকর্মে, টক্করে-সহযোগিতায় এগিয়ে যাবে এক-শ' গুণ। এই আমার বিশ্বাস। "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার" চল্‌বে যখন তখন যেখানে-সেখানে। এ চিজটা দাঁড়িয়ে যাবে ডাল-ভাত খাবার মতন। (পৃঃ ১৬৭, ২২৯-২৩০, ৩৫০)

বাঙালীর বাচ্চাকে বিদেশ-দক্ষ কর্‌বার কাজে যোগেন ঘোষ উঠে-প'ড়ে লেগেছিলেন ১৯০৩-৪ সনে। বঙ্গ-বিপ্লবের আর্থিক আন্দোলনে তাঁর বিদেশে-প্রেরণ-সমিতির কার্যফল বিপুল। ১৯৪২ সনে বিদেশ-দক্ষ বাঙালীর দল বহরে বেশ পুরু। এই দলের আকার-প্রকার আগামী দশকের ভেতর অভাবনীয়রূপে বেড়ে যাবে। তার পরে বাড়্‌বে আরও বেশী-বেশী।

লেখক—১৯৮০ সনের ভেতর দুনিয়ায় লড়াইয়ের অবস্থা কিরূপ দেখ্‌ছেন?

সরকার—অনেকবার নানা জায়গায় ব'লেছি যে, বর্তমানের লড়াই হ'চ্ছে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্র। এটা খতম হ'তে পারে ১৯৪৫ * সনে তৃতীয় কুরুক্ষেত্রের যোগ দেখ্‌তে পাচ্ছি ১৯৬০-৬৫ অথবা ১৯৬৫-৭০ সনের যুগে। এই সব কথা "পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ সিন্স ১৯০৫" বইয়ের দ্বিতীয় ভাগের তিন খণ্ডের (১৯৪২) ভেতর নানা উপলক্ষ্যে আলোচিত হ'য়েছে। ১৯৮০ সনের পূর্বেই একটা মহালড়াইয়ের সম্ভাবনা আছে। আর তাতেও বাঙালী জাত্ "বাড়্‌তির পথে"ই এগিয়ে চল্‌বে।

লেখক—বাঙালীর মগজ ভবিষ্যতে দাঁড়াবে কিরূপ?

সরকার—বাঙালীর মগজ অপেক্ষাকৃত যুক্তি-নিষ্ঠ, বিজ্ঞান-নিষ্ঠ ও যন্ত্র-নিষ্ঠ হবে। ১৯৮০ সনের বিচারে ১৯৪২ সনের কাজকর্মের অনেক-কিছু বিবেচিত হবে আহাম্মুকি ও পুরাপুরি বর্জনীয় মাল। খানিকটা হয়তো পরিশোধিত ও রূপান্তরিত হ'য়ে থেকে যাবে। সামান্য মাত্র দাঁড়িয়ে থাক্‌বে টেঁক্‌সই ভাবে। একালের অনেক হোমরা-চোমরাকেই ১৯৮০ সনের ছোকরারা নকড়া-ছকড়া ভাব্‌বে।

লেখক—শিক্ষার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াবে?

সরকার—আজকাল শতকরা দশজন মাত্র লিখ্‌তে পড়্‌তে পারে। ১৯৮০ সনের অবস্থায় এই অনুপাত হয়ত শতকরা পঁচিশ জন,—বড়জোর পঁয়ত্রিশ জন,—পর্যন্ত উঠবে। তার চেয়ে বেশী উঁচু হার এখনো,—"বস্তুনিষ্ঠ"ভাবে, অর্থাৎ সংখ্যাশাস্ত্রের "ঝোঁক" দেখে'—বিশ্বাস করতে পার্‌ছি না।

* ১৯৪৪ সনের জুন মাসে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে, এখনো বছর পাঁচ-ছয়েক লাগ্‌বে। ১৯৪৯-৫০ এর পূর্বে এই লড়াইএর হেস্ত-নেস্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। কাজেই তৃতীয় কুরুক্ষেত্র মাথা তুল্‌বে ১৯৭৫-এর সম-সম কালে।

নজরুল ও অন্নদাশঙ্করের পরবর্তী ধাপ

লেখক—বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ কেমন মনে হচ্ছে?

সরকার—কাব্য-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত করা কঠিন। তবে এসব জিনিস সম্বন্ধে জেনে রাখা উচিত—"মুহূর্তেই অসম্ভব আসে কোথা হ'তে?" সত্যেন দত্ত'র পরবর্তী ধাপ নজরুল ইসলাম। ১৯৮০ সনের যুগে বঙ্গ-কবিকে হ'তে হবে নজরুলের পরবর্তী ধাপ।

গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধে বল্‌তে ভরসা হয়। বঙ্কিম-রবি-শরৎ-সাহিত্যের গল্প ও উপন্যাস তলিয়ে যাবে। শক্তিশালী, নিরেট-চিন্তাওয়ালা লেখকদের হাতে বস্তুনিষ্ঠ আর তাজা-তাজা চরিত্রসমূহ বেরিয়ে আস্‌বে। নতুন-নতুন ঘটনা-সৃষ্টির কায়দায়ও তাঁদের উপন্যাস-শিল্প উল্লেখযোগ্য হবে। সে-সাহিত্য আজকালকার রচনাবলীর মতন "প্রচার"-সাহিত্য থাক্‌বে না, হবে খাঁটি শিল্প-সামগ্রী। দরদগুলা মালুম হবে সহজ, স্বাভাবিক, অকৃত্রিম ও মানবনিষ্ঠ।

লেখক—উপন্যাস-সাহিত্য বিষয়ক কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলুন।

সরকার—বিভূতি-তারাশঙ্কর-শৈলজা-মাণিক ইত্যাদি বন্দ্যোপাধ্যায়-চট্টোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়ের দল একালের গদ্য-সাহিত্য আগ্‌লে ব'সে আছেন। এঁরা বঙ্কিম-রবি-শরতের মাস্‌তুতো ভাই। এই "ব্রাহ্মণোক্রেসি" বা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ১৯৮০ সনের সাহিত্য-স্রষ্টাদের ভেতর থাক্‌বে কি না সন্দেহ। অধিকন্তু তথাকথিত ভদ্রলোক আর মধ্যবিত্ত মেজাজের লোকেরা হয়ত সেই ভবিষ্য গদ্য-সাহিতের স্রষ্টাদের প্রধান নয়। মনে হচ্ছে যে, মুসলমান সমাজের আর অনুন্নত হিন্দুশ্রেণীর প্রতিনিধিরাই ১৯৮০ সনের বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা হবেন। তাঁদের রচনায়ই বন্ধ হ'য়ে যাবে একালের কৃত্রিম, লোক-দেখানো পল্লী-মুখো "প্রচার", গরীব-মুখো প্রচার, চাষী-মুখো "প্রচার" আর মজুর-মুখো "প্রচার"। একালের সৌখীন গণ-নিষ্ঠা আর সৌখীন সমাজ-তান্ত্রিকতা আর সেকালে দেখা যাবে না।

সেকালের লেখকদের হাড়মাস স্বভাবতই পল্লী-নিষ্ঠ, গরীব-নিষ্ঠ, চাষী-নিষ্ঠ আর মজুর-নিষ্ঠ। তাঁদেরকে জোর-জবরদস্তি ক'রে পল্লীয়ানা, গরীবিয়ানা, চাষী-পনা আর মজুর-পনা জাহির কর্‌বার দরকার হবে না। তাঁদের জন্ম আর নিত্যনৈমিত্তিক জীবনই তাঁদের শিল্পসৃষ্টিকে বাংলার পল্লী-শহরের আর চাষী মজুরের আবহাওয়ার সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে গেঁথে রেখে দেবে।

লেখক—সেই উপন্যাস-সাহিত্যের আর কোনো লক্ষণ আছে?

সরকার—অধিকন্তু একমাত্র বাঙালী নরনারীর অভিজ্ঞতাওয়ালা লেখকেরা ১৯৮০ সনের বাঙালীকে তাতাতে পার্‌বে না। অ-বাঙালী, অ-ভারতীয়, অন্‌-এশিয়ান ও ইয়োরামেরিকান নরনারীর হাত-পা আর হৃদয়-মুড়োর সঙ্গে জ্যান্ত, ঘনিষ্ঠ ও নিবিড় পরিচয়ওয়ালা বাঙালী লেখকেরা হবেন সেই যুগের সাহিত্যবীর।

লেখক—একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—বর্তমানে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরবর্তী ধাপ শরৎ-বিভূতি-মাণিক নন রবীন্দ্রনাথের আসল পরবর্তী ধাপ অন্নদাশঙ্কর রায়। ১৯৮০ সনের ঘটনা-স্রষ্টা, চরিত্র-স্রষ্টা, অবস্থা-স্রষ্টা, মানব-নিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ বাঙালী লেখকেরা হবেন অন্নদাশঙ্করের পরবর্তী ধাপ। একমাত্র পল্লীনিষ্ঠায় আর বঙ্গ-নিষ্ঠায় বাংলার পাঠকের প্রাণ ছোঁআ সম্ভবপর নয়। তার জন্য চাই মানব-নিষ্ঠা আর দুনিয়া-নিষ্ঠা।

লেখক—"প্রচার"-সাহিত্য আর খাঁটি সাহিত্যে কী প্রভেদ?

সরকার—প্রভেদ জবর। একমাত্র "বাণী", বয়েৎ, আদর্শ বা কর্তব্য প্রচারের জোরে খাঁটি সাহিত্য ঝাড়া যায় না। তার জন্য চাই ব্যক্তি-সৃষ্টি, ঘটনা সৃষ্টি আর অবস্থা-সৃষ্টি। ("রবীন্দ্র-সাহিত্যের অসম্পূর্ণতা," ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সুরেন্দ্রনাথ হ'তে শ্যামাপ্রসাদ

লেখক—আপনার প্রচারিত উন্নতির ধাপ বা স্তরগুলা বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক জীবনের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে খাটিয়ে দেখাবেন কি?

সরকার—রাষ্ট্রিক জীবনকে দুই তরফ হ'তে দেখা চলে। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রশাসনের দিক। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র-চিন্তা, রাষ্ট্র-দর্শন, রাষ্ট্রিক বুখ্নি, রাষ্ট্রিক বাণী বা রাষ্ট্রিক আদর্শের দিক। এই দুই দিকে রাষ্ট্রিক বাংলায় প্রথম ধাপ, দ্বিতীয় ধাপ, তৃতীয় ধাপ ইত্যাদি ধাপের সারি দেখা সম্ভব। ধাপগুলাকে খুঁটা বা স্তম্ভও বল্‌তে পারি। এ-সবকে কখনো-কখনো "ডোজ" বা মাত্রাও ব'লে থাকি। এগুলা সামাজিক "ঝোঁকের" চিহ্নোৎ। ঝোঁকগুলা ধারা মাফিক চলে।

লেখক—রাষ্ট্রশাসন সম্বন্ধে বাংলাদেশে ধাপের সারি বা ধারা কিরূপ?

সরকাব—বিংশ শতাব্দীর হিসাব দিচ্ছি। কালানুসারে ধাপ বা খুঁটা গুলা অর্থাৎ শাসন-প্রণালীর "ঝোঁক" নিম্নরূপ ঃ—

১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের আইন।

১৯০৯ মিণ্টো-মর্লে-মার্কা ভারতশাসন-বিষয়ক আইন।

১৯১১ বঙ্গভঙ্গ-রদের আইন।

১৯১৯ মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড-মার্কা ভারতশাসন-বিষয়ক আইন।

১৯৩৫ ভারত-শাসনবিষয়ক আইন।

১৯০৫ হ'তে ১৯৩৫ পর্যন্ত আইনের বলে ভারতের জনসাধারণ কিছু-কিছু অধিকার বা এক্‌তিয়ার পেয়েছে। ১৯১৯ সনে পেয়েছে ১৯০৯ সনের তুলনায় অনেক-বেশী অধিকার। ১৯৩৫ সনের আইনে পাওয়া অধিকারগুলা পূর্ববর্তী অধিকারের চেয়েও বেশ-কিছু বেশী। ১৯৪২ সনে বাঙালী ও অন্যান্য ভারতবাসী ১৯৩৫ সনের অধিকার-সমূহকে অতি-নগণ্য সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত। এরি নাম স্বরাজের বা স্বাধীনতার ধাপে-ধাপে গতি, উন্নতি ও প্রগতি। "ঝোঁক"টা আর ধারাটা সহজেই বুঝা যাচ্ছে।

লেখক—রাষ্ট্র-চিন্তায় বা রাষ্ট্র-দর্শনে ধাপে-ধাপে প্রগতির স্তম্ভগুলা দেখাবেন?

সরকার—আবার বিংশ শতাব্দীর হিসাবই দিচ্ছি। কাল-মাফিক দাঁড়াবে নিম্নের স্তম্ভ-সারিঃ—

১৯০৫—সুরেন ব্যানার্জির কংগ্রেসী রাষ্ট্র-দর্শন।

১৯০৫-০৮—বিপিন পাল ও অরবিন্দ কর্তৃক প্রবর্তিত বঙ্গ-বিপ্লবের রাষ্ট্র-দর্শন।

১৯২০-২৩—চিত্তরঞ্জন দাশ-প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ দলের মণ্টেগু-আইন-বিরোধী রাষ্ট্রদর্শন।

১৯৩৭-৪০—সুভাষ বসুর ১৯৩৫-আইন-বিরোধী রাষ্ট্রদর্শন।

১৯৪২ মার্চ-ডিসেম্বর—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রচারিত লাটসাহেবের

শাসনপ্রণালী-বিরোধী রাষ্ট্রদর্শন।

কোথায় ১৯০৫ সনের সুরেন্দ্রনাথ, বা বিপিন পাল ও অরবিন্দ? আর কোথায় ১৯৪২ সনের মার্চ হ'তে ডিসেম্বরের শ্যামাপ্রসাদ? দুই-ই বাঙালী, একই বাংলা দেশ আর বাঙালী জাত্। কিন্তু বাঙালীতে-বাঙালীতে আর বাংলায়-বাংলায় ফারাক কতটা? আশ্‌মানে আর জমিনে যে-ফারাক। সাঁইত্রিশ বৎসরে বাঙালীর সুরৎ ব'দ্‌লে গেছে। বাঙালীর আওয়াজ ব'দ্‌লে গেছে। বাঙালীর মেজাজ ব'দ্‌লে গেছে। বাঙালী জাতের অবস্থাটা ঠিক যেন হুঁকোর নল্‌-নল্‌চে দুই-ই ব'দ্‌লে যাওয়ার অবস্থা। একটা বিলকুল নয়া বাংলার ভেতর র'য়েছি। প্রগতির "ঝোঁক" অতি-স্পষ্ট।

লেখক—আপনি শ্যামাপ্রসাদকে রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে ফেল্‌ছেন আর রাষ্ট্রিকদের ভেতর এত-উঁচু ঠাঁই দিচ্ছেন? তাঁকে তো দেশের লোক শিক্ষা-ক্ষেত্রের নেতা ব'লে জানে। মন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেওয়ায় এমন বিশেষ কী করা হ'য়েছে?

সরকার—প্রথমতঃ বুঝা যাচ্ছে যে. মন্ত্রীগিরিতে ইস্তফা দেওয়ার ভেতর একটা বড়-গোছের স্বার্থত্যাগ র'য়েছে। অনেক দিন ধ'রে বাঙালীর সার্বজনিক জীবনে এই ধরণের আর এই দরের স্বার্থত্যাগ দেখা যায় নি। দ্বিতীয়তঃ, সরকারী শাসন-বিভাগের কাজকর্ম সম্বন্ধে কড়া সমালোচনা বুঝাবার জন্য মন্ত্রীগিরি ছেড়ে দেওয়া যারপর নাই জরুরি ছিল। তৃতীয়তঃ, মন্ত্রিত্ব ইস্তফা দেবার জন্য আবশ্যক বুকের পাটা, সাহস আর তেজস্বিতা। এই সাহসিকতার ক্ষেত্রে বাঙালীর নামডাক নতুন ভাবে জারি হ'লো। দুনিয়ার নরনারী তার হিসাব রাখ্‌বে। সকল দিক হ'তে বাঙালী জাতের ইজ্জদ বেড়েছে পঞ্চাশ হাত। "সামাজিক" ঝোঁক জরিপ করার ভাষা চালাচ্ছি।

লেখক—শ্যামাপ্রসাদকে রাষ্ট্রিক কর্মক্ষেত্রে লোকেরা বড়-বেশী দেখেছি কি?

সরকার—১৯৪০ সনের জুন মাসে তাঁর এক সার্বজনিক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। তাতে লাট সাহেবকে পরামর্শ দেওয়া হ'য়েছিল বাঙালীকে সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিক রূপে গ'ড়ে তুল্‌বার স্বপক্ষে। এই বছর (১৯৪২) মার্চ-এপ্রিল মাসে ষ্ট্যাফোর্ড কৃপস্‌ এসেছিলেন ভারতে। ভারতশাসন বিষয়ক একটা খসড়া ছিল তাঁর হাতে। এই খসড়ার তীব্র সমালোচক ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

লেখক—আমার মনে হয় যে, শ্যামাপ্রসাদ রাষ্ট্রনৈতিক কর্মক্ষেত্রে সুপরিচিত নন।

সরকার—বোধ হয় তাই! আমি বড়-বেশী খবর রাখি না। কিন্তু "স্যাক্‌রার ঠুকুর-ঠাকুর আর কামারের এক ঘা" লাগিয়ে দিয়েছেন মন্ত্রীগিরিতে ইস্তাফা দিয়ে। লোকেরা হয়ত তাঁর কর্তব্যজ্ঞান ও স্বদেশ-নিষ্ঠা সম্বন্ধে এতটা জানতো না। আমার বিশ্বাস,—হয়ত আমার ভুল হ'তে পারে,—রাষ্ট্রিক মূর্তিতে এই তাঁর সত্যিকার প্রথম আবির্ভাব।

লেখক—মন্ত্রীগিরিতে ইস্তাফা দেওয়ার উপর আপনি এত জোর দিচ্ছেন?

সরকার—কী ক'র্‌বো বল্‌? আমি রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রের কেজো লোক নই। দূর থেকে মানুষের মেজাজ আর মগজ জরীপ করা আমার অন্যতম বাতিক। আমার মনে হচ্ছে যেন বাঙালী মেজাজের আবার আরেক মোড়-ফেরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। একটা নয়া বাঙলার গোড়াপত্তনই যেন হ'তে চ'লেছে। সুরেন (১৯০৫) হ'তে সুভাষ (১৯৩৭-৪০) পর্যন্ত সবই প্রায় তলিয়ে যাচ্ছে। একটা নতুন-কিছু খাড়া হব'-হব'। অবশ্য হাজার বার ব'লেছি,—আমার মতামতের দাম এক দামড়িও নয়। রাষ্ট্রিক দলের লোকেরা আমাকে আহাম্মুক ব'লেই জানে।

রাষ্ট্রিক ভারত ও বিশ্বশক্তি

লেখক—ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন দুনিয়ায় পরিচিত কি?

সরকার—তাও আবার ব'ল্‌তে হবে? আচ্ছা, প্রথমেই কয়েকজন মার্কিন সুধীর নাম ক'রছি। রজার বল্‌ড়ুইন, স্টুয়ার্ট চেজ্‌, নরম্যান টমাস, আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ার, ফ্রেড্‌রিক শুম্যান, উইলিয়াম হকিং, প্যর্ল্‌ বাক্‌ ইত্যাদি লেখকেরা ভারতবর্ষ নিয়ে কিছু-কিছু মাথা ঘামাচ্ছেন। ত ছাড়া "নেশান," "নিউ রিপাব্লিক," "সার্ভে," "লাইফ," "টাইম" ইত্যাদি উদারনৈতিক মার্কিন পত্রিকার সম্পাদকেরা ভারতীয় মেজাজের ও ভারতীয় দাবীর সঙ্গে আত্মীয়তা কায়েম কর্‌তে সচেষ্ট।

লেখক—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রদ-বদলের চিহ্ন কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—দেখ্‌তেই পাচ্ছিস যে,—দেশ-বিদেশের কাগজে আজকাল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক খবর বেরোয়। সকলেই অবশ্য ভারতবাসীর চরম বাণী প্রচার করে না। লম্বা-লম্বা ভারতীয় দাবীগুলার স্বপক্ষে উকিলি করাও সব বিদেশী সংবাদপত্রের মতলব নয়। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত নানা জনপদে ভারতীয় আন্দোলনটা এই লড়াইযের যুগে বেশ-কিছু জেগে র'য়েছে। তা ছাড়া মার্কিন মুল্লুকেও ভারতীয় স্বাধীনতার স্বপক্ষে নরম-গরম দুই ধরণের উকিলই দেখা যায়। জার্মাণি, ইতালি, জাপান ইত্যাদি দেশে ভারতীয় আন্দোলনের খবর কিরূপ বা কতটা প্রচারিত হচ্ছে জান্‌বার উপায় নেই। আন্‌কারা হ'তে মস্কো পর্যন্ত আর চুংকিং হ'তে নিউইয়র্ক পর্যন্ত বিশ্বশক্তির বেপারীরা আজকের ভারতীয় মেজাজটা ছুঁয়ে জীবন চালাতে অভ্যস্ত।

হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-মিলন অবশ্যম্ভাবী

লেখক—১৯৮০ সনের যুগে বাঙালী জাতের ধর্ম কতটা পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হবে?

সরকার—হিন্দু "জনসাধারণের" ধর্ম হবে রামকৃষ্ণ মিশনের হিন্দুত্ব। এটাকে সার্বজনিক হিন্দুত্ব বা "লোক-হিন্দুত্ব" বল্‌তে পারি। মূর্তিপূজা এই হিন্দুত্বের কেন্দ্র-কথা। কালে হয়ত মূর্তিনিষ্ঠা কিছু কম্‌তে পাবে।

দুনিয়ার খৃষ্টিয়ানরা আজও তাদের আচার-সংস্কার বদ্‌লায় নি। ইহুদিরাও ইহুদি আচার-সংস্কার বদ্‌লায় নি। অথচ তারা শিল্প-নিষ্ঠ, যন্ত্র-নিষ্ঠ, বিজ্ঞান-নিষ্ঠ, বিপ্লব-নিষ্ঠও বটে! বাংলার হিন্দুও নিজের আচার-সংস্কার বড়-বেশী বদ্‌লাবে না।

মুসলমান জনসাধারণ মূর্তিপূজা করে না; ভবিষ্যতেও কর্‌বে না। কিন্তু জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ, আত্মার উন্নতি, সামাজিক উৎসব ইত্যাদি বিষয়ে মুসলমান জনসাধারণ হিন্দু জনসাধারণের যমজ ভাই। দুয়ে আজও কোনো তফাৎ নেই। ১৯৮০ সনের যুগেও কোনো-তফাৎ থাক্‌বে না। "খানিকটা"-প্রতিমাহীন লোক-হিন্দুত্বকে বঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ধর্ম বলা যেতে পার্‌বে। অথবা 'খানিকটা'-প্রতিমাশীল "লোক-ইসলাম" দাঁড়াবে বাঙালী জাতের অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমানের সার্বজনিক ধর্ম।

লেখক—এই সকল বিষয়ে বেশী তথ্য পাওয়া যায় আপনার কোন্‌-কোন্‌ রচনায়?

সরকার—একালের একটা প্রবন্ধের নাম কর্‌ছি। "বাঙ্‌লায় দেশী-বিদেশী" (বঙ্গ-

সংস্কৃতির লেন-দেন) নামে পুস্তিকা বেরিয়েছে (১৯৪২)। এটা মার্চ-মে মাসের "আর্থিক উন্নতি"তে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া "বাংলামির জয়-জয়কার" নামে "উদ্বোধনে"ও বেরিয়েছে (অক্টোবরে ও নবেম্বর সংখ্যায়)। সাংস্কৃতিক বর্ণ-সঙ্কর আর ধর্ম-মিশ্রণ দুই-ই এই আলোচনার ভেতর পাবি।

লেখক—উচ্চ-শিক্ষিত হিন্দুমুসলমানের ধর্ম কিরূপ দাঁড়াবে?

সরকাব—উচ্চ-শিক্ষিত হিন্দু নরনারীর ধর্ম হবে ব্রাহ্মধর্ম। ১৯৮০ সনের উচ্চ-শিক্ষিত বাঙালীরা হয়ত নিজেদেরকে ব্রাহ্ম বল্‌বে না। কিন্তু ধর্ম-জীবন সম্বন্ধে উপনিযদ-বেদান্ত-গীতার দলভুক্ত থাক্‌বে। (পৃঃ ১২২, ১২৪, ১২৬, ১৪০-১৪১, ১৪৬, ২৬৬) উচ্চ-শিক্ষিত মুসলমানেরা কোর্‌আনকে যুক্তিনিষ্ঠরূপে ব্যাখ্যা কর্‌তে অভ্যস্ত হবে। তাতে উপনিযদ-বেদান্ত-গীতার চরম বাণীই ধরা পড়্‌বে।

আব্দুল ওদুদের যুক্তিনিষ্ঠা

লেখক—মুসলমান সমাজের পণ্ডিত-মহলে ধর্মবিষয়ক যুক্তিনিষ্ঠার কোনো পরিচয় আজকাল পাওয়া যাচ্ছে কি?

সরকার—হাঁ। মুসলমান মনীষী আবদুল ওদুদ 'কোর্‌আনের আল্লাহ্" সম্বন্ধে সাপ্তাহিক কৃষক পত্রিকার (ঈদ সংখ্যা ১৯৪২) যুক্তিনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস,—১৯৮০ সনের যুগে বহু-সংখ্যক উচ্চ-শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানকে সেইরূপ যুক্তিনিষ্ঠার প্রতিমূর্তি দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। ফলতঃ, উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে উচ্চ-শিক্ষিত হিন্দুর ধর্ম-মিলন,—বিশেযভাবে আত্মিক সমঝৌতা—অনিবার্য।

লেখক—আবদুল ওদুদের অন্যান্য মতামত কিরূপ?

সরকার—ওদুদ প্রধানতঃ সাহিত্যসেবী। তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা বিষয়ক কয়েকখানা বই আমি প'ড়েছি। তিনি সামাজিক প্রবন্ধও লিখে থাকেন। তাঁর রচনাবলী ও চিন্তাপ্রণালী আমি নানা কারণে পছন্দ করি। প্রথমতঃ, তিনি কমালপাশার গুণগ্রাহী। আমিও তাই। দ্বিতীয়তঃ, তিনি রবীন্দ্র-প্রেমিক। রাবীন্দ্রিক আমিও বটে। তৃতীয়তঃ, তিনি গ্যেটে-ভক্ত। গ্যেটে-প্রেমে আমিও মস্‌গুল। অধিকন্তু তিনি যুক্তিনিষ্ঠ লোক। যুক্তিনিষ্ঠায় তাঁর সঙ্গে আমার মিল অতি-স্বাভাবিক।

লেখক—ওদুদের "কোর-আনের আল্লাহ্" প্রবন্ধটার দুএক লাইন দেখাতে পারেন?

সরকার—এই দ্যাখ্ ঃ—

"শুধু কোর-আন্ নয়। জগতের অন্যান্য বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থেও জগতের অনেক মনীষী আল্লাহ্ সম্বন্ধে এই মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন—আল্লাহ্ যে স্বরূপতঃ দুর্জ্ঞেয় অথচ এই দুর্জ্ঞেয় আল্লাহ্‌র সঙ্গেই মানুষের প্রতিদিনের জীবন নিবিড়ভাবে যুক্ত এসব তাঁদেরও অন্তরতম কথা।"

আর একটা শোন্,—

"আল্লাহ্‌র এই সব শ্রেষ্ঠ গুণ স্মরণ করার প্রকৃত অর্থ কি তার নির্দেশ রয়েছে হজরতের এই বিখ্যাত বাণীতে—আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হও, অর্থাৎ আল্লাহ্ বল্‌তে যে সব শ্রেষ্ঠ গুণ তোমার চিন্তায় আসে সে সব নিজের ভিতর সৃষ্টি কর।"

লেখক—এই সব কথায় মুসলমান ধর্মকে হিন্দুধর্মের অনেক-কাছে পাওয়া যাচ্ছে না কি?

সরকার—তাই ত বল্‌ছি। যুক্তিনিষ্ঠার প্রভাবে মুসলমান নরনারী হিন্দুদের খুব-কাছে এস পড়্‌বে। অর্থাৎ যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দুরাও মুসলমানের কাছে যাবে।

ওদুদের আর একটা কথা নিম্নরূপ ঃ—"কোর-আনের এই যে বাণী ও হজরতের এই যে নির্দেশ,—এর মধ্যে এমন একটা ইঙ্গিত নিহিত র'য়েছে যা উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌লে দুর্জ্ঞেয় আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমাদের এমন একটি যোগ স্থাপিত হয় যাতে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে শক্তিসঞ্চার হয়,—আমাদের জানার আকাঙক্ষা অনেক তৃপ্ত হয়, আমাদের অনুভূতিও খানিকটা সজীব ক'রে তোলা হয়।"

রাবীন্দ্রিক ভগবান

লেখক—আপনি ভবিষ্যতে ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে আশা রাখেন?

সরকার—হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম-মিলন অবশ্যম্ভাবী। জনসাধারণের ভেতরও যেমন অবশ্যম্ভাবী, উচ্চশিক্ষিতের ভেতরও তেমন অবশ্যম্ভাবী।

লেখক—আপনি হিন্দু ও মুসলমানকে ধর্মের ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ কর্‌বার মতন কোনো নতুন ধর্মের আবির্ভাব কল্পনা কর্‌তে পারেন?

সরকার—কল্পনা ক'র্‌তে তো পারিই। তবে বর্তমানে কল্পনা কর্‌বার দরকার হচ্ছে না। আমার বিশ্বাস—আমাদের এখনকার আবহাওয়াতেই হিন্দু-মুসলমানের সমবেত বা যৌথ ধর্মের কাঠাম কাজ ক'র্‌ছে। সমসাময়িক বঙ্গ-সংস্কৃতির আর বঙ্গ-সমাজ এই যৌথধর্ম মেনেই চ'ল্‌ছে।

লেখক—আশ্চর্যের কথা। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ধর্ম? সে আবার কী? তাও আবার এখনি দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—আমি রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধর্ম-গীতগুলার কথা বল্‌ছি। এই গানগুলা হিন্দু গানও নয়, মুসলমান গানও নয়। এ সব হচ্ছে বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ মাত্রের জন্য জগদীশ্বর-বিষয়ক স্তোত্র। এ-সবকে আমি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভগবদ্-গীতা সমঝে' থাকি। তা ছাড়া আছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধর্মোপদেশ সমূহ। এই বাক্যগুলা হিন্দুর উপাসনাও নয়, মুসলমানের উপাসনাও নয়। এই সবের ভেতর আমি পাই বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আত্ম-বিশ্লেষণ ও পরমেশ্বর-ভক্তি। রাবীন্দ্রিক ভগবানকে ১৯৮০ সনের বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান তাদের সার্বজনিক ভগবানরূপে পূজা কর্‌বে।

("রাবীন্দ্রিক ভগবান" সম্বন্ধে পৃঃ ৭৩ দ্রষ্টব্য)

নবেম্বর ১৯৩১

নিরক্ষরেরা অশিক্ষিত নয়

১০ই নবেম্বর ১৯৩১

শিবদত্ত *—দেখ্‌ছি খুব সর্দ্দি হয়েছে। এক ডোজ অ্যাকোনাইট খেয়ে ফেলুন না?

সরকার—কেন, হোমিওপ্যাথির গর্ত্তে পড়েছ না কি? অবশ্য আমি কবিরাজি, হোমিওপ্যাথি সব-কিছুরই ভক্ত। জার্মাণিতে হোমিওপ্যাথি বেশী চলে না। কিন্তু আমার স্ত্রী জার্মাণ-বেটী হয়েও হোমিওপ্যাথির ভক্ত।

শিবদত্ত—আমিও তাই। মামুলি ব্যামোতে নিজেই এক-আধ ডোজ চালিয়ে থাকি। তা ছাড়া মামা হোমিওপ্যাথ।

সরকার—দেখ্‌লে,—সাধে কি বলি দুনিয়ার সব লোকই ডাক্তার? দাওয়াই জানে না এমন লোক আছে কি না সন্দেহ। মজার কথা,—পরের ওপর ডাক্তারি চালাতে সব মিঞাই ওস্তাদ। আমাদের ঝী "লক্ষ্মীর মা"কে বল্‌তে না বল্‌তেই গোটা চার-পাঁচেক দাওয়াইয়ের নাম ক'রে বসে। লেগেও যায় হয় ত দু-একটা কাজে।

শিবদত্ত—কেন, আপনি কি মনে করেন যে, এই সব মামুলি লোকের ডাক্তারিতে কোনো ফল হয় না?

সরকার—হবে না কেন? লোকেরা আর দশজনের কাছে দেখেইত শিখেছে। কেউ একমাত্র নিজ মগজের ঘী ঢেলে দাওয়াই বাৎলাতে এগোয় না। হয় কবিরাজ, না হয় হোমিওপ্যাথ, না হয় অ্যালোপ্যাথ—কারু না কারু পাঁতি মামুলি লোকজনের আর গেরস্থদের মগজে ব'সে যায়। আরে, ভাই, শুধু ডাক্তারি কেন? আমি ত প্রায় সব বিষয়েই মামুলি লোকজনের মগজ আর অভিজ্ঞতা তারিফ ক'রে থাকি। মামুলিতে আর অ মামুলিতে ফারাক করা আমার স্বধর্ম নয়। মামুলিরাও বেশ-তাজা মগজওয়ালা লোক।

শিবদত্ত—হঠাৎ কী বল্‌ছেন বুঝ্‌তে পারছি না।

সরকার—সোজা কথায়—আমি দুনিয়ার সব কটা লোককেই চিন্তাশীল মানুষ সমঝে থাকি। চিন্তাশীল মাত্রেই বিজ্ঞান-নিষ্ঠ লোক, দার্শনিক।

শিবদত্ত—সে আবার কী?

সরকার—দার্শনিকেরা হাতী ঘোড়া নয়, বুঝ্‌লে? যে-কোনো লোকই মগজ খাটিয়ে জীবন চালায়। মুচি-ম্যাথর-মুর্দাফরাস, ঝী-চাকর, কুলি, চাষী-মজুর এই সবের কার মাথায়

* শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত এম্-এ, বি-এল্ 'আর্থিক উন্নতি'র লেখক এবং বঙ্গীয় ধর্মবিজ্ঞান পরিষদের অবৃত্তিক গবেষক হিসাবে ১৯২৭ সনে অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের সহযোগী হন। বিনয়বাবুর সঙ্গে তাঁহার "মোলাকাৎ" বিভিন্ন পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল। বিনয় সরকার প্রণীত "নয়া বাংলার গোড়াপত্তন" (১৯৩২), "একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র" (১৯৩৫) ইত্যাদি গ্রন্থের ভিতর কোনো-কোনো মোলাকাৎ প্রকাশিত হইয়াছে। শিবচন্দ্র "ধন-বিজ্ঞানে সাক্‌রেতি" (১৯৩১) এবং "কনফ্লিক্‌টিং টেণ্ডেনসীজ ইন ইণ্ডিয়ান ইকনমিক থট্" (১৯৩৪) ইত্যাদি গ্রন্থের প্রণেতা। ১৯২৯ সন পর্যন্ত তিনি কলিকাতার ডায়োসীজান কলেজে ধন-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি মেদিনীপুরের মুন্সেফ ও ম্যাজিস্ট্রেট্ (জুন ১৯৪৪)। "প্রবুদ্ধ ভারত" ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁহার বহু সংখ্যক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে।

ঘী নাই? এদের কোন্ মেয়ে-পুরুষ কোন্ লোকটা? বাজার কর্‌তে গিয়ে ঠ'কে আস্‌তে চায় দুনিয়ার কোন্ আহাম্মুক?

শিবদত্ত—মগজ খেলালেই কি দার্শনিক হওয়া যায়?

সরকার—আলবৎ। আর কী চাও, বাবা? ভাল-মন্দ'র বিচার কর্‌তে পারে যে-কোনো লোক। লোভ-লোকসানের হিসাব চালিয়ে চলে,—অতি-মাত্রায় যারা ম্যাড়াকান্ত তারাও। যুক্তিহীন কথাবার্ত্তা, যুক্তিহীন চিন্তা, যুক্তিহীন জীবন সর্ব্বত্রই দেখা যায় কি? বোধ হয় নেহাৎ পাগলের দলে।

শিবদত্ত—আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে মুক্তি থাকলেই দর্শন আছে বলা উচিত? বিজ্ঞান আছে বলা উচিত? যুক্তিশীল লোকমাত্রই দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক?

সরকার—ঠিক তাই। মানুষ মাত্রেই যুক্তিশীল। অতএব মানুষ মাত্রেই দার্শনিক। মানুষ মাত্রেই বৈজ্ঞানিক। নেহাৎ "ল্যালা গোপাল", ব্যারামী অথবা খোকাখুকী এবং থুরথুরে বুড়া-বুড়ীদের বাদ দিচ্ছি। সব মানুষই অল্প-বিস্তর নিজে নিজের ডাক্তার, কবিরাজ, হোমিওপ্যাথ, চিকিৎসক। তেমনি যে-কোনো-লোকই নিজে নিজের সু-কু'র বিচারক। নিজে নিজের কর্ত্তব্য ঠাউরিয়ে চলে। নিজে নিজের যুক্তি চালায়। নিজে নিজের তর্কশাস্ত্রী। নিজে নিজের দার্শনিক। নিজে নিজের বৈজ্ঞানিক।

শিবদত্ত—এই ধরণের কথা আর কেহ বলে কি?

সরকার—কে জানে, ভায়া, বলে কিনা? কিন্তু হাট-বাজারের লোকজনের সঙ্গে কথা বল্‌লেই দুনিয়ার দর্শন-চুঞ্চু আর বিজ্ঞানবীরগুলা সহজেই এ কথা বুঝতে পার্‌বে। তখন শেয়ানায়-শেয়ানায় কোলাকুলি চল্‌তে বাধ্য। কে কার চেয়ে বড় দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ঠাওরাতে দেরি হবে না। বাজারের মুদী বড় দার্শনিক না টুলো পণ্ডিত, পার্ল্যামেণ্টের সভ্য, দর্শন-পত্রিকার লেখকেরা বড় দার্শনিক? এর জবাব হাতে-হাতে পাওয়া যাবে। প্রশ্নটা তলিয়ে-মজিয়ে বুঝ্‌তে চেষ্টা করা ভাল।

শিবদত্ত—নিজে নিজের দার্শনিক ব'লে কি আমরা সকলেই সব-কিছু কর্‌তে পারি?

সরকার—এক হিসাবে বাস্তবিকই তাই। যে কোনো মানুষের পক্ষে সব-কিছুই করা সম্ভব। কম্‌সে-কম চিন্তা করা সম্ভব। তবে প্রত্যেক কাজের জন্য অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক সন্দেহ নাই। হাত-পা মক্‌স করা চাই বলা বাহুল্য। অভিজ্ঞতাগুলার কিম্মৎ লাখ টাকা।

শিবদত্ত—তাহ'লে মানুষে মানুষে প্রভেদ কোথায়?

সরকার—সত্যি কথা,—প্রভেদ নাই। আসল প্রভেদটা অভিজ্ঞতায়, কাজকর্ম্মের অভ্যাসে। এই সঙ্গেই একটা কেজো কথা বল্‌তে চাই। সে অতি জবর। আমার মেজাজে রাষ্ট্রনৈতিক ভোটাভোটি বা অন্যান্য অধিকার-ভোগের জন্য লিখতে-পড়তে পারার কোনো দরকার পড়ে না। নিরক্ষর নরনারী সকলেই ইস্কুল-কলেজে-পড়া নরনারীর মতন রাষ্ট্রনীতি বুঝে। মানুষ মাত্রেই রাষ্ট্রদার্শনিক। মানুষ মাত্রেই রাষ্ট্রবৈজ্ঞানিক। পল্লীর উন্নতি-অবনতি, স্বাস্থ্যের উন্নতি-অবনতি ইত্যাদি বিষয়ে মাথা খেলাবার ক্ষমতা নিরক্ষরদের আছে। তথাকথিত শিক্ষিতে আর নিরক্ষরে আমি কোনো ফারাক করি না। নিরক্ষরেরাও "শিক্ষিত" লোক, অশিক্ষিত নয়।

শিবদত্ত—লেখা-পড়া শেখার দাম তা'হলে কী?

সরকার—লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকেরা কলম পিষতে পারে। ব্যস্। ঐ পর্যন্ত। চাষীরা হাল চালায়, শিখিয়ে-পড়িয়েরা কলম চালায়। কলম চালালে যদি মানুষটা "শিক্ষিত"

হয় তা'লে হাল চালালে "শিক্ষিত" হবে না কেন? ঘরামীরা-রাজমিস্ত্রীরা ঘর বাড়ী তৈরী করে। কামারেরা লোহা পেটে। কুমারেরা কাদা-মাটি কাজ করে। চুণিয়ারা চুণ তৈরী করে। জোলারা কাপড় বুনে। এই কাজগুলাই এই সব পেশার ইস্কুল। যারা কাজ করে তাদেরই মুড়োর ঘী কিলবিল করে। কেজো লোকদের মগজটা চষা হ'য়ে যায়। অর্থাৎ তারাই শিক্ষিত। এই জন্য আমার বয়েৎ—

"নিরক্ষর নয় অশিক্ষিত, তাদের মুড়োয়ও আছে ঘী,
জুচ্চুরি আর বাটপাড়িতে পণ্ডিত লোকেরা পেছপাও কি?"

অভিজ্ঞতার কিম্মৎ লাখ টাকা। হাতে-কলমে কাজ কর্‌লে কোনো লোক অশিক্ষিত থাক্‌তে পারে না। নিরক্ষরেরা কেবল বই পড়তে পারে না আর নাম সই কর্‌তে পারে না এই যা। কিন্তু তারাও অভিজ্ঞতাওয়ালা চষা-মগজের নরনারী।

শিবদত্ত—তা হ'লে লেখাপড়া শেখার আর ইস্কুল-কলেজের এত বেশী জোর দেওয়া হয় কেন?

সরকার—আমি মুখ্‌খু ব'লে বোধ হয় লেখাপড়ার তারিফ বড় বেশি করি না। অবশ্য লিখ্‌তে-পড়তে জানা খারাপ তা বল্‌ছি না। ঊনবিংশ শতাব্দী হ'তে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার সর্ব্বত্র বাণী হচ্ছে,—লেখাপড়া না শিখ্‌লে কেউ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের যোগ্য নয়। কিন্তু আমার কথা ঠিক তার উল্টা। প্রত্যেক মানুষেরই সু-কু বোধ আছে। প্রত্যেক মানুষেরই একটা নৈতিক জ্ঞান আছে। প্রত্যেক মানুষেরই পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রের প্রতি অল্প-বিস্তর কর্তব্যবোধ আছে। এই জন্য প্রত্যেক মানুষই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পাবার ও তা প্রয়োগ করার যোগ্য। কাজেই, জন-সাধারণকে লিখিয়ে-পড়িয়ে না ক'রে তোলা পর্যন্ত তাদেরকে রাষ্ট্রনৈতিক একতিয়ার দেওয়া উচিত নয়,—এই ধরণের মতের আমি যম। নিরক্ষরদেরকে আমি পূরাদস্তুর রাষ্ট্রিক জীব সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত।

("ইয়োরামেরিকার জনসাধারণ", ২৯ অক্টোবর ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

সতীশ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা উকিল, অশ্বিনী দত্ত ও দীনেশ সেন

২০শে ডিসেম্বর ১৯৩১

শিবদত্ত—ডন সোসাইটির সতীশ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আপনার কাছে অনেক-কিছু শুনেছি। গঠন-মূলক কর্মক্ষেত্রে তাঁর মতন বাঙালী খুব কমই ছিল মনে হচ্ছে। অথচ তাঁর নাম পর্যন্ত আমরা জানি না। আশ্চর্য নয় কি?

("সতীশ মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশনিষ্ঠা", ১৪ই নভেম্বর ১৯৪২)

সরকার—আশ্চর্যের কিছু নাই। অনেক বাঙালীই নানা কর্মক্ষেত্রে বাংলা দেশকে গ'ড়ে-পিটে তুলেছেন। দেশকে বাড়্‌তির পথে অল্প-বিস্তর ঠেলে তোলা অনেক বাঙালীর কৃতিত্বের মধ্যে দেখ্‌তে পাই। কিন্তু নামজাদা হওয়া যাকে বলে, তা অনেকের বরাতে ঘটে না। তবুও নিজ-নিজ কর্ম-কোঠের ভেতর তাঁরা নামজাদা সন্দেহ নাই। একটু খোঁজ কর্‌লেই জান্‌তে পারা যায় যে, তাঁদের ইজ্জদ্‌ নিজ-নিজ পেশায় বা বিদ্যার রাজ্যে বেশ উঁচুই বটে।

শিবদত্ত—সতীশবাবুর মতন আরও কয়েক জনের নাম কর্‌তে পাবেন? যাঁরা

স্বদেশীযুগের বাস্তবিক পক্ষে কর্মবীর বা চিন্তাবীর, অথচ বর্ত্তমানে যাঁদের নাম খুব কম লোকের মধ্যেই শোনা যায়? এমন কি, যাঁদের নাম নিজ-নিজ কর্ম-গণ্ডীর বাইরে বড়-একটা শোনা যায় না? এক কথায় যাঁরা সারা বাংলায় সুপরিচিত নন?

সরকার—বাঙালী জাত্‌কে কোন্ বাঙালী কোথায় কতখানি এগিয়ে দিয়েছে তার জরীপ করা আবার অন্যতম পেশা। আমার সঙ্গে কথাবার্তায় বেশ বুঝেছ্ যে, বঙ্গবীরদের কৃতিত্ব আলোচনা আমার পক্ষে আত্মিক ডাল-ভাত বিশেষ। এজন্য লোক-সমাজে, এমন কি বাঙালী মহলেও—আমি একটা হাস্যাস্পদ চিজ্। যা হ'ক্ গণ্ডা-গণ্ডা বঙ্গবীরের নাম ক'রে যেতে পারি যাদেরকে নিয়ে বাঙালীর বাচ্চারা ভবিষ্যতে গৌরব বোধ কর্‌তে অধিকারী। দুনিয়ার মাপে-কাঠিতেও তারা ফেলিতব্য মাল নয়।

শিবদত্ত—সতীশবাবুর সমান আর তিন জনের নাম করুন,—তিন বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র বা চিন্তাক্ষেত্র থেকে।

সরকার—তোমার ফরমায়েশটা কিছু অদ্ভুত রকমের,—তবে ভালই। স্বদেশী-যুগে আমি এক ইস্তাহার জারি ক'রেছিলাম জানো? তাতে এক গণ্ডা বঙ্গবীরকে এক বাথানে পু'রে বাঙালী জাত্‌কে চাঙ্গা ক'রে তুল্‌তে চেষ্টা ক'রেছি। সেই 'বাঘা-বাঘা" বাঙালীর চিড়িয়াখানায় আরও অনেক পুবে রাখা যায়।

শিবদত্ত—সেই চার বাঙালী কে কে?

সরকার—বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ,—এই চার ঘোড়ার গাড়ী হাঁকিয়েছি ভারতমাতার দিগ্‌বিজয় চালাবার জন্য ১৯১৩ সনে। সে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার মাসে। তখন আমার বোলচালটা বাঙালীর কানে আর অতি-কিছু মনে হয় নি। লোকেরা ভেবেছিল যে,—একটা দিগ্‌বিজয়ী যখন ভারতমাতা পায়দা করেছে তখন আবও কতকগুলা দিগ্‌বিজয়ী যে এদেশে নাই কে বল্‌লে? বুঝেছিল যে,—হাঁড়িতে যখন ভাত ফুটে, তখন মাত্র একটা দানা ফুটে না, এক সঙ্গে অনেক গুলাই ফুটে। কাজেই আমার লম্বাচৌড়া বুলিতে অনেকেই আজ-কাল থতমত খায় না। মনে করে যে, লোকটা বে-আক্কেল বটে, তবে বোধ হয় পুরাপুরি আহাম্মুকও নয়।

("জগদীশ সম্বর্দ্ধনা", ২০শে ডিসেম্বর ১৯৪২)

শিবদত্ত—এইবার তাহ'লে আর এক গণ্ডা বঙ্গবীরের বাথান তৈরী করুন।

সরকার—সতীশ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা উকিল, অশ্বিনী দত্ত ও দীনেশ সেন। এই চারজনের নাম করছি। এঁরা আলাদা আলাদা মেজাজের লোক। সতীশবাবু ছাড়া আর তিন জনই বাঙাল, পূর্ববঙ্গের মানুষ। এঁরা সকলেই পয়সা নম্বরের বঙ্গবীর। জগদ্বিখ্যাত বা ভারত-বিখ্যাত হোক কতটা সে-কথা পাড়ছি না। এঁরা বাঙলা দেশেই বাঙালী সমাজেও সার্বজনিক বঙ্গনেতা বা বঙ্গবীর রূপে ইজ্জৎ পেয়েছেন কিনা সে-বিষয়েও সন্দেহ করা চলে।

শিবদত্ত—সতীশবাবুর "ডন সোসাইটি" সম্বন্ধে ত আপনার কাছে অনেক-কিছু শুনেছি। অম্বিকা উকিলের ব্যাঙ্ক-বীমা-প্রতিষ্ঠান আর পুঁজি-নিষ্ঠা ও সমবায়-নিষ্ঠা সম্বন্ধে বঙ্গীয়-ধন-বিজ্ঞান পরিষদের মারফৎ আপনি অনেকবারই আমাদেরকে বলেছেন। গোটা বাঙালী জাতের পক্ষে এঁরা দুজনেই সার্বজনিক কর্মবীর ও বঙ্গ-নায়ক সন্দেহ নাই। মনে হয়েছে যে,—এই দুই জনকে একমাত্র পেশা হিসাবে বা কর্মক্ষেত্রের তরফ থেকে প্রসিদ্ধ বিবেচনা করা ঠিক নয়। সমগ্র বঙ্গদেশের মধ্যে বাংলার নরনারীর পক্ষে সতীশ

মুখোপাধ্যায় ও অম্বিকা উকিলকে সোজাসুজি "বাঙালী" ব'লে চিনে রাখা উচিত। আজকাল আমরা যে-বাংলা দেশে রয়েছি তার অন্যতম গঠন-কর্তাদের ভেতর এই দুইজন কৃতী বাঙালীর দান অবশ্য স্বীকার্য। স্বীকার না কর্‌লে দেশের বর্তমান উন্নতির অবস্থা বুঝতে পারা যাবে না। কিন্তু অশ্বিনী দত্ত আর দীনেশ সেন সম্বন্ধে আপনার জরীপটা মানান-সই কি? এঁদের কাজে গোটা বাঙালী জাত্ প্রেরণা পেয়েছে কতটা?

অশ্বিনী দত্ত'র চেলারা

সরকার—লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেও ঠিক জবাব দিতে পার্‌বে কিনা সন্দেহ। আগেই বলেছি যে,—যে-চার জনের নাম কর্‌ছি তাঁরা বাংলা দেশেই বঙ্গোন্নতির প্রবর্তক বা কর্মকর্তারূপে পরিচিত কিনা সন্দেহ। অশ্বিনী দত্তকে লোকেরা বরিশালের নেতা ব'লে জান্‌তো। প্রশ্ন উঠে,—তাতে বঙ্গনেতা হওয়া হওয়া যায় কি? অনেক জেলায়ই কোনো কোনো যুগে এক-একজন মুকুটহীন রাজা থাকে,—ধ'রে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই ধরণের মুকুটহীন নেতার আর অশ্বিনী দত্ত'র মতন মুকুটহীন নেতায় ফারাক বিস্তর। বরিশালের এমন কোনো উকিল, ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাক্‌রে, ইস্কুলমাষ্টার, ব্যবসাদার বা সাংবাদিক দেখিনি যে নিজকে অশ্বিনী দত্ত'র চেলা ব'লে পরিচয় দেয় নি।

শিবদত্ত—তারা সকলেই বরিশালে কাজ কর্‌ছে বোধ হয়?

সরকার—না। অশ্বিনী দত্ত'র বরিশাইলা চেলারা গোটা বাংলা দেশে ছড়িয়ে প'ড়েছে। এই একটা বড় কথা। বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায়ই অশ্বিনী দত্ত'র আত্মিক সন্তানেরা স্বদেশ-সেবার আর সমাজ-সেবার কাজে বাহাল আছে।

স্বদেশী যুগে ত এই অবস্থা দেখেছিই। এমন কি আজও দেখ্‌ছি। অশ্বিনী দত্ত'র নেতৃত্বকে এই জন্য বিশেষ অর্থে বঙ্গ-নেতৃত্ব বলা চলে। বরিশালের লোকেরা সমাজ-সেবক হ'য়েছে, স্বদেশ-সেবক হ'য়েছে, ব্যবসা বাণিজ্যে ঢুকেছে। কিন্তু তাদের অনেকেই বাংলা দেশের জেলায়-জেলায় মোতায়েন র'য়েছে। অশ্বিনী দত্ত'র চেলা বরিশালবাসী করিৎকর্মা লোকেদের নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় বাঙালী জাত্ বাড়ভির পথে এগিয়েছে। জেলায়-জেলায় এই দরের বঙ্গনেতা অশ্বিনী দত্ত'র মতন আর কতজন ছিলেন বা আছেন খোঁজ নিয়ে রাখা ভাল।

("অশ্বিনী-মণ্ডল", ৩রা ডিসেম্বর ১৯৪২)

দীনেশ সেন ও বঙ্গোপনিষদ্

শিবদত্ত—দীনেশ সেনকে বঙ্গবীর বল্‌ছেন কোন্ হিসাবে?

সরকার—লোকরা দীনেশ সেনকে জানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার মাষ্টার হিসাবে। মাষ্টারের ইজ্জদ্ কীই বা? তাও আবার বাংলা-মাষ্টারের! কাজেই দীনেশ সেনের দর-কষা অতি মাত্রায় কঠিন। কিন্তু জানোইতো আমি কট্টর বস্তুনিষ্ঠ জরীপের পেশাদার?

লোকটা মাষ্টার এ কথাটা ভুলে যাও। দীনেশ সেনকে বোধ হয় জীবনে কখনো স্বদেশী-সভায় গলাবাজি করতে হয়নি। "দেশকে বড় করো", "দেশটাকে ঠেলে তোলো" ইত্যাদি বুখনি ঝাড়বার কাজও হয়ত তাঁর ছিল না। কিন্তু লোকটার আসল পেশা—আত্মিক পেশা—ছিল বাংলাভাষা আর বাংলা সাহিত্য। মাষ্টারিটা ছিল গৌণ কাজ—আনুষঙ্গিক মাত্র, ঘটনাচক্রের ফল। ভাত-কাপড়ের উপায় মাত্র। ১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গবিপ্লব যখন আমরা কায়েম করি, তখন আমাদের প্রাণের কথাই ছিল "বাঙালী"। বাংলা ছিল আমাদের "দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, দেশ"। বঙ্গ ছিল আমাদের একমাত্র ব্রহ্ম। আমরা একমাত্র উপনিষদ্‌ বেদান্ত ও গীতার পাঠক-শ্রোতা-কথক ছিলাম। সেই উপনিষদ্-বেদান্ত গীতার একমাত্র মুদ্দা ছিল বাংলা ভাষা, বাঙালী জাত, বাংলা দেশ। "অথাতো বঙ্গ-জিজ্ঞাসা"—এই বয়েৎ নিয়ে সুরু ক'রেছিলাম আমরা জীবনযাত্রা। সেই বঙ্গোপনিষদেরই জ্যান্ত বস্তুনিষ্ঠ সরস প্রতিনিধি পেয়েছিলাম দীনেশ সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (১৮৯৭) কে। কাজেই দীনেশ সেন বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম ঋষি, স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম ঋষি, যুবক-বাংলার অন্যতম ঋষি।

শিবদত্ত—বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক বইকে আপনি এত উঁচু ঠাঁই দিচ্ছেন?

সরকার—দীনেশ সেনের সাহিত্য-ব্যাখ্যার ভেতর ধর্ম, দেবদেবী, পূজা পার্বণ, হাঁচি-টিকটিকি ইত্যাদি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু সাহিত্যের উপর ধর্মের একচাটিয়া প্রভাব দেখানো সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে মস্ত দোষ। ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সমজদার দীনেশ সেনের অসম্পূর্ণতা আমি সেকালেও দেখেছি, একালেও দেখে থাকি। তবুও দীনেশ সেনকে তখনকার মতন এখনও বঙ্গবীর, বঙ্গনায়ক, সার্বজনিক বাঙালী ছাড়া আর কিছু ভাবি না।

শিবদত্ত—কেন? আরও কিছু বলুন। কথাটা নতুন মনে হ'চ্ছে। ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস-বিষয়ক বই আপনার এত প্রিয়?

সরকার—দীনেশ সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইটা যে আমি কতবার প'ড়েছি তার হিসাব নাই। এই বইটার প্রভাব মালদহ হ'তে চাঁট্‌গা পর্যন্ত আর জলপাইগুড়ি হ'তে মেদিনীপুর পর্যন্ত হাজার হাজার লিখিয়ে-পড়িয়ে লোককে সজ্ঞানে "বাঙালী" ক'রে তুলেছে। আমরা এত বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন আবহাওয়ার নর-নারী যে সকলেই বাঙালী এই চেতনাটা জোরের সহিত আমাদের মগজে ব'সতে পেরেছিল "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইয়ের দৌলতে। বঙ্কিমের "বঙ্গ-দর্শন" পত্রিকায় যার অন্যতম সূত্রপাত তার ক্রমবিকাশ ও পরিপুষ্টি এই গ্রন্থে। বইটা ১৯০৫ সনের পূর্বে প্রকাশিত। আজ-কাল আমরা হাটে-মাঠে-বাজারে যত মিঞা ঘোঁটমঙ্গল ক'রে "বাঙালী", "বাঙালী" কপ্‌চাই, তাদের প্রত্যেকেরই অন্যতম জন্মদাতা "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" বইয়ের লেখক দীনেশচন্দ্র সেন।

শিবদত্ত—আপনি চরম কথা বল্‌ছেন। সাধারণতঃ লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে দীনেশ সেন সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা কল্পনা করা অসম্ভব।

সরকার—আরও শুন্‌বে? বল্‌ছি। রবীন্দ্রনাথের—

'আজি বাংলা দেশের হৃদয় হ'তে কখন আপনি
এ অপরূপ-রূপে বাহির হ'লে জননি?"

এই প্রশ্নটার ভেতরকার বঙ্গোপনিষদ্ সম্বন্ধে সকলেই ওয়াকিবহাল। দ্বিজেন্দ্রলালের

"বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" সেই বঙ্গোপনিষদেরই অন্যতম নিশানা। রবি-দ্বিজেন্দ্রের মতনই দীনেশ সেনও সেই বঙ্গোপনিষদেরই অন্যতম স্রষ্টা। ("ডন সোসাইটির সংস্কৃতি-শিক্ষালয়", ২৪ নবেম্বর ১৯৪২)।

ডিসেম্বর ১৯৩১

মানুষ কি উন্নতির পথে?

২৪শে ডিসেম্বর ১৯৩১

শিবদত্ত—মানুষ হাজার পাঁচ-সাত বছর আগে যেমন ছিল, এখনও কি তেমন আছে, না তার চেয়ে উন্নত বা অবনত হ'য়েছে?

সরকার—মানুষের নৈতিক জীবন-বিষয়ক ধারণা ব'দ্‌লে গেছে। অর্থাৎ এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের কিরূপ সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে বিষয়ে এ কালে নতুন খেয়াল জন্মেছে। আগেকার সঙ্গে মিল নাই। ধরা যাক্, পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ। সাবেক কালে পিতাই ছিল সংসারের হর্তা-কর্তা-বিধাতা। বাপের শাসন ছিল টক্করবিহীন। একালে বাপ-ছেলের পরস্পর-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত কর্‌বার জন্য কানুন কায়েম হ'য়েছে। বাপের অত্যাচার থেকে ছেলেকে বাঁচাবার জন্য নানা আইন-কানুন আছে। এ এক নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব।

শিবদত্ত—এই নৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবের সু-কু বিশ্লেষণ সম্ভব?

সরকার—আগেকার বাপের উপর আইন-কানুনের শাসন ছিল না; এখনকার বাপের উপর আছে। তার মানে কি তখনকার বাবাদের এমন সব সদ্‌গুণ ছিল যা আজ কালকার বাবাদের নাই? আমার তা মনে হয় না। ব্যক্তিগত চরিত্রের পরিবর্তন অতি কঠিন চিজ্। মানুষের স্বভাব বদ্‌লায় নি। আর একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এখনকার হিন্দুদের সাধারণতঃ একের অধিক স্ত্রী থাকে না। সাবেক কালে এক একজন হিন্দুর অনেক স্ত্রী থাক্‌তো। জিজ্ঞাস্য.—এখনকার হিন্দু স্ত্রীদের মধ্যে যে সব সদ্‌গুণ বা দুর্গুণ দেখা যায়, বহুপত্নীক হিন্দুর স্ত্রীদের তার চেয়ে কম সদ্‌গুণ বা দুর্গুণ ছিল কি? আমি তা স্বীকার করি না। মোটের উপর বল্‌বো, এ-পীঠ ও-পীঠ মাত্র। সাধারণতঃ চরিত্রের পরিবর্তন বিশ্বাস করা সম্ভব নয়। এই কোঠেরই আর একটা দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ। এক নারীর অনেক স্বামী থাকা একালের লোকেরা নিন্দনীয় মনে করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু পতিওয়ালী নারীরও কোনো সদ্‌গুণ নাই কি? শুধু পারিবারিক জীবনের দু-একটা তথ্য ঘাঁটা গেল। এই সব কথা আলোচনা কর্‌লে মনে হবে যে, মানুষের সদ্‌গুণ বাড়ছে কি কম্‌ছে তা বলা শক্ত। তবে কাঠাম বদ্‌লাচ্ছে, গড়ন বদ্‌লাচ্ছে, মতি-গতি বদ্‌লাচ্ছে।

শিবদত্ত—মানুষের স্বভাব-চরিত্রে উন্নতি-অবনতি মাপা সম্ভব কি?

সরকার—জবাব থেকেই বুঝ্‌তে পার্‌ছো যে,—বিশ্লেষণটা জটিলতা-পূর্ণ। এ কথাটা আর একদিক থেকে পরিষ্কার হবে। টাকা-পয়সার উপর লোভ, লোকের উপর কর্তৃত্ব করার লোভ, পদবী-উপাধি ইত্যাদি চিজ্ পাবার লোভ, মানব-চরিত্রে দু-দশ শ' বা হাজার বছর আগে ছিল জবরদস্ত্। এই সব দেখে-শুনে সক্রেটিস, প্লেটো ইত্যাদি গ্রীক ঋষিরা গণতন্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগে থেকেও মানব-চরিত্র সম্বন্ধে অতি নীচু ধারণা পোষণ ক'রে গেছে। আর

ভারতীয় মুনি-ঋষিদের ত কথাই নাই। সেকালের সমাজ-সংস্কারকেরা আদর্শ-রাষ্ট্রের কল্পনায় ডুব্‌তে বাধ্য হ'য়েছিল। মানুষকে জঘন্য জানোআর বিবেচনা করা ছিল সেকালে দুনিয়ার দস্তুর। আর একালের জ্ঞানে-বিজ্ঞানের আমলে সার্বজনিক লোক-শিক্ষার যুগেই বা কী দেখ্‌তে পাচ্ছ? সংসারে পয়সার লোভ ক'মেছে ক'জন লোকের? পদের মোহ ক'মেছে কি? উপাধি-পদবীর মায়া কাটিয়ে উঠেছে কোন্-কোন্ পুরুষ-নারী?

শিবদত্ত—বিবেকানন্দ'র মত অনেকটা ঐ ধরণেরই ছিল। তিনি বলেন যে, দুনিয়ায় ভাল-মন্দ যা আছে, তা কখনও কম্‌বেও না, বাড়্‌বেও না। এক জায়গা থেকে তাড়ালে তা আর এক জায়গায় দেখা দিবে। দুনিয়া কখনও উন্নত হয় না, দুনিয়াকে উন্নত ক'র্‌তে গিয়ে আমরাই উন্নত হই। তাঁর সঙ্গে আপনার মতটা মিল্‌ছে দেখ্‌ছি।

সরকার—তবে একদিকে মানুষের উন্নতি হ'য়েছে বল্‌তেই হবে। আগে পাড়া-পড়্‌শির মধ্যে লাঠালাঠি চল্‌তো। এক গাঁয়ের সঙ্গে অন্য গাঁয়ের মারামারি, ঝগ্‌ড়া-চুক্‌লি লেগেই থাক্‌তো। এখন আর গাঁয়ে-গাঁয়ে লড়াই নাই। আজ-কাল লড়াই করে কতকগুলা পল্লী মিলে অন্য কতকগুলা পল্লীর সঙ্গে। এক জাতির সঙ্গে অন্য জাতির ঝগড়া-মারামারি। এই হিসাবে মানুষের অহিংসা-প্রবৃত্তি কিছু বেড়েছে বলা যেতে পারে। কম্-সে-কম্ হিংসার ক্ষেত্র বা বহরটা কিছু বদ্‌লেছে। এটা গেল নৈতিক দিক। তাছাড়া মানুষের উন্নতি হ'য়েছে আর এক হিসাবে। মানুষের কর্মশক্তি বেড়েছে। মগজটার বাড়্‌তি সহজেই যখন-তখন মালুম হয়। বলা বাহুল্য, মুনোর ক্ষমতায় মানুষ একটা অতি-মাত্রায় যুগান্তরের ভিতর দিয়ে চ'লেছে। নিত্যি-নতুন আবিষ্কার আর উদ্ভাবন উন্নতিরই সাক্ষী সন্দেহ নাই।

শিবদত্ত—রাষ্ট্রিক জীবনে অহিংসা, উদারতা, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি সদ্‌গুণের বাড়্‌তি দেখ্‌তে পাচ্ছেন কি?

সরকার—একদম না। "তুমি যে-তিমিরে তুমি সে-তিমিরে।" কৌটল্য-নীতি ছাড়া সেকালের দুনিয়াও চল্‌তো না। আজও চলে না। কি এশিয়ায়, কি ইয়োরামেরিকায়। পশ্চিমা নজির দিয়ে বল্‌বো যে, রাষ্ট্রিক মানুষের সব-সে সেরা ঋষি হ'চ্ছে ম্যাক্যাভেল্লি। লোকটা ইতালিয়ান কৌটল্য। বুদ্ধ-খৃষ্টের পাঁতি রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক কাজ-কর্মে আজ পর্যন্ত চালু হয় নি। সেকালের মতন একালেও এই সব কাজ-কর্মের আসল উপদেষ্টা কৌটল্য বা আর মাক্যাভেল্লি। আমাদের মহাভারতখানা কৌটল্য-মাক্যাভেল্লি দর্শনের মহাসাগর। হিংসা, টক্কর, ঝগড়া, চুকলি, কোঁদল, জুচ্চুরি, বাট্‌পাড়ি, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, মিথ্যাপ্রিয়তা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি মনোভাব ছাড়া মানুষে-মানুষে লেন-দেন চালানো অসম্ভব। অতি-নিষ্ঠুর ব'কে চ'লেছি।

শিবদত্ত—এই অবস্থার পরিবর্তন অসম্ভব কি?

সরকার—অসম্ভব। মানুষের রক্তে কৌটল্য-মাক্যাভেল্লির নীতি ছাড়া আর কোনো নীতি বরদাস্ত কর্‌তে পারে না। এইটেই হ'ল সনাতন নীতি। অন্যান্য যা কিছু শব্দ মাত্র। ভাবুকতাময় হিতোপদেশের বোলচালে চিঁড়ে ভেজে না,—মাঝে-মাঝে মনের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা চলে মাত্র। আমার মন্তব্যটা অতি নির্দয়। কী কর্‌বো? ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ভাবুকতা, অহিংসা, পরোপকার, দয়া-মায়া ইত্যাদি চিন্তা ও কর্মের ঠাঁই থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু রাষ্ট্রিক ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগে এই সবের ঠাঁই এক কাঁচ্চাও নাই। ভবিষ্যতেও কোনো দিন থাক্‌বে না।

("কৌটল্য-মাক্যাভেল্লি", ৫ই জানুয়ারি ১৯৪৪)

সবার বিরুদ্ধে একা

২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩১

শিবদত্ত—আপনি কোনো দলে ঢুকছেন না কেন?

সরকার—বোধ হয় আমি সবার বিরুদ্ধে একা ব'লে।

শিবদত্ত—সে কী? বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

সরকার—কেন? নতুন আর কী বল্‌বো? আমার মতামতগুলার অনেক-কিছুই হয়ত তোমার জানা আছে। এর কোন্‌টাই বা লোক-প্রিয়? কোনো-না-কোনো মত কোনো-না-কোনো দলের অপছন্দ-সই।

শিবদত্ত—অনেকবার তাই মনে হ'য়েছে বটে। এমন কি দেশের আর্থিক উন্নতি সম্বন্ধে আপনি যা-কিছু লিখেছেন বা বল্‌ছেন তাও অনেকের পছন্দ-সই হ'তে পারে না। "বর্তমান-জগৎ" গ্রন্থাবলীর ভেতরও তার আন্দাজ করা যায়। আর একালের ইংরেজী ও বাংলা রচনার ভেতর তা খুবই স্পষ্ট। কিন্তু তবুও মনে হ'য়েছে যে, বোধ হয় এক আধটা রাষ্ট্রিক দল আপনাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে। তা নয় কি?

সরকার—ফরাসী-সাহিত্যবীর রমাঁ রলাঁর "ক্ল্যারাঁবোল্‌" পড়েছো? দেখ্‌বে "ল্যাঁ কঁৎর তুঁ" (সবার বিরুদ্ধে একা) কাকে বলে।

শিবদত্ত—একদম কারু সঙ্গে কোনো বিষয়ে আপনার মিল নাই?

সরকার—তাও কি কখনো সম্ভব? কারু না কারু সঙ্গে কোনো-কোনো দফায় দু-আনা-দশ পয়সা হয়ত মিল থাক্‌তে পারে। কিন্তু তাতে দলস্থ হওয়া যায় না। খুব জোর সবাই এই অধমকে সামাজিক বা ঘরোআ মিষ্টি-মুখের ব্যবস্থায় নিমন্ত্রণ কর্‌তে পারে। ঐ পর্যন্ত। কিন্তু কোনো আর্থিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক মোসাবিদার সভায় ডাক্‌বে না।

শিবদত্ত—কিন্তু তবুও আপনার মতামত অনেকে পছন্দ করে কেন?

সরকার—হয়ত তারা আমারই মতন আহাম্মুক বা গরু ব'লে। তারা নিশ্চয় কোনো দলের লোক নয়। হয় ত তারা খবরের কাগজের পড়ুয়া মাত্র। ব্যক্তিগত ভাবে তারা হয় ত আমাকে চেনে না। মোটের উপর তাদেরককে শহর-মফঃস্বলের জনসাধারণ বল্‌তে পারি। বোধ হয় তারা দেখ্‌ছে যে, এই লোকটা দেশ ছাড়া কোনো-কিছু জানে না। কোনো পয়সাওয়ালা লোকের পেছন-পেছন চলে না। কোনো দলের তোআক্কা রাখে না। র'য়েছে কেবল দেশকে বড় কর্‌বার ফিকির নিয়ে। ব্যস্‌।

("সমাজ-বিজ্ঞানে ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে সার্বজনিকের উল্টা পথে", ২রা নবেম্বর ১৯৪২, "বণিক, মজুর, রাষ্ট্রিক ও পণ্ডিত," ১১ই নবেম্বর ১৯৪২, 'আগে বাঙালী, তারপর ভারতবাসী", ৯ই মে ১৯৩২)

রমাঁ রলাঁর "ক্ল্যারাঁবোল"

শিবদত্ত—রমাঁ রলাঁর মন্তব্যগুলা আপনি পছন্দ করেন?

সরকার—অনেক বিষয়েই রলাঁর মতামতের সঙ্গে আমার মিল নাই। কোনো-কোনো বাণী পছন্দসই।

শিবদত্ত—তা হ'লে তাঁর "ক্ল্যারাঁবোল" বইটার নজির তুল্‌লেন কেন? অনেক সময়েই আপনি আবার রলাঁর সুখ্যাতিও ক'রেছেন।

সরকার—গল্প-লেখক, নাট্যকার, কবি ইত্যাদি শ্রেণীর সাহিত্য-সেবীদের মতামত, বাণী, বুখ্‌নি ও বয়েৎগুলা আমি যখন-তখন বিচার কর্‌তে বসি না। এই সকল লেখকদের বেলায় আমার প্রধান বা একমাত্র দেখ্‌বার জিনিষ লিখ্‌বার কায়দা। খতিয়ে দেখি প্রকাশ-ভঙ্গী। লেখকের "স্রষ্টা" কিনা এই হ'চ্ছে আমার আসল জিজ্ঞাস্য।

শিবদত্ত—"ক্ল্যারাঁবোল" বইয়ের "বাণী"টা কী?

সরকার—রলাঁ বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্র (১৯১৪-১৮) সম্বন্ধে কড়া সমালোচক। ক্ল্যারাঁবোল নামক এক চরিত্র খাড়া করা হ'য়েছে। এই ব্যক্তি ফরাসী জাতকে গাল দিচ্ছে, জার্মান জাতকে গাল দিচ্ছে। এর বিচারে শত্রুও কেউ নয় কেউ নয়। বল্‌ছে,—লড়াই করা আহাম্মুকি। স্বদেশ বা স্বজাতি ব'লে কোনো জিনিষ নাই,—শত্রু ব'লে কোনো জানোআর নাই। প্রত্যেক দেশের ভেতরই রয়েছে সু-কু। ফ্রান্স কোনো প্রকার স্বাধীনতার পীঠস্থান নয়। জার্মানিও সয়তানি, নিষ্ঠুরতা, বর্বরতার একচাটিয়া সওদা করে না। চাই বিশ্বশান্তি, দেশে-দেশে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জ্জাতিক সদ্ভাব ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শিবদত্ত—এই বাণী কি অন্য কোনো লেখকের রচনায় পাওয়া যায় না?

সরকার—যাবে না কেন? অর্থশাস্ত্রী, রাষ্ট্রশাস্ত্রী, সমাজশাস্ত্রী, আন্তর্জাতিক আইনশাস্ত্রী ইত্যাদি বিজ্ঞান-সেবকগণের কোনো-কোনো দল এই ধরণের লড়াই-বিরোধী বিশ্বরাষ্ট্রের বিশ্লেষণে সিদ্ধহস্ত। তা ছাড়া, মজুর-দলের কোনো-কোনো বিভাগ, সোশ্যালিষ্টদের কোনো-কোনো দল এই ধরণের শান্তিনিষ্ঠার প্রচারক।

শিবদত্ত—কবি, নাট্যকার, গল্প-লেখক, ইত্যাদি শ্রেণীর সাহিত্য-সেবীদের ভেতর বিশ্বশান্তির উকিল অনেকে নয় কি?

সরকার—নিশ্চয়। কিন্তু উকিলি কর্‌তে গেলেই সাহিত্য প'চে যায়। সাহিত্যটা আর শিল্প থাকে না। হ'য়ে পড়ে প্রবন্ধ, দার্শনিক আলোচনা, সংবাদপত্রের বিতণ্ডা, অধ্যাপকের বক্তৃতা।

শিবদত্ত—"ক্ল্যারাঁবোল" বইয়ের ভেতর শিল্প দেখ্‌তে পাবো কোথায়?

সরকার—শ'তিনেক পৃষ্ঠার ভেতর গোটা শ'য়েক অবস্থা সৃষ্ট করা হ'য়েছে। তার আবেষ্টনে দেখ্‌তে পাচ্ছি ক্ল্যারাঁবোলকে। স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে, বন্ধু, অ-বন্ধু, চাষী, ইস্কুল-মাষ্টার, মন্ত্রী, অধ্যাপক, সাংবাদিক, কবি, গাল্পিক, ছোকরার দল ইত্যাদি নানা ধরণের লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হ'চ্ছে। এই সব যোগাযোগের মারফৎ ফুটে উঠ্‌ছে গল্পকে গল্প, বাণীকে বাণী। খাড়া হ'য়েছে চরিত্রগুলা, খাড়া হ'য়েছে অবস্থাগুলা, আর খাড়া হ'য়েছে গল্পের ঘটনাগুলা। দেখ্‌ছি শুধু গল্পের ক্রম-বিকাশ, লোকগুলার স্বভাব-চরিত্র, ক্ল্যারাঁবোলের জীবন-সংগ্রাম। রলাঁর বুখ্‌নি বা বাণী দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আপনা-আপনি। সংবাদপত্রে সম্পাদক, মজুর-দলের নেতা, অথবা ইস্কুল-কলেজের গুরুমশায়ের মতন রলাঁকে হিতোপদেশ আওড়িয়ে যেতে হচ্ছে না। এরই নাম সাহিত্যে শিল্প-কলা।

শিবদত্ত—দেখ্‌ছি এ দিকেও আপনি "ল্যাঁ কঁৎর তু"?

সরকার—কেন?

শিবদত্ত—সাধারণতঃ কবি, নাট্যকার বা উপন্যাস-লেখকদেরকে পাঠকেরা পছন্দ করে

মতে মিল হ'লে। আপনি লেখকের মতামত সম্বন্ধে নির্বিকার। দেখ্‌ছেন শুধু লিখ্‌বার কায়দা,—শিল্পকলা!

সরকার—একেই বলি "শিল্প-স্বরাজ"। ইংরেজিতে বুখ্‌নি আছে "আর্ট ফর আর্ট্‌স্ সেক।"

বিশ্ব-মৈত্রীর প্রচারক

শিবদত্ত—আচ্ছা, রলাঁর বিশ্বশান্তি-বিষয়ক আদর্শ সম্বন্ধে আপনার কী মত? ভারতবর্ষে যদি কেহ বিশ্বশান্তি প্রচার কর্‌তে চায়, তা হ'লে কেমন হয়?

সরকার—রলাঁ দরদী হৃদয়বান্ লোক। আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষ—তাছাড়া খাতির-নদারৎ ও ঠোঁটকাটা। তার বিশ্বশান্তি-বিষয়ক সাধনা যারপরনাই পূজাযোগ্য। এই জন্য রলাঁকে আমি সর্বদাই কুর্নিশ ক'রে চলি। কিন্তু ভারতবর্ষে কেউ যদি রলাঁ-পন্থী হ'তে চায় তাকে বল্‌বো আহাম্মুক। ব'ল্‌বো তাকে ঃ—"গঙ্গাজলে মুখ ধুয়ে আয়। তারপর বিশ্বমৈত্রীর বুখ্‌নি ঝাড়িস্।"

শিবদত্ত—কেন?

সরকার—রলাঁ ফরাসীর বাচ্চা। স্বদেশ, স্বাধীনতা কাকে বলে বুঝেছে। শিল্প-নিষ্ঠা, যন্ত্র-নিষ্ঠা, বিজ্ঞান-নিষ্ঠা ইত্যাদি চিজ্ ফ্রান্সে জবরদস্ত্। রলাঁ যন্ত্র-নিষ্ঠায়, শিল্প-নিষ্ঠায় চরম ভাবেই ওয়াকিব-হাল। তাছাড়া ফরাসীদের সাম্রাজ্য বিপুল। সাম্রাজ্য-ভোগের সোআদ রলাঁ দস্তুর মতনই জানে। ইংরেজের সঙ্গে ফরাসীরা ল'ড়েছে, জার্মানির সঙ্গে ল'ড়েছে। কাজেস রলাঁ স্বাদেশিকতার কু, জাতীয়তার কু, শিল্প-নিষ্ঠর কু, পুঁজি-নিষ্ঠার কু, লড়াই-নিষ্ঠার কু, আর সাম্রাজ্য-নিষ্ঠার কু'ব বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে অধিকারী। এই সবে সে তিতিবিরক্ত হ'য়ে র'য়েছে। তাঁর পক্ষে তিতি-বিরক্ত হওয়া সম্ভব ও স্বাভাবিক।

শিবদত্ত—ভারতবাসী সম্বন্ধে কী বল্‌তে চান?

সরকার—ভারতবাসীব না আছে স্বাধীন দেশ, না আছে ফ্যাক্টরি-সম্পদ্, যন্ত্রপাতি, পুঁজিনিষ্ঠা। আর সাম্রাজ্য-ভোগ ত স্বপ্নেরও অতীত। সেই ভারতবাসী স্বদেশ-নিষ্ঠা, পুঁজি-নিষ্ঠা, আর সাম্রাজ্য-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে লম্বা গলায় বক্তৃতা ক'র্‌তে অধিকারী হ'তে পারে না। আগে স্বাধীন হ', তারপর বকিস্ "স্বাধীনতা কিছু নয়"। বর্তমানে আন্তর্জ্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বমৈত্রী, ইত্যাদি শব্দ ভারতবাসীর পক্ষে ছোট মুখে বড় কথা। কিন্তু রলাঁর মুখে এই সব শব্দই শোভা পায়। বিশেষতঃ রলাঁ ব্যক্তিটা বেশ-কিছু সাধু-চরিত্র ব'লে। যে-কোনো ফরাসীর মুখে এই সব চিজ্ শোভন নয় বলা বাহুল্য। কেননা অধিকাংশ ফরাসীই হাড়ে-হাড়ে পর-পীড়ক, বিদেশ-শোষক, সাম্রাজ্য-শাসক। বলা ভাল যে, কোনো-কোনো ভাবুকতাময়, দিল-দেরিয়া সাধু-চরিত্র ইংরেজের পক্ষে রলাঁ-পন্থী হওয়া অসম্ভব নয়।

শিবদত্ত—আন্তর্জাতিকতা, বিশ্ব-রাষ্ট্র, লড়াই-বিরোধী নীতি ইত্যাদি জিনিষের প্রচার সম্বন্ধে আপনি ফরাসীতে-ভারতবাসীতে এত প্রভেদ কর্‌তে চান?

সরকার—কী কর্‌বো, ভায়া? মনে কর, তের চৌদ্দ বছ্‌রের একটা ছোক্‌রা বল্‌ছে—"তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুতমিত-রমণী-সমাজে। সংসার কিছু নয়,

পরিবার কিছু নয়, টাকাকড়ি কিছু নয়।" তার মুখে এসব কেমন শোভা পায়? সে বল্‌ছে—"সন্ন্যাস আসল বা একমাত্র ধর্ম"। কী বল্‌তে চাও তাকে? তার জন্যে কী দাওয়াই?

শিবদত্ত—বলুন না।

সরকার—একে বলে মেকি বৈরাগ্য। জানোই তো আমাদের একটা সেকেলে কথা আছে,—মর্কট-বৈরাগ্য? এই সব ডেঁপোর জন্য পাঁতি হাসপাতাল, অথবা লাঠ্যৌষধি। খাঁটি সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত কাকে বলা যেতে পারে। যে-লোকটা গেরস্থ হ'য়ে পয়সা রোজগার ক'রে, সংসার চালিয়ে দুনিয়া খানায় কত ধানে কত চাল বুঝেছে। সে ছাড়া আর কেউ নয়। ভোগের আগে ত্যাগের বুখ্‌নির চরম বে-আকুবি। ভারত-সন্তান বল্‌ছে "স্বদেশ-সেবা কিছু নয়, স্বরাজ কিছু নয়, স্বজাতি-নিষ্ঠা কিছু নয়, যন্ত্রপাতি কিছু নয়, পুঁজি-নিষ্ঠা কিছু নয়, ব্যাঙ্ক-বীমা কিছু নয়, সাম্রাজ্য-টাম্রাজ্য কিছু নয়। আসল চিজ বিশ্বরাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, লড়াইহীন দুনিয়া, অহিংসার দিগ্‌বিজয়।" ভারতের এইরূপ আন্তর্জাতি-কতার ধুরন্ধরেরা মেকী বিশ্বপ্রেমিক, মর্কট-বৈরাগ্যশীল, আত্মপ্রবঞ্চক। অপরপক্ষে রলাঁ খাঁটি বিশ্বপ্রেমিক।

শিবদত্ত—এই ধরণের কথা আপনি আগে কখনো ব'লেছেন?

সরকার—হাঁ, ১৯২৫ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে জাহাজ থেকে নেমেই দেখ্‌লাম ভারতে চ'লেছে বিশ্বমৈত্রীর জয়জয়কার। তখনই তার বিরুদ্ধে গলাবাজি সুরু ক'রেছি, আর কলম চালিয়েছি। রমাঁ রলাঁর নাম সেই সূত্রে এসে পড়েছে। "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (যুবক ভারতের প্রতি সম্ভাষণ ১৯২৭) বইয়ে এই সব বিতণ্ডার চিহ্নোৎ আছে।

শিবদত্ত—কী ব'লেছেন মনে আছে?

সরকার—ব'লেছি সোজাসুজি রলাঁ উঁচুস্তরের লোক। সে-স্তরে ওঠা ভারত-সন্তানের পক্ষে বর্তমান অসম্ভব। তবে রলাঁর মতন ঋষির কথাগুলো কপ্‌চাতে পারে যে-কোনো লোক। মুখ আছে, ব'কে যাও, বাধা দেবে কে? অনধিকার চর্চার পরোআ কেহ রাখে না। সকলেই ব'কে চলে। মনে করে যে, খোদ প্রাণের কথাগুলাই, নিজ-নিজ আবিষ্কারই যেন প্রচার ক'রে চ'লেছে।

সাহিত্যের স্বরাজ না সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা

৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩১

শিবদত্ত—আপনি শিল্পের স্বরাজ মেনে চলেন, সাহিত্যের স্বরাজ মেনে চলেন। তাহ'লে দেখ্‌ছি আপনি সমাজের সঙ্গে শিল্পের বা সাহিত্যের যোগাযোগ স্বীকার করেন না। আপনি বোধ হয় শিল্পের ও সাহিত্যের সামাজিক, আর্থিক বা রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা চালাতে রাজি নন?

সরকার—কে বল্‌লে? শিল্প-সাহিত্যের সামাজিক, আর্থিক আর রাষ্ট্রিক—অধিকন্তু নৈতিক ও ধার্মিক ব্যাখ্যা চালানো অতি সম্ভব। সেকালে অর্থাৎ স্বদেশী যুগে—বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে—সাহিত্যের আর শিল্পের এই সব ব্যাখ্যা চালিয়েছিও। "রবীন্দ্র-

সাহিত্যে ভারতের বাণী" আর "বিশ্বশক্তি" বইয়ে তার অল্পবিস্তর চিহ্নোৎ আছে (১৯১৩-১৪)। "ল্যভ ইন হিন্দু লিট্‌রেচার" (তোকিও ১৯১৬), "হিন্দু আর্ট ইট্‌স্ হিউম্যানিজম্ অ্যাণ্ড মডার্ণিজম" (নিউইয়র্ক ১৯২০), "এস্‌থেটিক্‌স্ অব ইয়ং ইণ্ডিয়া" (১৯২২) ইত্যাদি রচনা সাক্ষ্য দিতে পারে। বস্তুতঃ শিল্প ও সাহিত্যের উপর ধর্ম, নীতি, সমাজ, অর্থ, রাষ্ট্র ইত্যাদি বস্তুর প্রভাব জবরদস্ত্।

শিবদত্ত—শিল্প-স্বরাজ আর সাহিত্য-স্বরাজ মান্‌তে গেলে শিল্প-সাহিত্যের উপর সমাজ ইত্যাদি বস্তুর প্রভাব মানা সম্ভব কি?

সরকার—আলবৎ। খুবই সম্ভব। প্রথম কথা,—প্রত্যেক কাব্যের কোনো-না-কোনো সামাজিক, আর্থিক বা রাষ্ট্রিক উপদেশ আছেই আছে। প্রত্যেক নাটকই ধর্ম, নীতি, সমাজ-সংস্কার, লোকহিত ইত্যাদি যা-হোক কিছুর উপদেষ্টা। প্রত্যেক গল্প, আখ্যায়িকা বা উপন্যাসেও সামাজিক বাণী, রাষ্ট্রিক বয়েৎ, পারিবারিক নীতি ইত্যাদি চিজ পাওয়া যায়। এই উপদেশগুলা, বাণীগুলা বা নীতিগুলা কারু পক্ষে পছন্দসই, কারু মেজাজে নেহাৎ কুনীতি, দুর্নীতি বা অনীতির সামিল। পাঠকে-পাঠকে কোঁদল চলে লেখকদের সুনীতি-কুনীতি নিয়ে।

শিবদত্ত—সমাজের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের আর কোনো যোগাযোগ দেখ্‌তে পাওয়া যায়?

সবকার—নিশ্চয়। ভেবে দেখো, শিল্পের রসদ কী কী? সাহিত্যের উপকরণ কী কী? হয় ব্যক্তি, না হয় পরিবার, সঙ্ঘ, রাষ্ট্র, সমাজ, না হয় প্রকৃতি, না হয় দুনিয়া, না হয় এইগুলার সব-কিছু। কাজেই সমাজ বস্তুটা ও শিল্প-সাহিত্যের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সব ছাড়া শিল্প ও সাহিত্যের সামগ্রী আস্‌তেই পারে না। চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনাসৃষ্টি আর অবস্থাসৃষ্টি—এই তিন রকমের সৃষ্টি হচ্ছে কবির কাজ, গাল্পিকের কাজ, নাট্যকারের কাজ। এই সকল সৃষ্টির ভেতর সামাজিক লেন-দেন উঁকি-ঝুঁকি মার্‌তে বাধ্য। সমাজ-হীন শিল্প প্রায় ঠিক যেন সোনার পাথরের বাটি।

শিবদত্ত—আপনি বল্‌ছেন যে, প্রথমতঃ সমাজের ওপব সাহিত্যের কোনো-না-কোনো প্রভাব অবশ্যম্ভাবী। তাছাড়া পরিবার, রাষ্ট্র, সঙ্ঘ, সমাজ ইত্যাদি বস্তু সাহিত্যের মাল-মশ্‌লা। কাজেই আপনার বিচারে সাহিত্যের সামাজিক ব্যাখ্যা অতি স্বাভাবিক?

সরকার—ঠিক তাই। একটা তৃতীয় দফাও আছে। তা হচ্ছে কবি, গাল্পিক, নাট্যকার ইত্যাদি সাহিত্য-স্রষ্টা লোকটা সম্বন্ধে। দুনিয়ার কোনো ব্যক্তিই অসামাজিক নয়। মায় বুনোরাও নয়। যারা কবিতা লেখে, গল্প লেখে, নাটক লেখে তারা হাত-পাওয়ালা মানুষ, মুড়োওয়ালা মানুষ, হৃদয়-ওয়ালা মানুষ। লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের আছে, তারা হিংসা করে, টক্কর দেয়, ভালবাসে। আন্তর্মানুষিক সম্বন্ধ ছাড়া কোনো লোক কল্পনা করা অসম্ভব। তারা কোনো-না-কোনো পরিবারের লোক। তারা রাষ্ট্রিক জীব। কোনো-না-কোনো ধর্ম বা অধর্ম তাদের মজ্জাগত। সুনীতি বা কুনীতিও তাদের জীবনে বেশ-কিছু প্রবল। কাজেই সাহিত্য-স্রষ্টারা সামাজিক ব্যাখ্যার বস্তু।

শিবদত্ত—সাহিত্য আর সাহিত্য-স্রষ্টা দুই-ই আপনার বিচারে সামাজিক বস্তু আর সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যার বস্তু। অথচ আপনি শিল্প-স্বরাজের প্রচারক? বুঝা কঠিন।

সরকার—অতি সোজা কথা। অনেকবারই ব'লেছি। আবার বল্‌ছি। কবি, গাল্পিক

নাট্যকার ইত্যাদি সাহিত্য-স্রষ্টারা ইস্কুল-মাষ্টারের কায়দায় বকাবকি করে না, দর্শন-গবেষকদের কায়দায় বকে না, পত্রিকা-সম্পাদকদের কায়দায় বকে না, রাষ্ট্র-নায়কদের কায়দায় বকে না। এদের মতনই সাহিত্য-স্রষ্টারাও লোক-শিক্ষক, সমাজ-সংস্কারক, নীতি-প্রচারক সন্দেহ নাই। কিন্তু দুয়ের প্রচারের কর্ম-কৌশলে ফারাক আকাশ-পাতাল।

শিবদত্ত—একটা দৃষ্টান্ত দিন না?

সরকার—এই ধরো সমাজতন্ত্র (সোশ্যালিজম্) নামক সুনীতি বা দুর্নীতি, ধর্ম ও অধর্ম। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ ক্লাসে আমাকে গলাবাজি কর্তে হয় বিস্তর। কিন্তু ইস্কুল-মাষ্টারের কর্মকৌশল এক চিজ্ আর আনাতল ফ্রাঁস বা বার্ণার্ডশ'র কর্মকৌশল আর এক চিজ। ধ'রে নিচ্ছি যে, অধ্যাপক আর শ' দুজনেই আন্তরিকভাবে সমাজতন্ত্রী, আর দরদী ও খাঁটি সমাজতন্ত্রী। কিন্তু গুরুমশায় বক্ছে এক ধরণে আর শ' বক্ছে অন্য ধরণে। এই জন্যেই বলি সাহিত্যের একটা স্বাধীনতা আছে, স্বরাজ আছে।

শিবদত্ত—গুরুমশায়ের সৃষ্টিটা কী? আর শ'র সৃষ্টিই বা কী?

সরকার—গুরুমশায় সৃষ্টি করে তর্ক, শ' সৃষ্টি করে গল্প (ঘটনা), চরিত্র ও অবস্থা। সাহিত্যের ভেতর উপদেশ অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য। কিন্তু সাহিত্য-স্রষ্টা যদি হ'তে চাও, তর্কা-তর্কি সৃষ্টি ক'রো না। যদি প্রবন্ধ লেখো তাহ'লে গল্প লেখা হবে না। সৃষ্টি করো গল্প, সৃষ্টি করো চরিত্র, আর সৃষ্টি করো অবস্থা। তা যদি না পারো,—ব'সে খাও কলা। মজার কথা, অনেক তথাকথিত গল্প-লেখক, কবি আর নাট্যকার সাহিত্য সৃষ্টি কর্তে ব'সে সাহিত্য-স্রষ্টা হ'তে পারে নি। হ'য়ে পড়েছে প্রবন্ধ-লেখক, দার্শনিক, অধ্যাপক, রাষ্ট্রিক-প্রচারক, পত্রিকা-সম্পাদক। অসল কথা,—কবিতা, গল্প নাটক ইত্যাদি সাহিত্য সৃষ্টি করা অতি কঠিন। প্রবন্ধ সৃষ্টি করা বেশী কঠিন নয়। আনাতল ফ্রাঁসের গল্পাবলীর ভেতর সাঁতার কাট্তে শেখো। আসল সাহিত্য-সৃষ্টির কর্মকৌশল পাকড়াও কর্তে পার্বে। অবশ্য তুমি কোনো দিন গল্প-লেখক হবে কিনা সন্দেহ। তবে সাহিত্য-বস্তুটার রস চাখ্তে শিখ্বে। মানুষের জীবনে তারও কিম্মৎ ঢের।

("প্রচার-সাহিত্য বনাম সাহিত্য-শিল্প", ২[illegible]শে এপ্রিল ১৯৪৩, "মার্ক্স্-পন্থী সমালোচনা" ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৪৩)

ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

"নিগ্রোজাতির কর্মবীর"

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

শিবদত্ত—কুষ্টিয়াতে সরস্বতী-পূজা উপলক্ষে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা আপনাকে অভিনন্দন-পত্র দিয়েছে শুনলাম। তার এক-আধটা আছে?

সরকার—ওই যে র'য়েছে চিঠির ফাইলের ভেতর।

শিবদত্ত—অভিনন্দনটা দেখ্ছি বাগাড়ম্বরে ভরা নয়। এর মধ্যে বস্তুনিষ্ঠা আছে। আপনার কার্যকলাপ ও রচনাবলীর সঙ্গে অনেক পরিচয় থাক্লে ঠিক ঐ ধরণে লেখা যায়। এদের কেউ আপনাকে অনেকদিন ধ'রে জানে কি?

সরকার—কুষ্টিয়ার সঙ্গে আমার চোদ্দ পুরুষেরও কোনো আলাপ নাই।

শিবদত্ত—দেখ্ছি মফঃস্বলেও আপনার বইয়ের মাল গিয়ে পৌঁছেছে। সভায় কী দেখ্লেন?

সরকার—চার-পাঁচ বছরের এক বাচ্চা বুক্ ফুলিয়ে "একদিন আমি হ'ব সেনানায়ক" বলে—কবিতা আওড়িয়ে গেল। তার দাঁড়াবার ভঙ্গীই বা কী! তার পর এক ছোক্রা এক কবিতা আবৃত্তি কর্লে, তার মধ্যে লেলিন আছে, কমাল আছে, দুনিয়ার যত বড়-বড় লোকেরই উল্লেখ আছে। সেই কবিতার মধ্যে "বিশ্বশক্তি"কে হাজির দেখ্লাম। বুঝ্লাম কাম-সে কম বোলচালে দেশটা বেশ কিছু এগিয়েছে।

শিবদত্ত—আপনি কী বল্লেন।

সরকার—বল্ব আর কী? প্রথম কথাই হ'ল—"এদের আমরা আর শিখাব কী? ছেলেরাই তো বুড়োদের গুরু।"

শিবদত্ত—এ ত' আপনার চিরকেলে বাণী। নতুন কিছু নয়। কুষ্টিয়ায় গিয়ে নতুন আবিষ্কার-করা জিনিষ এর ভেতর নাই।

সরকার—তা ঠিক। কিন্তু কুষ্টিয়াতে সেইটাই দাঁড়িয়ে গেল যেন প্রধান মুদ্দা। তবে আনুষঙ্গিক অনেক কথাই ছিল। দৃষ্টান্তও রকমারি এসে জুটেছে।

শিবদত্ত—কুষ্টিয়ার আব্হাওয়ায় মোটের উপর কোন্ জিনিষটা আশ্চর্য মনে হ'ল?

সরকার—কোথায় কোন্ কালে একখানা "নিগ্রো জাতির কর্মবীর" লিখেছিলেন (১৯১৩-১৪)। আশ্চর্য যে, সেই বইখানার প্রণেতা হিসাবেই আমাকে তারা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। সকলের মুখেই "নিগ্রোজাতির-কর্মবীর।"একজনের কাজের ফল কী রকমে কোন্ ভাবে দেখা দেয় তা কিছুই বলা যায় না।

শিবদত্ত—একমাত্র "নিগ্রোজাতির-কর্মবীর" কেন? আপনার অন্যান্য বইয়ের বুখ্নিগুলাও আজকাল যেখানে-সেখানে শুন্তে পাই।

সরকার--তা হ'লে শুন্বে? মজার কথা বলি। কয়েক সপ্তাহ ধ'রে আমার একটা ছাপা প্রবন্ধ আর একজনের নামে ধারাবাহিক রূপে বেরিয়েছে। আর কী চাও?

শিবদত্ত—আপনারা কতকগুলা বক্তৃতা শুনে আমার মনে হ'য়েছে যে, প্রত্যেকবারই আপনি এক ঘণ্টার ভেতর অনেকগুলা চিন্তা দিয়ে যান। অতগুলা হজম করা শ্রোতাদের পক্ষে কঠিন। তা ছাড়া প্রায় সবই নতুন, বে-পরোআ ও কিম্ভূত-কিমাকার গোছের। আপনাকে কোনো এক কথা দুই জায়গায় বল্তে শুনিনি।

সরকার—এ আমার মস্ত দোষ। এ জন্য অনেক সময় কাজের কথা গুলা লোকের মাথায় বস্তে পারে না। তা'ছাড়া লোকেরা যেখানে যা চায় অনেক সময়ে ঠিক তা হয় না। বরং উল্টা ঘটে। লোকজনের মতিগতির বিরোধী কথাই বলা হয় বেশী। ঘটনাচক্রে সেইরূপ লোকবিরোধী কথা বলাই আমি স্বদেশ-সেবার অঙ্গ বুঝে চ'লেছি।

শিবদত্ত—তা সত্ত্বেও একটু-একটু করে নতুন-নতুন বেপরোআ কথা দেশের লোকের মাথায় ঢুক্ছে। অনেকেই আপনার অনেক কথা পছন্দ করে না। অনেকে হয়ত বুঝেও না। কিন্তু সার্বজনিক মনের উপর স্বাধীন চিন্তার একটা দাগ র'য়ে যাচ্ছে। বিশেষতঃ আপনার মার্ক্স্-পন্থী সোশ্যালিজম্-ঘেঁশা চিন্তাগুলা অনেকের কাছে নতুন ঠেকে।

সরকার—দাগ র'য়ে যাচ্ছে কিনা জানি না। তবে আমি আমার কর্তব্য ক'রে চ'লেছি। "যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল, তোমারি কার্য সাধিবে",--এই আমার মন্তর। কাজের

কোনো ফল হ'ক-বা-না-হ'ক। কিন্তু সেদিন 'ইন্‌শিওর‍্যান্স ও ফিনান্স রিভিমউ''র সম্পাদক ডক্টর সুরেশ রায় বল্‌ছিল,—''আপনি ভাব্‌ছেন আপনার বকাবকির কোনো ফল হ'চ্ছে না? কিন্তু আমরা ব্যবসা-পাড়ার খবর রাখি। মফঃস্বলের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ আছে। বেশ দেখ্‌ছি আপনার চিন্তাগুলা অনেক ক্ষেত্রে কাজ কর্‌ছে। ভবিষ্যতে আরও কর্‌বে। অবাঙালী ব্যাঙ্ক-বীমার লোকজনও এই সব স্বাধীন চিন্তার কিছু-কিছু তারিফ কর্‌ছে।''

শিবদত্ত—ডাক্তার সুরেশ রায়ের কথার ভেতর মিথ্যা বোধ হয় নাই। ইস্কুল-কলেজ আর ছাত্র-মাষ্টারদের সঙ্গে কথাবার্তা চালালেও এ সম্বন্ধে কিছু-কিছু আন্দাজ করা যায়।

কারবারী ও অর্থশাস্ত্রী

সরকার—কিন্তু সুরেশবাবুর কথা শুন্‌বামাত্র আমি হো-হো ক'রে হেসে উঠেছিলাম।

শিবদত্ত—কেন? এতে হাস্‌বার কী আছে?

সরকার—কথাটার বিরুদ্ধে বল্‌বার হয়ত কিছু নেই। কিন্তু তার আবহাওয়ায় একটা মজার জিনিষ আছে। লোকেরা আমাকে কারখানা, ফ্যাক্টরি ইত্যাদির কাজে ওস্তাদ মনে করে। অনেকে ভাবে যে, আমি ব্যাঙ্ক-বীমা ব্যবসায় খুব হুসিয়ার লোক। আমদানি-রপ্তানির কারবারও বেশ-কিছু বুঝি। কোনো একটা কোম্পানী খাড়া কর্‌বার সম-সম কালে অথবা অল্প করে অনেকে আমাকে ডিরেক্টর হ'তে অনুরোধ করে। কেহ-কেহ আমাকে চেয়ারম্যান কর্‌তে চেয়েছে। ধনবিজ্ঞানসেবী লোককে অনেকেই কারবারী সমঝিতে অভ্যস্ত! এই দোষ।

শিবদত্ত—তাদের মতিগতি এরূপ কেন?

সরকার—যন্ত্রপাতির কথা আমি যখন-তখন বকি। শিল্প-বিপ্লব, শিল্প-নিষ্ঠা, ফ্যাক্টরি-কারখানা ইত্যাদি শব্দ আমার মুখে লেগেই র'য়েছে। বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে লেখালেখি ত আছেই। তা ছাড়া ব্যাঙ্ক-নিষ্ঠা, বীমা-সম্পদ্ ইত্যাদির সম্বন্ধে বোল্‌চাল আমার কম নয়। ''আর্থিক উন্নতি'' পত্রিকার চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ই হচ্ছে এই সব শব্দ। তাই লোকেরা মনে করে যে, আমি এই সব শিল্প-বাণিজ্যের কারবারে পাকা লোক। লোকেরা বোধ হয় বুঝে না যে, শিল্প-বাণিজ্যের মোল্লাগিরি করা এক চিজ্, আর শিল্প-বাণিজ্য ধুরন্ধর হওয়া আর এক চিজ। আমি মোল্লা মাত্র। আমার দৌড় মসজিদ অবধি। তারপর দৌড়োবে বেপারীরা, কারবারীরা, বৈশ্যেরা, পয়সাওয়ালারা।

শিবদত্ত—কেন? ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক সাহিত্য-স্রষ্টারা কি ব্যাঙ্ক-বীমার কারবারে পরিচালক হ'তে পারে না? ফ্যাক্টরি-কারখানার কর্মকর্তা হ'তে পারে না? বহির্বাণিজ্যের বেপারী হ'তে পারে না?

সরকার—এক কথায় বল্‌বো ''না''। এ-দুই কাজ দুই স্বতন্ত্র জগতের চিজ। কারবারী আর অর্থশাস্ত্রী দুই আলাদা জীব। বই লেখা-লেখি আর বক্তৃতা, গবেষণা, ছেলে-পড়ানো এক ধরণের সাধনা। আর কারখানায় দাঁড়িয়ে কুলী-কেরানী খাটিয়ে ধাতু চুঁইয়ে পয়সা বাহির করা আর এক ধরণের সাধনা। এই দুই সাধনায় একসঙ্গে সিদ্ধিলাভ করা সাধারণতঃ অসম্ভব। দুনিয়ায় এরূপ ডবল সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত খুবই কম।

শিবদত্ত—কারবারীদের সঙ্গে অর্থশাস্ত্রীদের সম্বন্ধ কিরূপ?

সরকার—কারখানায়, ব্যাঙ্ক-বীমায়, বহির্বাণিজ্যে দশ-বিশ বৎসর লেগে থাকার ফলে মগজে খুব তাজা-তাজা ঘী জম্‌তে পারে। পরে সেই ঘী বইয়ের আকারে বা প্রবন্ধে ঢালা অসম্ভব নয়। বরং ভালই। এই ধরণেব গোটা কয়েক দৃষ্টান্ত নানা দেশ থেকে দেওয়া চলে। বেপারীরা বা কারবারীরা অর্থশাস্ত্রী হ'লে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পাকা মাথার সুফল পাওয়া সম্ভব।

শিবদত্ত—অর্থশাস্ত্রীদের পক্ষে বেপারী বা কারবারী হওয়া কিরূপ?

সরকার—কিন্তু ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক গবেষণা কবা, বা বই লেখা, আর ইস্কুলমাষ্টারি ক'রা যাদের আসল ব্যবসা তাদের পক্ষে কারখানা চালানো, ব্যাঙ্ক চালানো, বেপারীগিরি ক'রা ইত্যাদি কাজ এক প্রকার অসাধ্য সাধন। দুনিয়ায় এইরূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তবে দুই মহলে আনাগোনা থাকা ভাল। বিশেষতঃ গবেষক, লেখক, অধ্যাপকদের পক্ষে এঞ্জিনিয়ার, শিল্পী, বণিক, ব্যাঙ্কার ইত্যাদি লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা খুবই জরুরি। বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান- পরিষদের আবহাওয়ায় এই যোগাযোগ পুরা মাত্রায় বজায় বেখেছি, জানইতো। কারবারী লোকের সঙ্গে দহরম-দহরম থাক্‌লে অর্থশাস্ত্রীদেব মুড়োটা পরিষ্কার হয়। তবে তাদের মত বা সিদ্ধান্তগুলা অনেক সময়েই হজম করা উচিত নয়।

লেখক-মহলে দলাদলি

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

শিবদত্ত---আপনার বই বা প্রবন্ধের ভেতব ভারতীর গবেষক বা লেখকদের কাজকর্ম সম্বন্ধে উল্লেখ দেখ্‌তে পাই। কিন্তু অন্যান্য ভারতীয় লেখকেরা বিলাতী লেখকদের নাম করেন,---অথচ কোনো ভাবতীয় লেখকদেব নাম কবেন না মনে হ'য়েছে। এর কারণ কী?

সরকার-- বাঙালী ও অ বাঙালী ভারতীয় লেখকদেব নাম করা আমার একটা বাতিক। আমার দেশকে গবেষণার বা সাহিত্যের আসরে লেখক হিসাবে ঠেলে তোলা আমি স্বদেশ-সেবার অন্যতম অঙ্গ সমঝে থাকি। চিবকালই আমার এই দস্তুর। অন্যান্য লেখকদের সম্বন্ধে যা বল্‌ছো তা বোধ হয় পুরাপুরি ঠিক নয়।

শিবদত্ত---কেন? দেশী লেখকদের নাম ভারতীয় লেখকদের বইয়ে দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি?

সরকার---একদম যায় না বলা অনুচিত। এর ভেতর কিঞ্চিৎ-কিছু দলাদলি আছে। লেখক-মহলের দলাদলি রাষ্ট্রিক দলাদলিবই মাস্‌তুতো ভাই। যদি তুমি দলস্থ হও তবে তোমার নাম তোমার দলীয় লেখকের বইয়ে বেরুবে। এই হ'লো সোজা রেওয়াজ। এসব বন্ধুত্বের ঘরোআ কথা।

শিবদত্ত---কেন গবেষণা বা রচনার মূল্য অনুসারে লেখককে উদ্ধৃত করা উচিত নয় কি?

সরকার—কী উচিত আর কী অনুচিত সে-সব আধ্যাত্মিক। দুনিয়া চলে সাংসারিক

লাভ-লোকসানের জোরে। মনে করো তুমি বেশী মাইনের চাক্‌রে। সঙ্গে-সঙ্গে দু-একটা বই লিখেছো। তোমার অনুগ্রহ হ'লে ছোট-বড়-মাঝারি লেখকেরা চাক্‌রি পেতে পারে,—দু'পয়সা ক'রে খেতে পারে, অথবা পদে উঠ্‌তে পারে। তাহ'লে দেখ্‌বে তোমার বইয়ের নাম নানা লেখক ঝালে-ঝোলে অম্বলে উল্লেখ কর্‌ছে। পাণ্ডিত্য, বিদ্যা-বুদ্ধি বা চরিত্র ইত্যাদির জোরে লেখক-মহলে তোমার খাতির হবে না। লেখকেরা তোমাকে উল্লেখযোগ্য বিবেচনা কর্‌বে যদি তোমার অনুগ্রহের জোরে তাদের পদোন্নতি হয়, পয়সা-রোজগার বাড়ে।

শিবদত্ত—কথাটা বড্‌ডো কড়া ও নির্দয় মনে হচ্ছে। চাক্‌রি দেবার অথবা আর কোনো অনুগ্রহ বিতরণ কর্‌বাব ক্ষমতা না থাক্‌লে গবেষক-লেখকদের নাম কেউ উল্লেখ করে না? সাহিত্য-সংসার যারপরনাই স্বার্থপর ও নীচাশয়? কিন্তু নতুন-নতুন চিন্তা যে-সকল বইয়ে থাকে সেই-সকল বইয়ের উল্লেখ কর্‌তে লেখকেরা চেষ্টা করে না কি?

সরকার—এই সম্বন্ধে কোনো নিয়ম আছে কিনা সন্দেহ। নতুন-নতুন চিন্তার প্রচারকদেরকে লিখিয়ে-লোকেরা ভয় ক'বে চলে। তাদের নাম করা হয়ত বিপদের কারণ। কে জানে, বাবা, কার নাম উল্লেখ ক'রে উপবওয়ালা মুরুব্বিদের চোখ-রাঙানি খেতে হয়? চাক্‌রি নিয়েও টানাটানি লেগে যেতে পারে?

শবদত্ত—মুরুব্বিদের তোআক্কা রাখে না এমন লেখক কি দেখা যায় না?

সরকাব—নিশ্চয় দেখা যেতে পারে। খাতির-নদারৎ লেখক আছেই আছে। কিন্তু তারা আবার নিজেদেরকে নতুন-নতুন চিন্তার প্রচারক হিসাবে দুনিয়ায় দাঁড় করাতে চায়। কাজেই তাদের পক্ষে অন্য কোনো নতুন চিন্তার প্রচারকের নাম করা বেআক্‌বি। তাহ'লে তাদের নিজেদের ইজ্জদ্ মারা যাবার সম্ভাবনা।

শিবদত্ত—বইয়ে নামোল্লেখ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত তাহ'লে কী বল্‌ছেন?

সরকার—বাঙালী লেখকের নাম অ-বাঙালী ভাবতীয় বইয়ে উল্লেখ হওয়া-না-হওয়া অনেক ঘোঁট-মঙ্গলের মাম্‌লা। তুমি লেখককে কী দিচ্ছ যে, সে তোমার নাম কর্‌বে? এমন কি বাঙালীদের লেখা বইয়েও অন্যান্য বাঙালী লেখকের নাম জারি হওয়া মুখেব কথা নয়। সর্বত্রই দেনা-পাওনার হিসাব-নিকাশ। লেখক-মহলের দলাদলি বেশ-কিছু জটিল। এর ভেতর টাকা-কড়ির ছোঁআচ আছে,—পদমর্যাদার ছোঁআচ আছে। আর তার সঙ্গে আছে কীর্তি-খ্যাতি-যশের তাড়না। তবে একদম নিঃস্বার্থ নামোল্লেখও দু'এক ক্ষেত্রে অসম্ভব নয়। তা ছাড়া যে-সব লেখক মারা গেছে এমন কয়েকজনের নাম পরবর্তী লেখকদের রচনায় প্রচারিত হওয়া অনেকটা সোজা।

ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ড

১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

শিবদত্ত—আপনি সেদিন কারবারীদের সঙ্গে মেলা-মেশা চালাতে ব'লেছেন, অথচ তাদের মতগুলা বাদ দিতে ব'লেছেন কেন?

সরকার—পুরাপুরি বাদ দিতেও বল্‌ছি না। বেপারীদের মতগুলা শুনা উচিত। তবে খুব সাবধানে। তারা পয়সাওয়ালা লোক, অর্থশাস্ত্রীরা গরীব। কাজেই এদের পক্ষে

পয়সাওয়ালাদের মতামত শুনে রাখা ভাল। টাকাকড়ি যারা নাড়াচাড়া করে, ধনবিজ্ঞানের কর্মকাণ্ডে তারা ওয়াকিবহাল। কিন্তু তাদের সব-কিছুতেই সায় দেওয়া ঠিক নয়। গরীব লোকেরও আক্কেল আছে। তাছাড়া অর্থশাস্ত্রীরা কেজো লোক নয় বটে। কিন্তু তারা একদম আনাড়িও নয়।

শিবদত্ত—বুঝা যাচ্ছে না। আর একটু খুলে বলুন।

সরকার—কারবারীরা নিজ নিজ ব্যাঙ্ক, বীমা-প্রতিষ্ঠান, খনি, পাটের কল, কাপড়ের কল, রাসায়নিক কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা বেশ বুঝে। রূপচাঁদে যারা লক্ষ্মীমন্ত তারা টাকাকড়ি সম্বন্ধে ওস্তাদ, বলাই বাহুল্য। লাভ-লোকসান ইত্যাদি খতিয়ান করা তাদের পক্ষে খুবই সহজ। নিজ-নিজ ট্যাক আর স্বার্থ সম্বন্ধে সব লোকই ওয়াকিবহাল। কিন্তু ব্যাঙ্কের কোনো কারবারী কারখানার মালিক বা পরিচালকের কারবার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। আবার বীমাওয়ালারা খনির কারবারের লাভ-লোকসান বুঝে-সুজে না। সকলেই তেল দিতে জানে নিজ-নিজ চরকায়। কাজেই প্রত্যেকে নিজ-নিজ কারবারের অভিজ্ঞতা ব'লে যেতে পারে। সেই সব সম্বন্ধে ধনবিজ্ঞান-গবেষকরা আনাড়ি।

শিবদত্ত—অর্থশাস্ত্রীরা গরীব ব'লে টাকা-পয়সার কারবার তারা বুঝে কম?

সরকার—তত্ত্বনিষ্ঠেরা প্রথমতঃ টাকা-পয়সায় গরীব। এইজন্য ধন-দৌলতের লেনাদেনা কম বুঝ্‌তে বাধ্য। আরও কথা আছে। দ্বিতীয়তঃ এরা কোনো কারবার চালায় না। কাজেই কারবার-টারবার কম বুঝ্‌বারই কথা। এজন্য কারবারীদের সঙ্গে ভাব রেখে চলা ভাল। তাদের ব্যাঙ্কে, বীমা ভবনে, খনিতে, কলে দু'চারবার ঢুঁ মেরে আসা যে কোনো অর্থ-শাস্ত্রীর পক্ষে জরুরি। বস্তুনিষ্ঠার জন্য তত্ত্বনিষ্ঠদের এইরূপ ভাবে চলা উচিত।

শিবদত্ত—কিন্তু সাবধান হ'তে বল্‌ছেন কেন?

সরকার—কারবারীরা নিজ-নিজ কর্মক্ষেত্রের বাহিরের ক্ষতি-বৃদ্ধি সম্বন্ধে অনেক সময়েই আনাড়ি,—বস্তুতঃ নির্বিকার। সুতরাং তাদের মতামত, সিদ্ধান্ত বা পরামর্শ বহুক্ষেত্রেই বর্জনীয় মাল।

শিবদত্ত—আপনি বল্‌ছেন যে, প্রত্যেক বেপারী নিজ-নিজ কারবারের ভালমন্দ বুঝে? নিজ নিজ স্বার্থ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল। নিজ-নিজ লাভ-লোকসান সম্বন্ধে হুসিয়ার বেশী?

সরকার—কারবারীরা নিজের স্বার্থ বুঝে বেশ,—আর দেশের স্বার্থ বুঝে কম। তামাম দেশের সকল প্রকার নর-নারীর সকল শ্রেণীর স্বার্থ অর্থাৎ সু-কু আলোচনা করা কারবারীদের ব্যবসা নয়। গোটা দেশের ভাল-মন্দ জরীপ করা আর এক ধরণের পেশা। কারবারীরা সার্বজনিক লাভ-লোকসানের পেশায় সাধারণতঃ নাবালক। কাজেই দেশশুদ্ধ লোকের "আর্থিক উন্নতি", দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থ ইত্যাদি বিষয়ে কারবারীদের শল্লাগুলা অনেক সময়েই নেহাৎ এক-চোখো বা এক-পেশে হওয়া স্বাভাবিক। পয়সাওয়ালা লোকেরা নিজের পয়সা বাড়াবার কায়দায় পণ্ডিত। মজুরদের জীবনযাত্রা কয়জন কারবারীর নজরে আসে? কয়জন মালিক কেরানীদের সুখ-দুঃখ বুঝে? এই কারণে অর্থশাস্ত্রীদের পক্ষে কারবারীদের মতামত সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানে চলা উচিত।

শিবদত্ত—কারবারীরা কি দেশের সার্বজনিক লাভ-লোকসানের কথা ভাব্‌তে পারে না?

সরকার—মনে করো, কোনো কারবারী নিজের পয়সা বাড়াবার ফিকির ঢুঁড়্‌ছে না। নিজ-নিজ লাভ-লোকসান সম্বন্ধে হুসিয়ার নয়। দেশের লোককে ধনী ক'রে তুল্‌বার

জন্য সে উঠে-প'ড়ে লেগেছে। তখন তাকে আর কারবারী বল্‌বো না। স্বদেশ-সেবক বল্‌ব, রাষ্ট্রিক নেতা অথবা আর-কিছু বল্‌বো।

শিবদত্ত—অর্থশাস্ত্রীরাই কি জাতীয় স্বার্থ, দেশের আর্থিক উন্নতি, সকল শ্রেণীর লোকের ভবিষ্যদমঙ্গল বিশ্লেষণ কর্‌তে ওস্তাদ?

সরকার—ঠিক ওস্তাদ কিনা বলা কঠিন। তবে ধনবিজ্ঞান-গবেষকদের পেশাই হ'লো তাই। এক সঙ্গে বহুসংখ্যক কারবারের খবর রাখা অর্থশাস্ত্রীদের ধনবিজ্ঞানে-সেবার অন্তর্গত। তা ছাড়া এক সঙ্গে গরীব, অ-গরীব, মজুর, অ-মজুর, চাষী, অ-চাষী সকল শ্রেণীর লাভ-লোকসান খতিয়ে দেখাও তাদের নিত্য-নৈমিত্তিক পঠন-পাঠনের ভেতর পড়ে। অধিকন্তু দেশের অতীত আর ভবিষ্যৎ দুই-ই অর্থশাস্ত্রীদের মগজে ঠাঁই পেতে বাধ্য। বিশেষতঃ বিদেশের খবর রাখাও তাদের ডাল-ভাত খাওয়া বিশেষ।

শিবদত্ত—বড়-বড় ব্যাঙ্কাররা কি বীমার খবর, বহির্বাণিজ্যের খবর, ফ্যাক্টরির খবর আর চাষ-আবাদের খবর রাখে না?

সরকার—রাখে। তবে অনেক সময়েই বেশী নয়। নজর তাদের সর্ব্বদাই একমাত্র নিজ ট্যাক পুরু করার দিকে। অবশ্য নিজ ব্যাঙ্কটা মোটা করাও তাদের আসল ধান্ধা। আর বীমা, বহির্বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, চাষ-আবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে খবর তারা কোথ্‌থেকে পায় জানো?

শিবদত্ত—বলুন না?

সরকার—ঐ অ-কেজো গরীব তত্ত্বনিষ্ঠ অর্থশাস্ত্রীদের কাছ থেকে। এই সকল লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকদেরকে তারা টাকাটা-সিকিটা-দো-আনিটা দিয়ে গবেষণায় মোতায়েন রাখে। গবেষকরা হপ্তায়-হপ্তায়, মাসে-মাসে দুনিয়ায় হাল-চাল সম্বন্ধে সংখ্যা ও তথ্য সংগ্রহ ক'রে চলে। পত্রিকায়, পুস্তিকায়, গ্রন্থাকারে সংগ্রহ বা মন্তব্যগুলা ছাপা হয়। এ সব সংখ্যা ও তথ্যের সবটুকু কারবারীরা কাজে লাগায় না। নিজ পছন্দসই অর্থাৎ ট্যাক-পরিপোষক যতটুকু একমাত্র সেইটুকুই হজম করা কারবারীদের রেওয়াজ। ইয়োরামেরিকায় আর জাপানে বড়-বড় ব্যাঙ্ক, বীমাভবন, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান, শিল্প-ফ্যাক্টরী ইত্যাদি কারবারের আওয়তায় নানাপ্রকার ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ চালানো দস্তুর। বণিক-পরিষৎ, চাষী-পরিষৎ, শিল্প-পরিষৎ ইত্যাদি সার্বজনিক কারবার-সঙ্ঘের তদ্‌বিরেও গবেষকদেরকে মাইনে দিয়ে বেঁধে রাখ্‌বার ব্যবস্থা আছে। এই সকল কারণে বিদেশে ধনবিজ্ঞান-বিষয়ক সাহিত্য ফুলে উঠে বেশ-কিছু।

সরকারী চাক্‌রে ও অর্থশাস্ত্রী

শিবদত্ত—আপনি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের আলোচনায় অনেক সময়ে সরকারী চাক্‌রেদের সুখ্যাতি ক'রে থাকেন। কারণ কী?

সরকার—সোজা কথা। কারবারীরা তথ্যনিষ্ঠ লোক। সরকারী চাক্‌রেরাও তথ্যনিষ্ঠ লোক। তত্ত্বের ধার এরা বড-একটা ধারে না। অর্থশাস্ত্রীরা প্রধানতঃ তত্ত্বনিষ্ঠ। তাদের বিশেষ জরুরি তথ্যের। এই জন্যই আমি তথ্যনিষ্ঠদের তারিফ করি। জানোইতো আমি যখন-তখন "বস্তুনিষ্ঠা" "বস্তুনিষ্ঠা" ব'কে থাকি। বস্তুনিষ্ঠ কারবারী আর বস্তুনিষ্ঠ

সরকারী চাক্‌রেদের সঙ্গে সহযোগ থাক্‌লে অর্থশাস্ত্রীরা তত্ত্বনিষ্ঠায় পেকে উঠ্‌তে পারে।

শিবদত্ত—সরকারী চাক্‌রেরা কারবারীদের মতন একপেশে নয় কি?

সরকার—ব'য়ে গেল,—তাতে ক্ষতি কী? সংসারের সব মিঞাই অল্প-বিস্তর একপেশে, এক-চোখো, কাণা। কিন্তু যার যে-চোখ সে সেই চোখে কিছু-না-কিছু দেখে। আর তাতে অন্যান্য এক-চোখো-গুলার চোখের সাম্‌নে নতুন-নতুন কিছু-না-কিছু ভাসে। সুতরাং আড্ডায় ব'সে রকমারি লোক তক্কা-তক্কি কর্‌লে প্রত্যেকেরই লাভ ছাড়া লোকসান নেই। অধিকন্তু সরকারী চাক্‌রেরা অনেকেই মাথাওয়ালা লোক। তাদেব মুড়োয় ঘী আছে বেশ-কিছু।

শিবদত্ত—কী রকম?

সরকার—সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, ইস্কুল-মাষ্টার জাতীয় পড়ুয়ারা একমাত্র মুড়োওয়ালা পণ্ডিত। তার গবেষণা করে, প্রবন্ধ লেখে, বই লেখে এই জন্যে। কিন্তু হাকিমি, জজিয়তি কর্‌তে গবেষণার দরকার কম হয় কি? প্রত্যেক মকর্দমার রায় এক-একটা গবেষণা ছাড়া আর কিছু নয়। পেন্‌শন পাবার পর বছর দশেক ধ'রে সরকারী চাক্‌রেরা বই লেখার দিকে মগজ খেলালে বাঙালীর সংস্কৃতি বেশ-কিছু উঁচিয়ে যেতে পারে। বিশেষতঃ ধন-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। পঞ্চান্ন হ'তে পঁয়ষট্টি বছর বয়সের লোকগুলার অভিজ্ঞতার কিম্মৎ খুব বেশী। রেলের কর্মচারী, স্বাস্থ্য-বিভাগের কর্মচারী, সমবায়-বিভাগের কর্মচারী, এঞ্জিনিয়ারিং-বিভাগের কর্মচারী, ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট্, মুন্‌সেফ, জজ, ইত্যাদি নানা শ্রেণীর সরকারী চাক্‌রের কথাই বল্‌ছি।

ভারত ইয়োরামেরিকার কত পেছনে?

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩২

শিবদত্ত—প্রথমবার * বিদেশ থেকে ফিরে এসে (১৯২৫-২৬) আপনি যে-সব কথা ব'লেছেন এবার সে দিকে আপনার কথাবার্তা কিছু কম মনে হ'চ্ছে। আপনি কি মতামত বদ্‌লাচ্ছেন? ইয়োরোপের সঙ্গে ভারতের তুলনা-বিষয়ক মতামতের কথা বল্‌ছি।

সরকার—মতামত কিছুই বদলাইনি। ১৯২৫-২৬ থেকে ১৯২৯ পর্যন্ত বল্‌তাম ফ্রান্স, জার্মাণি, আমেরিকা, বিলাত প্রভৃতির ৫০/৬০/৭৫ বছর পেছনে র'য়েছে আমাদের দেশ। তার সঙ্গে এও বল্‌তাম যে, ইয়োরোপের বলকান অঞ্চল, রুশিয়া প্রভৃতি দেশ ভারতেরই প্রায় সমান ধাপে অবস্থিত। আর ইতালি ও জাপান আমাদের খানিকটা আগে। মনে হ'চ্ছে যে, যারা আমার সঙ্গে আলোচনা করে তাদের অনেকের মাথায় প্রথম কথাটা এখন কিছু-কিছু ঢুকে গেছে। এই জন্য তাদের ভেতর একটা নৈরাশ্যের ভাব দেখা দিয়েছে। সবাই ভাব্‌ছে—"তাইত আমরা ৫০/৬০/৭৫ বছর পেছনে! এতটা পার্থক্য দূর করা কি সোজা?"

* প্রথমবার ১৯১৪ এপ্রিল হইতে ১৯২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিনয় সরকার সাড়ে এগার বৎসর বিদেশে ছিলেন ; দ্বিতীয় প্রবাসের সময় ১৯২৯ মে হইতে ১৯৩১ অক্টোবর পর্যন্ত আড়াই বৎসর।

শিবদত্ত—এই নৈরাশ্য-চিকিৎসার দাওয়াই কিছু ঠাওরিয়েছেন? আপনার বোল লাগিয়ে প্রশ্নটা কর্‌ছি।

সরকার—হাঁ, তাইত বল্‌তে যাচ্ছি। সেই—১৯২৫-২৯ সনেব মন্তব্যগুলার শেষ অংশটার উপর আজ ১৯৩১-৩২ সনে জোর দিচ্ছি। এবার আমার তথ্য ও সংখ্যাগুলার মতলব প্রধানতঃ নিম্নরূপ। আর্থিক দিক থেকে বাংলা দেশের যা অবস্থা, স্বাধীন বলকান, পোল্যাণ্ড ও রুশিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশের অবস্থা প্রায় সেই রকমই। বিদেশীরা আমাদের আর্থিক জীবনকে যেমন শাসন কর্‌ছে, ওদের দেশও তেমন শাসন কর্‌ছে। অথচ ওরা স্বাধীন। আমাদের দেশে মাথা-পিছু পুঁজি বা সম্পদ্ যতটা, ওদের দেশে তার চেয়ে অতিমাত্রায় বেশী নয়, অনেকটা প্রায় সমান। তবে ইতালি আর জাপান বেশ-কিছু এগিয়ে র'য়েছে। কিন্তু ১৯০৫ সনের ইতালি বা জাপানের অবস্থা বড়-বেশী উঁচু ছিল না। আর রুশিয়া বাদশাহী আমলে (১৯১৭ পর্যন্ত) প্রায় ভারতের আর্থিক অবস্থায়ই ছিল।

শিবদত্ত--ইতালির কথা কিছু খুলে বলুন।

সরকার—আর্থিক দিক দিয়ে ইতালির সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ-যতটা নিকট জার্মাণি, বিলাত, আমেরিকার সঙ্গে ততটা নয়। ঠারে-ঠোরে বুঝাচ্ছি। মার্কিণ নর-নারীর মাথা পিছু আয় ইতালিয়ানদেব প্রায় সাত গুণ। ইতালির আয় আমাদের প্রায় চার গুণ, অথচ ইতালি একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি। মাথা-পিছু জাপানীর আয় ইতালির মাথা-পিছু আয়ের কাছাকাছি, ভারতীয় আয়ের সাড়ে তিন গুণ। তাই যদি হয়, তা হ'লেই দেখ্‌তে পাচ্ছো যে,—আর্থিক হিসাবে প্রথম শ্রেণীর শক্তি-গুলার সমকক্ষ না হ'য়েও কোনো দেশের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি হওয়া অথবা স্বাধীন থাকা বেশ-কিছু সম্ভব।

শিবদত্ত—আপনি "আর্থিক উন্নতি"তে, সার্বজনিক বক্তৃতায় আর বইয়ে যে-সব তুলনামূলক ধন-বিজ্ঞানের কথা ব'লে চ'লেছেন সে-সব কথা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায়—কোনো দেশী-বিদেশী বইয়ে বা পত্রিকায় পাওয়া যায় না। এইজন্য আপনার কথাগুলা সহজে মনে বসে না। তুলনামূলক ধন-বিজ্ঞান কঠিন নয় কি?

সরকার—এক হিসাবে কঠিনই বটে। দেশী-বিদেশী সংখ্যাগুলা তুলনায় আলোচনা কর্‌বার সময় কয়েকটা কথা মনে রাখা দরকার। প্রথমতঃ ভিন্ন-ভিন্ন দেশের সংখ্যাগুলা কোনো নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে তৈরী নয়। যেমন ধরো ব্যাঙ্কে আমানতের মাথা পিছু পরিমাণ। এক দেশ সমবায়-ব্যাঙ্কগুলার হিসাব ক'রেছে, আর এক দেশ সে-সব বাদ দিয়েছে। কাজেই, ভিন্ন ভিন্ন দেশের সংখ্যা-তালিকা নিয়ে বিশ্লেষণ কর্‌বার সময় বেশ-কিছু গোল থাক্‌বেই। এই জন্য তুলনামূলক ধন-বিজ্ঞানের আলোচনায় একটু-আধটু ভুল থাক্‌তে বাধ্য।

শিবদত্ত—আসল বিপদ এই যে, আমাদের ইস্কুল-কলেজে সংখ্যা-শাস্ত্রের আলোচনাটাই হয় খুব কম। নেহাৎ যারা অঙ্কে ভাল ছেলে তাদের কয়েকজন মাত্র এই বিষয়ে এম্-এ পড়ে। এই সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন?

সরকার—কী আর বল্‌বো? আমি তো চাই বি-এ পরীক্ষার জন্যই সংখ্যা-বিজ্ঞানকে ধন-বিজ্ঞানের ছাত্রদের পক্ষে বাধ্যতামূলক কর্‌তে। আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। মার্কিণ নর-নারীর আয় ইতালিয়ানদের সাত গুণ। এই কথাটার মানে এরূপ নয় যে, আমেরিকার লোকগুলা ইতালিয়ানদের চেয়ে ঠিক সাত গুণ ধনী বা কর্মক্ষম। ইহার

মস্ত কারণ,—দুই দেশের বাজার-দরের স্তর সমান নয়। বিভিন্ন দেশের দরের পার্থক্য ও বৈচিত্র্য এত বেশী যে, তা ভাব্‌লে অবাক হ'তে হয়। এই জন্যই কোনো দুই দেশের ধন-সম্পত্তির হিসাব করতে গেলে, সেই দুটো দেশের আয়ের বা পুঁজির হিসাব কর্‌লেই হবে না। সেই টাকা দিয়ে কতটা মাল বা কাজ কেনা যায় তাও দেখ্‌তে হবে। অর্থাৎ দরের পার্থক্যটাও আলোচনা কর্‌তে হবে। ধরো, তোমাকে একশ' টাকা দেওয়া হ'ল। এই টাকা নিয়ে ইতালিতে যাও, আমেরিকায় যাও, ভারতে থাকো—এই বিভিন্ন স্থানে ঐ টাকাটায় একই পরিমাণের জিনিষ বা কাজ কিন্‌তে পার্‌বে না। অর্থাৎ একশ' টাকা তিন দেশেই অঙ্কের খাতায় একশ' বটে। কিন্তু মালের খাতায়, খাওয়া-পরার খাতায়, জীবনধারণের খাতায় তিনটা আলাদা বস্তু।

মার্চ ১৯৩২

বণ্টন-সমস্যা না সম্পদ্-বৃদ্ধি?

৫ই মার্চ ১৯৩২

শিবদত্ত—রুশিয়া আর্থিক-জগতে একটা যেন নতুন-কিছু ক'রেছে না কি?

সরকার—কোনো-কোনো বিষয়ে সত্যিই নতুন। যেমন ব্যক্তিগত পুঁজি-প্রথার ধ্বংস-সাধন। কিন্তু কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের কর্মকৌশলে আর আইন-কানুনে রুশিয়া ইংরেজ-জার্মানের পথেই চ'লেছে।

শিবদত্ত—প্রত্যেক লোকের সাংসারিক অবস্থা যদি সমান করা যায় তাহ'লে মানুষের চরিত্র উন্নত হ'বে না কি? দারিদ্র্যহীন সমাজে কোনো দুর্গতি থাক্‌তে পারে কি?

সরকার—সকলেব আর্থিক অবস্থা সমান হ'তে পারে না। দারিদ্র্যও চির-নির্বাসিত হবে না। তা ছাড়া প্রত্যেক মানুষই সু-কুয়ে ভরা। সকল যুগের প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সু-কু'র কম-বেশী মিশ্রণ আছে। সমাজে আইন-আদালত, শাসন-যন্ত্র ইত্যাদি র'য়েছে কেন? কু-হীন মানুষের সমাজ নয় ব'লে। কু-হীন কোনো দিনই সমাজ হবে না। দারিদ্র্যহীন নর-নারীর সমাজেও সু-কু'ব মিশ্রণশীল মানুষ থাক্‌বেই থাকবে।

শিবদত্ত—বর্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা ধন-বন্টনের শ্রেষ্ঠ প্রণালী উদ্ভাবিত করা নয় কি? ভারতের ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যে খুব ক্ষতি হচ্ছে না কি?

সরকার—ভারতের প্রায় সব ক'টা লোকই গরীব। ধনী কয়জনই বা? গোটা ভারতে আয়-কর দেয় ক'লাখ লোক? প্রায় আঙ্গুলে গুণা যায়! অথচ লোক-সংখ্যা কোটি-কোটি। সেইজন্যই এখানে ধন-বণ্টনের চেয়ে ধনোৎপাদনের কথাটাই বড়। অবশ্য ধন-বণ্টনের প্রশ্ন একদম উড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। ইয়োরামেরিকা ধনীর দেশ। ওসকল দেশে অনেকেরই ধন-সম্পত্তি যথেষ্ট। এই জন্যই সেখানে ধন-বণ্টনের কথাটাই প্রধান হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ইয়োরামেরিকার সমস্যাগুলা ভারতে আজও পুরামাত্রায় দেখা দেয় নি। আমাদের আসল সমস্যা দেশশুদ্ধ লোকের দারিদ্র্য। মাথা-পিছু খাওয়া-পরার হিস্যা কম। সার্বজনিক সম্পদ্-বৃদ্ধির কর্ম-কৌশলই বড় কথা।

ইতিহাসে নৃতত্ত্বের ঠাঁই

শিবদত্ত—আপনি অনেক সময়ে বাংলাদেশের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা পেড়েছেন। "আদ্যের গম্ভীরা"-লেখক হরিদাস পালিতকেও মাঝে-মাঝে এখানে দেখেছি। তাঁর লেখা আর্থিক নৃতত্ত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধ ও "আর্থিক উন্নতি"তে প'ড়েছি। "অ্যান্থ্রপলজি" চর্চার জন্য কয়েকখানা বিদেশী বইয়ের নাম কর্‌বেন?

সরকার—টেকস্‌ট্ বুক জাতীয় নৃতত্ত্ব-বিষয়ক বইয়ের নাম বাদ দিচ্ছি। এই দিকে আমার মার্কিণ-বন্ধু গোল্ডনভাইজার, লোভি ইত্যাদি পণ্ডিতদের একাধিক বই আছে। সম্প্রতি প্রথমে নাম ক'র্‌বো ইংরেজ সমাজশাস্ত্রী হবহাউস-প্রণীত "মর‍্যাল্‌স্ ইন্ এভোলিউশন" (নীতিধর্মের ক্রম-বিকাশ)। মার্কিণ-সমাজশাস্ত্রী সাম্‌নার প্রণীত "ফোক্‌ওয়েজ" (আচার-সংস্কার) ও কাজের বই। ইংরেজ নৃতত্ত্ব-সেবী গম্-প্রণীত "ফোক্‌লোর অ্যাজ্ এ সায়েন্স" বইটা পড়্‌লে আমাদের লোক-শাস্ত্রীদের মাথা পরিষ্কার হ'তে পার্‌বে। অবশ্য এই সবই বেশ-কিছু পুরাণা বই। কিন্তু আজও তার সব-কটাই নানা প্রকার তথ্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ সম্বন্ধে হদিশ দিতে পার্‌বে।

শিবদত্ত—আপনি ভারতীয় ইতিহাসের গবেষকদেরকে প্রায়ই নৃতত্ত্বের কথা ব'লে থাকেন। এর কোনো বিশেষ মতলব আছে কি?

সরকার—আমাদের দেশের সব-কিছুর জন্যই ঋগ্বেদে উৎপত্তি খোঁজার একটা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে। এই রেওয়াজটা অবশ্য খারাপ কিছু নয়। কিন্তু বিভিন্ন জাতের ভেতর যে-সব রীতি-নীতি চলিত্ আছে তার মধ্যে ঋগ্বেদ, পুরাণ, আর্যামি বা ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের প্রভাব ঢুঁড়্‌তে লেগে যাওয়া সব সময়ে অনাবশ্যক। এসব বাতিক থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আমার দাওয়াই হ'চ্ছে নৃতত্ত্ব। কথায়-কথায় সংস্কৃত সাহিত্যের বা ভাষার শরণ লওয়া আহাম্মুকি। ওসব ছাড়া আর একটা উপাদানও আছে। আমাদের পূজা-পার্বণ, ব্রত-উপবাস, সামাজিক রীতি-নীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাটি ফুঁড়ে উঠেছে। অনেক অংশে এ-সব "লৌকিক" চিজ,—"প্রাকৃত" মাল। তার জন্য হামেশা "সংস্কৃত" নজির খুঁজার দরকার নেই।

শিবদত্ত—কথাটার মানে কী?

সরকার—আজকাল যাঁরা উঁচু জাতের লোক ব'লে পরিচিত, তাঁদের অনেকেই এক কালে উঁচু জাতের ছিলেন না। তাঁদের বাপদাদারা অনেক ক্ষেত্রে বেশ-কিছু "ছোট-লোক" ছিলেন। তাঁদের মধ্যে যে-সব রীতি-নীতি আজকাল প্রচলিত সেগুলা অনেক সময়েই তাঁদের "ছোটলোক"—অনার্য, অহিন্দু—পূর্ব্বপুরুষের মধ্যে প্রচলতি ছিল। সেই সব অনার্য, অহিন্দু, অ-ব্রাহ্মণ আচার-ব্যবহারই ঘষা-মাজার পর একালে "ভদ্র" আকারে দেখা যাচ্ছে। এই জন্য আমি চাই নৃতত্ত্বের সহযোগিতা সংস্কৃতের সঙ্গে।

ভবিষ্যদ্ বাণী

শিবদত্ত—স্বদেশী যুগে আপনি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এমন কোনো চিন্তা প্রকাশ ক'রেছেন যা পরবর্তী কালে ফ'লে গেছে?

সরকার—তা' হ'লে "সাধনা", "ঐতিহাসিক প্রবন্ধ", "শিক্ষা-সমালোচনা", "বিশ্বশক্তি" ইত্যাদি বইগুলা উলটে-পালটে দেখতে হয়।

শিবদত্ত—সে-সব বইয়ের মন্তব্যগুলার ভেতর কি আজও আপনার মত পাওয়া যায়?

সরকার—অনেক জায়গায়ই অদল-বদল করবার কোথাও কিছু দেখতে পাই না। তবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য প্রভেদ সম্বন্ধে সেকালে সার্বজনিক মতেরই প্রচারক ছিলাম। তার বিরুদ্ধে পাঁতি দিচ্ছি বছর বিশেক ধ'রে।

শিবদত্ত—এক-আধটা ভবিষ্যদ্‌বাণীর কথা মনে পড়ছে?

সরকার—"বিশ্বশক্তি" বইয়ের (১৯১৩-১৪) এক জায়গায় ব'লেছি যে, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ'র ধর্মই বিংশশতাব্দীতে হিন্দুর প্রধান ধর্ম দাঁড়িয়ে যাবে। আজকাল লোকজনের মতি-গতি দেখে মনে হয় কথাটা বোধ হয় ফ'লে যাচ্ছে।

শিবদত্ত—আর কোনো ভবিষ্যদ্‌বাণীর দৃষ্টান্ত আছে?

সরকার—১৯১০ সনের শীতকালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট চার্লস্ এলিয়ট ভারতে আসছিলেন শফরে। তখন আমার বয়স বৎসর তেইশেক। সেই সময়ে আমি তাঁকে চিঠি লিখি। তাতে প্রস্তাব করি যে, তিনি আমাকে তাঁর ভারত-পর্যটনের জন্য প্রাইভেট সেক্রেটারী ক'রে নিন। কোনো মাইনে বা ভাতা চাই নি। ভারতের নানা প্রকার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কায়েম ক'রে দিতে পারবো এইরূপ জানিয়েছিলাম। সেই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখেছিলাম যে, "তাঁর রচনাগুলা ইংরেজিতে তর্জমা হ'লে দুনিয়ার সেরা সাহিত্যের ভেতর সে-সব খুব উঁচু ঠাঁই পাবে।" চিঠিটা লিখেছিলাম এলাহবাদে ব'সে। তখন আমি মেজর বামনদাস বসুর বাড়ীতে, পাণিনি আপিসে,—অতিথি। তার তিন বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পান (১৯১৩)। কাজেই ভবিষ্যদ্‌বাণীটা ফ'লে গেছে বলতে হ'বে। চিঠিটা ছাপা হ'য়েছিল। মেজর বসু, তাঁর দাদা জজ শ্রীশ বসু, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি অনেকে সেটা দেখেছিলেন।

শিবদত্ত—রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইংরেজিতে যা লিখেছিলেন তার কিছু মনে আছে?

সরকার—লিখেছিলাম,-"হিজ বেস্ট্ ওয়ার্ক্স্ হোয়েন ট্রান্স্লেটেড ইন্-টু ইংলিশ উড অকিউপাই এ ফোরমোষ্ট প্লেস্ ইন দি ওয়ার্ল্ড্স্ ক্লাসিক্যাল লিট্রেচার।"

শিবদত্ত—তখন রবিবাবুর কোনো বইয়ের ইংরেজি তর্জমা বেরিয়েছিল কি?

সরকার—না। এইরূপ লেখার জন্য এলাহাবাদের "লীডার" দৈনিক আমাকে ঠাট্টা ক'রেছিল। ব'লেছিল, —ছোক্‌রা ত্যাঁদড়, আর অন্যান্য বাঙালীর মতনই পাঁড় বাঙালী। পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় আর "হিন্দুস্থান রিভিউ"র সচ্চিদানন্দ সিংহ "লীডার" কাগজের মন্তব্যটা দেখিয়েছিলেন। এ কালের এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, রণেন বসু (মেজর বসুর ভাই-পো, জজ শ্রীশ বসুর ছোট ছেলে) সব খবর জানে।

এপ্রিল ১৯৩২

আন্তর্জাতিকতায় মার্কিণ ও ইংরেজ

১০ই এপ্রিল ১৯৩২

শিবদত্ত—আজ আমেরিকা থেকে একখানা পুস্তিকা পেলাম। তা থেকে জানা গেল আমেরিকায় একটা নতুন পরিষৎ কায়েম হ'য়েছে। তার নাম "আকাডেমি অব্ ওয়ার্ল্ড ইকনমিকস্"। এই থেকে আর অন্যান্য কারণেও আমার মনে হয় যে, দুনিয়ার সমস্যাগুলা আন্তর্জাতিক ভাবে বোঝ্‌বার চেষ্টা আমেরিকায় যতটা আছে, অন্য কোনো দেশে ততটা নেই।

সরকার—তোমার একথা বল্‌বার কারণ কী জানো? ইংরেজি ভাষা ছাড়া—আর কোনও ভাষায় তোমার দখল নেই। ধনবিজ্ঞানকে সারা দুনিয়ার দিক থেকে চর্চা করার কথাটা ধরো। এ বিষয়ে জার্মানি দুনিয়ার অগ্রণী। ওয়ার্ল্ড-ইকনমি কথাটা জার্মানি থেকেই আমদানি। "ভেল্ট্-ভির্ট্‌শাফ্‌ট্" শব্দ জার্মাণিতে ডাল-ভাতের মতন প্রচলিত। আমি জার্মানি থেকেই এই বোল ও মাল ভারতে আমদানি ক'রেছি। "আর্থিক উন্নতি" মাসিকের "বিশ্বদৌলত" জার্মাণ মাল।

শিবদত্ত—আচ্ছা যদি ধরে নিই যে, জার্মাণি আমেরিকার চেয়ে বেশী আন্তর্জাতিক, তাহ'লে এ বিষয়ে জার্মাণির পর আমেরিকাকে স্থান দিতে রাজি আছেন কি?

সরকার—না। কারণ ইংরেজের আন্তর্জাতিকতা বড় কম নয়। আন্তর্জাতিক হিসাবে এমন কি বিলাতকেই সব্-সো-সেরা-স্থান দেওয়া চলে। বিলাতী সরকারের স্ট্যাটিস্টিক্স্ দপ্তরে তথ্য ও সংখ্যা-সংগ্রহের ব্যবস্থা বিপুল। তাতেই বোঝা যায় ইংরেজরা কত বড় আন্তর্জাতিক। বিলাতের "ফবেন আপিস" (পররাষ্ট্র-বিভাগ) ও ইংরেজদের আন্তর্জাতিকতার মস্ত প্রমাণ। দুনিয়া, বিশ্ব ইত্যাদি চিজ ইংরেজদের সম্পত্তি। জানই তো বৃটিশ সাম্রাজ্যের বহর আর আকার-প্রকার? দুনিয়া, বিশ্ব, বিশ্বদৌলত ইত্যাদি সম্বন্ধে বকাবকি করে জার্মাণরা বেশী-বেশী। অপর দিকে ইংরেজরা "ওয়ার্লড্-ইকনমি" বোলটা চালায় খুব কম। কিন্তু এর যা-কিছু মাল বা শাঁস তা ভোগ করে খুব বেশী ইংরেজরাই,—জার্মাণরা নয়।

শিবদত্ত—ইংরেজ খুব বড় আন্তর্জাতিক জাত—শুনে অনেকে আশ্চর্য হবে। লোকের সাধারণ ধারণা,—ইংরেজরা নেহাৎ কূপমণ্ডূক। দুনিয়ার নানা জায়গায় ওদের রাজত্ব। এ কথা ঠিক। সেই জন্য ওদের মধ্যে যারা দেশ-শাসক, তাদের পক্ষে দুনিয়ার নানা খবরাখবর রাখ্‌তে হয়। তার ফলে তাদের মধ্যে একটা আন্তর্জাতিকতা গ'ড়ে ওঠে। কিন্তু এইসব বাদ দিলে ইংরেজকে কি একটা বড় আন্তর্জাতিক ভাবওয়ালা জাত্ বলা যায়? ধরুন, যে-সব পণ্ডিত আন্তর্জাতিক ভাবে চিন্তা করেন, সেই রকম পণ্ডিতের সংখ্যা বিলাতে বেশী না আমেরিকায় বেশী? বিলাতের "ইকনমিক জার্নাল" আর "আমেরিকান ইকনমিক রিভিউ", এই দুই ধনবিজ্ঞান-পত্রিকার মধ্যে শেষোক্তটির আন্তর্জাতিক ভাব বেশী নয় কি?

সরকার—দুটা পত্রিকা দেখে দুটা জাতের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ধরা যায় না। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক দেশের লোকই প্রধানতঃ জাতীয়তার ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত। আন্তর্জাতিকতার

আদর্শ প্রত্যেক দেশে খুব অল্প-সংখ্যক লোকের মধ্যেই আবদ্ধ। এ কথাটা প্রথমেই স্বীকার ক'রে নেওয়া ভাল। তারপর বল্‌ছি যে, বিলাতে অ-বিলাতী বিষয়ের যতটা পঠন-পাঠন ও 'আলোচনা-বিশ্লেষণ হয়, আমেরিকায় অ-মার্কিন বিষয়ে ততটা পঠন-পাঠন আলোচনা-বিশ্লেষণ হয় কিনা সন্দেহ। মার্কিণ মুল্লুকে ইয়োরোপের বার ভূত গিয়ে বসতি গেড়েছে। এই জন্য মার্কিণ দেশটা গোড়ায়ই এক হিসাবে আন্তর্জাতিক। তবুও ইংরেজের মাপে মার্কিনরা বিদেশী খবর বেশী রাখে না। মার্কিণ মুল্লুকের গড়নটা আন্তর্জাতিক বটে। কিন্তু এই মুল্লুকের সঙ্গে অন্যান্য মুল্লুকের রাষ্ট্রিক ও আর্থিক যোগাযোগ খুব কম। এই সঙ্গে আর একটা কথাও মনে রাখা দরকার। দুনিয়ার নানা দেশে যে আন্তর্জাতিকতা দেখা যায়, সেটা ভ্রাতৃভাবের বা বিশ্বপ্রেমের আন্তর্জাতিকতা নয়। তার আকার-প্রকার বিচিত্র। সেটা আর কিছু নয়, নিজের আত্মরক্ষা ও উন্নতির জন্য সমকক্ষ ও শ্রেষ্ঠ দেশ-গুলার খবর রাখা। কাজেই এই আন্তর্জাতিকতাটুকু জাতীয় স্বার্থবোধ হ'তেই উদ্ভূত। আমি একে জাতীয়তারই লেজুড় সমঝে থাকি।

র‍্যামজে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড ও বিলাতী মজুরদল

শিবদত্ত—র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড সম্বন্ধে ল্যাস্‌কির মতামত পড়্‌ছিলাম। ল্যাস্‌কি বল্‌ছেন—"গত বছর (১৯৩১) বিলাতী বেকার-বীমার সাহায্যের হার কমিয়ে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা সমস্যা দাঁড়িয়েছিল। তাই নিয়ে মজুরপন্থী মন্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ হ'ল। তখন র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্-ডোন্যাল্ডের উচিত ছিল, মন্ত্রীগিরিতে ইস্তফা দেওয়া। তারপর হয় মজুরদলের অন্য কোনো নেতা (যথা হেণ্ডারসন) অথবা বিপক্ষদলেব নেতা (যেমন বল্ড্‌ুইন) ইত্যাদির অধীনে ক্যাবিনেট কর্‌বার জন্য বাজাকে পরামর্শ দেওয়া তাঁর পক্ষে শোভন হ'ত। কিন্তু তিনি তা না ক'বে নিজের মজুরদলকে ছেড়ে বিপক্ষদলকে নিয়ে একটা গভর্ণমেন্ট তৈরী কর্‌লেন।" এটা ল্যাস্‌কিব মতে বিলাতী শাসন-প্রণালীর নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধ। এজন্য ল্যাস্‌কি ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডকে আক্রমণ ক'রেছেন। এই বিষয়ে আপনার কী মত?

সরকার—ধরা যাক্, যেন র‍্যাম্‌জে ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের কাজটা আইন-সঙ্গত হয় নি। কিন্তু তারপরেই ত পার্ল্যামেন্টের জন্য সভা-বাছাইয়ের পালা সুরু হ'ল। তাতে ইংরেজজাত র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডপন্থী দলকেই প্রধান ক'রে পাঠালো কেন? এ থেকেই বোঝা যায় যে, র‍্যামজে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের কাজ সত্যি-সত্যি বে-আইনি হয় নি। আক্ষরিক হিসাবে হয় তো বা বে-আইনি।

শিবদত্ত—ইংরেজজাতের অধিকাংশের ভোট র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যল্ড দখল কর্‌তে পেরেছিলেন। তার কারণ জনসাধারণকে বুঝানো হ'য়েছিল যে, পুরাপুরি মজুরদলের ক্যাবিনেট থাক্‌লে দেশের আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হবে। এইজন্যই লোকেরা সম্পত্তি-নাশের ভয়ে মজুরদলের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ম্যাকডোন্যাল্ড ত ছিলেন মজুরদলের নেতা। তিনি কোন্ প্রাণে নিজের দলের লোক ছেড়ে রক্ষণশীল দলে যোগ দিলেন?

সরকাব—তা ছাড়া আর কোনো উপায়ই ছিল না। অন্যান্য দেশের মত বিলাতেও মুদ্রাহ্রাস হ'য়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি (ইনফ্লেশন) ক'মেছে। মজুবির হারও ক'মেছে।

কাজেই বেকার-বীমা-বিষয়ক সাহায্যের হারও কমানো আবশ্যক হ'য়েছিল। তা না হ'লে বীমা-ভাণ্ডারের আয়-ব্যয়ের সমতা থাকে না। কিন্তু মজুরদল তা ক'র্‌তে সাহস পেতো না। অন্য দিকে রক্ষণশীল দলের পক্ষে র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড নেহাৎ জরুরি ছিল। কারণ তা হ'লে তারা কতকগুলা মজুরের সহানুভূতি পেতে পারে। অন্যান্য কথাও আছে। ভারতবর্ষে র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডের একটু পশার বা সুনাম আছে। র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড প্রধানমন্ত্রী থাক্‌লে ভারতের নয়া শাসন-ব্যবস্থা সুচারুরূপে কায়েম হবার সম্ভাবনা। এই সব কারণে বিলাতের নতুন গবর্মেন্ট প্রধানতঃ হ'ল রক্ষণশীল, কিন্তু তার প্রধান মন্ত্রী হ'লেন র‍্যাম্‌জে-ম্যাকডোন্যাল্ড। নয়া ক্যাবিনেটের অধিকাংশই রক্ষণশীল। তথাপি এর নাম হ'ল ন্যাশন্যাল গবর্মেন্ট। দুনিয়া খিচুড়ি। সোজা সরল পথের পথিক নয় কোনো মিঞা কোনো কালে। সবই জটিলতাময়, হ-য-ব-র-ল'য় ভরা।

শিবদত্ত—তা'হলে বলা চলে যে, রক্ষণশীল দল র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডকে যন্ত্র-হিসাবে ব্যবহার ক'রেছে?

সরকার—হাঁ, তা সত্য বটে। কিন্তু আবার আর একটা সত্যও আছে। একদিকে র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড মজুরদলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রেছেন। অপরদিকে দেশভক্তির পরাকাষ্ঠাও দেখিয়েছেন। আবার বল্‌ছি,—সংসার বড় জটিল। দেশের বিপদ্ দেখে তিনি তাঁর দল ভুলে দেশকেই বড় ক'রে দেখ্‌লেন।

শিবদত্ত—আপনার সঙ্গে র‍্যাম্‌জে-ম্যাকডোন্যাল্ডের আলাপ ছিল শুনেছি?

সরকার—হাঁ, ক'লকাতায় দেখা হ'য়েছিল। বিলাতেও তাঁর সঙ্গে আমার আনাগোনা ছিল। এমন কি বল্‌তে পারি যে, "সোশ্যালিজম্" সম্বন্ধে আমার আসল হাতে খড়ি তাঁর মারফতেই হয়। ১৯১৪ সনের কথা (এপ্রিল—নবেম্বর)। বিদেশে যাবার পূর্বে সোশ্যালিজম্ সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানা ছিল? ইস্কুল-কলেজে ত এক প্রকার কিছুই আলোচিত হ'ত না। আর সার্বজনিক জীবনে কিম্বা সংবাদ-পত্রেও তার কোনো দাগ দেখিনি। সুরেন ব্যানার্জি, মতি ঘোষ, বিপিন পাল, অরবিন্দ, সতীশ মুখোপাধ্যায়, (ডন সোসাইটি)) ইত্যাদির আবহাওয়ায় সোশ্যালিজমের অ-আ-ক-খও ছিল না। আমরা ভাবতাম যে, সোশ্যালিজম্ বুঝি মাত্র দারিদ্র্য তাড়াবার একটা উপায়। যাই হোক্, র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডই সোশ্যালিজম্ সম্বন্ধে আমার গুরু। তিনি চিঠি-পত্র দিয়ে বিলাতের নানা স্থানে নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই মজুর-নায়কদের সঙ্গে চেনা-শুনা হয়। তাতে আমার মগজ উপকার পেয়েছে ঢের।

শিবদত্ত—এ হেন মজুর-নেতা র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড এতটা পরিবর্তিত হ'য়েছেন কেন?

সরকার—এর উত্তর অতি সোজা। তখনকার দিনে (১৯১৪) র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড ছিলেন সরকারের বিপক্ষে। "অপোজিশন"-দলের নেতা। এখন তিনি শাসনযন্ত্রের কর্তা। বিপক্ষদলের নেতা থাকার সময় অনেক-কিছু বকা বা ভাবা চলে। কিন্তু শাসনের কাজ নিজের হাতে এলে দায়িত্বের চাপ পড়ে খুব বেশী। সেই অবস্থায় নিজ-নিজ দোষ-গলদগুলা সর্বদাই চোখে পড়ে। তখন আগেকার ভাবুকতা প্রায় লোপ পেয়ে বসে। তা ছাড়া অভিজ্ঞতা ব'লে একটা জিনিষ আছে ত? অভিজ্ঞতা জিনিষটাই একটা বড় শিক্ষক। অভিজ্ঞতা বাড়্‌বার সঙ্গে-সঙ্গে প্রত্যেক জিনিষই তিনি নতুন ভাবে দেখ্‌তে শিখেছেন। কাজেই তাঁর মনোভাব আর চরিত্রও পরিবর্তিত হ'য়েছে।

শিবদত্ত—আচ্ছা, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর সাহানুভূতি আছে মনে হয়?

সরকার—"সহানুভূতি" আছে কিনা সে-প্রশ্নের কোনো মানে হয় না, ভায়া। রাষ্ট্রিক জীবনেব সহানুভূতি চিজটা প্যাঁচালো। হাজার হ'লেও ইংরেজ ত? জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারো,—ভারতবাসীর শাসন-ক্ষমতা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস আছে কিনা। প্রত্যেক ইংরেজই স্বাধীনতা ভালবাসে। সেই হিসাবে র‍্যাম্‌জে-ম্যাকডোন্যাল্ডও বিশ্বাস করেন যে, ভারতবর্ষের স্বাধীন হওয়া উচিত এবং তার যোগ্যতা সে একদিন কালে-ভদ্রে হয়ত অর্জন ক'র্‌বে। কাজেই ভারতীয় স্বরাজ বা স্বায়ত্ত-শাসনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা যেমন-খুসী আন্দাজ ক'র্‌তে পারো। "ভারত-বন্ধু" ইংরেজরা যে-ধরণের লোক র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডকে তা ছাড়া আর কিছু সম্‌ঝে রাখা ঠিক হবে না বল্‌তে পারি। আমি অবশ্য কোনো লোকের সহানুভূতি-ঠহানুভূতি নিয়ে মগজ ঘামাই না। তা ছাড়া, দেখ্‌তেই পাচ্ছো রাষ্ট্রনীতির গর্তে আমি কখনো পড়িনি। কাজেই র‍্যাম্‌জে-ম্যাক্‌ডোন্যাল্ডকে ভারতীয় স্বরাজ-স্বাধীনতা সম্বন্ধে বাজিয়ে দেখবার খেয়াল চাপে নি। তুমি ইস্কুল-কলেজে পড়্‌বার সময়ে কখনো রাষ্ট্রিক গলাবাজি ক'রেছো?

শিবদত্ত—না, কোনো দিনই না।

("বর্তমান জগৎ ও মজুর-আন্দোলন", ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২)

এপ্রিল ১৯৩২

সুইস্‌জাতের ধরণ-ধারণ

১২ই এপ্রিল ১৯৩২

হেমেন সেন *—সুইট্‌সারল্যাণ্ডে আপনি কতবার গিয়েছিলেন আর জেনেভায় কতদিন ছিলেন?

সরকার—প্রথমবারকার ইয়োরোপ-ভ্রমণের সময় আমার জেনেভা যাওয়া হয় নি। অবশ্য সুইট্‌সারল্যাণ্ডে ছিলাম অনেক দিন। পূরাপূরি ছয় মাস একনাগাড় সুইট্‌সারল্যাণ্ডে কাটিয়েছিলাম ১৯২৩এর নভেম্বর হ'তে ১৯২৪এর এপ্রিল মাস পর্যন্ত। এসেছিলাম জার্মাণি হ'তে সোজা দক্ষিণে। সে যাত্রায়, সুইট্‌সারল্যাণ্ড হ'তে আবার দক্ষিণে ইতালির দিকে দু-তিনবার ঢুঁ মারা গিয়েছিল।

প্রঃ—তখন তা হ'লে আপনি সুইট্‌সারল্যাণ্ডের কোন্‌-কোন্‌ অঞ্চল দেখেছিলেন?

উঃ—বাস্তবিক পক্ষে সে-যাত্রায়ও সুইট্‌সারল্যাণ্ডের অঞ্চল হিসাবে বেশী-কিছু দেখা হয় নি। স্টুট্‌গার্টের পথে জার্মাণির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল হ'তে সুইট্‌সারল্যাণ্ডের জুরিখ্‌

* ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা কর্তৃক সম্পাদিত "সুবর্ণ-বণিক সমাচার" মাসিকে কবি হেমেন্দ্রবিজয় সেন বিনয় সরকাবেব সঙ্গে অনুষ্ঠিত এই মোলাকাৎ প্রকাশ করেন (ফাল্গুন ১৩৩৮)। "সমাচার" যথাসময়ে বাহিব হইতে পারে নাই। এইজন্য এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত মোলাকাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বিনয় সবকারের কোনো-কোনো কবিতার ছন্দ হেমেন সেনের হাতে মেরামত হইয়াছে। অন্যান্য মোলাকাতেও হেমেন সেনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্যন্ত পৌঁছি। এই অঞ্চলকে এককথায় জার্মাণিরই জের বলা যেতে পারে। তবে জুরিখে ছিলাম মাত্র দিন কয়েক।

প্রঃ—সুইট্‌সারল্যাণ্ডের এই অঞ্চলকে "জার্মাণির জের" বল্‌ছেন কেন?

উঃ—কারণ, এই জনপদে আগাগোড়া জার্মাণ ভাষারই রেওয়াজ।

প্রঃ—সুইট্‌সারল্যাণ্ডের নিজের কোন ভাষা নেই?

উঃ—না। সুইট্‌সারল্যাণ্ডের উত্তর আর পূর্ব অঞ্চলটা জার্মাণ-ভাষাভাষী নরনারীর দেশ। পশ্চিম জনপদে চলে ফরাসী ভাষা। যে-অংশে লোকেরা ফরাসী বলে, সে-অংশটা আয়তনে খুবই ছোট। সুইট্‌সারল্যাণ্ডের যে-সকল শহর বিদেশে বিশেষতঃ ভারতে নামজাদা তার অধিকাংশই জার্মাণ-ভাষাভাষী সুইস্‌ নগর। জুরিখের নাম আগেই ব'লেছি। এই ধরণের আর এক শহর বাজেল। আর একটার নাম লুৎস্যার্ণ। এ ছাড়া সুইট্‌সারল্যাণ্ডের রাষ্ট্র-সংসদ্‌ বসে যে-শহরে সেটাও জার্মাণ জনপদেই অবস্থিত, নাম তার ব্যার্ণ।

প্রঃ—আপনি তা হ'লে যে-যাত্রায় ছ'মাস সুইট্‌সারল্যাণ্ডের কোন্‌ মুল্লুকে কাটিয়েছিলেন?

উঃ—সে হচ্ছে সুইট্‌সারল্যাণ্ডের দক্ষিণতম সীমা। সেইন্ট গোটার্ড পাহাড়-শৃঙ্গ পার হ'য়ে দক্ষিণে নাম্‌তে হয়। জুরিখ হ'তে অবশ্য সোজা রেলে যাওয়া চলে। এই রেলপথের সুড়ঙ্গটা আমাদের দেশের পাঠশালায়ও বোধ হয় জানে।

প্রঃ—সে অঞ্চলটার নাম কী?

উঃ—জার্মাণ ভাষায় নাম তার টেস্‌সিন। ফরাসীতে তেস্যাঁ। আর আসল স্বদেশী নাম তিচিনো।

প্রঃ—আসল স্বদেশী নাম বল্‌ছেন কেন?

উঃ—কারণ, ঐ মুল্লুকটা জার্মাণও নয়, ফরাসীও নয়, ভাষা-হিসাবে এই মুল্লুক ইতালিয়ান। গোটার্ড পাহাড়ের দক্ষিণবর্তী জনপদটা প্রায় আগাগোড়াই ইতালিয়ান। বস্তুতঃ এই অংশকে উত্তর ইতালির শেষ সীমানা বল্‌লেই চলে। মজার কথা, মুসলিনির আমলে ফাশিস্তরা সুইট্‌সারল্যাণ্ডের এই অংশটাকে ইতালির উদরস্থ কর্‌বার জন্য মাঝে-মাঝে লাঠির আওয়াজ শুনিয়ে থাকে। সুইস্‌ গবর্ণমেন্টকে এইজন্য অনেক সময় ব্যতিব্যস্ত হ'তে হ'য়েছে। অবশ্য জনপদটা ছোট, লোকজনের সংখ্যাও কম।

প্রঃ—আচ্ছা, যে-জনপদে ফরাসী চলে, সে-জনপদের কোনো কোনো শহর নামজাদা কি?

উঃ—আল্‌বাৎ, সব চেয়ে বেশী নামজাদাই জেনেভা। ঐ ধরণের আর একটা নামজাদা শহর লোজান। সুইট্‌সারল্যাণ্ডের ঘড়ি অধিকাংশই এই ফরাসী জনপদে তৈয়ারী হয়।

প্রঃ—তা হ'লে সুইট্‌সারল্যাণ্ডের লোকেরা কোন্‌ ভাষায় কথা বলে বুঝ্‌ব?

উঃ—ভাষার টানে, রক্তের টানে, লেনদেনের টানে সুইস্‌ নরনারী বাস্তবিক পক্ষে তিনটা ভিন্ন-ভিন্ন দেশের লোক। ফরাসী অঞ্চলের সুইস্‌রা ফরাসী ভাষায় কথা কয়, তাদের কেহ জার্মাণ ভাষা একপ্রকার জানে না বল্‌লেই চলে। আর ইতালিয়ান তাদের জানা তো নাই-ই। জার্মাণ সুইট্‌সারল্যাণ্ডের নর-নারী জার্মাণ ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা জানে না। আর ইতিলিয়ান জনপদের লোকেরা জার্মাণও জানে না, ফরাসীও জানে না। কথাগুলা

কিছু অতিরঞ্জিত ক'রে বল্‌ছি। অর্থাৎ প্রত্যেকেই হয়ত কিছু-কিছু অপর ভাষা দুইটা জানে।

প্রঃ—সুইট্‌সারল্যাণ্ডের ইস্কুলে কী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়?

উঃ—সুইট্‌সারল্যাণ্ডে তথাকথিত সার্বজনিক অথবা জাতীয় ভাষা ব'লে কোনো ভাষা নেই। প্রত্যেক জনপদেই ছেলেমেয়েরা নিজ-নিজ মাতৃভাষায় লেখা-পড়া শিখে থাকে। তবে জার্মাণ জনপদের ইস্কুলে ফরাসী ভাষা শেখাবার ব্যবস্থা আছে। এমন কি শিক্ষার ব্যবস্থায় ফরাসী ভাষা বাধ্যতামূলক বটে, তথাপি ফরাসী এখানে একটি মামুলি দ্বিতীয় ভাষা মাত্র। অনেকের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে বুঝেছি যে, তারা ইস্কুল ছাড়্‌বার পর ফরাসী ভাষার সঙ্গে মোলাকাৎ খুব কমই্‌ করে। (আমাদের দেশের ইস্কুলে ৫/৭ বৎসর সংস্কৃত পড়্‌বার পরও সংস্কৃত ভাষায় আমাদের অভিজ্ঞতা নেহাৎ কম থাকে)। বস্তুতঃ তাদের সঙ্গে ফরাসীতে কথাবার্তা চালাতে চেষ্টা ক'রে দেখেছি, অনেকেই তা পারে না।

প্রঃ—তা হ'লে ফরাসী-সুইট্‌সারল্যাণ্ডে ভাষা-সমস্যা কিরূপ?

উঃ—"স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ"। ফরাসী ভাষাই এখানকার আদি ভাষা, তবে জার্মাণ পড়াবারও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের কথা এই অঞ্চলের সুইস্‌-মহলে জার্মাণ ভাষার সঙ্গে অসহযোগ যেন একটা বাঁধা কথা। জার্মাণ সুইট্‌সারল্যাণ্ডের লোকেরা যতটুকু ফরাসী বল্‌তে পারে, ফরাসী সুইট্‌সারল্যাণ্ডের লোকেরা ততটুকু জার্মাণ বল্‌তে পারে না মনে হ'য়েছে।

প্রঃ—ইতালিয়ান-সুইট্‌সারল্যাণ্ডের কথা তা হ'লে কিছু বলুন।

উঃ—এখানকার ইস্কুলেও জার্মাণ অথবা ফরাসী পড়াবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু লোকেরা না জানে ফরাসী, না জানে জার্মাণ।

"বিদেশ-দক্ষ" লোকজন

প্রঃ—লোকেরা সার্বজনিক রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের জন্য কোন্‌ ভাষার ব্যবহার করে?

উঃ—যে যে-গাঁয়ে বাস করে, সে সে-গাঁয়ের দৈনিক কাগজ পড়ে, ব্যস,—কেহ জার্মাণ, কেহ ফরাসী, কেহ ইতালিয়ান।

প্রঃ—আমরা কেন শুনি ও বলাবলি ক'রে থাকি যে, সুইস্‌ নরনারী প্রত্যেকেই তিন-তিনটা ভাষায় কথা কইতে পারে, বই পড়্‌তে পারে ইত্যাদি?

উঃ—আমরা যে-কোনো বিদেশীকে হোমরা-চোম্‌রা ভাবি ব'লে। তবে এখানে আর একটি কথাও ব'লে রাখা ভাল। পৃথিবীর প্রত্যেকে দেশে—মায় ভারতেও—একাধিক ভাষা শেখা আজকালকার দিনে একটা মামুলি কথা। বিশেষতঃ ব্যবসায়ী ও বণিক্‌মণ্ডলে, দালাল-পাড়ায়, হোটেলের কাজে একাধিক ভাষা না জান্‌লে কথঞ্চিৎ উঁচুদরের দায়িত্বপূর্ণ কাজ চালানো সম্ভবপর হয় না। তার উপর আছে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক নামে একজাত। তাদেরকেও অনেক সময়ই, বাস্তবিক পক্ষে প্রায় প্রতিদিনই একটা দ্বিতীয় অথবা সময়-সময় একটা তৃতীয় ভাষাও দখলে রেখে অনুসন্ধান-গবেষণা চালাতে হয়। অধিকন্তু অন্য এক শ্রেণীর লোকও আজকাল সকল দেশেই আছে। তারা পররাষ্ট্রনীতির ব্যবসায়ী। দেশবিদেশের রাজনৈতিক উঠানামা জরিপ করা তাদের পেশা। কেহ বা রাজ-দূত, কেহ

বা কন্‌সাল, কেহ বা পররাষ্ট্র-সচিব, কেহ বা বড়-বড় সংবাদপত্রের কিম্বা বিদেশী সংবাদ-বিভাগের ধুরন্ধর। এই সকল ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণীর লোক আজকাল প্রত্যেক দেশেই গুণ্‌তিতে বেশ পুরু। এমন কি আমাদের ভারতেও দেখ্‌তে-দেখ্‌তে দু'একজন ক'রে "বিদেশ দক্ষ", বিদেশী সংবাদের বিশেষজ্ঞ, পররাষ্ট্রনীতির সমজদার, বিদেশী আন্দোলনের ধুরন্ধর বেড়ে যাচ্ছে। ইয়োরামেরিকার আর জাপানের সর্বত্রই এই ধরণের বিদেশ-দক্ষ নরনারী (অতএব বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় সুপটু) লোকজন আমাদের ভারতের চেয়ে অনেক বেশী।

প্রঃ—সুইস্‌-সমাজে বিদেশ-দক্ষ নরনারী অনেক কি?

উঃ—কম নয়। বিশেষ কারণগুলা উল্লেখযোগ্য। সুইট্‌-সারল্যান্ড টুরিষ্ট-বা-পর্যটক-প্লাবিত দেশ। বিদেশী নরনারীর যাতায়াতের উপর নির্ভর ক'রে এদেশের রেল-হ্রদের যানবাহন-কোম্পানী হোটেল-রেস্তরাঁর ব্যবসাদার, মনোহারী দোকানের মালিক ইত্যাদি সকলেই অল্পবিস্তর টাকা রোজগার করে। যে খানিকটা কাশ্মীর আর কি! কাজেই একাধিক ভাষাজ্ঞান সুইট্‌সারল্যান্ডের আবহাওয়ায় একটা আটপৌরে জিনিষ গোছের। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি লোকজনের হাঁড়ির খবর নিয়ে দেখেছি যে, সুইস্‌ জনসাধারণ বাস্তবিক পক্ষে মূলতঃ এক ভাষাভাষী আর সেই এক ভাষাও জনপদ হিসাবে বিভিন্ন।

পারিবারিক ও সামাজিক কোঁদল

প্রঃ—দেশটা এরূপ ত্রিধা-বিভক্ত হ'লে ইহার মধ্যে ঐক্য কোথায়?

উঃ—জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ওঠাবসায় বাস্তবিক পক্ষে কোনো প্রকার ঐক্য নেই। আমি সুইট্‌সারল্যান্ডের তিন জনপদকে তিন-তিনটা স্বাধীন দেশে বিবেচনা কর্‌তে অভ্যস্ত। ঐক্য এখানকার সবই আইন-বিষয়ক, শাসন্‌-বিষয়ক, রাষ্ট্র-বিষয়ক।

প্রঃ—সভ্যতা-বিষয়ক, সামাজিক ঐক্য কিছুই নাই কি? এতদিন ধ'রে এক আইনের অধীনে, এক শাসনের অন্তর্গত থেকেও তিন জন-পদের নরনারী সামাজিক লেনদেন সম্বন্ধে একতা বিকাশ কর্‌তে পারেনি কি?

উঃ—ওপর-ওপর মনে হ'বে যে, বোধ হয়—সংস্কৃতি, কৃষ্টি বা সভ্যতা হিসাবেও খানিকটা ঐক্য গ'ড়ে উঠেছে। বিশেষতঃ ভারতবাসীর চোখে ফরাসীও যা, ইংরেজও তা, জার্মাণও তা, স্পেনিশও তা, ইতালিয়ানও তা মনে হবারই কথা ; কেন না, ইহারা সকলেই শাদা চামড়ার লোক, হ্যাটকোটও পরে সবাই, খায়ও সকলে টেবিলে ব'সে। কিন্তু এই বাহ্য ঐক্য ফুঁড়ে অন্দরে আর সঙ্গে-সঙ্গে অন্তরে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌লে ইয়োরোপীয়ানদের ভিন্ন-ভিন্ন জনপদে বিলকুল ভিন্ন-ভিন্ন সমাজ, সংসার, পরিবার, ধরণ-ধারণ, অধ্যাত্মজীবন আবিষ্কার কর্‌তে পারি। বস্তুতঃ ইতালিয়ানরা নিজেদেরকে ফরাসী হ'তে একদম আলাদা ভাবে। ফরাসীরা নিজেদেরকে কোনো দিনই ইংরেজদের সঙ্গে সমগোত্রভুক্ত সম্‌ঝে' চলে না। সেইরূপ ইংরেজে জার্মানে ফারাক অনেক বেশী। জার্মানে পর্তুগীজে পার্থক্যও প্রচুর। ফলতঃ সুইট্‌সারল্যান্ডের তিন জনপদে তিন-তিনটা স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র সমাজ দেখ্‌তে পাই।

প্রঃ—দু'কটা এমন কথা বল্‌তে পারেন কি যাতে সুইট্‌সারল্যান্ডের ফরাসী-জার্মাণ-ইতালিয়ান প্রভেদটা বেশ নিরেটভাবে ধর্‌তে পারি?

উঃ—আসল কথা ধরা পড়ে বিয়ে-ঘটিত কাণ্ডে। সুইস্-ইতালিয়ান কোনো মতে সুইস্-জার্মাণকে বিবাহ কর্‌বে না। সুইস্-জার্মাণ কোনো মতেই সুইস্-ফরাসীকে বিবাহ কর্‌বে না। সুইস্-ফরাসীও কোনো মতে সুইস্-ইতালিয়ানকে বিবাহ কর্‌বে না। সবই চলেছে ঠিক যেন গোত্র-মাফিক। যদি বা প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে ঘটনাচক্রে দু'টা-একটা ছুট্‌কা বিবাহ গোত্রের বাহিরে ঘ'টে যায়, তা হ'লে পারিবারিক জীবন প্রায়ই নরককুণ্ডে পরিণত হয়। প্রথম দু'এক বৎসর হয়ত গোলাপী নেশায় বেশ-কিছুদিন চ'ল্‌তে পারে। কিন্তু ক্রমশই দেখা যায় যে, ফরাসী মেয়ে গিয়ে জার্মাণ সুইট্‌সারল্যাণ্ডে হাঁই-ফাঁই হাঁই-ফাঁই করে, জার্মাণ মেয়ে ফরাসী-সুইট্‌সারল্যাণ্ডের সামাজিক আবহাওয়ায় তিতিবিরক্ত হ'য়ে উঠে ; আর ইতালিয়ান নারী গোটার্ড পাহাড়ের উত্তর পাড়ে একদম নির্জীব অবস্থায় চলাফেরা করে।

প্রঃ—সামাজিক দ্বন্দ্বগুলা দেখা দেয় কোন্ আকারে?

উঃ—ঠিক আমাদের দেশে যে-আকারে সামাজিক ঝগড়া, পারিবারিক কোঁদল অথবা পাড়াপড়্‌শীর দ্বন্দ্ব দেখ্‌তে পাই, ইয়োরোপের সকল দেশেই ঠিক সেই আকারে দেখ্‌তে পাই। ইংরেজ সমাজেও এই সব দেখা যায়, জার্মাণ সমাজেও দেখা যায়, ইতালিয়ান সমাজেও দেখা যায়, ফরাসী সমাজেও দেখা যায়। এই গেল প্রথম কথা। ''আন্তর্মানুষিক যোগাযোগ''গুলা দুনিয়ার সর্বত্রই এক ঢঙের বা গড়নের।

প্রঃ—ইয়োরোপে পারিবারিক ঝগড়ার কোনো বিশেষত্ব আছে?

উঃ—এই পারিবারিক ঝগড়াকলহ জটিলতর হ'য়ে উঠে, যেই বিবাহ হয় ইংরেজ-ফরাসীতে অথবা ফরাসীতে-জার্মাণে অথবা ইতালিয়ানে-ফরাসীতে। আন্তর্জাতিক বিবাহে যে-সব নিত্য-নৈমিত্তিক ঝগড়া দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সেগুলা মামুলি সাধারণ স্বদেশী সমাজেও আগাগোড়া আছে, কেবল আকারে-প্রকারে কিছু-বেশী নজরে ঠেকে।

প্রঃ—সুইস্ সমাজে বিয়ে-ঘটিত কোঁদল কেমন?

উঃ—সুইট্‌সারল্যাণ্ডে যদি কোনো ফরাসী-সুইস্ জার্মাণ-সুইস্‌কে বিয়ে করে তা'হলে ঠিক যেন স্বাধীন ফ্রান্সের কোনো লোক স্বাধীন জার্মাণির কোনো লোককে বিয়ে কর্‌ল বুঝ্‌তে হবে। অর্থাৎ সুইট্‌সারল্যাণ্ডের তিন জনপদবাসী নরনারীর ভিতর ঘটনাচক্রে বিবাহ অনুষ্ঠিত হ'লে সত্যি-সত্যিই আন্তর্জাতিক বিবাহ ঘট্‌ল মনে করা উচিত।

প্রঃ—এই সব পারিবারিক ঝগড়ার দু-একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারেন?

উঃ—ফরাসী মেয়ে যদি জার্মাণ-সুইস্ পরিবারে ঘর কর্‌তে আসে তা'হলে সে তার জার্মাণ ননদ এবং জা, জার্মাণ শাশুড়ী, মাস-শাশুড়ী, পিস-শাশুড়ী ইত্যাদির সমালোচনায় ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে উঠ্‌তে বাধ্য। অবশ্য প্রথমেই বুঝে রাখা উচিত যে, ইয়োরোপে কোনো ছেলেই বিয়ে করার পর নিজ-নিজ বাপ-মার সঙ্গে এক পরিবারে থাকে না, সকলেই বিবাহিত জীবন সুরু করে বিলকুল স্বতন্ত্র ঘরবাড়ীতে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপ, মা, ভাই, বোন, ভগ্নীপতি, ভাজ, ভাই-পো, ভাই-ঝি ইত্যাদির সঙ্গে লেনদেন, যাওয়া-আসা সর্বদাই বজায় থাকে। এই কারণে স্ত্রী এই সকল আত্মীয়-স্বজনের সংস্পর্শ, আনাগোনা, টীকা-টিপ্পনি এড়িয়ে চল্‌তে পারে না। ''আন্তর্মানুষিক'' যোগাযোগ থেকে হয়েই যায়।

প্রঃ—কেন, এসব তো মামুলি ননদ-ভাজের ঝগড়া মাত্র? এসব এড়িয়ে চল্‌বার তাগিদ কোথ্‌থেকে আসে?

উঃ—অন্যান্য ক্ষেত্রে যা মামুলি ননদ-ভাজের টীকা-টিপ্পনি বা ঝগড়া-ঝাটি মাত্র

বিবেচিত হয়, সেই-সব মামুলি ঝগড়াঝাটিই ফরাসী-বনাম জার্মাণ, ইতালিয়ান-বনাম ফরাসী, অথবা জার্মাণ-বনাম ফরাসী ইত্যাদি জাতিগত কোঁদল বা আন্তর্জাতিক সমস্যারূপে দাঁড়িয়ে যায়। ফরাসী মেয়ে তখন তার বাপের বাড়ীর কথা তুলে গোটা ফ্রান্সের ইজ্জদ্ রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা করে। ইতালিয়ান মেয়ে তার বাপেব বাড়ী বল্‌লে বুঝে ঠিক যেন গোটা ইতালির চৌদ্দপুরুষই তার আত্মীয়। আর একবার যেই "দেশ" নিয়ে সমালোচনা সুরু হয়, অমনই আর যাবে কোথায়? অর্থাৎ প্রতিদিনই আন্তর্জাতিক বিবাহ-গঠিত পরিবারে এক-একটা বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র চল্‌তে থাকে।

প্রঃ—তা হ'লে সুইট্‌সারল্যান্ডের পারিবারিক গড়ন কিরূপ বল্‌বেন?

উঃ—মোটের উপর নিম্নরূপ ঃ—

ফরাসী-সুইট্‌সারল্যান্ডে জার্মাণ-ফরাসী বিবাহের দৃষ্টান্ত বিরল, জার্মাণ-সুইট্‌সারল্যান্ডেও তথৈবচ। ইংরেজিতে একটা কথা বলে—জলের চেয়ে রক্ত ঘন। এই নীতি অনুসারেই ইতালিয়ান-সুইস্ বিবাহ করে ইতালিয়ান-সুইসকে, জার্মাণ-সুইস জার্মাণ-সুইসকে ইত্যাদি। এই থেকেই বুঝ্‌তে হবে সুইট্‌সারল্যান্ডের পারিবারিক কাঠামো।

প্রঃ—সুইস্ নরনারী তা'হলে স্বাধীন ফ্রান্সকে আর স্বাধীন জার্মাণিকে কিরূপ চোখে দেখে?

উঃ—এইখানে একটা মজার কথা বেরিয়ে পড়্‌বে। দেশ-বিদেশে অনেকেরই বিশ্বাস,— জেনেভা অঞ্চলের সুইস্‌রা যখন ফরাসী তখন তারা বোধ হয় ফ্রান্সকে আপনাব লোক বিবেচনা করে। সেইরূপ তিচিনোর ইতালিয়ান-সুইস্‌রা বোধ হয় ইতালিকে আপনার জন ভেবে থাকে। আর জার্মাণ-সুইট্‌সারল্যান্ডের লোকেরা জার্মাণি ও অষ্ট্রিয়াকে যেন নিজের লোক বিবেচনা করে। আসল কথা ঠিক উল্টা। রাষ্ট্রহিসাবে ইতালিয়ান-সুইস ইতালিকে আপনার লোক ভাবে না, রাষ্ট্রহিসাবে ফরাসী-সুইট্‌-সারল্যান্ডের নরনারী ফান্সকে বন্ধু বিবেচনা করে না ; আর জার্মাণ সুইট্‌সারল্যান্ডের নরনারীও জার্মাণি ও অষ্ট্রিয়াকে রাষ্ট্রহিসাবে নিজের লোক ভাবে না। সুইস্‌রা যে অঞ্চলেই বাস করুক, আর যে ভাষায়ই কথা বলুক না কেন, সকলেই কট্টর স্বদেশভক্ত। তারা দু'চক্ষে না দেখ্‌তে পারে ফ্রান্সকে, না দেখতে পারে জার্মাণিকে, না দেখ্‌তে পারে ইতালিকে।

বিদেশ-গবেষণার হাতিয়ার

প্রঃ—আপনি এসব খবর পেলেন কোথায়?

উঃ—পাবার প্রণালী অতি সোজা। আমি যা জানি না, লোককে তা খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করি। এই হ'লো সমাজ-গবেষণার হাতিয়ার বা কর্মকৌশল।

প্রঃ—জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে?

উঃ—জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলে নিশ্চয়ই। তবে এসব প্রশ্ন এত ঘরোআ যে, সাধারণতঃ লোকেরা এসব কথা তুল্‌তে সাহসই পায় না। আমাদের দেশেও ক'জন বাঙালী তার পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের তাদের ঘরের কথা বা কুলের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস পায়? কাজেই বিদেশীর পক্ষে অপর কোনো বিদেশীকে হেঁসেল-ঘরের কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা,

ননদ- ভাজের কথা পাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোভন দেখায় না। সাধারণতঃ লোকেরা খুব জোর খবরের কাগজের দু'একটা নিন্দা-চুগ্‌লির গল্প শুনে কোনো বিদেশী সমাজের ধরণধারণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান অর্জন করে মাত্র। কিন্তু তাতে সেই সমাজের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই অবিচার করা হয়।

প্রঃ—আপনার পক্ষে তা হ'লে এই সব পারিবারিক গেরস্থালীর বা অন্যান্য সামাজিক কথা সম্বন্ধে বিদেশী লোকজনদের সঙ্গে কথা পাড়া সম্ভবপর হ'ল কী করে?

উঃ—আমি লোকটা ঠোঁটকাটা। বিলকুল সোজা ভাবে—বিনা আম্‌তা আম্‌তা ক'রে,—আমি জিজ্ঞাসা ক'রে ফেলি। লোকেবা বোধ হয় বুঝে যে, তাদের ব্যক্তিগত ঘরোআ কথা নিয়ে ঘোঁটমঙ্গল করা আমার মতলব নয়। সংসারখানা কি, দুনিয়ার চিড়িয়াখানায় লোকজনের ধরণ-ধারণ কিরূপ এইটুকু বুঝে লওয়া মাত্র আমার মতলব। আর এক কথা। ঘটনাচক্রে দুনিয়ার নানাদেশেই অনেক লোক এই অধমকে ঘরোআ বন্ধু ভাবে নিয়েছে।

প্রঃ—কিন্তু আপনার মতলব এইরূপ সোজা বুঝে কি তারা তাদের কুলের কথা পাড়্‌তে অগ্রসর হয়?

উঃ—কথাটা আরো কিছু গভীরভাবে তলিয়ে দেখা আবশ্যক। বাস্তবিক পক্ষে দু'একবার করমর্দন আর "কেমন আছেন মশায়?" "আজ্ঞে বেশ আছি", "চলে যাচ্ছে", "সম্বন্ধমাভাযণপূর্বমাহু" ধরণের আলাপ-পরিচয়ের পর এই শ্রেণীর গুহ্যতত্ত্ব আলোচনা করা সম্ভবপর হয় না। আর শোভন তা নয় বটেই।

প্রঃ—কেন প্রথম কয়েক দিনের আলাপে কী জানা যায়?

উঃ—যে-কোনো সমাজেই যাই না কেন—কি আমেরিকায়, কি ফ্রান্সে, কি বিলাতে, কি জাপানে-চীনে, কি জার্মাণিতে, কি ইতালিতে, কি সুইট্‌সারল্যান্ডে—সর্বত্রই প্রথম দু'তিন দিনের গল্পগুজব প্রধানতঃ বা একমাত্র থাকে দুনিয়ার আবহাওয়া সম্বন্ধে। চা-যোগের নিমন্ত্রণই হোক, কি পুরাপেট ভোজনের ব্যবস্থাই হোক, দুপুর বেলাই হোক, কি নৈশ মজলিশই হোক, প্রথম-প্রথম আলাপ-পরিচয়গুলায় আলোচিত হয় বিজ্ঞানের কথা, সঙ্গীতের কথা, "ফিউচারিজ্‌মের" কথা, সোশ্যালিজ্‌মের কথা, স্বাধীনতার কথা ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবীতে লম্বা-লম্বা বোলচাল যে-সকল বিষয়ে সম্ভব সেই সকল বিষয়ে কথাবার্তাই প্রথম কয়েক বৈঠকে প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের ভিতর প্রধান ঠাঁই অধিকার করে। আমার বিবেচনায় এই সকল প্রথম দুই-তিনবারকার আড্ডায় কোনো ব্যক্তি বা পরিবার বা ক্লাবের নিকট হ'তে ভিতরকার কথা, প্রাণের কথা, আসল জীবনের কথা কিছুই পাওয়া যায় না। এই সকল আলাপ-পরিচয় নেহাৎ ভালভাসা, অগভীর ছাড়া আর কিছু নয়। তাতে ফরাসীকেও চিন্‌তে পারা যায় না, জার্মাণকেও চিন্‌তে পারা যায় না, জাপানীকেও চিন্‌তে পারা যায় না, মার্কিণকেও চিন্‌তে পারা যায় না, সুইসকেও চিন্‌তে পারা যায় না। ও-সবই বিজয়া-দশমীর কোলাকুলি আর মিষ্টিমুখ বিশেষ। সে হচ্ছে পোষাকি চিজ,—জগন্নাথের মহোচ্ছব, আটপৌরে কিছু নয়।

প্রঃ—প্রথম দুই-তিনবারকার আলাপে যদি বাস্তবিক কোনো বিদেশীর আসল প্রাণের কথা ধরতে না পারা যায় তা হ'লে বিদেশী-সমাজের ভিতরকার কথা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা নেহাৎ কঠিন নয় কি?

উঃ—আলবাৎ কঠিন। আর বাস্তবিক পক্ষে এইজন্যই পৃথিবীতে সাধারণতঃ বিদেশী

নরনারী সম্বন্ধে সুবিচার করা অধিকাংশ পর্যটক, সম্পাদক বা লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কেন না অনেক সময়ই পর্যটক, লেখক, সাংবাদিকেরা অতি অল্প সময় মাত্র—কোনো কোনো ক্ষেত্রে দু'চার দিন বা ঘণ্টা দশেক মাত্র—এক একটা শহরে কাটাবার সুযোগ পায়। এই অবস্থাতে লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা, তাদের সঙ্গে বেশ-কিছু বন্ধুত্বের সহিত কথাবার্তা কওয়া প্রায়ই ঘ'টে উঠে না। বড়-জোর কোনো একটা কাফেতে কিম্বা রেস্তরাঁতে ঘণ্টা খানেক বা ঘণ্টা কয়েক কথাবার্তার সুযোগ জুটে। যদিই বা ঘটনাচক্রে কোনো পরিবারে চা-যোগের অথবা নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ জুটে গেল, তখনও-কোনো বিদেশী অতিথি গেরস্থমশায়কে অথবা গৃহস্থ-পত্নীকে কুলের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার সুযোগ পেতে পারে না। কাজেই পারিবারিক জীবন ও সামাজিক জীবন, এক কথায় নরনারীর ব্যক্তিত্বের প্রধান-প্রধান শক্তিগুলা সম্বন্ধে বিদেশী মাত্রেই অল্পবিস্তর অনভিজ্ঞ থাক্‌তে বাধ্য।

প্রঃ—বিদেশীদের ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা কাটিয়ে ওঠা একদম অসম্ভব কি?

উঃ—এই অনভিজ্ঞতা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব যদি কোনো লোক অনেকদিন ধ'রে বিদেশী পরিবারের সঙ্গে তাদের ঘবের লোকের মতন লেন-দেন চালাতে পারে। বলা বাহুল্য,—আসল কথাই হচ্ছে বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা, নিবিড়তর আনাগোনা। মৌখিক আলাপ-পরিচয়েব মারফতে কোনো লোকের ঘরবাড়ীর কথা, রান্নাঘরের কথা, শ্বশুরবাড়ীর কথা, একটা জাতের আসল ধরণ-ধারণ জান্‌তে পারা যায় না।

প্রঃ—বিদেশী নরনারীর পরিবারে ঘরের লোকের মতন চলাফেরা কর্‌তে পার্‌লেই কি আত্মীয়স্বজনের কথা, বিবাহের আগেপরের কথা, ধর্মকলহের কথা, আন্তর্জাতিক বিদ্বেষের কথা সম্বন্ধে গভীরতর আলোচনা চালানো সম্ভবপর হয়?

উঃ—অনেক ক্ষেত্রেই হয়। বিশেষতঃ যে-সব পরিবারেখের গিন্নি বেশ কিছু বয়স্থ লোক অর্থাৎ দু'তিন ছেলেমেয়ের জননী, তারা নিজেদের সুখদুঃখেব কথা বিনা ওজরে ব'লে যেতে সঙ্কোচ বোধ করে না। তারা তাদেব ছেলেপেলেদের ভেতর অথবা আত্মীয়কুটুম্বের ভেতর যে-সকল কোঁদল চলে, সে-সব সম্বন্ধে "মানুষের কাছে" "মানুষের মতন" বেশ-সহজেই ব'লে যেতে প্রস্তুত থাকে। পাড়াপড়্‌শীদের সঙ্গে তাদের ঝগড়া-ঝাটিগুলা ঘটে,—টাকার গরমে। কখনো বা ধর্মের বৈষম্যে কখনো বা সামাজিক পদগৌরবের পার্থক্যে। সে সব কথাও তারা বিনা আপত্তিতে ব'লে যায়। আমার অভিজ্ঞতা এইরূপ যে, এই ধরণের ভাবিভাত্তিক গৃহস্থঘরের মেয়েরা গৃহস্থালী, পারিবারিক জীবন, সামাজিক লেনদেন সম্বন্ধে যে-সকল কথা ব'লে চলে তাতেই সমাজের নিরেট কথাগুলা পাকড়াও কর্‌তে পারি। তারা কোনো দুরবস্থা "ব্যাখ্যা" কর্‌তে অগ্রসর হয় না অথবা কোনো দুর্নীতি ব্যাখা ক'রে উড়িয়ে দিতেও চেষ্টা করে না। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংস্পর্শে আস্‌লে আটপৌরে জীবনটা অতি স্বাভাবিক-রূপেই নিজের কব্‌জায় এসে হাজির হয়। কিন্তু অনেক সময়ই মুস্কিল হয় পুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার সময়।

প্রঃ—পুরুষদের কাছ থেকে কিরূপ খবর পাওয়া যায়?

উঃ—পুরুষেরা সাধারণতঃ বিদেশীকে দেখাবার মতন পোষাকি জীবনটাই বিবৃত ক'রে থাকে। তাতে কু-দিকটা ঢাকা পড়ে। প্রদর্শন-যোগ্য বস্তু জাহির কর্‌বাব যথাসম্ভব চেষ্টা দেখা যায়। বিশেষতঃ যে-সকল পুরুষ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কেতাব প'ড়েছে, তারা অতি

সাবধানে কথা কয় যেন নিজ দেশের কোনে গলদ না বেরোয়। যাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের কারবার আছে, কিম্বা যারা ভারতবর্ষে শফর ক'রে গেছে, তারা ভারতবাসীর সঙ্গে কথা বল্‌বার সময় নিজেদের সমাজ, পরিবার, গৃহস্থালী, রীতিনীতি সব-কিছুই ঝেড়ে-বেছে পালিশ ক'রে দেখায়। এমনভাবে চিত্রিত করে যাতে ভারতবাসীর সুপরিচিত কু-গুলার একটাও যেন নিজ সমাজের ভেতর না দেখা যায়। অর্থাৎ পুরুষের নিকট হ'তে সাধারণতঃ পাওয়া যায়, তাদের দেশ-সম্বন্ধীয় অশেষপ্রকার "প্রচার" বা "প্রপাগাণ্ডা"। নিজের দেশটাকে ভারতবর্ষের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর প্রমাণ কর্‌বার ঝোঁকটা খুবই প্রবল থাকে।

প্রঃ—একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলুন না?

উঃ—ধরা যাক্ ইয়োরামেরিকান সমাজের সনাতন ইহুদি-বিদ্বেষ। খৃষ্টিয়ানে-ইহুদিতে যে-সকল ঝগড়া আছে, তা নামজাদা ফরাসী-জার্মাণ, ইতালিয়ান-মার্কিণ বা অন্য কোনো ইয়োরামেরিকান অধ্যাপক বা জননায়কস্থানীয় পুরুষের নিকট কোনো ভারতবাসী পাবে কি না সন্দেহ। সেইরূপ অন্যান্য ধরণ-ধারণ, রীতি-নীতি সম্বন্ধেও ভারতবাসীর পক্ষে ইয়োরামেরিকান সমাজের ভিতরকার নর্দমাগুলা পুরুষদের নিকট হ'তে,—বিশেষতঃ ভারতঘেঁষা সাংবাদিক বা গ্রন্থাকারের নিকট হ'তে অথবা তথাকথিত "ভারত-বন্ধুদের" মজলিশ হ'তে—আবিষ্কার করা সম্ভবপর নয়। ইয়োরামেরিকার সংস্কৃত-ফার্শী-পালি-জানা ভারত-তত্ত্ববিৎ বা প্রাচ্য-দক্ষ অধ্যাপকেরা এই হিসাবে চরম পাপী। তাদের মস্ত পেশা হচ্ছে ইয়োরামেরিকার তুলনায় ভারতীয় নরনারীকে খাটো, ঘৃণ্য, নগণ্যরূপে দাঁড় করানো। তাদের মুখ থেকে নিজ সমাজের গলদ সম্বন্ধে একটা সাক্ষ্যও পাওয়া না যাবারই কথা।

"আন্তর্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ

প্রঃ—ইয়োরামেরিকার সমাজ আর ইয়োরামেরিকার নরনারীর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যদি ভারতবাসীর পক্ষে বাঞ্ছনীয় ও আবশ্যক বিবেচনা করেন, তা হ'লে কোন্ প্রণালীতে আমাদের অগ্রসর হওয়া আবশ্যক?

উঃ—প্রণালী আর কিছুই নয়, চাই বিদেশীদের সঙ্গে বিস্তৃততর ও গভীরতর লেনদেন। চাই বন্ধুত্ব, চাই আত্মীয়তা। চাই অনেক দিন-ব্যাপী বন্ধুত্ব ও অনেক দিনব্যাপী আত্মীয়তা। অবশ্য কোনো এক পরিবার বা দুই পরিবারের অভিজ্ঞতা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌লে চল্‌বে না। কোনো এক শহরের বা এক পল্লীর অভিজ্ঞতায় মশ্‌গুল থাক্‌লেও চল্‌বে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই চাই বহুবিধ পরিবার, বহুবিধ পল্লী, বহুবিধ শহরের সঙ্গে আত্মিক সহযোগ। এক কথায় ইহাকেই আমি বলি যুবক-ভারতের "বিদেশী আন্দোলন"। "বিশ্বশক্তির সদ্ব্যবহার" চিজটা এরি অন্তর্গত।

প্রঃ—আমরা তো স্বদেশী আন্দোলনই ক'রে থাকি। আপনি "বিদেশী আন্দোলন" পাড়্‌ছেন। সে আবার কী জানোআর?

উঃ—একটা দৃষ্টান্ত এখানে দিতে পারি। ইয়োরামেরিকানরা পাদ্রি হিসাবে, পণ্ডিত হিসাবে, ব্যবসায়ী হিসাবে, সরকারী চাক্‌রে হিসাবে, ভারতবর্ষে অনেকদিন ধ'রে বসবাস কর্‌ছে। ভারতবর্ষের মতিগতি, ভারতবাসীর জাত-পাঁত ভারতীয় নরনারীর সু-কু, লেন-

দেন, ধরণ-ধারণ ইত্যাদি সম্বন্ধে তারা অসংখ্য অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রেছে। সেই সকল অভিজ্ঞতা নানা দৈনিকে, সাপ্তাহিকে, মাসিকে, গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হ'য়েছে। এই সকল আলোচনার ফলে গ'ড়ে উঠেছে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ভারত-তত্ত্ব ইত্যাদি বিজ্ঞান। এই শ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ আলোচনা গবেষণার জন্য কায়েম আছে "এশিয়াটিক সোসাইটি" ইত্যাদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

প্রঃ—বেশ তো? আপনি কী করতে বল্‌ছেন?

উঃ—ভারতের জন্যও আমি চাই এই ধরণের ইয়োরামেরিকা-বিষয়ক গবেষণার কেন্দ্র, গবেষক, পর্যটক ও লেখক। ভারতবাসীর ইয়োরা-মেরিকান অ্যান্‌থ্রপলজি, নৃতত্ত্ব, সমাজ-ব্যবস্থা, ভাত-কাপড়, ঘরকন্না, ধর্মকর্ম, রীতি-নীতি, ধরণ-ধারণ, সৌজন্য-শিষ্টাচার, আইন-কানুন, আন্তর্জাতিক লেনদেন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গ'ড়ে তুল্‌বার জন্য সচেষ্ট হোক। রামমোহন রায়ের আমল হ'তে আজ পর্যন্ত বাংলা দেশে অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এই ধরণের ইয়োরামেরিকান সভ্যতা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ অথবা গবেষণা-পরিষদ্ গ'ড়ে তুল্‌বার উল্লেখযোগ্য চেষ্টা করা হয় নি। সেই চেষ্টায় আজ যুবক-ভারত অগ্রসর হোক্। চাই ভারতে বিদেশ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নরনারী,—বিদেশ-দক্ষ লোকজন।

প্রঃ—আপনি কিছু কর্‌ছেন?

উঃ—এই ধরণের নানা মতলবে "আন্তর্জাতিক বঙ্গ"-পরিষৎ কায়েম করা গেল (৯ই এপ্রিল ১৯৩২)। তার তদ্‌বিরে ছয়জন গবেষক নিয়মিতরূপে দেশবিদেশের সমাজ, শাসন-ব্যবস্থা ও আইন-কানুন আলোচনা কর্‌বে। এই পরিষৎ থাক্‌বে বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের ভগ্নী-প্রতিষ্ঠান স্বরূপ।

প্রঃ—"আন্তর্জাতিক বঙ্গ"-পরিষদের মারফৎ আপনি ফলাফল কিরূপ আশা করেন?

উঃ—এক প্রকার কিছুই না। ধনবিজ্ঞান পরিষদের মারফৎই বা কতটুকু আশা করা যায়? গবেষণার কাজে নুন-তেল লাগে। না-খেয়ে লোকেরা লেখাপড়া চালাতে পারে না। অবৃত্তিক গবেষক দিয়ে ধন-বিজ্ঞানের সাহিত্য পুষ্ট করাও অসম্ভব আর বিদেশী আন্দোলনের জন্য সাহিত্যও পুষ্ট করা অসম্ভব। পয়সা খরচ কর্‌তে পার্‌লে বাংলা দেশে "বিদেশ-দক্ষ" লোক অনেক গ'ড়ে তোলা সম্ভব।

("সাত-সাতটা বিদেশী আন্দোলন", "আলিয়াঁস ফ্রাঁসেজের কলিকাতা-শাখা", "রোটারি ক্লাব", ১৭ই মে ১৯৪৪)

মে ১৯৩২

বল্কান-চক্র ও ভারত

১লা মে ১৯৩২

শিবদত্ত—"নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন" বইএর প্রথম ভাগটা নেড়ে-চেড়ে দেখ্‌ছি যে,—এর মধ্যে বিলাত, ফ্রান্স, জার্মাণি প্রভৃতি আমাদের চেয়ে উন্নত এই কথাই বারে বারে নানাদিক্ দিয়ে বলা হ'য়েছে। কিন্তু ইয়োরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলা, যেমন বলকান অঞ্চল ইত্যাদি যে আমাদের সমান-সমান এই কথাটার ওপর জোর পড়েনি। এর কারণ

কী?

সরকার—আগেই এই ধরণের কথা দু'একবার হয়ত আলোচনা ক'রেছি। আচ্ছা, ইয়োরোপের পশ্চাৎপদ দেশগুলো যে আমাদের সমান-সমান এই ধারণাটা তুমি আমার কাছে প্রথম কবে পেয়েছ মনে আছে?

শিবদত্ত—ও-কথাটা আপনার সব লেখারই মধ্যে অল্প-বিস্তর লুকানো আছে। যখনই আপনি ব'লেছেন যে, বিলাত, জার্মাণি প্রভৃতি দেশ আমাদের চেয়ে ৫০/৬০/৭৫ বছর এগিয়ে, তার সঙ্গে-সঙ্গেই এ ধারণাটা আপনি ছড়িয়ে গেছেন যে, ইয়োরোপের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর দেশগুলা আমাদের প্রায় সমান-সমান। কিন্তু এই ধারণাটা আপনার কাছ থেকে খুব স্পষ্ট ভাবে পেয়েছি মাত্র মাস কয়েক আগে। এন্টালি বাজারে সওদা ক'র্‌তে-ক'র্‌তে আপনি একথা অনেকবার ব'লেছেন। সেই সময়ই আপনাকে খুব জোরের সঙ্গে বল্‌তে শুনি যে, আমরা ইয়োরামেরিকার পশ্চাৎপদ দেশগুলার অনেকটা কাছাকাছি। পশ্চাৎপদ দেশ ব'ল্‌তে আপনি প্রধানতঃ বল্কান জনপদ, বা বল্কান-চক্র, রুশিয়া ইত্যাদি দেশের কথা উল্লেখ ক'রেছেন। আপনি ইয়োরোপকে দুই শ্রেণীতে বা দুই জাতে ভাগ ক'রেছেন কোন্ মতলবে?

সরকার—এই বাতিক প'ড়েছি আমি ১৯১৪-১৮ সনের যুগে বা তারও আগে। "ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট" বই ১৯২৫ সনে বেরোয় (মাদ্রাজে)। কিন্তু অধ্যায়গুলো লেখা আর পত্রিকায় ছাপা হ'তে থাকে ১৯২১ সন থেকে। তখন আমি প্রথমবার বিদেশে। এই বইয়ে আধুনিক ইয়োরোপের দেশগুলার ভেতরকার বামুন-শূদ্দুর ফারক পষ্টাপষ্টি বাৎলিয়েছি। প্রথমে আমি ইয়োরোপের প্রধান কয়টা দেশগুলা নিয়ে পড়ি। আর তারা যে আমাদের চেয়ে নানাবিষয়ে অনেক উন্নত, একথা বারবার বল্‌তে থাকি। কেন জান? তখন আমাদের দেশে লোকজনের মস্তিষ্ককে এই ধারণা পেয়ে ব'সেছিল যে, আমরা আধ্যাত্মিকতায় বড়, ভারতবাসী ইয়োরোপের গুরু। এই ভ্রান্ত ধারণাটা ভাঙ্‌বার জন্যই আমাকে বারবার ব'ল্‌তে হ'য়েছে যে, ওরা বর্তমানে আমাদের চেয়ে উন্নত, ওরাই আমাদের গুরু। কাজেই আমরা যে ওদের গুরু এ ধারণা ছ্যাব্‌লামি মাত্র। এইজন্য ইয়োরোপের পশ্চাৎপদগুলা সম্বন্ধে আলোচনায় জোর দিইনি, তবে এদিকে নজর সর্বদাই ছিল অল্প-বিস্তর। আমাদের দেশটাকে ঠেলে তোল্‌বার হদিশ দেওয়া আমার অন্যতম পেশা বা বাতিক। কাজেই কারা আমাদের সমান-সমান বা অল্প-কিছু ওপরে, তাদের হিসাব রাখাও আমার আটপৌরে কাজ।

শিবদত্ত—একালের বল্কান অঞ্চলে আমাদের সমান অবস্থা দেখ্‌তে পান কোন্ দিকে?

সরকার—ধরো ব্যাঙ্কের কারবার। আমরা বাঙালী যেমন টাকা-কড়ির ব্যাপারে ইংরেজের দাস, বল্কান দেশের লোকেরাও ঠিক তেমনি জার্মাণ, ইংরেজ, ফরাসী, মার্কিণ ইত্যাদি পুঁজিপতিদের দাস। ওদের দেশের বড়-বড় ব্যাঙ্ক যা তা সবই বিদেশী। দেশী ব্যাঙ্ক যে-কয়েকটা আছে, সেগুলো বিদেশী প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ছোট। তাছাড়া, সেগুলাও অল্প-বিস্তর বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোর তাঁবে শাসিত হয়।

বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য

শিবদত্ত—বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে "বাঙালী, ভারত ও দুনিয়া" ব'লে যে একটা বক্তৃতা দিয়েছেন (২২শে ডিসেম্বর, ১৯৩১) তাতে বাঙালীদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। আজকাল চারিদিকেই ঐক্য-গ্রথিত ভারতীয় রাষ্ট্রের কথা শোনা যাচ্ছে। ঐ সময় বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কথা ব'লে দেশটাকে কি আপনি পিছিয়ে দিতে চাচ্ছেন না?

সরকার—ভাই, আমার কথা শুন্‌লেই যে বাঙালীরা কোনো-কিছু কর্‌বার জন্য আদানুন খেয়ে লেগে যাবে কে বললে? আমি চাচ্ছি মগজের খেলা। যুক্তির লড়াই। আমি ভারতখানাকে তামাম ইয়োরোপের মতন একটা মহাদেশ বা নিম-মহাদেশ সমঝে থাকি। এটা ফ্রান্স, ইতালি বা স্পেনের মতন ছোটোখাটো মামুলি দেশ নয়। ফ্রান্স, ইত্যাদি ইত্যাদি দেশের মতন দেশ পাঞ্জাব, বাঙলা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ইত্যাদি জনপদ। এইসব হ'চ্ছে যুক্তির কথা। সদিচ্ছা মাফিক চিন্তার মামলা নয়। কেঠো নীরস তথ্য বা বস্তু।

শিবদত্ত—সারা ভারত একটি ঐক্য-গ্রথিত রাষ্ট্রের অন্তর্গত হবে এরূপ আপনি বিশ্বাস কর্‌তে রাজি নন?

সরকার—না। এটা বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার অতীত জিনিষ। ভারতের মতই ইয়োরোপেরও অবস্থা। ইয়োরোপে কোনো দিন ঐক্যবদ্ধ ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র খাড়া হ'তে পার্‌বে না। এত বড় একটা মহাদেশ কোনো ঐক্য-গ্রথিত বাষ্ট্রের অন্তর্গত হবে, তা সম্ভব মনে করি না। কারণ দুনিয়ায় এটা এখনও সম্ভব হয় নি। সম্ভাবনার লক্ষণ এখনো চোখে আস্‌ছে না, ভায়া। পাঁচ-সাতশ, বছর পরে কী হবে বা হওয়া সম্ভব তার কোষ্ঠী কাটা আমার আক্কেল-দৌলতের অতীত।

শিবদত্ত—কেন, ভারতবর্ষ কি আজ ঐক্য-গ্রথিত নয়?

সরকার—ভারত ঐক্য-গ্রথিত হ'য়েছে বটে, কিন্তু সেটা ইংরেজ শাসনের দৌলতে। নেপোলিয়ানের আমলেও কিছুদিনের জন্য ঐক্য-গ্রথিত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র দাঁড়ায় নি কি? যে-দিন থেকে ভারত একই বড় লাটের তাঁবে শাসিত হ'চ্ছে, সেদিন থেকেই ভারতে একটা ঐক্য দাঁড়িয়ে গেছে। একথা বুঝে না কোন্ কানা? কিন্তু এটা যে বিলাতী শাসনের ফলেই প্রতিষ্ঠিত তা'ভুলে যাই কেন? এটা বিলাতী ঐক্য,—ভারতীয় ঐক্য নয়।

শিবদত্ত—এই ঐক্য-গ্রথিত বৃটিশ ভারতের সুফল কিছু নেই কি?

সরকার—কে বল্‌ছে নাই? আলবৎ আছে। কিন্তু তা বৃটিশ-ঐক্য, বিলাতী সাম্রাজ্যের ক্যার্‌দানি, ইংরেজ জাতের আধ্যাত্মিক, আর্থিক ও পল্‌টনি শক্তির জয়-জয়কার। তাতে ইংরেজের বাড়্‌তি দেখতে পাই, বিলাতী নরনারীর দিগ্‌বিজয় পরিস্ফুট। এর ভেতর ভারতীয় নরনারীর ঐক্য কোথায়? আবার ভারতের কেন্দ্র-গভর্মেন্ট ও প্রাদেশিক গভর্মেন্টগুলার যে সম্বন্ধ তার মধ্যেই 'ফেডারেশানের' ভাব কিছু-কিছু র'য়েছে। ফেডার্যাল গভর্মেন্ট কর্‌বার কথা উঠেছে। ভাল কথা। তার উদ্দেশ্য বর্তমানের বন্দোবস্তকেই অদল-বদল ক'রে, প্রাদেশিক গভর্মেন্টগুলার সীমানা, কার্যক্ষেত্র বা ক্ষমতা বাড়িয়ে-কমিয়ে দেওয়া। তাতে শাসন-যন্ত্রটা আরও মজবুত ও কর্মঠ হ'য়ে উঠ্‌বে। তার বিরুদ্ধে বল্‌বার কী আছে? এ সবই বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর বৃটিশ নরনারীর শক্তিবৃদ্ধির কর্ম-কৌশল মাত্র। ওসব খারাপ-কিছু নয়। কিন্তু তাকে ফুলিয়ে তথা-কথিত ভারতীয় ঐক্য, ঐক্যবদ্ধ

ভারত-রাষ্ট্র ইত্যাদিরূপে সম্বর্দ্ধনা করা ছেলেমানুষি।

শিবদত্ত—আপনি কী চান?

সরকার—আমি রাষ্ট্রনীতির ধার ধারি না। আমার কথা মাফিক কাজ হ'তে পারে কিনা তাও খতিয়ে দেখি না। আমি চাই যে, দেশের লোকেরা নতুন দিকে মুড়ো খেলাক্। বাঙালীর মগজের ভেতর চাষ চল্‌তে থাকুক।

শিবদত্ত—বর্ত্তমানে নতুন দিক্ কিরূপ?

সরকার—বাঙালীরা ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এক-একটা প্রদেশে যথাসম্ভব স্বতন্ত্রতা রক্ষা ক'রে চলুক্। অবশ্য পাঞ্জাবীরা আর বাঙালীরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা রেখে অগ্রসর হ'ক্। মারাঠাদের সঙ্গেও বাঙালীদের যোগাযোগ রেখে চলা উচিত। কাউকে একঘ'রে ভাবে থাক্‌তে বল্‌ছি না। বাঙালীর বঙ্গ-স্বাতন্ত্র্যের মতন পাঞ্জাবীদের হোক্ পাঞ্জাব-স্বাতন্ত্র্য আর মাদ্রাজীদের মাদ্রাজ-স্বাতন্ত্র্য ইত্যাদি। বাঙ্‌লাকে ভারতবর্ষের ভিতরকার স্বতন্ত্র জনপদ ভাবা উচিত। এইটাই আমি এখন জোরের সঙ্গে প্রচার ক'র্‌তে চাই। বাঙ্‌লাদেশই হবে ভবিষ্যতে আমাদের প্রধান কর্ম্ম-মঞ্চ। পাঁচ কোটি বাঙালী ইয়োরোপের যে-কোনো পাঁচ কোটি নরনারীর সমান, এই লক্ষ্য ও আদর্শ আমি ভারতে ছড়াতে চাই। চার-পাঁচ কোটি ইতালিয়ান নরনারীর দেশে শতকরা বা হাজারকরা যতগুলা এঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ব্যাঙ্কার, চিত্রশিল্পী, কবি ইত্যাদি আছে বাঙ্‌লাদেশেও শতকরা বা হাজার-করা ঠিক ততগুলা ঐ শ্রেণীর নরনারী আবশ্যক।

আগে বাঙালী, তারপর ভারতবাসী

৯ মে ১৯৩২

শিবদত্ত—সেকালের জার্ম্মাণি সম্বন্ধে বিস্‌মার্কের যেরূপ মেজাজ ছিল, বাংলাদেশ সম্বন্ধে দেখ্‌ছি আপনাব মেজাজ সেইরূপ?

সরকার—মোটেই নয়। বোধ হয় আগাগোড়া ভুল বুঝ্‌ছো। সমাজ-বীমা সম্বন্ধে আমি বিস্‌মার্ক-পন্থী। জমি-জমার আইন-কানুন সম্বন্ধেও আমি বিস্‌মার্ক-পন্থী। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য মুল্লুকের যোগাযোগ সম্বন্ধে আমি বিস্‌মার্ক-পন্থী নই।

শিবদত্ত—আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

সবকার—সোজা কথা। বিস্‌মার্কের মতলব ছিল প্রুশিয়া জেলাকে জার্ম্মাণ-ভাষাভাষী নরনারীর দেশে কর্ত্তা ক'রে তোলা। আমি কি উত্তরবঙ্গ বা পূর্ববঙ্গকে বাংলা-ভাষাভাষী নরনারীর দেশে কর্ত্তা ক'রে তোল্‌বার পাঁতি দিচ্ছি? একদম নয়। আমি বল্‌ছি যে, ভারতবর্ষ ইয়োরোপের মতন একটা মহাদেশ বিশেষ। ইয়োরোপে ফ্রান্স, ইতালি, জার্ম্মাণি ইত্যাদি দেশ যা, ভারতে বাংলা, পাঞ্জাব, গুজরাত, মাদ্রাজ ইত্যাদি দেশ তা। ব্যস্।

শিবদত্ত—আপনার চিন্তাপ্রণালী সম্বন্ধে বিদেশের কোনো নজির দেবেন?

সরকার—ইয়োরোপের যে-কোনো ফরাসী, যে-কোনো জার্ম্মাণ, যে-কোনো ইতালিয়ান, যে-কোনো ইংরেজ এইরূপ চিন্তার প্রতিনিধি। মার্কিন মুল্লুকের নজির চাও?

শিবদত্ত—দিন না।

সরকার—সেকালের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিককার আর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার মার্কিণ রাষ্ট্রবীর জেফার্সনের নাম শুনেছ বোধ হয়? তিনি ছিলেন মার্কিণ মুল্লুকের ভিন্ন-ভিন্ন স্টেট্‌গুলার স্বতন্ত্রতার প্রচারক। তাঁর মতি-গতি ছিল ফেডার‍্যাল গর্ভমেন্ট বা ঐক্য-গ্রথিত কেন্দ্র-সরকারের একতিয়ার কমাবার দিকে। এই হিসাবে বাঙ্‌লাদেশ সম্বন্ধে আমাকে প্রকারান্তরে জেফার্সন-পন্থী সম্‌ঝিতে পার। অবশ্য আর বিশ-ত্রিশ-পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাক্‌লে আমার মেজাজ কিরূপ হবে বল্‌তে পারি না। তবে মনে হচ্ছে যে, আমি বোধ হয় কোনো দিনই বাঙ্‌লাদেশকে ফ্রান্স, ইতালি ইত্যাদি দেশের মতন স্বাতন্ত্র্যশীল স্বাধীন জীবন-কেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই ভাব্‌তে পার্‌বো না। ভারতীয় ঐক্যের জন্য দরদ আমার বেশী নয়। আমার কাম্য স্বাধীন বঙ্গ,—বাঙালী জাতের স্বতন্ত্রতা। স্বাধীন বাঙ্‌লার সঙ্গে ভাবতবর্ষের অন্যান্য জনপদের যোগাযোগ গৌণ কথা। আমি আগে বাঙালী তারপর ভারতবাসী।

শিবদত্ত—আপনি কি কংগ্রেসেব লোক নন?

সরকার—আমি কোনো-কিছুর লোক নই। আমি আমার লোক। আমার মুখে কোনো দিন গভর্মেন্টের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বল্‌তে শুনেছ কি? জীবনে আমাব পক্ষে রাষ্ট্রিক আন্দোলনে নাম লেখানো সম্ভব হ'ল না,—কি দেশে, কি বিদেশে। অনেকেই অথচ আমাকে রাষ্ট্রিক দলে ঢুকাতে চায়।

শিবদত্ত—কেন? রাষ্ট্রিক আন্দোলনে ঢুক্‌ত আপত্তি কী? আজ কাল ত কাউন্সিল-অ্যাসেমব্লি থাকাতে রাষ্ট্রিক আন্দোলনে যোগ দেওয়াটা বেশ-কিছু সুবিধাজনকই হ'য়ে প'ড়েছে! বোধ হয় লাভও আছে। এ সবে ঢুক্‌তে আপনি নারাজ কেন?

সরকার—রাষ্ট্রিক আন্দোলনে ঢুকে যাওয়ার মানে হ'চ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা অপরের মুখ দেখে কথা কওয়া। নিজের স্বাধীনতা খুয়িয়ে বসা। দশ জনের চোখের দিকে তাকিয়ে তাদের পছন্দসই কাজ করা,—অর্থাৎ নিজ ব্যক্তিত্ব আর চরিত্র জলাঞ্জলি দেওয়া। আমার মারাঠা বন্ধুরা আমার মতটা পছন্দ ক'র্‌ছে কিনা চোপর দিনরাত ভাব্‌তে হবে তাই। মাদ্রাজী ইয়ারেরা কি কথা বল্‌ছে, পাঞ্জাবী দোস্তেরা আমাকে দিয়ে কি বলতে চায়,—হামেশা তার সন্ধান রাখ্‌তে হবে। আর লোকপ্রিয় বোলচাল ঝেড়ে জীবন কাটাতে হবে।

শিবদত্ত—একমাত্র এই কারণে আপনি রাষ্ট্রিক আন্দোলনে ঢুকেন নি?

সরকার—রাষ্ট্রিক আন্দোলনের আর একটা মস্ত দোষ আছে। এতে কোনো মিঞা মাস তিনেক, বছর খানেক বা বছর দেড়েকের বেশী প্রভাবশালী থাক্‌তে পারে না। বার-চোদ্দ মাস হ'তে না হ'তেই নয়া-নয়া দল খাড়া করার দরকার হয়। আর তাতে প্রত্যেকের পক্ষে পাততাড়ি গুটিয়ে জীবন সুরু করা জরুরি হ'য়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে কিছু বল্‌ছি না। রাজনীতির দস্তুরই তাই। এতেই দেশের উন্নতি। তবে সে-জীবনটা সকলের পক্ষে বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। যারা লেখাপড়ায় মেজাজ খেলাতে চায়, তাদের পক্ষে রাষ্ট্রিক দল গড়ার কাজে ঢুঁ মার্‌তে যাওয়া অনুচিত। অধিকন্তু এ সব কাজে নোংরামি আর জঞ্জাল ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌তে হয় বিস্তর। তারজন্য হাড়-মাস চাই অন্য রকমের।

("সমাজ-বিজ্ঞানে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সার্বজনিকের উল্টা পথে", ২রা নবেম্বর, ১৯৪২, "বণিক, মজুর, রাষ্ট্রিক ও পণ্ডিত", ১১ই নবেম্বর, ১৯৪২, "সবার বিরুদ্ধে একা", ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৩১)

সেপ্টেম্বর ১৯৩২

স্বদেশ-সেবক শশীপদ

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩২

শিবদত্ত—আপনি সে দিন বরাহনগরের শশীপদ ইন্‌স্টিটিউটের সভায় (২১শে আগষ্ট ১৯৩২) বল্‌লেন যে, "বাংলা দেশে শশীপদের মত গণ্ডা-গণ্ডা বা শত-শত স্বদেশ-সেবক দেখা দিয়েছে।" কথাটা কি ঠিক?

সরকার—আলবৎ। ঐ প্রতিষ্ঠানের মতন শিক্ষাকেন্দ্র বাংলা দেশের নানা ঘাঁটিতে তৈরী হ'য়েছে। হ'য়েছে ব'লেই আজ বাংলা দেশ এগিয়েছে। দেখ্‌তে পাচ্ছে না বাংলা দেশটা উঁচিয়ে যাচ্ছে।

("সেবাব্রত শশীপদ", ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২)

শিবদত্ত—বাংলা দেশটা উঁচিয়ে যাচ্ছে একথা অনেকেই বিশ্বাস কর্‌তে নারাজ।

সরকার—কী কর্‌বো? যাঁরা রাজী হবেন না, তাঁরা তাঁদের মত পোষণ কর্‌তে অধিকারী। কিন্তু আমি আহাম্মুক। আমার মতে বাংলা দেশের উন্নতি হ'চ্ছে।

শিবদত্ত—কী-কী লক্ষণ দেখ্‌ছেন?

সরকার—১৯০৫ সনে যখন আমরা স্বদেশ-সেবায় প্রথম নামি, তখন বাংলা দেশে ক'টা নৈশ বিদ্যালয় ছিল? ক'টা ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল? এখন তার চেয়ে ঢের বেড়েছে। কত বেড়েছে জান? প্রায় তিন গুণ। চালাকি? এই যে বৃদ্ধি হ'ল, সেটা কিসের জোরে?

শিবদত্ত—বলুন না?

সরকার—এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে যে, শশীপদ যেমন বরাহনগরে তাঁর বিদ্যালয়ের জন্য আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন, তেমনি বাংলার অন্যান্য জেলায় ও শহরে-পল্লীতে গত ২৫/৩০ বছরর মধ্যে অনেক শশীপদ কাজে নেমেছেন। এই জন্যই বাংলা দেশের এতটা উন্নতি সম্ভব হ'য়েছে। অবশ্য উন্নতির মাত্রা আজও খুব বেশী নয়। সে-কথা আলাদা। কিন্তু উন্নতি বা বাড়্‌তি বটে।

শিবদত্ত—বাংলায় শিক্ষার উন্নতির পেছনে আর কোনো শক্তি আছে?

সরকার—একটার কথা বলি। তাও অনেকে স্বীকার করে না। যাই হ'ক্‌, সরকারী ব্যবস্থায় হোমিওপ্যাথিক ডোজে স্বরাজ পেয়েছে অনেক লোক। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড এই সব প্রতিষ্ঠান আমাদের আংশিক স্বরাজ প্রাপ্তির নিদর্শন। সোজা কথা, এই সব নিম-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো কিছু-কিছু দেশীয় লোকের হাতে এসেছে। এইজন্য লেখাপড়া শেখার আগ্রহ বেশ-কিছু বেড়ে চ'লেছে। ইস্কুল-পাঠশালার সংখ্যা বাড়্‌বার অন্যতম কারণ এই দিকে ঢুঁড়্‌তে হবে। জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন-বোর্ডগুলার সভ্য-সংখ্যা বাড়্‌ছে। তার সঙ্গে-সঙ্গে ইস্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের দলও পুরু হচ্ছে।

শিবদত্ত—আপনি এই সব উন্নতি দেখে খুসী আছেন?

সরকার—বাড়্‌তি মাত্রই সুখের জিনিষ। সুখী না হবার কী আছে? কিন্তু আমরা এ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে যা-কিছু উন্নতি করেছি তা ইয়ো-রামেরিকার মাপকাঠি দিয়ে বিবেচনা ক'র্‌তে গেলে নিতান্ত ছেলেমানুষি বিবেচিত হবে। কোনো ইংরেজ, জার্মাণ, মার্কিণকে

আমাদের ইস্কুল-কলেজ-লাইব্রেরী প্রভৃতি দেখাতে আন্‌লে তারা এগুলো নিতান্ত হেয় ও নগণ্য মনে ক'র্‌বে। কোনো মতে লিখ্‌তে-পড়্‌তে পারে এমন লোকের সংখ্যা গোটা দেশের শতকরা দশেরও কম যে!

মনুষ্যত্ব বনাম দারিদ্র্য

শিবদত্ত—তাহ'লে আপনি খুসী হ'চ্ছেন কিসের জোরে?

সরকার—বাঙালী জাত্‌ এ পর্যন্ত যা-কিছু ক'রেছে তাতে আত্মনিন্দা, আত্মগ্লানি বা আত্মমাননা ক'র্‌বার কিছু নেই। বাঙালী কাজকর্ম এমন কিছু নয় যাতে বাঙালীকে হেয় বা খেলো মনে ক'রতে পারি। গত ২৫।২৭ বছরের কথা ধরা যাক্‌। বিপুল দারিদ্র্যের সঙ্গে আর নানা প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে যুঝ্‌তে-যুঝতে বাঙালী এই পর্যন্ত খাড়া হ'য়েছে। এই ধরণের যুঝা-যুঝিতে অন্যান্য দেশের লোকেরা হিম-শিম খেয়ে যেতো। দুনিয়ার আর কোনো জাতই এতটা দাঁড়াতে পার্‌তো কিনা সন্দেহ। তারা হাতী-ঘোড়া নয়। তা মার্কিনই বল, জার্মাণই বল, ইংরেজই বল, জাপানীই বল। ওরা স্বাধীন দেশের লোক। কাজেই সব-কিছুর পেছনে খাটে সরকারী টাকা। আমাদের সে-সব সুযোগ অতি-কম। মনুষ্যত্বের মাপে বাঙালী বড়। ওরা আমাদের চেয়ে বড় নয়।

শিবদত্ত—বাঙালীরা ইয়োরামেরিকার মাপে সমান হবে কবে?

সরকার—মার্কিণ, জার্মাণ বা ইংরেজের আর্থিক সম্পদের সমান সম্পদ্‌ বাঙালী জাতের কোনোকালেই হবে না। এই কথাটা পরিষ্কার বুঝে রাখা দরকার। ওসব দেশের মতন বড়-বড় যন্ত্রপাতির কারখানা, ব্যাঙ্ক বা বীমা-কোম্পানী কায়েম করা বাঙালীর হাড়ে কোনো দিন সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। বার্লিন শহরে জার্মাণ ধাতু-মজুরদের আন্দোলন-বিষয়ক আপিস-বাড়ীটা কি প্রকাণ্ড! সে-বাড়ী দেখ্‌লে চোখে ছাড়া-বড়া লেগে যায়। মনে হয় যেন, কল্‌কাতায় তার মত একটা বাড়ীও নাই। এই থেকে বুঝ্‌তে পার্‌বে আর্থিক হিসাবে ওরা কত উঁচুতে, আমরা কত নীচে।

শিবদত্ত—তাহ'লে আমরা ওদের চেয়ে হীন নয় কি?

সরকার—আর্থিক হিসাবে ওদের চেয়ে হীন হ'তে পারি। কিন্তু মনুষ্যত্ব আলাদা চিজ। কর্তব্য-নিষ্ঠায়, ত্যাগের ক্ষমতায়, কর্মপটুত্বে আমরা ওদের চেয়ে কোনো অংশে হীন কি? এইটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। আর এর উত্তরে আমি বল্‌বো—"না"। ওসব দেশে চরিত্রহীন নরনারী হাজার-হাজার, কাপুরুষও হাজার-হাজার।

শিবদত্ত—টাকা-পয়সায় যারা ছোট তারা ব্যক্তিগত ও সামাজিক বা রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে ছোট থাক্‌তে বাধ্য নয় কি?

সরকার—না। দারিদ্র্যের দৌরাত্ম্যে মনুষ্যত্ব সব সময়ে চাপা পড়ে না। জাপানীতে আর ইংরেজ-জার্মাণ-মার্কিণে আর্থিক প্রভেদ বিস্তার। জানই ত? জাপানী মজুরদের যেখানে দৈনিক রোজগার ১, জার্মাণ মজুরদের রোজগার সেখানে হয়তো ৩, ইংরেজ মজুরের ৪॥০, মার্কিণ মজুরের ১৪,। কিন্তু তাই ব'লে কি মার্কিণ মজুর জার্মাণ মজুরের চার-পাঁচ গুণ বেশী করিৎকর্মা, না জার্মাণ মজুর জাপানী মজুরের তিনগুণ বেশী পটু? তা মোটেই নয়। এক একজন জাপানী মজুর কাপড়ের কলে যতখানি কাপড় বোনে

তা যে-কোনো ইয়োরামেরিকান জাতের মজুরদের চেয়ে কম নয়। কর্মক্ষমতা, মনুষ্যত্ব, চরিত্রবত্তা ইত্যাদি চিজ মজুরীর তথ্যা দিয়ে জরীপ করা সম্ভব নয়। জাপানী মজুরের আয় দৈনিক ১৲ হ'লে ভারতীয় মজুরের আয় দৈনিক দশ-বারো আনা। ভারতীয় ও জাপানী মজুরের আয় খুব কাছা-কাছি। ইতালিয়ান মজুরের আয় জাপানী মজুরের কিছু-বেশী। এই সব আপেক্ষিক আয় সম্বন্ধে খবর রাখা মন্দ নয়।

দারিদ্র্য-দোষ কি গুণ-রাশিনাশী?

শিবদত্ত—এই সব আয়ের কথা পাড়ছেন কেন?

সরকার—দারিদ্র্য বনাম মনুষ্যত্ব-বিষয়ক প্রশ্নের জবাবই এইখানে। জাপানী মজুরের আয় ভারতীয় বা বাঙালী মজুরের চেয়ে অতি মাত্রায় বেশী নয়। বাঙালীরা ভাত খায়, ডাল খায়, তার সঙ্গে পয়সা থাক্‌লে দুধ-মাছও খায়। গমের রুটী-খেকো বাঙালীর সংখ্যা অল্প। কিন্তু পয়সা-ওয়ালা জাপানীরাও খায় তিন বেলাই ভাত। তেল বা ঘী-দুধের নামমাত্র নেই। কাঁচা মাছ খাওয়া তাদের বেওয়াজ। জাপানের ঘর-বাড়ী, শহর-পল্লীর মধ্যে এমন কিছু দেখ্‌তে পাওয়া যাবে না যাতে "লাগিবে নয়নে ধাঁধা"। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাপান "ফার্ষ্ট্ ক্লাস পাওয়ার," পয়লা দর্জার রাষ্ট্রশক্তি। মার্কিণ, রুশ প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর শক্তিগুলা জাপানের ভয়ে কাঁপে। এমন কী লীগ্ অব্ নেশন্‌স্‌কেও জাপানীরা থোড়াই "কেয়ার" করে। কলা দেখিয়ে চলে। জাপানীরা গরীব হ'তে পারে, ইংরেজ-মার্কিন-জার্মাণ মাপে। কিন্তু তা ব'লে তারা এদের মাপে খেলো নয়। জাপানীরাও নিজেকে কখনো খেলো বিবেচনা করে না। আমি বাঙালী সম্বন্ধে এই ধরণের বিচারই চালাতে অভ্যস্ত। আমার ধন-বিজ্ঞান-গবেষণার অন্যতম খুঁটা এই বিচারের ভিতর র'য়েছে।

শিবদত্ত—আপনি বাঙালী-জাতের দারিদ্র্যে ভয়ের কোনো কারণ দেখেন না?

সরকার—দারিদ্র্য কোনো মতেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ ত সোজা কথা। কিন্তু আমার বিবেচনায়—"দারিদ্র্য-দোষ গুণরাশিনাশী" নয়। দারিদ্র্য থাকা সত্ত্বেও বড়-বড় কাজ ফাঁদা সম্ভব। আমরা গরীব হ'তে পারি, কিন্তু তার জন্য আমাদের সঙ্কুচিত হবার কোনো কারণ নাই। মানুষ হিসাবে দুনিয়ার কোনো জাত্ বাঙালীর চেয়ে বড় নয়। ওদের টাকা পয়সা আছে আর পল্টন আছে। আমাদের এইব নাই, এই যা। এতে মানুষ হিসাবে ওরা আমাদের চেয়ে বড় প্রমাণিত হয় না। ওরা স্বার্থ-ত্যাগের অবতার নয়,—অতিমাত্রায় পুণ্যাত্মা নয়। যখন-তখন প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত নয়। এসব দিকে আমাদের অনেক সদ্‌গুণ আছে।

শিবদত্ত—ব্যক্তিগত জীবনে পয়সাওয়ালারা মানুষ হিসাবে গরীবদের চেয়ে বড় নয় কি?

সরকার—মিথ্যা কথা। খাওয়া-পরা, বাড়ী-ঘর ইত্যাদির মাপে বড় নিশ্চয়। কিন্তু গরীব লোকের মনুষ্যত্ব, চরিত্রবত্তা ইত্যাদি শক্তি দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে। অপর দিকে পয়সায় যারা বড় তাদের অনেকের এইসব গুণ নাই। সেই কথাই জাতি সম্বন্ধেও খাটে। ইংরেজ, জার্মাণ, মার্কিণ, জাপানী প্রভৃতির মতন ঐশ্বর্য্য বাঙালীর নাই। কিন্তু ইংরেজ, জার্মাণ, মার্কিণ, জাপানীর মতন কর্তব্যনিষ্ঠ ও স্বদেশনিষ্ঠ হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই

সম্ভব। সত্যি কথা, স্বদেশ-সেবায় আর স্বার্থত্যাগে ওসব মিঞাদের কেউই বাঙালীর বাচ্চাকে হারাতে পারে না। অটোমোবিলের সঙ্গে পায়দলের যে প্রভেদ, মার্কিণের সঙ্গে জার্মানের সেই প্রভেদ, জার্মানের সঙ্গে জাপানীরও সেই প্রভেদ। আমাদেব অটোমোবিল চড়্‌বার ক্ষমতা নেই, সুতরাং আমাদের যেতে হবে চরণবাবুর জুড়িতে। কিন্তু তার জন্য আমরা যে-কোনো অটোমোবিলওয়ালা জাতের চেয়ে হীন তা নয়। অথবা তারজন্য যে আমরা বিশ্বশক্তির অন্যতম উল্লেখযোগ্য শক্তি নই তাই বা কে বল্‌লে? দুনিয়ার আসল শক্তি মনুষ্যত্ব। এই বস্তু পয়সা দিয়ে, বাড়ী-ঘর দিয়ে, জমিদারি দিয়ে, ব্যাঙ্কের আমানত দিয়ে কেনা যায় না। বাঙালী গরীব হ'য়েও দিগ্‌বিজয়ী।

(''ভারতের স্বদেশী-মার্কা অর্থশাস্ত্র'', ১০ই জানুয়ারি ১৯৪৪, 'দারিদ্র্য সত্ত্বেও বাঙালীর বাড়্‌তি'')

অক্টোবর ১৯৩২

যন্ত্রপাতি ও সমাজ-সেবার বিদ্যাপীঠ

১০ই অক্টোবর ১৯৩২

শিবদত্ত—আপনি কি মনে করেন আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি ঠিক পথে চল্‌ছে?

সরকার—অনেকটা ঠিক পথেই বটে। তবে ম্যাট্রিক পাশ করা, তারপর আই-এ, আই-এস-সি, তারপর বি-এ, বি-এস-সি, এবং বি-এ, বি-এস্‌-সির পর এম্‌-এ, এম্‌-এস সি পাশ করা রেওয়াজ হ'য়েছে। এই রেওযাজ ভাঙা উচিত। এ যেন অনেকটা গড্ডলিকা প্রবাহের মত দাঁড়িয়ে গেছে। ছেলে মেয়েরা বি-এ, এম্‌-এ পাশ করুক তাতে ক্ষতি নেই। বরং বাংলা দেশের লোকসংখ্যার তুলনায় এই সবের সংখ্যা আরও বাড়া উচিত। কিন্তু আমার বক্তব্য এই যে, শিক্ষার ব্যবস্থায় আরও বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য আনা আবশ্যক। যান্ত্রিক এঞ্জিনিয়ারী, রাসায়নিক এঞ্জিনিয়ারী, বৈদ্যুতিক এঞ্জিনিয়ারী ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা প্রকার টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার সুযোগ আরও বাড়ানো চাই।

শিবদত্ত—শিল্প-শিক্ষার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় বাঙ্‌লায় নাই কি?

সরকার—এই সকল দিকে যাদবপুরের টেক্‌নিক্যাল কলেজটা বাঙালী জাতের ''সবেধন নীলমণি''। এই ধরণের কলেজ আরও কায়েম করা উচিত। যাদবপুরের কলেজে পাশ করা কোনো ছেলে ব'সে আছে ব'লে আমার জানা নেই। তার মানে আবার এই নয় যে, কোনো একটা টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা শিখ্‌লেই আপনা-আপনি চাক্‌রি জুটে যাবে।

শিবদত্ত—তা'হলে আপনি নতুন-নতুন টেক্‌নিক্যাল ইস্কুল চাচ্ছেন কেন?

সরকার—বাংলা দেশে চাই নয়া-নয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমঝদার লোক হাজার-হাজার। নতুন-নতুন মগজ আর নতুন-নতুন অভিজ্ঞতা বাঙালী সমাজে গজিয়ে উঠুক। যাদবপুর কলেজের মতন অন্ততঃ আরও চারটা কলেজ বাংলার পূর্বে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে খাড়া হ'লে বাঙালী জাতের ইজ্জদ্‌ রক্ষা হয়।

শিবদত্ত—শুধু যন্ত্রপাতি-বিষয়ক বিদ্যাপীঠ হ'লেই চল্‌বে কি?

সরকার—তাছাড়া ঐ ধরণের ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্বাণিজ্যের কলেজও কয়েকটা চাই যুবক বাঙলার জন্য। কৃষি-বিদ্যালয়ের আবহাওয়ায়ও নয়া-নয়া মগজ তৈরি হ'তে পারে।

শিবদত্ত—শিক্ষা-সম্বন্ধে আর কিছু ব'ল্‌বেন?

সরকার—অধিকন্তু মেয়েদের জন্য চাই সমাজ-সেবা শেখবার ইস্কুল-কলেজ। সমাজ-সেবার বিদ্যায় পাশ ক'রে মেয়েরা নানা কর্মক্ষেত্রে টাকা রোজগার করতে পারবে। তার ভিতর ধাত্রী-বিদ্যাটা পড়ে। সার্বজনিক স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রচার-বিদ্যাও আছে। ইত্যাদি। এই ধরণের মেয়েদের ইস্কুল-কলেজ এখনো দেখ্‌তে পাচ্ছি না। আন্দোলন চাই। আসল কথা এক-তরফা ম্যাট্রিক, এম-এ, এম-এস-সি লাইনে চল্‌লে যুবক বাঙলার ছেলে-মেয়েরা সংসারে বেশী-কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। চাই নয়া-নয়া ধরণের বিদ্যাপীঠ।

শিবদত্ত—সেকালে আপনি "শিক্ষাবিজ্ঞান"-বিষয়ক নানা বই লিখেছিলেন। এই ক্ষেত্রে বাঙলা দেশে আর কার-কার রচনা আছে?

সরকার—কেন? তুমি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাম শোনো নি? অথবা তাঁর গ্রন্থাবলী পড়োনি? "এডুকেশন গেজেট" সাপ্তাহিকটা ছিল নামে ইংরাজি কিন্তু মালে বাঙলা। এক সঙ্গে নানাদিকে তাঁর নজর পড়্‌তো।

শিবদত্ত—নানা দিক্ মানে?

সরকার—শিক্ষাপ্রচার তো ছিলই। সঙ্গে-সঙ্গে ছিল "আচার", "পরিবার", "সমাজ" ইত্যাদি সব কিছুরই আলোচনা। প্রত্যেক বিষয়ে আলাদা-আলাদা বই লিখেছিলেন। তাঁর "সামাজিক প্রবন্ধ" আজও সকলের পড়া উচিত। বেশি-কিছু গোঁড়া হিন্দুয়ানি সন্দেহ নাই। তবুও তার ভেতর একালের "স্বদেশী আন্দোলন", "জাতীয় শিক্ষা", "রাষ্ট্রিক স্বরাজ" ইত্যাদি সব-কিছুরই ছোঁআচ বা সূত্রপাত তাতে ছিল। ভূদেব "দশাননী" দৃষ্টিভঙ্গীওয়ালা দার্শনিক।

শিবদত্ত—আর কারু নাম কর্‌তে পারেন?

সরকার—রবীন্দ্রনাথও শিক্ষা-বিজ্ঞানের প্রতিনিধি। "শিক্ষার হের ফের" প্রবন্ধ বোধ হয় বেরোয় ১৮৯৩ সনে। তারপর থেকে তাঁকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে কলম চালাতে অথবা গলাবাজি কর্‌তে হ'য়েছে অনেক। "শিক্ষা" বইয়ের (১৯০৮) প্রবন্ধগুলা প'ড়ে দেখো। তারপর নাম কর্‌বো গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর ইংরেজি "এ ফিউ থট্‌স্ অন এডুকেশন" (১৯০৪) আছে। আর আছে "শিক্ষা" (১৯০৭)। অধিকন্তু "জ্ঞান ও কর্ম" (১৯১০) "সামাজিক প্রবন্ধ" বইয়ের পরবর্তী ধাপ।

জানুয়ারি ১৯৩৩

প্রতিনিধি-পুরুষ রবীন্দ্রনাথ

১৫ই জানুয়ারি ১৯৩৩

শিবদত্ত—"প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রিকার জন্য "গান্ধি বনাম সরকার" বিষয়ক অর্থনৈতিক প্রবন্ধসমূহ লিখ্‌বার সময় (১৯২৯-৪১) আপনার "বর্তমান জগৎ"-গ্রন্থাবলী খুব বেশী ঘাঁট্‌তে হ'য়েছিল। তখনও দেখ্‌ছি আর আজকাল "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" (১৯২৭)

ইত্যাদি রচনাবলী ঘাঁট্‌তে-ঘাঁটতে বুঝ্‌ছি যে, আপনার বইগুলার ভেতর বাঙালী জাতের স্বদেশী যুগ থেকে একাল পর্যন্ত সবেরই ছাপ আছে। এই সকল লেখা পড়্‌লে বাঙ্‌লা দেশের সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলা ও তার ইতিহাস পরিষ্কার ভাবে ধর্‌তে পারা যায়।

সরকার—কেন? এরূপ ভাব্‌বার কারণ কী?

শিবদত্ত—বাঙালীদের কাছে কতকগুলা প্রশ্ন এসেছে, প্রায় সবই যেন এই পাতাসমূহের ভেতর ধরা প'ড়েছে। আর তার জবাবও যেন বেশ-কিছু পাওয়া যায়। অন্ততঃপক্ষে এই সকল আন্দোলন নিয়ে বাঙালী-সমাজে যতরকম তর্কাতর্কি চল্‌ছে, তার ছবি পেতে পারি। ঠিক যেন যুবক বাঙ্‌লার আত্মিক ইতিহাস।

সরকার—এই বিষয়ে সব-চেয়ে বেশী মাল পাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যে।

শিবদত্ত—রবিবাবুর রচনাবলী ত প্রধানতঃ কাব্য। তার ভেতর বঙ্গ-সমাজের সমস্যা বেশী পেতে পারি কি?

সরকার—তোমরা আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের মুড়োর ভেতর ঢুক্‌তে পারোনি দেখ্‌ছি! রাবীন্দ্রিক মগজটা হ'চ্ছে খাঁটি তার্কিকের মগজ। চব্বিশ ঘণ্টা প্রশ্নাপ্রশ্নি আর তর্কাতর্কিতে ভরা এই মুড়ো। গানকে গান, কবিতাকে কবিতা, নাটককে নাটক—রবীন্দ্র-কাব্যের প্রত্যেক কণায় একটা ক'রে জিজ্ঞাসা আছে। যেখানে জিজ্ঞাসা নাই, সেখানে জবাব আছে। সমস্যাহীন রবীন্দ্র-সাহিত্য হ'তেই পারে না। সোনার পাথরের বাটি যেমন অসম্ভব চিজ্‌। কোনো-কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়া হ'চ্ছে না—কম্‌-সে-কম্‌ প্রশ্নের বিশ্লেষণ হ'চ্ছে না,—অথচ রবির হাতে কলম এসে দাঁড়ালো,—এমন অবস্থা কল্পনা করা অসম্ভব।

শিবদত্ত—এও আপনার আর একটা বে-পরোআ মত। নতুন-কিছু বটে। আপনি রবিবাবুর কাব্যগ্রন্থের ভেতর এত সব সমস্যার প্রভাব আর তার সমাধান দেখ্‌তে পান?

সরকার—নিশ্চয়। তার ওপর-বিপুল গদ্য-সাহিত্যে তো আছেই। তার ব্যবসাই হ'ল সমস্যার বিশ্লেষণ আর সমস্যার সমাধান।

শিবদত্ত—আপনি রবিবাবুর বক্তৃতা ও প্রবন্ধগুলার কথা বল্‌ছেন?

সরকার—শুধু প্রবন্ধ-সাহিত্য নয়, ভায়া। গল্পগুলা আর উপন্যাস গুলা কী? সেই সতর-আঠার বছর বয়স থেকে আজ পর্যন্ত রবির কলমের আগায় যা-কিছু বেরিয়েছে সবই বাঙালীর আত্মিক জীবনের ছবি। বিগত পঞ্চাশ-ষাট্‌ বছরের বঙ্গ-সংস্কৃতি হাতে-হাতে পাক্‌ড়াও কর্‌তে চাও? তা'লে রবীন্দ্র-গদ্যে আর রবীন্দ্র-কাব্যে ডুব মারো। বাঙ্‌লার নরনারীর উপর—ডাইন বাঁয়ে, আর পেছনে,—যত ঝড় ব'য়ে গেছে, তার সব-কিছুই রবীন্দ্র-মগজে আর রবীন্দ্র-হৃদয়ে আন্দোলন তুলেছে। ফরাসী ভিক্তর হুগোর মগজ ছিল খানিকটা এইরূপ। হুগোর পূর্ববর্তী যুগে সাহিত্যবীর গ্যেটে ছিলেন জার্মানীজাতের ঠিক এইরূপ প্রতিনিধি-পুরুষ ("রেপ্রেজেন্‌টেটিভ ম্যান")। বোধ হয় প্রতিনিধি-পুরুষ হিসাবে রবি,—হুগো আর গ্যেটের চেয়েও বড়।

শিবদত্ত—রবীন্দ্রনাথকে বাঙালী জাতের এত বড় "রেপ্রেজেন্টেটিভ-ম্যান" (প্রতিনিধি-পুরুষ) আর কেহ ভাবে কিনা সন্দেহ। এ ভাবে আমরা রবিবাবুকে দেখ্‌তে অভ্যস্ত নই। এই হ'চ্ছে রবীন্দ্রনাথের এক নতুন মূর্তি।

সরকার—এই হিসাবে সেকালের বঙ্কিম আর একালের শরৎ কেহই রবির কাছে দাঁড়াতে পার্‌বে না।

শিবদত্ত—ভেবে দেখ্‌বার কথা।

সরকার—অধিকন্তু আছে আর এক মূর্তি। সে হ'চ্ছে চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ। রাবীন্দ্রিক ছবিগুলায় বাঙালী-জাতের একটা নয়া দুনিয়া বেরিয়ে প'ড়েছে। মিউনিকের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখ্‌লাম ছবি আঁক্‌তে (১৯৩১)। সেই মূর্তিকে তাঁকে দেখ্‌বা মাত্র আমার তাক্ লেগে গিয়েছিল। লোকটা ঠিক পাগলের মতন—প্রথম প্রেমে-পড়া লোকের মতন—দিশেহারা হ'য়ে তুলী টান্‌ছে। মনে হ'লো আবার নয়া বাঙ্‌লার গোড়াপত্তন।

ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

বিবেকানন্দ'র "কলম্বো হ'তে আলমোড়া"

২৪ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

শিবদত্ত—ইতালি, আমেরিকা, জাপান, ভারত ইত্যাদি দেশের তুলনাগুলা শুন্‌তে-শুন্‌তে আমার বিবেকানন্দ-সাহিত্য মনে পড়্‌ছে।

সরকাব—হঠাৎ কী ক'রে?

শিবদত্ত—বিবেকানন্দ'র প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে তুলনায় আর আপনার প্রাচ্যে-পাশ্চাত্যে তুলনায় প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

সরকার—তুমি ত বিবেকানন্দ গুলে খেয়েছো। এই ধরণের বিবেকানন্দ গুলে-খাওয়া ছোক্‌রা আজকাল কম আছে। আমি ঐ ধরণের ছোক্‌রাদের আবহাওয়া খুব পছন্দ করি। বলো কিছু বিবেকানন্দ-কথা শুনে যাই। দেখি তোমার মতি-গতি কোন্ দিকে। আমার বিশ্বাস বিবেকানন্দকে দু-এক কথায় চুম্‌ড়ে নেওয়া সোজা নয়। যার যেমন মর্জি, সে বিবেকানন্দ'র বাণী সেই বকম বুঝে। কাজেই বুঝবার ভেতর ভুলচুক থেকে যায়।

শিবদত্ত—বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে ফিরে এসে যে-সব বক্তৃতা দিয়ে ছিলেন (১৮৯৭-৯৮) সে-সব "লেক্‌চার্স ফ্রম কলম্বো টু আল্‌মোড়া" (কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত) নামে পাওয়া যায়। আপনি প্রথমবার বিদেশ থেকে ফিরে এসে (১৯২৫-২৬) যে-সব কথা ব'লেছেন, তার কিছু-কিছু পাচ্ছি "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং-ইণ্ডিয়া" (যুবক-ভারতের প্রতি সম্ভাষণ) বইয়ে (১৯২৭)। আর "আর্থিক উন্নতি" ইত্যাদি পত্রিকার ভেতরও খানিকটা পাওয়া যায়। বিদেশ-ফের্তা দুই বাঙালীর বাণীতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ অনেকবার মনে হ'য়েছে। এটা কি আদর্শ মেজাজ ও লক্ষ্যের প্রভেদ? না সময়ের প্রভেদ? কাল-অনুসারে প্রভেদ তো দেখ্‌ছি মাত্র ২৮-৩০ বৎসর।

সবকার—"আকাশ-পাতাল প্রভেদ" কিনা সন্দেহ। গোড়ার কথায় বোধহয় বেশ-বড় রকমের মিল আছে। আগেই ব'লেছি,—বিবেকানন্দকে যে যেমন চায়, সে তেমন বুঝে। কেজো লোকেরা বিবেকানন্দ'র বুলির মধ্যে এক মাল পায়। দর্শনের প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আর এক মাল পায়। সমাজ-সংস্কারকেরা এক জিনিষ দেখে। রকমারি দুনিয়া। হয়ত সবই ঠিক। সরকারী চাক্‌রেরা বিবেকানন্দ-সাহিত্যের সমজদারি করে এক চোখে। যারা সরকারী চাক্‌রে নয়, তাদের চোখে বিবেকানন্দ-সাহিত্য বিলকুল আলাদা চিজ্।

শিবদত্ত—কিন্তু তবুও দুটা-একটা কথা সহজেই ধরা যায়। বিবেকানন্দ'র বাণীর ভেতর যেখানে-সেখানে যোগ, ধ্যান, ধর্ম, বেদান্ত ইত্যাদি খুব জোরের সহিত প্রচারিত।

কিন্তু এসব সম্বন্ধে আপনি কিছু বলেন না দেখ্‌তে পাই।

সরকার—ভাই, সে সম্বন্ধে বল্‌বার অধিকারী নই। যা বুঝি না, তা বকি না। কিন্তু দেশটাকে ঠেলে তুল্‌বার জন্য বিবেকানন্দ'র বক্‌াবকির ভেতর অনেক-কিছু পাওয়া যায়। সেই বকাবকিগুলার "আসল ভেতরে" একবার ঢুকে পড়ো। দেখ্‌বে যে, স্বদেশ-সেবক-বিবেকানন্দ'র বুখ্‌নিতে আর এই মামুলি অধমের তুচ্ছ বোলচালে প্রাণের যোগ আছে অসীম। সে-যোগটা অবশ্য সংস্কৃতে লেখা যোগশাস্ত্রের যোগ নয়। সে হ'চ্ছে জবর আত্মিক যোগ। আগেই ব'লেছি, মানুষের চোখগুলা রকমারি। তোমার চোখে বা আর কারু চোখে বিবেকানন্দ যা, আমার চোখে হয়ত বা তা নয়। কী করা যাবে? মজার কথা, এই বছর পঁচিশেক ধ'রে বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে আমার চোখটা একই র'য়ে গেছে। কিছু বদ্‌লালো না। পাপিষ্ঠ আমি।

শিবদত্ত—বিবেকানন্দ'র সপ্ততিতম জন্মোৎসব সভায়* (৩১ শে জানুয়ারি ১৯৩২) সভাপতি হিসাবে আপনি ইংরেজিতে যে-সব কথা ব'লেছেন, তাতে শ্রোতারা বিবেকানন্দর সম্পূর্ণ নতূন মূর্তি দেখেছে। আমি উপস্থিত ছিলাম। সকলে অবাক্ হ'য়ে শুনেছে। বাজারে বিবেকানন্দ'র একটি সার্বজনিক মূর্তি প্রচলিত আছে। আপনি তার জায়গায় একদম নতুন মূর্তি খাড়া কর্‌ছেন।

সবকার—বিবেকানন্দ'র কোনো কথা মনে আছে?

শিবদত্ত—প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের প্রভেদ-সম্বন্ধে বিবেকানন্দ যা ব'লেছেন, তার সঙ্গে আপনাব মিল ঢুঁড়ে পাওয়া যায় না। আমি ত দেখ্‌ছি, ঠিক উল্টা বলাই আপনার দস্তুর।

সরকার—তবুও ঠিক উল্টা কিনা জানি না। তবে বোধ হয়, কোনো-কোনো বিষয়ে বেশ-কিছু উল্টা। আমার বক্তব্য অতি সোজা।—পূর্বেই বলো আর পশ্চিমেরই বলো, মানুষ একই ধরণের রক্তমাংসের জানোআর। পূবের মানুষ এক শ্রেণীর, আর পশ্চিমের মানুষ আর এক শ্রেণীর, এটা মোটেই সত্য নয়। কাজেই পূবের লোকেরা কতকগুলা জিনিষের বিশেষ চর্চা করুক, আর পশ্চিমের লোকেরা অন্যান্য জিনিষের চর্চা করুক— এই ধবণের পাঁতি আমি বরদাস্ত করতে পারি না। পূর্বে-পশ্চিমে কেনা-বেচা চল্‌বে। দুই-বিভিন্ন রকমের জিনিষ নিয়ে—এই ধরণের চিন্তা বিলকুল গাঁজাখুরি। আমার কথায় এই দাঁড়ায় যে, সব দেশগুলা একই পথে চ'লেছে, কেবল কতকগুলা দেশ কয়েক বছর এগিয়ে র'য়েছে, আর কতকগুলা কয়েক বছর পেছিয়ে র'য়েছে। এই সম্পর্কে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার। আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগ-বিষয়ে যা কি কিছু ব'লেছি, তাতে হিন্দুত্ব বা হিন্দুসভ্যতা-সম্বন্ধে আমার মতামত বদ্‌লাবার দরকার হয় না। বারবরই আমি হিন্দুত্বেরও হিন্দু-সংস্কৃতির গৌরব-প্রচারক। "পজিটিভ্ ব্যাক্‌গ্রাউন্ড" বইটা (১৯১৪, ১৯২১, ১৯২৬) বোধ হয় জানো। তার ভেতর হিন্দু-সংস্কৃতির বস্তুনিষ্ঠা ও বিজ্ঞান-নিষ্ঠা জোরের সহিত বাৎলানো আছে।

*এই ইংরেজি বক্তৃতার সারমর্ম যথাসময়ে "প্রবুদ্ধ ভারত" নামক ইংরেজি মাসিকে আর বাঙলা সারমর্ম "উদ্বোধন" মাসিকে বাহির হইয়াছিল। বিনয় সরকারের "নয়া বাঙলার গোড়াপত্তন" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড (১৯২৩), ৩৩৭—৩৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। তাঁহার "বিবেকানন্দ দু'-মুখো ছুরি" নামক বক্তৃতা "বাড়তির পথে বাঙালী" গ্রন্থে (১৯৩৪) পাওয়া যায়।

যুবক-এশিয়ার ভবিষ্য-নিষ্ঠা

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩

শিবদত্ত—আচ্ছা, ইয়োরামেরিকায় ত বড়-বড় পণ্ডিতের অভাব নেই। অথচ তাঁরা এই কথাটা ধর্‌তে পারেন নি কেন?

সরকার—আমেরিকায় নিউইয়র্কের দার্শনিক জন ডুয়ী অবিকল এই প্রশ্নই তুলেছিলেন সে ১৯১৭ সনের কথা। তাঁর বাড়ীতে আমাকে নৈশভোজনে ডেকেছিলেন। সেই উপলক্ষে পঁচিশ-ত্রিশ জনের পাত প'ড়েছিল। খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ও পরে তক্কাতক্কি চ'লেছিল বিস্তর। তিনি বলেন,—"তুমি যে-কথা ব'ল্‌ছো সে-সব অ, আ, ক, খ'র মত অতি সোজা মনে হ'চ্ছে। অথচ আশ্চর্য এই যে, এই কথাটা এতদিন আমাদের মাথায় ঢোকেনি। এটা কী ক'বে সম্ভব হ'ল?"

শিবদত্ত—আপনি কী ব'লেছিলেন?

সরকার—প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই "ফিউচারিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া"-(যুবক-এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা)-শীর্ষক প্রবন্ধ লেখা। ডুয়ীরই সুপারিশে ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট স্ট্যান্‌লি হল আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যান। এই প্রবন্ধটা ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বজনিক বক্তৃতারূপে পড়া হয়। পরে সেটা 'ইণ্টার্ন্যাশন্যাল জার্নাল অব এথিক্‌সের" সম্পাদক, অধ্যাপক টাফ্‌ট্‌সের নিকট ডুয়ী পাঠিয়ে দেন। ১৯১৮ সনে ছাপা হয়। কয়েক বছর পর একটা বড় বইয়ের নাম ক'রেছি ঐ প্রবন্ধ দিয়ে। বইটা ছাপা ও প্রকাশিত হয়েছিল। জার্মানির লাইপৎসিগ্‌ শহরে (১৯২২)। ঐ প্রবন্ধটা এই বইয়ের প্রথম অধ্যায়। এই ফাঁকে একটা কথা ব'লে রাখি। অনেকেই হয়ত তোমরা জান না। দার্শনিক ডুয়ী আর অর্থশাস্ত্রী সেলিগ্‌ম্যান আর চিত্রশিল্পী ম্যাক্‌স্‌ ওয়েবারের সঙ্গে আমার মার্কিন-জীবন অতি-সুজড়িত।

শিবদত্ত— দেখ্‌ছি, আপনাকে ফাঁকতালে একটা খুব মহত্ত্বপূর্ণ প্রশ্ন ক'রে ব'সেছি। এই প্রশ্নটার ভেতর কোথায় ডুয়ী, স্টান্‌লি হল, এথিক্‌স্‌, আর কোথায় জার্মানির সেই বই? সবই জড়ানো র'য়েছে?

সরকার—শুধু তাই নয়। এই প্রশ্নে আর জবাবেই গাঁথা আছে এই গরীবের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ। আমার দর্শন, সমাজ-শাস্ত্র, সংস্কৃতিবিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান—যা কিছু বল সবই "যুবক-এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা"'র রসদ জুগিয়েছে।

শিবদত্ত—ঐ বইয়ের নামডাক আছে বাঙ্‌লাদেশে। কিন্তু কেহ কখনো প'ড়েছে কিনা জানি না। কল্‌কাতার কতজন লোকে প'ড়েছে কে জানে? আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ত বইটা আছে।

সরকার—অনেককে ঐ বইয়ের সমালোচনা প'ড়েছে। কেহ-কেহ আমার কাছে কোনো-কোনো দেশী-বিদেশী পত্রিকার মন্তব্য আওড়িয়েছেও।

শিবদত্ত—পাশ্চাত্য নরনারীর পক্ষে আপনার সিদ্ধান্তগুলা বুঝা সহজ কি? ওরা যে দুনিয়া বুঝ্‌তে কেবলমাত্র নিজেদেরকেই বুঝে থাকে। ইয়োরোপ আর আমেরিকা ছাড়া ওরা জগতের আর কোনো দেশের খবর রাখে কি?

সরকার—সেটা স্বাভাবিক নয়। স্বাধীন জাত্‌গুলা গোলাম জাত্‌গুলাকে নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখে,—তোদেরকে মানুষই মনে করে না। একটা কুকুরের কাছে কি আমরা লজ্জা-

সরম করি? আমরা কুকুরকে যে-চোখে দেখি, ওরা আমাদেরকে ঠিক সেই চোখে দেখে। তা ছাড়া মানুষ অতীতের কথা বড় একটা মনে রাখে না। যে-লোক আজ অতি কষ্টে-সৃষ্টে দিন কাটাচ্ছে, হয়ত সে ক্রমে বিদ্বান্ ও বড়লোক হ'ল। তখন কি আর তার আগেকার দুর্দাশার কথা মনে থাক্‌বে? ধরো, ম্যাট্রিক বা আই-এ পাশকরা ছেলে এর কাছ থেকে ওর কাছ থেকে দু-চার পয়সা যোগাড় ক'রে বিলাত, আমেরিকা মেরে পাশ ক'রে চ'লে এলো। মনে কর, তখন কোনো ম্যাট্রিক বা আই-এ পাশকরা ছেলে বিদেশে যেতে ইচ্ছুক হ'য়ে তার কাছে গেল। সে কি আর তার সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে কথা বল্‌বে? সে তখন বল্‌বে,—"ম্যাট্রিক, আই-এ দিয়ে চল্‌বে না। আরও কিছু পড়াশুনা চাই। তারপর সাগর-পাড়ি।" ভুলে যায় যে, সে নিজে ম্যাট্রিক বা আই-এ পাশ ক'রে বিদেশে গিয়েছিল। অবশ্য মেজাজ সকলকারই বিগড়ে যায় না, অথবা সমানভাবে বিগ্‌ড়ে যায় না। ছেলেবেলার দারিদ্র্য মনে রেখে সংসারে চলাফেরা কর্‌তে বেশী লোক ঝুঁক্‌বে কি? মানুষ জানোআরটা বড় দাম্ভিক।

শিবদত্ত—আপনি কি বল্‌তে চান যে, ব্যক্তির মত জাতিগুলাও অতিমাত্রায় অহঙ্কারী? পুরাতন দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্গতি সব-কিছু ভুলে যায়?

সরকার ঠিক তাই। অগ্রসর দেশগুলা তাদের অতীত ভুলে গিয়েছে। ব্যক্তিগত চিত্ত আর জাতিগত চিত্ত একই ধরণের।

শিবদত্ত—কিছু খুলে বলুন, বিস্তৃতভাবে। কথাটা পরিষ্কার হ'চ্ছে না।

সরকার—বিলাতে এক সময়ে চর্খা চল্‌তো। কিন্তু যেই ষ্টীম-এঞ্জিন বেরুলো, তখনই সে যে কোনো দিন চর্খা ঘুরাতো, তাও ভুলে গেল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি জার্মানি বিলাতের তুলনায় মহা পেছনে প'ড়েছিল। কিন্তু সেই জার্মানি ১৮৭০ সনের পর থেকে বিলাতের সঙ্গে সমান-সমান বুক ফুলিয়ে চল্‌তে সুরু ক'রেছে। ১৯০৫ সনের পর জার্মানরা ইংরেজদের আগাগোড়া জুড়িদার। জার্মানরা কি আর ভাব্‌তে পারে যে, ওরা কস্মিন্‌কালে ইংরেজদের নীচে ছিল? দুনিয়া অতীতে দেখে না, মানুষ কট্টর বর্তমান-নিষ্ঠ।

শিবদত্ত—ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে কি?

সরকার—নিশ্চয়, ধরো বাঙালী জাত্‌টা। এই জাত্ চিরকালই ছোটদের জাত, এরা কখনো বিদেশ-জয় করেনি। কেবল পালদের আমলে বিদেশ-জয়ের কথা শোনা যায়। কিন্তু তার মধ্যে সত্যি কতটা, তার পাকাপাকি মীমাংসা হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। অপর দিকে, রাজেন্দ্র চোল বাঙলা জয় ক'রেছে। মরাঠারা জয় ক'রেছে, মুসলমান-ইংরেজের ত কথাই নাই। অধিকন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বাঙালীর ইজ্জদ্ বড় বেশী নয়। পাণিনি, চরক, আর্যভট্ট, কালিদাস ইত্যাদির দরের লোক বাঙ্‌লাদেশে পয়দা হয়নি। কিন্তু এই বাঙালী যেই ১৯০৫ সনের বিপ্লব সুরু কর্‌লো অমনি তারা ভারতের নেতা হ'য়ে পড়্‌লো। আজ গোটা দুনিয়ার বাঙালী জাত্ একটা-কিছু বটে। বাঙালীর বাচ্চা ১৯০৫ সনের আগে কি অবস্থায় ছিল, বাঙালীদেরও আর মনে নেই। বাঙালী জাত্ আজ বিশ্বশক্তির অন্যতম শক্তি। তবে এখনো মহাশক্তি নয়। শক্তিযোগের আখ্‌ড়ায় বাঙালীরা তে-রে-কা-টা সাধ্‌ছে মাত্র। কিন্তু ১৯০৫ সনের পূর্ববর্তী অবস্থা বাঙালী ছোঁড়া-বুড়ো সকলেই ভুলে গেছে।

শিবদত্ত—আপনি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধ'রে এই যে নানারকমের নতুন-নতুন কথা বলছেন, এই সবের ফলাফল কেমন দেখ্‌ছেন আমাদের দেশে?

সরকার---কপালের জোর, ভাই। পত্রিকাগুলার ভেতর নিন্দা কেহ ক'রেছে ব'লে জানি না। কি এদেশে, কি বিলেতে, কি ফ্রান্সে, ইতালিতে, জার্মানিতে, কি আমেরিকায়, কি জাপানে। কিন্তু এই অধমের কথাগুলা বেআড়া রকমের। আমার লেখা-লেখির সমালোচনা ও তার মূল্য-যাচাইয়ের সময় আস্‌বে আরও বিশ-পঁচিশ বছর পর। দেশে-বিদেশে নতুন নতুন ঢঙের মগজওয়ালা লোক দেখা দিচ্ছে। আরও যাবে। সেই নয়া আবহাওয়ায় এই সব কিম্ভূত-কিমাকার আর বে-পরোআ মতামতের আসল যাচাই হ'তে পার্‌বে। ১৯৫৫-৬০ এর ভেতর কিছু-কিছু বুঝা যাবে।

শিবদত্ত---নতুন ঢঙের মগজওয়ালা লোকের কথা বলছেন কেন?

সরকার---ইয়োরামেরিকার নরনারী, মায় পণ্ডিতেরা আর রাষ্ট্রিকেরাও আস্তে আস্তে বেশ বুঝ্‌ছে যে, এশিয়ার লোকগুলা যন্ত্রপাতির কাজে আর বেশীদিন পেছপাও থাকবে না। রাষ্ট্রিক দুনিয়ায়ও এশিয়ার নরনারী ক্রমে স্বাধীন ও স্বরাজী দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই পশ্চিমে-পূর্বে ফারাক-সম্বন্ধে যে ধরণের দর্শন, নীতি বা আদর্শ প্রচার করা হ'য়েছে, সেই ধরণের দর্শন, নীতি বা আদর্শ ইয়োরামেরিকার আসরেও কল্‌কে পাবে না।

শিবদত্ত---ভারতের নবনারীব নয়া মগজ কিরূপ হ'চ্ছে?

সরকার---বাঙ্‌লাদেশের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আজকালকার বাঙালী লিখিয়ে-পড়িয়ে পরিবারের পাঁচ ছেলের ভেতর সাড়েচার ছেলে কেরানী বা ইস্কুলমাষ্টার বা ঐ-ধরণের কিছু। আর বাকীর ভেতর কেউ বা উকিল, ডাক্তার, ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ ইত্যাদি। ছিট্‌কে বেরোয় এক আধটা এঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্কের কর্মী, বীমার দালাল বা কেনাবেচার কর্মচারী। কিন্তু ১৯৫৫-৬০ সনের আবহাওয়ায় অনেকেই হবে এঞ্জিনিয়ার বা রাসায়নিক। ডজন-ডজন বহির্বাণিজ্যের বেপারী, ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার বা বীমার ওস্তাদ দেখা যাবে। কল-কারখানা আর ফ্যাক্টারী চালাবার কাজে মোতায়েন থাক্‌বে শ'য়ে শ'য়ে বাঙালী। তখন দেশে আস্‌বে সত্যিকাব মজুর-প্রধান্য। তার সঙ্গে দেখা দেবে বাঙালী মজুর-নেতা, মজুর-রাষ্ট্রিক। একদিকে দেখা যাবে যন্ত্রনিষ্ঠা, পুঁজি-নিষ্ঠা। বিজ্ঞান-নিষ্ঠা, আবিষ্কার-নিষ্ঠা। অপরদিকে মজুরনিষ্ঠা, সমাজতন্ত্রী-নিষ্ঠা। সোশ্যালিজম্।

শিবদত্ত---সেই আবহাওয়ায আপনি বাঙালী-চিন্তায় নতুন কী-কী আশা কর্‌ছেন?

সরকার---অনেক কিছু। তখন বুঝতে হবে যে, বাঙালী জাত্‌টা আধুনিক হ'য়েছে। বাঙালী জাত্ আজই ঠিক ঐ রকম,---আমার মেজাজ মাফিক,---আধুনিক খানিকটা বটে। সেই আবহাওয়া যত বাড়্‌বে, ততই এই অধমের "যুবক-এশিয়ার ভবিষ্যনিষ্ঠা", "যুবক ভারতের প্রতি সম্ভাষণ", "আর্থিকউন্নতি" আর "নয়া বাঙ্‌লার গোড়াপত্তন" জলবৎ তরল হ'তে থাক্‌বে। এ সবের নূতনত্ব আর কিছু মালুম হবে না। তখন আর পূর্বে-পশ্চিমের তথাকথিত ফারাক্ নিয়ে লোকেরা মাতামাতি কর্‌বে না। এমন কি এই নিয়ে যে উনবিংশ-শতাব্দীতে আর বিংশ-শতাব্দীর প্রথম দিকেও এত মাতামাতি চল্‌তো, তাই তাদের কাছে বেআকুবি বিবেচিত হবে। প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের সাদৃশ্য, সাম্য আর ঐক্য প্রমাণ কর্‌তে গিয়ে যে আমাকে গালা-গালি খেতে হয়েছে, তাও তারা বুঝ্‌তে পার্‌বে না। বস্তুতঃ এই ঐক্য, সাদৃশ্য ও সাম্যের প্রথম প্রচারক কে বা কারা, তাই তাবা ধর্‌তে পার্‌বে না। এসব কথা তাদের কাছে জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সংস্কৃতি-সভ্যতার অ-আ-ক-খ বা প্রথম স্বীকার্য থাক্‌বে। এই হ'ল "ফিউচারিজম" বা ভবিষ্যনিষ্ঠার মুদ্দা বা প্রাণের কথা।

("১৯০৫ সনের পরবর্তী ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী" ১৪ই অক্টোবর ১৯৪২)।

"সার্বজনিক দাদার"যুগ

শিবদত্ত—বোধ হ'চ্ছে যেন, আপনার আসল বক্তব্যের দিকে লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে মনের মোড় কিছু-কিছু ফিরেছে। ভারতীয় নরনারীকে চরমভাবে পরকালসর্বস্ব ও অহিংসা-নিষ্ঠ এবং অতিমাত্রায় দার্শনিক, যোগী, ধর্মপ্রাণ বা আধ্যাত্মিক বিবেচনা কর্‌তে সকলেই আর লালায়িত হ'চ্ছে না। আপনার পারিভাষিক দিয়ে বল্‌তে পারি যে, ভারতীয় লেখক, গবেষক আর পণ্ডিতের মগজ ক্রমশঃ বস্তুনিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সরকার—অসম্ভব নয়। মজুরপন্থীরা আর সোশ্যালিষ্টরা এই মতের মক্কেল হ'তে বাধ্য। তা ছাড়া এঞ্জিনিয়ার, ব্যাঙ্কার, বীমাদার, আমদানি-রপ্তানির কারবারী, কারখানার পরিচালক ইত্যাদি শ্রেণীর অনেকের পক্ষেই এই ভাবধারা স্বাভাবিক মালুম হবার কথা। এই সকল পেশার লোক বেড়েই চ'লেছে। তারা অনেকেই এই অধমকে "দাদা" বলে বা বল্‌বে।

শিবদত্ত—ঠিক ব'লেছেন। কোনো-কোনো লোক আপনাকে "বিনয়-দা" বলে। অথচ তারা আপনাকে চেনে কিনা সন্দেহ।

সরকার—প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর বন্ধুরা আমাকে "বিনয়-দা" বলে। প্রথমতঃ ১৯০৫ সনের বঙ্গবিপ্লবের যুগে যারা আমার প্রায়-সমানবয়েসী ছিল, অথবা ইস্কুল-কলেজের হিসাবে দু-চার বছর ছোট ছিল। এক কথায় তাদেরকে স্বদেশী আন্দোলনের লোক, স্বদেশী আন্দোলন-ঘেঁষা বা লোক বল্‌তে পারি।

শিবদত্ত—আর কাদেরকে এই ধরণের বিবেচনা করেন?

সরকার—দ্বিতীয়তঃ, একালের অর্থাৎ ১৯১৮ সনের পরবর্তী যুগের লোকেরা। তাদের অনেকেই আমার ১৯০৫-১৪ সনের খবর রাখে না। তারা এমন কি আমার ১৯১৪-১৮ সনের লড়াইয়ের সময়কার লেখা-পড়া-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল নয়। কিন্তু লড়াইয়ের পরবর্তী বার-তের বছরের খবর রাখে। তারা বয়সে আজকাল ৩২-৩৫ বছরের বেশী নয়। অর্থাৎ আমার চেয়ে বয়সে প্রায় বছর দশেক ছোট। এরা যখন বছর বিশেকের, তখন এরা আমার লেখা-লেখির সঙ্গে যোগে আসে।

শিবদত্ত—এ সব খবর পান কোথ্‌থেকে।

সরকার— খোদ তাদের মুখ থেকে। এদের কেউ-কেউ হয়তো পুঁজি-নিষ্ঠায় মেতেছে। কম-সে-কম ছোট-বড়-মাঝারি ব্যাঙ্ক বীমায় মস্‌গুল হ'তে চায়। কারখানায়, যন্ত্রপাতিতে বা ঐ-ধরণের কিছুতে হাত খেলাতে তারা এগুচ্ছে। অন্যান্যেরা সোশ্যালিজমের গন্ধে আমাকে "দাদা" বল্‌তে সুরু ক'রেছে। ১৯১৮ সনের আগে ভারতে মজুর, মজুর-নিষ্ঠা, মজুর-নীতি, সোশ্যালিজম্, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পারিভাষিক চল্‌তো না। আমার "বর্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর ভেতর,—বিশেষতঃ ফ্রান্স ইতালি আর জার্মানি-বিষয়ক খণ্ডগুলায়,—মার্ক্‌স্, লেলিন্, সোশ্যালিজম্, কমিউনিজমের ছড়া-ছড়ি। তা ছাড়া মার্ক্‌স্-সাহিত্যের "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" আর "ধনদৌলতের রূপান্তর" বাঙ্‌লায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। স্বদেশীযুগের ভায়ারাও এই বই দুটা আজকাল ঠিক যেন মাৎসিনি-সাহিত্যেরই বইয়ের মতন গিল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে। অবশ্য আমি নিজে কখনো কোনোপ্রকার রাজনীতির গর্তে পড়ি নি। কোনো দিনই দলের লোক নই।

শিবদত্ত—"বিনয়-দা" নামের ভেতর এত ভিন্ন-ভিন্ন ভাগা-ভাগি আছে? আগে বুঝি নি।

সরকার— দেখতেই পাচ্ছ,—সেকালের মাৎসিনি-পন্থী ন্যাশন্যালিষ্টরাও আমাকে "দাদা" বলে। আবার একালের মার্ক্স্-পন্থী (বা লেনিন্-পন্থী) সোশ্যালিষ্ট (বা কমিউনিষ্ট) রাও "দাদা" বলে। বুঝতে হবে যে, বয়সে আমি কিছু পুরু হ'য়ে প'ড়েছি। নিজেকে অবশ্য নিজে এখনো চ্যাংড়াই ভাবি। বছর পঁয়তাল্লিশ এমন কীইবা বয়স? তবে এরি ভেতর দুটো যুগ পরিষ্কারভাবে দেখ্তে পাচ্ছি।—এইটেই বিশেষ আনন্দের কথা। বাঙালী-জাত বেড়ে চ'লেছে এইখানেই ঠেক্বে না। আরও বাড়্বে। সেই বাড়তিরও চিহ্নোৎ দেখা যাচ্ছে।

শিবদত্ত—যারা আপনাকে "বিনয়-দা" বলে, তারা আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনে? তাদের সঙ্গে কোনো কাজ-কর্মে আলাপ পরিচয় হ'য়েছে?

সরকার—কোনো দিন না। প্রথম আলাপেই "বিনয়-দা", সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীও "বৌদি"। এটা "সার্বজনিক দাদা"র যুগ। বাঙালীজাতের ইতিহাস যদি কখনো লেখো, তাহ'লে "সার্বজনিক দাদার যুগ" উল্লেখ কর্তে ভুলো না। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'ভারতবর্ষ''-সম্পাদক জলধর সেনের নাম শুনেছ নিশ্চয়। সাহিত্য-জগতের সার্বজনিক "জলধর-দা" এই যুগেরই অন্যতম মূর্তি! বোধ হয় যেন স্বদেশী যুগেও আমরা তাঁকে "জলধর-দা" বল্তাম। ঠিক মনে পড়ছে না। বোধ হয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অথবা সাহিত্য-পরিষদের নলিনী পণ্ডিত খবর দিতে সমর্থ। আজকাল আরও অনেক "সার্বজনিক দাদা" আছে। এইজন্যই বল্ছি "যুগ"।

নবেম্বর ১৯৩৬

সিন্ধু ও সিন্ধী*

হেমেন সেন—শুন্লাম এবার পূজার ছুটিতে আপনি সিন্ধুদেশে গিয়েছিলেন? কদিন ছিলেন, কী বৃত্তান্ত?

সরকার—হাঁ, মাত্র দিন এগার-বার ছিলাম। ৩১শে অক্টোবর থেকে ১১ই নভেম্বর (১৯৩৬) পর্যন্ত।

প্রঃ—সিন্ধুদেশের খবর, আর সিন্ধী নরনারীর কথা, বাঙালী আমরা খুব কমই জানি। ঐ সব সম্বন্ধে কিছু ব'কে জান্না।

উঃ—পূর্বে আমি কখনো সিন্ধুদেশ দেখিনি। এই প্রথম সেদেশে যাবার সুযোগ জুটেছিল—রামকৃষ্ণের পূজারী হিসেবে। বরাত্ নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু বরাতের কাজ ছাড়াও অনেক-কিছু দেখেছি-শুনেছি।

প্রঃ—রামকৃষ্ণের পূজারী কী রকম?

উঃ—করাচিতে সিন্ধুদেশের লোকেরা একটি রামকৃষ্ণ-আশ্রম খাড়া ক'রেছে। তার

* মোলাকাৎটা প্রথমে 'সুবর্ণবণিক্-সমাচার' পত্রিকায় বাহির হইয়াছিল (অগ্রহায়ণ ১৩৪৩, নবেম্বর ১৯৩৬)। হেমেন্দ্র বিজয় সেন এম-এ, বি-এল কবি ও বহুসংখ্যক দেশী-বিদেশী জীবন-বৃত্তান্তের লেখক।

তদ্বিরে রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। উৎসব চ'লেছিল প্রায় দুই সপ্তাহ ধ'রে। এই শতবার্ষিকীর অন্যতম অনুষ্ঠান ছিল ধর্মসম্মেলন।

প্রঃ—বেশ ত। এতে রামকৃষ্ণের পূজারী হ'লেন কী ক'রে আপনি?

উঃ—খেয়ে না খেয়ে করাচির উৎসবের কর্মকর্তারা এই অধমকে ধর্মসম্মেলনের অনেকগুলা সভার সভাপতি ক'রে ফেলেছিল। কাজেই রামকৃষ্ণ পূজায় মোয়েন থাক্‌বার সৌভাগ্য পাওয়া গিয়েছিল।

প্রঃ—সিন্ধুদেশে ঢুকলেন কোন্ দিক্ দিয়ে?

উঃ—পাঞ্জাব দিয়ে। লাহোর থেকে সোজা দক্ষিণে সিন্ধুনদ ভাটিয়ো করাচিমুখো হ'য়েছিলাম। দেখে মনে হ'ল যে, দক্ষিণ পাঞ্জাবটা যেন প্রায় আগাগোড়াই মরুভূমি অর্থাৎ বালুর দেশ। স্বদেশী যুগে ১৯১০।১১।১২তে আমার উত্তর পাঞ্জাব দেখা ছিল। এবার রেলে যেটুকু দক্ষিণ পাঞ্জাব দেখা হ'ল, তাতে মনে হ'ল, পাঞ্জাবের ভেতর যে এমন মরুভূমি থাক্‌তে পারে, তা কল্পনা করাও কঠিন।

প্রঃ—পাঞ্জাবেই মরুভূমি? তা'হলে সিন্ধুদেশের অবস্থা কী?

উঃ—যতই দক্ষিণে যেতে লাগ্‌লাম, ততই রেলের দুধারে দেখ্‌ছি কেবল বালুর মাঠ। বালুর পরে বালু, বালুর শেষে সুদূর গ্রামখানি আর নজরে আসছে না। সিন্ধুদেশে পড়্‌বার পর গাড়ীর ভেতর দুধার থেকে উড়ে এসে পড়তে আরম্ভ কর্‌ল কেবল বালু। দেড় ঘণ্টা—দু'ঘণ্টার ভেতর ঠিক যেন সিকি-ইঞ্চি, আধ-ইঞ্চি উঁচু বালুর স্তব প'ড়ে গেল বেঞ্চের উপর।

প্রঃ—সত্যি কথা বল্‌ছেন?

উঃ—গাড়ীর ভেতর একজন সিন্ধু-পাঞ্জাবের বকেয়া মোসাফের আমাকে বল্‌লে—"মশায় একি দেখ্‌ছেন? আস্‌তেন মে-জুন মাসে, তাহ'লে দেখ্‌তেন, এক-এক ঘণ্টায় এত বালু এসে জমে যে, এক-একটা দেশলাইর বাক্স ডুবে যায়।" খানিক দূর যাচ্ছি, এমন সময় মোসাফির সাহেব আমাকে বল্‌লে—"দাদা, জীবনে কখনো মরীচিকা দেখেছ? ঐ দেখ। দেখতে পাচ্ছ, ঐ দূরে ওখানে জলের চাদরের মত একটা-কিছু চিক্-চিক্ করছে? ঐ সব জল-টল কিছু নয়—পুকুর বা নদী ওখানে নেই—শুধু বালু ধূ ধূ করছে—এরই নাম মরীচিকা।"

প্রঃ—এ ধরণের মরুভূমি আপনি আর কোথাও দেখেছেন কি?

উঃ—বছর পঁচিশ-তিরিশেক আগে রাজপুতনায় কিঞ্চিৎ মোসাফিরি করা গিয়েছিল, কিন্তু তখন এ রকমের বালু-সমুদ্র কখনো অভিজ্ঞতায় পড়ে নি। রাজপুতনা অবশ্য সুবিস্তৃত জনপদ। এর কোনো-কোনো জায়গায় হয়ত সিন্ধুদেশেরই মত বালুর আবহাওয়া র'য়েছে। তা কিছু আমার নজরে পড়্‌বার সুযোগ ঘটে নি।

প্রঃ—সে কি! আপনি ত মিশরে গেছেন, সেখানে নিশ্চয় মরুভূমি দেখেছেন?

উঃ—হাঁ, এখন আমি মিশরের কথাই একটু বলব। মিশরে গিয়েছিলাম ১৯১৪ সালে। সেখানে অভিযান ছিল নীলনদ উজিয়ে। সিন্ধুদেশে গিয়ে মনে হ'য়েছিল, যেন আবার মিশরই দ্বিতীয়বার দেখা হ'ল। সিন্ধুনদ আর নীলনদ দুই-ই একপ্রকার সমান্তরালরূপে প্রবাহিত। তবে সিন্ধু পড়্‌ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, আর নীল পড়্‌ছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। নীল উপত্যকায় দেখেছিলাম, নদীটা ব'য়ে যাচ্ছে আর তার দুধারে সামান্যমাত্র পলিপড়া জমি ; তার পরেই কেবল বালু ধূ ধূ কর্‌ছে। সেই দৃশ্যই আবার যেন সিন্ধুদেশে নজরে

পড়ল। তবে মিশরে এত বালু গাড়ীর ভেতর উড়ে এসে পড়েনি। এজন্যে সিন্ধু-সফরটা আমার কাছে ভৌগোলিক হিসাবে যারপরনাই নতুন অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ।

প্রঃ—করাচি পৌঁছলেন কখন?

উঃ—সকাল বেলা।

প্রঃ—করাচি রেলষ্টেশনটি খুব বড়?

উঃ— ষ্টেশনটা দেখে এমন কিছু হাতী-ঘোড়া মনে হয় না। তবে করাচি পৌঁছবার আগেই উড়ো জাহাজের বন্দর আর তার সংশ্লিষ্ট নয়া শহর চোখে প'ড়েছিল। আর করাচি ষ্টেশনেরই লাগাও করাচি বন্দরেব বাড়ীঘর বেশ-কিছু নতুন আর্থিক জনপদের সাক্ষ্য দিচ্ছিল।

প্রঃ—কোথায় গিয়ে আড্ডা গাড়া হ'ল,—রামকৃষ্ণ আশ্রমেই?

উঃ—ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন করাচি রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শর্বানন্দ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন একজন সিন্ধি ভদ্রলোক। এই সিন্ধি মশায়ের বাড়ীতেই স্বামীজি আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন।

প্রঃ—শর্বানন্দকে আগে চিন্‌তেন?

উঃ রেঙ্গুনের রামকৃষ্ণ-ধর্মসম্মেলনে শর্বানন্দ'র সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। এঁকে রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের অন্যতম বিরাট খুঁটা বিবেচনা করি। রেঙ্গুনের স্বামী পুণ্যানন্দও কর্মবীর।

প্রঃ—আচ্ছা, সিন্ধী বাবুটির নাম কি? ইনি কি ব্যবসায়ী মহাজন নাকি?

উঃ—নাম জগৎসিং আইল্‌মল্‌ কুন্দনানি। ইনি ব্যবসায়ী মহাজন নন। ইনি ছিলেন সরকারী চাকুরে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, বর্তমানে পেন্সনপ্রাপ্ত। উপাধি রায় বাহাদুর। ইনি রামকৃষ্ণে খুব-বড় ভক্ত। করাচিতে যে সকল সিন্ধী নর-নারী রামকৃষ্ণে-আশ্রমের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য ক'রেছেন, তাঁদের তিনি অন্যতম। কুন্দনানি মশায় স্বামী শর্বানন্দের মস্ত গুণগ্রাহী।

প্রঃ—এত-বড় লম্বা-চওড়া নাম বরদাস্ত কর্‌তে আপনাকে বেগ পেতে হয় নি? শুধু জগৎসিং হ'লে যথেষ্ট হ'ত নাকি?

উঃ—হাঁ, এক হিসেবে তাই। বাস্তবিক পক্ষে এই সিন্ধী বাবুটির নাম জগৎসিংই বটে। দ্বিতীয় শব্দটা হ'চ্ছে তাঁর বাপের নাম। সিন্ধু ও গুজরাত আর মহারাষ্ট্র—এই তিন দেশে প্রত্যেক লোকের নামের সঙ্গে দ্বিতীয় স্থানে বসে বাপেব নাম। প্রথম শব্দটাই নিজের নাম।

প্রঃ—তাহ'লে কুন্দনানিটা কি?

উঃ—এটা বংশের নাম। আনি-ভাগান্ত শব্দে বুঝ্‌তে হবে যে, লোকটা অমুক-বংশের লোক অর্থাৎ এই সিন্ধী মশায়ের জন্ম কুন্দন্‌বংশে। ইনি আইল্‌মলের পুত্র। অতএব খাঁটি স্বদেশী-হিসাবে এঁকে সহজে জগৎসিং ব'লেই জানে। সিন্ধুদেশের অনেক নামেই আনি-ভাগান্ত শব্দ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। বাঙ্‌লা দেশে ঠিক এই ধরণের পদবী দেখা যায় না। তবে মারাঠিতে এর জুড়িদার দেখ্‌তে পাই। সে হ'চ্ছে 'কার'-ভাগান্ত শব্দ,—যথা দেউস্‌কার, পারাড়কার, কেল্‌কার, ভাণ্ডারকার, সাভারকার, হার্দিকার, আম্বেদকার ইত্যাদি। কার-ভাগান্ত শব্দে মারাঠারা বোঝে যে, লোকটি অমুক গ্রামের বা জনপদের লোক।

প্রঃ—করাচি শহরটি কেমন লাগ্‌লো?

উঃ—মাত্র কয়েক দিনের অভিজ্ঞতায় বেশী কিছু বলা উচিত নয়। তবে একদম

প্রাথমিক খেয়ালগুলা ব'কে যেতে পারি। মনে হ'ল যেন, অত বড়-বড় সুশ্রী শড়ক আমি ভারতবর্ষের কোনো শহরে দেখিনি! (?)

প্রঃ—রেঙ্গুনেও না?

উঃ—না, রেঙ্গুনেও না। মেপে-জুকে আর তামা-তুলসী-গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বল্‌ছি না, বলা বাহুল্য। রেঙ্গুন দেখে মনে হ'য়েছিল বাস্তবিকই যেন একটা খুব সমৃদ্ধিশালী দেশের রাজধানীতে র'য়েছি। বাড়ীঘরগুলো প্রশস্ত ও বৃহদাকার ত বটেই। রাস্তাঘাটের ঐশ্বর্যও উল্লেখযোগ্য। করাচিতে সেই সবই চোখে এল। অধিকন্তু করাচিতে যত টুকু বেশী নজরে প'ড়েছে, তার সবই নতুন, তক্-তক্ কর্‌ছে। বাড়ীঘরগুলো সবই যেন পঁচিশ-তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের চেয়ে পুরোনো নয়। অনেক রাস্তায় এখন পর্যন্ত ঘরবাড়ী খাড়া হয়নি। রেঙ্গুনের ভেতর একটা প্রাচীনত্ব আছে। সেখানে খানিকটা কল্‌কাতা ও বোম্বাইয়ের বনেদি ভাব ঘরবাড়ী আর শড়কের আবহাওয়ায় স্পর্শ ক'রেছিলাম। কিন্তু করাচিতে সবই যেন তাজা, নয়া, জোআন।

প্রঃ—সে কি মশায়, করাচিতে পুরোনো কিছুই নেই?

উঃ—আছে বৈ কি। পুরোনো করাচির ভেতরও প্রবেশ ক'রেছি। সেখানকার গলিঘোঁজ আর বাড়ীঘর ইত্যাদি দেখে উত্তর-ভারতের যে কোনো পুরোনো শহরের দৃশ্য চাখ্‌তে পেরেছি বাস্তবিকপক্ষে ইতালি, ফ্রান্স ইত্যাদি ইয়োরোপীয়ান দেশসমূহের অনেক শহরেই মধ্যযুগের গলিঘোঁজ আজও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। পুরোনো করাচির ভেতরে খানিকটা পুরোনো ভেনিস ইত্যাদি শহরেরই অবস্থা যেন দেখেছি। কিন্তু আমি নয়া করাচির কথা বল্‌ছি,—বস্তুতঃ নয়া করাচির ভিতরকার ও তার নয়া-নয়া মহাল্লার কথা বল্‌ছি। এখানে সবই নবীন, বাস্তশিল্প নবীন, ঘরের দেওয়াল, ঘরের জানালা ও ঘরের ছাদ, ঘরের সম্মুখভাগ, সবই যে নবীন। বলা যেতে পারে, মধ্যযুগের ভারত এই নয়া-করাচিতে এক ছটাকও প্রভাব রাখেনি।

প্রঃ—কী রকম?

উঃ—কাণ্ডটা বিচিত্র। নয়া করাচির ঘরবাড়ীগুলা সবই আমার কাছে ইতালির "ভিলা"র মতন মনে হ'য়েছে। ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলে দক্ষিণ ফ্রান্স, আর উত্তর-পশ্চিম ইতালিতে বহুসংখ্যক ছোট বড়-মাঝারি সমুদ্র-পল্লী বা সমুদ্র-নগর আছে। সেগুলোকে সহজে "রিভিয়েরা" জনপদ বলা হয়। নয়া-করাচির ইমারতগুলাকে আমি ঠিক "রিভিয়েরা"র কুটির, হর্ম্য, বা প্রসাদ ইত্যাদি ভবনের জুড়িদারই সম্‌ঝে রেখেছি।

প্রঃ—কেন, কল্‌কাতা কি বোম্বাই কি মাদ্রাজের আধুনিক বাস্তুরীতির সঙ্গে কি নয়া করাচির বাস্তুরীতির কোনো সাদৃশ্য নেই?

উঃ—হাঁ, কলকাতা, বোম্বাই মাদ্রাজের যে-সকল আফিস-ঘর কিংবা যে-সকল বসতবাড়ি বা প্রাসাদতুল্য ভবন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তার অনেকগুলাই ইতালিয়ান "রেনেসাঁস" ছাঁচে গড়া। সেই রেনেসাঁস রীতিরই ছড়াছড়ি দেখেছি নয়া করাচির প্রায় সব-ক'টা বাড়ীতে। শুধু ছড়াছড়ি নয়, আমি একে নবীন ইতালিয়ান-রীতির দিগ্‌বিজয় বল্‌তে চাই। বাড়ীগুলা প্রায় সবই "ভিলা"-জাতীয়। আপিসি কায়দার লম্বাচওড়া বিশালকায় ঘরবাড়ীর কথা বল্‌ছি না। ভিলাগুলা বাগান-বাড়ী-বিশেষ। অবশ্য এই মরুভূমিতে বাগান শব্দে হাতীঘোড়া বুঝতে হবে না। আলাদ-আলাদা বাড়ীগুলো—একটার সঙ্গে আর একটার যোগ নেই। দেওঘর, মধুপুর ইত্যাদি অঞ্চলের

মতন চারদিকে ফাঁকা জায়গা রেখে বাড়ী তৈরী হ'য়েছে। ঘরবাড়ীগুলা দেখ্লে তাজা জীবনের আনন্দ স্পর্শ করা যায়। অধিকন্তু প্রত্যেক ইমারতের আবহাওয়ায়ই আর্থিক সম্পদ্ও মালুম হয়।

প্রঃ—বাড়ীগুলা সবই কি সমুদ্রের উপরে?

উঃ—একেবারেই নয়। করাচির নাম শুনে ভেবেছিলাম, বোধ হয় অনেক দিন পর আবার "সাগরকূলে বসিয়া বরিলে হেরিব লহরমালা।" রাধামাধব, এই ভিলাগুলা থেকে সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে হ'লে ১৪।১৫ মাইল যেতে হয়। অবশ্য বাঁধা শড়কও র'য়েছে, শড়ক তক্-তক্ও কর্ছে। আর সমুদ্রের ধারে "ক্লিফ্টন বীচ" নামক সাগরতট র'য়েছে। সেখানে বেড়াবার ও আরাম কর্বার তোফা ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু সে ঠিক যেন কল্কাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার পর্যন্ত যাওয়ার হাঙ্গামা। তা সত্ত্বেও করাচির বাড়ীঘরে সমুদ্রের হাওয়া সর্বদাই চলে। কাজেই থার্মোমেটারের মাপে করাচিতে যদিও কল্কাতার গরমই কাগজে কলমে দেখা যায়, তথাপি করাচির মরসুম মহাগ্রীষ্মকালেও ঠিক যেন বসন্ত আর কি। অর্থাৎ ঘরের ভিতর ফুরফুরে হাওয়া দিনরাত লেগেই আছে। আমি অবশ্য মাত্র নবেম্বরের আবহাওয়াই জানি।

প্রঃ—আপনার কথায় মনে হ'চ্ছে যে, করাচি আমাদের ভারতের যেন একটা স্বর্গধাম।

উঃ—হাঁ, প্রথম দৃষ্টিতে একপ্রকার তাই। পয়সাওয়ালা লোকের পক্ষে। আর এইজন্য ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। ভারতীয় গরমের আবহাওয়ায় এই যে চিরবসন্তের কেন্দ্র, একে আমি আর্থিক ভাবতের পক্ষে বেশ-একটা সুযোগবহুল কর্মভূমি বিবেচনা করি।

প্রঃ—কী রকম?

উঃ—এই শহরকে ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহুসংখ্যক স্বাস্থ্যান্বেষী পর্যটক বছরে কম-সে-কম ৫।৭ সপ্তাহের জন্য আড্ডা গাড়ার উপযুক্ত বিবেচনা কর্বে,—এইরূপ আমার সর্বদা মনে হ'চ্ছিল। ইয়োরামেরিকা প্রবাসের সময় লক্ষ্য ক'রেছি যে, সাদা চামড়াওয়ালা নরনারীরা হাজারে-হাজারে দক্ষিণী সূর্যের তাপের লোভে ভূমধ্যসাগরের কূলে-কূলে এসে কয়েক সপ্তাহ কাটাবার জন্য অস্থির হ'য়ে পড়ে। ওদের জীবনের আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই সূর্যের আলোর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানো। নির্মল আকাশের সূর্যতাপ ভোগ কর্তে পারা এরা চরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করে। তার জন্যে পয়সাওয়ালা লোকের অনেক দূর থেকে এসে মাত্র দু-এক দিন থাক্তে পেলেও অতি কৃতার্থ হয়। এই সব লোকেরা যদি ভারতবর্ষেও দক্ষিণ ফ্রান্স, দক্ষিণ ইতালি, উত্তর আফ্রিকা, মিশর ইত্যাদি দেশের মতন একটা সুব্যবস্থাশীল ঘরবাড়ীওয়ালা শহরের কথা জান্তে পায়, তা'হলে তারা প্রথমে গণ্ডায়-গণ্ডায় পরে শ'য়ে-শ'য়ে এমন কি হাজারে-হাজারে ভারতবর্ষকেও স্বাস্থ্যের খনি বিবেচনা কর্তে শিখ্বে।

প্রঃ—করাচি আপনাকে পেয়ে ব'সেছে দেখ্ছি। বিদেশীরা এতদূর পর্যন্ত আস্বে কি?

উঃ—না আস্বার কোনো কারণ নেই। আমি করাচিকে অন্যতম ভারতীয় "রিভিয়েরা"-শহর বিবেচনা কর্ছি। ইয়োরোপীয় রিভিয়েরার শহরগুলার সঙ্গে করাচির পক্ষে টক্কর দেওয়া সম্ভব। অবশ্য করাচি এখন যে অবস্থায় আছে, ঠিক সেই অবস্থায় শাদা চামড়াওয়ালা টুরিস্ট্দেরকে আকর্ষণ করা সহজ নয়। তার জন্য চাই খেলাধূলার ব্যবস্থা, আর সমুদ্রস্নানের জন্য বিস্তৃততর ব্যবস্থা। রকমারি থিয়েটার ও সিনেমার আয়োজন চাই। তাছাড়া চাই নাচগান ইত্যাদির আড্ডা। এসব গ'ড়ে তোলা পয়সার

খেলা। যদি কোনো পার্শী, গুজরাতি, সিন্ধী বা মারোয়াড়ি পুঁজিপতি ব্যক্তিগতভাবে অথবা কেহ কেহ দলবদ্ধভাবে শ্বেতাঙ্গ টুরিস্ট্‌দের জন্য করাচিতে নতুন-নতুন বিলাস-স্বাস্থ্য ও আরামি-কেন্দ্র কায়েম করবার জন্য টাকা ঢাল্‌তে প্রস্তুত থাকেন, তাহ'লে বিদেশী নরনারীর ট্যাঁক থেকে করাচিতে টাকা খসাবার ব্যবস্থা ঘট্‌তে পারে। তাতে একমাত্র করাচিরই নয়, গোটা সিন্ধুদেশের এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেরও নরনারীর পক্ষে নতুন-নতুন আয়ের পথ খুলে যাবে ব'লে বিশ্বাস করি।

প্রঃ—স্বাস্থ্যান্বেষীদের আনাগোনায় আপনি ধনবৃদ্ধির উপায় দেখ্‌ছেন কেন?

উঃ—টুরিস্ট্‌দের আনাগোনায় খুব বড় ব্যবসা সৃষ্ট হয়েছে মিশর দেশে। ইতালি, ফ্রান্স ইত্যাদি, দেশেও অনেক পরিমাণে বিদেশী মোসাফেরদের আনাগোনা সম্পদ্ সৃষ্টি ক'রে থাকে। ভারতবর্ষে আজকাল শীতকালে বিদেশী টুরিস্ট্‌দের সমাগম হয়। টুরিস্ট্‌দের সংখ্যা ক্রমে-ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। তাতে ভারতীয় নরনারীর বেশ-কিছু লাভ হ'য়ে থাকে। তা কলকাতার লোকেরা শীতকালের মরসুমে কিছু-কিছু আন্দাজ কর্‌তে পারে। কিন্তু করাচির ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে আমি কিছু-লম্বা ধারণা পোষণ করি। একে একটা বেশ-কিছু বড়-গোছের পয়সা-রোজগারের কেন্দ্র মনে কর্‌ছি। আজকাল উড়ো জাহাজের সাহায্যে ইয়োরোপ থেকে করাচি পৌঁছানো ছেলেখেলামাত্র। পয়সাওয়ালা লোকের পক্ষে ইয়োরোপ থেকে এসে চিরবসন্তময় করাচিতে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি করা অতি-কিছু নয়। করাচিতে থাক্‌বার সময় সিন্ধী, গুজরাতী, পার্শী ইত্যাদি বণিক্-বন্ধুদেরকে করাচির আর্থিক ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে এই ধরণের একটা চিত্র দিয়ে আস্‌তে কসুর করিনি।

করাচির রামকৃষ্ণ-ধর্মসম্মেলন

প্রঃ—এবার ধর্মসম্মেলনের কথা কিছু বলুন।

উঃ—১লা নভেম্বর হ'তে ৮ই নভেম্বর পর্যন্ত সম্মেলনের ব্যবস্থা ছিল। আলোচনার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নির্ধারিত হ'য়েছিল—

(১) রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী। (২) খৃষ্টধর্ম। (৩) ইস্‌লামধর্ম। (৪) হিন্দুধর্ম। (৫) শিখধর্ম। (৬) পার্শীধর্ম। (৭) বৌদ্ধ ধর্ম। (৮) জৈনধর্ম। (৯) চীন ও জাপানের কনফিউশিয়ান, তাও এবং শিন্তো ধর্ম। (১০) বাহা ধর্ম। (১১) উপসংহার।

বক্তার ভেতর ছিলেন স্বামী শর্বানন্দ, করাচির এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জুন্নরকার, পাদ্রী হ্যাস্‌কেল, শেঠ গোলাম আলি চাগ্‌লা, সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ কলেজের অধ্যাপক জেঠমল পার্শরাম, পার্শীপুরোহিত ডক্টর ধাল্লা, বোম্বাইয়ের জৈন-পুরোহতি মুনি মহারাজ বিনয়বিজয়জি, পার্শী মহিলা শিরিন ফৌজদার।

প্রঃ—ওরে বাপরে! এতগুলো ধর্ম! ধর্মমতের হাট ব'সেছিল দেখ্‌ছি।

উঃ—হাঁ, এক হিসাবে ধর্মের হাটই বটে। রামকৃষ্ণের কৃপায় ১৯৩৬ সনে কলম্বোতে, সিঙ্গাপুরে, রেঙ্গুনে, মাদ্রাজে, বোম্বাইয়ে, কানপুরে, কাশীতে, এলাহাবাদে, দিল্লীতে, নাগপুর শহরে এই ধরণের ধর্মের হাট ব'সেছে। রেঙ্গুনের ধর্মসম্মেলনে এই অধমকে সভাপতিরূপে যেতে হ'য়েছিল। সেখানেও কারবার বিরাট দেখেই এসেছি। রেঙ্গুনের

অভিজ্ঞতায় আর করাচির অভিজ্ঞতায় আমি বল্‌তে পারি যে, ভারতবর্ষের কোনো শিক্ষাকেন্দ্রে, কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে, কোনো সংস্কৃতিমণ্ডলে বা কোনো সাহিত্য-পরিষদে এতগুলো ধর্মসম্বন্ধে একসঙ্গে এক ছাদের তলায় এরূপ বিস্তৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় না। বড়-বড় শিক্ষাকেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয় বা সাহিত্যপরিষদের তদ্বিরে এইরূপ বিভিন্ন ধর্মমত-সম্বন্ধে পরস্পর সহানুভূতিসূচক অথচ বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আশা করা উচিত। কিন্তু দুঃখের কথা ভারতবর্ষের কোথাও পণ্ডিত-সমাজের ব্যবস্থায় এইরূপ ধর্ম-জিজ্ঞাসা দেখ্‌তে পাই না।

প্রঃ—কোন, আপনি ধর্মসভার আর ধর্ম-বক্তৃতার জন্য এত উদ্‌গ্রীব কেন?

উঃ—বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় মানুষের মুড়োটা বেশ-কিছু ঝর্‌ঝ'রে ও খোলসা হ'য়ে উঠে। "দশাননী" বা বিশ-চোখো দৃষ্টিভঙ্গী পায়দা হয়। মেজাজে উদারতা ঢুক্‌তে পারে। মানুষের কলিজাটা বাড়িয়ে দিবার কাজ খুব মহত্ত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকীর উদ্যোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রের রামকৃষ্ণ-মিশন সেই গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিল। প্রত্যেক কেন্দ্রের ধর্মসভায়ই লোক হাজির হ'য়েছে প্রচুর। সকল ব্যবসার, সকল আয়ের, সকল জাতের নরনারীই বক্তৃতাগুলো আগ্রহের সহিত শুনেছে। তাতে ভারতীয় নরনারীর সংস্কৃতি বিষয়ক একটা মস্ত অভাব খানিকটা দূরীভূত হ'য়েছে। এদিকে উচ্চশিক্ষিত ভারতবাসীর বিশেষতঃ সাহিত্যসেবী এবং সার্বজনিক সভাসমিতির কর্মকর্তাদের নজর রাখা আবশ্যক। কেন না বিভিন্ন ধর্মমতের আলোচনার উপলক্ষ্যে প্রকারান্তরে লোকেরা একসঙ্গে নানা দেশের, নানা সমাজের, নানা মনীষীর এবং নানা যুগাবতারের কর্মকথা ও চিন্তারাশির সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারে। ধর্মসম্মেলনের ফলে রেঙ্গুনে আমি দেখেছি লোকজনের মাথায় অনেক নতুন-নতুন খেয়াল ঢুকেছে। করাচিতেও আমি এই সুফল যথেষ্ট লক্ষ্য কর্‌তে পেরেছি। মোটের উপর শ্রোতাদের মেজাজে বেশ কিছু উদরতা আর সার্বজনীনতা ঘর ক'রে ব'স্‌তে পেরেছে। ভারতবর্ষের নানা কেন্দ্রে এই সুফল ছড়াতে পেরেছে ব'লে রামকৃষ্ণমিশনকে আমি বিশেষভাবে অভিনন্দিত কর্‌তে পারি। রামকৃষ্ণশতবার্ষিকীর কর্মকর্তারা বারমাসব্যাপী উৎসবের জন্য যতগুলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ক'রেছেন, তার ভেতর ধর্মসম্মেলনগুলার ব্যবস্থাটা অনেকদিন ধ'রে ভারতীয় নরনারীর উপকার ক'র্‌বে। এই সম্মেলনসমূহের প্রভাব বেশখানিকটা স্থায়ী হবে মনে হ'চ্ছে।

প্রঃ—এই এতগুলো ধর্মের হট্টগোলে মুলগায়েন কি ছিলেন আপনি একা?

উঃ—রেঙ্গুনের বেলা ব্যবস্থা তাই ছিল বটে। কিন্তু করাচিতে প্রথম দিন ছিলেন পার্শী বণিক্‌ জামসেদ মেতা। আর একদিন ছিলেন করাচি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক বুটানি। তিনি সিন্ধী। উপসংহারের দিন বক্তা ছিলাম আমি একা। সেইদিন সভাপতি ছিলেন জগৎসিং। অন্যান্য দিন মূলগায়েনের ভার প'ড়েছিল এই অধমেরই ঘাড়ে।

প্রঃ—এত জায়গায় ধর্মসম্মেলন হ'ল, কৈ কলকাতায় ত কিছু হয় নি? শতবার্ষিকীর উদ্যোক্তারা কল্‌কাতাকে ভুলে রইলেন কেন?

উঃ—কল্‌কাতায়ও হ'চ্ছে। কল্‌কাতার ধর্মসম্মেলনই শতবার্ষিকী উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান হবে। আগামী (১৯৩৭) মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে,—একদম পয়লা তারিখে সুরু হবার কথা। দিন দশ-বার চল্‌বে। এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা,—দুনিয়ার নানা মুল্লুক থেকে লোক আস্‌বে। আর প্রবন্ধ ত আস্‌বেই। ফরাসী, জার্মান, ইতালিয়ান

ইত্যাদি ভাষও প্রবন্ধ আস্‌ছে। জাপান, চীন, ইরাক, মিশর ইত্যাদি দেশের প্রতিনিধি থাক্‌বে। বিলাত, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, হল্যাণ্ড আর আমেরিকা এই সব দেশ হ'তে এই ধর্মসম্মেলনের জন্য ডেলিগেট আস্‌বার কথা আছে। ইতালির লয়েড ট্রিস্টিনো জাহাজ-কোম্পানী যাত্রীদেরকে আধা মাশুলে নিয়ে আস্‌তে রাজি হ'য়েছে। এই ধর্মসম্মেলনের ইংরেজি নাম "পার্লামেণ্ট অব রিলিজ্যান্‌স্"। কাজেই কল্‌কাতায় এবার একটা বড়গোছের আন্তর্জাতিক হাট ব'সে যাবে। আর সেই হাটে সওদা বিকোবে রকমারি ধর্মকথা, রকমারি নীতিকথা, রকমারি আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা, রকমারি বাড়্‌তির পথে মানবজীবন। বেলুড়ের স্বামী সম্বুদ্ধানন্দর কাছে এই বিষয়ক হরেক রকম খবর পাওয়া যাবে। এই স্বামী মহারাজ রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম জবরদস্ত কর্মবীর।

মার্চ ১৯৩৯

ধর্মের আন্দোলন ও আর্থিক উন্নতি *

হেমেন সেন—মশায়, কিছু মনে না করেন ত একটা ঘরোআ কথা আপনাকে জিজ্ঞেস কর্‌তে চাই। ধর্মের আন্দোলন আপনাকে পেয়ে বস্‌ল কী ক'রে? আপনাকে মাঝে-মাঝে রামকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা কর্‌তেও দেখা যায়। এসব সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি রচনা আপনার হাতে বেরিয়েছে। তা ছাড়া, "হিন্দুচোখে চীনা ধর্ম, নামক প্রকাণ্ড ইংরেজি বইও আপনি বহুদিন আগেই লিখেছেন (শাংহাই ১৯১৬)। এসব দেখে শুনে আমার অনেক দিন ধ'রে ইচ্ছে আপনার সঙ্গে একবার ধর্ম-সম্বন্ধে আপনার মতামত নিয়ে আলোচনা করি।

উঃ—আচ্ছা, বেশ ভাল কথা। আমি ধর্মের আন্দোলনে হাতী-ঘোড়া কিছু দেখিটেখি না। আমি চাই দেশটাকে বাড়াতে, মানুষগুলাকে যেন-তেন-প্রকারেণ ঠেলে বড় ক'রে তুল্‌তে। তার জন্য ধর্মের আন্দোলন কেন, যমের আন্দোলনেও চালাতে প্রস্তুত আছি। মানুষের জীবনে অন্যান্য হাজার হাজার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মতনই ধর্মও আমার কাছে আলোচ্য বস্তু। যখন-যখন সময় জোটে বা সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন-তখন ধর্মই হোক আর অর্থই হোক আর অর্থই হোক, কামই হোক, কামই হোক আর মোক্ষই হোক, সব-কিছুরই আলোচনা ক'রে থাকি। ত্রিশ-বত্রিশ বছর ধ'রে চ'লেছে এই পেশা।

প্রঃ—কিন্তু মশায় ধর্মসম্মেলনের মাহাত্ম্য-কীর্তন, ধর্মচর্চা, আর বুদ্ধরামকৃষ্ণ ইত্যাদি অবতারদের সম্বন্ধে আলোচনা আপনার মতন অর্থশাস্ত্রীর মুখে কেমন-কেমন ঠেকে! ধনদৌলতের সঙ্গে ধর্মের যোগাযোগ আমরা তো টুঁড়েই পাই না। অর্থকে ধর্মওয়ালারা

*প্রথমে "সুবর্ণবণিক্‌-সমাচার" মাসিকে বাহির হইয়াছিল (চৈত্র ১৩৪৫, মার্চ ১৯৩৯), পরে "উদ্বোধন" মাসিকে বাহির হয় (কার্তিক ১৩৪৬, অক্টোবর ১৯৪০)। মোলাকাৎ চালাইয়াছিলেন কবি হেমেন্দ্র বিজয় সেন এম্‌-এ, বি-এল। শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্য-কৃষি-বিষয়ক বহুসংখ্যক বিদেশী ও স্বদেশী কর্মবীরের জীবন-বৃত্তান্ত হেমেন সেনের হাতে বাহির হইয়াছে। বোধ হয়, তিনি শ-তিনেক জীবনী "সমাচারে" প্রকাশ করিয়াছেন। হেমেন সেন বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষদের অবৃত্তিক গবেষক।

চিরকাল ভেবে এসেছে অনর্থের মূল, আর আপনি ধর্মকে অর্থের দুষমণ না ভেবে ঠিক যেন বন্ধুই ভাবছেন। ধর্মওয়ালারা যদি অর্থকে কলা দেখাতে চায়, আপনার উচিত অর্থের কোঠ থেকে ধর্মকে কলা দেখানো। "আর্থিক উন্নতি"র সম্পাদকের কাছে আর "একালের ধনদৌলতে ও অর্থশাস্ত্র"-লেখকের কাছে লোকেরা ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই-ই আশা করে। বিশেষতঃ আপনি "ধনদৌলতের রূপান্তর" আর "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র" ইত্যাদি মার্ক্‌স্-পন্থী ফরাসী ও জার্মান বই দুটার তর্জমা ক'রেছেন। লোকেরা আপনারা কাছে চায় ধর্মের সঙ্গে লড়াই। আপনি ঠিক লোকরুচির বিরুদ্ধে যাচ্ছেন না কি? ধনবিজ্ঞানের মুল্লুক থেকে আপনি ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি জিনিষের সঙ্গে হামদর্দি দেখাচ্ছেন। ধর্মকে ডেকে আন্‌ছেন অর্থের দুনিয়ায়। ভয়ানক কারবার! আপনার মতিগতি বোঝা ভার।

উঃ—এর ভেতর রহস্য বা "মিস্ট্রি"-জাতীয় বস্তু বিলকুল নাই। সবই জলবৎ তরল। অর্থকে যদি কোনো ধর্মওয়ালা কোনোদিন কলা দেখিয়ে থাকে, তবে সে পয়লা নম্বরের আহাম্মুক,—সে লোকটা পশ্চিমাই হোক আর পূরবীই হোক, সেকালের লোকই হোক বা একালের লোকই হোক। এই ধরণেব আহাম্মুকির বিরুদ্ধে লড়াই চালানো "আর্থিক উন্নতি"র আর "বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদে"র এবং ধনবিজ্ঞান-গবেষণার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। আদা-নুন খেয়ে কোনো-কিছুর স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আন্দোলন চালানো অবশ্য আমার দস্তুর নয়। যদি কখনও দুনিয়ার কোথাও জোরের সহিত প্রচারিত হয় যে, ধর্মই মানুষের একমাত্র চিজ এবং আর সব-কিছুই অলীক, বুজরুকি ইত্যাদি, তবে তার উল্টা জবাব দিবে অর্থশাস্ত্রীরা. রাষ্ট্রবিজ্ঞানসেবীরা এবং অন্যান্য বিদ্যা-কলার গবেষকেরা। তারা বল্‌বে, ধর্ম একটা চিজ বটে, কিন্তু মানুষের জীবনে ধর্ম একমাত্র চিজ নয়। পুরুষার্থ বহু-বিধ, বহুঢঙের। অতএব ধর্মের অদ্বৈতবাদ টেঁকসই নয়। "আর্থিক উন্নতি"র বেদান্ত এই ধরণের ধর্মবিষয়ক অদ্বৈতকে কলা দেখিয়ে কাজ সুরু করে। কিন্তু তা ব'লে মানুষের ধর্মচর্চাকে বুজরুকি, অলীক বা অসার-কিছু ব'লে কলা দেখাতে প্রস্তুত নয়। ধর্মের অদ্বৈত বুজরুকি। কিন্তু ধর্ম চিজটা বুজরুকি নয়। এই হ'ল "আর্থিক উন্নতি"র আর অর্থশাস্ত্রের বা ধনবিজ্ঞানের আসল দর্শন।

("আত্মা, পরকাল, ভগবান্‌", ৭ই নভেম্বর ১৯৪২)

প্রঃ—দেখ্‌ছি মহা ফ্যাসাদে ফেল্‌লেন। আপনি তাহ'লে অর্থের অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন না? ধনদৌলতকে সংসারের একমাত্র কাম্য সম্‌ঝিতে প্রস্তুত নন?

উঃ—আলবৎ নই। ধর্মের অদ্বৈতবাদ যেমন বুজরুকি, ধনদৌলতের অদ্বৈতবাদও ঠিক তেমনি বুজরুকি। অর্থচিন্তা, অর্থসেবা, ধনগবেষণা, ধনবিদ্যা সবই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা ব'লে অন্যান্য হাজাব-হাজার কাজ, চিন্তা, বিদ্যা, গবেষণা বর্জনীয় বা ফেলিতব্য চিজ নয়। ধর্মবিষয়ক অদ্বৈতবাদের মুগুর আমি। আর্থিক অদ্বৈতবাদ যদি কায়েম ক'রে বসি, তা হ'লে যে আহাম্মুকির বিরুদ্ধে আমি বকাবকি কর্‌ছি, ঠিক সেই আহাম্মুকিই নিজে ক'রে বস্‌ব। আমি চাই দ্বৈত, বহুত্ব।

মার্ক্‌স্ ঋষি

প্রঃ—তাহ'লে কার্লমার্কস্‌কে আপনি হাজার বার লম্বা-গলায় ঋষি বলেন কেন?

মার্ক্স্ ত অর্থের অদ্বৈতবাদ প্রচার ক'রেছেন। (পৃষ্ঠা ৭১,২৪৬,৩৮৭-৩৮৯)

উঃ—মার্ক্সকে ঋষি বলার কারণ আছে। দুনিয়ার আহাম্মুকগুলা দর্শন চর্চা করতে ব'সে অনেকদিন ধ'রে প্রকৃতিকে, দুনিয়াকে, সংসারকে, বস্তুকে, ধনদৌলতকে নেহাৎ তুচ্ছ করত। সেই সময় মার্ক্স্ জোর্‌সে পণ্ডিত-মূখ্‌খুগুলাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যে, বাজে কথা ব'কে কোনো লাভ নেই। মার্ক্স্ সকলের চোখের ঠুলি খুলে দিয়েছে। দুনিয়ার পণ্ডিতদের মালুম হ'য়েছে জবর সত্য। সেটা এই। আতমা, পরকাল, ভগবান্ ইত্যাদির জোরে মানুষরে জীবন চলে কিনা স্পষ্টাস্পষ্টি জানা যায় না। হয়ত কিছু-কিছু চলে। কিন্তু প্রকৃতি, স্থূলশরীর, খাওয়া-পরা, বিষয়-কর্ম, জমিজমা, ধনদৌলতের উৎপাদন, বণ্টন, বিতরণ ইত্যাদি ভৌতিক শক্তি ও কারবার ছাড়া নরনারী এক পা চল্‌তে পারে না। এই হ'চ্ছে কেঠো, নিরেট, নির্মম সত্য। আত্মিক অদ্বৈতবাদকে জুতিয়ে দুরস্ত কর্‌তে পেরেছিল কার্ল্ মার্ক্স্। এই জন্য মার্ক্স্‌কে আমি বলি দার্শনিক জগতের "বাপ্‌কা বেটা", ঋষি, যুগাবতার ইত্যাদি।

প্রঃ—দেখা যাচ্ছে যে, আত্মা, ভগবান্, ধর্ম আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি চিজ মার্ক্সের দুষমণ। এইগুলাকে ধ্বংস করার কৃতিত্ব আছে ব'লে আপনি মার্ক্সের তারিফ কর্‌ছেন। তাই যদি হয়, তাহ'লে আবার ধর্মের সঙ্গে আপনার কোলাকুলি কেন? আধ্যাত্মিকতা, ধর্মসম্মেলন, নীতিকথা, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদির কিস্মৎ আপনি দেখ্‌ছেন কী ক'রে?

উঃ—মার্ক্সের দর্শন (কম্-সে-কম্ মার্ক্স্-পন্থীদের দর্শন) নির্ভুল নয়। আত্মার অদ্বৈতকে গুঁড়ো ক'রে দেওয়া মার্ক্সের ক্যার্‌দানি সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জায়গায় মার্ক্স বা মার্ক্স্‌পন্থীরা বসালে প্রকৃতির অদ্বৈতই আমার চিন্তায় বুজরুকি। যে-কোনো অদ্বৈতবাদের যম আমি। মার্ক্স্ যদি বল্‌তো যে, ধনদৌলত, আর ধনদৌলতের উৎপাদন, বণ্টন ইত্যাদি কাজ মানুষের জীবনে ও সভ্যতার বিকাশে অন্যতম শক্তি,—তাহ'লে আমার কোনো আপত্তি থাক্‌ত না। এমন কি এগুলাকে অন্যতম মহাশক্তি, অন্যতম জবরদস্ত শক্তি ইত্যাদি বল্‌লেও আমি মার্ক্সের সঙ্গে একমত হ'তে প্রস্তুত আছি। কিন্তু মার্ক্স্ অথবা মার্ক্স্‌পন্থীরা বলে একবগ্‌গা চরম ধরণের কথা। তাদের বিচারে ধনদৌলতই মানুষের একমাত্র পুরুষার্থ ; একমাত্র ধনদৌলতের ওপরই সংসারের সুশ্রী-বিশ্রী, সু-কু, ন্যায়-অন্যায়, সত্যাসত্য, উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে ; এক কথায় উৎকর্ষের, সংস্কৃতির আর সভ্যতার সব-কিছু চিরকাল নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে এসেছে আর্থিক শক্তির দ্বারা। এই সব মতামতের আবহাওয়ায় আমি দেখ্‌তে পাই আর্থিক অদ্বৈতের আস্ফালন। অতএব লাগাও লড়াই।

("মার্ক্স্, কঁৎ, হার্ডার", ২৪শে সেপ্টেম্বর, "বণিক্, মজুর, রাষ্ট্রিক ও পণ্ডিত", ১১ই নবেম্বর, "বাঙলায় সোশ্যালিজম্-নিষ্ঠা", ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

প্রশ্ন—আপনার দৃষ্টিতে দুনিয়ার সংস্কৃতি বা সভ্যতা তবে চ'লে আস্‌ছে কিসের জোরে?

সরকার—কোনো একটা-কিছুর জোরে নয়,—সেই একটা-কিছু যত-বড় হাতী-ঘোড়া হউক না কেন। আমি দেখ্‌ছি যে, দুনিয়াখানা একমাত্র জমিজমা, টাকা-কড়ি ধনদৌলতের তাঁবে নিয়ন্ত্রিত, পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হ'য়ে আসেনি। এই সব ছাড়াও হাজার শক্তি এক সঙ্গে বা কতক্কাংশে পরে-পরে কাজ ক'রেছে। সেইগুলাও জবর শক্তি। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে টাকাপয়সা, জমিজমা, ধনদৌলতের চেয়ে এই সবের কোনো-কোনোটা বেশী প্রভাবওয়ালা শক্তিও বটে। কাজেই অর্থের কোঠে ব'সে ধনবিজ্ঞানের আখ্‌ড়া থেকে

ধনবিজ্ঞানসেবী অর্থশাস্ত্রীদের পক্ষে অর্থের বহির্ভূত কাজকর্ম, লেনদেন, যোগাযোগ, চিন্তা, গবেষণা, অনুসন্ধান, বিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে অসহযোগ চালানো অসম্ভব বা বেআকুবি। বরং সেই সবের সঙ্গে চাই সদ্ভাব, সহযোগিতা, হামহর্দি, আর দহরম-মহরম।

লেখক—তাহ'লে এইবার সোজা কথায় বুঝিয়ে বলুন ত রামকৃষ্ণ-ধর্মসম্মেলন থেকে আর্থিক উন্নতির সুযোগ-সুবিধা কী-কী হ'তে পারে?

সরকার—মানুষের মেজাজটা যদি চাঙ্গা হ'যে উঠে, তাহ'লে তার পক্ষে সব-কিছুই সুসাধ্য—টাকাকড়িকে টাকা-কড়ি, দেশোন্নতিকে দেশোন্নতি। রামকৃষ্ণ-ধর্মসম্মেলনের আবহাওয়ায় লোকগুলার চিত্তে নয়া-নয়া খেয়াল জাগাতে পার্‌লে বুকটা চওড়া হ'য়ে যেতে পারে। কলিজাটা ফুলে উঠ্‌তে পারে। লোকগুলার মুড়োর ভেতর নতুন-নতুন ঘী এসে জম্‌তে পারে। ব্যস্‌। আর কী চাই? তাহ'লেই নতুন-নতুন কাজে লোকের মতিগতি খেল্‌তে থাক্‌বে। নয়া-নয়া ফন্দী নিয়ে লোকেরা বাজারে বেরিয়ে প'ড়্‌বে। কোনো-কিছু খাড়া ক'রে তুল্‌বার জন্য প্রাণের ভেতর একটা অস্থিরতা গজিয়ে উঠবে। আর্থিক উন্নতি, সমাজ-সংস্কার, দেশোন্নতি ইত্যাদি সব-কিছুর জন্যই চাই এই ধরণের অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, অশান্তি। এ সবকে আমি বলি সৃষ্টিকারক অসাম্য ও অশান্তি। এই সব অসন্তোষ, অশান্তি ও অস্থিরতা থেকেই জন্মগ্রহণ করে ধনদৌলতের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন,—বস্তুতঃ আরও অন্যান্য অসংখ্য রকমের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও আন্দোলন ইত্যাদি।

লেখক—সৃষ্টিকারক অসাম্য বা অস্থিরতা কি ধর্মসম্মেলন ছাড়া আর কিছু থেকে পায়দা হ'তে পারে না?

সরকার—কেন পার্‌বে না? আমার দর্শন হ'চ্ছে বহুত্বের বেদান্ত। তথাকথিত ধর্মের গন্ধ নাই এমন হাজার-হাজার চিজ দিয়েও মানুষের মেজাজকে চাঙ্গা করা সম্ভব,—কোনো-কিছু খানা করার উৎসাহ জাগিয়ে তোলা যায়, গঠনমূলক অস্থিরতার ফোআরা ছুটানো যেতে পাবে।

রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য

লেখক—তাহ'লে আর্থিক জগতের তরফ তেকে রামকৃষ্ণ-ধর্ম-সম্মেলনের বিশেষত্ব কী?

সরকার—ভারত-সন্তানের পক্ষে,—আর বিশেষতঃ বাঙালীব পক্ষে,—রামকৃষ্ণ-ধর্মসম্মেলনের কিস্মৎ কিছু বিচিত্র রকমের। প্রথমেই একটা কথা ব'লে রেখেছি। অন্যান্য ধর্মসম্মেলনের মতন এই ধর্মসম্মেলনের প্রভাবেও মগজের আকার-প্রকার ব'দ্‌লে যেতে পারে। নয়া-নয়া খেয়াল জাগ্‌তে পারে। সঙ্কীর্ণতার ঠাঁইযে খানিকটা উদারতা গজিয়ে উঠ্‌তে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ধর্মসম্মেলনমাত্রেরই,—বস্তুতঃ যেকোনো সম্মেলনেরই,—এই সব মামুলি সুফল। যে-কোনো ধর্মসম্মেলনের প্রভাবে লোকেরা আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের কাজে ও চিন্তায় লেগে যেতে পারে। রামকৃষ্ণ-ধর্মসম্মেলনের প্রভাবে সেই সব তো আছেই। অধিকন্তু নতুন-কিছুও দেখ্‌তে পাচ্ছি।

লেখক—সেই সব নতুন-কিছুও কথাই বলুন।

সরকার—রামকৃষ্ণ বাঙালী,—ভারতবাসী। বিবেকানন্দও বাঙ

আমি রামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ হ'তে স্বতন্ত্রভাবে দেখি না। বস্তুতঃ বিবেকানন্দ'র দৌলতেই আমরা রামকৃষ্ণের কিস্মৎ বুঝেছি। লোকেরা জানে যে, বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের আবিষ্কার। আমি বলি যে, রামকৃষ্ণও বিবেকানন্দ'র আবিষ্কার। বিবেকানন্দ'র আবিষ্কৃত ও পেটেন্ট-করা রামকৃষ্ণকেই আমরা জানি। বিবেকানন্দ না থাক্‌লে আমরা রামকৃষ্ণকে চিন্‌তাম কি না সন্দেহ। অন্ততঃ যেভাবে আমরা বর্তমানে রামকৃষ্ণকে চিনেছি, তার প্রায় ষোল আনাই বিবেকানন্দ'র ব্যাখ্যায় ও প্রচারে তৈয়ারি মাল। এই দুই বা এক বাঙালীর নামে আজকাল দুনিয়ার চল্‌ছে একটা "ভারতীয়" সাম্রাজ্য। তাকে আমি "রামকৃষ্ণ"-সাম্রাজ্য ব'লে থাকি।
("রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য",২৩শে আগষ্ট, ১৯৪২)

লেখক—"রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য" সম্বন্ধে কখনো শুনিনি তো?

সরকার—এই পারিভাষিকটা চালাচ্ছি কিছুদিন ধ'রে। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্য হ'চ্ছে বিংশ-শতাব্দীর ভারতীয় সাম্রাজ্য। রামকৃষ্ণ-ধর্ম-সম্মেলনের মারফৎ অন্যান্য আর যা কিছুই হোক, এই নবীন ভারতীয় সাম্রাজ্যটা জগতের সর্বত্র চেঁড়ে উঠেছে। এই কথাটা বাঙালীর আর অন্যান্য ভারতবাসীর মগজে গিয়ে বসুক। তাহ'লে সে আর "জড়-ভরত" হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে না। নৈরাশ্য, অবসাদ, ভীরুতা, কাপুরুষতা তার ত্রিসীমানায় থাক্‌তে পার্‌বে না। বিংশ-শতাব্দীর ভারতীয় নরনারী একটা বিশ্বপ্রভাব বা দিগ্‌বিজয় ভোগ কর্‌ছে। তার খবর হোমিওপ্যাথিক ডোজেও যদি কোনো বাঙালীর বা অন্য ভারত সন্তানের পেটে গিয়ে পড়ে, তাহ'লে সৃষ্টিকারক অস্থিরতা তার মুড়োর ভেতর কিল্‌বিল্‌ কর্‌তে বাধ্য। সে অস্থির হ'য়ে ছুটাছুটি ক'র্‌বে সেই লোকটা বুঝ্‌বে যে, একালের বাঙালী বা ভারতবাসীরা সবাই ম্যাড়াকান্ত নয়। অনেকেই জাঁদ্‌রেল যোদ্ধা আর বোম্বেটে কর্মবীর।

লেখক—রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের খবর পেলে যুবক-বাঙ্‌লার আটপৌরে জীবনে কোনো লাভ আছে কি?

সরকার—বেশ আছে। যুবক-বাঙ্‌লা বুঝ্‌বে যে, বিংশ-শতাব্দীর বাঙালীর পক্ষে বিরাট-বিরাট কাজ ফাঁদা হাতীঘোড়া নয়। পর্বত-প্রমাণ প্রতিষ্ঠান আর দুনিয়া-জোড়া আন্দোলন চালাবার জন্যেই যুবক-বাঙ্‌লার জন্ম। এই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানসমূহ,—ব্যাঙ্ক-বীমা-বর্হিবাণিজ্যের অন্তর্গতই হউক বা বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্য ইত্যাদি মুল্লুকেরই হউক। রামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যের দম্ভল কিঞ্চিৎ-কিছু চোখে দেখ্‌লেই যুবক-বাংলা খাড়া হ'য়ে পড়্‌বে,—আশার প্রতিতিমূর্তিরূপে, উৎসাহের অবতাররূপে, কর্মনিষ্ঠার পালোআনরূপে। আর তারপর তো হাতের পাঁচ নতুন-নতুন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-আন্দোলন,—সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক এবং আর্থিক।

লেখক—তা'হলে রামকৃষ্ণের আন্দোলন থেকেও আপনি সাধারণ গেরস্থদের সাংসারিক উপকার, দেশের আর্থিক উন্নতি ইত্যাদি স্থূললাভ আশা করেন? জবাবটা এক কথায় বলুন।

সরকার—আল্‌বৎ। কাজেই আর্থিক উন্নতির পাণ্ডাদের পক্ষে ধর্মের আন্দোলনের মোল্লাদের সঙ্গে সমঝৌতা কায়েম করা বিজ্ঞানসম্মত কাজ। আমি ধর্মের আন্দোলন পছন্দ করি,—দেশ-বিদেশে ভারতবাসীর প্রতিপত্তি কায়েম কর্‌বার জন্য। ধর্ম আমার কাছে দুনিয়ার মানুষের এক্তিয়ার প্রতিষ্ঠা কর্‌বার যন্ত্র-বিশেষ।

লেখক—দেখ্‌ছি যে, আর্থিক দিগ্‌-বিজয়ের ধান্ধায় বেরিয়েও ধর্মের সঙ্গে কোলাকুলি করা চলে? ধর্মেব পাল্লায় প'ড়েও ব্যাঙ্ক-বহির্বাণিজ্যে পর্ব্বত-প্রমাণ প্রতিষ্ঠান আর দুনিয়া-

জোড়া আন্দোলন রুজ্জু করা যায়? ধর্মের আন্দোলনকে ও আর্থিক উন্নতির কাজে লাগানো সম্ভব? লাগানো উচিতও বটে?

সরকার—এইবার তাহ'লে বুঝেছেন ধনবিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তি আর "আর্থিক উন্নতি"র বেদান্ত।

("ইস্কুল-কলেজে চাই স্বামজিদের আনাগোনা", ৪ঠা নবেম্বর, ১৯৪২ দ্রষ্টব্য)

এপ্রিল ১৯৪২

বাঙ্‌লায় দেশী-বিদেশী*

প্রঃ—বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান-পরিষদে সেদিন (১২ই এপ্রিল,১৯৪২) আপনি বঙ্গ সংস্কৃতির লেন-দেন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন শুনিলাম?

উঃ— আলোচনাটা আমিই চালাইয়াছি বটে। কিন্তু কথাগুলা আমার নয়। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার "ক্যালকাটা রিভিউ" পত্রিকায় ১৯৪১ সনের এপ্রিল-সংখ্যায় একটা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

আমি তাহার বাঙ্‌লা তর্জমা করিয়াছি।[১]

সেটাই পড়া হইয়াছিল।

সংস্কৃতি কাহাকে বলে?

প্রঃ—প্রবন্ধটার নাম কী?

উঃ—"বেঙ্গলি কাল্‌চার অ্যাজ এ সিস্টেম অব মিউচুয়্যাল আক্‌কুলটুরেশনস্‌।"

*বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান-পরিষদের গবেষক ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় এম-এমহাশয়ের সহিত কোনো সংবাদপত্র-সেবীর প্রশ্নোত্তর। ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষৎ ও সমাজবিজ্ঞান-পরিষদের অবৃত্তিক গবেষক। বর্ত্তমানে (আগষ্ট, ১৯৪৪) তিনি ইন্ডিয়ান জুট মিল্‌স্‌ অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম লেবার-অফিসার, (মজুর-মঙ্গল বিষয়ক কর্মচারী)। রুশদিগের গল্প-সাহিত্য হইতে ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় কয়েকটা বাংলা তর্জমা প্রকাশ করিয়াছেন।

এই রচনা "বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন" সরকার-সম্পাদিত "আর্থিক উন্নতি" মাসিকে প্রথম বাহির হইয়াছিল (চৈত্র, ১৩৪৮ ; বৈশাখ, ১৩৪৯ , মার্চ-এপ্রিল ও এপ্রিল-মে, ১৯৪২)।

১. ইংরেজী প্রবন্ধটা তর্জমা করিবার সময় বিনয়বাবুর সঙ্গে অনেকবার মৌখিক আলোচনা করিযাছি। সেই সকল আলোচনার ফলে মূল প্রবন্ধটার ভিতর নাই এমন কথা কিছু-কিছু বাঙ্‌লা তর্জমার ভিতর বসাইয়া দিয়াছি। কিন্তু কোনো কথাই আমার নিজের নয়। সবই বিনয়বাবুর শব্দ ও যুক্তি। তর্জমার ভাষাটা যথাসম্ভব বিনয়বাবুর গ্রন্থাবলীর ভাষার অনুরূপ রাখিয়াছি। বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান-পরিষৎ ও বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের সভায় তর্কাতর্কির সময় তিনি যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার প্রভাবও তর্জমার ভিতর লক্ষ্য করা যাইবে।

মূল ইংরেজী রচনাটা বিনয়বাবুর " পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ্‌ সিন্স্‌ ১৯০৫ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের তৃতীয় খণ্ডে (লাহোর ১৯৪২) স্থান পাইয়াছে। ৫৩-৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।—ক্ষিতি মুখোপাধ্যায়।

প্রঃ—"আক্‌কুলটুরেশন" কী চিজ্‌?

উঃ—ইহা একটা নতুন শব্দ,—জার্মানিদের তৈয়ারী। আজকাল মার্কিন নৃতত্ত্বসেবী ও সমাজশাস্ত্রী মহলে চলে খুব বেশী। কোনো "কুলটুর", "কাল্‌চার", কৃষ্টি বা সংস্কৃতি অন্য কোনো কাল্‌চার বা সংস্কৃতির ভিতর প্রবেশ করিতে থাকিলে অথবা প্রবেশ করিয়া বসিলে দ্বিতীয় সংস্কৃতিটার অল্প-বিস্তর অথবা বেশ-কিছু রদ-বদল ঘটিতে থাকে। এই দুই সংস্কৃতি হইতে সংস্কৃতির নতুন গড়ন বা ছাঁচ গড়িয়া উঠে ইহাকে "সংস্কৃতীকরণ" বলা যাইতে পারে। তাহারই কথা আক্‌কুলটুরেশনের অন্তর্গত। কোনো দুই সংস্কৃতির মেলমেশের প্রণালীকে সহজে আক্‌কুলটুরেশন বলা যায়। "আক্‌কুলটুরেশন" সংসারে অহরহ ঘটিতেছে। সংস্কৃতী-করণ কাণ্ডটা নতুন-কিছু নয়।

প্রঃ—"মিউচুয়্যাল আক্‌কুলটুরেশন" কাহাকে বলে?

উঃ—পারস্পবিক সংস্কৃতীকরণ বা সংস্কৃতিকরণ বা সংস্কৃতি-বিনিময়। এক-তরফা দেওয়া নয়,—সঙ্গে-সঙ্গে কিছু-কিছু লওয়াও বটে। ইহারই সোজা নাম লেন-দেন। বিনয়বাবুর মতে বাঙালী জাতের সংস্কৃতিটা পুরাপুরি মৌলিক বা স্বাধীন চীজ নয়। ইহার ভিতর অ-বাঙালী মাল আসিয়া জুটিয়াছে বিস্তর। এই কথাটা একাল-সেকাল সকল কাল সম্বন্ধেই খাটে। খাঁটি স্বদেশী বা ষোল আনা দেশী চিজ্‌ যাঁহারা বাঙ্‌লার সমাজে সভ্যতায়, শিল্প-কর্মে, ধর্মজীবন, আচার-ব্যবহারে, এমন কি ভাষায়ও ঢুঁড়িতে চান, তাঁহারা বিনয়বাবুর মতে হতাশ হইতে বাধ্য। বাঙ্‌লার নরনারী আত্মিক হিসাবে কতখানি স্বদেশী আর কতখানি বিদেশী, তাহার বিশ্লেষণই সেই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রঃ—বাঙালী জাতের নিজ মাথা বা আত্মা হইতে স্বাধীনভাবে উদ্ভাবন-করা কোনো জিনিষই কি বাঙ্‌লার সভ্যতায় পাওয়া যায় না?

উঃ—যাইবে না কেন? তবে সর্বদাই—সকল যুগেই,—আর সকল জেলায়ই দেশী ও বিদেশী দুই শক্তিই দেখিতে হইবে। বঙ্গসংস্কৃতি আগাগোড়া দো-আঁস্‌লা মাল।

প্রঃ—এইবার তাহা হইলে বঙ্গ-সংস্কৃতির দেশী-বিদেশী-সম্বন্ধে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিন।

উঃ—দুএকটা নয়। অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে : একখানা পাঁচশ' পৃষ্ঠব্যাপী বই লেখাও সম্ভব। তবে বিনয়বাবুর প্রবন্ধটা মাত্র আট-দশ পৃষ্ঠায়ই খতম। কিন্তু তাহাতে যে-কোনো গবেষক পাঁচশ' পৃষ্ঠায় বই সম্পূর্ণ করিবার মতন তথ্য, ইসারা ও যুক্তি পাইবেন। এই ধরণের বই লেখানো বিনয়বাবুর মতলবও বটে।

বিনয়বাবু প্রথমে সংস্কৃতি কাহাকে বলে, তাহা বুঝাইয়াছেন। এই বিষয়ে তাঁহার মত সাধারণ্যে প্রচলিত মত হইতে পৃথক্‌।

প্রঃ—কেন? সংস্কৃতি, কৃষ্টি, কাল্‌চার তো অতি সোজা কথা। তাহার ব্যাখ্যায় আবার বিশেষত্ব কী?

উঃ—এই বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। বিনয়বাবুর মতটা নিম্নরূপ।[১]

সংস্কৃতি ও সভ্যতা একই কথা এবং উভয়েরই অর্থ নয়া-নয়া সৃষ্টি বা আত্মপ্রকাশ। যে-কোনো সৃষ্টি,— সে ভালই হউক বা মন্দই হউক,—সংস্কৃতির ভিতর পড়ে। কিন্তু

১ "কালচাব"'-সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ মিশন-কর্তৃক প্রকাশিত "প্রবুদ্ধ ভারত" মাসিকে বিনয় সরকারের "ইণ্ডিয়াজ্‌ ঈপক্‌স্‌ ইন্‌ ওয়ার্লড-কালচার" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর, ১৯১৪)।

সৃষ্টি-কার্য কাহাকে বলে? চাষ-আবাদও সৃষ্টি, ছবি আঁকাও সৃষ্টি, লড়াই করাও সৃষ্টি, দলবাঁধাও সৃষ্টি, মন্তর আওড়ানোও সৃষ্টি, গ্যাস-বিষ তৈয়ারী করাও সৃষ্টি। এই বিষয়ে বিনয় বাবুর আসল জিজ্ঞাস্য নিম্নরূপ ঃ—মানুষের কাজকর্মের পশ্চাতে কোন্ প্রেরণা বা ঝোঁক দেখিতে পাই? পৃথিবীকে প্রভাবান্বিত করিবার আকাঙক্ষা, দুনিয়ার উপর একতিয়ার কায়েম করিবার ইচ্ছা, সংসারে প্রভুত্ব চালাইবার বাসনা—এই সব ইচ্ছাই সৃষ্টি-কার্যের গোড়ার কথা। একমাত্র ইচ্ছা থাকিলেই কাজ হয় না। চাই শক্তি, চাই ক্ষমতা। মানুষকে প্রভাবান্বিত করিবার ক্ষমতা, জগৎকে তাঁবে আনিবার যোগ্যতা, মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার শক্তি,—এই সবও মানুষের সৃষ্টি-কার্যের গোড়ার কথা। সহজে বলা চলে যে, কোনো জিনিষকে উল্টাইয়া-পালটাইয়া ভোল বদলাইয়া দেওয়ার নামই সৃষ্টি, কৃষ্টি বা সংস্কৃতি। আধিপত্য করা, কর্তৃত্ব চালানো প্রভৃতি কাজ সংস্কৃতির অঙ্গ ,—অঙ্গ শুধু নয়, সংস্কৃতির প্রাণ।

অতএব সংস্কৃতি বা সভ্যতা বলিলে বুঝিব কতকগুলা প্রভাব বিস্তার। কোনো লোকের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িলে আশে-পাশের লোকগুলা নতুন-নতুন পথে চিন্তা ও কর্ম করিতে থাকে। ইহারই নাম মতান্তর-গ্রহণ, পথ-পরিবর্তন, দলে আনা ইত্যাদি। ধর্মের বেলায় যাহাকে "কনভার্শন" (নতুন ধর্মে দীক্ষা) বা পরধর্ম-গ্রহণ বলে তাহাকে সহজে বলিব সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠা বা প্রভাব বিস্তার। সংস্কৃতি বলিলে এইরূপ মত-সৃষ্টি, মতান্তর-গ্রহণ, পথান্তর-প্রতিষ্ঠা, পরধর্ম-স্বীকার ইত্যাদিও বুঝিব। এক কথায়, সংস্কৃতি বিজয়লাভেরই প্রতিশব্দ। জীবনের বিস্তার , দিগ্বিজয়-সাধন, জগতে আধিপত্য-প্রতিষ্ঠা,—এই সব সংস্কৃতি বা সভ্যতার নামান্তর মাত্র। সু-কু সবই সংস্কৃতি, সৃষ্টি, আত্ম প্রকাশ বা দিগ্বিজয়ের অন্তর্গত। মানুষের কাজের ভিতর কিছুই ফেলিতব্য চিজ্ নয়।

বিনয়বাবুব বিশ্লেষণে,—পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিই প্রথমতঃ রূপ নেয় সামরিক ও রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়তঃ প্রকাশ পায় সাহিত্যে, বিজ্ঞান, ধর্ম, নীতি, আর্থিক ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থায়। এই সবের কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে তাহার বিচাবে সম্প্রতি সময় কাটাইবার দরকার নাই। বঙ্গ-সংস্কৃতির রূপগুলাও ঠিক এই দুই রকমেরই। বাঙালীর দিগ্বিজয় দেখিতে পাই প্রথমতঃ লড়াইয়ের কাজে ও রাজনৈতিক জীবনে। তাহা ছাড়া জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিদ্যা, কলা, ধর্মপ্রচার, নৈতিক জীবন। আর্থিক কাজকর্ম আব সমাজ-গঠনেও বাঙালী জাত যুগে-যুগে দিগ্বিজয়ী হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম বাঙ্‌লায় বিদেশী

প্রঃ—বাঙালী জাতিকে দিগ্‌বিজয়ী সপ্রমাণ করা সম্ভব কি? কথাটা নতুন রকমের সন্দেহ নাই।

উঃ—নিশ্চয়। মহাভারতের লেখকেরা বাঙালীকে জবরদস্ত্ যোদ্ধার জাতি বলিয়াই চিনিত। হাজার-হাজার বছর ধরিয়া বাঙালীরা উত্তর ভারত হইতে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাগুলাকে কিছু-কিছু প্রাক্-বৈদিক ও প্রাক্-মহেঞ্জোদাড়ীয় বিবেচনা করা চলিতে পারে। কতকাংশ হয়ত বৈদিক ও মহেঞ্জোদাড়ীর যুগের অন্তর্গত। তাহার পরবর্তী বহু যুগের ঘটনাও মহাভারতের ভিতর আছে সন্দেহ

নাই। মহাভারত বইটার বিভিন্ন অংশ বর্তমান আকারে কবে "লেখা" হইয়াছে তাহার কথা বলিতেছি না। এই বইয়ের ভিতরকার লোকগুলা কখন ভারতের নানা স্থানে চলাফেরা করিয়াছে সেই কথাই বলিতেছি। জানিয়া রাখা ভাল যে, মহাভারতের সার্টিফিকেট মাফিক বাঙালীরা লড়াই-দক্ষ বীর জাত। বঙ্গমাতা বীর-প্রসবিনী। মহেঞ্জোদাড়ীয় সভ্যতার কাল হইতে বুদ্ধদেবের আমল পর্যন্ত যে বঙ্গ-সংস্কৃতি গড়িয়া ওঠে, তাহা বলা বাহুল্য নানা প্রকার অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, কর্ম, চিন্তা ও আদর্শের সমষ্টি। সে সবই "দিগ্‌বিজয়ের" নিদর্শন, কেন না বিনয়বাবুর মতে সংস্কৃতি = সৃষ্টি (বা আত্মপ্রকাশ) = দিগ্‌বিজয়।

কিন্তু এই সকল রীতি-নীতি ও লেন-দেন যে-সকল "দিগ্‌বিজয়ী" বাঙালী আবিষ্কার, সৃষ্টি বা উদ্ভাবন করয়িাছিল তাহারা কে? বর্তমান যুগের পরিভাষায় তাহারা নানা শ্রেণীর পারিয়া, ইতর, অস্পৃশ্য ও অনার্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সে সকল সংস্কৃতি-প্রবর্তক বঙ্গ-সন্তান সেকালের মাপকাঠিতে "ছোটোলোক" বা "হরিজন" মাত্র বিবেচিত হইত। তথা-কথিত "ইন্দো-আরিয়ান" বা "আর্যেরা" বাঙালীজাতকে "বয়াংসি" অর্থাৎ চিড়িয়ামাত্র সম্‌ঝিতে অভ্যস্ত ছিল। বৈদিক সাহিত্যের ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া শতপথ ব্রাহ্মণ পর্যন্ত নানা স্থানে বাঙ্‌লার নরনারীকে কাক-পায়রা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

আজকালকার দিনে পাহাড়ে, বন-বাদাড়ে, নদী-উপত্যকায় যে-সকল আদিমবাসী দেখা যায় তাহারা এবং অন্যান্য অস্পৃশ্য বা অনুন্নত জাতি, এই প্রাক্‌-বৈদিক ও প্রাক্‌-বৌদ্ধ যুগের বাঙালীদেরই বংশধর বা সম-জাতীয় মাসতুত ভাই বিশেষ। অধিকন্তু সেকালের অস্পৃশ্য ও অনুন্নত জাতির কতকাংশ ঘটনাচক্রে একালের তথাকথিত উচ্চ জাতি বনিয়া গিয়াছে অথবা উচ্চ জাতির সঙ্গে মিশিয়া রহিয়াছে। এই উচ্চ জাতির কতক অংশ সেই বৈদিক যুগের বাঙালী চিড়িয়া, কাক ও পায়রারই এক গোষ্ঠীর অন্তর্গত। দেখা যাইতেছে যে, তথাকথিত ছোটলোকগুলা সংস্কৃতির স্রষ্টা হিসাবে বেশ-কিছু উল্লেখযোগ্য।

কি সেকাল, কি একাল, সকল যুগেই অনা[illegible] বাঙালীর ভিতর হিমালয়ের নেপালী, তিব্বতী, ভুটিয়া, চীনা ইত্যাদি নরনারীর হাড়মাস ও সংস্কৃতি দেখিতে হইবে। তাহা ছাড়া আসামী, মগ, বর্মী ইত্যাদি জাতের দান নগণ্য নয়। অধিকন্তু, মুণ্ডা, ওরাওঁ, সাঁওতাল, কোল, ভিল, উড়িয়া ইত্যাদি জাত ও অনার্য-পারিয়া বাঙালীর সঙ্গে মিশিয়া আছে।

নৃতত্ত্ব বিদ্যার অন্তর্গত শারীরিক মাপজোকের সাহায্যে সেকালের বাঙালীর হাড়মাসের সঙ্গে একালের বাঙালীর হাড়মাসের এই সকল যোগাযোগ দেখানো এবং সম্বন্ধ-প্রতিষ্ঠা এখনো খুব সহজ ব্যাপার নহে। কেননা মাথা-চোখ হাত-পা ইত্যাদি লইয়া তুলনায় জরীপ করার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখনো বড়-বেশী চালানো হয় নাই। অধিকন্তু বর্তমানের আলোচনায় রক্তসংমিশ্রণ, বর্ণসঙ্কর, আকৃতিগত মিল, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গড়াত-মত সাদৃশ্য ইত্যাদির সমস্যা লইয়া মাথা ঘামানো হইতেছে না। আলোচনা হইতেছে সংস্কৃতি সম্বন্ধে। ভাষা, সাহিত্য, রীতিনীতি, আচার-সংস্কার, খাওয়া-পরা, ধর্ম-কর্ম, দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ ইত্যাদি বস্তু হইল সংস্কৃতি বা কৃষ্টি ও কালচারের অন্তর্গত। বর্তমান আলোচনায় সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের মাল বিশ্লেষিত হইতেছে,—আকৃতিক নৃতত্ত্বের তথ্য নয়। আকৃতি হিসাবে বাঙালীর দো-আঁস্‌লা কিনা আলোচিত হইতেছে না। বলা হইতেছে যে, বাঙালীর সংস্কৃতিটা পূরা-দস্তুর দো-আঁস্‌লা।

প্রঃ—এই ত গেল অতি-প্রাচীন যুগের কথা,—বৌদ্ধকাল পর্যন্ত। তাহার পর?

উঃ—মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত (খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী) হইতে সেনবংশ পর্যন্ত হাজার দেড়েক বছরও বাঙ্‌লা দেশ রাষ্ট্রিক হিসাবে বহুকালই স্বাধীন ছিল। এই যুগের অধিকাংশ সময় বাঙ্‌লাদেশ উত্তর ভারতের তাঁবে-দারিতে ছিল না। অবশ্য মৌর্য ও গুপ্তদের সময়ে কিছু-কালের জন্য বাঙ্‌লাকে রাষ্ট্রিক পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

এইবার সংস্কৃতির অবস্থা বিশ্লেষণ করা যাউক। তাহাতে বঙ্গ-সংস্কৃতির স্বাধীনতা ও দিগ্‌বিজয় প্রমাণিত হইবে। প্রথমে জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, ভারতজয়ী ও বিশ্বজয়ী হিন্দুদেব ভাষা সংস্কৃত। এই ভাষাটাকে বলে "আর্য"। কিন্তু পূর্ব ভারতের (বঙ্গ-বিহারের) লোকেরা সংস্কৃত বুঝিত না বলিয়া ইহাদিগকে চিড়িয়া বলা হইত: যাহারা পাখীর মতন কিচির-মিচির করে আর সংস্কৃত বুঝে না তাহারা অনার্য। বাঙালীরা এই হিসাবে অনার্য। এই চিড়িয়াদের দেশে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের আর্য (অর্থাৎ বৈদিক) ধর্ম ও সংস্কৃতি কবে প্রথম আমদানি হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা যায় না। বাঙ্‌লাভাষী লোকগুলির মগজে জবরদস্ত্ বৈদিক সংস্কৃতি, ইন্দো-আরীয় (আর্য) সভ্যতা ও হিন্দুত্ব ঢুকাইতে অনেক সময় লাগিয়াছে। বাঙালী জাতকে হিন্দু-সংস্কৃতি-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে কম বেগ পাইতে হয় নাই। বুঝিতে হইবে, চিড়িয়া-জাতীয় বাঙ্‌লায় অনার্য নরনারীর বৈদিক অথবা তথাকথিত ইন্দো-আরীয় সভ্যতা মাফিক্ সংস্কৃতিকরণ নেহাৎ "মধুর বহিবে বায়, বেয়ে যাব রঙ্গে"-রূপে ঘটে নাই।

কতকগুলা নরনারীকে এক সংস্কৃতি হইতে আরেক সংস্কৃতিতে টানিয়া আনা নেহাৎ দু'একদিনে ঘটিযা উঠে না। সংস্কৃতিকরণ বহুকাল-সাপেক্ষ। ধর্মের আসরেও কোনো জনপদের পক্ষে নতুন ধর্মে দীক্ষা লওয়ার মামলা সহজে নিষ্পন্ন হয় না। পরধর্ম-গ্রহণের কাণ্ডে অনেক দিন লাগে। বাঙ্‌লার "হরিজন"রা খুব সহজে বিদেশী সংস্কৃতির খপ্পরে পড়ে নাই। পাঞ্জাবী ও কনৌজীয়দের হিন্দুধর্ম এবং বিহারীদের বৌদ্ধধর্ম বাঙালীদের হাতে যথেষ্ট বাধা পাইয়াছিল। বাঙালীরা তাহাদের স্থানীয় দেবদেবী, আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতি লইয়া মসগুল থাকিত। এই সবের সাহায্যে তাহারা অবাঙালী ও বিদেশী ধর্ম দুইটাকে নতুন ছাঁচে ঢালিযা লইয়াছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে হয়ত আর্য বা হিন্দুধর্মের নল-নল্‌চে দুইই বদ-লইয়া গিয়াছে। ইহা পারিয়া অনার্য বাঙালী জাতের পক্ষে প্রকাণ্ড দিগ্‌বিজয়।

প্রঃ—বিনয়বাবু কি বলিতে চাহেন যে, পৃথিবীর নানা দেশে অনেক লোক যেমন খৃষ্ট-ধর্মে আর মুসলমানধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত "কন্‌ভার্ট" (পরধর্মাবলম্বী), বাঙালীরাও সেইরূপ হিন্দুধর্মে "কন্‌ভার্ট"?

উঃ—ঠিক তাই। বাঙালী হিন্দুরা পরধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত "কন্‌ভার্ট" মাত্র। ইংরেজ খৃষ্টিয়ানরা, ফরাসী খৃষ্টিয়ানরা, মিশরের মুসলমানরা, ইরানের মুসলমানরা যেমন পরধর্মে দীক্ষিত লোক, বাঙালী হিন্দুরাও অবিকল তাই। সর্বত্রই "কন্‌ভার্শনের" (পরধর্মাবলম্বনের) খেলা।

হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্ম সেকালের বাঙ্‌লার "অনার্য" নরনারীর পক্ষে বিদেশী মাল্। কিন্তু বাঙালী জাত্ এই বিদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বশে আনিয়াছিল। তথাকথিত আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি অনার্য বাঙালীর প্রভাবে পড়িয়া অনার্যীকৃত হইয়াছে। ইহাকে বলিব অবাঙালী সংস্কৃতির বাঙালীকরণ। হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম অনায়াসে

বাঙালীদের জয় করিয়া লইতে পারে নাই। বাঙালী ধর্মের, নিকটও ইহাদেরমাথা নোআইতে হইয়াছি। সন্ধি হইয়াছে। 'পারিয়া' অর্থাৎ অনার্য বাঙালী বা কাক ও পায়রাজাতীয় নরনারীর সংস্কৃতি ও ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ও বৌদ্ধধর্মের একটা বোঝাপড়া বা আপোষ, সমঝৌতা বা সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। ইন্দো-আরিয়ান বা আর্য-ধর্ম যেমন বাঙ্‌লা দেশকে জয় করিয়াছে বাঙালী ধর্মও তেমনি উহাকে নাজেহাল করিয়াছে। জয়টা একতরফা হয় নাই—ধর্মান্তর বা মতান্তর গ্রহণটা হইয়াছে পারস্পরিক। অনার্যের আর্যকরণ আর আর্যের অনার্যকরণ দুই-ই সেকালের বঙ্গ-সংস্কৃতির ভিতরে এক সঙ্গে দেখিতে হইবে। ইহার ভিতর কোন্‌টা বেশী কোন্‌টা কম তাহার তুলনায় আলোচনা সূক্ষ্ম বিচারের উপর নির্ভর করিবে। আসল কথা,—বঙ্গ-সংস্কৃতি দো-আঁস্‌লা মাল।

প্রঃ—বাঙালী জাত্‌কে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত ("কন্‌ভার্ট") করার কারবারে কোনো বিশেষত্ব আছে কি?

উঃ—বাঙ্‌লাদেশের খুব বেশী-লোককে পরধর্ম (হিন্দুত্ব) স্বীকার করানো সম্ভব হয় নাই। অসংখ্য নরনারী অহিন্দু, অর্থাৎ বাঙালী বা অনার্য রহিয়া গিয়াছিল।

"কন্‌ভার্শন" কারবারটা বেশ-কিছু অসম্পূর্ণ এবং আংশিক ছিল। এই সম্বন্ধে নিরেট প্রমাণ খাড়া করা সম্প্রতি সহজ নয়। অনেক গবেষক এই বিদ্যার ক্ষেত্রে লাগিয়া থাকিলে ভাল হয়। প্রশ্নটা একদিকে যেমন ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের অন্তর্গত, অপর দিকে ইহার ভিতর নেতৃত্ব ও সমাজবিজ্ঞান আসিয়া পড়ে। পৃথিবীর সর্বত্রই এক ধর্ম হইতে আর এক ধর্মে দীক্ষিত করার কারবার অসম্পূর্ণ ও আংশিক থাকিয়া যায়।

বাঙ্‌লা দেশের ভিতর বৈদিক মতে হিন্দুকরণ এবং বৌদ্ধকরণ সাধিত হইতে অনেক বাধা ছিল। অধিকন্তু সকল অঞ্চলে সমান মাত্রায় আর্য-করণ সম্ভব হয় না। বিঘ্ন ছিল নানা রকমের। দেশে লোকের বসতি খুব ঘন ছিল না। একস্থান হইতে অন্য স্থানে দূরত্ব ছিল অনেক। বনবাদাড়, প্রচণ্ড নদী, পথ ঘাটের অভাব, সব-কিছু মিলিয়া "আন্তর্মানবিক" সম্বন্ধটা বিস্তৃত ও নিবিড়ভাবে গড়িয়া উঠিতে দেয় নাই। কাজেই আর্য-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় পদে-পদে বাধা পাইতে থাকে. ধর্ম-প্রচারের বাধা বিপত্তি দূর করিবার মতন কলাকৌশল তখনকার দিনের আর্য, বৈদিক বা হিন্দু মিশনের অর্থাৎ প্রচার-প্রতিষ্ঠানের ছিল না। বস্তুতঃ প্রচারকার্যটা সাধু-সন্ন্যাসী-পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় যা কিছু হইয়াছে---কোনো প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় সাধিত হইয়াছে কিনা বলা কঠিন। লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের সংখ্যা কম ছিল। কাজেই প্রচার-কার্যটা কাগজপত্রে তত হয় নাই, যতটা হইয়াছে মুখে-মুখে। বৌদ্ধধর্মের প্রচারে হয়ত খানিকটা প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব দেখিতে হইবে।

সেনবংশের পরবর্তী কালসম্বন্ধেও কোনো-কোনো বিষয়ে এই সব কথাই খাটিবে। ষোড়শ শতাব্দী (আকবরের সময়)—ষোড়শ শতাব্দী কেন, বলিতে গেলে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্‌লা-দেশের ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থা প্রায় পূর্ববৎই থাকে। মোটের উপর এই হাজার দুই-আড়াই বছরে লোক-সংখ্যা বাড়িয়া চলে। দিনের পর দিন মানুষে-মানুষে, গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে ভাবের আদান-প্রদান কতকটা সহজ হইতে থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া আদান-প্রদানের এইরূপ প্রগতি বা বাড়্‌তি দেখা যায়। কিন্তু এই বাড়্‌তির মাত্রাটা বড় বেশি উঁচু নয়। ঊনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীর আবহাওয়ায় লোকে-লোকে মেলামেশা, লেনদেন ও যোগাযোগ অতি উঁচুমাত্রায় ও বিপুল

বহরে সাধিত হইতেছে। সেই বহরের ও সেই মাত্রার মেলা-মেশা, লেন-দেন ও যোগাযোগ বুদ্ধ হইতে রামমোহন পর্যন্ত হাজার দুই-আড়াই বছরের ভিতর ঘটিয়া উঠে নাই—ইহা প্রথমেই স্বীকার করিয়া লওয়া আবশ্যক। কাজেই হিন্দু-ধর্ম বা আর্য-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয়, আর্যের বাঙালীকরণ, বাঙালীর আর্যীকরণ ইত্যাদি "আন্তর্মানুষিক" যোগাযোগগুলা সুবিস্তৃত অথবা গভীর আকারে দেখা দেয় নাই।

বাঙ্‌লার মুসলমান

প্রঃ—বিনয়বাবু হিন্দুধর্মকে বাঙালীর পক্ষে বিদেশী ধর্ম বিবেচনা করেন দেখিতেছি। এই হিন্দুধর্মকে বাঙালী ধর্ম জয় করিয়াছে। তাঁহার মতে ইহা একপ্রকার দিগ্‌বিজয়। কিন্তু বঙ্গসমাজে ইস্‌লামের ঠাঁই কিরূপ? মুসলমান ধর্মের বেলায় বাঙালী ধর্ম দিগ্‌বিজয়ী হইতে পারিয়াছে কি?

উঃ—পারিয়াছে। নয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরে বিজয়-কেতন ওড়ানো বাঙালীর স্বভাবসিদ্ধ। বক্তিয়ার খিল্‌জী হইতে সিরাজদ্দৌলার সময় পর্যন্ত মধ্য যুগের ওই সাড়ে পাঁচ-শ' বছর ধরিয়াও সব জায়গায় বঙ্গ-সংস্কৃতির সাম্রাজ্য নানা শ্রেণীর ও নানা জাতের নরনারীর জীবনে বেশ-কিছু প্রকট ছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই সময় বঙ্গদেশ দিল্লীর সঙ্গে অর্থাৎ উত্তর-ভারতের সঙ্গে মাত্র পঁচাশী বৎসরের জন্য সংযুক্তত ছিল। অর্থাৎ সমগ্র মুসলমান-আমলে অতি সামান্য সময় মাত্র বঙ্গদেশের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের সাক্ষাৎভাবে রাষ্ট্রিক যোগাযোগ ছিল। বাঙালী জাত চিরকালই স্বাধীন। বাঙালীর এই স্বাধীনতার ধারা অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

যাহা হউক, ধর্মও সংস্কৃতি-সম্বন্ধে এই যে,—১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঙ্‌লার অনেক লোক অহিন্দু ও অবৌদ্ধ ছিল। বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গ-সম্বন্ধে ইহা আরও বেশি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইবে হাজার দেড়েক বৎসরের প্রচারের ফলেও "সমগ্র" বাঙালী জাতি এই দিগ্বিজয়ী হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের আওতায় আসিয়া পড়ে নাই। সকল ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির হিন্দুকরণ বা আর্যীকরণ পাইকারী হিসাবে সাধিত হয় নাই। অনেক সময়েই আবার তাহাদের পক্ষে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম-গ্রহণ নামেমাত্র চলিয়াছিল। এই কথাটা শক্ত মুঠায় পাকড়াও করা আবশ্যক।

এই প্রসঙ্গে দুনিয়ার খৃষ্ট ও ইস্‌লাম ধর্ম-প্রচারের কথা ধরা যাউক। আমরা জানি যে, ইয়োরামেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার খৃষ্ট ও ইস্‌লাম ধর্মের প্রচার হইয়াছে। কিন্তু এই ধর্মপ্রচারের ফলে কোনো জনপদেই রাতারাতি সমগ্র জাতের ধর্মান্তর ঘটে নাই। যাহা ঘটিয়াছে, তাহাও পরিমাণে বেশি নয়। ঐ সকল দেশের অনেকলোক এখনও নিম্‌-খৃষ্টিয়ান ও নিম্‌-মুসলমান। বাঙ্‌লা-দেশের হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম-সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা খাটে। ইন্দো-আরিয়ান ধর্মের প্রচারেরপরেও দেশের অনেক লোক অহিন্দু ও অবৌদ্ধ অর্থাৎ সংস্কৃতি-হিসাবে "অনার্য" রহিয়া গিয়াছিল। আধা-হিন্দু ও আধা-বৌদ্ধের সংখ্যাও কম ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও আর্য-সংস্কৃতির দিগ্বিজয়ের এই "ঢিমা তেতালা" ভাবটা মালুম হয়। তখনও সেই দিগ্বিজয়ের বহরটা বেশি ছিল না, তখনও পাহাড়—জঙ্গলবাসী অনেক "চিড়িয়া"কে আর্যধর্মে আনা বাকী রহিয়া গিয়াছে। বিনয়বাবু

বলেন যে, সেনবংশের সময়ে বাঙ্‌লা-দেশের সমস্ত বা অধিকাংশ লোক হিন্দু কিংবা বৌদ্ধ হইয়াছে বলিলে ভুল হইবে। তখনও বাঙ্‌লা-দেশে এমন অনেক লোক ছিল, যারা হিন্দুও হয় নাই, কিংবা বৌদ্ধও বনিয়া যায় নাই। তখনও অসংখ্য লোক ছিল বঙ্গ-ধর্মী, অর্থাৎ বাঙালী মাত্র।

এই আলোচনার ভিতর বিনয়বাবুর যেখানে-সেখানে "আর্য" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, সেই সকল স্থানে আর্য ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বুঝিতে হইবে। কোথাও কোনো নির্দিষ্ট রঙের, চুলের বা মুখাকৃতির নরনারী বুঝিয়ে হইবে না। আর্য শব্দটা ভাষা-বিষয়ক,— শরীরের গড়ন-বিষয়ক নয়। কাজেই বিনয়বাবুর পারিভাষিকে "অনার্য" শব্দের অর্থ যে-লোকটা সংস্কৃত ভাষা জানে না, সেই লোক। আর্য ধর্মের অর্থ সংস্কৃত ভাষায় যে সকল নরনারী কথা বলে, তাহাদের ধর্ম বা সংস্কৃতি। ধর্মের সঙ্গে-সঙ্গে সর্বত্রই কৃষ্টি আর সংস্কৃতিও সমঝিতে হইবে।

বাঙ্‌লাদেশের বিভিন্ন জনপদে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের দিগ্বিজয়ের আকার-প্রকার ও বহর সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন। সেন-আমলের হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের যথার্থ পরিধি ও প্রভাব-সম্বন্ধে যাহা-কিছু বলা হইল, তাহা এখনও বহু গবেষণা-সাপেক্ষ। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের এবং সংস্কৃতির বাঙালীকরণ সম্বন্ধে যথোচিত খোঁজ চালানো হয় নাই। বিনয়বাবু বলেন যে, এই দিকে পঠন-পাঠন ও অনুসন্ধান আবশ্যক। বাঙালী জাত কবে, কোথায়, কতখানি আর্যীকৃত হইয়াছিল, তাহার একটা তথ্যনিষ্ঠ খতিয়ান হাওয়া দরকার। বিশেষতঃ ত্রয়োদশ-শতাব্দীর প্রথমদিকে বাঙ্‌লাদেশের আর্যীকরণের সীমানা ও চৌহদ্দি-সম্পর্কে টন্‌ট'নে জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে ঠারে-ঠারে ধরিয়া লওয়া যায় যে, সেকালের বঙ্গ-সমাজের নানা কেন্দ্রে অনেকগুলা অহিন্দু বা নিম্‌-হিন্দু এবং অনেকগুলা অবৌদ্ধ বা নিম্‌-বৌদ্ধ পরিবার আদিম অনার্য চিড়িয়া-শ্রেণীর লেন-দেন ও রীতি-নীতি লইয়াই জীবনধারণ করিত। এই আবহাওয়ার ভিতর ইস্‌লাম আসিয়া দেখা দিল।

প্রঃ—বিনয়বাবুর মতে তাহা হইলে বাঙ্‌লাদেশে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিল কাহারা?

উঃ—ত্রয়োদশ-শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ-শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের ভিতর এই সকল অহিন্দু ও অবৌদ্ধদের কেহ-কেহ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। ঐতিহাসিক তথ্যের জোরে প্রমাণ করা সুকঠিন যে, মুসলমানদের জোরজবরদস্তিতে লাখ-লাখ হিন্দু ও বৌদ্ধ ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। বোধ হয়, হিন্দু বা বৌদ্ধদের মধ্যে খুব কম লোকই মুসলমান হইয়াছে। অনেকের ধারণা,—হিন্দু সমাজের উচ্চজাতির অত্যাচার-উৎপাতে বিরক্ত হইয়া তথাকথিত নীচজাতিরা দলকে-দল মুসলমান হইয়া যায়। বিস্তৃত ক্ষেত্রে এইরূপ দলে-দলে ধর্মান্তর-গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। কি না সন্দেহ। হিন্দু-বৌদ্ধের উপর মুসলমানের আর অব্রাহ্মণদের উপর ব্রাহ্মণদের উৎপাত হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই বোধ হয় এই নালিশ ভিত্তিহীন। রাষ্ট্রিক, সামরিক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ধুরন্ধরদের মধ্যেই সাধারণতঃ হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে। এইরূপ ধরিয়া লওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সকল শ্রেণীর বাহিরের নরনারী অহিন্দু ও অবৌদ্ধ রহিয়া যায়। ইহাদের অনেকের উপর আর্যধর্মের ও আর্যসংস্কৃতির প্রভাবটা ভাসা-ভাসা রকমের ছিল। এই সকল অহিন্দু ও ভাসা-ভাসা হিন্দু, অবৌদ্ধ ও ভাসা-ভাসা-বৌদ্ধ অর্থাৎ নিম্‌-আর্যীকৃত

নরনারীর ভিতরেই ইস্লাম ধর্মের প্রচারটা সাধিত হয়,—মোটামুটি এইরূপ ধরিয়া লইতে হইবে। এই হিসাবে পূর্ববঙ্গের ঠাঁই উঁচু।

দেখিতেছি, এইবার আমরা সংখ্যাতত্ত্ব বা স্ট্যাটিস্টিক্সের আওতায় আসিয়া পড়িলাম। এই সকল বিতর্কে চুলচেরা হিসাব করিয়া দেখানো প্রয়োজন,—ঠিক কতজন লোক, কতটি পরিবার কোন্-কোন্ জেলায় হিন্দু, বৌদ্ধ বা ইসলাম ধর্ম মানিয়া লইয়াছে। কিন্তু এইসব চুলচেরা হিসাব করিবার দিকে আজ পর্যন্ত ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ মাথা খেলান নাই। মাথা খেলানো সহজও নয়। কাজেই এই সকল ব্যাপারে মাথা না ঘামাইয়া সেনবংশের সময়কার সকল বাঙালীকেই হিন্দু বা বৌদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া রেওয়াজ রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, সমাজবিজ্ঞানের তরফ হইতে এ সিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া যায় না। ধর্মান্তরগ্রহ বা সংস্কৃতীকরণ সামাজিক বা "আন্তর্মানুষিক" মেলামেশা-বিষয়ক প্রক্রিয়া। এই সম্বন্ধে যে-সকল পণ্ডিত বিশ্লেষণ চালাইতে অভ্যস্ত তাহাদের পক্ষে সেন-আমলের প্রত্যেক বাঙালীকে সোজাসুজি হিন্দু বা বৌদ্ধ সমঝিয়া রাখা সম্ভবপর নয়। বাঙালী জাতের মুসলমান-যোগাযোগ সম্বন্ধে ইহাই হইল বিনয়বাবু অতি-বড় কথা। এইজন্য বারে-বারে এই কথাটা উল্লেখ করা আবশ্যক।

প্রঃ—যাহা হউক, অহিন্দু ও অবৌদ্ধ অর্থাৎ "অনার্য" বাঙালীরা মুসলমান ধর্মের ও সংস্কৃতির উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? বাঙালীর ইস্লাম-বিজয়ের লক্ষণ কী কী?

উঃ—বাঙালীর সৃষ্টিশক্তি ইস্লামকেও সহজে পথ ছাড়িয়া দেয় নাই। হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের মতো ইস্লামকেও বাঙালীদের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই সকল ক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতিও বুঝিয়া রাখিতে হইবে। অহিন্দু ও অবৌদ্ধদেরকে মুসলমান-বানানোর আর একটা বাধা আসিল চৈতন্যের বৈষ্ণব-ধর্মের ভিতর দিয়া। সেই সময়কার অনেক অহিন্দু ও অবৌদ্ধদের ভিতর কেহ-কেহ গ্রহণ করিল বৈষ্ণব-ধর্ম, কেহ-কেহ গ্রহণ করিল ইস্লাম। বাঙালী ধর্মও সংস্কৃতি এবং অবাঙালী হিন্দু, অবাঙালী বৌদ্ধ ও অবাঙালী মুসলমান ধর্মের ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে দেখা দিল সেখ শুভোদয়া, কবিকঙ্কন চণ্ডী, রাধা-কৃষ্ণের গান ইত্যাদি সাহিত্য। দেখা যাইতেছে যে, এই সময়ে অবাঙালী ধর্ম বা সংস্কৃতি তিন প্রকারের—হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুস্লিম। এই তিন অবাঙালী ধর্ম একই সঙ্গে চলিতেছে। কিন্তু এই তিন বিদেশী সংস্কৃত প্রত্যেকেই বাঙালীর খাঁটি স্বদেশী অর্থাৎ আদিম পারিয়া ও চিড়িয়া-জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বুঝাপড়া চালাইতেছে। বাঙ্লাদেশে এই উপায়ে দেশী ও বিদেশী সংস্কৃতিগুলার উপর স্বদেশী সংস্কৃতির প্রভাব গভীরভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রাচীনকালের মতো মধ্যযুগের বঙ্গ-সংস্কৃতির ভিতর দো-আঁস্লা কৃষ্টির আসর গুলজার ছিল। দো-আঁস্লামি সনাতন চিজ।

হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইস্লাম সংস্কৃতি ও ধর্মের উপর খাঁটি বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতি যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত সেকালের বাঙ্লা সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাই। সেখ শুভোদয়া গ্রন্থে আছে ইস্লামের উপর আদিম বঙ্গ-সংস্কৃতির ছাপ। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ইস্লাম ও বঙ্গ-ধর্মের সমঝৌতা পরিস্ফুট। সঙ্গে-সঙ্গে চলিতেছে বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে অবাঙালী হিন্দু ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির দহরম-মহরম। বৈষ্ণব সাহিত্য রাধা-কৃষ্ণের গানের সমুদ্র বিশেষ। এই সকল প্রেম সঙ্গীতের ভিতর মামুলি স্বদেশী অর্থাৎ পারিয়া ও "অনার্য" জনসাধারণের চিত্ত তথাকথিত আর্য, হিন্দু বা বৌদ্ধ-সংস্কৃতিকে

রূপান্তরিত করিয়াছে। মুসলমান কাজি-রচিত বৈষ্ণব-গানে ও পারিয়া এবং ইস্‌লামের পারস্পারিক লেন-দেন দেখা যায়। এই যে তিন শ্রেণীর সাহিত্যের কথা বলিতেছি, ইহার প্রত্যেকটারই আবহাওয়া অতি গভীরভাবে স্বদেশী লৌকিক বা "লোকায়ত"। অর্থাৎ অনার্য-পারিয়া শ্রেণীর হাবভাব, রীতিনীতিও আশা-আকাঙক্ষা এই সমুদয়ের আসল কথা-বস্তু। মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের সর্বত্রই দেখিতে পায় যে, অবাঙালী সংস্কৃতিগুলা—সে-সব আর্যই হউক বা ঐস্‌লামিকই হউক— বেশ-কিছু স্বদেশী বনিয়া গিয়াছে। এই সব সংস্কৃতি বঙ্গ-সংস্কৃতির সঙ্গে বনিবনাও চালাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে পারস্পরিক খাপ-খাওয়াটা অল্প-বিস্তর সাধিত হইয়াছে। মোদ্দা কথা, আর্য ধর্মগুলা ও মুসলমান ধর্ম দুই-ই বাঙালী-আওতায় রূপান্তরিত হইতেছে। বাঙালী হরিজনদের সঙ্গে আসিয়া মিশিল "জলচল" হিন্দুত্ব ও মুসলমান ধর্ম। ছোট জাত, অস্পৃশ্য, আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে ইহারা হাতে হাত মিলাইল। ইহার নাম সামাজিক গুরু-চাণ্ডালী। "লোকায়েত" বা লৌকিক অংশ বাদ দিলে বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রায় সব-কিছুই বাদ পড়ে।

বাঙালীকরণ

প্রঃ—বঙ্গ-ধর্ম ও বঙ্গ-সংস্কৃতি তাহা হইলে কী চিজ?

উঃ—অনেকবারই বলা হইয়াছে যে, "অনার্য", আদিম, বুনো, "পারিয়া", "কাক-পায়রা", পাহাড়ী ইত্যাদি নরনারীর ধর্ম ও বা সংস্কৃতি হইল বাঙালীর খাঁটি স্বদেশী ধর্ম ও বা সংস্কৃতি। এইটাই ভিত্তি বা গোড়ার কথা। তাহার পর সকল যুগেই দেশী-বিদেশীর সম্মেলনে বঙ্গ-ধর্ম ও বঙ্গ-সংস্কৃতির ক্রম-বিকাশ। বঙ্গ-সংস্কৃতি দো-আঁস্‌লামিরে বিপুল বিশ্বকোষ। বঙ্গ-সংস্কৃতির বনিয়াদ বলিলে একমাত্র তথাকথিত বঙ্গদেশের ভিতরকার লোকজনের কৃষ্টি বুঝিয়ে হইবে না। নেপাল, তিব্বত, ভুটান, চীন, ব্রহ্মদেশ, আসাম একদিকে এবং উড়িষ্যা, ছোট-নাগপুর, বিহার অন্যান্য দিকে খাঁটি স্বদেশী পারিয়া বা চিড়িয়া-জাতীয় বাঙালী নরনারীর "হাড়মাস" এবং সংস্কৃতি জোগাইয়াছে। লৌকিক বা লোকায়েত বঙ্গসংস্কৃতির বনিয়াদ বিপুল ও সুবিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ।

বনিয়াদটা-সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতরূপে আলোচনা চলে। বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানদের আচার-ব্যবহার ও চালচলনে মিল আছে। কারণ কী? সাধারণের ধারণা,—হিন্দুদের কেহ-কেহ মুসলমান হইয়া যাওয়ায় এইরূপ ঘটিয়াছে। কথাটার ভিতর কিছু সত্য আছে। কিন্তু আসল কারণ,—হিন্দুধর্মের মতো মুসলমান-ধর্মের অনার্য বাঙালী আদিম লোকদের আচার-ব্যবহার আর চালচলন ঢুকিয়া গিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মেই "বাঙ্‌লামি"র প্রলেপ পড়িয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের উপর বাঙ্‌লার খাঁটি *স্বদেশী সংস্কৃতি দিগ্বিজয় চালাইতেছে। এই কথাটা মনে রাখিলে বাঙালী হিন্দু এবং* মুসলমানদের রীতিনীতির ভিতর ঐক্য ও সাদৃশ্যগুলা সহজে বুঝিতে পারিব। দুই সংস্কৃতিই "বাঙালীকরণের" প্রভাবে অনেকটা একরূপ দেখাইয়া থাকে।

খৃষ্টিয়ান ধর্মের প্রভাব আপাততঃ বাদ দিলে দেখিতে পাইব যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দিকে বাঙালী-সংস্কৃতিতে তিন-তিনটা প্রবল ধারার সমাবেশ হইয়াছে। প্রথমটা আদি ও অপরাজেয় বাঙালা-ধর্ম। দ্বিতীয়টা আর্যধর্মের নয়া-পুরাণা ও নানা সংস্করণ।

তৃতীয়টা ইস্‌লাম। ইসলাম-ধর্মের প্রসারের সময়েও বৈদিক হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, শাক্তধর্ম বা তান্ত্রিকধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে তথাকথিত "আর্য"ধর্মের দিগ্বিজয় চলিতে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, যাহাকে হিন্দু বলিতেছি, মানসিক ও সামাজিক গড়নে সে হয়ত একই সঙ্গে আধহিন্দু ও আধা-মুসলমান। অধিকন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে তাহার প্রাচীন "অনার্য" বঙ্গধর্মও বজায় রাখিয়া চলিতেছে। এই সময়কার অনেক মুসলমান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। তাহারা একই সঙ্গে হয়ত মুসলমান, হিন্দু ("আর্য") ও পারিয়া। বাঙালী মুসলমানের ধর্ম ও সংস্কৃতি একমাত্র অথবা পুরাপুরি ঐস্‌লামিক নয়। তাহার ভিতর আছে আর্য (হিন্দু-বৌদ্ধ) আর আনার্য-পারিয়া মাল। চৈতন্যদের সময়ে এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংজ্ঞা খুব পরিষ্কার ছিল কি না সন্দেহ। জাতি, ধর্ম, শ্রেণী প্রভৃতির প্রভেদ বুঝাইবার জন্য আজ এই বিংশ-শতাব্দীতে নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি ও ধর্মের দিক্‌ হইতে যে সমস্ত সংজ্ঞা আমদানী হইয়াছে—তাহা অষ্টাদশ-শতাব্দীর বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান এবং আধা-হিন্দুও আধা-মুসলমানদের অজানা ছিল। বিনয়বাবুর মতে কথাগুলা নিরেট ঐতিহাসিক প্রমাণের জোরে প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকে গবেষণা চালানো উচিত।

প্রঃ—বাঙালী হিন্দুরা যে-সকল দেবদেবী পূজা করে, আর সংস্কার আচার, উৎসব ও পার্বণ ইত্যাদি মানিয়া চলে, সে-সম্বন্ধে "দেশী-বিদেশী" বিচার তাহা হইলে কিরূপ?—এই সব জিনিষ হিন্দু না অহিন্দু?

উঃ—বিনয়বাবুর প্রধান কথা,—হাজর-হাজার বছর ধরিয়া বাঙালীদের আসল ধর্ম বাঙালী-ধর্ম—হিন্দুধর্ম নহে। আর নেহাৎ যদি হিন্দু বলিতেই হয়, তবে বলা উচিত যে, উহা বঙ্গ-হিন্দুধর্ম এই বঙ্গ-হিন্দুধর্ম পাঞ্জাবী, কনৌজীয়, তামিল এবং অন্যান্য হিন্দুধর্ম হইতে প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা চিজ। দুর্গা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, কালী, চণ্ডী, সরস্বতী, রাধা, মনসা, বেহুলা, শীতলা এবং অন্যান্য যে-সব দেবতার পূজা বা মানত্‌ কিংবা পরব্‌ বাঙলাদেশের বিভিন্ন জাতির বহুসংখ্যক নর-নারী করিতেছে, অন্যান্য প্রদেশে তার কোনো অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। অথবা সেই সকল অবাঙালী পূজার গড়নে আর বাঙালী পূজার গড়নে আকাশ-পাতাল ফারাক। এই সকল দেবীরা আসলে সবাই বাঙালী নারী,—বাঙ্‌লার ঘরে-ঘরে বিরাজিত মা, বোন, স্ত্রী বা মেয়ে। বাঙালীর বস্তুনিষ্ঠ কল্পনাশক্তি, মানব-প্রীতি ও সৃষ্টিপ্রতিভা এই সকল বাঙালী মেয়েকে দেবীর আসনে বসাইয়াছে আবার শিব, কৃষ্ণ, কার্তিক, গণেশ, দক্ষিণরায় প্রভৃতি দেবতা আসলে বাঙালী পুরুষ ছাড়া আর কিছুই নহে—এরা বাঙালীর প্রতিগৃহের বাবা, ভাই, স্বামী বা ছেলে। বাঙালীরা যখন নানা প্রকার স্তব-স্তুতি ও অবোধ্য সংস্কৃত মন্তর আওড়াইয়া এই সকল দেবদেবীর পূজা করে, তখন তাহারা বাঙালী ছেলেমেয়েরই তারিফ করে, তাহাদের নিজ হাতে গড়া জিনিসই পূজা করে। লোকায়তের জয়জয়কার চলিতেছে বাঙালী সমাজে।

বাঙালীর হিন্দুধর্মে লৌকিক-লোকায়তের, বাস্তবের আর মানুষের ও সংসারের স্থান খুব বেশী। ইহা তথাকথিত আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর,—এইরূপ বলা নেহাৎ গা-জুরি মাত্র। কম্‌-সে-কম্‌ এইরূপ বলিলে ষোল আনা সত্য বলা হয় না। দেবদেবীগুলি বাঙালীদের নিজস্ব, স্বাধীন সৃষ্টি। এই সবই বাঙ্গালীর বাচ্চা। শক্তি, স্বাস্থ্য, সম্পদ্‌ ও উদ্যমের মূর্তিরূপে অথবা স্রষ্টারূপে এগুলি বাঙালীর মগজ ও হৃদয় হইতে বাহির হইয়াছে। বাঙালীজীবনের অগ্রগতির জন্য বাঙ্‌লার নরনারীকে মজবুদ ও কর্মঠ করিয়া তুলিবার জন্য এই সকল

দেবদেবীর জন্ম বাঙলার নরনারীর কাছে বঙ্গ-হিন্দুধর্ম একটা ছেলেখেলা। বাঙালী মানবিকতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল বঙ্গ-হিন্দুধর্ম।[১]

"মঙ্গল"-সাহিত্য, পাঁচালী, ব্রতকথা ইত্যাদি কাহিনী, গান ও ছড়ার ভিতর বাঙলার নরনারী পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে মানুষময় করিয়া ছাড়িয়াছে। বাঙালীর হিন্দুধর্ম পার্থিব সংসারকে, জগতের নরনারীকে মধুময়, সুখী ও শক্তিশালী করিবার ধর্ম। বঙ্গ-হিন্দুধর্মের সনাতন মন্তর চণ্ডিদাসের মুখে বাহির হইয়াছে। তাহা হইল "সবার চেয়ে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

বঙ্গ-হিন্দুধর্মের পূজাপার্বণের আবহাওয়ায় প্রায় ষোল আনাই লৌকিক, অনার্য, পারিয়া, "বাঙালী" কোনো-কোনো ক্ষেত্রে শুধু মন্তরটা "আর্য" কেন না ইহা সংস্কৃত ভাষায় আওড়ানো হয়। সংস্কৃতের ছোঁআচটুকু বাদ দিলে বঙ্গীয় হিন্দুধর্মে আর্যামির টিকি পর্যন্ত দেখা যাইবে কিনা সন্দেহ। ইহার মুড়ো হইতে পা পর্যন্ত প্রায় সবই "বাঙ্‌লামি"তে ভরপুর। আর্যামি তোআক্কা রাখা বাঙালীর ধাতে সয় না বাঙালীর বাচ্চা হাড়ে-হাড়ে "লোকায়ত।"

আসল কথা, বাঙ্‌লার হিন্দু-নরনারী সংস্কৃত মন্তরের "থোড়াই কেআর" করে। বাঙ্‌লা ভাষায় তৈয়ারী গান, কিচ্ছা, কাহিনী ইত্যাদি সাহিত্য বঙ্গ-হিন্দুধর্মের প্রধান বা একমাত্র বাহন বলিলে যেন ঠিক বলা হয়। বাঙালী হিন্দুর দেবগুলা বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভিতর ঢুঁড়িতে হইবে,—সংস্কৃতের "ক্যাঁক্‌ড়া-বিছা"র ভিতর নয়।

একদিকে যেমন ইস্‌লাম-ধর্ম বাঙালী-রূপ গ্রহণ করিতে থাকে, অপর দিকে "আর্য" হিন্দুধর্মও তেমনি বাঙ্‌লার মাটিতে বাঙ্‌লার দেবদেবীকে স্বীকার করিয়া লইয়া নতুন ভোল লয়। এই দুই রূপান্তরসাধন একই সঙ্গে একই সময়ে চলিতে থাকে। ডোম, হাড়ি, চামার, বাগদী প্রভৃতি তথাকথিত "ছোট"জাত্‌ও এই সকল দেবদেবী বানানোর কাজে সাহায্য করিয়াছে। এই ব্যাপারে অনার্য এবং তথাকথিত ছোটজাত্‌গুলার সৃষ্টিশক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বভারতীয় হিন্দুধর্ম বঙ্গ-ধর্মের প্রভাবে বঙ্গ-হিন্দুধর্ম বানিয়াছে বলিলে হয়ত ঠিক বলা হয় না। বস্তুতঃ ইহা পুরাপুরি সত্য নহে। প্রকৃত অবস্থায় দেখা যায় যে, বাঙালী লোকধর্মই সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ ভারতীয় সংস্কৃতির ছিটেফোঁটার উপর বঙ্গ-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। কাজেই হিন্দুধর্মের অল্পবিস্তর যাহা-কিছু হোমিওপ্যাথিক ডোজে বাঙ্‌লাদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গ-সংস্কৃতির দৌলতে রূপান্তরিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম বঙ্গধর্মকে রূপান্তরিত করিয়াছে না বলিয়া যদি বলি বঙ্গধর্মই হিন্দুধর্মকে রূপান্তরিত করিয়াছে, তাহা হইলে রূপান্তর-গ্রহণের চিত্রটা যথোচিতরূপে নিখুঁত হয়। চণ্ডী, কালী, রাধা, বেহুলা ইত্যাদি ঠাক্‌রুণদের আর হোলি, গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতি উৎসবগুলার গান ও পাঁচালী হইতে বুঝা যায় যে, তথাকথিত অনার্যে আর্যীকরণ অপেক্ষা তথাকথিত আর্যের অনার্যীকরণ হইয়াছে অনেক বেশি।[২]

১। বিনয় সরকার,—"পজিটিভ ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড অব্ হিন্দু সোশিঅলজি", প্রথম ভাগ (এলাহবাদ, ১৯৩৭), বেঙ্গলি পজিটিভিজম্ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

২। হরিদাস পালিত,—"আদ্যের গম্ভীরা" (কলিকাতা, ১৯১২) এবং "বাঙ্‌লা ও সংস্কৃতধাতুর গোড়া-এক (কলিকাতা, ১৯৩৭)। বিনয় সরকার,—" ফোক্-এলিমেন্ট ইন হিন্দু কালচার' (লন্ডন, ১৯১৭), এবং "ভিলেজেস্ অ্যান্ড টাউনস্ অ্যাজ সোশ্যাল প্যাটার্নস্ (কলিকাতা, ১৯৪১), পারিয়ানিজেশন অব দি আরিয়ান অধ্যায় দ্রষ্টব্য,—১৮৭-১৯২ পৃষ্ঠা।

মোটের উপর, "পারস্পারিক" দিগ্‌বিজয়ের—দো-আঁস্‌লামির—কথাটা বারে-বারে মনে রাখা আবশ্যক।

প্রঃ—বাঙালী মুসলমানদের দেশী-বিদেশী সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিনয়বাবু কী বলেন?

উঃ—তাঁহার মতে বাঙালী মুসলমানদের আদর্শ, ধর্ম ও রীতি-নীতি আলোচনা করিলেও দেখিতে পাই যে, ইস্‌লামের উপর বঙ্গ-শক্তি, বঙ্গ-সংস্কৃতি ও বঙ্গ-ধর্মের জবর প্রভাব। পশ্চিম-এশিয়ার ও উত্তর-ভারতের ইস্‌লাম-ধর্ম বঙ্গদেশে আসিয়া সনাতন বঙ্গ ধর্মের প্রভাবে বাঙালীকৃত হইয়াছে। বাঙালী মুসলমানের ধর্ম দুনিয়ার অন্যান্য মুসলমানের ধর্ম হইতে বেশ-কিছু পৃথক। "লোকায়ত" বাঙালীর প্রভাবে ইস্‌লামের ভোল যথেষ্ট বদ্‌লাইয়াছে। বাঙালী মুসলমানদের মহরম-পার্বণটার ভিতর হাসান আর হোসেন এই নাম দুইটা অ-বাঙালী। আর সব-কিছুই,—মিছিল-চালানো, দলে-দলে তাজিয়া বাহির করা, মায় বিসর্জন পর্যন্ত—বাঙালী। বাঙালী হিন্দুদের উপর সংস্কৃত ভাষা যতটুকু জাঁকিয়া বসিয়াছে, বাঙালী মুসলমানদের উপর আরবি ও ফার্সি ভাষা এমন কি ততটুকুও চাপিয়া বসে নাই। বাঙ্‌লা ভাষাই বাঙালী মুসলমানের প্রাণের ভাষা। ভক্তি ও শক্তি-প্রকাশের জন্য বাঙালী মুসলমান আরবি ও ফার্সি বয়েৎ অপেক্ষা বাঙ্‌লা পদ ও বাক্যই বেশি ব্যবহার করিয়া থাকে। বাঙ্‌লা সাহিত্যেই বাঙালী মুসলমানের আসল-আসল কোরান বিরাজ করিতেছে। এই সকল বিষয়ে যাঁহা হিন্দু তাঁহা মুসলমান। অর্থাৎ দুই মিঞাই বিদেশী ভাষাকে কলা দেখাইয়া স্বদেশী ভাষায় ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চালাইতে অভ্যস্ত। জননী বঙ্গভাষা দুইয়েরই দরদ মিটাইয়া থাকে। আর্যের বা অনার্যের ইস্‌লামীকরণ অপেক্ষা বাঙ্‌লায় ইস্‌লামের অনার্যীকরণই বেশী প্রকট। আবার দিগ্‌বিজয়ের সেই "পারস্পরিকতা" মাথা চাঁড়িতেছে। ইস্‌লামের উপর বঙ্গ—"লৌকিকের" প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে বিনয়বাবু বহুসংখ্যক তথ্যমূলক ও সংখ্যানিষ্ঠ নৃতাত্ত্বিক গবেষণা চাহিয়া থাকেন। অনুসন্ধান চালানো জরুরি সন্দেহ নাই।

একালের বঙ্গ-সংস্কৃতি

প্রঃ—একালের বঙ্গ-সংস্কৃতির ভিতর দেশী-বিদেশী বিশ্লেষণ চালিবে কি? পারস্পরিক সংস্কৃতীকরণের আর দো-আঁস্‌লামির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে কি?

উঃ—আল্‌বাৎ। বিংশ-শতাব্দীর বাঙালী সংস্কৃতিতে বাঙালী কাক-চিড়িয়া-পায়ারার অর্থাৎ বাঙালী অনার্যের প্রভাব সাহেবক কালের মতোই বজায় আছে। প্রথমতঃ এই অনার্য-ধর্ম ও সংস্কৃতি অনুসারে এখনও বহুসংখ্যক লোক জীবনধারণ করিতেছে। মুণ্ডা-ওরাও-সাঁওতাল. খাসি-গারো-চাক্‌মা ইত্যাদি নামে তাহারা পরিচিত। গুণ্‌তিতে তাহার কতগুলা, সম্প্রতি তাহার খতিয়ান করিবার প্রয়োজন নাই। তবে তাহাদের অনেকেই এখনও হিন্দুনামেও পরিচিত নয়। মুসলমান-নামেও পরিচিত নয়, খৃষ্টিয়ান-নামেও পরিচিত নয়। তাহারা সাধারণতঃ আদিম, পাহাড়ী, বুনো ইত্যাদিরূপে বিবৃত। আজকাল কংগ্রেসী দপ্তরে তাহাদিগকে 'আদিবাসী" বলা হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ এই অনার্য বঙ্গধর্ম ও সংস্কৃতি হিন্দুধর্মের উপর, মুসলমান-ধর্মের উপর এবং খৃষ্টিয়ান-ধর্মের উপর বঙ্গ প্রভাববিস্তার করিতেছে। হিন্দু, ইসলাম ও খৃষ্টিয়ান-ধর্ম এই তিনটাই অনার্য বঙ্গধর্মের

আওতায় বাঙালীকৃত হইতেছে। অনার্যীকরণের দিগ্বিজয় আজও প্রবল ধারায় দেখিতে পাই। ফলতঃ এই অনার্য বঙ্গধর্মের প্রভাব বাঙ্লাদেশের অন্যান্য রীতিনীতি ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান মূর্তিমন্ত রহিয়াছে। তৃতীয়তঃ, বাঙ্লাদেশে এমন অনেক নরনারী আছে, যাহাদিগকে একই সঙ্গে হিন্দু বলিয়া মনে হয়, আবার মুসলমান বলিয়াও মনে হয়। তাহাদিগকে সামাজিক ও ধর্মের ছাঁচ অনুসারে কখনও বা হিন্দু বলিলেও বলিতে পারি, আবার মুসলমান বলিলেও বলিতে পারি। একই সঙ্গে তাহারা আধা-হিন্দু ও আধা-মুসলমান। এই সকল শ্রেণীর নরনারীর জীবনে অনার্য বঙ্গধর্মের প্রভাব সর্বদাই লক্ষ্য করিতে হইবে। মধ্যযুগেও এইরূপ আধা-হিন্দু, আধা-মুসলমান নরনারী গুন্‌তিতে কম ছিল না। সমাজ-শাস্ত্রের তরফ হইতে আধা-হিন্দু, আধা বৌদ্ধ, আধা-মুসলমান, আধা-শিন্তো, আধা-কন্‌ফিউশিয়, আধা-খৃষ্টিয়ান ইত্যাদি ধরণের চিত্ত, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশেষরূপেই উল্লেখযোগ্য। আদিম সুমারির সংখ্যা-তালিকায় হয়ত এই সকল 'আধা''-ধর্মীদের নাক গুণা সম্ভব হয় না। যাহা হউক এই সকল বিষয়ে গবেষণা চাই। দুনিয়ার নানা দেশে রকমারি সাংস্কৃতিক দো-আঁসলামি জ্বল্‌-জ্বল করিতেছে। সেইদিকে ভারতীয় সমাজশাস্ত্রী ও ঐতিহাসিকদের নজর ফেলা আবশ্যক।

প্রঃ—বঙ্গ সংস্কৃতির বর্তমান যুগকে পুরাপুরি পরানুবাদ বা পরানুকরণের যুগ এবং বৈদেশিক প্রভাবের যুগ বলা উচিত নয় কি?

উঃ—বিনয়াবাবুর জবাব হইবে,—"না"। এটা অন্যান্য যুগের মতনই দো-আঁসলামির যুগ,—পূরাপূরি, স্বদেশীর যুগও নয়, পূরাপূরি বিদেশীর যুগও নয়।

প্রথমেই উল্লেখ করা উচিত যে, ক্লাইভের সময় হইতে ১৯১১ সন পর্যন্ত রাষ্ট্রশাসন-সম্বন্ধে বাঙ্লাদেশ উত্তর-ভারত হইতে পৃথক্‌ ছিল। বরং বলা উচিত যে, এই সময়ে বাঙ্লাদেশেই গোটা ভারতের রাজধানী। ইহাতে রাজনীতিক্ষেত্রে বাঙালীদের যথেষ্ট সুবিধা জুটিয়াছে।

যাহা হউক রামমোহনের আমল হইতে আজ পর্যন্ত ছোট-বড়-মাঝারি গ্রন্থকার বা সাংবাদিকের রচনা বিশ্লেষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, বিদেশী সংস্কৃতির আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা এই বঙ্গ-সংস্কৃতির আছে বিস্তর। বাঙালী-সংস্কৃত শুধু আত্মরক্ষাই করে নাই,—বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলা-দর্শন। ইত্যাদি সকল প্রকার কৃষ্টিকে নিমন্ত্রণ করিয়াও আনিয়াছে। তাহা ছাড়া বাঙ্লার নরনারী বিদেশী সংস্কৃতিকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজের ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছে। ইহাই আসল কথা। বিদেশী সংস্কৃতির বাঙালীকরণ ঊনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতির খুব বড় তথ্য। এক হিসাবে ঊনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি আগাগোড়া ইয়োরামেরিকান সংস্কৃতির মফঃস্বল বা উপনিবেশ মাত্র। আর এক তরফ হইতে বলিতে হইবে যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির উপর আধিপত্য-স্থাপনের ফলে একালের বঙ্গ-সংস্কৃতির মূর্তি লাভ করিয়াছে। মোটের উপর আবার পারস্পরিক দিগ্‌-বিজয় লক্ষ্য করা কর্তব্য। খৃষ্টিয়ান-ধর্ম, পাশ্চাত্য-সংস্কৃতি, ইংরেজী-শিক্ষা সব-কিছুই এই বঙ্গ-প্রভাব এবং বাঙালীর দিগি্বজয় ও আধিপত্য মানিয়া লইয়াছে। সোজা কথা এই যে, সেকালের মতন একালেও বঙ্গ-সংস্কৃতি আগাগোড়া দো-আঁসলা।

রামমোহন অষ্টাদশ-শতাব্দীর পাশ্চাত্য-যুক্তিনিষ্ঠাকে বাঙালা-রূপ দিয়াছেন। দান্তে ও মিল্‌টনের বিশ্বব্যাপী পৌরুষ ও শক্তিযোগ বাঙালী-মূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে মধুসূদনের লেখায়। ভিক্টোরিয় যুগের গণশক্তি, সমাজতন্ত্র ও নারীত্বকে বাঙালী-পোষাক পরাইয়াছেন

রঙ্গলাল, বিহারী, হেম ও নবীন। কঁৎ ও মিলের প্রচারিত "পজিটিভিজম্" বা মানবতন্ত্র ও সংসার-নিষ্ঠা বাঙালীরূপে দেখিতে পাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-সাহিত্যে, কৃষ্ণ-চরিত্রে এবং মায় "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে। ফিখ্‌টে ও কার্লাইয়ের আদর্শবাদের বঙ্গরূপ দিলেন বিবেকানন্দ। পথপ্রদর্শক জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্রের কর্মপটুত্বের ফলে একালের পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সাধনা যুবক-বাঙ্‌লার রক্তের সঙ্গে বেশ কিছু মিশিতে সুরু করিয়াছে। মাৎসিনি ও কাণ্টের অধ্যাত্মনিষ্ঠা, কর্তব্যজ্ঞান ও যৌবনশক্তি বাঙালীকৃত হইল অরবিন্দের রাষ্ট্রসাধনায়। আধুনি আর্থিক ব্যবস্থার পুঁজিতন্ত্র ও শিল্পনিষ্ঠা। বাঙালী-আবহাওয়ায় মিশিল অম্বিকা উকিলের আন্দোলনে ও কর্ম-প্রচেষ্টায়। ব্রাউনিং ও হুইট্‌ম্যানের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বাঙালী-সংস্করণে দেখা দিল রবীন্দ্র-সাহিত্যে। দস্তয়েভ্‌স্কির রচনাতে যে মানবপ্রীতি ও নীতিবৈচিত্র্যের কদর দেখিতে পাই, তাহা নতুন বাঙালী-রূপ পাইয়াছে শরৎচন্দ্রের রচনায়। ১৯১৭-২০ সনের (লেনিনের যুগের) পর হইতে বাঙালী কবি, গল্পলেখক, বৈজ্ঞানিক, অর্থশাস্ত্রী এবং রাষ্ট্রিক পণ্ডিত ও বক্তারা সমাজতন্ত্রের (সোশ্যালিজ্‌মের) একটা মানান-সই বাঙালী-গড়ন খাড়া করিবার জন্য কর্মঠভাবে পরীক্ষা চালাইতেছে। মার্কস্-লেলিনের বাঙালী সুরৎ কায়েম করিবার কাজে হিন্দু-মুসলমান এক।

বাঙালীরা বর্তমান যুগে ইয়োরামেরিকার সংস্কৃতি এমন জবরভাবে দখল করিয়া লইয়াছে যে, পাশ্চাত্য-চিন্তাধারার সঙ্গে যথেষ্ট ও গভীর পরিচয় না থাকিলে সাধারণ-শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে বলা শক্ত,—পাশ্চাত্য-ভাবধারা বাঙালীর আত্মপ্রকাশকে আদৌ প্রভাবান্বিত করিয়াছে কিনা। ঊনবিংশ ও বিংশ-শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি ও বঙ্গধর্ম বাঙ্‌লার নরনারীর পক্ষে অগৌরবের জিনিষ নয়। এই সব পূরামাত্রায় বঙ্গ-সৃষ্টির অপূর্ব বিকাশ। এই সকল সৃষ্টি ও কৃষ্টি-সম্বন্ধেও বাঙালীজাত্‌কে দিগ্‌বিজয়ী বলিতে হয়। এমন কি বাঙ্‌লার নরনারীর ভিতর যাহারা খৃষ্টিয়ান-ধর্ম লইয়াছে, তাহাদের আওতায়ও খৃষ্ট-সংস্কৃতি বাঙালীকৃত হইয়াছে। সর্বত্রই দেখা যায়, বাঙালীকরণের জয়জয়কার। ইহার ভিতর সমাজ-শাস্ত্রীরা দো-আঁস্‌লামির দিগ্‌বিজয় দেখিতে বাধ্য।

প্রঃ—বাঙালীরা বেশী দিগ্‌বিজয় না অ-বাঙালী ভরত-সন্তানেরা বেশী দিগ্‌বিজয়ী? এই বিষয়ে বিনয়বাবুর কী মত?

উঃ—দিগ্‌বিজয়ের মাপকাঠি ও বহর লইয়া আগে আলোচনা করা দরকার। যখনই কোনো লোক অপর কোনো লোকের চিত্ত বা মগজ দখল করে, তখনই বিনয়বাবুর মতে লোকটা দিগ্‌বিজয়ী। এই হিসাবে প্রত্যেক কবি, গল্পলেখক, দার্শনিক, রাষ্ট্রিক, বক্তা, নট-নটী, গায়ক-গায়িকা, পালোআন, চাষী, মিস্ত্রী, ঘরামি, সকলেই অল্পবিস্তর দিগ্‌বিজয়ী। কিন্তু দিগ্‌বিজয়ের চৌহদ্দিটা সকলের সমান নয়। কাহারও দিগ্‌বিজয় নিজ পরিবার পার হয় না,—যাকে বলে "মাগের কাছে পেগের বড়াই"। কাহারও দিগ্‌বিজয় নিজ পাড়ায় সীমাবদ্ধ। কেহ বা জেলা পর্যন্ত দিগ্‌বিজয়ী। প্রদেশ-বিজয় কাহারও-কাহারও কপালে ঘটে ইত্যাদি। সম্রাট্ ধর্মপা, চৈতন্য এবং নব্যন্যায় প্রভৃতির কথা বাদ দিলে মালুম হইবে যে, অষ্টাদশ-শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা ধর্মপ্রচারকেরা সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করেন নাই। বাঙালী গুণী, ঋষি, পণ্ডিত, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি শ্রেণীর দৌড় ছিল প্রধানতঃ বাঙ্‌লা দেশের চৌহদ্দির ভিতর গণ্ডীবদ্ধ। বাঙ্‌লার বাহিরে বাঙালীর ইজ্জদ্ সেকালে নেহাৎ সামান্য ছিল। আদিম ও মধ্যযুগের ভারতীয়দের মতো সর্বভারতীয় খ্যাতি বাঙালীদের বরাতে জুটিয়াছে ঊনিবিংশ-শতাব্দীতে এবং ইদানীং কয়েক বছর।

এই হিসাবে অবাঙালীরা বাঙালীর চেয়ে বেশী দিগ্‌বিজয়ী।

রাজনীতি, সামরিক বিদ্যা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আদিম ও মধ্যযুগের অবাঙালীকে বাঙালী-সংস্কৃতি কতটা প্রভাবান্বিত করিয়াছে, আদৌ করিয়াছে কিনা, করিয়া থাকিলে কোন্ সময়ে করিয়াছে—এই সকল বিষয়ে তথ্য আবিষ্কার করা প্রয়োজন। এইরূপ আবিষ্কারের জন্য এক-একটা করিয়া প্রদেশ ধরিয়া বঙ্গ-প্রভাব-সম্বন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণা চালানো দরকার। বিনয়বাবু এই সকল গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে খুব জোর দিয়া থাকেন।

অষ্টাদশ-শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানেরা রাজনীতি, সাহিত, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে যে সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়াছে, তার মধ্যে একমাত্র "সৈয়ার মুতাক্ষরিন" কিছুটা সর্বভারতীয় খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই ক্ষেত্রেও গবেষণার প্রয়োজন। বিশেষ করিয়া দেখা দরকার যে, ইহার গ্রন্থকর গোলাম হোসেনকে আদপেই বাঙালী বলা চলে কিনা।

কি হিন্দু, কি মুসলমান, দুই প্রকার বাঙালীই বিনয়বাবুর বিবেচনায় অবাঙলীর হিন্দু-মুসলমানের চেয়ে মধ্যযুগে খাটো ছিল। এই দুয়ের কাহাকেই "ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া" চলিতে কিনা সন্দেহ।[৫]

প্রঃ—বর্তমান যুগে বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় কোথায় বা কতটুকু?

উঃ—গোটা দুনিয়ার বাটখারায় মাপিলে দেখা যাইবে যে, অষ্টাদশ-শতাব্দী পর্যন্ত অবাঙালী ভারতীয় সৃষ্টিশক্তি যে স্তরে উঠিয়াছিল, বাঙালী সৃষ্টিশক্তি ততটা উঁচু স্তরে উঠিতে পারে নাই। পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম এশিয়ার ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রসারের ফলে বিদেশে যে "বৃহত্তর ভারত" গড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহার মূলে প্রধানতঃ অবাঙালী হিন্দু ওবৌদ্ধদেরই কেরামতি দেখা যায়। আদিম এবং মধ্যযুগে বাঙালীরা "বৃহত্তর ভারত"গঠনে কিছু করিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনক ও বেশী খবর পাওয়া যায় না। অন্ততঃ যথার্থ ঐতিহাসিকভাবে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ খুব কম। একমাত্র পাহাড়পুরের (রাজসাহী) স্থপতিবিদ্যা ও কারুশিল্প যবদ্বীপ, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের (ঢাকা) "বাঙাল-বাচ্চা" বৌদ্ধ দীপঙ্কর তিব্বতে যে প্রচারকার্য করিয়াছেন, তাহা অবশ্য বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিষয়ে বহুসংখ্যক গবেষকের মোতায়েন থাকা বাঞ্ছনীয়। হয়ত বৃহত্তর ভারতে বঙ্গ-প্রভাবের নয়া-নয়া প্রমাণ আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। তখন বিনয়বাবু মত বদলাইতে রাজি হইবেন।

১৮৯৩ সনে আমেরিকার সঙ্গে বিবেকানন্দ'র সম্পর্ক স্থাপিত হইবার পর হইতে দুনিয়ার সংস্কৃতির আসরে বাঙালীকে কিছু-কিছু "ভদ্রলোকের পাতে" দেওয়া যাইতেছে। ১৯০৫ সনের যুবক-বাঙ্‌লার গৌরবময় স্বদেশী বিপ্লব বর্তমান জগতের আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও সভ্যতায় একটা উল্লেখযোগ্য শক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিগত ৩৫-৩৬ বৎসর ধরিয়া বাঙ্‌লার নরনারী শিল্প বিজ্ঞান, কলা, দর্শন, সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, এবং আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কর্মক্ষেত্রে যাহা-কিছু করিতেছে, দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সুধীপরিষদে সেই সমুদয়ের অল্প-বিস্তর আলোচনা চলিতেছে। বাঙালী লেখকদের রচনাবলীও নানাবিধ

৫। বিনয় সরকার,—"সমাজবিজ্ঞান" প্রথম ভাগ (কলিকাতা, ১৯৩৮),—বঙ্গ-সংস্কৃতির দিগ্‌বিজয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

আর্ন্তর্জাতিক পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত ও যাচাই হইতেছে। এই সকল কারণে বাঙ্‌লার সুধী ও "কেজো" লোকদেরকে দুনিয়ার পণ্ডিত ও জননায়কগণ দলের লোক বা সহযোগিরূপে সমাদর করিতে সুরু করিয়াছে। যুবক-বাঙ্‌লার হুসিয়ার প্রতিনিধিরা আজ কিছুকাল ধরিয়া দুনিয়ার ডিহিতে-ডিহিতে বিশ্ববাসীর সঙ্গে দহরম মহবম চালাইতেছে,—বন্ধুভাবে হাতে-হাত মিলাইয়া সমানে-সমানে চলাফেরা করিতেছে। দেশ-বিদেশে বসবাস করিতে-করিতে বঙ্গসন্তান আজকাল "বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার" করিবার বিদ্যায় ওস্তাদ বানিয়া যাইতেছে। তাহার ফলে ইয়োরামেরিকার আর এশিয়ার ও আফ্রিকার নানা জনপদে ভারতবাসর বিভিন্ন স্বার্থ পুষ্ট হইতেছে। বিদেশী স্ত্রী-পুরুষের নিকট হইতে কৃতী-বাঙালীরা সম্য ও প্রীতির রাখী পাইতেছে। ঘরে-বাইরে বাঙালার সঙ্গে একত্রে কাজ করিবার সুযোগ পাইয়া দুনিয়ার নরনারী বেশ-কিছু চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। ইহা বাঙালীজাতের পক্ষে মস্ত বড় দিগ্‌বিজয়। মাত্রাটা অবশ্য এখনো বেশী লম্বা নয়। বর্তমান জগতে বাঙালর প্রভাব আস্তে-আস্তে বাড়িতেছে। বলিয়া রাখা ভালো যে, এই যুগে, ভারতের অবাঙালী সুধী এবং কর্মীরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশে অবাঙালী সুখী এবং কর্মীরাও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে দেশ-বিদেশে কৃতিত্ব দেখাইতে পশ্চাৎপদ নয়।

বিশ্বসংস্কৃতিতে ভারতীয় ভাব-সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইয়াছে। বিনয়বাবু বর্তমান ভারতের এই দিগ্বিজয়কে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বৃহত্তর ভারতেরই পরবর্তী ধাপ বা ধারা বিবেচনা করিতে অভ্যস্ত। বিংশশতাব্দীর এই "বৃহত্তর ভারত" প্রতিষ্ঠায় বাঙালী রাষ্ট্রনেতা ও সংস্কৃতি-নায়কদের কর্মনিষ্ঠা বেশ-উঁচু ঠাঁই অধিকার করে। আজ ১৯৪১ সনে বাঙালীরা উঁচু হইতে নিজের দিকে নামিয়ে যাইতেছে না, বরং ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিতেছে। অবশ্য একথা অস্বীকার করিবার যো নাই যে, উন্নতিটা একটু "ঢিমা তেতলায়" সাধিত হইতেছে। উন্নতির হার ও মাত্রা নেহাৎ অল্প। কিন্তু উন্নতি ঘটে।

বাঙালী-জাতের উন্নতি, বাড়্‌তি বা প্রগতি-সম্বন্ধে বিনয়বাবুর প্রাণের কথা নিম্নরূপঃ—

"এত উচ্চে উঠেছি, তবু উচ্চতমের অনেক দেরি।"

("ভারতে ইয়োরামেরিকার চোরাই মাল", ১৭ই নবেম্বর ১৯৪৩)

এপ্রিল ১৯৪৩

নোবেল প্রাইজে ভোটাভোটি

২০শে এপ্রিল ১৯৪৩

হরিদাস—আপনি যখন বিলেতে ছিলেন, তখন বার্ণার্ড শ'-এর সঙ্গে আপনার আলাপ পরিচয় হ'য়েছিল?

সরকার—না। রবার্ট ব্রিজেস, ঈট্‌স্‌ প্রভৃতি কবির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল।

হরিদাস—ঈট্‌স্‌ কি "নোবেল প্রাইজ" পেয়েছিলেন?

সরকার—হাঁ।

হরিদাস—নোবেল প্রাইজের সঙ্গে টাকা-পয়সার যোগাযোগ এবং বিদ্যাবুদ্ধির সম্বন্ধ কী ধরণের?

সরকার—সম্বন্ধটা অতি ঘনিষ্ঠ। নোবেল প্রাইজ পেতে গেলে বিদ্যাবুদ্ধি তো চাই-ই। কিন্তু তার চেয়ে বেশী চাই কিংবা কম্-সে-কম্ সমান-সমান চাই টাকা-পয়সার সুযোগ। তার সঙ্গে-সঙ্গে প্রচার। পেটোআদের প্রচার আর তদবির ভিন্ন কোনো মিঞা আজ পর্যন্ত নোবেল প্রাইজ পেয়েছে কিনা সন্দেহ। সমাজসেবা, গ্রন্থপ্রকাশ, গবেষণা, আবিষ্কার আর বিদ্যাবুদ্ধিই নোবেল প্রাইজ-লাভের এক মাত্র উপায় নয়।

লেখক-বুঝ্তে গোল বাঁধ্ছে।

সরকার—একটা সোজা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি মনে কর কোনো লোক ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি বা আইন-সভার সদস্য হতে চায়। তবে তার কী-কী সম্বল দরকার হবে? প্রথমতঃ বিদ্যাবুদ্ধি কিঞ্চিৎ-কিছু বা বেশ-কিছু। দ্বিতীয়তঃ আর প্রধানতঃ হ'চ্ছে আর্থিক সুযোগ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। তার স্বপক্ষে ব'কে বেড়াবার মতন পেটোআ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা। তার স্বপক্ষে ব'কে বেড়াবার মতন পেটোআ চাই অনেক। নোবেল প্রাইজ-লাভের বেলায়ও ঠিক এই কথাই বল্ছি। যেখানে ভোটাভোটি, সেখানেই চাই টাকা-পয়সার জোর, প্রচার-প্রচারকের দল।

হরিদাস—তাহ'লে নোবেল প্রাইজ না পেয়েও পৃথিবী বিখ্যাত চিন্তাবীর হওয়া সম্ভব?

সরকার—আল্‌বৎ। এ তো অতি সোজা কথা। গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ আর পার্লামেন্টের সদস্যবৃন্দ ছাড়াও সব দেশেই বহুসংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি থাকে। সে-রকমে নোবেল প্রাইজ-ওয়ালাদের দলের বাইরেও পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই বড়-বড় চিন্তাবীর র'য়েছে অনেক। নোবেল প্রাইজ না পেলেই একটা পণ্ডিত ছোটদরের,তা বুঝায় না। আবার নোবেল প্রাইজ পেলেই যে লোকটা মহা উঁচু-কিছু, তাও সব ক্ষেত্রে সত্য নয়। যে-সব জিনিষের দর সার্বজনিক ভোটে কষা হয়, তার কিস্মৎ গোঁজামিলে ভরা। তাতে মেকি চলে বেশ-কিছু। তার ভেতর অনেক রহস্য আছে। একমাত্র চরিত্র, একমাত্র কর্মদক্ষতা, একমাত্র বিদ্যার দৌড়, একমাত্র সৃষ্টিশক্তি ইত্যাদির জোরে একাল-সেকাল-কোনো-কালেই কেহ ভোট পায় না।

স্বদেশী আন্দোলন ও নোবেল প্রাইজ

লেখক—স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কোনো সম্বন্ধ আছে?

সরকার—অতি নিকট সম্বন্ধ। নোবেল প্রাইজ ১৯১৩ সনের ঘটনা ; আর বঙ্গ-বিপ্লব সুরু হয় ১৯০৫-এ। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে বঙ্গ-বিপ্লবের প্রভাবে ইয়োরামেরিকার নানা দেশে ভারতবর্ষের স্বপক্ষে ছোট-বড়-মাঝারি নানা দল ও মত পুষ্ট হ'তে থাকে। সেই দল ও মতের জোরে বঙ্গ কবির নোবেল প্রাইজ পাওয়াটা বেশ-কিছু সহজ হ'য়ে প'ড়েছিল। দুনিয়ায় একটা ভারতীয় আবহাওয়া তৈরী হ'চ্ছিল। সেই আবহাওয়ার কিস্মৎ খুব বেশী। বঙ্গ-বিপ্লবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ-লাভের

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। আর বাঙালীর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মানে কী জানিস্? যুবক-ভারতের দিগ্‌বিজয়,—যুবক-এশিয়ার দিগ্‌বিজয়। বাঙালীকে,ভারত-সন্তানকে, এশিয়ানকে ঠেলে তুল্‌বার জন্য,—"ভদ্রলোকের পাতে দেবার" জন্য ইয়োরামেরিকার কতকগুলা লোক উঠে প'ড়ে লেগেছিল। তা না হ'লে বাঙালীর বরাতে নোবেল প্রাইজ জুট্‌তো না।

লেখক—নোবেল প্রাইজ পাওয়া উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের কোনো বিদেশী প্রচারক, পেটোআ বা বন্ধুর নাম করতে পারেন?

সরকার—আইরিশ কবি ঈটস্। আয়ার্ল্যান্ডের কবিরা আর স্বদেশ-সেবকেরা ভারতীয় স্বদেশী আন্দোলনের আর বঙ্গ-বিপ্লবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। এখনো র'য়েছে। ১৯১৪-২৫-এর যুগে ইয়োরামেরিকার নানা দেশে তা দেখেছি। আয়ার্ল্যান্ডে তা বুঝে এসেছি। ডিভ্যালেরা আমেরিকায় অনেক বাঙালী ও অবাঙালীর "এক গেলাসের ইয়ার" ছিলেন। নিউইয়র্কের আড্ডাধারীরা তার খবর রাখে। বসন্ত রায়, তারক দাস ইত্যাদি বাঙালীর বাচ্চারা সাক্ষ্য দিতে পার্‌বে।

চরম সত্য আছে কি?

লেখক—আচ্ছা, কয়েকটা নতুন দিকে এবার কথা চালাতে ইচ্ছা করি। আমাদের শাস্ত্রে আছে যে, ব্রহ্মাকে জান্‌লে "জানার" আর কিছু বাকী থাকে না। সেই "পরাজ্ঞান' লাভ হ'লে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়,—সকল দ্বন্দ্বের ঘটে অবসান। এ রকম জ্ঞানের অস্তিত্ব আপনি স্বীকর করেন?

সরকার—এক কথায় উত্তর দেবো "না"। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে চরম ব'লে কোনো-কিছু থাক্‌তে পারে না। যারা বলে এমন জ্ঞান, যার পরে আর জান্‌বার কিছু বাকী থাকে না, তাদের মগজে ঘিলুর অভাব যৎপরোনাস্তি। যাদের মনটা অত্যন্ত অলস ও মগজটা ক্রিয়াহীন, তাদের মুখেই যখন-তখন ঐ ধরণের হেঁয়ালিময় বুজরুকিপূর্ণ বুলি শোনা যেতে পারে। এসব বুজরুকির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ চালানো আমার অন্যতম পেশা।

লেখক—আপনার নিজ সিদ্ধান্ত কিরূপ?

সরকার—নিউটনের মতন যে-লোক, সে কখনো বলবে না যে, জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে "শেষ" ব'লে কিছু আছে। ভারতবর্ষে পণ্ডিত-অপণ্ডিত সব মিঞা ব'কে বেড়ায় ঐ ধরণের কথা। আর ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব ঐখানে,—এই কথা ব'লে আহাম্মুকের মতন লাফালাফি করাও আমাদের দস্তুর। এখানেই হ'চ্ছে ভারতীয় মগজের একটা মস্ত বড় অসম্পূর্ণতা। এটা মেরামত করার প্রয়োজন।

লেখক—মেরামত হ'তে পারে কি?

সরকার—নিশ্চয়। চাই ভারতীয় লিখিয়ে পড়িয়ে মহলে হাজার-হাজার নিউটন-মেজাজী ও নিউটন-পন্থী নরনারী। তাহ'লে আমাদের চেহারা ব'দ্‌লে যাবে। নিউটন-মেজাজী লোকই হ'চ্ছে জার্মান কবিবর গ্যেটে'র ফাউস্ট্ চরিত্র।

লেখক—ফাউস্টের কথা বুঝা যাচ্ছে না।

সরকার—গ্যেটে'র নাটকের ফাউস্ট জ্ঞানযোগী ব্যক্তি। জ্ঞানযোগে সে চরমপন্থী।

কিছুতেই তার আশ্ মিটে না। দুনিয়ার সব-কিছুই সে জান্তে চায়, বুঝতে শিখ্তে চায়। অনন্ত জ্ঞান হচ্ছে তার একমাত্র সাধনা। ফাউস্ট্‌পন্থী নরনারী কোনো দিনই স্বীকার করতে পারে না যে, জগতের যা-কিছু জ্ঞাতব্য, সবই কোনো মিঞা জেনে ফেলেছে। সর্বদাই তার মনে হবে,—"এত উচ্চে উঠেছি, তবু উচ্চতমের অনেক দেরি।"

লেখক—এ লাইনটা পেলেন কোথায়?

সরকার—এই অধমেরই এক বুখ্‌নি। এর ইংরেজিও আছে "ব্লিস্ অব এ মোমেণ্ট" নামক কবিতার বইয়ে (বষ্টন ১৯১৮)

("তথাকথিত সত্যদ্রষ্টারা কী দেখেছেন?' ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৪২,"সমালোচনা সাহিত্য" ২৭ ডিসেম্বর ১৯৪৩)

মে ১৯৩৪

প্রচার-সাহিত্য বনাম সাহিত্য-শিল্প

৮ই মে ১৯৪৩।

সুবোধ ঘোষাল*—অনেক দিন হ'লো আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে "সমাজ-চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র", "মেসেজ্‌স্ অব দান্তে" আর "হার্ডার্স্ ডক্‌ট্রিন অব দি ন্যাশন্যাল সোল" লিখেছিলাম। মনে আছে বোধ হয়? আজ আরেকবার কিছু সাহিত্যচর্চা কর্‌তে চাই। যেখানে-সেকানে আজকাল অনেক মহলেই শুন্‌তে পাই যে, আধুনিক সাহিত্য প্রচার-সাহিত্য ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার এ বিষয়ে কী মত?

সরকার—প্রথমেই আমাদের দেখ্‌তে হবে,—আধুনিক সাহিত্য বল্‌তে কোন্ বছর থেকে কোন্ বছরের ভেতর তৈরী সাহিত্য বুঝায়। দ্বিতীয়তঃ দেখ্‌তে হবে,—যেটা আধুনিক যুগ নয়, সে সময়কার তৈরী সাহিত্যই বা কতখানি প্রচার-সাহিত্য বা আদৌ প্রচার-সাহিত্য কিনা।

লেখক—আপনি কোনো সিদ্ধান্তে এসেছেন?

—

*শ্রীযুক্ত সুবোধ কৃষ্ণ ঘোষাল এম-এ কিছুকাল কলেজ ফর উইমেনে ইংরেজি-সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। "সরকারিজম্" (বিনয় সরকারের মতামত) নামক ইংরেজি গ্রন্থের (১৯৩৯) প্রণেতা।

সুবোধ ঘোষাল বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান-পরিষদের অবৃত্তিক গবেষক।

১৯১৪ সনে সুবোধ ঘোষালের নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলা "ইণ্ডিয়া টু-মরো" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিলঃ

ফেব্রুয়ারী—"কঁদর্সে অ্যাণ্ড হিজ কন্‌ট্রিবিউশনস্" (ফরাসী সমাজশাস্ত্রী কঁদর্সের চিন্তাধারা)।

মার্চ—"দি কন্‌ট্রিবিউশনস্ অব ব্যর্গ্‌সঁ টুয়ার্ডস মডার্ণ ফিলজফি" (আধুনিক দর্শনে বার্গ্‌সঁর দান)।

এপ্রিল—"দি নেও-আইডিয়্যালিজম্ অব ক্রচে" (ইতালিয়ান দার্শনিক ক্রচের নবীনীকৃত ভাবনিষ্ঠা)।

আগষ্ট—"দি থ্রী ইলেকট্রাজ্ ইন গ্রীক ড্রামা" (গ্রীক নাট্য-সাহিত্যের তিন ইলেক্‌ট্রা)।

সেপ্টেম্বর—"রবীন্দ্রনাথ ইন্ সোশ্যাল থট্" (সমাজ-চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ)।

ডিসেম্বর—"রবীন্দ্রনাথ অ্যাণ্ড হিজ ওয়ার্ক্‌স্"।

সরকার—এরূপ বিশ্লেষণ চালালে দেখা যাবে যে, হিন্দু বাল্মীকি অর গ্রীক ইস্কিলস্ থেকে আনাতল ফ্রাঁস, গল্‌সোআর্থি আর শরৎ চ্যাটার্জি, বুদ্ধদেব বসু ও তারাশঙ্কর ব্যানার্জি পর্যন্ত সকলের সৃষ্ট সাহিত্যই প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। জীবনের নানা মুহূর্তে আমাদের নানা ধরণের কর্তব্য আসে। সাহিত্য আমাদের সেই সকল কর্তব্য-পালনে সচেতন করে বা সাহায্য করে। সাহিত্য-মাত্রই লোকশিক্ষক। নীতিহীন কাব্য, গল্প বা নাট্য থাক্‌তেই পারে না।

লেখক—প্রত্যেক কবি, নাট্যকার ও গল্পলেখকের রচনাই কি নীতিকথায় ভরা?

সরকার হাঁ। সকলেই কোনো-না কোনো নীতির প্রচারক। তবে যে-প্রচারটা নেহাৎ গুরুমশাইয়ের বুখ্‌নিতে ভরা, সেই প্রচারটাকে পাঠকেরা বা শ্রোতারা বড় পুছে না। তাকে কলা-দেখানো দস্তুর। ফলতঃ সেটা সাহিত্য-কলা নয়। সেটা "হিতোপদেশ" মাত্র। সাহিত্যশিল্পে আর হিতোপদেশে ফারাক বিস্তর।

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, একালের বাঙালী কবিরা নীতি-প্রচারক?

সরকার—পাঁক্-প্রচারক প্রেমেন মিত্রও নীতি-নিষ্ঠ। আর নীতি প্রচারে "পদাতিক" সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো পেছ-পাও নয়ই। সেকালের রাবীন্দ্রিক "নৈবেদ্য" ও "বলকা" হিতোপদেশে ভরপুর ছিল। আর এ-কালের "রোগ-শয্যায়" ও "জন্মদিনে" নয়া-নয়া রৈবিক নীতিই প্রচারিত হ'য়েছে। নীতি-প্রচার বঙ্গ-কাব্যে কোনো দিনই বাদ পড়েনি।

লেখক—অনেকে একালের বঙ্গ-কাব্যকে নীতিহীন বিবেচনা করে না কি?

সরকার—"অনেকের" অর্থ হ'চ্ছে কোনো-কোনো পাঠক। সেই সব পাঠকের সুনীতি-কুনীতি হয়ত কতকগুলা নির্দিষ্ট পথে চলে। এইজন্যে বোধ হয়, তারা নয়া-নয়া সুনীতি কুনীতি পাকড়াও কর্‌তে অসমর্থ। পাঠকেরা বিষ্ণু দে'র "বাইশে জুন" আর বুদ্ধদেব বসুর "বন্দীব বন্দনা" ঘাঁট্‌তে আরম্ভ করুক। তাহ'লে তাদের চোখ-কান-হৃদয়-মুড়ো নতুন-নতুন নৈতিক আবহাওয়ায় বেশ-কিছু তৈয়ের হ'তে থাক্‌বে। সেকালে রাবীন্দ্রিক নীতি নিয়েও পাঠক-মহলে বহুবার বহু গণ্ডগোল বেধেছিল। জানিস্ বোধ হয়? বঙ্কিমের নীতিও অনেকেই হজম কর্‌তে পার্‌তো না। জানা তো আছেই!

হার্ডির "ডাইনাস্ট্‌স্"

লেখক—সাহিত্য-শিল্প আর হিতোপদেশের ফারাক্ সম্বন্ধে আরও দু একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—যে কোনো নামজাদা লেখকের রচনাকে সাক্ষী ডাকা যেতে পারে। একালের ইংরেজ সাহিত্যবীর হার্ডি "ডাইনাস্ট্‌স্" (বংশনিষ্ঠ, বংশপ্রিয় বা বংশালু) লিখেছেন। বইটা আধা-নাটক, আধামহাকাব্য। সেকালের মিল্টন "প্যারাডাইজ লস্ট্" লিখেছিলেন। আমি "ডাইনাস্ট্‌স্"কে বিংশ-শতাব্দীর "প্যারাডাইজ লস্ট্" সমঝিতে অভ্যস্ত।

লেখক—এই দুইয়ের হিতোপদেশ কোথায়? আর শিল্পই বা কোথায়?

সরকার—দুই-ই নীতিকথার ভরা। মিল্টনের নীতি অবশ্য হার্ডির নীতি নয়। হার্ডি কলম ধ'রেছেন নেপোলিয়ানের আহাম্মুকির বিরুদ্ধে, আর ফরাসী-জাতের অতিবৃদ্ধির

বিলম্বেও প্রপাগাণ্ডা জবরদস্ত্‌। বৃটিশ-সাম্রাজ্যের গৌরব প্রচারক হার্ডি ঠিক যেন ধর্মপ্রচারক মিল্‌টনকেও কানা ক'রে ছেড়েছেন। তা সত্ত্বেও এই দুইয়ের কেহই মামুলি ইস্কুলমাষ্টার নন। উভয়েই পয়লা-নম্বরের সাহিত্য-শিল্পী।

লেখক—তা বুঝ্‌বো কী ক'রে?

সরকার—প্রত্যেকেই সৃষ্টি করেছেন গল্প। অবশ্য গল্পের রসদ বা মাল-মশলা সবই চুরি-করা চিজ। এ সব এসেছে মিল্‌টনের বেলায় বাইবেল ইত্যাদি সাহিত্য হ'তে, আর হার্ডির বেলায় খবরের কাগজও পার্লামেন্টের কার্য-বিবরণী হ'তে। দ্বিতীয়তঃ, দুই কাব্যেই খাড়া হ'য়েছে কতকগুলা চরিত্র। সবই জ্বল্‌-জ্বল্‌ কর্‌ছে। তৃতীয়তঃ প্রত্যেক গল্পেই ঘটনা সমাবেশের ভেতর দেখ্‌তে পাই নতুন নতুন অবস্থা-সৃষ্টি। এই যোগাযোগ-সৃষ্টিগুলা উচ্চাঙ্গের সাহিত্য- মতার চিহ্নোৎ।

লেখক—"হিতোপদেশ" লেখকদের লক্ষণ কী কী?

সরকার—হিতোপদেশ-প্রচারক বল্‌লে বুঝ্‌তে হবে, প্রবন্ধ-লেখক, সাহিত্য-সমালোচক, পত্রিকা-সম্পাদক, দার্শনিক বা দর্শন-লেখক, ঐতিহাসিক ইত্যাদি শ্রেণীর সাহিত্যসেবী। তারা গল্পও খাড়া করে না, চরিত্রও খাড়া করে না, অবস্থা বা যোগাযোগও খাড়া করে না। তারা মন্তব্য ঝাড়ে। এক, দুই, তিন ক'রে যুক্তি সাজিয়ে চলা তাদের দস্তুর। তারা সোজা-সুজি পাঁতি, বাণী, বয়েৎ বা বুখ্‌নির সারি গাঁথ্‌তে অভ্যস্ত। নীতি-ধর্ম হয়ত দুই শ্রেণীর লেখকদেরই একরূপ। কিন্তু প্রকাশভঙ্গী দুই শ্রেণীর লেখকদের দুই ধরণের। অবশ্য নীতি-ধর্মের সু-কু বিলকুল আলাদা কথা। কোন্‌ নীতি বা ধর্ম মানুষের পক্ষে মঙ্গলজনক, আর কোন্‌টা নয়, তা আলোচনা কর্‌ছি না।

গল্‌সোআর্থি ও বার্নার্ড্‌ শ'

লেখক—হার্ডি ছাড়া আর দু-,কজন আধুনিক সাহিত্যবীরের রচনা এই সূত্রে উল্লেখ কর্‌বেন?

সরকার—গল্‌সোআর্থির "সিল্‌ভার বক্‌স্‌" (রূপার বাক্‌স), "লয়্যাল্‌টিজ্‌" (রকমারি ভক্তি), "জাষ্টিস্‌" (ন্যায়), 'স্ট্রাইফ' (দ্বন্দ্ব) ইত্যাদি নাটকগুলা সমাজ-সংস্কার, আইন-সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ক নীতিকথার ভরা। কিন্তু কোথাও প্রবন্ধ-রচনার কাঠামো দেখা যায় না। "ফর্সাইট সাগা" নামে তাঁর গোট-ছয়েক বড়-বড় গল্প বা উপন্যাস আছে। তার ভেতর পাবি ফর্সাইট নামক ধনি-পরিবারের কিচ্ছা। পয়সাওয়ালা ইংরেজ-নরনারীর নিত্যনৈমিত্তিক সু-কু এই কাহিনীগুলার ভেতর পাকড়াও কর্‌তে পার্‌বি। কিন্তু কোথাও পাবি না "আচার-প্রবন্ধ" বা "সামাজিক প্রবন্ধ"।

লেখক—আর কারু কথা বল্‌বেন?

সরকার—বার্নার্ড্‌ শ'-প্রণীত নাটকগুলা-সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। তবে শ'-সৃষ্ট চরিত্রগুলায় গল্‌সোআর্থি-সৃষ্ট চরিত্রসমূহের ষোলকলায় পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অনেক সময় দেখা যায় না। চরিত্রগুলা অনেকটা এক-পেশে, ঠিক যেন কোন নির্দিষ্ট মতের মূর্তি। শ'র রচনাবলীর ভিতর প্রচারের হিস্যা আপেক্ষিক হিসাবে খানিকটা স্পষ্ট। কিন্তু তবুও এসব দার্শনিক প্রবন্ধ নয়। শ' সত্যিকার সাহিত্যশিল্পী। অধিকন্তু হাসির হর্‌রা সৃষ্টি কর্‌তে

সে নং ১।

লেখক—শ'কে সাধারণতঃ সোশ্যালিস্ট বলা হয়?

সরকার—এইজন্যই প্রচারের ঝাঁজে শ-সাহিত্যে বেশ-কিছু তেজি গল্‌সোআর্থিক দরিদ্র-সেবক নির্যাতিতের সুহৃৎ বলা চলে। কিন্তু বাজারে নাম-লেখানো সোশ্যালিস্ট্‌ তাঁকে ব'ল্‌বো না। শ' বাজারী সোশ্যালিস্ট্‌দের অন্যতম।

ফ্রাঁস্‌ ও রলাঁ

লেখক—ইয়োরোপের অন্য কোনো সাহিত্য হতে দুএকজনের নাম কর্‌তে পারেন?

সরকার—ধর্‌, একালের ফরাসী আনাতল ফ্রাঁস্‌ আর রমাঁ রলাঁ। এই দুই জনই পাঁড়-প্রচারক। এঁদের প্রত্যেক লাইন নীতিকথায় ভরপুর। ফ্রান্সকে আর দুনিয়ার চব্বিশ ঘণ্টা জুতোনো হ'চ্ছে এই দুই সাহিত্যবীরের একমাত্র কাজ। ফরাসী-বিপ্লবের বিরুদ্ধে, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে, স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে, স্বজাতি-নিষ্ঠার বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো ছাড়া এঁরা আর কিছু জানেন না। এক কথায় ফ্রাঁস আর রলাঁ সোশ্যালিজম, কমিউনিজ্‌ম, বিশ্বশান্তি ইত্যাদি সম্পর্কিত ধর্মের বা নীতির উপদেষ্টা বা প্রচারক। অথচ এঁদের কোনো লেখায় ইস্কুলমাষ্টারী বা গুরু মশাইয়ের ধরন-ধারণ ঢুঁড়ে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় গল্প, চরিত্র, আর যোগাযোগ-সৃষ্টি।

লেখক—প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও এঁরা আপনার বিচারে সাহিত্যশিল্পী?

সরকার—তাইত ব'কে চ'লেছি। বিশ্বশান্তি, ধনসাম্য, গণতন্ত্র, জাতিমাত্রের স্বাধীনতা, প্রত্যেক দেশের স্বরাজ ইত্যাদি বিষয়ক ধর্ম বা নীতির স্বপক্ষে-বিপক্ষে লেখে অনেকে। পার্লামেণ্টের সভ্যেরা লেখে মজুর-সমিতির কর্মকর্তারা লেখে, অন্যান্য রাষ্ট্রিক দলপতিরা লেখে অধ্যাপকেরা লেখে, সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা লেখে। কিন্তু তাদের লেখালেখিতে সাহিত্যশিল্প বেরোয় না,— বেরোয় শুধু বয়েৎ, বুখ্‌নি, বাণী, মন্তব্য, কর্তব্যাকর্তব্য— এককথায় হিতোপদেশ। এরা সাহিত্যে শিল্পী নয়।

লেখক—আপনি ফ্রাঁস্‌ আর রলাঁর ধর্ম বা নীতি পছন্দ করেন?

সরকার—ফ্রাঁস্‌ আর রলাঁর ধর্ম বা নীতি আমি পছন্দ করি কিনা সেই প্রশ্ন বর্তমান আলোচনায় অপ্রাসঙ্গিক। বস্তুতঃ বক্তব্য বা বাণীগুলার সু-কু বিচার্য নয়। বিশ্বশান্তি, সমাজতন্ত্র, সাম্রাজ্য-বিরোধ, সার্বজনিক ভ্রাতৃত্ব, আন্তর্জাতিকতা, ইত্যাদি নীতি-সম্বন্ধে বকমারি মতামত থাকা খুবই সম্ভব। কিন্তু এঁদের সাহিত্যশিল্পটা অতি উঁচুদরের চিজ,—এই হ'চ্ছে আমার আসল কথা। এই দরের সাহিত্যবীর দুনিয়ার বিরল।

লেখক—কোন্‌ বইয়ের কথা বল্‌ছেন?

সরকার—এঁদের যে কোনো বইয়ের কথা বল্‌ছি। ফ্রাঁসের "পেঙুইন দ্বীপ" ফরাসী-দেশের বৃত্তান্ত। "তৃষিত দেবতা" বইয়ে আছে ফরাসী বিপ্লবের গল্প। রলাঁর রচনাবলীর ভেতর নাম করছি "আনেৎ ও সিলভী", 'গ্রীষ্ম' আর "মাতা পুত্র"। এই তিনটা বইয়ের সমবেত নাম "লাম আঁশাঁতে" (সংমোহিত চিত্ত)। এই সবের ভেতর সুনীতি-কুনীতি যা'হ'ক কিছু আছেই আছে। তার জোরে সাহিত্যবীর হওয়া যায় না। গল্প, চরিত্র ও অবস্থাগুলা সবই অদ্ভুত সৃষ্টি। প'ড়ে দেখ্‌বি। বুঝ্‌বি পয়লা-নম্বরের সাহিত্যশিল্প কাকে

বলে। ফরাসী নামের ইংরেজি তর্জমা দিয়ে গেলাম। বইয়ের তর্জমা গুলা সরস। ফরাসী ভাষা না জান্‌লেও ক্ষতি নাই।

("সাহিত্যের স্বরাজ না সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা।" ৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৩১)

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা

(১৯১১-৩৩)

১৯শে মে ১৯৪৩।

লেখক—রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে সমালোচনা-সাহিত্যের অবস্থা কিরূপ দেখ্‌ছেন?

সরকার—বেশ ভাল। বাড়্‌তির দিকে,—বহরে-আকারে-প্রকারে তো বটেই। সমালোচনা-প্রণালী, বিশ্লেষণের কায়দা, দোষ-গুণ-বিচারের মেজাজ সব-কিছুতেই বাঙালী লেখকেরা নতুন-নতুন লক্ষণ দেখাচ্ছে।

লেখক—দু একটা বইয়ের নাম করুন।

সরকার—রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে লেখক আজকাল অনেক। "বইয়ে"র লেখকের কথা বল্‌ছি। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্বন্ধে বক্তা শত শত। তাদের অনেকে বকেও ভাল। কয়েকটা স্মৃতিসভার সভাপতি হ'তে হ'য়েছিল। দেখেছি সাহিত্য-যাচাইয়ের কায়দা বেশ পেকে উঠেছে। তা'ছাড়া পত্রিকায় রবীন্দ্র-লেখক ডজন-ডজন। এই সব প্রবন্ধই কালে বই হ'য়ে দাঁড়াবে। অধিকন্তু বইও ডজন-ডজন। এই সব প্রবন্ধই কালে বই হ'য়ে দাঁড়াবে। অধিকন্তু বইও গণ্ডা-কয়েক বেরিয়েছে।

লেখক—কয়েকটা সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—সেকালের কথা আগে বলি। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে রবি-সম্বন্ধে কোনো "বই" ছিল না। ১৯১১ সনে রবীন্দ্রনাথের বয়স পঞ্চাশ বৎসর। সেই উপলক্ষে আমরা রবীন্দ্র-পূজার ব্যবস্থা করি। মহাসমারোহে সেই সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠিত হয় টাউন হলে, সাহিত্য-পরিষদে। সত্যেন দত্ত, চারু বন্দোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলি, যতীন বাগচী ইত্যাদি কবিগাল্পিকের দল রবীন্দ্র-পূজকদের ভেতর ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যদুনাথ সরকার, নাটোরের মহারাজ জগদীন্দ্র নারায়ণ রায় ইত্যাদি মাতব্বরেরাও ছিলেন। এই অধমও ছিল বেশ-কিছু উৎসাহী চাঁইদের অন্যতম।

লেখক—রবীন্দ্র-লেখকদের অবস্থা কিরূপ ছিল?

সরকার—এই হৈ-হৈ রৈ-রৈর দিনেও রবি-সম্বন্ধে কোনো "বই" দেখিনি। রবীন্দ্র-শিষ্য অজিত চক্রবর্তী একটা বড়-গোছের প্রশস্তিপ্রবন্ধ লিখেছিলেন। "প্রবাসী"তে বেরোয়। পরে বোধ হয় এটা বই হ'য়েছিল। দেখিনি। সর্বপ্রথম প্রকাশিত বই কোন্‌টা বলতে পার্‌বে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা। সন-তারিখের কারবার যারা করে। একালের ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় আর সজনী দাস বাঙ্‌লা-সাহিত্যের প্রত্নতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ। তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করিস্‌। ঠিক-ঠাক ব'লে দিতে পার্‌বে। এই অধমের "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" বেরোয় প্রবন্ধাকারে "গৃহস্থ" মাসিকে।

লেখক—সে তো ১৯১৩ সনে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে?

সরকার—ঠিক কথা। বল্‌ছি যে, সেটা প্রথমে বই ছিল না। "গৃহস্থ'র সেই সংখ্যাটার নাম ছিল "রবীন্দ্রনাথের দিগ্‌বিজয় সংখ্যা।" বই বেরোয় ১৯১৪ সনের প্রথম দিকে।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনা-হিসাবে এইটাই কি সর্ব প্রথম বই?

সরকার—আমি প্রত্নতত্ত্বের বেপারী নই। হিসাব ক'রে দেখা ভাল। তখনকার দিনে রবীন্দ্র-লেখকদের ভেতর ছিলেন চট্টগ্রামের শশাঙ্কমোহন সেন, আর আমাদের ন্যাশন্যাল কলেজের ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক—পরবর্তিকালে রবীন্দ্র-লেখকদের রচনাবলী কিরূপ?

সরকার—আবদুল ওদুদের "রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ" বেরিয়েছে একালে অর্থাৎ বিংশ-শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রে পরে। ১৯২৭ সনে। বইটা আকারে বড় নয়, যা হ'ক বই। আলোচনা চিত্তাকর্ষক। ১৯৩১ সনে হ'লো রবীন্দ্রের সত্তর বৎসর পূর্ণ। আবার কলকাতায় বড় মহোচ্ছব। এই উপলক্ষে বেরোয় ইংরেজিতে "গোল্ডন্ বুক অব টাগোর"। বাংলায় এলো "জয়ন্তী উৎসর্গ" নামক প্রবন্ধ-গুচ্ছ। সংগ্রহ-বইটা বহরে বেশ-কিছু বড়। এই অধমের কিঞ্চিৎ-কিছুও ইংরেজি আর বাংলা বই দুটায় পাওয়া যাবে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই আমার মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরিয়ান প্রভাত মুখোপাধ্যায়-প্রণীত "রবীন্দ্রজীবনী" (১৯৩৩)। দুই খণ্ডে প্রকাশিত। বইয়ের মতন বই। এই ধরণের বই লিখ্‌তে পারা যে-কোনো লেখকের পক্ষে গৌরব-জনক কাজ।

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী"

লেখক—কেন? বিশেষত্ব কী?

সরকার—বইটা ঠিক যেন রবীন্দ্র-সাহিত্যের রোজ-নামচা। রবির জন্ম হ'তে সুরু ক'রে প্রত্যেক বছরের ডায়েরির আছে এর ভেতর। প্রত্যেক বাঁ পৃষ্ঠায় মাথায় দেখতে পাবি ইংরেজি বছর আর ডান পৃষ্ঠায় মাথায় বাংলা বছর। রবীন্দ্রনাথের ফি বছর এখানে ধ'রে রাখা হ'য়েছে। জীবনকথা ত আছেই। ভ্রমণ-কাহিনীও আছে। তা ছাড়া আছে লেখালেখি বৃত্তান্ত। বক্তৃতা, বচসা, বিতণ্ডা, বকাবকি ইত্যাদিও বাদ যায় নি। তারপর পাবি রবির স্বপক্ষে-বিপক্ষে, লোকজনের, সভা-সমিতির আর লেখকদের মতামত। সবই সঙ্কলিত হ'য়েছে বয়স অনুসারে—বছর-বছর। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে প্রভাতের ব্যাখ্যা-সমালোচনাও কিছু-কিছু পাবি। কিন্তু বইটা আগাগোড়া বস্তুনিষ্ঠ। সকলের পক্ষেই যারপর-নাই জরুরি।

লেখক—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্র-ব্যাখ্যা বা রবীন্দ্র-সমালোচনা আপনার পছন্দসই?

সরকার—অনেক জায়গায়ই অমিল। তবে যে-কোনো ব্যাখ্যা আর সমালোচনা আমার ভাল লাগে। তাতে ব্যাখ্যাকার আর সমালোচকদের মেজাজ, দৃষ্টিভঙ্গী, জীবনদর্শন ইত্যাদি চিজ পাক্‌ড়াও কর্‌তে পারি। আবদুল ওদুদের "রবীন্দ্র-কাব্যপাঠ", চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবি-রশ্মি", প্রমথ বিশীর "রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ", নীহার রায়ের "রবীন্দ্র-সাহিত্যের

ভূমিকা" ইত্যাদি বইগুলা এইজন্য মূল্যবান্।

লেখক—কোন এ কথা বল্‌ছেন?

সরকার—রবির আলোয় পাঠকেরা রকমারিভাবে তেতে উঠেছে। পরস্পরে অমিল আছে বটে। এদের সকলের সঙ্গেই আবার এই অধমের অমিলও বেশ-কিছু দেখা যায় এখানে-সেখানে। কিন্তু লেখকে-লেখকে বা পাঠকে-পাঠকে অর্থাৎ ব্যাখ্যায়-ব্যাখ্যায় আর সমালোচনায়-সমালোচনায় যতই অমিল হ'ক, সর্বত্রই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে রবিকে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের কিস্মৎ এই সব পরস্পর বিরোধী মূল্য বা ব্যাখ্যার সমষ্টি। রবি এই সবই আর এই সবরে উপরও আর-কিছু।

লেখক—পরস্পর-বিরোধী রবীন্দ্র-ব্যাখ্যার দু-একটা নমুনা দেবেন?

সরকার—রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কোনো সমজদার বলে ব্রাহ্ম। কোনো সমজদার বলে হিন্দু। কারু কষ্টিপাথরে রবীন্দ্র-সাহিত্য পাশ্চাত্যের দাস, কারু কষ্টিপাথরে রবীন্দ্র-সাহিত্যের আসল প্রেরণা প্রাচ্য। কোনো কোনো লেখক রবীন্দ্র-সাহিত্যে পায় বিশ্বপ্রেম, অন্যান্যের বিচারে রবীন্দ্র-সাহিত্য স্বজাতিনিষ্ঠ। একালের সমালোচকেরা রবীন্দ্র-সাহিত্যে পায় "বুর্জোআমি" আবার কেহ-কেহ "রুশিয়ার চিঠি"-লেখকের ভেতর সাম্যবাদের গন্ধও পেয়েছে। "রক্ত-করবী"র ভেতর মার্ক্স্ আবিষ্কার কর্‌তে কেউ-কেউ রাজি। সেকালে একালের কেহ-কেহ রবীন্দ্র-সাহিত্যে দুর্নীতির বিশ্বকোষ পেয়ে থাকে। ঠিক উল্টা ব্যাখ্যাও বাজারে চ'লেছে চিরকালই।

লেখক—তাহ'লে রবীন্দ্রনাথকে চেনা যাবে কী ক'রে?

সরকার—সমালোচকদের মর্জি-মাফিক কতকগুলা মন-গড়া রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে গেছে। এই কথা ব'লেছি "যৌবনমূর্তি রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে। সেটা বেরিয়েছে "জয়ন্তী" উৎসর্গের প্রবন্ধগুচ্ছে (১৯৩১)। স্থিতিনিষ্ঠ মোহিত মজুমদার, আর "সামাজিক ব্যাখ্যাকার" বিনয় ঘোষ ও হুমায়ুন কবির ইত্যাদি সমালোচকদের রবীন্দ্র-যাচাইকে এই সকল রকমারি দরকষাকষির ভেতর ঠাঁই দিতে হবে। তাহ'লে পরস্পর-বিরোধী রবীন্দ্র-ব্যাখ্যার বহর ও বৈচিত্র্য বেশ-কিছু ফুটে উঠ্‌বে। রবীন্দ্রনাথকে চেনা কত কঠিন বুঝ্‌তে পারবি।

"রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী"

লেখক—আপনি রবীন্দ্র-ব্যাখ্যায় কোন্ পথের পথিক?

সরকার—১৯১৩-১৪ সনের "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" যে-পথের পথিক ছিল সেই পথ আজও ছাড়িনি। তবে সেকালে "ভারতের বাণী"কে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের বাণী হ'তে ষোল আনা তফাৎ ক'রে ফেলেছিলাম। সেভাবে তফাৎ করার রেওয়াজ আমি অনেক দিনই বর্জন ক'রেছি। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বিশ্বকোষ সম্‌ঝেছিলাম সে-যুগে। আজও সেইরূপ বিশ্বকোষই সম্‌ঝে চলি। রবীন্দ্রনাথের অমুক-অমুক বইগুলা খাঁটি রৈবিক আর অন্যান্য বইগুলা অ-রৈবিক বা আধা-রৈবিক, এমন চিন্তা আমার মগজে ঠাঁই পায় না।

লেখক—সে-যুগের রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতর কিরূপ বিশ্বকোষ দেখেছিলেন?

সরকার—বইটার সূচীপত্র ঘাঁট্‌লেই বুঝা যাবে। কিছু-কিছু উদ্ধৃত কর্‌ছি—"রবীন্দ্রনাথের দিগ্‌বিজয়, কাব্য-রচনা ও স্বদেশ-সেবা, স্বদেশের স্বর্ণ-সিংহাসন, রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈষ্ণবের ভক্তিযোগ, ভক্তিতত্ত্বে প্রকৃতি-পূজা, কবিবরের শাক্তভাব, পরং ত্যাগবলং বলম্‌, কাব্যে বিপ্লব-তত্ত্ব বা আদর্শবাদ, প্রকৃতি-পূজা বা স্বাধীনতার গান, মিস্টিসিজম, অধ্যাত্মবাদ, রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্ব, কালিদাসের পরিপূর্ণ হিন্দুজগৎ, রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা ইত্যাদি।

লেখক— দেখ্‌ছি অনেক জিনিষই আছে? কিছু প'ড়ে শুনান না?

সরকার—আচ্ছা, তবে শোন্‌ (পৃঃ ১২১)! "কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত ভক্ত, কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত শাক্ত, কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্ত প্রেমিক। কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের ন্যায় অসীমের ও ভূমানন্দর উপাসক। কবি-হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিবেকাননেন্দর ন্যায় স্বদেশভক্ত,—সর্বত্যাগী শঙ্করের পূজা-প্রবর্তক। কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবের প্রতিমূর্তি, প্রকৃতি-রাজ্যের প্রজা, পল্লী-রাণীর ভৃত্য, স্বাধীনতার চারণ।"

লেখক— বেড়ে শুনাচ্ছে। আর কিছু পড়ুন।

সরকার—"যদি ভারতবর্ষ কখনও বিক্রমাদিত্যের গৌরবযুগ ছাপাইয়া উঠিয়া জগতের কর্মক্ষেত্রে মাথা তুলিতে পারেন—সেই দিনকার ভারতবাসী ভারতবর্ষকে কালিদাসের জন্মভূমি অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের জন্মভূমি বিবেচনা করিয়া গৌরব করিবেন। সেদিন যদি না আসে—তাহা হইলেও কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথকে একই সিংহাসনে বসাইয়া তুল্য আনন্দ উপভোগ করিবেন। আমাদের জাতীয় জীবন ভবিষ্যতে যেরূপ দাঁড়াইবে, তাহার উপরই কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের তুলনা ও আসন-বিভাগ নির্ভর করিতেছে।"

লেখক—কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের তুলনা সম্বন্ধে এই ত্রিশ বৎসরে আপনার মত কিছু বদ্‌লেছে?

সরকার—আধ কাঁচ্চাও নয়। বরং যা-কিছু ব'লেছি, তা ফ'লে আস্‌ছে। দেখ্‌বি তোরা আরও কিছুকাল পরে হয়তো।

"সন্ধ্যা-সঙ্গীত"-এর পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্য

লেখক—প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী"-সম্বন্ধে আর কিছু বলুন।

সরকার—মাঝে-মাঝে রবীন্দ্রনাথের রচনা-সম্বন্ধে প্রভাতের টীকা-টিপ্পনী দেখ্‌তে পাই। তাতে বলা হ'য়েছে কোনো-কোনো রচনা ছেলেবেলার লেখা, অতএব তুচ্ছ, রবির উপযুক্ত নয়। পাকা হাতের মাল হ'লে অন্যরূপ হ'তো ইত্যাদি। এই ধরণের ব্যাখ্যা, সমালোচনা বা টিপ্পনী অন্যান্য লেখকের রচনায়ও দেখা যায়। তাঁরা রবির নির্দ্দিষ্ট বয়সের পরবর্তী রচনাকে খাঁটি রৈবিক বল্‌তে অভ্যস্ত। প্রত্যেকেই-নিজ-নিজ খেয়াল-মাফিক এক-একটা মন-গড়া রবি আবিষ্কার ক'রেছে। প্রথম বিশীর "রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ" (১৯৩৯) বইয়েও এই রেওয়াজ দেখ্‌তে পাই।

লেখক—আপনি এই সকল টীকা-টিপ্পনী-সম্বন্ধে কী বল্‌তে চান?

সরকার—রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই নিজ রচনাবলী সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা সমালোচনা টিপ্পনী

চালিয়ে গেছেন। তাঁর বাণী, নির্দেশ, ইসারা বা হুকুম-মাফিক যেন সমালোচকেরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ব্যাখ্যা চালাচ্ছে মনে হচ্ছে। রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্বন্ধে খোদ রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য আমাদের কোনো-কোনো সমজ্‌দার বিনা বাক্যব্যয়ে সুবোধ বালকের মতন মেনে চল্‌ছে। বড়ই আশ্চর্যের কথা।

লেখক—সে কী রকম?

সরকার—রবীন্দ্রনাথের মতে "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" (১৮৮২) হচ্ছে তাঁর কবি-জীবনের সর্বপ্রথম খুঁটা। তখন তাঁর বয়স বছর একুশেক। তার আগেকার রচনাবলীকে তিনি আমল দিতে প্রস্তুত নন।

লেখক— কেন নন?

সরকার—এই সমস্যারই বিশ্লেষণ হওয়া উচিত। রবীন্দ্র-মতের সমালোচনাটা দস্তুর-মাফিক চিত্ত-সমালোচনার চিজ্। তিনি তাঁর কৈশোর আর যৌবনের কাজকর্ম-সম্বন্ধে এত বেশী উদাসীন কেন? বস্তুতঃ এতটা বিরোধী কেন? কোন্ বয়সে তিনি এই সবকে নকড়া-ছকড়া বল্‌তে সুরু ক'রেছেন? এই সকল প্রশ্নের বিশ্লেষণ অনেকটা সাইকো-আনালিসিস্ বা চিত্ত-বিকলনের অন্তর্গত। সেইদিকে বহুসংখ্যক লেখকের মন দেওয়া উচিত।

লেখক—আপনার মত কিরূপ?

সরকার—আমার বিচারে সেই সব রচনা ফেলিতব্য চিজ্ নয়। আমি মুখ্‌খু মানুষ। আমার মোটা বুদ্ধিতে এই সবের ভেতর রবীন্দ্র-শিল্পের আর রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বের বড়-বড় খুঁটা পাওয়া যায়। রবীন্দ্র-সাহিত্যের গোড়ার কথা তো পাওয়া যায়ই। একমাত্র গোড়ার কথার জন্য এই সবকে তারিফ-যোগ্য বিবেচনা কর্‌ছি, এরূপ ভাবা উচিত নয়। এইসব যে-কোনো প্রতিভার পক্ষে খুব উল্লেখযোগ্য স্তম্ভ। কাব্য-হিসাবে এসব তুচ্ছ নয়। তা ছাড়া সমগ্র রবীন্দ্র-সৃষ্ট দুনিয়ার উৎস ও প্রেরণাগুলার অনেক-কিছু একুশ বৎসর বয়সের পূর্ববর্তী রচনাবলীর ভেতর পাক্‌ড়াও কর্‌তে পারি। "সন্ধ্যা-সঙ্গীত" এর পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্বন্ধে গবেষক চাই অনেক।

বিদেশী আড্ডায়-আড্ডায় রবীন্দ্রনাথ

লেখক— প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-জীবনী" কোনো দিকে অসম্পূর্ণ নয় কি?

সরকার—দু-একটা বিষয়ে কিছু অসম্পূর্ণ মনে হ'য়েছে। তবে কোনো-এক গবেষক বা সঙ্কলন-কর্তার পক্ষে সকলদিকে নজর দেওয়া সম্ভবপর নয়। প্রভাতের পক্ষেই দিতে পার্‌লে ভাল হ'তো। আসল কথা, নতুন-নতুন গবেষক চাই।

লেখক— কোন্ কোন্ দিকের জন্য গবেষণার কথা বল্‌ছেন?

সরকার—প্রত্যেক লেখক, শিল্পী, দার্শনিক, ধর্ম-প্রচারক, বক্তা, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি কৃতী লোক-সম্বন্ধে আমি চাই তার লাইব্রেরীর বৃত্তান্ত। বিশেষতঃ রবির মতন পড়ুয়া সাহিত্য-স্রষ্টা-সম্বন্ধে। কোন্-কোন্ দেশী-বিদেশী বই তাঁর ঘরে-লাইব্রেরিতে-বৈঠকখানায় দেখা যেতো? কোন্-কোন বইয়ে তাঁর নিজের হাতের দাগ দেখ্‌তে পাওয়া যায়? এইসব পড়াশুনার ভেতর হয়ত রবীন্দ্র-সাহিত্যের মস্ত-মস্ত উৎস বা প্রেরণা র'য়েছে। তা যে জানে না, সে রবির মুড়োটা আর হৃদয়টা পুরাপুরি দখল কর্‌তে পারবে না। পড়াশুনার

বহর ও দৌড় থেকে অবিষ্কার করতে হবে দেশী-বিদেশী প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার গড়ন।

লেখক—আর কোনো বিষয়ে তথ্যের অভাব আছে "রবীন্দ্র-জীবনী" বইয়ে?

সরকার—রবীন্দ্রনাথের পরিবার ছিল সে কালের কল্‌কাতায় দেশী-বিদেশী-সমাগমের বৃহত্তম আড্ডা। পাশ্চাত্য লোকজন বিশেষতঃ ইংরেজ-নরনারী ঠাকুর-পরিবারে ঢুঁ মেরে গেছে কত-গণ্ডা বা কত-ডজন ফি বছর? তা জানা আবশ্যক। রবীন্দ্র-শিল্পের কথাবস্তু আর প্রেরণা বুঝ্‌বার জন্য এসব জানা চাই। উনবিংশ-শতাব্দীর মাঝামাঝি হ'তে ১৯০৫ পর্যন্ত যুগটায় কল্‌কাতার ভেতর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বারোআরিতলা বেশী ছিল না। এইদিকে ঠাকুর-গুষ্টির বিশেষত্ব খুব-বেশি।

লেখক—আজকাল কি বাঙ্‌লাদেশে দেশী-বিদেশীর যোগাযোগ অনেক-বেশী?

সরকার—আজকাল অনেক বাঙালীর সঙ্গে পাশ্চাত্য নরনারীর মেলামেশা ঘট্‌ছে উল্লেখযোগ্যরূপে। বিদেশে ত ঘটেই। দেশের ভেতরে, কলকাতায়, মায় মফঃস্বলেও বাঙালীরা বিদেশীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায়। ১৯০৫ সনের পূর্ববর্তী ষাট-সত্তর বছর ধ'রে ঠাকুরবাড়ীই ছিল বাঙালী-জাতের পক্ষে প্রায় একমাত্র দেশী-বিদেশী-যোগাযোগের বাথান। সেই একচেটিয়া অবস্থা বর্তমানে আর নাই।

লেখক—ঠাকুর-বাড়ীর দেশী-বিদেশী-মেলামেশা-সম্বন্ধে কিরূপ তথ্য চান?

সরকার—সেই বাথানের প্রভাব রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশ্লেষিত হওয়া উচিত। রবির পক্ষে ঘরে ব'সেই দুনিয়াকে স্পর্শ কর্‌বার, বিশ্বশক্তির সঙ্গে দহরম-মহরম চালাবার সুযোগ জুটেছিল চরমভাবে। তা ছাড়া রবি নিজেই দুনিয়ার পায়চারি ক'রেছেন বহুবার। জ্যোতিষ ঘোষ প্রণীত "বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ" (১৯৪২) প'ড়ে দেখ্‌বি। তাতে দ্বাদশবার রবিকে দেখ্‌তে পাবি ভবঘুরে বা দুনিয়া-পর্যটকরূপে।

লেখক—বিশ্বভ্রমণের প্রভাব রবীন্দ্র-সাহিত্যে আপনি খুব বেশী দেখ্‌তে পান?

সরকার—আমার মতামত সম্প্রতি আলোচ্য নয়। তবে বক্তব্যটা অতি সোজা। রবীন্দ্র-ব্যক্তির সঙ্গে কল্‌কাতা, শিলাইদহ, হিমালয়, কাশ্মীর ইত্যাদি ভারতীয় প্রকৃতি, নরনারী ও সমাজের যোগাযোগ রাবীন্দ্রিক সাহিত্যের ও শিল্পের একমাত্র তথ্য নয়। বিলাত, ইয়োরামেরিকা,এশিয়া আর আফ্রিকার নদী-পাহাড় আর পুরুষ-নারীও এই বিপুল কাব্য-গদ্য-চিত্রশিল্পে দেখ্‌তে হবে। লণ্ডনের আড্ডায়-আড্ডায়, নিউইয়র্কের আড্ডায়-আড্ডায়, প্যারিসে আড্ডায়-আড্ডায়, বার্লিনের আড্ডায়-আড্ডায়, মস্কোর আড্ডায়-আড্ডায়, বিউনস্ আইরেসের আড্ডায়-আড্ডায়, তোকিওর আড্ডায়-আড্ডায়, পিকিঙের আড্ডায়-আড্ডায় রবীন্দ্রনাথ আড্ডাধারী। রবির এই ভবঘুরে মূর্তি আগে ধ্যান কর, তবে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে প্রবেশ কর্‌তে পার্‌বি। তার আগে রবীন্দ্র-কাব্য, রবীন্দ্র গদ্য,রবীন্দ্র-চিত্রাবলী-সম্বন্ধে ষোল আনা সমজ্‌দার হওয়া অসম্ভব।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিদেশের প্রভাব-সম্বন্ধে এত কথা বল্‌ছেন কেন?

সরকার—কবিরা, গায়কেরা, চিত্র-শিল্পরা, ধর্মপ্রচারকেরা, রাষ্ট্রিক লেখকেরা গাছ-পাথরের জিনিষ নয়। তারা হাত-দাঁতের মানুষ, কলিজা-মগজের মানুষ, রক্তমাংসের মানুষ। দুনিয়ার সব-কিছুর সঙ্গে, মায় পুরুষ-নারীর সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে লোকগুলা চাঙ্গা হ'য়ে উঠে। প্রত্যেক দিন সকালে-বিকালে, সন্ধ্যায়-রাত্রিতে রবিকে বার বারে কম্‌-সে কম হাজার দু'তিনেক পুরুষ-নারীর সঙ্গে বচসা কর্‌তে হ'য়েছে।

ভবঘুরে রবীন্দ্রনাথ

লেখক—এই সকল যোগাযোগের কথা কেন তুলছেন?

সরকার—সেই সকল বচসার মাল পাবি তাঁর বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, গল্প-সাহিত্যে, গানে, কবিতায়, ছবিতে। কোথাও হয়ত দেখ্‌বি সমালোচনা, কোথাও তীব্র প্রতিবাদ। আবার বোধ হয় কোথাও সমঝৌতা, কোথাও কোলাকুলি। কোনো বচসার ফল হয়ত ভাঙার উন্মাদনা বা উদ্দীপনা। আর কোনো বচসায় হয়ত এসে জুটেছে গড়্‌বার তেজ, ভাবুকতা ও শক্তি। একমাত্র সোনার বাঙলার চেহারা আর বাঙালী-নরনারীর মূর্তি দেখে রবীন্দ্র-হৃদয়ে তেতে উঠেনি। রবীন্দ্র-হৃদয়ে ইয়োরামেরিকান আর এশিয়ান এবং আফ্রিকান প্রকৃতি ও পুরুষ-নারী জবরদস্ত প্রভাব ছড়িয়েছে। রবীন্দ্র-মগজ-বিশ্লেষণের সময় বিদেশে ঘরকন্নার তথ্যগুলা আর বিদেশে আড্ডামারার মারপ্যাঁচগুলা-সম্বন্ধে ওয়াকিব্‌হাল হওয়া উচিত। অবাঙালী রবি ও অন্যতম রবীন্দ্রনাথ।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিদেশী-প্রভাব-সম্বন্ধে সমালোচকেরা ওয়াকিব্‌হাল নয় কি?

সরকার—সাধারণতঃ বলা চলে যে, প্রত্যেক সমালোচকই অজ্ঞাত সারে বিদেশী-প্রভাব, স্বীকার ক'রে চলে। প্রায় সকলের পক্ষেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ একপ্রকার প্রথম স্বীকার্য। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বপ্রেমিক খাড়া কর্‌তে যারা উঠে প'ড়ে লেগেছে তারা ভারতের সঙ্গে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বিশ্লেষণ কর্‌তে অভ্যস্ত। কিন্তু আমি ঠিক এই ধরণের পাশ্চাত্য-প্রভাব, ইংরেজী-শিক্ষার প্রভাব, বিশ্বশক্তির আন্দোলনের প্রভাব ইত্যাদি মামুলি বস্তুর কথা তুল্‌ছি না। এসব তো হাতের পাঁচ। যে-কোনো ভারতীয় পুরুষ-নারী-সম্বন্ধে বিদেশী-প্রভাব উহ্য বুঝে নিতে হবে।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশ্বশক্তির প্রভাব-সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য তা হ'লে কী?

সরকার—আমি বল্‌ছি যে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের আর রবীন্দ্র-চিত্রা-বলীর প্রায় সব-কিছুই বিদেশী লোকজনের সঙ্গে নিবিড়তম ঘেঁসা-ঘেঁসির ফল। স্বদেশের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান ত আছেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে আর ছবিতে কোনো-না-কোনো বিদেশী-অভিজ্ঞতা সর্বদাই অজ্ঞাতসারেও কিছু-না-কিছু কাজ ক'রেছে। ভবঘুরের প্রভাব প্রচুর।

লেখক—এই সব অভিজ্ঞতা কিরূপ?

সরকার—হয়তো কোনো বিদেশী থিয়েটারে নাচ-গান-বাজনা দেখা, অথবা কোনো বিদেশী মজলিশের খোস-গল্পে হিস্যা নেওয়া। কোনো বিদেশী পরিবারে কাফি খেতে-খেতে হয়তো রবির প্রাণে কোনো উৎসাহ জেগেছে। কখনো বা কোনো বিদেশী হোটেলে বসবাস কর্‌বার সময় কোনো অজানা অতিথির কথাবার্তায় প্রাণ চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে। তা ছাড়া বিদেশী লেখকদের বই পড়া ত আছেই। বিদেশী রাষ্ট্রিকদের সঙ্গে তর্কাতর্কি চালানো আর হাতাহাতি করাই বা কম রসদ জুগিয়েছে কি? অধিকন্তু বিদেশী চিত্রকর, সঙ্গীতের ওস্তাদ আর নর্তক-নর্তকীদের সঙ্গে মেলামেশার দাগ রবীন্দ্র-সাহিত্যে আর রবীন্দ্র-শিল্পে ঢুঁড়্‌বার ব্যবস্থা থাকা চাই। তবে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন আর সমগ্র সৃষ্টি যাচাই করা সম্ভব হবে। একমাত্র উপনিষদ্‌, কালিদাস, বৈষ্ণব-পদাবলী, কবিকঙ্কন, হেমচন্দ্র আর বিহারীলাল ঘাঁট্‌লে চল্‌বে না। ভবঘুরে রবীন্দ্রনাথ রকমারি।

লেখক—কোনো রবীন্দ্র-সমালোচকের রচনায় বিদেশ-ভ্রমণের প্রভাব-সম্বন্ধে বিশ্লেষণ

দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—এখনও উল্লেখযোগ্য আকারে দেখ্‌তে পাইনি। তবে প্রমথ বিশীর "রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ" বইয়ে (১৯৩৯) বিদেশী-প্রভাবের ইসারা আছে। কিছু বিশ্লেষণ পাবি শেলী, কীট্‌স্‌ ও কালিদাসের সঙ্গে রবির তুলনায়।

লেখক—কি সেই ইসারা?

সরকার—প্রমথ বিশীর বই হ'তে উদ্ধৃত কর্‌ছি (পৃ. ১৩):— "চারিবার দীর্ঘ বিদেশ-যাত্রার পর কাব্যউৎসের নূতন ধারা খুলিয়া গিয়াছে:— (১) ১৮৭৮-১৮৮০ পর্যন্ত বিলাতে বাস। ১৮৮২-তে "সন্ধ্যাসঙ্গীত" প্রকাশিত। (২) ১৮৯০-এ কয়েক মাস বিলাতে অবস্থান। "চিত্রাঙ্গদা", "বিদায় অভিশাপ" ও "সোনার তরী" প্রভৃতি ১৮৯১-৯৩-তে লিখিত। (৩) ১৯১২-১৩ সতেরো মাস ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় ভ্রমণ, ১৯১৪-তে "বলাকা"র কবিতা-রচনা আরম্ভ। (৪) ১৯২৪-২৫-এ দক্ষিণ আমেরিকার পথে "পূরবী"র যাত্রী-অংশের অধিকাংশ কবিতা লিখিত।"

লেখক—এই চার যুগ-সম্বন্ধে আপনি কী বলছেন?

সরকার—এই যুগ-বিভাগের স্বপক্ষে-বিপক্ষে আমি কিছু বল্‌ছি না। বল্‌ছি শুধু এই যে, রবির হাতে যা-কিছু বেরিয়েছে, তার প্রায় সবকিছুর সঙ্গে বিদেশ অল্প-বিস্তর সুজড়িত। প্রমথ বিশীর বইয়ে বিদেশ-ভ্রমণের কথা আছে। দেখা যাচ্ছে যে, বাঙালী সমালোচকের নজর ঐ দিকে গেছে। এই সম্বন্ধে সুবিস্তৃত বুঝাপড়া চাই।

মন-গড়া রবীন্দ্রনাথ

২৬শে মে ১৯৩৪

লেখক—আপনি সমালোচকদের "মন-গড়া রবীন্দ্রনাথ" সম্বন্ধে কয়েকবার ব'লেছেন। এখন জান্‌তে চাই—"সন্ধ্যা-সঙ্গীত" এর পরবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যের সবটাই এঁদের চিন্তার রৈবিক কি?

সরকার—আগেই ব'লে চুকেছি,—মন-গড়া রবীন্দ্রনাথ গুলা রকমারি। যার যেরূপ খেয়ালে সে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সেইটুকুকে রৈবিক বলে। অন্যান্য সব-কিছু হ'চ্ছে তাদের বিবেচনায় তুচ্ছ,—রবির অনুপযুক্ত, অ-রৈবিক, ফেলিতব্য, বর্জনীয় মাল।

লেখক—"মন-গড়া রবীন্দ্রনাথ'-সম্বন্ধে দু'একটা দৃষ্টান্ত দিন।

সরকার—যারা রবি ধর্মমতে পাগল তারা ধর্ম-বহির্ভূত রবীন্দ্ররচনালী ধর্তব্যের ভেতর বিবেচনা করে না। বিশ্ব-প্রেমিক রবিকে নিয়ে অনেক মাতামাতি করে। তাদের পক্ষে স্বদেশ-সেবক রবীন্দ্রনাথ নগন্য। সেদিন আমার ছেলেবেলার বন্ধু ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট সুকুমার চট্টোপাধ্যায় বল্‌ছিল:—"জানিস্‌, বিনয়, একালের রবীন্দ্রসমালোচকদের ভেতর এমন-এমন পণ্ডিতও আছে, যারা "বলাকা" (১৯১৬) বইয়ের পূর্ববর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্যের খবরই রাখে না।" সুকুমারের দেওয়া খবরটা বোধ হয় আজগুবি নয়। প্রত্যেক পাঠকই এক-একটা মনগড়া রবীন্দ্রের মালিক। দুনিয়ার অধিকাংশ লোক "এক তারাতে একটি যে তার, আপন মনে সেইটি বাজাতে" ভালবাসে। রাবীন্দ্রিক সেতারে বা বীণায় একাধিক সুর, বিশ্বসুর বেরোয়। এক তারাওয়ালাদের কাছে এই বৈচিত্রপূর্ণ বিভিন্নতায় ভরা বিশ্বসুর

বেসুরো অসুরের তাণ্ডব মাত্র। ইহাতে বেচারা রবির কী দোষ? "যৌবন-মূর্তি রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে (১৯১৩) ব'লেছি—"বিশ্বকোষ ঘাঁটতে ব'সে লোকে করে হাহাকার।"

লেখক—এই ধরণের মনগড়া রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কেন?

সরকার—লম্বা-আয়ুওয়ালা সাহিত্যবীরদের বরাতই এইরূপ। জার্মান গ্যেটের কপালেও তাই জুটেছে। ফরাসী ভিক্তর উগোকে নিয়েও ফরাসীরা এই কাণ্ড ক'রেছে।

লেখক—এর কারণ কী?

সরকার—কারণ অতি সোজা। ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয়"ঘেঁটে (পৃঃ ৫৫) দেখ্‌ছি রবির প্রথম কবিতা লেখা হয় বার বৎসর বয়সে। নাম "অভিলাষ"। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় সেটা ছাপা হয়েছিল ১৮৭৪ সনের নবেম্বর মাসে। তখন কবির বয়স তেরো বৎসর সাত মাস। "হিন্দু মেলার উপহার" লেখা হ'য়েচিল ১৩ বৎসর নয় মাস বয়সে (১৮৭৫ ফেব্রুয়ারী)। সেটা ঠিক যেন হেমচন্দ্রের রচনা। রবির লেখা শেষ হয় আশী বৎসর বয়সে মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে (১৯১৪সনে)। সাতষট্টি-আটষট্টি বৎসর ধ'রে যে-লোকটা লেখে, তার লেখার সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে পারে কে? কাজেই কোনো মিঞা বলে যে, কবিতাতো কবিতা "কড়ি ও কোমল" (১৮৮৬) কবিতা। কারু মতে " সোনার তরী"র (১৮৯৪) কবিই আসল রবি। কেউ খায় "নৈবেদ্য" (১৯০১), কেউ চায় 'গীতাঞ্জলি" (১৯৯০), কেউ-কেউ "বলাকা" (১৯১৬) পর্যন্ত এসে ঠেকে। তার পরে অনেক পাঠক এগুতে পারেনি। অপর দিকে যারা "পূরবী" (১৯২৫) হ'তে "শেষলেখা" (১৯৪১) পর্যন্ত মালের বেপারী তাদের অনেকেই আবার "বলাকা" (১৯১৬) হ'তে "সন্ধ্যা সঙ্গীত" (১৮৮২) পর্যন্ত মাল-সম্বন্ধে নির্বিকার। বিকাল বেলাটা নিয়ে যারা আছে, তারা দুপুরও চেনে না, সকাল ত চেনেই না। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিপুল বহরের সঙ্গে কুস্তি চালানো যে-সে হাড়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

লেখক—সম্ভব হয় না কেন?

সরকার—তার কারণ রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব রোজ-রোজই বেড়ে চ'লেছে—"হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া গাহিয়া গাহিয়া গান"। ষাট-সত্তর বছর ধ'রে হাজার মূর্তিতে, হাজার কাজ-কর্মে, হাজার আন্দোলনে দেখা দিয়েছে এই ব্যক্তিত্ব। কখনো কোনো একটা নির্দিষ্ট গর্তে প'ড়ে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব দিশেহারা হয় নি। পাঠকেরা অধিকাংশই কোনো দাগদেওয়া ব্যক্তিত্বেব অধিকারী। "মোল্লার দৌড় মসজিদ্ অবধি"। "কড়ি ও কোমল" যার পেটে সয়, তার পেটে হয় ত "নৈবেদ্য"ই বেমাল। "গীতাঞ্জলি" পর্যন্ত সে উঠ্‌তে পারে না। তাকে "বলাকা"র আশমানে তুলে ঠেকানো যাবে কী ক'রে? "জন্মদিনে" (১৯৪১) বা "শেষলেখা" তার বরদাস্ত হবে না। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, কোনো-কোনো দলে "নৈবেদ্য"-"গীতাঞ্জলি"র জয়জয়কার, কোনো কোনো দলে "বলাকা"র জয়জয়কার, আর কোনো-কোনো দল "নবজাতক" (১৯৪০) নিয়ে মশ্‌গুল।

"বলাকা"র পরবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্য

লেখক—আপনি রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোন্ গর্তে প'ড়েছেন?

সরকার—ভায়া, আমি আনাড়ি। কোনো গর্তে-ঠর্তে পড়িনি। হনুমানের গন্ধমাদন উপ্‌ড়ে নিয়ে আসা মনে আছে তো? আমার মুখে ল্যাজায়-মুড়োয় সব নিয়ে রবি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের আগা-পাছা কিছুই বাদ দিতে রাজি নই। রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাল বেলাটায়ও আমি রাবীন্দ্রিক তেজ পেয়ে থাকি। জার্মান-সাহিত্যের আসরে একটা মজার তক্কা-তক্কি আছে। হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল।

লেখক—কী সেটা?

সরকার—গ্যেটের "ভিলহেল্ম মাইস্টার" নামক ঢাউস্ উপন্যাসটার প্রথম অংশ লেখা হবার অনেক বৎসর পরে লেখা হয় দ্বিতীয় অংশ। জার্মান-পাঠক-মহলে এই দুই অংশ নিয়ে ঘোঁট-মঙ্গল চলে জবর। অনেকের মতে প্রথম অংশটা ("পাঠ্যাবস্থা", ১৭৭৮-৯৬) আসল গোটে-শিল্প। দ্বিতীয় অংশটা ("ভ্রমণ", ১৮২১) বুড়োমিতে ভরা অপদার্থ। জগদ্বিখ্যাত "ফাউস্ট্" নাটক-সম্বন্ধেও এই লড়াই চ'লেছে। এই নাটকের দুই অংশ। প্রথমটার (১৮০৮) সঙ্গে দ্বিতীয়টার (১৮৩২) কোনো যোগ নাই। মিল্‌টনের "প্যারাডাইজ্ লস্ট্" বইয়ের সঙ্গে "প্যারাডাইজ রিগেইণ্ড" বইয়ের যেমন যোগ নাই। "ফাউস্ট্" নাটকের দ্বিতীয় অংশ বেরোয় প্রথম অংশের অনেক বছর পরে (১৮৩২)। একদল সমালোচক দ্বিতীয় অংশকে দার্শনিকতায় আর বস্তুনিষ্ঠায় ভরপুররূপে তারিফ করে। আর একদল বলে ঐ অংশটা কাব্যই নয়। কাব্য তো কাব্য প্রথম অংশ "ফাউস্ট্" কাব্য। বস্তুতঃ দুনিয়ার লোকেরা "ফাউস্ট্" বল্‌লে প্রথম অংশটাই বুঝে। অনেকেই দ্বিতীয় অংশের নাম পর্যন্ত শুনেনি। আমার পক্ষে "ফাউস্ট্" আর "ভিল্‌হেল্ম মাইস্টার" দুইই আগাগোড়া গ্যেটে-সাহিত্য।

লেখক—আপনি রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে বুড়োমির কোনো লক্ষণ দেখেন নি?

সরকার—"যৌবনমূর্তি" রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে (১৯৩১) আমি রবিকে চিরযুবা ব'লে পূজা ক'রেছি। তা সত্ত্বেও বল্‌বো যে, লম্বা-মেয়াদের জীবনওয়ালা শিল্পীরা, সাহিত্য-সেবীরা দুনিয়ার সঙ্গে তাল রেখে চল্‌তে পারে না। কি পাঁচ-সাত-দশ বৎসর পর-পর সংসারের গতিভঙ্গী বদ্‌লে যায়। আর্থিক, রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক সবকিছুরই নল্-নলচে বৎসর পঁচিশ-ত্রিশের ভেতর রূপান্তরিত হয়। কাজেই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পেরোবার পর রাষ্ট্রিক জননায়কগণের মতন শিল্প-সাহিত্যের স্রষ্টারাও প্রায়ই সংবাদপত্রের পেছনকার সংখ্যাগুলার মতন সেকেলে হ'তে থাকে। যাট্ পেরুলে অবস্থা হয় আরও কাহিল। সত্তরের পর ত কথাই নাই। কি গ্যেটে, কি ভিক্তর উগো, কি রবি, এঁদের সকলের সম্বন্ধেই ঘুণ ধরার অবস্থা এসেছিল বলা চলে। তাতে এঁদের মহত্ত্বের কদর কমে না। এই মাত্র স্বীকার করা হয় যে, এঁরাও রক্তমাংসের মানুষই বটে। সুতরাং বিশ-পঁচিশ বছরের ছোক্‌রা পাঠকেরা পঞ্চান্ন-পঁয়ষট্টি বছরের প্রবীণ সাহিত্য-বীরদেরকে বাতিল বিবেচনা ক'র্‌লে সাধারণতঃ কিছু অন্যায় করা হয় না।

রবীন্দ্র-চিত্তের ক্রম-বিকাশ-সম্বন্ধে প্রমথ বিশীর বই

৩১শে মে ১৯৪৩

লেখক—"রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ" বইয়ের ভিতর কী আছে?

সরকার—"সোনার তরী" (১৮৮২) হ'তে "বলাকা" (১৯১৬) পর্যন্ত বছর পঁয়ত্রিশেকের রবীন্দ্র-কাব্যের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা এই বইয়ের মাল।

লেখক—ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কোনো বিশেষত্ব দেখ্‌তে পেয়েছেন?

সরকার—রবীন্দ্র-চিত্তের ক্রম-বিকাশ বুঝাতে গিয়ে লেখক রবীন্দ্র ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলা খুলে ধর্‌তে চেষ্টা ক'রেছেন।

লেখক—উপাদানগুলা কী কী?

সরকার—লেখকের মন্তব্য-মাফিক—এক কথায় বলা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রের চিত্তে দুই পরস্পর-বিরোধী শক্তির খেলা চ'লেছে। একদিকে তথ্য, আর একদিকে সত্য। সীমায় আর অসীমে লড়াই বা দ্বন্দ্ব হ'চ্ছে রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব আর রবীন্দ্র-কাব্যের খুব মোটা কথা। অন্য এক তরফ হ'তে এই দ্বন্দ্ব হ'চ্ছে মানবিকতা আর ভগবদ্ভক্তির লুকোচুরি খেলা। রবীন্দ্র-চিত্তে যদি কিছু সমন্বয় থাকে, তবে তা ঢুঁড়্‌তে হবে তাঁর প্রকৃতি-নিষ্ঠায়। রবি একমাত্র আনন্দের বেপারী নন। রবীন্দ্র-কাব্য "অশান্ত" রসও বেঁটেছে দেদার।

লেখক—প্রমথ বিশীর এই বিশ্লেষণ বা সমালোচনায় মার্ক্‌স্‌-পন্থী সামাজিক ব্যাখ্যা আছে?

সরকার—বিলকুল নাই বরং ঠিক উল্টা। একটু-আধটু দেশ-বিদেশ, পদ্মা-পাহাড় ইত্যাদি আবেষ্টন-সংক্রান্ত সংবাদ আছে বটে। কিন্তু লেখক সামাজিক ব্যাখ্যাকার নন। প্রমথ বিশী কট্টর চিত্তপন্থী। সাহিত্যেব চিত্ততত্ত্ব তাঁর আসল কথা। চিত্তবিষয়ক বিশ্লেষণগুলা চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ।

লেখক—রবীন্দ্র-চিত্তের ক্রম-বিকাশ-সম্বন্ধে আপনি কি প্রমথ বিশীর সঙ্গে একমত?

সরকার—অনেক জায়গায়ই না। বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাগুলা স্থানে-স্থানে বেশ চমৎকার। দ্বন্দ্বগুলা ফুটানো হ'য়েছে পরিষ্কার ভাবে কোথাও-কোথাও। কিন্তু একটানা ক্রম-বিকাশ দেখাবার কায়দায় বস্তুনিষ্ঠার অভাব মালুম হয়। একটা মন-গড়া চিত্তপ্রবৃত্তি-মাফিক রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে ভেতর বিরোধ, দ্বন্দ্ব বা লড়াই দাঁড় করানো হ'য়েছে। কোনো রক্ত-মাংসের মানুষকে দু-একটা নির্দিষ্ট সূত্র বা ফর্মূলা-অনুসারে বিচার, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা আমার মেজাজ-মাফিক কাজ নয়।

লেখক—আপনার বিশ্লেষণে রবীন্দ্র-চিত্ত কিরূপ দাঁড়াবে?

সরকার—রবীন্দ্র-চিত্তে আর রবীন্দ্র-কাব্যে অন্যান্য দ্বন্দ্ব, অন্যান্য উপাদান, অন্যান্য সমন্বয়ও আছে। কোনো নির্দিষ্ট সমন্বয় বা দ্বন্দ্বের সূত্র ধ'রে রবীন্দ্র-চিত্ত অগ্রসর হয় নি। নানা মুহূর্তে নানা খেয়াল চেপেছে। কবিতাগুলা সেই সকল খেয়ালের সাক্ষী। প্রত্যেক তিন-তিন বৎসর বা দেড়-দুই বৎসর পর-পর বইগুলা বেরিয়েছে। তার প্রত্যেকটায়ই রকমারি উপাদান, রকমারি দ্বন্দ্ব আর রকমারি সমন্বয় বা সমন্বয়ের অভাব দেখা সম্ভব। এই গেল আমার মেজাজ মাফিক বস্তুনিষ্ঠ চিত্ত-তত্ত্বের পাঁতি। কোনো বাঁধা পথের চিত্তবিকাশ এই অধমের চিত্তবিজ্ঞান জানে না। মানুষের মন তো? চলে আঁকাবাঁকা পথে। গতিবিধি এর উল্টাপাল্টা। আইন-কানুনের ধার ধারে না। রবির ভাষায় শুন্‌বি রবি-

চিত্ত কিরূপ? একটা শ্লোকে আছে কবি-সম্বন্ধে রবির বাণী। এই বাণীটা আমি চালাতে চাই স্বয়ং রবি-সম্বন্ধে।

লেখক—বলুন না।

সরকার—শোন্ "উৎসর্গ" (১৯১৪) হ'তে পড়ছি ঃ—

"যে আমি স্বপন-মূরতি গোপন-চারী
যে-আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি ;
আপন-গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, কে পারে আমারে ধরিতে?

রবীন্দ্র-চিত্তের বিশ্লেষণে "কে পারে আমারে ধরিতে?"—প্রশ্নটার চরম ইজ্জদ্ দেওয়া ভাল। বুঝে রাখা উচিত যে, লোকটা নেহাৎ জটিল। রকমারি সোআদে ভরা তাঁর লেখালেখি। রবীন্দ্রসাহিত্য বহুত্বময়। রবীন্দ্র-শিল্প বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোনো ফর্মূলায় একে ধরা যাবে না।

লেখক—তা হ'লে আপনি প্রমথ বিশীর বইটাকে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ বল্‌ছেন কেন?

সরকার—রবি-লোকটাকে একটা কাঠামোর ভেতর ফেলে গ'ড়ে পিটে তোল্‌বার ক্ষমতা দেখ্‌তে পাচ্ছি রচনাটাতে। গঠনমূলক মগজের অধিকারী এই লেখক। যে-সে লোকের পক্ষে এই কাজ সম্ভব নয়। বাহাদুরি আছে। বইয়ের পাতায়-পাতায় প্রমথ বিশীর নিজ জীবন দর্শন পরিষ্কাররূপে ধরা দিয়েছে। এইজন্য বইটা বেশ লাগে। ভেবেছি আর একটা দার্শনিক পাওয়া গেল। তা ছাড়া আর একটা বিশেষ কারণ আছে।

লেখক—বিশেষ কারণটা কী?

সরকার—লেখক রবীন্দ্র-কাব্যের মানব-মুখিতার উপর জোর দিয়েছেন। বুঝিয়েছেন যে, রবীন্দ্র কাব্যের বড় কথা বা আসল কথা ভগবদ্‌ভক্তি নয়। "গীতাঞ্জলি" রবীন্দ্র-সাহিত্যের চরম বা শ্রেষ্ঠ বাণী নয়। রবি মানুষের কবি। সাধারণতঃ লোকেরা রবিকে ধর্মপ্রচারক, ধর্মকবি ব'লে জানে। তার বিরুদ্ধে লেখক মত খাড়া ক'রেছেন। এই মত-প্রচারের জন্য প্রমথ বিশীকে আমি সম্বর্দ্ধনা জানাচ্ছি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের রাবীন্দ্রিক সমালোচনা কতখানি স্বীকারযোগ্য

লেখক—প্রমথ বিশীর বইয়ের কোনো দোষ আপনার চোখে ঠেকেছে?

সরকার—মাত্র একটা কথা ব'লে যাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর লেখালেখি সম্বন্ধে নানা জায়গায় নানা ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও সমালোচনা ক'রেছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রমথ বিশী সেই সব কথা বেদবাক্যের মতন স্বীকাব ক'রে নিয়েছেন। কবি, শিল্পী, দার্শনিক বা রাষ্ট্রিক নিজ জীবন ও কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু ব'লে থাকে। সেই সব চিজ আত্মজীবন-চরিতের দর্শন হিসাবে হজম করা উচিত। ব্যস্। তার বেশী ইজ্জদ এই সবের পাওয়া অনুচিত। কবি, শিল্পী ইত্যাদি ব্যক্তির জীবন বা কাজকর্ম সেই আত্মজীবন-চরিত মাফিক ব্যাখ্যা করা অতি-ভক্তির লক্ষণ। কোনো চতুর মগজওয়ালা লোকে তা ক'র্‌তে রাজি হবে না। জেনে রাখা ভাল যে,—রবি নিজ জীবন বা সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে

কতকগুলা কথা ব'লেছেন। বেশ তো। কিন্তু সমালোচক, জীবনচরিত-লেখক ইত্যাদি লোকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের আত্ম-বিশ্লেষণ, আত্ম-ব্যাখ্যা আর আত্ম-সমালোচনাও নিজ কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে দেখা উচিত। স্বীকার ক'রে নেওয়া উচিত নয়।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্য ও রবীন্দ্র-শিল্প সম্বন্ধে রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যা ও সমালোচনা আপনি পছন্দ করেন না?

সরকার—কেন পছন্দ ক'র্‌বো না? সে-সবও ভাল লাগে। রবীন্দ্র-প্রবন্ধাবলীর অন্যান্য অংশ যেমন সুন্দর, এই আত্ম-ব্যাখ্যা, আত্ম-বিশ্লেষণ বা আত্মজীবন-চরিতগুলাও ঠিক তেমনি সুন্দর। এই সকল সমালোচনা রবীন্দ্র-দর্শনের অন্তর্গত। প্রবন্ধ-সাহিত্য আর চিঠি-সাহিত্য দুইই দর্শন।

লেখক—তা হ'লে আপত্তি কী?

সরকার—দর্শনটা দর্শনভাবে গিল্‌তে চাই। আত্মজীবন-চরিত আত্মজীবন-চরিতরূপে চলুক। আর কবিতাটা কবিতাভাবে চাখ্‌তে চাই, শিল্পটা শিল্পভাবে উপভোগ কর্‌তে চাই। কবিতা-শিল্পের উপর দর্শনের বোঝা বা আত্মজীবন চরিতের আল্‌খাল্লা চাপাতে চাই না। রবীন্দ্রনাথকে বলি,—"গুরুদেব, তোমার দর্শনগুলা আমরা অপছন্দ করি না। সে-সবেও দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, ভাষা, সাহিত্য, ছন্দ, ধর্ম, নীতি ইত্যাদি বস্তু সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা আছে। তুমি তোমার জীবন, চিন্তারাশি ও কাজকর্ম সম্বন্ধেও যা-কিছু বলো সে সবও খুবই উপাদেয়। তা দিয়ে তোমার ব্যক্তিত্ব ও শিল্প মাঝে-মাঝে বেশ-কিছু বুঝা যায়। কিন্তু তোমার কবিতা আর চিত্রাবলীরও একটা স্বাধীনতা আছে। সেগুলা স্বরাজী। তোমার নিজ ব্যাখ্যা-সমালোচনার সাহায্য না নিয়েই সে-সব আত্মপ্রকাশ ক'র্‌তে সমর্থ। সেই সব আমরা স্বাধীনভাবে খুঁটে-খুঁটে আপন মনে উপভোগ ক'র্‌তে চাই। তুমি যে কবি, সে কথা তুমি না ব'ল্‌লেও বুঝ্‌বার ক্ষমতা এই অধমদের আছে।"

লেখক—আপনি কি মনে করেন যে, রবীন্দ্রনাথের নিজ ব্যাখ্যা ও সমালোচনাগুলার আওতায় রবীন্দ্র-সাহিত্য বা রবীন্দ্র-শিল্প বুঝ্‌বার পক্ষে অসুবিধা হয়?

সরকার—অনেক সময় অসুবিধা হয় বৈ কি? কবিতাগুলা আর চিত্রগুলা জ্যান্ত, তাজা, সরস মাল। এই সব হচ্ছে লাল টক্‌টকে বস্তু, তেজী ভিটামিনওয়ালা চিজ। ব্যাখ্যা, সমালোচনা, বিশ্লেষণ, দর্শন, আত্মজীবন-চরিত হাজার হলেও শুষ্কং কাষ্ঠং। ভারি-ভার্তিক চিজ। তর্কের কচ্‌কচানি হচ্ছে দর্শনের প্রাণ। তা ছাড়া নিজেকে অপরের কাছে বুঝবার ভেতর খানিকটা লোকদেখানো কৃত্রিম ও অলীক ব্যক্তিত্ব হাজির হয়। বেশ-কিছু বাজে কথা ঢুকে পড়া সহজ। বিশেষতঃ রবি যখন ঋষি নামে পরিচিত,—বিশ্ববীর ব'লে পূজিত। তখন ঋষি-বীরের পক্ষে মানানসই "ব্যাখ্যা" ঝাড়্‌তে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। নিজেকে অনর্থক কট-মট ক'রে তোলা হ'তে পারে। অতি সোজা আদিম চিত্ত-বৃত্তির উপর চেপে পড়ে পোষাকি মনোভাব। জোব্বাজুব্বির আল্‌খাল্লা বা ওভারকোটের দৌরাত্ম্যে সহজ-সরল হাড়-মাস তলিয়ে যায়, আর মাংসপেশীর গন্ধমাত্র লোপাট হয়। আত্মজীবন-চরিত হচ্ছে অনেকটা অ-বাস্তব, অ-স্বাভাবিক, অ-সত্য সাহিত্য।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যের রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যা-সমালোচনা তাহ'লে পুরাপুরি বর্জনীয়?

সরকার—কখনই না। তাও পড়া উচিত। তা থেকে সাহায্য নিলে কোনো-কোনো বিষয় বুঝবার সুবিধাও হ'তে পারে। কিন্তু ও-সব বেশী ঘাটাঘাঁটি কর্‌লে কাব্য-নাট্য-গল্প-হাস্যের ভিটামিনগুলা উড়ে যেতে বাধ্য। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর-পঁচাত্তর বছর বয়সের

কোঠ থেকে পনর-বিশ পঁচিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সকে যাচাই করা, পরীক্ষা করা, ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা হচ্ছে বুড়োমি ছাড়া আর কিছু কম নয়। এই বুড়োমিও উপভোগ্য সন্দেহ নাই। তাও দর্শন। দর্শন ফেলিতব্য চিজ নয়। কিন্তু চ্যাংড়া, ছোঁড়া, জোআন, প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথ কি কম উপভোগ্য? বুড়োকে ছোঁড়ার ঘাড়ে চাপিয়ে তার সর্বনাশ করি কেন? "প্রভাত-কিরণে সকালবেলাতে মন ল'য়ে সখি গেছিনু খেলাতে"। রবি খেল্‌তো, প্রভাত-কিরণে খেল্‌তো। সেই খেলাগুলা কি রাবীন্দ্রিক মাল নয়? তা হ'লে রবিকে পুছ্‌তো কোন্ বাঙালী? আত্মজীবন-চরিত খুব সাবধানে পড়া উচিত। এর সবটুকুই গ্রহণীয় বা স্বীকার-যোগ্য নয়।

লেখক— আপনি আত্মজীবন চরিত-পছন্দ করেন না?

সরকার—কে বল্‌লে পছন্দ করি না? আত্মজীবন-চরিত ছোটদরের সাহিত্য নয়। নিন্দা কর্‌বার কিছুই নাই। তবে নিজের জীবন সম্বন্ধে লিখ্‌তে বসা অনেক সময়েই অপ্রীতিকর কাজ। নিজেকে দুনিয়ার সাম্‌নে প্রকাশ বা জাহির করা কাজটা হাম-বড়ামির সঙ্গে মিশানো কারবার। লোকের কাছে নিজেকে গ্রহণীয়, প্রিয়, অতএব বড়ো ক'রে তোল্‌বার খেয়াল আপনা-আপনি এসে দেখা দেয়। তার উপর এসে জুটে কিঞ্চিৎ কিছু অথবা বেশ-কিছু লুকিয়ে রাখ্‌বার প্রবৃত্তি। নিজের কু-গুলা, দুর্বলতাগুলা ঢাক্‌বার জন্য রহস্য, মিস্টরি, অলৌকিক মাল জড় হ'তে দুর্বলতাগুলা ঢাক্‌বার জন্য রহস্য, মিস্টরি, অলৌকিক মাল জড় হ'তে থাকে। হেঁয়ালিতে ভ'রে উঠ্‌তে পারে আত্মজীবন চরিতের ব্যাখ্যা সমালোচনা-বিশ্লেষণ। দু'এক জায়গায় প্রমথ বিশী রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যা বয়কট ক'রে চ'লেছেন। এইরূপ বর্জন উচিত হ'য়েছে। আরও বর্জন করা উচিত ছিল।

লেখক—তা হ'লে প্রমথ বিশীকে আপনার মেজাজ-মাফিক স্বাধীন সমালোচক বল্‌বো না কেন?

সরকার—না, তা বলা চল্‌বে না। মোটের উপর "রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহ" রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি" (১৯১২), "ছিন্নপত্র" (১৯১২) আর "ভানুসিংহের পত্রাবলী" (১৯৩০) ইত্যাদি রচনার ভারে অতিমাত্রায় আক্রান্ত। সমালোচকের পক্ষে আরও বেশী স্বাধীনতা রক্ষা ক'রে চলা উচিত ছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমালোচনায় রাবীন্দ্রিক ব্যাখ্যাগুলার আওতা অতটা স্বীকার করা ঠিক হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। তবে প্রমথ বিশীর পাঁঠা। সেটা সে ল্যাজেই কাটুক কি মুড়োয়াই কাটুক,—তাতে তোর আমার কী এলো-গেলো?

রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকালবেলা

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যের তৃতীয় অংশ-সম্বন্ধে আপনি তা'হলে শেষ কথা কী বল্‌ছেন?

সরকার—আমি "বলাকা"র (১৯১৬) পরবর্তী পঁচিশ বৎসরে রবীন্দ্র-সাহিত্যকেও কুর্নিশ ক'রে চলি। "বলাকা"র সময় রবীন্দ্রনাথের বয়স বছর পঞ্চান্ন। আমার রবি বার বৎসর বয়সে কলম ধ'রেছে স্বাধীনতার চারণ হেমচন্দ্রের আওতায়, আর কলম ছেড়েছে আশী বছর বয়সে "সভ্যতার সঙ্কট" (১৯৪১) প্রবন্ধে স্বাধীনতার গান গেয়ে। স্বাধীনতায় সুরু, স্বাধীনতায় শেষ। রবীন্দ্র-সাহিত্যের এই বিকাল বেলাটার উপর

গবেষকদের নজর পড়া উচিত। দুপুর আর সকাল বেলার সঙ্গে তুলনা চালানো ডাকরি তো বটেই।

লেখক—একালের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আপনার কোনো লেখা আছে?

সরকার—"ক্যালকাটা রিভিউ" মাসিকের তিনটা প্রবন্ধের নাম ক'রতে পারি। রবীন্দ্র-সাহিত্যের একদম শেষ অবস্থা সম্বন্ধে। প্রথম "টাগোর দি পোয়েট অ্যাজ পেইন্টার" (জুলাই, ১৯৪১), দ্বিতীয় "টাগোর দি গ্রেটেস্ট ইণ্ডিয়ান অব হিস্টরি" (সেপ্টেম্বর, ১৯৪১), তৃতীয় "দি লাস্ট ফেজেজ্ অব্ টাগোর্স সোশ্যাল ফিলজফি" (জানুয়ারী, ১৯৪২)। তৃতীয় প্রবন্ধে "সভ্যতার সঙ্কট", "শেষ লেখা" আর "মাই বয়হুড্ ডেজ" এই তিন রচনার আলোচনা আছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটা আমার "ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড টাউন্স্ অ্যাজ সোশ্যাল প্যাটার্নস্" বইয়ে (১৯৪১) স্থান পেয়েছে।

লেখক—প্রথম প্রবন্ধে কী আছে?

সরকার—রবীন্দ্রনাথের "চিত্রলিপি" (১৯৪১) বইয়ের ছবি আর কবিতাগুলার বিশ্লেষণ।

লেখক—রবীন্দ্র-চিত্রাবলী-সম্বন্ধে ১৯৪১ সনের আগে আর কখনো কিছু লিখেছেন?

সরকার—হাঁ "ক্রিয়েটিভ ইণ্ডিয়া" বইয়ে (লাহোর, ১৯৩৭) একটা অধ্যায় আছে। তার ভেতর পাবি "পোয়েট্রি অ্যাণ্ড পেইন্টিংস্ অব রবীন্দ্রনাথ।"

লেখক—সত্তর বৎসর বয়সের রবীন্দ্র-জয়ন্তী-বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজি বইয়ে (১৯৩১) আপনার কোন্ কোন্ লেখা আছে?

সরকার—"যৌবন-মূর্তি রবীন্দ্রনাথ" আর "টাগোর অ্যাণ্ড ওয়ার্লড্ ফোর্সেজ।"

লেখক—রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতি-সম্বন্ধে আপনি কিছু লেখেন নি?

সরকার—"দি পোলিটিক্যাল ফিলজফীজ্ সিন্স ১৯০৫" বইয়ের চার ভাগে রাবীন্দ্রিক রাষ্ট্রদর্শন অল্প-বিস্তর আলোচিত হ'য়েছে। প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে মাদ্রাজে ১৯২৮ সনে। দ্বিতীয় খণ্ডের তিনভাগ লাহোরে ১৯৪২ সনে। তাতে রবীন্দ্রনাথের স্বজাতি-নিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিকতা বিশ্লেষিত আছে। তা ছাড়া "স্বদেশী সমাজ" (১৯০৪) হ'তে "সভ্যতার সঙ্কট" (১৯৪১) পর্যন্ত ভাবধারার খতেনও ক'রেছি।

লেখক—সাহিত্য-বরদের জীবন-চরিত-বিষয়ক দু'এক খানা উঁচুদরের বইয়ের নাম করতে পারেন?

সরকার—জর্মাণ সাহিত্যবীর গ্যেটে সম্বন্ধে আছে ইংরেজ দার্শনিক লুইজ প্রণীত জীবন-চরিত। এমন উপাদেয় জীবন-চরিত আর একটাও পড়ি নি। এককালের ইংরেজ নাট্য-ও কথা-শিল্পী গল্সোআর্থির জীবন-বৃত্তান্ত আর চিঠিপত্র পাবি ম্যারট-প্রণীত রচনায়। গল্সোআর্থি-বিষয়ক বইটা অবশ্য প্রধানতঃ সঙ্কলন। কিন্তু গ্রন্থকারের রচনা-প্রণালী, মেহনৎ ও আগ্রহ অনুকরণযোগ্য। দুটাই বহরে বেশ বড় বই। ছেলেবেলায় আমি "ইংলিশ মেন অব লেটার্স"-গ্রন্থাবলীর ভক্ত ছিলাম। এই গ্রন্থমালার অনেক বই সুলিখিত। আকারে মাঝারি গোছের। সহজেই বশে আনা যায়। আজকাল বাঙালী সাহিত্যবীরদের সম্বন্ধে ভাল-ভাল জীবন-চরিত আর সমালোচনা বেরুচ্ছে। এই ধরণের বিদেশী গ্রন্থের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চল্লে লেখকেরা বঙ্কিম, হেম, রবি, গিরিশ, দ্বিজেন্দ্র, শরৎ সম্বন্ধে নয়া ঢঙের উপাদেয় বই ঝাড়তে সমর্থ হবে।

জুন ১৯৪৩

হুমায়ুন কবিরের "বাঙ্লার কাব্য"

১লা জুন ১৯৪৩

সুবোধ ঘোষাল—হুমায়ুন কবির "বাঙ্লার কাব্য" বইয়ে (১৯৪২ পৃঃ ৮) ব'লেছেনঃ— "সামাজিক মানসের প্রকাশ হিসাবে বাঙলা কাব্যের ইতিহাস আলোচনার চেষ্টা পূর্বে কোনোদিন হ'য়েছে ব'লে জানি না।" এই মন্তব্য সম্বন্ধে আপনার মত কী?

সরকার—সাহিত্যের "সামাজিক ব্যাখ্যা" সম্বন্ধে কোন্ বাঙালীর প্রবন্ধ বা বই কাল হিসাবে সর্ব-প্রথম? এই প্রশ্নের জবাব জান্তে চাস্? দেখ্ছি যে, হুমায়ুন বল্ছেন ঃ— "আমি।" ভাল কথা। বিনয় ঘোষকে জিজ্ঞাসা কর্। বোধহয় জবাব পাবি "আমি"। গোপাল হালদারকে জিজ্ঞাসা কর্। সেখানেও হয়ত জবাব পাবি "আমি"। প্রত্যেকেই আগা-পাছা না ভেবে নিজকে কাল হিসাবে সর্ব-প্রথম ভাব্তে পারে। কেননা প্রত্যেকের রচনারই কোনো-না-কোনো বিশেষত্ব আছে। সেই বিশেষত্বশীল রচনার কাল হিসাবে সর্বপ্রথম লেখক নিশ্চয়ই প্রত্যেকে।

লেখক—আপনি কী বল্বেন?

সরকার—অনেক বকা সম্ভব। একটা কথা শুনে রাখ্—সামাজিক ব্যাখ্যা রকমারি। এই ক্ষেত্রের ছোট-বড়-মাঝারি প্রবন্ধ বা বই বাঙালীর হাতে অনেক দিন ধ'রে বেরুচ্ছে। কাল-হিসাবে সর্বপ্রথম লেখকের নাম আমার জানা নাই। তবে সেই লোকটা অথবা সেই লোকগুলা ১৯৪০ সনের পূর্ববর্তী লেখক সন্দেহ নাই।

লেখক—তবুও এক-আধটা বইয়ের নাম করুন।

সরকার—একালের শশাঙ্ক সেন লিখিত "বাণী-মন্দির" (১৯২৮) দেখ্তে পারিস্। তা ছাড়া সেকালের দীনেশ সেনের "বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য" (১৮৯৬) তো আছেই।

লেখক—হুমায়ুন কবিরের "বাঙলার কাব্য" বইয়ে (১৯৪২) পৃঃ ৩০) দেখ্ছি ঃ— "বৈষ্ণবধর্ম সুবর্ণবণিকদের মধ্যে যত প্রসার-লাভ ক'রেছে হিন্দুসমাজের অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে তা করে নি।" একথা সত্য কি?

সরকার—মালদহ জেলায় আমার জন্ম। খাঁটি মালদহিয়া লোকজনের সঙ্গে আমার "শিশুকাল কাটিল রে"। তারা অধিকাংশই বৈষ্ণব। মাছ-মাংস তো খায়ই না—মায় ডিমও ছোঁয় না। এমন কি যাত্রার গানেও মা-কালীর নাম পর্যন্ত তারা শুনতে চায় না। অথচ তাদের ভেতর সুবর্ণ-বণিক্ বোধ হয় একজনও নেই। পুঁড়া, কাঁসারি, চুনিয়া, নুনিয়া, নাগর, ধানুক, চাঁই এই সব হচ্ছে মালদহ জেলার বৈষ্ণব। অন্য জেলা-সম্বন্ধেও খবর লওয়া ভাল।

লেখক—"প্রধানতঃ সুবর্ণবণিক্দের মধ্যেই যে বৈষ্ণবধর্ম এবং কাব্যের ব্যাপ্তি তার ঐতিহাসিক কারণ স্পষ্ট।" কবিরের এই কথা স্বীকারযোগ্য কি?

সরকার—না। এই মন্তব্যের পশ্চাতে যথেষ্ট তথ্য নাই। অ-সুবর্ণ-বণিক্-সমাজে বৈষ্ণব সাহিত্যের "ব্যাপ্তি" ঘটেনি এ কথা ঐতিহাসিকের পক্ষে প্রমাণ করা সোজা নয়। বৈষ্ণব-সাহিত্য কোনো বর্ণাশ্রম-মাফিক জাত-পাতের একচাটিয়া ছিল কিনা সন্দেহ।

"সবার উপর মানুষ সত্য"

লেখক—কবির এক জায়গায় (২৯-৩০ পৃঃ) "বৈষ্ণব-কাব্যে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা"কে ইস্‌লামের "প্রতিধ্বনি" ব'লেছেন। এ-কথার মানে কী?

সরকার—চণ্ডীদাসের বুখ্‌নি হচ্ছে ঃ—"সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" একথাটাব উৎপত্তি বোধ হয় হুমায়ুনের মতে মুসলমান-সাহিত্যে।

লেখক—আপনি কী মনে করেন?

সরকার—এই বাণী অতি-সার্বজনিক ও মানুষের পক্ষে আদিম কথা চিজটা বিশেষভাবে বৈষ্ণববস্তু নয়, বৌদ্ধবস্তুও নয় অথবা মার্কামারা মুসলমান মালও নয়। মানুষের চিন্তায় মানুষই সব-সে সেরা মাল—একথা বুঝ্‌বার জন্য গীতা, উপনিষৎ আর ধম্মপদ ও মহাবগ্‌গ পর্যন্ত ধাওয়া কর্‌তে হয় না অথবা কোরান-হদিশের বয়েৎও জানার দরকার হয় না।

লেখক—আপনার বক্তব্য কী?

সরকার—মুসলমানদের আগেও বাঙ্‌লাদেশে সংস্কৃতি ছিল। হিন্দু বা আর্য-সংস্কৃতির আগেও বাঙালীর সংস্কৃতি ছিল। লোক বাস করতো বাঙ্‌লাদেশে। তাদেরকে "আদিম" বা "দ্রাবিড়" বাঙালী বলা চলে। আজকালকার পরিভাষায় তারা "নিগ্রয়েড্", "অষ্ট্রিক" ইত্যাদি জাতীয় নর-নারী। তাদের সকলের নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে ছিল "সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।" একালেও আদিম নরনারী স্বভাবতঃ এইরূপই চিন্তা করে।

লেখক—এই ধরণের কথা আর কোথায়ও শোনা যায়?

সরকার—পৃথিবীর সকল দেশের সকল আদিম লোকের কণ্ঠেই এই বাণী যখন-তখন বেরোয়। অবশ্য যদি কণ্ঠ থাকে। অ-হিন্দু, অ-মুসলমান, অ-খৃষ্টিয়ান, প্রাক্-হিন্দু, প্রাক্-মুসলমান, প্রাক্-খৃষ্টিয়ান, কোটি-কোটি নর-নারী এই মন্তরের জোরে ঘরকন্না চালায়, পল্লী-শহর গ'ড়ে তোলে। সামাজিক নৃতত্ত্বের মামুলি অ-আ-ক-খ'র ভেতর পড়ে মানুষের এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব। তারা পরমেশ্বর, ভগবান্, [illegible]ড়্, আল্লা ইত্যাদি অ-মানুষিক শক্তির তোআক্কা রাখে না। তাদের নাচগানবাজনায় শুনা যায় মানুষের মাংসপেশীর সুর আর মানুষের হৃদয়-মুড়োর রাগিণী। এই তাদের অতিস্পষ্ট জীবনদর্শন।

লেখক—আপনি তো হিন্দু-সংস্কৃতির বা আর্যসভ্যতার বস্তু-নিষ্ঠা, সংসার-নিষ্ঠা, মানব-নিষ্ঠা, ইহ-নিষ্ঠা "পজিটিভিজম্"-সম্বন্ধে হাজাব-হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন। সে-কথা বল্‌ছেন না কেন বর্তমান-প্রসঙ্গে।

সরকার—সে-যুক্তি এ ক্ষেত্রে না তুল্‌লেও চল্‌তে পারে। সকলেরই জেনে রাখা উচিত আর একটা কথা। তার উপর জোর দিতে চাই। অহিন্দু লোকেরা হিন্দু হ'য়েছে। আর অ-মুসলমান নরনারীই যথা সময়ে মুসলমান হ'য়েছে। সকলেই হিন্দু থেকে মুসলমান হয় নি। অ-হিন্দুরাও মুসলমান হ'য়েছে। তারা বেদ-পুরাণ-তন্ত্র আর কোরান-হদিশ ইত্যাদি গ্রন্থের নাম শুন্‌বার আগে হ'তেই মানব-নিষ্ঠ, সংসার-নিষ্ঠ, ইহ-নিষ্ঠ লোক। বৈষ্ণব বা শাক্ত হবার জন্যে তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুতঠাকুর বা মোল্লার কুর্নিশ করা জুরুরি হয়েছিল কিনা সন্দেহ। মামুলি অষ্ট্রিক, নিগ্রয়েড্, দ্রাবিড় ইত্যাদি রক্তমাংসের লোকজন রাধাকৃষ্ণের প্রেমে সহজেই মশ্‌গুল হ'তে পার্‌তো। এখনো হয়। অপর দি[illegible] মনসার

গান, কালকেতুর গান, চণ্ডীমায়ের গান গাওয়াও তাদের কাছে অতি-সহজ নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই সবরে ভিতর ঐস্লামিক সংসার-নিষ্ঠার আর মুসলিম মানব ভ্রাতৃত্বের প্রভাব আবিষ্কার করতে যাওয়া নৃতত্ত্বের জাত্ মারতে বসার সমান।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, মানব-নিষ্ঠা, পজিটিভিজ্‌ম্, সংসার-প্রীতি ইত্যাদি গুণ মানুষ মাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক?

সরকার—তাই তো বল্‌ছি। তথা-কথিত "ইতর", ছোটলোক, অস্ট্রিক, আদিম, অসভ্য, নিরক্ষর, অ-হিন্দু, অ-মুসলমান ইত্যাদি জনগণের আসল, প্রধান বা একমাত্র ধর্মই মানব-নিষ্ঠা। এই জন্য আমার পারিভাষিকে বাঙালীর ধর্ম গোড়ায় মানব-ধর্ম। প্রাক্-হিন্দু ও প্রাক্-মুসলমান বাঙ্‌লার ধর্মকে আমি বলি বাঙালী মানুষের ধর্ম, বঙ্গধর্ম বা "বাঙ্‌লামি" (পৃঃ ৩৪৮-৩৬৪)। মানব-নিষ্ঠা আর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মানুষ মাত্রেরই পক্ষে মুড়ি-মুড়কি বিশেষ। এই চিজ এত আদিম ও সার্বজনিক যে এর জন্য মনু, বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু, মহম্মদ ইত্যাদি মহাপুরুষদের সুপারিশ দরকার হয় না। মানুষ জ'ন্মেই মানব-নিষ্ঠ।

মুসলমান কবিরা কি নেতি ধর্মী?

লেখক—মুসলমানদের সম্বন্ধে কবিরের মন্তব্যগুলা সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন?

সরকার—কিছু-কিছু স্বীকারযোগ্য। সৈয়দ অহম্মদকে যুক্ত প্রদেশের পক্ষে মুস্‌লিম বিপ্লব-সাধক বলা ঠিক হ'য়েছে। এই সঙ্গে হুমায়ুনের আর একটা মন্তব্য হিন্দু-মুসলমান সকলের পক্ষে স্বীকার-যোগ্য।

লেখক—কোন্ মন্তব্যটা?

সরকার—হুমায়ুনের কথা হ'চ্ছে এই যে, "কালান্তরে স্যর সৈয়দের জীবন-দৃষ্টির ও রূপান্তর প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনকে অস্বীকার করারই নাম গোঁড়ামী।"

লেখক—মুসলমান-বিষয়ক কবিরের কোন্-কোন্ মন্তব্য আপনার মতের সঙ্গে মিলে না?

সরকার—হুমায়ুনের মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমান মানস "নেতিধর্মী"। এই কথাটা ঠিক নয়। সেকালের কবি কায়কোবাদকেও নেতিধর্মী বলা চলে না। আর একালের নজরুল, কাদের, জসিমুদ্দিন, ইত্যাদি কবির রচনায়ও নেতি-ধর্ম প্রকাশ পায় নি। এঁরা সকলেই হাঁ-ধর্মী লেখক। গঠনমূলক ভাবধারা এঁদের রচনায় পাওয়া যায়।

লেখক—আপনি একালের হিন্দু কবিতে আর মুসলমান কবিতে প্রভেদ দেখ্‌তে পান না?

সরকার—একদম না। কোনো কবিতা প'ড়ে আমি বুঝ্‌তে পারিনি লোকটা হিন্দু না মুসলমান। সত্যি কথা বল্‌বো? আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো কবিতায় লেখকের জাত্ ঠাওরাতে পারি 'নি। লোকটা জার্মাণ না ইতালিয়ান না মার্কিণ না ফরাসী না ইংরেজ? এ বোধহয় আমার আর একটা মুখ্‌খুমি। কী করা যাবে?

লেখক—কবিরের চিন্তায় তো আধুনিক হিন্দু-মুসলমান কবিদের ভেতর প্রভেদ আছে।

সরকার—জানি। আমি তো, ভায়া, নজরুল ইত্যাদি লেখকদেরকে মুসলমানও বলি

না, হিন্দুও বলি না। আমার কষ্টিপাথরে এরা হচ্ছে কবি। বাংলা ভাষায় লেখে ব'লে বলা যেতে পাবে বাঙালী কবি। ব্যস্। গোটা কয়েক মিনার, মসজিদ, আব মিএগ্র শব্দের ছড়াছড়ি থাক্‌লেই লেখকেরা মুসলমান হয় না। দুচার বার হিন্দু, মন্দির আর হরি ইত্যাদি শব্দ দেখ্‌বামাত্র লেখককে হিন্দু বলা উচিত নয়। কবিদের ধর্মও নাই, জাত্‌ও নাই, শ্রেণীও নাই। তারা স্রষ্টা, সৃষ্টি করে দুনিয়া। তাদের পেশা আছে। পেশাটা কবিত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। তারা চরিত্র-স্রষ্টা, অবস্থা-স্রষ্টা, ঘটনা-স্রষ্টা।

লেখক—"নেতি-ধর্মী" কাকে বলে?

সরকার—যে-সকল লেখকেব রচনায় পরাজয়, নৈরাশ্য, ব্যর্থতা, পলায়ন ইত্যাদি বিফলভাব লক্ষণ দেখা যায়, তাদেরকে হুমায়ুনের পারিভাষিকে নেতি-ধর্মী বলা যেতে পারে। একালের হিন্দু মধ্যবিত্ত কবিরাও তাঁর মতে নেতি-ধর্মী। বস্তুনিষ্ঠ বিচারে হুমায়ুনের এই রায়ও ঠিক নয়। মধ্যবিত্তরা আজও বাড়্‌তির পথে, মর্‌বার পথে নয়। তাদের ভেতর হা-হুতাশ বড় একটা মালুম হয় না। অনেকেই লাল-টক্‌টকে চিন্তাধারার মালিক।

ভূগোল, রক্ত আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'র প্রভাব

৩রা জুন ১৯৪৩

সুবোধ ঘোষাল—"বাঙ্‌লার কাব্য" বইটা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলুন না?

সরকার—এই বইয়ে হুমায়ুনের স্বকীয় দর্শন পাওয়া যায়। তাঁর "পোয়েট্রি, মনাড্‌স অ্যাণ্ড সোসাইটি" (কাব্য, অনু ও সমাজ, ১৯৪১) আর একটা সাহিত্য-সমালোচনার বই আছে। সেটা প্রধানতঃ বিদেশী সমালোচক-দার্শনিকদের সিদ্ধান্তগুলার সারমর্ম। "বাঙলার কাব্য" হচ্ছে নিজ দর্শনের বই। লেখকের মগজ গঠন-মূলক। হাজার-বার শ' বছরের বঙ্গ-সাহিত্যকে পৃষ্ঠা শয়েকের ভেতর পূরে দেওয়া খুব ক্ষমতার কাজ। অবশ্য বহরে বড় হ'লে,—অন্ততঃ ডবল হ'লে—লেখকের বক্তব্যগুলা খোলশা ক'রে বলা হ'তো।

লেখক—বইয়ের বিশেষত্ব কী কী দেখ্‌ছেন?

সরকার—বইটা বহরে ছোট, কিন্তু বইয়ের মতন বই। প্রত্যেক পাতায়ই স্বাধীন চিন্তা গিজ্‌-গিজ্‌ কর্‌ছে। ভাবধারায় চিন্তার খোরাক আছে প্রচুর। বইটাকে "বঙ্গ-সংস্কৃতি" অথবা "বাঙালী সমাজ" নাম দেওয়া চলতো। সাহিত্য বা কাব্য হ'তে দৃষ্টান্ত তোলা হয় নি একটাও। কিন্তু বইটা চিন্তায় ভরা, খুবই শাঁশাল।

লেখক—বঙ্গীয় চিন্তা-জগতে এই বইয়ের স্থান সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

সরকার—লেখকের ব্যক্তি-বিশ্লেষণগুলা চমৎকার। কিন্তু ব্যখ্যা-সমূহ অর্থাৎ কারণ-বাৎলানো অনেক সময়েই স্বীকারযোগ্য নয়। কার্য-কারণ-নির্দেশের কারবারে আমার সঙ্গে অমিল ঘ'টেছে নানা জায়গায়। আমি অনেক সময়েই মতামতের ধার ধারি না। দেখি আলোচনা প্রণালী। বেশ লেগেছে।

লেখক—দু-একটা দৃষ্টান্ত দিন না।

সরকার—সাহিত্যের উপর ভৌগোলিক প্রভাব দেখা হুমায়ুনের এক মস্ত খেয়াল। তা ছাড়া "অষ্ট্রিক" রক্তে আর "আর্য"রক্তের প্রভেদ দিয়ে সাহিত্য-প্রভেদ বুঝাবার দিকেও মাথা খেলেছে। পূর্ববঙ্গে আর পশ্চিম বঙ্গে প্রভেদ দেখাবার ঝোঁক বেশ প্রবল।

"মনসা-মঙ্গল" আর বৈষ্ণব-কাব্যের প্রভেদও নৈসর্গিক (ভৌগোলিক) সংঘটনের ঘাড়ে এসে প'ড়েছে। কিন্তু এসব কোনো তথ্যনিষ্ঠ প্রমাণের জোরে দাঁড় করানো চলে না। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অন্যান্য ব্যাখ্যাও দেওয়া সম্ভব। হুমায়ুনের আলোচনা- প্রণালীতে ফরাসী-সাহিত্য-সমালোচক তেইন-প্রবর্তিত ভূগোল-রক্ত-আবেষ্টনের প্রভাব খানিকটা দেখা যায়।

লেখক— আর কিছু বল্‌বেন?

সরকার—মধ্যযুগের সাহিত্য-বিশ্লেষণ সরস ও সজীব (৩৩-৪৬ পৃঃ)। একালের মাইকেল-বিশ্লেষণ আর রবীন্দ্র-বিশ্লেষণও খুবই চিত্তাকর্ষক। বিশ্লেষণগুলা সবই দু-এক কথায় সারা হ'য়েছে। কিন্তু দখলওয়ালা বিশ্লেষণ।

লেখক— আপত্তি কোথায়-কোথায় কর্‌ছেন?

সরকার—যেখানে-সেখানে "মধ্যবিত্ত মানসের" ধাক্কা দেখানো হ'য়েছে, সেই সকল জায়গায় যুক্তির ফাঁক দেখা যায়।

লেখক—কবির কি মার্কস্‌-পন্থী?

সবকার—না। এই বইটার ভেতর শ্রেণী-বিবাদ অথবা আর্থিক অদ্বৈতের উল্লেখ নাই। প্রমাণও নাই। কিন্তু চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত'র প্রায় একচেটিয়া প্রভাব হুমায়ুনের সাহিত্য-বিশ্লেযণে ধরা প'ড়েছে। এই বিষয়ে লেখক একপ্রকর অদ্বৈতবাদী। এই হিসাবে বল্‌বো মার্কসের ছায়া কিছু পড়েছে। কিন্তু মোটেব উপর হুমায়ুন বহুত্বপন্থী। এই জন্য আমার সঙ্গে মাঝে-মাঝে মিল হয়।

লেখক— উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সমাজের জন্য আর কোন্‌-কোন্‌ শক্তির উল্লেখ কবা উচিত ছিল?

সরকার—রাষ্ট্রিক প্রভাব তো আছেই। তার উপর প্রথমতঃ বিদেশী পুঁজির প্রভাব। এই সঙ্গে আসে বিলাতী কারখানা, দোকান, জাহাজ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি আফিস। দ্বিতীয় কথা শহরে-মফঃস্বলে সরকারী শাসন-বিভাগের কাছারি-আদালত ইত্যাদি কর্মকেন্দ্র। তৃতীয় শক্তি হচ্ছে ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বা সর্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য সামাজিক শক্তি হচ্ছে স্বদেশী আন্দেলনের শিল্প-বাণিজ্য। এই শক্তিপাঁচেক বাদ দিয়ে একমাত্র জমিদারি-প্রথা, সামন্ত-তন্ত্র এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'ব উপর নজর দিলে বঙ্গ-জীবন, বঙ্গ-সাহিত্য আব বঙ্গ-দর্শন বুঝা সম্ভব নয়।

বঙ্কিম, রবি, দান্তে

লেখক— আর কোনো দিকে এই বইয়েব চিন্তায় আর আপনার চিন্তায় অমিল আছে?

সবকাব—বঙ্কিমে-রবীন্দ্রে প্রভেদ দেখানো হ'য়েছে। পড়্‌ছি ঃ— "বঙ্কিমী যুগের হিন্দুমানসের স্বপ্ন ছিল প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন। সে স্বপ্ন কোনো দিন রবীন্দ্রনাথকে টানে নি" (পৃঃ ৬৮)। এই দুই বাক্যের কোনোটাই যুক্তিনিষ্ঠ নয়। আর একটা মন্তব্য নিম্নরূপ ঃ— "বঙ্কিমী যুগের অন্ধ ইংরেজ-ভক্তি তাঁর (রবীন্দ্রের) মনে কোনো দিন জাগে নি" (পৃঃ ৬৬)। এই বাক্যের দুই বিভিন্ন অংশে দুইটা যুক্তিহীন মত প্রচারিত হ'য়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একটা পাশ্চাত্য সাহিত্য-বিষয়ক মন্তব্য দেখাতে পারি।

লেখক— কী সেটা?

সরকার—বলা হ'য়েছে যে, "পারিপার্শ্বিকের যে সহযোগ দান্তের কাব্য-সাধনা সহজ, রবীন্দ্রনাথের বেলা তা ঘটেনি" (পৃঃ ৬৪)। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালিয়ান আবেষ্টনে দান্তে কী পেয়েছিলেন? আর উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় আবেষ্টনে রবি পান নি কী? প্রভেদ বুঝানো সহজ নয়।

লেখক—পারিপার্শ্বিক বিশ্লেষণের অসম্পূর্ণতা কোথায়?

সরকার—হেম, নবীন, গিরিশ, ভূদেব, বিবেকানন্দ, ক্ষীরোদ ইত্যাদি শক্তির উল্লেখ নাই বইয়ের ভেতর এই কারণে হয়ত রবির পারিপার্শ্বিকটা পূরাপূরি ধরা পড়েনি। তার দরুণই বোধ হয় দান্তে-রবীন্দ্রে প্রভেদ মালুম হ'য়েছে জবরভাবে।

লেখক—কিন্তু বাঙালী-সমাজে পারিপার্শ্বিক বদ্‌লায় নি কি?

সরকার—আলোচনার কথা। মাইকেলে, বঙ্কিমে আর রবীন্দ্রে পারিপার্শ্বিক ফারাক টানা হ'য়েছে খুব জোরের সহিত। কিন্তু এই ফারাক হুমায়ুনের সিদ্ধান্তের উল্টা দিকে যাবে। আসল কথা,—মধ্যবিত্ত শ্রেণী, লিখিয়ে-পড়িয়ে দল, ইংরেজি-ভারতীয় সমন্বয়ের প্রয়াস ইত্যাদি বস্তু মাইকেলের পরবর্তী বঙ্কিমের যুগে বেড়ে চ'লেছে। বঙ্কিমের পরবর্তী রবীন্দ্র-যুগে সেই বাড়তি থামেনি। তার একটানা স্রোতই আবার রবীন্দ্রোত্তর যুগেও ষোল আনা বজায় আছে। কাজেই পারিপার্শ্বিকে-পারিপার্শ্বিকে মাল হিসাবে তফাৎ নাই। একই পারিপার্শ্বিক চ'লেছে বরাবর,—মাত্রায় বেড়ে-বেড়ে উচ্চতর ডোজে।

গানের কবি ও গায়ক-কবি নজরুল ইস্‌লাম

৬ই জুন ১৯৪৩

লেখক—কাজি নজরুল ইস্‌লাম সম্বন্ধে অনেকদিন হ'তে জিজ্ঞাসা করবো ভাব্‌ছিলাম। বলুন দু-এক কথা। আপনার সঙ্গে তো তাঁর ভাব আছে শুনেছি।

সরকার—নজরুলের লেখা গান-শুনি ১৯[illegible] সনের ডিসেম্বর মাসে। ব্যারিষ্টার কুমুদনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে (ব্রাইট স্ট্রীট বালিগঞ্জ)। তাঁরা আমাদেরকে অতিথি ক'রে রেখেছিলেন। প্রায় বার বছর পর বিদেশ হ'তে কল্‌কাতায় সেই ফিরে এলাম। প্রথম বিদেশ-পর্যটনের কথা বল্‌ছি। কুমুদ চৌধুরীর নাম শুনেছিস্ বোধ হয়?

লেখক—মনে পড়্‌ছেনা তো?

সরকার—নামজাদা শিকারী। "ঝিলে-জঙ্গলে"-বইয়ের লেখক। শিকারের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে গল্প বলার ক্ষমতা দেখেছি তাঁর অদ্ভুত। শিকার ছিল তাঁর পক্ষে সুকুমার শিল্পকে সুকুমার শিল্প আবার পশুবিষয়ক চিত্ত-তত্ত্বকে চিত্ততত্ত্ব। এই সকল বিষয়ে তাঁর কাছে গল্প শুনা মনে হ'তো যেন জীবনের একটা অভিজ্ঞতা। কুমুদ চৌধুরী সাহিত্য-সংসারের "বীরবল" প্রমথ চৌধুরীর সেজ্‌দা,—আর কবি-গায়ক দিলীপ রায়ের মেশো। জজ স্যার আশুতোষ চৌধুরী এঁদের সকলেরই বড়্‌দা। তিনি ছিলেন শেষ বয়সে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রেসিডেন্ট। এঁদের অন্যতম, যোগেশ চৌধুরী (ব্যারিস্টার), বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে স্বদেশী স্টোর্স কায়েম করেছিলেন।

লেখক—কুমুদ চৌধুরীর বাড়ীতে নজরুলের কোন্ গান শুনেছিলেন? মনে আছে?

সরকার—মেয়েরা গান কর্‌তো। কোরাস্ শুনেছিলাম নিম্নরূপ :—

"চল্ চল্ চল্
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল।
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে, চল্‌রে, চল্
চল্, চল্, চল্।"

জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, নজরুলের লেখা। এটা আজকাল তাঁর "সন্ধ্যা"-বইয়ের অন্তর্গত। শুনবা মাত্র মনে পড়্‌লো "বিদ্রোহী"র

"বল বীর
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির।"

এই কবিতার চরম তারিফ ক'রেছিলাম প্রবাসের "ফিউচারিজম্ অব ইয়ং এশিয়া" বইয়ে (বার্লিন ১৯২২)।

লেখক—চরম তারিফটা কী?

সরকার—নজরুল আধুনিক বাংলা কাব্যের যুগ-প্রবর্তক।

লেখক—তারপর?

সরকার—নজরুলের গান শুনেছি এখানে-সেখানে তাঁর চেলাদের মুখে। নজরুলের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় বোধ হয় মুস্‌লিম সাহিত্য সম্মেলনে (১৯২৩)—দ্বিতীয় বিদেশ-পর্যটনের পর। সেই সম্মেলনেই সেকালের প্রবীণ কবি কৈকোবাদ ও একালের প্রবন্ধ-সাহিত্যিক ওদুদের সঙ্গে আলাপ। নজরুলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে অন্যান্য সভা সমিতিতেও। কিছুদিন হ'লো তাঁর নিজ গলার গাওয়া গান শুনেছি। ভূতপূর্ব মেয়র জাকারিয়ার বাড়ীতে (সেপ্টেম্বর ১৯৪২)। নৈশ ভোজনে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির "কৃষক"-সম্পাদক মনসুর, মানব-দরদী যুবা-কবি হাতেম আলি নওরোজি। দরজার ফাঁক দিয়ে অন্দর হ'তে মেয়েদের করমায়েস এল "অগ্নিবীণা" (১৯২১) পড়্‌বার। নজরুলের পাঠও শুনা গেল সেই বৈঠকে।

লেখক—সেদিন আর কিছু ছিল?

সরকার—জলসায় তর্কাতর্কি চলেছিল বঙ্কিম-সাহিত্য নিয়ে। জাকেরিয়া বঙ্কিমের গুণগ্রাহী বটে—কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যের মুসলমান বিদ্বেষ শিল্পের তরফ থেকে বরদাস্ত করতে রাজি নন্। ওদুদকে মনে হলো ষোল আনা বঙ্কিমের উকিল। কিন্তু সেদিনকার আবহাওয়ায়ও নজরুল আমার কাছে গানের কবি বা একমাত্র গায়ক রূপেই র'য়ে গেলেন। শুনা গেল ফজলুল হকের "নবযুগ" দৈনিকে তাঁকে সম্পাদক করা হবে। "নবযুগ" যখন বেরুলো, তাতে "ঈদের চাঁদ" কবিতা দেখ্‌লাম নজরুলের। বেশ জোরাল ও ঝাঝাল।

লেখক—নজরুলের গান সম্বন্ধে আপনার কী ধারণা?

সরকার—প্রথমেই বলি যে, বুঝ্‌লাম নজরুল শুধু গানের কবি মাত্র নন, গায়ক কবিও বটে। তারপর বলি যে, তাঁর গানের সুরগুলা লাগে ভাল। এই পর্যন্ত বল্‌তে পারি। এর বেশী জান্‌তে হ'লে জিজ্ঞাসা করিস্ দিলীপ রায় আর ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়কে। সুরের কাঠাম, বহর আর গড়ন ইত্যাদি বিদ্যায় এঁরা বোধ হয় পাকা লোক।

লেখক—কার-কার সুর আপনার ভাল লাগে?

সরকার—বাবা! এই প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে? রৈবিক সুরও আমার পছন্দ সই। নজরুলের সুরও পছন্দ-সই। বাঙালীকে গজল শুনিয়ে নজরুল নামজাদা। কিন্তু গজলই তাঁর একমাত্র সুর নয়। আমি রামপ্রসাদী কালীর পাটাও খাই, বৈষ্ণব বাউলের মালপোয়াও খাই। কীর্তনও শুনি ব'সে,—ভাটিয়ালও লাগে ভাল। গরীব মানুষ, যা পাই তাতেই আনন্দ। সেকালের বাজখাই লালচাঁদ বড়ালের খাম্বাজি গলায় মাত্ হ'তাম। আর একালের পঙ্কজ মল্লিকের খাদে-শুইয়ে-দেওয়া গলাই বা মন্দ কি? দিলীপের "মীরাবাই" শুনতেও যখন-তখনই রাজি আছি। এই ভালো লাগালাগির কলা-কৌশল, আঙ্গিক ও পারিভাষিকের কট মট বিশ্লেষণ করবার ক্ষমতা এই হাড়ে নাই। কাজেই এবিষয়ে আর বেশী তাগাদা করিস্ না।

লেখক—নজরুলি সুরের প্রভাব কেমন মনে হচ্ছে?

সরকার—বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুরু হয়েছে রৈবিক সুরের ধারা। নজরুলি সুরের ধারা সুরু হ'লো তার প্রায় বছর পঁচিশেকের পর। ধারা দুইটা বেশ-কিছু স্বতন্ত্র। দুই ধারাই বাঙালী জাত্কে মাত ক'রেছে। রৈবিক সুর আর নজরুলি সুর অনেকদিন পর্যন্ত বাঙলা দেশকে মাত্ ক'রে রাখ্বে। এই দুই সুরের ধারা অনেকটা আলাদা-আলাদা ভাবে বাঙ্লার নর-নারীকে তাতাতে-তাতাতে চল্বে। হয়ত কোথাও-কোথাও রৈবিক সুরের সঙ্গে নজরুলি সুরের মেলমেশও সাধিত হ'তে থাক্বে। সুর শিল্পী নজরুল বাঙালী-সমাজে অমর। রামপ্রসাদী, বৈষ্ণব, ভাটিয়াল, বাউল, কীর্তন, ঝুমুর, বোল্বাই (গম্ভীরা), জারি, রাবীন্দ্রিক ইত্যাদি সুরের মতন নজরুলি সুরও বঙ্গীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ।

করুণা, যতীন ও নজরুলের রাবীন্দ্রিক শব্দ-ছন্দ-ঝঙ্কার

লেখক—নজরুলকে গানের "কবি" বল্ছেন। তাঁর গানের "কবিতা" গুলা কেমন লাগে?

সরকার—"বুলবুল" (১৯২৭) বইটা গানের বই। সুর বোধ হয় সব কটাই গজল। এর ভেতরকার একটা শ্লোক শুন্বি বল্ছি,—

"তিতিরি শিখীর সাথে
নোটন কপোতী নাচে,
ঝিঁঝির ঝিয়ারী গাছে
ঝুমুর কাজরী গীতি"।

লেখক—এই কয় লাইনে কী পাচ্ছেন?

সরকার—এই ধরণের শ্লোকে আমার মনে পড়ে স্বদেশী যুগের করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ঝরা-ফুল"। তাঁর "তাজমহল" পড়েছিস শব্দ, ঝঙ্কার, অনুপ্রাস ইত্যাদি কাব্যের ভাষা-সৌষ্ঠবে নজরুলকে করুণানিধানের ছোট ভাই মনে হয়। নজরুলের "চৈতী হাওয়া" আর "ছায়ানট" (১৯২৫) ঠিক সেইরূপ মনে পড়িয়ে দেয় এই সঙ্গে তখনকার দিনের যতীন বাগ্চির ছন্দ আর ঝঙ্কারকেও। করুণা আর যতীন দু'জনেই বেঁচে আছেন।

বেশী বুড়ো নন। সেকালে যতীনের "কাজলা দিদি" বেশ উপভোগ্য মনে হ'তো।

লেখক— গানের কবিতার ভেতর আর কোনো লক্ষণ দেখতে পান?

সরকার—নজরুল বাঙলাদেশের আবেষ্টনকে জনসাধারণের চোখে দেখতে সুপটু। "মেঠো" ভাষায় চলতি শব্দে পাড়াগেঁয়ে হসন্ত-ধ্বনির সাহায্যে পল্লীদৃশ্যগুলা আঁকবার ক্ষমতা তাঁর জবরদস্ত। লোকটা খাঁটি বাঙালী। মফঃস্বলের নদী-মাঠ, ফুল-পাখী, আকাশ-বাতাস,— এই-সবকে মামুলি শব্দে সরস করা তাঁর বাহাদুরির অন্তর্গত। নজরুল অনেকটা ঠিক যেন পশ্চিম বঙ্গের (রাঢ় অঞ্চলের) গ্রাম্য কবি। অতি তাজা ও প্রাকৃত তাঁর বোলচাল ও ভাবভঙ্গী। সেকালের মতি রায়, নীলকণ্ঠ আর রসিক চক্রবর্তীর যাত্রার দল ছিল। জানিস্ তো? তাঁদের গানের শব্দগুলা যেন নজরুলের রপ্ত হ'য়ে গেছে।

লেখক— নজরুলকে এত অতীতে নিয়ে যাচ্ছেন?

সরকার—এমন কি তাঁদেরও পূর্ববর্তী দাশরথি রায়ের পাঁচালিতে মেঠো-মিঠে সোজা শব্দের গাঁথনি দেখা যায়। তাও যেন নজরুলের হাতের পাঁচ। নজরুল ছেলেবেলায় বোধ হয় যাত্রা-পাঁচালির গান শুনে থাকবে। শুধু কানে নয়, তার মরমে গিয়ে এইসব খুব গভীর ভাবে ব'সেছিল মনে হচ্ছে। আমি নজরুলকে এই হিসাবে বাঙালী নরনারীর অতি-ঘরোআ কবি সমঝিতে অভ্যস্ত। বঙ্গ-সংস্কৃতির সেকেলে ধারা বিংশ শতাব্দীর জনসাধারণের ভেতর নজরুল-মারফৎ নতুন গড়নে ছড়িয়ে প'ড়েছে। গানের কবি নজরুল ভাষা হিসাবে খানিকটা পাঁচালি-যাত্রাকারদের সন্তান ও উত্তরাধিকারী। অবশ্য দুচারটা ঝুমুর আর বৈষ্ণব পদাবলীর আওয়াজও নজরুলের "বুলবুল" জড়াতে পেরেছে। সুরগুলা কিন্তু নজরুলি। নজরুলি ছন্দও আছে। সকল দিক থেকে নজরুল-গীতাবলী বঙ্গ-সাহিত্যের অপূর্ব সৃষ্টি।

লেখক— রবীন্দ্রিক প্রভাব নজরুল-গীতাবলীতে নাই?

সরকার—বিংশ শতাব্দীর কোন্ বাঙালীর বাচ্চা রবীন্দ্র সাহিত্য চিবিয়ে খায় নি রে? নজরুলের উপর রাবীন্দ্রিক প্রভাব প্রথমেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে। আলোচনা করার প্রয়োজনই হয় না। প্রভাবটা এত স্পষ্ট। রবীন্দ্র কাব্যের শব্দ-ছন্দ ঝঙ্কার নজরুলের কানে ও চিত্তে বেশ-কিছু ঘা মেরেছে। তবে রাবীন্দ্রিক চিত্ত নজরুলের নয়। তা হচ্ছে রবির পেটেণ্ট, রাবীন্দ্রিক মার্কা মারা মাল। নজরুলের "বুলবুল", "চন্দ্রবিন্দু", "দোলন চাঁপা" ইত্যাদি গানের বই প্রধানতঃ বস্তুনিষ্ঠ। কল্পনা আর ভাবুকতা নিয়ে কারবার তাঁর খুবই কম।

লেখক— রবীন্দ্র-চিত্তে কি বস্তুনিষ্ঠা নাই?

সরকার— কেন থাকবে না? "মানসী" (১৮৯০), "সোনার তরী" (১৮৯৪), "চিত্রা" (১৮৯৬), "চৈতালি" (১৮৯৬), "ক্ষণিকা" (১৯০০) ইত্যাদি উনবিংশ শতাব্দীর অনেক বইয়েই রবীন্দ্র-কাব্যের বস্তুনিষ্ঠা পাকড়াও করা যায়। প্রকৃতি-বিষয়ক কোনো কোন কবিতা প্রায় পুরাপুরি বস্তুনিষ্ঠ। কোনো-কোনো কবিতার কয়েকটা শ্লোক প্রাকৃতিক দৃশ্যের নিখুঁত ছবি। "পলাতকা" (১৯১৮) হ'তে "সানাই" (১৯৪০) পর্যন্ত কবিতার বইয়েও বস্তু-নিষ্ঠার, বিশেষতঃ সমাজ-নিষ্ঠার—ইজ্জদ ঢের। তবে একমাত্র চামড়ার চোখ-কান দিয়ে দুনিয়াকে ছোঁবার চেষ্টা করা রবির ধাতে নাই। হৃদয়ের সঙ্গে দুনিয়াকে মেখে রাখা হচ্ছে তাঁর সাধারণ দস্তুর। তাঁর আটপৌরে কাব্যেও কল্পনা আর ভাবুকতার ডোজ বেশ চড়া। রৈবিক রক্তের হরেক বিন্দু রোমাণ্টিক অনুভূতিময়,—কল্পনানিষ্ঠ।

লেখক—রাবীন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠার এক-আধটা নমুনা দিন না?

সরকার—"মানসী"র "বধূ" হ'তে দিচ্ছি শোন্—

"মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে,
সুদূর গ্রামখানি আকাশে মেশে।
এধারে পুরাতন শ্যামল তালবন।
সঘন সারি দিয়ে দাঁড়ায় ঘেঁসে।
বাঁধের জলরেখা অলসে যায় দেখা,
জটলা করে তীরে রাখাল এসে।"

বঙ্গ-পল্লীর চিত্ত এর চেয়ে কোথায় পাবি বেশী স্পষ্ট, তাজা ও সরস? "মানসী" হ'তে "ক্ষণিকা" পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্য খেয়েই সত্যেন, কুমুদ লাহিড়ী, যতীন, করুণা, কুমুদ মল্লিক, কালিদাস রায় ইত্যাদি কবির বস্তুনিষ্ঠা। প্রভাত মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মণি গাঙ্গুলি, সৌরীন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি গাল্পিকেরাও এই সব বস্তুনিষ্ঠ রবীন্দ্র-কাব্যে মশ্‌গুল ছিলেন।

লেখক—এর প্রভাব আপনি নজরুল-কাব্যে দেখেছেন?

সরকার—হ্যাঁ। সোজাসুজি রাবীন্দ্রিক প্রভাব তো আছেই। হয়তো সত্যেনের মারফৎও রাবীন্দ্রিক প্রভাব নজরুল-কাব্যে এসেছে। শোন্। "বুলবুল" থেকেই পড়্‌ছি ঃ—

"তালীবন হানে তালি।
ময়ূরী ইশারা হানে
আসন পেতেছে ধরা
মাঠে মাঠে চারা ধানে।"

লেখক—আশ্চর্য মিল তো?

সরকার—এই রকম আরও অনেক আছে। 'ছায়ানট' (১৯২৫) ও দেখ্‌তে পারিস্। এই বইও গান-প্রধান। রাবীন্দ্রিক দৃশ্য-নিষ্ঠা, শব্দ যাদু আর ছন্দ-স্রোত নজরুল-দরিয়ায় বেশ সজোরে ব'য়ে যাচ্ছে মনে হবে।

লেখক—রবীন্দ্র-চিত্তের প্রভাব নজরুলে নাই বল্‌ছেন কেন?

সরকার—সে হচ্ছে মানস বা চিত্তের কথা। সে আলাদা চিজ। রবীন্দ্র-মানসের অধিকারী একমাত্র রবি। সে-চিজ দুনিয়ার সুদুলর্ভ ধনদৌলত। লাখে-হাজারে এক-আধজনের ভাগ্যে তা জুটে।

লেখক—এত বিরল রবীন্দ্র-চিত্ত?

সরকার—আচ্ছা, শোন্ সেই "বধূ"রই কয়েক লাইন ঃ—

"দেবে না ভালোবাসা দেবে না আলো
সদাই মনে হয় আঁধার ছায়াময়
দীঘির সেই জল শীতল কালো
তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভাল।"

এই কয় লাইনের মানস রাবীন্দ্রিক একচেটিয়া সম্পত্তি। এ হচ্ছে প্রকৃতি-নিষ্ঠায় রৈবিক ভাবুকতার অন্যতম চরম নিদর্শন। রাবীন্দ্রিক "শিশু" (১৯০৯) কবিতাগুলা প'ড়েছিস্? বুঝবি রবীন্দ্র-মানস কী চিজ। এই দরের কাব্য পৃথিবীতে কম আছে।

লেখক— রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় নজরুল কিরূপ দাঁড়াবে?

সরকার—রবি হচ্ছে বাঙালীর গৃহ-দেবতা। বাঙালী জাত্ ঘরে-ঘরে আটপৌরে কাজের দেবতা-স্বরূপ রবিকে ব্যবহার করে। তার সঙ্গে তুলনা সইতে পার্‌বে কে? একশ' বছর পরের লোকেরাও এই প্রশ্নের জবাব দিতে পার্‌বে কিনা সন্দেহ। আসল কথা, রবির সৃষ্টি-শক্তি অলৌকিক বা অতি-মানবীয় শ্রেণীর চিজ—যদি দুনিয়ার অলৌকিক-কিছু থাকে। একে স্বদেশী এলাকার বহির্ভূত সামগ্রী সম্‌ঝে চলা আমার দস্তুর। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে এই ধরণের অবস্থাকে বলে "একস্ট্রা-টেরিটোরিয়্যাল"। তার ওপর স্থানীয় আইন-কানুনের মাপ-জোক চলে না।

লেখক— সোজাসুজি রাবীন্দ্রিক প্রভাবের দৃষ্টান্ত নজরুল-কাব্যে কিরূপ?

সরকার—একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সহজে বুঝা যাবে। "দোলন-চাঁপা"র (১৯২২) "বেলা শেষে" কবিতাটা রাবীন্দ্রিক মালে ভরপুর। রাবীন্দ্রিক বোলে, ভঙ্গীতে আর মুদ্রায় ভরপূর তো বটেই। নজরুল বল্‌ছেন ঃ—

"পাখী উড়ে যায় যেন কোন্ মেঘলোক হ'তে
সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা গৃহপানে ঘর-ডাকা পথে।"

"কোন্ মেঘলোক", "কোন্ বিরহিণী ক'নে", "অনাদি কালের কোন্ অনন্ত বেদনা", "যুগ-যুগ ধরি", "কি জানি কখন কি হয়—" ইত্যাদি শব্দের অনিশ্চয়তা, অস্পষ্টতা ও অমূর্ততা বাংলা-কাব্যে রৈবিক পেটেণ্ট। অন্যান্য অনেকের মতন নজরুলও রবীন্দ্র-সায়রে সিনান ক'রেই এই সব কমল লুট্‌তে পেরেছেন। তারপর রৈবিক বিশেষণের ছড়াছড়ি এই কবিতার ভিতর যৎপরোনাস্তি। "সন্ধ্যা-দীপ-জ্বালা", "আসি-বলে-চলে-যাওয়া", "অনাদর-হানা", "দেবতার-পায়-ঠেলা" ইত্যাদি বিশেষণের আমদানি রবীন্দ্র-খনি হ'তেই সম্ভব হ'য়েছে।

নজরুল-কাব্যে দাশরথি-নীলকণ্ঠ'র উত্তরাধিকার

লেখক—আপনি পাঁচালি-যাত্রাগানের বংশধর বল্‌ছেন নজরুলের গানকে কোন্ হিসাবে?

সরকার—সোজা সোজা পাড়াগেঁয়ে মেঠো-মিঠে বাংলা শব্দের প্রয়োগ নজরুলের অন্যতম কীর্তি। এই সকল শব্দকে আমি পাঁচালি-যাত্রা ইত্যাদি লোক-সাহিত্যের সনাতন সম্পদ বিবেচনা করি।

লেখক—একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—আচ্ছা, নীলকণ্ঠ'র একটা গান ধর্‌ছি ঃ—

"গত নিশীথে কোন্ ফুলেতে
কার সনেতে মজেছিলে?
সত্যভাবে নাম রাখিতে
প্রভাতে জ্বালাতে এলে।
তাই বলি হে রসময়
ব'য়ে গেছে সুসময় ;

ক্ষুধার সময় ব'য়ে গেলে
ভাল লাগে কি সুধা দিলে?
কণ্ঠে বলে প্রভাত কালে
কোথা যাও হে চিকন-কালা?
তোমা বিনে নিকুঞ্জ বনে
কাঁদে যত ব্রজবালা।
শুকালো কমলের মধু
কমল প'ড়ে রইল শুধু।
সে ফুলে ব'সো গা বঁধু
মধু আছে ভরা ফুলে।"

লেখক—আপনি কি এই গানেরও আবহাওয়া পেয়েছেন নজরুলের গীতাবলীতে?

সরকার—শোন্ তা'হলে আবার "বুলবুল" ঃ—

"কার নিকুঞ্জে রাত কাটায়ে
আস্‌লে প্রাতে পুষ্প-চোর?
ডাক্‌ছে পাখী বৌ গো জাগো—
আর ঘুমিয়ো না রাত্র ভোর।"

লেখক—মায় দাশু রায়কে নজরুলের পূর্ব-পুরুষ ভাবা সম্ভব কি?

সরকার—আগে যে-দুটা শ্লোক তুলেছি তাও আবার খতিয়ে দ্যাখ্। "বুলবুল" বইটা আগাগোড়াই ঠিক যেন দাশুরায়-নীলকণ্ঠ'র সুললিত শব্দের আধুনিক ফুলঝুরি। দাশরথির একটা অনুপ্রাস শুন্‌বি?

লেখক—বলুন না?

সরকার—শোন্ ঃ—

"বঞ্চিত ক'রোনা কুরু
কিঞ্চিত করুণা শিব,
ভব, তব করুণা বিনে
ভবে আর কত আসিব?"

নজরুল-কাব্যে দাশরথি-নীলকণ্ঠ'র উত্তরাধিকার ঠাওরাতে গল্‌দঘর্ম হবার প্রয়োজন হয় না। প্রধানতঃ শব্দের তরফ হ'তে বল্‌ছি। প্রাকৃত শব্দ, ঘরোআ শব্দ, এই সবকে বাঙলামির অন্যতম চিহ্নোৎ সম্‌ঝে থাকি।

লেখক—কেন? অন্যান্য বিষয়ে নজরুলের অবস্থা কিরূপ?

সরকার—গানের কথা-বস্তু, ছন্দ আর সুর সম্বন্ধে নজরুল অনেকটা স্বরাজী। সেকেলে বাঙলার ছাপ এই সবের ওপর পরিমাণে অল্প। সুর-স্রষ্টা নজরুল স্বদেশী বিপ্লবের দ্বিতীয় যুগের (১৯১৯—২৯) পল্লী-প্রাণ, বঙ্গ-নিষ্ঠ গায়ক কবি। দাশু-নীলকণ্ঠ'র স্রোত রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহে মিশ্‌বার পর সুরু হ'য়েছে নজরুলি সুর-শব্দ-ছন্দের-ধারা। নজরুলের মতন ষোল আনা বাঙালীর বাচ্চা বাঙলা সাহিত্যের গৌরব।

"বিদ্রোহী" যুগ-প্রবর্তক কেন?

৮ই জুন ১৯৪৩

লেখক—"বিদ্রোহী"র বিশেষত্ব কী? বিদেশে এইটা দেখেইতো আপনি নজরুলকে যুগ-প্রবর্তক কবি ব'লেছিলেন?

সরকার—কবিতার মালটা নামের উপযুক্ত। বহরে খানিকটা বড় ব'লে এর ইজ্জদ্। বার-চোদ্দ লাইনে শেষ হ'য়ে গেলে বিদেশ থেকে কবির কৃতিত্ব আন্দাজ করা যেতো না। নজরুলের নাম ১৯২১ সনের আগে কখনো "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "উপাসনা" ইত্যাদি কাগজে দেখিনি। বিদেশে এই কয়টা পত্রিকা আমার কাছে নিয়মিতরূপে যেতো। "গৃহস্থ"ও পেতাম ১৯১৬ পর্যন্ত।

লেখক—বিদ্রোহটা কোথায়?

সরকার—বিদ্রোহ প্রথমতঃ মালে, দ্বিতীয়তঃ ভাষায়, তৃতীয়তঃ ছন্দে।

লেখক—ছন্দ-বিষয়ক বিদ্রোহ দেখ্লেন কী ক'রে?

সরকার—এর "নৃত্য-পাগল-ছন্দ" দেখ্বার জন্য দূরবীণ বা অনুবীণ লাগাতে হয় না। "বিদ্রোহী" চোখে পড়্বামাত্রই নজরে ভেবে উঠ্লো আমার অতি-প্রিয় কবি মার্কিন হুইট্ম্যান। বিদ্রোহী হুইট্ম্যান সম্বন্ধে ১৯১৫ সনে লিখেছিলাম— "হুইটম্যান তো মানুষ নয়, সে যে ইয়াঙ্কিদের নায়াগ্রা ঝোরা"—ইত্যাদি বিষ-চব্বিশ লাইন। কবিতাটা প্রথমে ইংরেজিতে বেরোয় "ব্লিস্ অব এ মোমেন্ট" নামে বস্টনে ১৯১৮ সনে। পরে বাংলাটা ছাপা হ'য়েছে। যা' হক সেই নায়াগ্রা ঝোরার ছন্দই মূর্তি পেয়েছে "বিদ্রোহী"তে।

লেখক—আপনি নজরুলকে বাঙালী হুইট্ম্যান বল্তে চান?

সরকার—আপত্তি নাই। তবে বাঙালীর বাচ্চা এই "বিদ্রোহী"র ছন্দে হুইট্ম্যানকে নকড়া-ছকড়া ক'রে ছেড়ে দিয়েছে। হুইট্ম্যান "ভেয়র লিবর" বা গদ্য-ছন্দের মালিক। মিত্রাক্ষর বা মিলনাত্মক পদ্যের ছন্দে তার একতিয়ার ছিল না। কিন্তু মিত্রাক্ষর পদ্য-ছন্দে আত্ম-প্রকাশ কর্তে পেরেছে "বিদ্রোহী"। সমস্তটা এক নিঃশ্বাসে হুড়হুড় ক'রে প'ড়ে ফেল্তে পেরেছিলাম। এও ছন্দের একটা মস্ত যাদু মনে হ'য়েছিল। দেখ্লাম সত্যি-সত্যিই

> "আমি চল চঞ্চল, ঠমকি ছমাক
> পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি
> ফিং দিয়া দিই তিন দোল,
> আমি চপলা চপল হিন্দোল।"

এই চাঞ্চল্য আর গতিশীলতা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মনে রাখ্তে হবে তখন আমি বছর সাতেক বাংলা দেশের (ভারতেরও) বাহিরে। বাংলা কবিতায় "নৃত্য-পাগল-ছন্দ" কেন আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল তার অন্যতম কারণ বোধ হয় এই সুদীর্ঘ প্রবাস-জীবন।

লেখক—আপনি এই ধরণের "নৃত্য-পাগল-ছন্দ" বাংলা সাহিত্যে আগে দেখেন নি?

সরকার—নিশ্চয় দেখেছি। কে না দেখেছে? রবীন্দ্র-সাহিত্যের মহাসাগরে আট্লাণ্টিকের ঝড় তুফান দস্তুর-মতনই আছে। সে একমাত্র মামুলি প্রশান্ত সাগরের লীলা-নিকেতন নয়।

লেখক— রবীন্দ্র-কাব্যেও "নৃত্য-পাগল-ছন্দ" আছে? দেখাতে পারেন?

সরকার—পড়্ গিয়ে "বলাকার" (১৯১৬)। শোন্ ঃ—

"দূর হ'তে শুনিস্ কি মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হ'তে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নি-বন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ"—ইত্যাদি

এই গেল বিংশ-শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের ভেতরকার রৈবিক নৃত্য-পাগল-ছন্দের নমুনা।

লেখক—"বলাকা"র পূর্ব্ববর্ত্তী রবীন্দ্র-কাব্যে নৃত্য-পাগল-ছন্দ দেখা যায় কি?

সরকার—শোন্ তা হ'লে রবীন্দ্রনাথের "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়"। মাত্র একটা শ্লোক দেখাচ্ছি ঃ—

"প্রলয় পিনাক তুলি
করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া
জগতের আদি অন্ত
থর থর থর থর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।
উঠিলরে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।"

তা ছাড়া নামজাদা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" তো আছেই। তার ছন্দে পাগল হয়নি এমন কোনো রবীন্দ্র পাঠক নাই। এসব লেখা হ'য়েছিল আমাদের জন্মের আগে। সে রৈবিক "প্রভাত-সঙ্গীত" (১৮৮৩)-এর যুগ। রাবীন্দ্রিক "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"ই নতুন ক'রে পেয়েছিলাম নজরুলের "বিদ্রোহী"তে। ডোজটা অতিমাত্রায় চড়া ছিল বল্‌তেই হবে।

লেখক—তা হ'লে "বিদ্রোহী"কে যুগ-প্রবর্ত্তক বললেন কেন?

সরকার—রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিশ্বকোষে আছে দুনিয়ার সব-কিছু সুতরাং কোনো রাবীন্দ্রিক মাল নতুন লেখকের রচনায় পেলে তাকে রাবীন্দ্রিক রূপে বাসিমাল সমঝে রাখা ঠিক নয়। এই মেজাজ আহাম্মুকির লক্ষণ। তা হ'লে তাজা, কাঁচা, নতুন বা সবুজ শিল্পী ঢুঁড়বার জন্য বোধ হয় বছর পঞ্চাশেক ব'সে থাকতে হবে। রবিকে শিল্পী হিসাবে বাতিল করা বড় শীগ্‌গির সম্ভব হবে না। "বিদ্রোহী" দেখ্‌বামাত্র নজরুলের ভেতর আমি হুইট্‌ম্যান আর রবীন্দ্রনাথ দুজনকে এক সঙ্গেই পাকড়াও ক'রেছিলাম। তবুও বুঝে নিলাম লেখক বাপকা বেটা। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের পরবর্ত্তী অন্যতম যুগ-প্রবর্ত্তক বাঙালীর বাচ্চা নজরুল।

লেখক—স্বদেশী যুগের যুবা কবিরা কি রাবীন্দ্রিক "স্বপ্নভঙ্গে"র ছন্দ দখল কর্‌তে পারে নি?

সরকার—এক কথায় বল্‌বো "না"। কুমুদ লাহিড়ী, করুণা, যতীন, কুমুদ মল্লিক, কালিদাস রায়,—এদের কেউই নৃত্য-পাগল-ছন্দের অধিকারী নন। ছন্দের রাজা ছিল

সত্যেন। নানা ঢঙের ছন্দ তার হাতে যাচাই হ'য়েছে। কিন্তু "বিদ্রোহী"র সমান লম্বা কবিতায় রাবীন্দ্রিক "সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ে"র কিম্বা "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"র ছন্দ সত্যেনও দেখাতে পারে নি। এইখানেই নজরুলের বিশেষত্ব। আগেই ব'লেছি রাবীন্দ্রিক ছন্দটাও বেশ চড়া হারে চেঁড়ে তোলা হ'য়েছে "বিদ্রোহী"তে।

লেখক—"বিদ্রোহী"তে ভাষার বিদ্রোহ কোথায়?

সরকার—সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে দেশী-বিদেশী আর আটপৌরে ও প্রাকৃত শব্দের মেল-মেশ সহজেই ধরা পড়ে। গুরু-চাণ্ডালী হচ্ছে নজরুলের অন্যতম ভাষা-লক্ষণ। এই বিষয়ে নজরুল অবশ্য একদম কান-কাটা শিপাহী নন। তাছাড়া রাবীন্দ্রিক টাকশালের শব্দ এর ভেতর গুলজার। যা হক গুরু-চাণ্ডালীর জন্য, অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃতের খিঁচুড়ির প্রসাদে "বিদ্রোহী"র জোর বেঁধেছে।

নজরুলের "আমি" ও ব্যক্তিত্ব

লেখক—এইবার বলুন,—মাল সম্বন্ধে "বিদ্রোহী"কে? সুতা-প্রবর্তক ব'লেছেন কেন?

সরকার—"বিদ্রোহী"র "আমি" হচ্ছে হুইট্‌ম্যানের আমি। এই আমিতে একমাত্র লেখক-কবিকে বুঝ্‌তে হবে না। বুঝ্‌তে হবে যে-কোনো লোক পড়্‌ছে তাকে, প্রত্যেক পাঠককে। এক কথায় মানুষ মাত্রকে। "বিদ্রোহী" হ'লো ব্যক্তির উপনিষদ্। ব্যক্তিত্ব এই কবিতার বেদান্ত। এই ধরণের "আমি"র ব্যবহারে কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সিদ্ধহস্ত। তাকেও আমি মালের অর্থাৎ ভাবধারার জন্য বাঙালী হুইট্‌ম্যানের ইজ্জদ দিয়ে থাকি। আজকাল বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ও হুইট্‌ম্যান-প্রেমিক। যা-হক নজরুলের কবিতায় রক্ত-মাংসের গড়া প্রত্যেক ব্যক্তি বিদ্রোহী। এই দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবন-দর্শন বাংলা কবিতায় ১৯২১ সনের পূর্বে বেশী ছিল না। থাক্‌লেও তা প্রত্যক্ষ, পরিষ্কার ও প্রবল আকারে পাওয়া যেত না। অধিকন্তু "আমি",—"আমি",—"আমি"র স্রোতে বাঙালী লেখকেরা ভাস্‌তে শেখে নি। উত্তম পুরুষের এক বচনের আওতায় মানব মাত্রের এই বিদ্রোহী মূর্তি বাংলা কাব্যে আত্মপ্রকাশ করে নি। এইখানেই নজরুলের যুগ-প্রবর্তক পদবী।

লেখক—মানুষ মাত্রকে বিদ্রোহী কল্পনা করা আপনি পছন্দ করেন?

সরকার—জ'ন্মে অবধি আমি আর-কোনো দর্শন খাড়া করিনি। ঝালে-ঝোলে-অম্বলে এই হচ্ছে এই অধমের একমাত্র কথা। ১৯০৫—১৪ সনের যুগের "সাধনা" হ'তে "বিশ্বশক্তি" পর্যন্ত বইগুলা বেরিয়েছিল। তার আসল মুদ্দা হচ্ছে ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দিগ্‌বিজয়। বীজগণিতের সাম্য সম্বন্ধ মাফিক আমার দার্শনিক কাঠামো ছিল নিম্নরূপ :—

মানুষ=বীর=ভাঙা-গড়ার ক্ষমতাওয়ালা জানোআর।

লেখক—এই সাম্য সম্বন্ধটা কোথায় পাওয়া যাবে?

সরকার—"গৃহস্থ" পত্রিকার ১৯১৩—১৪ সনের সংখ্যায় এই সাম্য-সম্বন্ধের দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গী খোদা র'য়েছে। আবেষ্টনের সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই, বিশ্বশক্তির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের পাঞ্জা-কষাকষি, সমাজকে ভেঙেচুরে, কেটে ছিঁড়ে ব্যক্তির পক্ষে বেরিয়ে পড়া এই হচ্ছে "সাধনা"—"বিশ্বশক্তি"র নির্গলিতার্থ। কাজেই নজরুলের "বিদ্রোহী"কে এই অধমের

কাব্য-মূর্তি সম্‌ঝে নেওয়া অতি সহজ মনে হ'য়েছিল।

লেখক—আমিত্ব বিশ্ব-চিন্তায় নতুন জিনিষ কি?

সরকার—"সাধনা-বিশ্বশক্তি"র মনুষ্যত্ব=বীরত্ব অর্থাৎ হুইট্‌ম্যানি-নজরুলি আমিত্ব পেছন দিকে বৈদিক সাহিত্য পর্যন্ত ঠেলে নেওয়া চলে। বৈদিক সাহিত্য থেকে অবশ্য বর্তমান যুগে এই আমিত্ব আমদানি করা হয় নি,—না আমেরিকায় না বাঙ্‌লায়।

লেখক—বেদের কোথায় আছে?

সরকার—অথর্ব বেদের (১২।১।৫৪) মন্তরটা নিম্নরূপ ঃ—

"অহমস্মি সহমান
উত্তরো নাম ভূম্যাম্‌।
অভীষাড়স্মি বিশ্বাষাড়্‌
আশামাশাং বিষাসহি।"

এই মন্তরটাকে আমি "আর্থিক উন্নতি" মাসিকের কপালে খুদে রেখেছি ১৯২৬ সন হ'তে।

লেখক—শ্লোকটার বাংলা কী?

সরকার—"আর্থিক উন্নতি"র যে-কোনো সংখ্যায়ই দেখ্‌তে পাবি। দেখিস্‌ নি? আচ্ছা বল্‌ছি ঃ—

"পরাক্রমের মূর্তি আমি,
শ্রেষ্ঠতম নামে আমায়
জানে সব ধরাতে।
জেতা আমি বিশ্বজয়ী,
জন্ম আমার দিকে দিকে।
বিজয়-কেতন উড়াতে।"

লেখক—এটার ইংরেজি বোধ হয় আপনার কোনো-কোনো বইয়ে দেখেছি?

সরকার—নিশ্চয়। কত জায়গায় আছে বল্‌তে পারিনা। বোধ হয় "পোলিটিক্যাল ইন্‌স্টিটিউশনস্‌ অ্যাণ্ড থিয়োরীজ অব দি হিন্দুজ" আর "ফিউচারিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া" বই দু'টায় প্রথম ব্যবহার ক'রেছি। ১৯১৭-১৮ সনে এই বই দু'টার অধ্যায়গুলা মার্কিন পত্রিকায় বেরিযেছিল। বই দু'টা বার্লিনে বেরোয় ১৯২২ সনে।

হুইট্‌ম্যান ও গদ্য-ছন্দ

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যে কি হুইট্‌ম্যানের "আমি" নাই?

সরকার—আগেই হয়ত ব'লেছি, "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"টা আমিত্বময়।

লেখক—হুইট্‌ম্যানের কথা রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাওয়া যায় কি?

সরকার—রবীন্দ্রনাথের "সাধনা" (১৯১৪) নামক ইংরেজি বক্তৃতাবলীতে হুইট্‌ম্যানকে মার্কিন বৈদান্তিক বলা হ'য়েছে। হুইট্‌ম্যানি মাল কিছু উদ্ধৃত করাও আছে। বাংলা লেখার ভেতর উল্লেখ কর্‌তে পারি "ছন্দ" বইটা (১৯৩৬)। এর ভেতর একটা প্রবন্ধ আছে "গদ্যছন্দ" নামে। হুইট্‌ম্যানের কয়েক লাইন তর্জমা ক'রে দেওয়া হ'য়েছে যথা ঃ—

"লুইসিয়ানাতে দেখ্‌লুম একটি তাজা ওক গাছ
বেড়ে উঠেছে,
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো থেকে
শ্যাওলা পড়্‌ছে ঝুলে
* * * *
আশ্চর্য লাগ্‌লো কেমন ক'রে এ গাছ ব্যক্ত ক'র্‌ছে
খুসীতে ভরা আপন পাতাগুলিকে
যখন না আছে ওর বন্ধু, না আছে দোসর,
আমি বেশ জানি আমি তো পার্‌তুম না।"

লেখক—এটা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো মন্তব্য আছে?

সরকার—রবি বল্‌ছেন ঃ—"এক দিকে দাঁড়িয়ে আছে কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ ওক গাছ, একলা আপন আত্মসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতায় আনন্দময়, আর একদিকে একজন মানুষ, সেও কঠিন বলিষ্ঠ সতেজ, কিন্তু তার আনন্দ অপেক্ষা কর্‌ছে প্রিয় সঙ্গের জন্যে। এটি কেবলমাত্র সংবাদরূপে গদ্যে বল্‌বার বিষয় নয়। এর মধ্যে কবির আপন মনোভাবের একটি ইসারা আছে।"

লেখক—আপনি এই মন্তব্য সম্বন্ধে কী বল্‌তে চান?

সরকার—এই মন্তব্যে আমি আপত্তি কর্‌বো না। হুইট্‌ম্যানকে কবি বল্‌তে প্রস্তুত আছি। কিন্তু সে উঁচু-দরের কবি নয়। গদ্যে কবিতা সম্ভব এটা স্বীকার করছি। ব্যস্‌। এই পর্যন্ত।

লেখক—আপনি গদ্য-কবিতার পক্ষপাতী নন?

সরকার—গদ্যে লেখে কোন্‌ কবি? পদ্যে যার দখল নাই। এই হ্‌চ্ছে সোজা কথা। হুইট্‌ম্যানের ক্ষমতা ছিল না পদ্যের ছন্দ, মিত্রাক্ষর বা অমিত্রাক্ষর খাড়া করবার। কিন্তু রবির গদ্য-কবিতার বিশেষত্ব আছে। তাঁর সাত খুন মাপ। রবীন্দ্র-সাহিত্যে শ'য়ে-শ'য়ে পদ্য-ছন্দ বেরিয়েছে। তারপরে খেয়াল-বশে রবি গদ-ছন্দের হাত সাফাই দেখাতে নেমেছিলেন। রৈবিক গদ্য-ছন্দ পছন্দ করি। কিন্তু তা ব'লে পদ্যে ক্ষমতাহীন লেখকের তথাকথিত গদ্য-কাব্যের তারিফ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

লেখক—গদ্য-কাব্য লেখা কি কঠিন?

সরকার—নিশ্চয় কঠিন। খবরের কাগজের সংবাদগুলাকে কেটে কেটে সিঁড়ির আকারে সাজালেই গদ্য-কাব্য হয় না। বস্তুতঃ হুইট্‌ম্যানের অনেক রচনা প্রায় খবরের কাগজের সিঁড়ি-কাটা লাইন গোছের। এইজন্য হুইট্‌ম্যানের "ভেয়ার লিবর" আমার অনেক সময়ে পছন্দসই নয়। কিন্তু রাবীন্দ্রিক গদ্য-কাব্য হুইট্‌ম্যানি সাংবাদিক গদ্য নয়। এর ভেতর ছন্দ আছে দস্তুর-মতন।

লেখক—কোন্‌ কোন্‌ রচনার কথা বল্‌ছেন?

সরকার—"পুনশ্চ" (১৯৩২) দেখ্‌বি। "শেষ সপ্তক" (১৯৩৫) ও মামুলি সাংবাদিক গদ্য নয়। পদ্যে দুর্বল কবিরা হুইট্‌ম্যানকে গুরু বেছে নেবে। কিন্তু ছন্দে যারা হাত-পাকা একমাত্র তারাই গদ্য-কাব্যের কবি রবীন্দ্রনাথের সাগ্‌রেত হবার অধিকারী।

লেখক—তাহ'লে হুইট্‌ম্যান আপনার অতি-প্রিয় হলো কী করে?

সরকার—মালের দৌলতে আর বোলচালের দৌলতে। তাছাড়া গদ্যকাব্যের রীতিটা

নতুন ব'লে।

লেখক—আপনি ছন্দের উপর এত জোর দিয়ে থাকেন তা আগে কখনো ভাব্‌তে পারি নি। অন্যান্য বিষয়ের মতন এই বিষয়েও আপনি গতানুগতিকের উল্টো পথে যাবেন এই রূপই ভেবেছি। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য আপনি পদ্য-ছন্দ আঁক্‌ড়ে ধ'রে র'য়েছেন।

সরকার—বোধ হয় তার অন্যতম কারণ এই যে, আমার হাতে আপনা-আপনি পদ্য-ছন্দ বেরিয়ে আসেনি। পদ্য-ছন্দের স্বাভাবিক ক্ষমতা যদি এই অধমের থাক্‌তো তাহ'লে হয়ত বা ছন্দ সম্বন্ধে এত জোর দিতাম না। তখন বোধ হয় বলা সম্ভব হ'লেও হ'তে পার্‌তো যে, ছন্দ না হ'লেও চলে। ছন্দে গরীব ব'লেই ছন্দের জন্য দরদ এত বেশী। গদ্য-কবিতা দিকে আমার রায় কোনো দিন যাবে না। রাবীন্দ্রিক গদ্য-ছন্দের কথা আলাদা।

নজরুলের সমসাময়িক যুবক বাঙলা

(১৯১৯-৪৩)

২১শে জুন ১৯৪৩

লেখক—নজরুল-কাব্যের বাণী কী?

সরকার—এক কথায় জান্‌তে চাস্? নজরুল হচ্ছেন বঙ্গ-বিপ্লবের দ্বিতীয় যুগের কবি। সে ১৯১৯-২৯ সনের কথা। এই যুগটাকে লোকেরা সহজে বলে গান্ধির যুগ বা অসহযোগের যুগ। মজার কথা, অসহযোগের যুগটাকে অনেক লেখক বাঙালী জাতের পক্ষে সাংস্কৃতিক দারিদ্রের যুগ বল্‌তে অভ্যস্ত।

লেখক—এ কথার মানে কী?

সরকার—অনেকের বিশ্বাস, ১৯০৫-১৪ সনের বঙ্গ-বিপ্লব বাঙালী জাত্‌কে সাহিত্যে আর সুকুমার শিল্পে চরম প্রেরণা দিয়েছিল। সেই যুগটাকে বাঙালী জাতের পক্ষে একমাত্র রাষ্ট্রিক বা আর্থিক আন্দোলনের যুগ বিবেচনা করা হয় না। বাঙ্‌লার নরনারী সংস্কৃতির প্রত্যেক কর্মক্ষেত্রে সেকালে যারপরনাই তেতে উঠেছিল। সে ছিল সর্বগ্রাসী উদ্বোধন, উন্মাদনা ও উত্তেজনার যুগ। এই হচ্ছে বাঙালী জাতের অতিপ্রিয় সার্বজনিক মত।

লেখক—এই বিশ্বাসটা কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

সরকার—নিশ্চয় যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বাঙ্‌লার নরনারীর আর একটা বিশ্বাস চ'লেছে। তারা মনে করে যে, প্রথম কুরুক্ষেত্রের পরবর্তী যুগে (১৯১৯-২৯) বাঙালী জাত ১৯০৫-১৪ সনের যুগের মতন উন্মাদনা, উত্তেজনা আর উৎপ্রেরণা পায় নি।

লেখক—১৯০৫-১৪ সনের সঙ্গে ১৯১৯-২৯ সনের এইরূপ তুলনা সাধন ঠিক নয় কি?

সরকার—পুরাপুরি ঠিক নয়। ১৯১৯-২৯ সনের যুগেও যুবক বাঙ্‌লা রাষ্ট্রিক আন্দোলনের সঙ্গে-সঙ্গে আর্থিক আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও জবরদস্ত রূপেই হাত দেখিয়েছে। ১৯০৫-১৪ সনের যুগ বাঙালীর কাছে একদম নয়া, নবীন, তাজা জিনিসের যুগ ছিল বলা হয়ত সম্ভব। সেই সকল জিনিসের সোআদ বাঙালী জাত ১৯০৫ সনের পূর্বে কখনো বোধ হয় চাখেনি। কাজেই ১৯০৫-১৪ সনে বাঙ্‌লার আবহাওয়ায়

লাফালাফি, মাতামাতি, তর্জন-গর্জন, ভাবুকতা, ভাবালুতা ইত্যাদি মনোভাব বা কর্ম-প্রয়াসের চরম দেখা গিয়েছিল।

লেখক—গান্ধি-যুগটা তাহ'লে বাঙালী জাতের পক্ষে কিরূপ?

সরকার—১৯১৯-২৯ সন হ'চ্ছে বাঙালীর পক্ষে ১৯০৫-১৪ সনের পরবর্তী ধাপ মাত্র। এইজন্য লাফালাফি -মাতামাতিতে ১৯০৫-১৪ সনের আবহাওয়া বড় বেশী ছিল না। অপর দিকে ভারতবর্ষের গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি জনপদের পক্ষে গান্ধি-যুগ (১৯১৯-২৯) সত্যি-সত্যিই বিপ্লবের প্রথম যুগ। আমাদের ১৯০৫-১৪ সন যা,— ঐ সকল অঞ্চলের পক্ষে ১৯১৯-২৯ প্রায় তা। এইজন্য হয়তো কখনো কখনো বাঙালীর ১৯১৯-২৯ সনকে আপেক্ষিক ভাবে খানিকটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা অথবা খাটো বিবেচনা করা সম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ১৯২৯-২৯ সনের যুগ বাঙালীর পক্ষে নিন্দনীয়, ফেলিতব্য, বর্জনীয়, ছোট-খাটো যুগ নয়। সেটাও গৌরবেরই যুগ।

লেখক—নজরুল-কাব্যের বাণী সম্বন্ধে আপনার এই সকল কথার যোগাযোগ বা মতলব কী?

সরকার—বল্‌ছি যে, নজরুল ১৯১৯-২৯ সনের যুগে বাঙালী জাতের কাব্য-মূর্তি। এই সকল বিশেষণের বেলায় রবীন্দ্রসাহিত্যকে বাদ দেওয়া উচিত। সে হচ্ছে "এক্‌স্ট্রা-টেরিটোরিয়াল", স্বদেশী-এলাকার বহির্ভূত মাল। তা বাদ দিলে সত্যেনকে ১৯০৫-১৪ সনের জন্য বাঙালী জাতের কাব্য-মূর্তি বল্‌তে পারি। ঠিক সেই ধরণেই বল্‌ছি যে, নজরুল সত্যেনের পরবর্তী ধাপ। এই হিসাবেও রবীন্দ্র-সাহিত্যকে বাদ দিচ্ছি। এই ধরণের অন্যান্য কবি সত্যেনের যুগেও ছিল। নজরুলের যুগেও এই ধরণের অন্যান্য কবি ছিল ও আছে। সত্যেন আর নজরুলকে সহজে দুই যুগের প্রতিনিধি সমঝে নিচ্ছি। বুঝ্‌তে হবে যে, প্রত্যেক যুগেই ছন্দ, বোল আর মাল সম্বন্ধে কতকগুলা সার্বজনিক লক্ষণ র'য়েছে। তা ছাড়া রাবীন্দ্রিক প্রভাব প্রত্যেক যুগেই অল্পবিস্তর সকল কবির রচনায়ই মূর্তি পেয়েছে। এই সকল ঐক্যের ভেতরই সত্যেনেরও বৈশিষ্ট্য আছে, নজরুলেরও বৈশিষ্ট্য আছে।

লেখক—সাধারণতঃ লোকেরা এইরূপ বিশ্বাস করে না কি?

সরকার—বোধ হয় না। এইরূপ বিশ্বাস কর্‌লে বাঙালীরা ১৯১৯-২৯ সনের (গান্ধি-যুগের) বাঙালী জাত্‌কে সাংস্কৃতিক ক্ষেদ্রে দরিদ্র সম্‌ঝিতো না। সত্যি কথা, নজরুলের সঙ্গে-সঙ্গে আর কিছু-পরে দেখা দিয়েছে বহু-সংখ্যক আধুনিক কবি ও গাল্পিক। তারা ক্ষমতাশালী ও বটে। শরৎ-সাহিত্য এই যুগেরই চিজ। ১৯০৫-১৪ সনের যুগে রবীন্দ্র-সাহিত্য ছাড়া যতগুলা ছোট-বড়-মাঝারি সাহিত্য ছিল তার তুলনায় ১৯১৯-২৯ সনের রকমারি বঙ্গ-সাহিত্য কোনো হিসাবে খাটো নয়।

লেখক—অন্যান্য কর্ম ও চিন্তার ক্ষেত্র সম্বন্ধেও এই কথা খাটে কি?

সরকার—সঙ্গীতের কথা ধরা যাক্‌। গাইয়ে-বাজিয়ের দল ১৯০৫-১৪ সনে যুবক-বাংলায় বড়-বেশী উল্লেখযোগ্য ছিল না। ১৯১৯-২৯ সনের যুগে সঙ্গীত-শিল্পী দিলীপ রায়ের সুরু। তার সঙ্গে-সঙ্গে গণ্ডা-গণ্ডা গাইয়ে-বাজিয়ে আজকাল যুবক-বাঙলার নতুন মূর্তি। নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর ও তার পরবর্তী বিমলেন্দু বসু একালেরই সাক্ষী; চিত্রশিল্পের জগতে অতুল বসু, যামিনী রায়, মুকুল দে ইত্যাদি শিল্পীরা এ যুগের রূপদক্ষ কৃতী

শিল্পী। দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী, প্রদোষ দাসগুপ্ত, গোপেশ পাল, ক্ষিতীশ রায় ইত্যাদি স্থপতিদের দলও বাড়্‌তির দিকে।

লেখক—বৈজ্ঞানিক ও আর্থিক আন্দোলন সম্বন্ধে কী বল্‌তে চান্‌?

সরকার—১৯০৫-১৪ সনে বাঙালীর বিজ্ঞান-গবেষণা ছিল নেহাৎ শৈশবাবস্থায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রীতিমত সঙঘ দেখা দিয়েছে ১৯১৯-২৯ সনের যুগে। অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রে লেখালেখি যা-কিছু তার অধিকাংশই এই যুগের মাল। যন্ত্রশিল্পের কাজে, আর ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্বাণিজ্যে বাঙালীরা হাতেখড়ি সুরু ক'রেছিল বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে সন্দেহ নাই। কিন্তু সফলতা লাভের পরিচয় সে যুগে ছিল না। যান্ত্রিক, শিল্পী ও বেপারী বাঙালী বল্‌লে বুঝ্‌তে হবে ১৯১৯-২৯ সনের ও তার পরবর্তী লোকজনকে।

লেখক—নজরুল যে-যুগের প্রতিনিধি সেই যুগ সত্যেনের যুগের চেয়ে কোনো হিসাবে খাটো নয়?

সরকার—না। নজরুলের যুগ সুরু ১৯১৯-২৯ সনে। কিন্তু সেই যুগ আজও চল্‌ছে বলা চলে। কম্‌-সে-কম্‌ সেই যুগের ধারাটা চল্‌ছে। "আধুনিক" আর "সাম্প্রতিক" মানসওয়ালা কবি-গাল্পিকেরা সেই যুগেরই শেষ ধাপ মাত্র। নাম ধ'রে বলা যেতে পারে,— এককালের মোহিত মজুমদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, আব্দুল কাদের, প্রেমেন মিত্র, সজনী দাস, জসিমুদ্দীন, সুধীন দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি কবিরা এই ধাপের সাক্ষী। রাধারাণী ও নরেন দেব-সঙ্কলিত "কাব্য-দীপালি" (১৯২৮) আর আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন মুখোপাধ্যায়-সঙ্কলিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" (১৯৪০) বই দু'টা ঘাঁট্‌লে আরও নাম পাওয়া যাবে।

লেখক—বক্তব্যটা আরও পরিষ্কার ক'রে বল্‌বেন?

সরকার—১৯৪০-৪৩ সনের যুবক বাঙলার কবি, গাল্পিক, চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, সঙ্গীত-শিল্প, বিজ্ঞান-সেবক, যান্ত্রিক, এঞ্জিনিয়ার, ঐতিহাসিক, দর্শন-লেখক, বণিক, সংবাদপত্রসেবী, রাষ্ট্রিক ইত্যাদি পেশার নামজাদা অনেকেরই সূত্রপাত ১৯১৯-২৯ সনের যুগে। এঁদের অনেকের বয়স ৪০।৪৫ পেরোয়নি নজরুলের সমসাময়িক যুবক-বাঙ্‌লা (১৯১৯-৪৩) সত্যেনের সমসাময়িক যুবক-বাঙলার (১৯০৫-১৮) চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর। চিত্তরঞ্জন-যতীন্দ্রমোহন-সুভাষ বসু-শ্যামাপ্রসাদ রাষ্ট্রিক-ক্ষেত্রে সুরেন-বিপিন-অরবিন্দ'র অযোগ্য উত্তরাধিকারী নন। নতুন অবস্থা মাফিক ব্যবস্থা কর্‌বার ক্ষমতা একালের রাষ্ট্রিকদেরও বেশ-কিছু দেখা গিয়েছে। এই হ'চ্ছে সোজা কথা। বিনা গোঁজামিলে এইরূপই আমি সম্‌ঝে থাকি।

লেখক—আপনি নিজেকে নজরুলের সমসাময়িক বিবেচনা করেন?

সরকার—না। বয়স হিসাবে কোনো মতেই সম্ভবপর নয়। নজরুলের বয়স আজ বোধ হয় চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হবে। আমি পঞ্চাশ পেরিয়ে,—পঞ্চান্ন পেরিয়ে গিয়েছি। এঁদের চেয়ে কম-সে-কম বছর দশেকের বড়। এঁরা ১৯১২-২৯-এর লোক। আমি ১৯০৫-১৪ সনের লোক। সত্যেনের যুগকে বল্‌তে পারি আমার যুগ। নজরুলের যুগ আমার পরবর্তী যুগ। বয়সের ছোট-বড় হিসাব কর্‌তেই হবে। বঙ্গ-বিপ্লবের দ্বিতীয় যুগে র'য়েছেন এঁরা। প্রথম যুগ ছিল আমাদের। প্রশ্ন কর্‌ছিস ব'লে নিজের কথা ব'লেছি। নিজেকে কারু সঙ্গে তুলনায় ফেল্‌ছি না। এই সময়ে বেঁচে র'য়েছি ব'লে আমরা সকলে এক যুগের লোক নই। এইটুকু জেনে রাখা ভাল।

বিপ্লব-নিষ্ঠায় নজরুল-কাব্য

লেখক—এইবার তাহ'লে নজরুল-সাহিত্যে ফিরে আসুন। নজরুলের বাণী কিরূপ?

সরকার—নজরুল-কাব্যের মুদ্দা প্রধানতঃ দুই। প্রথম হচ্ছে বিপ্লব, বিদ্রোহ, লড়াই। দ্বিতীয় ভালবাসা। নজরুল লড়াইয়ের কবি আর প্রেমের কবি।

লেখক—"বিদ্রোহী" কবিতার ভেতর বিদ্রোহ শব্দটা আছে ব'লে তাঁকে বিদ্রোহের কবি বল্‌ছেন?

সরকার—একমাত্র এই কবিতার জন্য নয়। 'সন্ধ্যা"-বইটা খুলে দ্যাখ্‌। এর ভেতর "জীবন-বন্দনা" আছে। তার শেষ শ্লোক নিম্নরূপ ঃ—

"কূপ-মণ্ডুক" "অসংযমীর" আখ্যা দিয়াছে যারে,
তারি তরে ভাই গান রচে যাই বন্দনা করি তারে।"

এই কবিতায় মামুলি রক্তারক্তি, মার-কাট, খুন-খারাপ্পা নাই। দুনিয়ার মামুলি নরনারী যা চায় তার বিরুদ্ধে আছে পাঁতি। এই হ'চ্ছে নজরুলের বিদ্রোহ-বিপ্লব-লড়াই। "আমি গাই তারি গান"-কবিতায় আছে—

"গাহি তাহাদেরি গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।"

পরিবর্তনের রেওয়াজ, ভবঘুরেমি, আর গতিনিষ্ঠা হচ্ছে নজরুলী বিপ্লব-দর্শনের শাঁস।

লেখক—"সন্ধ্যা"র ভেতর এই ধরণের আর কোনো কবিতার উল্লেখ কর্‌তে পারেন?

সরকার—সেই গতিনিষ্ঠার দস্তুলে ভরা "চল্‌, চল্‌, চল্‌," গানটা। "তরুণ তাপস", "না-আসা-দিনের কবির-প্রতি", "জীবন", "যৌবন", "জাগরণ" ইত্যাদি ছোট-ছোট কবিতারও ধুআ একরূপ। প্রত্যেকটায়ই নতুন-নিষ্ঠা, পরিবর্তন-প্রিয়তা। চাই অভিযান, চাই রদ-বদল। অতএব চাই বাধা-বিঘ্নের সঙ্গে বিরোধ, বর্তমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। চাই মরণ-দোল, চাই ঝড়ের সঙ্গে লড়াই। এই হচ্ছে "সন্ধ্যা"র মোটা কথা।

"বাংলার আজীজ" কবিতায় নজরুলের বিপ্লব-নিষ্ঠা মূর্তি পেয়েছে নিম্নরূপে ঃ—

"আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠ্‌ল গেয়ে গান,
তোমার চোখে দেখ্‌ল তারা আলোর অভিমান।"

নজরুলের কথার ভেতর অস্পষ্টতা, হেঁয়ালী, বা দুর্বোধ্যতা নাই। সবই হচ্ছে সরল-সোজা।

লেখক—নজরুলের আর কোনো বইয়ে "সন্ধ্যা"র বিপ্লব বা বিদ্রোহ আছে?

সরকার—নামজাদা বই "অগ্নিবীণা" (১৯২১)। এটাও আগাগোড়া বিপ্লব-নিষ্ঠায় ভরপূর। এরই ভেতর আছে "বিদ্রোহী"। বিপ্লবের বাণী "ধূমকেতু"-কবিতার প্রাণ। নজরুল বল্‌ছেন ঃ—

"আজিও ব্যথিত সৃষ্টির বুকে ভগবান কাঁদে ত্রাসে,
স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টি পাছে বা বড় হ'য়ে তারে গ্রাসে।"

এই হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে নজরুলের লড়াই। মানুষের আবেষ্টন বা পারিপার্শ্বিক এখানে ভগবান। আবেষ্টনকে চুরমার ক'রে ব্যক্তি চাচ্ছে দুনিয়ায় বেরুতে। ভাঙা-গড়ার দরদ নজরুলি বিপ্লবের আত্মা।

লেখক—ভগবান সম্বন্ধেও নজরুলের মাথা খেলে?

সরকার—নজরুলের কল্পনায় ভগবানের চেয়ে বড় মানুষ। মানবনিষ্ঠা তাঁর বিপ্লবনিষ্ঠার সঙ্গে সুজড়িত। কোনো নির্দিষ্ট দেশ, দল, সঙ্ঘ ইত্যাদির স্বপক্ষে-বিপক্ষে নজরুলের বিপ্লব মাথা খাড়া করে না। এই কবি মানুষমাত্রকে ভগবানের আসনে বসাতে চায়। মানুষকে ঠেলে তোলাই হ'লো বিপ্লব-সাধন।

লেখক—নজরুল-কাব্যেও এই ধরণের খেয়াল আছে?

সরকার—ভগবানের চেয়েও মহত্তর ইজ্জদ্ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে নজরুল-কাব্যের আসল দর্শন। "বিদ্রোহী"তে দেখেছি মানুষের "আমিত্ব" আর "ব্যক্তিত্বে"র জয়জয়কার। সেই মানুষের উঁচু ঠাঁই উজ্জ্বলরূপে পরিস্ফুট "ধূমকেতু"তে। কবির কথায় ঃ—

"এ চিতাগ্নিতে জগদীশ্বর পুড়ে ছাই হবে,
হে সৃষ্টি জানো কি তা?
কি বল? কি বল?
ফের বল ভাই আমি শয়তান-মিতা
হো হো ভগবানে আমি পোড়াবো বলিয়া
জ্বালিয়াছি বুকে চিতা।"

ভগবানকে জাহান্নমে পাঠানো আর ব্যক্তিকে দুনিয়ায় দিগ্‌বিজয়ী করা নজরুল-কাব্যের অন্যতম বিপুল ধান্ধা।

লেখক—এই ধরণের বাণী আরও পাওয়া যায়?

সরকার—"আগমনী"তে নজরুলের আকাঙক্ষা স্পষ্টাস্পষ্টি বাৎলানো আছে। তাঁর চাহিদা কী? শোন্ ঃ—

"নাই দানব,
নাই অসুর,
চাইনে সুর,
চাই মানব।"

দুনিয়ার জন্য চাই মানুষ। "সবার উপরে মানুষ সত্য"। যে-কোনো ধর্ম্মের যে-কোনো জাতের আর যে-কোনো শ্রেণীর নরনারীর জন্য নজরুলের এই ব্যবস্থাপত্র। নজরুল মানুষের কবি। এইজন্যই নজরুলকে ব'লেছি বিপ্লবের কবি। মানুষের নল-নল্‌চে বদলে দেওয়াটাই বিপ্লব। আবেষ্টনের ধ্বংস-সাধন এই বিপ্লবের আর এক রূপ।

লেখক—নজরুলি বিপ্লবের আর কোনো লক্ষণ আছে?

সরকার—লড়াইয়ে আর ভাঙাচুরায় নজরুলি বিপ্লব খতম হয় না। "প্রলয়োল্লাস"-কবিতার ইঙ্গিত গঠনমূলক। দুনিয়াকে শোনানো হচ্ছে ঃ—

"ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর—?
প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
আস্‌ছে নবীন,—জীবন-হারা
অসুন্দরে কর্‌তে ছেদন।"

নজরুলী বিপ্লব দুনিয়া গড়্‌তেও সুপটু।

স্বাদেশিকতার দরদ

লেখক—নজরুল-কাব্যে স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতি-নিষ্ঠা, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তা ইত্যাদি বিষয়ক রচনা নাই?

সরকার—আছে বৈ কি? বঙ্গীয় স্বদেশী যুগের জাতীয়তা-ধর্ম নজরুলি বিপ্লব-নিষ্ঠার অন্যতম অঙ্গ। নানা দেশের স্বদেশ-প্রেমিকরা নজরুলের সম্বর্দ্ধনা পেয়েছেন। স্বাদেশিকতার দরদ দেখা যায় তাঁর নানা বইয়ে।

লেখক—অ-বাঙালী স্বদেশ-সেবক সম্বন্ধে নজরুলের দু-একটা শ্লোক শোনাতে পারেন?

সরকার—"সন্ধ্যা"য় আছে "রীফ সর্দার"। এর একটা শ্লোক নিম্নরূপ ঃ—

"হে মরু-কেশরী আফ্রিকার।
কেশরীর সাথে হয় নি রণ,
তোমারে বন্দী ক'রেছে আজ
সভ্য ব্যাধের ফাঁদ গোপন।"

"অগ্নিবীণা"র "কামাল পাশা" হ'তে পাই ঃ—

"ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লী মায়ের—
দামাল ছেলে কামাল ভাই ;
অসুর-পুরে শোর উঠেছে
জোরসে সামাল সামাল তাই।"

লেখক—আফ্রিকা আর তুর্কী সম্বন্ধেও নজরুলের কবিতা আছে দেখ্‌ছি?

সরকার—"শাত-ইল-আরব" কবিতায় বাঙালীর বাচ্চা চোখের জল ফেল্‌ছে ইরাকের স্বাধীনতার জন্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের "মিবার পাহাড়" যেন নজরুলকে দিয়ে বলাচ্ছে ঃ—

"শাতিল আরব! শাতিল আরব!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর,
শহীদের লোহু দিলীরের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব-বীর।"

শেষ শ্লোক শুন্‌ছি ঃ—

'ইরাক-বাহিনী! এ যে গো কাহিনী,—
কে জানিত কবে বঙ্গ-বাহিনী
তোমারও দুঃখে "জননী আমার!"
বলিয়া ফেলিবে তপ্ত নীর?"

লেখক—বিদেশী নরনারীর জাতীয়তা সম্বন্ধে বাঙালী কবির আবেগ নতুন নয় কি?

সরকার—বাঙালীর কাব্য-জগতে এই এক নবীন অভিজ্ঞতা সন্দেহ নাই। বিপ্লবের কবি নজরুল, মানুষের কবি নজরুল, আফ্রিকা-তুর্কী-ইরাকের নর-নারীর স্বদেশী আন্দোলনেও মশগুল। ঐ দ্যাখ্ ঃ—

"পরাধীনা! একই ব্যথায় ব্যথিত
ঢালিল দু-ফোঁটা ভক্তবীর।"

স্বদেশ-সেবক বাঙালী কবি যে-কোনো পরাধীন জাতের ব্যথায় ব্যথিত। এই কবিতাগুলা বঙ্গ-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন।

লেখক—ভারতের জাতীয় আন্দোলন নজরুল-কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে কি?

সরকার—"বাংলার আজীজ" কবিতা আছে "সন্ধ্যা"য়। তার শেষ শ্লোকে দেখ্‌ছি এক আকাঙ্ক্ষা, যথা ঃ—

"আবার এসো সবার মাঝে শক্তিরূপে বীর,
হিন্দু সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পীর!"

"সন্ধ্যা" নামে একটা কবিতা আছে। তার আকাঙ্ক্ষায় ফুটে উঠেছে ভারতীয় স্বদেশ-প্রেম।

লেখক—তার সুর কিরূপ?

সরকার—"সন্ধ্যা কি কাটিবে না?
কত সে জনম ধরিয়া শুধিব এক জনমের দেনা?
মোদের পাপের নাহি যদি ক্ষয়, যদি না প্রভাত হয়,
প্রলয়ঙ্করী বেশে আসি কর্ ভীরুর ভারত লয়।"

লেখক—দেখ্‌ছি বাঙলা দেশ সম্বন্ধেও স্বতন্ত্র কবিতা আছে?

সরকার—চিত্তরঞ্জনের চতুর্থ বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে (১৯২৮) নজরুলের "তর্পণ" ভারতীয় নর-নারীকে তাদের দুর্দশা দেখিয়ে দিচ্ছে। এই শোন্ ঃ—

"হে দেশবন্ধু হয়ত স্বর্গে দেবেন্দ্র হ'য়ে তুমি
জানি না কি চোখে দেখিছ পাপের ভীরুর ভারত-ভূমি!
মোদের ভাগ্যে ভাস্কর সম উঠেছিলে তুমি তবু,
বাহির আঁধার ঘুচালে, ঘুচিল মনের তম কি কভু?"

১৯১৯-২৯-এর যুগে নজরুল ভারতীয় রাষ্ট্রিক স্বরাজ-স্বাধীনতার দরদী কবি। নজরুল-মানস জাতীয়তা-ধর্মী, স্বদেশ-নিষ্ঠ, বঙ্গ-প্রেমিক।

এই সূত্রে বাঙ্‌লার গঠন-মূলক স্বদেশ-সেবকেরা নজরুলের সম্বর্দ্ধনা পেয়েছেন।

লেখক—কাকে-কাকে নজরুল-কাব্যে সম্বর্দ্ধনা করা হ'য়েছে? কোন্ কোন্ বইয়ে?

সরকার—"সন্ধ্যা"য় আছে শরৎ সম্বন্ধে। সত্যেন দত্ত সম্বন্ধে গোটা দুতিনেক কবিতা পাবি "ফণি-মনসা"য় (১৯২৬)। সেই বইয়েই অশ্বিনী দত্ত আর দিলীপ রায়ের সম্বর্দ্ধনাও আছে।

মুসলিম দুনিয়া ও যুবক-বাঙ্‌লা

লেখক—বাঙ্‌লা বা ভারত নিয়ে নজরুলের আর কোনো বই আছে?

সরকার—প্রকাশকেরা "জিঞ্জীর" (১৯২৬) নামক বইটার বিজ্ঞাপন দেয় "মুস্‌লিম কবিতার সমষ্টি" ব'লে। কিন্তু আমার বিবেচনায় এটা ভারতীয় বা বঙ্গীয় স্বাদেশিকতা বা স্বজাতি নিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত।

লেখক—কেন? এর ভেতর মুস্‌লিমই বা কতখানি আর ভারতীয় স্বাদেশিকতাই বা কতখানি?

সরকার—বাঙালী জাত্‌কে বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে সংযুক্ত কর্‌বার পক্ষে নজরুলের

"জিঞ্জীর" যারপর নাই কাজের বই। এর "চিরঞ্জীব জগলুল" "আমানুল্লাহ" ইত্যাদি কবিতায় বাঙালীর বুক চওড়া হ'তে বাধ্য। নজরুলি মানব-নিষ্ঠার দম্ভল এই বইয়ের প্রথম হ'তে শেষ পর্যন্ত বজায় আছে। গোটা কয়েক আরবী শব্দ হয়ত পাঠকের গলায় ফুটতে পারে। কিন্তু নজরুলের "অগ্নি-বীণা" বা অন্যান্য বই গিল্‌তে গিয়ে সংস্কৃত কাঁটা পাশ হ'তে হয়। এই আবহাওয়ায় না হয় গোটা কয়েক আরবী কাঁটার বেড়া পেরুতে হবে। তাতে কীই বা গেল-এলো?

লেখক—দু-একটা নমুনা চাই।

সরকার—"সুবহ্ উস্মদ" (পূর্বাশা) হতে পড়্‌ছি—

"খর-রোদ পোড়া খর্জ্জুর তরু—
তারও বুক ফেটে ক্ষরিছে ক্ষীর।
সুজলা, সুফলা শস্য শ্যামলা
ভারতের বুকে নাই রুধির।"

এই হ'লো নজরুলের দুঃখ। সেই সঙ্গে আকাঙক্ষা বেরুচ্ছে নিম্নরূপ ঃ—

"জেগেছে আরব ইরাণ তুরাণ
মোরক্কো আফ্‌গান মেসের।
এয় খোদা! এই জাগরণ রোলে,
এ-মেষের দেশও জাগাও ফের।"

একমাত্র মুস্‌লিম এশিয়ার আর আফ্রিকার জাগরণেই নজরুলের পেট ভরে না। ভারতের জাগরণই তাঁর প্রাণের কথা। হেমচন্দ্রের—

"আরব্য মিশর তাতার তুরকি
চীন ব্রহ্মদেশ অন্য কব কি"

—ইত্যাদি শ্লোকটা মনে পড়্‌ছে? ঠিক সেই লাইনগুলা ফলাও ক'রে যেন নজরুল "জিঞ্জীর" বইয়ের এশিয়া ও আফ্রিকা বিষয়ক কবিতাগুলা লিখেছেন। প্রত্যেকটার ধু-আই যেন "ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়।" বঙ্গ-বিপ্লবের স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত এই বই তথা-কথিত "মুস্‌লিম কবিতার সমষ্টি" নয়।

লেখক—"আমানুল্লাহ"-কবিতা থেকে দু-এক লাইন শোনাবেন?

সরকার—নজরুলের অমানুল্লাহ-সম্বর্দ্ধনার মুদ্দা নিম্নরূপ ঃ—

"তোমার রাজ্যে হিন্দুরা আজো
বেরাদর-ই-হিন্দু নয় কাফের,
প্রতিমা তাদের ভাঙনি ভাঙনি
একখানি ইট মন্দিরের।"

লেখক—জগ্‌লুল্ সম্বন্ধে নজরুলের সম্বর্দ্ধনা কিরূপ?

সরকার—শোন্ কিছুটা ঃ—

"বন্ধ যারে বন্দিল হ'য়ে নন্দন-ফুল হার,
না-ই হ'ল সে গো পয়গম্বর নবী—
দেব অবতার,
সর্বকালের সর্ব-দেশের সকল নর ও নারী
করে প্রতীক্ষা, গাহে বন্দনা মাগিছে

আশিস্ তারি।"

কিন্তু সেই সঙ্গেই রয়েছে ভারতের কথা, যথা—

এই ভারতের মহা মানবের সাগর তীরে
হে ঋষি,
তেত্রিশ কোটি বলির ছাগল চরিতেছে দিবানিশি।"

ভারত সম্বন্ধে নজরুলের আকাঙক্ষাও তার সঙ্গে জড়ানো আছে। কবি বল্‌ছেন ঃ—

"মলয় শীতলা সুজলা এদেশে আশিস্ করিও খালি—
উড়ে আসে যেন তোমার দেশের মরুর দু' মুঠো বালি।"

লেখক—"জিঞ্জীর" সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য সহজে জান্‌তে পারি?

সরকার—বাঙালী ছেলেমেয়েদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুক্‌বার বয়সের আগেই "জিঞ্জীর" হজম ক'রে ফেলা উচিত। এশিয়ায় ও আফ্রিকায় "বৃহত্তর ভারত" কায়েম ও পুষ্ট কর্‌বার কাজে এই বই হ'তে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে প্রচুর। ছেলেবেলা হ'তে যুবক বাঙলার মগজ ও কলিজা নজরুলের বুখ্‌নিতে রপ্ত হোক্। তা হ'লে বাঙালীর বাচ্চা আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় মজ্‌বুদ ভাবে পায়চারি কর্‌তে পার্‌বে। বাঙ্‌লার কাব্যে "জিঞ্জীর" অতি দামী কেতাব। গঠনমূলক বই।

মধুসূদন-সত্যেন-নজরুল

লেখক—বিদেশী বিষয়-বস্তু নিয়ে ইংরেজি কবিতা আপনার নাই কি "ব্লিস অব এ মোমেন্ট" বইয়ে (বস্টন ১৯১৮)? তাতে ঈজিপ্ট, চীন, জাপান, আমেরিকা, আট্‌লান্টিক, প্রশান্ত মহাসাগর ইত্যাদি দেশ-বিদেশের ছবি পেয়েছি। তাছানা ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন, গ্যেটে, নেপোলিয়ান, হুইট্‌ম্যান্, ব্রাউনিঙ্ ইত্যাদি পাশ্চাত্য কবিদের সম্বন্ধে কবিতাও প'ড়েছি। সে-সবের ভালো-ভালো আমেরিকান সমালোচনাও দেখেছি। তাছাড়া দেখেছি, জাপানী চিত্রশিল্পী সেশ্যু সম্বন্ধে "সাজঘরে চিত্রশিল্পী," অধিকন্তু আছে "সুইস স্বরাজের সূত্রপাত"। সে সব সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন?

সরকার—আমার লেখাগুলাকে কবিতা বলি না। "ব্লিস্ অব এ মোমেন্ট"-বইয়ের ইংরেজী রচনাগুলা আগে বাংলায় লেখা হ'য়েছিল। কয়েকটা বাংলায় ছাপা হ'য়েছেও। "আত্মশক্তি"-সাপ্তাহিকে,—বোধ হয় ১৯২৭-২৮ সনে। তার সম্পাদক ছিলেন একালের নামজাদা নাট্যশিল্পী শচীন সেনগুপ্ত।

লেখক—বিদেশী বিষয়-বস্তু নিয়ে বাঙালী কবিদের ভেতর কে-কে মাথা খেলিয়েছেন?

সরকার—এই ক্ষেত্রে বাঙ্‌লার কাব্য খুবই গরীব। মধুসূদনের সনেট ছিল সনেটের জন্মদাতা ইতালিয়ান কবি পেত্রার্কা সম্বন্ধে। বিহারী, হেম, গিরিশ, নবীন, ইত্যাদি কবিদের রচনায় এই ধরণের বিদেশী বিষয়ক কবিতা আছে কিনা মনে পড়ছে না। শেকস্‌পীয়ারের "টেম্পেস্ট" আর "রোমিও-জুলিয়েট" তর্জমা ক'রেছিলেন হেম। অবশ্য শেলী আর টেনিসনের কিছু কিছুও তাঁর অনুবাদে পাওয়া যায়। তা ছাড়া বিদেশী কাব্যের প্রভাব সকলের উপরই জবরদস্ত। বিক্রমপুরের কবি গোবিন্দ দাস ১৮৯৫ সনে "চীন-জাপান-যুদ্ধ" লিখেছিলেন কবিতায়। সেটা তাঁর "কস্তুরী"-বইয়ে পাওয়া যায়। তাতে এশিয়াকে

মা বলা হ'য়েছে। চীন-জাপানের ঐক্যে এশিয়ার বিশ্ব-বিজয় অবশ্যম্ভাবী এইরূপ বাণী ছিল।

লেখক—গোবিন্দ দাসের "চীন-জাপান যুদ্ধ" হ'তে দু-এক লাইন শোনাতে পারেন?

সরকার—তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল নিম্নরূপ ঃ—

"মিলে-মিশে দুই-ভাই, থাক্ তোরা এক ঠাঁই,
এক আত্মা, এক দেহ, এক মন প্রাণ।
তা হ'লেও ভীম দেহ, সাধ্য কি ছুঁইবে কেহ
ভাঙ্গিতে পারিবি আল্প ধ'রে দিলে টান।
পশ্চিমের শশিরবি আবার কাড়িয়া লবি,
দাপটে করিবি ধরা পুনঃ কম্পমান।
প্রশান্তের মহাঢেউ, সাধ্য কি সহিবে কেউ,
আণ্ডিস্ উড়িয়া যাবে ভাসিবে সুদান।
যা হ'য়েছে এই ঢের থাম রে জাপান।"

লেখক—বিষয়-বস্তু সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্য কি ঘর-কুনো?

সরকার—অনেকটা তাই। তবে বাঙলাদেশের কথা ও কাহিনীই রবীন্দ্রনাথের একমাত্র খাদ্য নয়। অবাঙালী ভারতীয় বস্তুও তাঁকে তাতাতে পেরেছিল।

লেখক—সেই সবের পরিমাণ কিরূপ?

সরকার—অ-বাঙালী ভারতীয় বিষয়-বস্তুর কবিতা রবীন্দ্র-সাহিত্যে খুব কম। শিবাজী, শা-জাহান আর প্রাচীন বৌদ্ধ ও মধ্য-যুগের শিখ-রাজপুত কাহিনী ছাড়া অন্য কোনো ভারতীয় বিষয়-বস্তু রবীন্দ্র-কাব্যে ঠাঁই পেয়েছে কিনা সন্দেহ।

লেখক—বড়ই আশ্চর্য, এই বিষয়ে আপনি একজনকেও উল্লেখযোগ্য পাচ্ছেন না?

সরকার—কেন পাবো না? সত্যেন দত্ত বিদেশী-বিষয়-বস্তু নিয়ে কাব্য রচনার ক্ষেত্রে মস্ত-বড় শিল্পী। সত্যেনের "কাব্য-সঞ্চয়ন" বইয়ের চার আনা হচ্ছে বিদেশী মালের অনুবাদ। তা ছাড়া আছে "কবর-ই-নুরজাহান"-প্রশস্তি। বিদেশী বিষয়-বস্তুর ব্যবহারে নজরুল সত্যেনের সাগরেত ও জবরদস্ত উত্তরাধিকারী। মোহিতলাল মজুমদার-প্রণীত "বিস্মরণী" (১৯২৭) বইয়ে জাহাঙ্গীর ও নুরজাহান আর জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার সম্বন্ধে সরস কবিতা আছে। গাল্পিকদের ভেতর প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "দেশী ও বিদেশী" (১৯১০), সৌরীন মুখোপাধ্যায়ের "শেফালি" (১৯১০) ও "মাতৃঋণ" (১৯১৬) আর দিলীপ রায়ের "মনের পরশ" ও "দুধারা" (১৯২৯) ইত্যাদি বইয়ে বিদেশী কথা-বস্তুর ছাপ বেশ প্রবল। "মাতৃঋণ" অবশ্য ফরাসী লেখক দোদে'র বইয়ের তর্জমা বা বাঙালী-কারণ।

লেখক—বাংলা-সাহিত্যের গতি-এদিকে কেমন দেখ্ছেন।

সরকার—বিদেশী-চর্চায় মধুসূদন-সত্যেন-নজরুলের উত্তরাধিকারী হবার জন্য বাঙালী কবিদের চেষ্টা করা উচিত। আজকালকার বস্তি-কবি আর কাস্তে-কবিদের ভেতর কেহ-কেহ তেতে উঠ্লে বিদেশী বিষয়-বস্তুর কাব্য বাংলা সাহিত্যে কিছু-কিছু হাজির হ'তে পারে। হয়ত কারু-কারু মেজাজ শীগ্গিরই এই দিকে খেল্তে থাক্বে। কবিতা লেখা জোর-জবরদস্তির চিজ্ নয়। মেজাজটা শরীফ হওয়া চাই। মনে রাখ্তে হবে যে, বিদেশী সাহিত্য হ'তে খোদ "তর্জমা"র হিসাব আলাদা।

জুলাই ১৯৪৩

নজরুল-কাব্য কি সাম্যবাদী?

৩রা জুলাই ১৯৪৩

লেখক—দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয়তার বাণী ছাড়া নজরুলি বিপ্লবে অন্য কোনো কথা ধরতে পারা যায় কি?

সরকার—আগেই ব'লেছি নজরুলি বিপ্লব মানুষ মাত্রের উচ্চতম ইজ্জত দাবী করে। সেই দাবীর সঙ্গে-সঙ্গে "সাম্যবাদে"র আকাঙক্ষা নজরুল-কাব্যে বেশ-কিছু শুন্‌তে পাওয়া যায়। "সন্ধ্যা"র "শরৎচন্দ্র" কবিতায় নজরুল বলেছেন ঃ—

"অসীম আকাশে বাঁধনি ঘর
হে ধরণীর নীল দুলাল!"
আর "দেখাও স্বর্গ তব বিভায়—
এই ধূলার উর্দ্ধে নয়।"

লেখক—এতে কী বুঝা যায়?

সরকার—কথাগুলো নজরুল-কাব্য সম্বন্ধে পুরাপূরি খাটে। এ-চিজ অবশ্য সোশ্যালিজ্‌ম্-কমিউনিজ্‌ম্ নয়। "ধূলা-মাটির সাম্যগান" গেয়েছেন নজরুল কাজেই "সাম্যবাদী"র বাণীও বেরিয়েছে "অগ্নিবীণা'র" লেখকের কণ্ঠে। তবে এই সাম্যবাদে মার্ক্‌স্-দর্শন কতটা আছে তা আলোচনা করার দরকার নেই। এ-হচ্ছে মানব-প্রেমিকের সাম্যবাদ। তার ভেতর দ্বন্দ্ব-মূলক শ্রেণী-লড়াইয়ের তর্কশাস্ত্র না পাবারই কথা। কবি নজরুল গরীবের দরদী, নির্যাতিতের দরদী,—এই পর্যন্ত।

লেখক—নজরুল-কাব্যকে বিপ্লব-নিষ্ঠ বল্‌ছেন অথচ সাম্যবাদী বল্‌ছেন না কেন?

সরকার—বিপ্লব সোজা কথা। সাম্যবাদ তত সোজা নয়। মানুষের জীবনকে কোনো নতুন ব'নেদের উপর দাঁড় করাবার মেজাজকে বিপ্লবী মেজাজ বল্‌তে পারি। সেই মেজাজ থাক্‌লেই লেখক রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার কবি না হ'তেই পারে। আবার যে-লেখক রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার কবি সে হয়ত সাম্যবাদী কবি নয়। সাম্যবাদ আর্থিক চিজ। বুঝ্‌তে হবে যে,—বিপ্লব, স্বাধীনতা আর সাম্যবাদ তিনটা আলাদা-আলাদা জিনিষ। নজরুল বিপ্লব-নিষ্ঠ সন্দেহ নাই, মানব-নিষ্ঠও বটে। তুর্কী, ইরাক্‌, ভারত এই সব দেশের স্বরাজ-স্বাধীনতা সম্বন্ধেও নজরুল-কাব্যদরদী। কিন্তু সাম্যবাদের মেজাজ নজরুল-কাব্যে আছে কিনা বিচারের বিষয়।

লেখক—সাম্যবাদের কাব্য কাকে বলে?

সরকার—সাম্যবাদের কাব্য সুপরিচিত স্বাধীনতার কাব্য নয় কোনো নির্দিষ্ট দেশের ওপর কোনো বিদেশীর কোনো প্রকার শাসন পছন্দ না করা স্বরাজ-মেজাজীর স্বাধীনতা-দরদীর লক্ষণ। এই মেজাজ রাষ্ট্রিক। ভারতবর্ষে এই মেজাজ সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু সাম্যবাদের মেজাজ ভারতে বুঝা সোজা নয়। স্বাধীনতার মেজাজে মূর্তি পায় পরজাতি-বিদ্বেষ, বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই, স্বদেশে-বিদেশে বিরোধ। একে বলে ন্যাশনালিজ্‌ম্, জাতীয় ঐক্য,—সকল শ্রেণীর সমন্বয়-বিশিষ্ট স্বদেশের স্বার্থরক্ষা।

লেখক—সাম্যবাদ কী?

সরকার—সাম্যবাদ স্বদেশ বুঝে না, বিদেশ বুঝে না। বুঝে প্রত্যেক দেশের ভিতরকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। জাতীয় ঐক্য, সমন্বয়শীল স্বদেশী সমাজ ইত্যাদি চিজ সাম্যবাদের পরিভাষায় পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় দেশের ভিতরকার অনৈক্য, বিভিন্নতা, বৈচিত্র্য। সাম্যবাদ চায়। শ্রেণীতে-শ্রেণীতে বিবাদ, ধনী-শ্রেণীর বিরুদ্ধে নির্ধন-শ্রেণীর লড়াই। এই শ্রেণী-সচেতন মেজাজ ও কাব্য এক চিজ, আর স্বদেশ-সচেতন-মেজাজ ও কাব্য আর এক চিজ।

লেখক—গরীবের জন্য দরদী মেজাজ ও কাব্য কি সাম্যবাদী মেজাজ ও কাব্য নয়?

সরকার—না। যে-কোনো লোক গরীবের বন্ধু, নির্যাতিতের সুহৃৎ, পারিয়ার সখা হ'তে পারে। "সর্বহারার গান" লেখা বেশী কঠিন নয়। কাস্তে-কাব্য আর বস্তি-গল্প সৃষ্টি করা সোজা কথা। মান্ধাতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার সর্বত্রই "দরিদ্রের ক্রন্দন"টা সাহিত্যে শুনা গিয়েছে। কিন্তু দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথী কবিমাত্রকে সাম্যবাদী কবি বলা চলে না। সাম্যবাদ বিলকুল নয়া মাল। লোকহিত, পরোপকার, বিবেকানন্দী "দরিদ্র নারায়ণ"-পূজা, অচ্ছুতোদ্ধার, মুচি-মেথর-মুর্দা-ফরাসের সঙ্গে জল-বাতাসা-খাওয়া, বামুন-শূদ্দুরে অথবা হিন্দু-মুসলমানে বিয়ে দেওয়া ইত্যাদি কাণ্ড খাঁটি সাম্যবাদের অন্তর্গত নয়। এসব কাজ ও চিন্তা মামুলি সমাজ-বিপ্লবের এলাকায় পড়ে। মানব-নিষ্ঠ বিপ্লবী সাহিত্যে এই ধরণের সমাজ-সেবা, সমাজ-সংস্কার, সামাজিক পুনর্গঠন ঠাঁই পেয়ে থাকে।

লেখক—তা হ'লে সাম্যবাদের কাব্য কিরূপ?

সরকার—চাষীদেরকে জমিদারের বিরুদ্ধে লড়ায় যে-সাহিত্য সেই সাহিত্য সাম্যবাদী। জমিদারের ঠাঁইয়ে চাষীদেরকে বসায় যে-সাহিত্য সেই সাহিত্য সাম্যবাদী। জমিদার-হীনরূপে সমাজকে গ'ড়ে তুল্‌বার হদিশ দেয় যে-সাহিত্য সেই সাহিত্য সাম্যবাদী। আর এক দিক আছে। সে হচ্ছে মজুরের আর কেরাণীর দুনিয়া। ফ্যাক্টরি, কারখানা, ব্যাঙ্ক, বহির্বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ক কারবারের মহাজন-পুঁজিপতি-মালিকদের বিরুদ্ধে মজুর-কেরাণীদেরকে তাতিয়ে তোলে যে-সাহিত্য সেই সাহিত্য সাম্যবাদী। পুঁজিশাহীর ঠাঁইয়ে মজুরশাহী কায়েম করাতে উঠে-পড়ে লাগে যে-সাহিত্য সেই সাহিত্য সাম্যবাদী। পুঁজিপতি আর মহাজন-দেরকে ধ্বংস ক'রে সমাজের ভেতর একমাত্র মজুর-কেরাণীর আধিপত্য গড়্‌বার শল্লা দেয় যে-সাহিত্য সাম্যবাদী। এই ধরণের সাহিত্য নজরুল বা শরৎ পরিবেষণ ক'রেছেন কি?

লেখক—নজরুল-সাহিত্যকে আপনি সাম্যবাদী সাহিত্য বল্‌তে রাজি নন?

সরকার—না। পারিভাষিক মাফিক সাম্যবাদ নজরুলের আমদানি করা বা প্রচার করা চিজ নয়। "সর্বহারা" (১৯২৫) বইটায় "কৃষাণের "গান", "শ্রমিকের গান", "ধীবরের গান", "সাম্যবাদী", "সাম্য", "কুলিমজুর" ইত্যাদি কবিতা আছে। এই সবের সুর সোশ্যালিজম্‌-কমিউনিজম্‌ নয়। সর্বত্র পাই সুপরিচিত নজরুলি ভাষায় সার্বজনিক মানব-নিষ্ঠা।

লেখক—একটা দৃষ্টান্ত দিন।

সরকার—"মানুষ"-কবিতার বাণী শোন্ ঃ—

"গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।"

"রাজা প্রজা" কবিতায়ও সেই মুদ্দা ঃ—

"সাম্যের গান গাই—
যেখানে আসিয়া সমবেদনায় সকলে হয়েছি ভাই।"

"সর্বহারা"-বইয়ের অধিকাংশ কবিতায়ই এই ধরণের মানবিকতা স্পর্শ করতে পার্‌বি। অধিকাংশ কবিতায়ই ছেলে-ছোকরাদের জান্‌ ছ্যাঁক্‌ ক'রে উঠ্‌তে বাধ্য। বুড়োরাও এগুলার ঘায়ে চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বে। কবিতা-গুলা খুবই দামী। মানুষকে মানুষের মতন দেখ্‌তে শেখা যে-কোনো মানুষের পক্ষে জরুরি। এই হ'চ্ছে আসল আধ্যাত্মিকতা। নজরুলকে লোক-শিক্ষক হিসাবে আমি খুব উঁচু ঠাঁই দিয়ে থাকি। "সর্বহারা'-বইটা লোকজনের কলিজা বদ্‌লে দিয়েছে মনে হ'চ্ছে। "সর্বহারা"র নজরুলি বয়েৎ বা বুখ্‌নিগুলার ভেতর যেন এই অধমেরই প্রাণের কথা সরস কবিতায় বলা র'য়েছে। তবে এই সবের ভেতর সোশ্যালিজ্‌ম্‌-কমিউনিজ্‌ম নাই।

লেখক—বাঙলার "সাম্প্রতিক" কবিদের ভেতর অনেকে মজুর-ভাই, কিষাণ-ভাই ইত্যাদি সম্বন্ধে কবিতা লেখে। তারা সোশ্যালিস্ট কিম্বা কমিউনিস্ট কি?

সরকার—ঐ শব্দগুলার জোরে কোনো লেখককে সোশ্যালিস্ট বা কমিউনিস্ট বলা উচিত নয়। মজুর-কিষাণদের জীবন-যাত্রা সাহিত্যের বিষয়-বস্তু হ'চ্ছে এই পর্যন্ত বলা যেতে পারে। "মাটির পৃথিবী", "মাটির মানুষ", "মাটির মেয়ে", ইত্যাদি বোল রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাল-বেলায় আর দুপুরে এবং এবং সকালেও পাওয়া যায়। এই ধরণের বোলচাল সাম্প্রতিক গল্পে-কাব্যে বেড়েছে। তাতে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বা কমিউনিজ্‌ম্‌ প্রমাণিত হয় না।

লেখক—আপনার পারিভাষিক মাফিক সাম্যবাদী-সাহিত্য কোথাও আছে কি?

সবকার—আছে। ইয়োরামেরিকার প্রত্যেক দেশেই সাম্যবাদ আজকাল অল্পবিস্তর মজুর-শ্রেণীর স্বধর্ম বিশেষ। সাম্যবাদের আবার রকমফের আছে। এক রকম হচ্ছে মামুলি সোশ্যালিজ্‌ম্‌। আর এক রকম হ'লো কমিউনিজ্‌ম্‌।

সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বনাম কমিউনিজ্‌ম্‌

লেখক—সোশ্যালিজ্‌ম্‌ আর কমিউনিজ্‌মে তফাৎ কী?

সরকার—পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সোশ্যালিজ্‌ম্‌ মাত্রা হিসাবে দেখা যায়। কমিউনিজ্‌ম্‌ আছে মাত্র সোভিয়েট রুশিয়ায়। এই প্রভেদটা প্রথমে মনে রাখা ভাল। কিন্তু এতে ফারাকটা বুঝা যাবে না।

লেখক—বুঝা যাবে কী ক'রে?

সরকার—সোশ্যালিজ্‌মের ব্যবস্থায় লোকেরা ব্যক্তিগত ভাবে জমি-জমা, টাকা-কড়ি, বাড়ী ঘর ইত্যাদি সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারে। কমিউনিজ্‌মের ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ধনদৌলত, সম্পত্তি, পুঁজি ইত্যাদি থাক্‌তে পারে না। ব্যক্তিগত পুঁজি যে-সমাজে নাই, সেই সমাজকে কমিউনিস্ট বলতে হবে।

লেখক—কমিউনিস্ট-সমাজে ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি, বাড়ী-ঘর, পুঁজি-পাটা ইত্যাদির মালিক কে?

সরকার—রাষ্ট্র হ'চ্ছে সকল প্রকার ছোট-বড়-মাঝারি ধন-দৌলতের একমাত্র মালিক কমিউনিস্ট দেশে। এ-চিজ এমন কি ইয়োরামেরিকার নর-নারীই বুঝে না। ভারত-সন্তান বুঝ্‌বে কোত্থেকে? লেনিনের পাঁতিতে রুশরাষ্ট্রের একচাটিয়া অধিকার কায়েম হ'য়েছে ধন-দৌলতের ওপর। সেই ব্যক্তিগত-পুঁজিহীন রাষ্ট্রিক-পুঁজিশীল ধন-দৌলতের ব্যবস্থা আজও রুশিয়ার চল্‌ছে স্তালিনের যুগে।

লেখক—সোশ্যালিজ্‌মে আর আন্যান্য মামুলি ব্যবস্থায় প্রভেদ কী?

সরকার—সোশ্যালিস্ট সমাজে রাষ্ট্রব্যক্তিগত ধন-দৌলত, টাকা-কড়ি ইত্যাদি সম্পত্তির উপর কড়া হারে কর আদায় করে। গরীবরা কর দেয় না অথবা নেহাৎ অল্প-হারে কর দেয়। বড় লোকের ট্যাঁক থেকে মোটা হারে ট্যাক্‌স আদায় করা হয়। সেই টাকা খরচ করা হয় তামাম দেশের সার্বজনিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সম্পদ, সংস্কৃতি ইত্যাদির উন্নতির জন্য। ব্যাস্‌। এই জন্য সোশ্যালিস্ট্‌ দেশে আর অন্যান্য দেশে প্রভেদ সহজে মালুম হয় না। কেননা অন্যান্য দেশেও কর আদায় করা হ'য়ে থাকে। প্রভেদ এই যে সোশ্যালিজ্‌মের ব্যবস্থায় কর-আদায়ের বহর খুব লম্বা-চৌড়া। ধনীরা রাষ্ট্রের কর-দাবী যখন-তখন আর খুব বেশী-বেশী সইতে বাধ্য হয়।

লেখক—সোভিয়েট-রুশিয়ায় কবিরা স্বদেশের গান গায় না কি? তারা জননী জন্মভূমির কবি নয় কি?

সরকার—সোভিয়েট-রুশিয়ায়ও জাতীয় সঙ্গীত আছে। কমিউনিস্ট সমাজে স্বদেশ-প্রেমিক কবি আর গাল্পিক র'য়েছে। কিন্তু বিলাতী-মার্কিণ-ফরাসী-জার্মান-জাপানী স্বদেশী গান ও স্বদেশ-প্রেমিক সাহিত্য যে চিজ্‌ সোভিয়েট-রুশিয়ার স্বদেশী গান ও স্বদেশ-প্রেমিক সাহিত্য সে চিজ্‌ নয়। রুশিয়ায় ধনী, জমিদার, বেপারী, ব্যাঙ্কার, ফ্যাক্টরি-পতি ইত্যাদি শ্রেণী লোপাট হ'য়ে গেছে। এইরূপ বিশ্বাস করে রুশিয়ায় জনসাধারণ। রুশিয়ায় আজকাল জীবনধারণ করে মাত্র এক শ্রেণীর লোক। তারা সকলেই মজুর বা কেরাণী। রুশিয়া শ্রেণী-হীন দেশ। কাজেই রুশ-কবিদের স্বদেশ-প্রেম শ্রেণীহীন সমাজের গৌরব-প্রচার। অন্যান্য দেশের জাতীয়তা-পন্থী সাহিত্যে আর সোভিয়েট রুশিয়ার জাতীয়তা-পন্থী সাহিত্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। কাজেই "সর্ব-হারাদের গান"-লেখক ব'লে নজরুল বা আর কোনো বাঙালীর পক্ষে সাম্যবাদী কবির দলে ঠাঁই পাওয়া কঠিন। তবে "বিদেশী-বিদ্বেষ" হিসাবে সোভিয়েট জাতীয় সঙ্গীতে আর অন্যান্য জাতীয় সঙ্গীতে প্রভেদ থাকা অসম্ভব।

("কমিউনিজ্‌ম্‌ বনাম সোশ্যালিজ্‌ম্‌", মে ১৯৪৪)

"অগ্নিবীণা" ও "সর্বহারা" বাণী-প্রচারের কাব্য

লেখক—নজরুলকে আপনার কোনো কোনো বাণীর কাব্য-মূর্তি বল্‌ছেন কেন?

সরকার—এই অধমের হাতে আপনা-আপনি যদি ছন্দ বেরিয়ে আস্‌তো তা' হ'লে বাংলা-ইংরেজি অনেক লেখাই হয়ত নজরুলি আকারে দেখা দিতো। এ সব তো তোর জানাই আছে। "সরকারিজ্‌ম্‌"-বই (১৯৩৯) লিখ্‌তে গিয়ে এই ধরণের কত কথাই তো ঘেঁটেছিস্‌।

লেখক—তাই-তো। কিন্তু আপনার "ব্লিস্ অব এ মোমেন্ট" (বস্টন ১৯১৮) নামক ইংরেজি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে বছর পঁচিশেক আগে। ১৯১৪-১৮ সনে চীনে, জাপানে আর আমেরিকায় প্রবাসের সময় বাংলায় অনেক কবিতা লিখেছিলেন। তার কিছু-কিছু "নয়া বাঙলার গোড়া পত্তন" (১৯৩২) আর "বাড়্তির পথে বাঙালী" (১৯৩৪) বইয়ে দেখেছি। তা'ছাড়া কিছু দিন হ'লো "দিগ্-বিজয়ের বেদ-বাইবেল-কোরাণ" (১৯৪০) নামে কবিতার পুস্তিকাও বেরিয়েছে। এইগুলাকে আপনি কবিতা বল্ছেন না কেন?

সরকার—আমার বিচারে এ-সব কবিতা নয়। প্রথম কথা, ছন্দ এই অধমের দখলে নাই। প্রায় প্রত্যেক লাইনই ঘসে-মেজে পালিশ করানো দরকার হয়। যে-কয়টা কবিতা বাংলায় বেরিয়েছে, তার সব-কিছুরই ছন্দ মেরামত ক'রে দিয়েছে কেহ-না-কেহ। প্রত্যেকটার সঙ্গেই সংশোধকদের নাম জুড়ে দেওয়া আছে। হেমেন্দ্রবিজয় সেনকে দিয়ে মেরামত করিয়েছি অনেকগুলা। দ্বিতীয় কথা, শব্দগুলা আমার চোআড় ও কেঠো।

লেখক—কিন্তু চিন্তাগুলার তো মূল্য আছে?

সরকার—একমাত্র চিন্তা বা বাণীর জোরে কবিতা দাঁড়ায় না। যাই হ'ক কম-সে-কম শ-পাঁচেক রচনা এই হাত থেকে আপনা-আপনি গড়িয়ে এসেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের যুগে (১৯১৪-১৮)। এই সবের ভাবধারা ও মালগুলা ফেলে দিতে চাই না।

লেখক—কী কর্তে চান?

সরকার—দু-চার জনকে দিয়ে ছন্দ মেরামত করিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যা'ক, আসল কথা হ'চ্ছে যে, নজরুলের কবিতাবলীতে এই অধমের মোটা-মোটা কয়েকটা বক্তব্য খুব সরস আর জোরাল ভাবে প্রচারিত হ'য়েছে। "অগ্নিবীণা" আর "সর্বহারা" প্রধানতঃ এই দুইটা বইয়ের কথা বল্ছি।

লেখক—নজরুলের বেলায় আপনি বাণীগুলাকে কাব্য বল্ছেন কেন?

সরকার—পরিষ্কার ক'রে বলি। প্রথম কথা,—কাব্য-শিল্পে প্রচারকার্য শিল্পের জাত মেরে দেয়। প্রচারক কখনো উঁচুদরের কবি নয়। এই আমার চিরকেলে মত। দ্বিতীয় কথা,—উঁচু দরের কবিরাও লোক-শিক্ষক বটে। কিন্তু সেই লোক-শিক্ষা আসে পরোক্ষভাবে। গল্পের ভেতর দিয়ে বাণীটা পাকড়াও করা সম্ভব। চরিত্রের ভেতর দিয়ে উপদেশটা ধরা দিতে পারে। অথবা অজ্ঞাত-সারে ঘটনার ভেতর দিয়েও বক্তব্য প্রকাশিত হয়। সোজাসুজি মতের প্রচার কর্তে যাওয়া উচ্চশ্রেণীর কবি-গাল্পিক-নাট্যকারের লক্ষ্য হতে পারে না। এইবার বল্ছি তৃতীয় কথা। "অগ্নিবীণা" আর "সর্বহারা"য় গল্প নাই, চরিত্র নাই, ঘটনার আর অবস্থার সৃষ্টি নাই। আছে বাণী-প্রচার, বুখ্নি-প্রচার, মন্তব্য-প্রচার। নজরুল প্রচারক-কবি—জবরদস্ত ভাবে বাণী-প্রচারক, বিনা গোঁজামিলে লোক-শিক্ষক।

লেখক—বেশ তো। তা হ'লে এই দুই বইকে কাব্য বল্ছেন কেন?

সরকার—"উচ্চতম" শ্রেণীর কাব্য বল্ছি না। বক্তব্যগুলা পদ্যে লেখা হ'য়েছে বয়েৎ বা সুত্রের আকারে। ছন্দের জোর আছে, শব্দগুলা চোস্ত। জুৎ-সই উপমা আছে, কল্পনাও কিছু-কিছু আছে। এই জন্য চিন্তাটা পাঠকের চিত্তে ঘা মারে শক্ত ও সরসভাবে। বাঙালীর কাব্য-জগতে এই বাণীগুলা অমরতা লাভ কর্তে বাধ্য। বাঙ্লার ছেলেমেয়েদের মুখে

এসব বেঁচে থাক্‌বে। যে-সে কবিতা সম্বন্ধে এতবড় কথা বলা চলে না।

লেখক—বাণী-প্রচারের কাব্য আপনার পছন্দ-সই নয়?

সরকার—নিশ্চয়ই পছন্দ-সই। আসল-কথা, সব কাব্যই বাণী-প্রচারক। বাণীহীন কাব্য হ'তেই পারে না। প্রধানতঃ প্রচারের কায়দায় তফাৎ হয় কাব্যে-কাব্যে। সোজাসুজি প্রচারের কবিতাগুলাকে আমি গুরুমশায়ের বুখ্‌নি সম্‌ঝে থাকি। "উচ্চতম" শ্রেণীর কাব্যের অন্তর্গত করি না। কিন্তু জীবন গঠনের জন্য সে-সব ছাড়া আমার দিন চলে না।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাণী-প্রচারের কাব্য নাই কি?

সরকার—আলবৎ আছে। সেই সকল অংশ খেয়ে আমরা মানুষ হ'য়েছি। সেই সব আজও অনেক কাল ধ'রেই লোকজনের শক্তি-স্বাস্থ্য-সম্পদ্‌ বৃদ্ধির জন্য কাজে লাগ্‌বে। কিন্তু একমাত্র সেই-সব প্রচার-কাব্যের দৌলতে রবীন্দ্র-সাহিত্য উচ্চতম সাহিত্য নয়। যে-সকল কবিতায় রবীন্দ্র-বাণী ইস্কুল-মাষ্টারের বা স্বদেশ-সেবকের বা রাষ্ট্র-নায়কের রীতিতে জারি হয়নি আমি সেই সকল কবিতাকে উচ্চতম সাহিত্যের ইজ্জদ দিতে অভ্যস্ত।

লেখক—নজরুলের মতন সোজাসুজি বাণী-প্রচারক কবি বাঙ্‌লা দেশের আর কে-কে?

সরকার—রামা-শ্যামা-আবদুল-ইসমাইল হ'তে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকল কবিই অল্পবিস্তর সোজাসুজি অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে বাণী-প্রচারক বা লোক-শিক্ষক। তবে প্রত্যক্ষ বাণী-প্রচারকদের ভেতরও ছোট-বড় বা উনিশ-বিশ করা সম্ভব।

লেখক—করুন।

সরকার—স্বদেশী যুগের সত্যেন দত্ত প্রত্যক্ষ বাণী-প্রচারকদের মধ্যে জবরদস্ত (১৯০৫-১৪)। জাতীয়তার কবিতা তো আছেই। তা'ছাড়া আছে "সাম্য-সাম", "জাতির পাঁতি" ইত্যাদি মানব-নিষ্ঠার কাব্য। অসহযোগ-যুগের (১৯১৯-২৯) কবিদের ভেতর নজরুল হ'চ্ছে জবরদস্ত বাণী-প্রচারক। নজরুলকে সত্যেনের ছোট ভাই বলা আমার দস্তুর। বাস্তবিক পক্ষে মাল হিসাবেও,—একমাত্র কাল হিসাবেই নয়,—নজরুল সত্যেনের উত্তরাধিকারী ও পরবর্তী ধাপ। নজরুলের পরবর্তী ধাপ,—মাল হিসাবে আবার বল্‌ছি—সুরু হ'য়ে গেছে ১৯৩০ সনের কাছাকাছি।

লেখক—সত্যেনে আর নজরুলে কোনো প্রভেদ নাই কি?

সরকার—সত্যেনের চেয়ে নজরুল বেশী ঝাঁঝাল ও জোরাল। সত্যেনের বুখ্‌নিগুলা মনে হয় যেন মগজ বা মুড়ো থেকে বেরিয়েছে। আর নজরুলের বয়েৎগুলা বেরিয়েছে ঠিক যেন কলিজা বা হৃৎপিণ্ড থেকে। উচ্ছ্বাস, উন্মাদনা, দাপাদাপি, লাফালাফি হ'চ্ছে নজরুলের অতিমাত্রায় স্বাভাবিক কাণ্ড। ফরাসী সাহিত্যের পারিভাষিকে বল্‌বো যে, সত্যেন যেন ক্লাসিক আর নজরুল যেন রোমান্টিক। একজন যুক্তি-নিষ্ঠ, আরেক জন আবেগ-নিষ্ঠ।

লেখক—দৃষ্টান্ত?

সরকার—"মেথর", "শূদ্র", "জাতির পাঁতি", "সাম্য-সাম", "গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি" ইত্যাদি সত্যেন্দ্র-কাব্য লেখা হ'য়েছে মুড়োর ঘী দিয়ে। অপর দিকে শুধু মুড়ো দিয়ে নয়, হাত্‌-পা, হৃদয়, মুড়ো, মাংসপেশী, হাড়-মাস সব-কিছু দিয়ে লেখা হ'য়েছে নজরুলের "সর্বহারা" ও "অগ্নিবীণা" বই দুটার অধিকাংশ রচনা। মানুষটার ষোল আনাই এই সবের ভেতর মূর্তি পেয়েছে।

১৯৩১-৪০ সনের বাণী-প্রচারক কবি

লেখক—নজরুলের পরবর্তী ধাপে প্রত্যক্ষ বাণী-প্রচারকেদের ভেতর জবরদস্ত কবি কে বা কে-কে?

সরকার—১৯৩০-এর পরবর্তী কালে বঙ্গ-কাব্যে বহুত্বের যুগ চল্‌ছে। যুগটা গৌরবময়। নয়া-নয়া ছন্দের চমক দেখা যাচ্ছে। নয়া-নয়া শব্দের শক্তি পরিস্ফুট। নয়া-নয়া খেয়ালেব খিলানও মাথা তুল্‌ছে। মনে হচ্ছে যেন আবার একটা মধু, রঙ্গলাল, বিহারী, হেম, নবীন ইত্যাদি কবিদের যুগ দেখ্‌তে পাচ্ছি। বছর ত্রিশেকের পর অবস্থাটা বুঝা যাবে।

লেখক—সেকালের কোনো প্রভাব একালের ওপর নাই কি?

সরকার—"পুনশ্চ"র (১৯৩২) পরবর্তী রবীন্দ্র-সাহিত্য এই যুগের সজনী, প্রেমেন, বিবেকানন্দ, দিলীপ, জসীমউদ্দীন, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু ইত্যাদির কবি-মানসে আর কবিত্ব-শিল্পে অল্প-বিস্তর হদিশ জোগাতে পেরেছে। সেকেলে রবির প্রভাবও বেশ-কিছু আছে।

লেখক—এই যুগের বাণী-প্রচারক তা হ'লে কে?

সরকার—বোধ হয় বুদ্ধদেবকে ১৯৩১-৪০ দশকের যুগ-প্রতিনিধি বা যুগ-প্রবর্তক বল্‌বো। প্রেমেনকেও বাণী-প্রচারকদের ভেতর জবরদস্ত্ বলা যেতে পারে।

লেখক—এক কথায় এই যুগের কাব্য-লক্ষণ কী বাৎলাতে পারেন?

সরকার—বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ইয়োরামেরিকায় সুরু হ'য়েছে "এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট" শিল্প-ধারা ও সাহিত্য-ধারা। সেই "এক্‌স্‌প্রেশনিজ্‌ম্" বঙ্গ-সংস্কৃতিতে আমদানি হ'য়েছে ১৯৩০ সনের কাছাকাছি। প্রেমেন-বুদ্ধ ইত্যাদি কবিরা "এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট"-ধর্মী।

লেখক—এক্‌স্‌প্রেশনিজ্‌ম্ আবার কী?

সরকার—আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "প্রকাশের" দরদ বা "আত্মপ্রকাশের আগ্রহ"। স্ট্রাম্, ট্রাক্‌ল, ভের্ফেল, ড্যেবলিন, সোর্গে ইত্যাদি জার্মান কবিরা আত্মাকে নিয়ে কারবার করে। চিত্ত-নিষ্ঠা এই সকল প্রকাশ ধর্মীদের আসল লক্ষণ। সেকালের রোমান্টিকতা যেন একালে আত্ম-প্রকাশ-নিষ্ঠার মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। প্রকাশ-নিষ্ঠদের দরদ নিজ-নিজ খেয়াল নিয়ে। কোনো-কিছুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রচার চালানো তাদের ধান্ধা নয়। দুনিয়া যে-ভাবে চলছে চলুক। প্রকাশ-দরদী কবিরা নিজের চিত্তকে জাহির কর্‌বার জন্য ব্রতবদ্ধ। বুদ্ধ হ'তে বিষ্ণু পর্যন্ত ১৯৩১-৪০-এর বঙ্গ-কবিদের চিত্ত সেই প্রকাশ-নিষ্ঠায় ভরপুর।

লেখক—বুদ্ধদেবকে ১৯৩১-৪০ এর প্রতিনিধি ঠাওরাচ্ছেন কী ভেবে?

সরকার—প্রায় সমান-বয়েসী হচ্ছে দশ-বার জন। বুদ্ধ আর বিষ্ণু কিছু ছোট। সকলেরই কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রত্যেকেই লেখালেখির পরিমাণে আর বহরে উল্লেখযোগ্যও বটে। এদের ভেতর জসীমউদ্দীন কবিতায় গল্প সৃষ্টি কর্‌তে সুপটু। এই ক্ষমতা আর কাহারো নেই। বস্তুতঃ অরৈবিক বঙ্গ-সাহিত্যের স্বদেশী যুগ হ'তে আজ পর্যন্ত প্রায় কোনো কবিই (নাট্যকার বাদে) গল্প, চরিত্র ও অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষমতা দেখাতে পারে নি। যাক্ সে কথা। কিন্তু জসীমউদ্দীনের কাব্য অতিমাত্রায় পল্লীবদ্ধ। ইহার গণ্ডী সুবিস্তৃত নয়। এজন্য একে যুগ-প্রবর্তক বা যুগ-প্রতিনিধি বলা চলে না। জবরদস্ত্ বাণী-প্রচারকের দলে জসীমউদ্দীনকে ফেলা চলে না।

লেখক—সজনী দাসকে বাদ দিচ্ছেন কেন?

সরকার—সজনীর কাব্যশক্তি বেশী দেখা দিয়েছে হাসি-ঠাট্টার সৃষ্টিতে। একমাত্র বা প্রধানতঃ ব্যঙ্গ-কাব্যের জোরে কেউই যুগ-প্রবর্তক হ'তে পারে না। হাঁ-ধর্মী বাণী-প্রচারকের কাব্য এ নয়। অপর দিকে সুধীন দত্ত'র কাব্য গুরু-গম্ভীর। মোহিত মজুমদারের মতন সুধীনের শব্দ-সম্পদ্ আর ছন্দ-গৌরব উপভোগ্য। কিন্তু কবিতাগুলা সকলের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। অভিধানের সাহায্য লাগে। কাজেই সুধীন লোকপ্রিয় কবি নন। এই কাব্যের বাণী পাকড়াও করা কষ্ট-কল্পনার কাজ। মনে হচ্ছে যে, বছর দশ-পনর পর সুধীনের বাজার তৈরী হ'তে পারে। এই কাব্যে শাঁশাল মাল আছে বিস্তর। যা'হ'ক ১৯৩১-৪০ এর প্রতিনিধি সুধীনের পক্ষে হওয়া অসম্ভব। জবরদস্ত্ বাণী-প্রচারক তো নয়ই।

লেখক—বিষ্ণু দে সম্বন্ধে কী বল্‌ছেন?

সরকার—বিষ্ণুকেও অতি পাণ্ডিত্যের জন্য বেগ পেতে হবে। এর কবিতাগুলা সহজে বুঝা যায় কিনা সন্দেহ। বিষ্ণু-কাব্যের বাণী এখনো জ'মে উঠে নি। অধিকন্তু সুধীনের মতন ছন্দের জোর এর নাই। তবে মাল হিসাবে বিষ্ণু-কাব্য সম্বর্দ্ধনা-যোগ্য। ফরাসী সিম্বোলিস্ত্ কুবিস্ত্ বা "দাদা" পন্থীদের ধরণ-ধারণ খানিকটা নজরে পড়ে।

লেখক—দিলীপ আর বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কী বল্‌লেন?

সরকার—বিবেকানন্দ'র "শতাব্দীর সঙ্গীত" আর "বিপ্লবী নায়িকা" উঁচুদরের মাল পরিবেষণ ক'রেছে। ১৯৩১-৪০ দশকের শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভেতর পড়্‌বে এ সব। ভবিষ্যতে এই সবের কিম্মৎ আর বাড়্‌বে। কিন্তু কবিতা লেখা এ কবির পেশা নয় মনে হ'চ্ছে। বছর-বছর কাব্যের স্রোত বহাতে পারে নি। উচ্ছ্বাস আছে ; ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আছে। অপর দিকে দিলীপের কাব্য খানিকটা সুধীন ও বিষ্ণু দের রচনাবলীর মতন পাণ্ডিত্যপূর্ণ মাল। এ সবের বাণী সহজে ধরা পড়্‌বার নয়। দিলীপের আর বিবেকানন্দ'র কবিতা আইয়ুব ও হীরেন সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কাব্য" বইয়ে থাকা উচিত ছিল। বইটা কিছু অসম্পূর্ণ র'য়েছে।

লেখক—বাকি রইল বুঝি প্রেমেন?

সরকার—বুদ্ধদেবের মতন প্রেমেনেরও আবেগ আছে, উন্মাদনা আছে, প্রাণ ঢাল্‌বার ক্ষমতা আছে। দুজনেই ব্যক্তিত্বময়, আমিত্বের কবি। এই বিষয়ে সুধীন, বিষ্ণু ও দিলীপ বেশ-কিছু দরিদ্র। তাঁরা জ্ঞানযোগী, ভক্তিযোগের মাত্রা কম। প্রেমেন ও বুদ্ধদেব প্রধানতঃ ভক্তিযোগী, গীতি-ধর্মী, দিলদরিয়া কবি। নজরুলের ধাঁচ কিছু-কিছু প্রেমেন-বুদ্ধ'র আবহাওয়ায় মালুম হয়।

লেখক—তা'হলে প্রেমেনে আর বুদ্ধদেবে তফাৎ করছেন কী ক'রে?

সরকার—বুদ্ধদেবের কথাবস্তু রকমারি। প্রেমেনের কাব্য-দুনিয়ায় বৈচিত্র্য খানিকটা কম মনে হ'চ্ছে। কিন্তু পাঠকমাত্রেই দুজনকে মাল হিসাবে সহজে নজরুলের পরবর্তী ধাপ সমঝিতে সমর্থ। দুজনেরই বাণী হাঁ-ধর্মী, সুস্পষ্ট-বস্তুনিষ্ঠ। ১৯৪১-এর পরবর্তী যুগে নয়া কাব্যধারার স্রোত সুরু হ'য়েছে বলা চলে।

লেখক—বাণী-প্রচার তো আপনার বিচারে উচ্চতম কাব্যের লক্ষণ নয়। তাহ'লে ১৯৩১-৪০ সনের কবিদের ভেতর যারা বাণী-প্রচারক হিসাবে জবরদস্ত নয় তাদের কাব্য সম্বন্ধে ভবিষ্যতের সমালোচনা কিরূপ দাঁড়াবে মনে হচ্ছে?

সরকার—আগেই ব'লেছি সুধীন আর বিবেকানন্দ উৎরে যাবে। এই দুই কবির রচনার কতকগুলা বেশ-কিছু টেকসই, বাণী যাই হোক না কেন। সজনীর আর দিলীপেরও

কিছু-কিছু ভেসে উঠ্‌বে। জসীমউদ্দীনের "নক্‌সি কাঁথা" আর "সোজন বাদিয়া" ইত্যাদি রচনা দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। বিষ্ণুর নয়া-নয়া আঙ্গিকগুলা লোকজনের হজম হ'তে দেরি লাগ্‌বে। প্রেমেন ও বুদ্ধ আর পূর্ববর্তী নজরুল, এই তিনজনেরই দর কিছু-কিছু ক'মে আস্‌বে। তবে যুগ-প্রবর্তক, যুগ-প্রতিনিধি আর বাণী-মূর্তিরূপে এদের ইজ্জদ থেকে যাবে। এই হচ্ছে ১৯৩১-৪০-দশকের কাব্য সম্বন্ধে এই অধমের ভবিষ্য-বাণী।

লেখক—ভবিষ্যৎটা কতদিন পরের কথা?

সরকার—১৯৫৫-৬০ সনের কথা বলছি। এই কবিরা নিজ জীবনেই যাচাইয়ের আর দর-কষাকষির ওলট-পালট দেখতে পাবে। হয়ত বা আমিও দেখ্‌তে পাবো,—কে জানে?

লেখক—দুএকজন ইংরেজ একস্‌প্রেশনিস্ট কবির নাম করবেন?

সরকার—লরেন্স, এলিঅট, ব্লাণ্ডেন, স্পেণ্ডার, অডেন ইত্যাদি কবিকে প্রকাশ দর্দী বা আত্মপ্রকাশনিষ্ঠ লেখক বলা যেতে পারে। অন্যান্য পারিভাষিকের মতন "একস্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌"ও বেশ-কিছু ধোঁআটে ও অস্পষ্ট। কতকগুলা দাগী এক্‌স্‌প্রেশনিস্টের প্রদর্শনী সাজাতে গেলে ডিগ্‌বাজি খেতে হবে। সবই খানিকটা ঠোরে-ঠোরে বুঝা আবশ্যক।

লেখক—এক্‌স্‌প্রেশনিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে আপনার কোনো লেখা বেরিয়েছে?

সরকার—"বর্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর (১৯১৪-৩৫) 'ইয়াঙ্কিস্থান", "প্যাবিসে দশ মাস" আর "পরাজিত জার্মানি" খণ্ডে এই প্রকাশ-ধর্মের সুকুমার-শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা আছে। একালে 'টাগোর দি পোয়েট অ্যাজ পেইন্টার" প্রবন্ধে (ক্যালকাটা রিভিউ, জুলাই ১৯৪১) রাবীন্দ্রিক চিত্রশিল্পকে এক্‌স্‌প্রেশনিস্ট্‌ জাতের ভেতর ফেলেছি। রবির "চিত্রলিপি" (১৯৪০) বইয়ের আঠারোটা ছবি বিশ্লেষণ কর্‌তে গিয়ে এই কথা বল্‌তে হ'য়েছে।

উচ্চতম শ্রেণীর কাব্য কিরূপ?

৫ই জুলাই ১৯৪৩

সুবোধ ঘোষাল—সত্যেন আর নজরুল তা'হলে উচ্চতম শ্রেণীর কবি নন?

সরকার—না ; এই বিষয়ে আমার কোনো গোঁজামিল নাই। কবিতায় এঁরা চরিত্র খাড়া কর্‌তে পারেন নি, ঘটনা সৃষ্টি কর্‌তে পারেন নি, অবস্থা জমিয়ে তুল্‌তে পারেন নি। যতখানি পেরেছেন তাতে উচ্চতম শ্রেণীর কবি হওয়া সম্ভব নয়। (পৃঃ ৪২৭)

লেখক—আপনার বিবেচনায় বাঙ্‌লা সাহিত্যে উচ্চতম শ্রেণীর কবি কে কে?

সরকার—নাট্যকারদেরকেও কবিদের ভেতর ধর্‌বো?

লেখক—ধরুন না? আপত্তি নাই।

সরকার—উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যে উচ্চতম শ্রেণীর কাব্য-স্রষ্টা হচ্ছেন মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল (?), নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ। এঁরা সকলেই ব্যক্তি সৃষ্টি ক'রেছেন, ঘটনা সৃষ্টি করেছেন, আর অবস্থা সৃষ্টি ক'রেছেন।

লেখক—আপনি যে একদম নবরত্ন গ'ড়ে ছাড়্‌লেন? আরও কমিয়ে বলুন।

সরকার—কেন রে? ন'জনও তোর সয় না? কত আর কমাবো? আচ্ছা, তা হ'লে কায়েম কর্‌ছি আর এক রকমের হিসাব। মহাকাব্যে বল্‌বো মধু, নাট্যকাব্যে বল্‌বো গিরিশ, আর গীতিকাব্যে বল্‌বো রবি। মধু, গিরিশ আর রবি এই হ'লো আমার বঙ্গ-কাব্যের ত্রিবীর। এই তিনটেকে নিয়ে যে-কোনো বাঙালীর বাচ্চা দুনিয়ায় দিগ্‌বিজয়ে বেরুতে পারে। কোথাও মাথা হেঁট কর্‌তে হবে না।

লেখক—দৃষ্টান্ত দিয়ে উচ্চতম শ্রেণীর কাব্যে আর সত্যেন-নজরুলি কাব্যে প্রভেদটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?

সরকার—এই ধর্ রবীন্দ্র-সাহিত্যের "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"। এর ভেতর আছে ঃ—

"আমি ঢালিব করুণা-ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ-কারা"

ইত্যাদি ইত্যাদি। রবির এই "আমি হ্যান্ কর্‌বো, আমি ত্যান্ কর্‌বো"র জুড়িদার হচ্ছে নজরুলের "বিদ্রোহী"। ধরা যাক্ রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতর যা-কিছু বেরুলো তার সবটাই প্রায় এই ধরণের "হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা" ইত্যাদি। তা' হ'লে একমাত্র "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"শ্রেণীর কবিতার জোরে রবীন্দ্র-কাব্য উচ্চতম কাব্যে দাঁড়াবে না।

লেখক—রবীন্দ্র-কাব্যের ভেতর তা হ'লে আর কী আছে? যার জোরে এটা উচ্চতম শ্রেণীর অন্তর্গত?

সরকার—ব'লেছি চরিত্র-সৃষ্টি, গল্প-সৃষ্টি, অবস্থা-সৃষ্টি। "বধূ"-কবিতার "তাহারই কোলে গিয়ে মরণ ভালো" মনে আছে তো? সন্ন্যাসী উপগুপ্ত'র কবিতায় আছে, "আজি রজনীতে হয়েছে সময় এসেছি বাসব-দত্তা।" এটা ছেলেবেলায় মুখস্থ আওড়িয়েছিস বোধ হয়? এই সব হচ্ছে অতি উঁচুদরের অবস্থা-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত। এই ধরণের বহুসংখ্যক সৃষ্টি আছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের গীতি-কাব্যে। নাটক ইত্যাদির তো কথাই নাই। কিন্তু এই দরের (বা এমন কি এই ধরণেরই) অবস্থা-সৃষ্টি-সত্যেন-নজরুলের কাব্যে বড়-একটা দেখা যায় না। পাওয়া যায় অতি সামান্য। এইখানেই "বিদ্রোহী"-লেখকে আর "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-লেখকে জমিন-আশমান ফারাক হ'য়ে গেল। সত্যেনের "সাম্য-সাম" অথবা "জাতির পাঁতি" কিম্বা "চরকার গান" রাবীন্দ্রিক রসের মাল নয়। এ সব সোজাসুজি প্রচার-সাহিত্য।

লেখক—ব্যক্তি-সৃষ্টির দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধি-প্রবর্তিত সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সত্যেনের কবিতা বেরিয়ে-ছিল ১৯১২ সনে। তার এক চিত্র নিম্নরূপ ঃ—

"নেতা তাদের তরুর মত
স্তব্ধ দৃঢ় দুঃখজিৎ,
নিজের মাথায় বজ্র ধবেন
বিজয় তাদের সুনিশ্চিত্।"

কাব্যের ভিতর একটা ব্যক্তি তৈরি হ'য়েছে দেখা যাচ্ছে। নজরুলের হাতে এই ধরণেব কয়েকটা ব্যক্তি সৃষ্ট হ'য়েছে। কামালপাশা, জগলুল, আমানুল্লাহ ইত্যাদি বিষয়ক কবিতাগুলার কথা বল্‌ছি।

সত্যেন-নজরুলি চরিত্রের জুড়িদার রবীন্দ্র-সাহিত্যে আছে অনেক। সহজেই মনে পড়বে—

"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।"

লেখক—তা হ'লে চরিত্র-সৃষ্টি সম্বন্ধে রবীন্দ্র-সাহিত্যে আর সত্যেন-নজরুলি-সাহিত্যে তফাৎ কোথায়?

সরকার—তফাৎ খুব বেশী। সত্যেন আর নজরুল স্বদেশ-সেবক ছাড়া অন্য কোনো চরিত্র বেশী খাড়া কর্‌তে পারেন নি। রবীন্দ্র-সাহিত্যে স্বদেশ-সেবক তো আছেই। তা ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর চরিত্র আছে গুন্‌তিতে ডজন-ডজন। একমাত্র স্বদেশী জননায়কদের চরিত্র-স্রষ্টা হ'লে রবিকে উচ্চতম শ্রেণীর কবিরূপে পূজা কবা সম্ভব হ'তো না।

লেখক—স্বদেশ-সেবা-মূলক কবিতা লিখে উচ্চতম শ্রেণীর কবি হওয়া যায় না?

সরকার—স্বদেশ-সেবা, ধর্মপ্রচার, লোকহিত, সমাজ-সংস্কার, বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি বিষয়-বস্তু কাব্যের বর্জনীয় নয়। এই সব নিয়ে উচ্চতম কাব্য-সৃষ্টি করা সম্ভব। কিন্তু "সোজাসুজি" বিদ্রোহ-প্রচার অথবা স্বদেশ-সেবকের প্রশস্তি কিম্বা বিপ্লবের জয়গান চালিয়ে যাওয়া উচ্চতম কাব্যের লক্ষণ নয়। কোনো কবির পক্ষে দু-চারটা কবিতা এই ধরণের লেখা চল্‌তে পারে। কিন্তু এই সব ছাড়া—অন্যান্য দিকে নজর থাকা চাই। অধিকন্তু সকল বিষয়-বস্তুই ব্যক্তি, গল্প আর অবস্থার মারফৎ ফুটানো চাই। উপদেশ বা কর্তব্যগুলা প্রচারিত হওয়া চাই "পরোক্ষভাবে"।

লেখক—বিদেশী সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—জার্মান নাটক্যার শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) অনেকগুলা নাটক লিখেছেন। "মারিয় স্টুয়ার্ট," "ভিল্‌হেল্‌ম্ টেল" ইত্যাদি প্রত্যেকটার মুদ্দাই স্বদেশ-সেবা, বিপ্লব, বিদ্রোহ, লড়াই, স্বাধীনতা ইত্যাদি। এসবের চরিত্রও আছে, অবস্থাও আছে, গল্পও আছে। এই অধমের লিখিত 'সুইস স্বরাজের সূত্রপাত" কবিতাটা "ভিল্‌হেল্‌ম্ টেল" নাটকের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাক্ সে কথা। কিন্তু গ্যেটের তুলনায় শিলারকে আমি বলি খানিকটা ছোট দরের কবি। দ্বিজেন্দ্রলালকে আমি ব'লেছি বাঙালীর শিলার ঃ—

"বিংশ শতাব্দীর শিলার তুমি বাঙালী দ্বিজেন্দ্রলাল
যে আলোক দেখি না ধরার বুকে তার জ্যোৎস্নায় তুমি মাতাল।"

তাঁর নাট্য-কাব্যের প্রায় একমাত্র মুদ্দা স্বাধীনতা। এই হিসাবে রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাশে দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্য খানিকটা ছোটদরের চিজ।

লেখক—একটা ইংরেজি দৃষ্টান্ত দিন না?

সরকার—শেক্‌সপীয়ার স্বদেশ-সেবার নাটকও লিখেছে। কিন্তু একমাত্র এই সবের লেখক হ'লে শেক্‌স্‌পীয়ার মার্লোর সমান খানিকটা ছোট দরের নাট্যকার হ'য়ে পড়্‌তো। মার্লো সুধু হিমালয়ের সমান আকাঙক্ষাওয়ালা বাজখাই বোলচালশীল অসমসাহসিক চরিত্রের স্রষ্টা। তার ট্যাম্বার্লেন, ফস্টাস ইত্যাদি চরিত্র এই দরের চিজ

লেখক—বিলাতী গীতিকাব্য সম্বন্ধে কিছু বলুন।

সরকার—গীতিকারদের ভেতর কীট্‌সের নামডাক খুব বেশী। কিন্তু মনে কর্ কয়েকটা "ওড্"-জাতীয় উচ্ছ্বাস ছাড়া আর-কিছু এর হাতে বেরোয় নি। "নাইটিঙ্গেল", "গ্রীশ্যান আর্ণ" ইত্যাদি কবিতা উচ্চতম সন্দেহ নাই। কিন্তু একমাত্র এই সবের জোরে কীট্‌স্‌কে উচ্চতম শ্রেণীর কবির ইজ্জদ্ দেওয়া যেতে পারে না। শেলী, ব্রাউনিঙ্ ইত্যাদি কবিদের বেলায়ও সেই কথা খাটে। কতকগুলা প্রশস্তি, গৌরব-প্রচার, সম্বর্দ্ধনা, স্তব-স্তুতি ইত্যাদি সাহিত্য-মাত্রের স্রষ্টা এঁরা নন। কীট্‌স্, শেলী, ব্রাউনিঙ্ ইত্যাদি শ্রেণীর ও দরের কবি

রবীন্দ্রনাথ। সত্যেন আর নজরুল সেই শ্রেণীর ও সেই দরের কবি নন। সত্যেনের "কাব্য-সঞ্চয়ন" আর নজরুলের "সঞ্চিতা" ঘাঁটলে কথাটা সহজেই বুঝা যাবে।

লেখক—কীট্‌স্‌ ও ব্রাউনিঙের দু-একটা উচ্চতম শ্রেণীর কাব্যের নাম করবেন?

সরকার—কীট্‌সের "ঈভ্‌ অব সেইন্ট অ্যাগ্নেস্‌" কবিতাটা বহরে বেশ-কিছু বড়। এর ভেতর অনেক-কিছু সৃষ্টি করা হ'য়েছে। ব্রাউনিঙের 'মেন অ্যাণ্ড উইমেন" বইটা নিশ্চয় পড়েছিস্‌? এর ভেতরকার কবিতাগুলা অতি চমৎকার ব্যক্তি-সৃষ্টির আর অবস্থা-সৃষ্টির নিদর্শন। আগে এই সব পড়লে তবে উচ্চতম কাব্যের সোআদ পাবে লোকেরা। তাতে মুখ তৈয়ের হবে। সেই মুখেই চাখা দরকার সত্যেন-নজরুলকে।

ভালোবাসার বঙ্গ-সাহিত্য

১৮ই জুলাই ১৯৪৩

সুবোধ ঘোষাল—নজরুল-কাব্যের প্রথম মুদ্দা ব'লেছেন বিপ্লব, আর দ্বিতীয় মুদ্দা ভালোবাসা। এইবার তাহ'লে বলুন ভালোবাসার সাহিত্যে নজরুলের ঠাঁই কিরূপ?

সরকার—"বুলবুল", "ছায়ানট" আর "দোলন-চাঁপা" এই বই তিনটার অনেক-কিছুই ভালোবাসাবাসির খেলা। নজরুল ভালোবাসার সাহিত্যে বাঙালী কবিদের ভেতর খুবই উঁচু। এই কবি খোলাখুলি ভালোবাসার গান লিখে আর গেয়ে যেতে পারে। এই কথাটা বঙ্গসাহিত্যে যারপর নাই মূল্যবান।

লেখক—কেন? ভালোবাসাবাসির সাহিত্য কি বাংলায় নাই?

সরকার—আছে। বিহারীলাল, গোবিন্দদাস ইত্যাদির কথা ভুললে চলবে না। তবে বাঙালীর মেজাজে ভালোবাসাবাসি হচ্ছে লুকোনো-চুরোনো কাণ্ড। ও সম্বন্ধে লেখালেখি ও ছাপাছুপি বড়-একটা বরদাস্ত হয় না আমাদের। ঢাক্‌-ঢাক্‌ গুড়-গুড় চালানো কবিদেরও দস্তুর। সমালোচকেরা "স পাপিষ্ঠ স্ততোঽধিকঃ।"

লেখক—ঠিক বুঝতে পারছি কিনা সন্দেহ?

সরকার—ভালোবাসাটা যে শারীরিক চিজ একথা কবিতায়, নাটকে, নভেলে লিখতে বাঙালীর হাত কাঁপে—মুখ শুকিয়ে আসে। বুক ফেটে যায়। যদি বা দুএকজন লিখলো,—তার সমালোচকেরা এই মামুলি রক্তমাংসের স্বধর্মটাকে নিঙড়ে-শুকিয়ে একটা তথাকথিত "আধ্যাত্মিক" তত্ত্বের-কেঠো তক্তায় নিয়ে ঠেকাবেই ঠেকাবে।

লেখক—দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাবেন?

সরকার—রবীন্দ্র-কাব্যের ভালোবাসাকেও আগে "প্রেমে" পরিণত করানো হ'চ্ছে সমালোচকদের রেওয়াজ। তারপর সেই প্রেমকে দার্শনিক ভাটিতে পুড়িয়ে একদম ভিটামিনশূন্য, ক্যালরি-হীন ভগবদভক্তিরূপে খাড়া করানো হ'চ্ছে। ষাট্‌-সত্তর বছরের রবীন্দ্র-সাহিত্যে বড়-জোর এক আধ ছটাক পুরুষ-নারীর যোগাযোগ এই সমজদারেরা দেখতে পান। সেটুকু সহ্য করতেই আমাদের অতি-আধুনিক সমালোচকেরাও গলদ্‌-ঘর্ম। তার বেশী রবীন্দ্র-সাহিত্যে বরদাস্ত করতে আজও আমাদের লোকেরা নারাজ। নীহার রায় "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা"য় (১৯৪১, পৃষ্ঠা ৮৪) "কড়ি ও কোমল" বইয়ের কতকগুলা কবিতা সম্বন্ধে ব'লেছেন—"সর্বত্রই একটা ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া প্রকাশ

পাইয়াছে। কিন্তু যৌনাকর্ষণ হইতে ভাবগত আকর্ষণই প্রবল!" "বিবসনা", "স্তন", "দেহের মিলন" ইত্যাদি শরীরনিষ্ঠ কবিতা সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যাখ্যা চল্‌ছে।

লেখক—রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভালোবাসাবাসি সম্বন্ধে ঢাক্‌-ঢাক্‌ গুড়-গুড় কোথায় দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরকার—এই তো বল্‌লাম—সমজদারদের ব্যাখ্যা-সমালোচনার ভেতর। তা ছাড়া আর একটা মজা দেখ্‌ছি। রবীন্দ্র-কাব্যের গোড়ার দিকে ভালোবাসাবাসির রক্তমাংস বেশ গুলজার ছিল। সে হ'চ্ছে একুশ বছর বয়সের পূর্ববর্তী রচনা। কিন্তু আজকাল কারু-কারু মতিগতি রাবীন্দ্রিক "সন্ধ্যা সঙ্গীত" (১৮৮২) বইয়ের পূর্ববর্তী রচনাগুলাকে কাঁচা হাতের লেখা ব'লে চেপে রাখ্‌বার দিকে। সে-সবের ভিটামিন আর ক্যালরি এঁদের সয় না মনে হচ্ছে।

লেখক—কোন্‌ কোন্‌ রচনার নাম কর্‌ছেন?

সরকার—নেহাৎ কচি বয়সের লেখাগুলার কথা বল্‌ছি। তের বছর বয়সের "ফুলবালা" (১৮৭৫), চৌদ্দ বছর বয়সের "বনফুল" (১৮৭৬), যোল বছর বয়সের "কবি-কাহিনী" (১৮৭৮) ইত্যাদি। প্রভাত মুখোপাধ্যায়-প্রণীত "রবীন্দ্র-জীবনী" প্রথম খণ্ডে (১৯৩৩, পৃঃ ৪২-১০৩) কিছু-কিছু নমুনা পাওয়া যায়। পড়্‌বার জিনিষ। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চাশোর্দ্ধে পৌঁছে "ফুলবালা" হ'তে "ভগ্ন-হৃদয়" (১৮৮১) ও "শৈশব-সঙ্গীত" পর্যন্ত সব কিছু ছেঁটে ফেল্‌বার ফার্মাণ জারি ক'রেছিলেন। সমালোচকেরা আদর্শ গুরুভক্ত। তাঁদের কেহ-কেহ গুরুদেবের হুকুম মাফিক সেই সব রচনা বর্জনীয়ই সম্‌ঝে চ'লেছেন। প্রমথ বিশী আর নীহার রায় দু'জনেই এ বিষয় ঠিক যেন গুরুভাই। বোধ হয় বছর দশ-বিশের ভেতর নয়া-নয়া সমজদারেরা স্বাধীন চোখে রবীন্দ্র-সাহিত্যের কৈশোর ও যৌবন বিশ্লেষণ করতে সাহসী হ'তে পার্‌বে। ততদিনে "মনোবিকলন"-বিদ্যাটা আমাদের শিল্প-সমজদার-মহলে বেশ-কিছু বপ্ত হ'য়ে আস্‌বে। মাঝে-মাঝে এক-আধ পশলা ফ্রয়েড্‌-দর্শন ছড়িয়ে দেওয়া ভাল। মাথা পরিষ্কার হয়। তবে ফ্রয়েডামির ভোজটা নরম থাকা চাই!

লেখক—নজরুল সম্বন্ধে কী বল্‌ছেন?

সরকার—বাঙালী জাতের আবহাওয়ায় নজরুলের পক্ষে ভালোবাসার কবি হওয়া খুবই বাহাদুরির কাজ। অতিমাত্রায় বেহায়া আর ঠোঁট-কাটা না হ'লে নজরুলের পক্ষে অনেক কবিতাই প্রকাশ করা সম্ভব হ'তো না। এই হিসাবে নজরুল বিপ্লবী। নজরুলকে দেখে হয়ত অনেক বাঙালীর ভয় ভেঙেছে বা ভাঙ্‌ছে। নজরুলের প্রেম-সাহিত্যকে বঙ্গ-কাব্যে মানবিকতা বা মানব-নিষ্ঠার পথ প্রদর্শক বল্‌তে পারি। আজকাল নির্লজ্জভাবে ভালোবাসার কবিতা লিখ্‌তে কারু-কারু সাহস দেখা যাচ্ছে।

প্রেম-সাহিত্যে "ছায়ানট" ও "পূবের হাওয়া"

লেখক—নজরুলের প্রেম-কাব্যের কোনো বিশেষত্ব আছে?

সরকার—নজরুল অন্যান্য রচনার মতন প্রেমের কবিতায়ও সোজাসুজি বস্তু-নিষ্ঠ। মার্কিন হুইট্‌ম্যানের আবহাওয়া আবার দেখ্‌তে পাচ্ছি। বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

"বিপ্লবী নায়িকা" ও "শতাব্দীর সঙ্গীত" বইয়ের ভালোবাসাবাসি এই আবহাওয়ারই চিজ্। হুইট্‌ম্যান-নজরুল-বিবেকানন্দ'র প্রেম-কবিতার লক্ষণ হ'চ্ছে আন্তরিকতা। হৃদয়-শীল সত্যানিষ্ঠা এই সকল রচনার প্রাণ। রূপ-রস-গন্ধ-স্বর্শ-শব্দ এই সবের কোনো-কিছু বাদ পড়ে না। এরা রূপক টুঁড়ে হয়রাণ হয় না। সোজা কথার শিল্পী এরা। অপর দিকে নোংরামি নজরুল আর বিবেকানন্দ'র কাব্য-লক্ষণ নয়।

লেখক—নজরুল-কাব্য থেকে নোংরামিহীন আন্তরিকতার নমুনা দেবেন?

সবকার—"প্রতিবেশিনী" আছে "ছায়ানট" বইয়ে। একটা শ্লোক পড়ছি ঃ—

"আমার দ্বারের কাছটিতে তার
ফুট্‌তো লালী গালের টোলে.
টল্‌তো চরণ, চাউনি বিবশ
কাঁপ্‌তো নয়ন পাতার কোলে।"

লেখক—আর এক-আধটা নমুনা চাই।

সরকার—"ছায়ানট" থেকে আর একটা শোনাচ্ছি। "পূবের হাওয়া" কবিতাটা পড়ছি শোন্—

"আমি ঝড় পশ্চিমের প্রলয় পথিক
মাতিয়া ছুটিতেছিনু, চলার দাপটে
ব্রহ্মাণ্ড ভণ্ডুল করি।

* * *

আঁখি মোর ঢুলে আসে শেষ হ'লো চলা

* * * *

কাজল সুস্নিগ্ধ করি অঙ্গুলি পবশ
বুলায় নয়নে মোর দুলায়ে অবশ
ভার-শ্লথ তনু মোর ডাকে "জাগো পিয়া"।
এতক্ষণে আপনাব পানে নিরখিয়া
হেরিলাম আমি ঝড় অনন্ত সুন্দর
পুরুষ কেশরী বীর। * * *
* * মুক্ত ঝোড়ো কেশে
বিশ্বলক্ষ্মী মালা তাঁর বেঁধে দেন হেসে।
একথা হয় নি মনে আগে—আমি বীর
পরুষ পুরুষসিংহ, জয়লক্ষ্মী-শ্রীর
স্নেহের দুলাল আমি, আমারেও নারী
ভালোবাসে, ভালোবাসে রক্ততরবারী
ফুলমালা চেয়ে ; চাহে তারা নর
অটল পৌরুষ বীর্যবন্ত শক্তিধর।

জানিস সেদিন আমি এ সত্য মহান্,—
হাঁসিল যেদিন মোর মুখে ভগবান
মদনমোহনরূপে! সেই দিন প্রথম
হেরিনু সুন্দর আমি সৃষ্টি অনুপম।"

এই হ'চ্ছে পূবের হাওয়ার উক্তি।

লেখক—কী পাচ্ছেন এই উক্তিতে?

সরকার—বেশ উঁচুদরের ব্যক্তি ও অবস্থা সৃষ্ট হ'য়েছে এখানে। শরীরনিষ্ঠ ভালোবাসা আছে। অথচ অশারীরিক রস খুব জোরাল। আর একটা কথা জেনে রাখা ভাল। "পূবের হাওয়া" (১৯২৪) নামে একটা বইও আছে। সেটা "কোমল" জাতীয় বই। এর "বেদন হারা", "স্নেহ-পরশ", "রেশমী ডোর" ইত্যাদি কবিতায় নজরুলি প্রেমের টুক্‌রো-টাক্‌রা পাওয়া যায়। (পৃঃ ৪২১)।

লেখক—"ছায়ানট" বইয়ের 'পূবের হাওয়া"র উক্তিতে আপনি কী দেখ্‌তে পাচ্ছেন।

সরকার—এই কল্পনাটার কিম্মৎ লাখ টাকা। রবীন্দ্র-সাহিত্যেই আমি এই ধরণের দৃশ্য আশা ক'রে থাকি। রাবীন্দ্রিক "চিত্রাঙ্গদা" নাটকের (১৮৯২) আবহাওয়ায় জীবনেব যে পুনর্গঠিন দেখা যা সেই জীবন পুনর্গঠনের ছবিই স্বাধীনভাবে নজরুলের এই কল্পনায় বেরিয়েছে। রক্তমাংসের স্বধর্ম, যৌবনের স্বধর্ম, পুরুষনারীর স্বধর্ম এমন জোরের সহিত, এমন সত্যভাবে, এমন পবিত্ররূপে দেখাতে পারা যে-সে কবির পক্ষে সম্ভব নয়। এখানে শরীর তো আছেই, কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আত্মা। শরীরের স্বরাজ আর আত্মার স্বরাজ দুইই একত্রে ঠাঁই পেয়েছে নবজীবনের বিকাশকাণ্ডে।

লেখক—আর একটুকু পরিষ্কার ক'রে বল্‌লেন?

সরকার—"পূবের হাওয়া"র কল্পনায়, শরীরটা আত্মার মায়া মাত্র নয়। দুইই স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল লাল টক্‌টকে বস্তু। এখানে পাচ্ছি নজরুলের সংযমপূর্ণ শরীর-নিষ্ঠা। একটা বিলাতী নজির দিতে পারি।

লেখক—কোন্ নজির?

সরকার—মনে পড়্‌ছে উনবিংশ শতাব্দীর দান্তে গাব্রিয়েল রসেটিকে। তাঁর "হাউস অব লাইফ্" (জীবনের ঘর) নামক সনেট-সমষ্টিতে ভালোবাসার সংযত শরীরনিষ্ঠা দেখ্‌তে পাই। অবশ্য তার ভেতর খানিকটা হেঁয়ালি আছে। যা হক, বইটা বেরিয়েছিল ১৮৮১ সনে। রসেটি "ব্লেসেড ড্যামোজেল" (স্বর্গের বালা) কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ। এই কবিতার কিছুটার বাংলা তর্জমা বোধ হয় চীন-প্রবাসের সময় প্রকাশ ক'র্‌ছিলাম। ঠিক মনে পড়্‌ছে না।

লেখক—শরীর ও আত্মার যোগাযোগ রাখা কঠিন কি?

সরকার—শরীরনিষ্ঠ ভালোবাসার কবিতায় ছ্যাব্‌লামি ক'রে বসা খুবই স্বাভাবিক,—বিশেষতঃ গজল-গাইয়ের পক্ষে। এই অবস্থায় রাশ টেনে রাখ্‌তে পেরে নজরুল চরম শিল্প-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর "দোলন-চাঁপা" বইয়েরও অনেক কবিতাই এই সংযমশীল শরীর-নিষ্ঠায় ভরপুর। ভালোবাসার সাহিত্যে নজরুলের কবিতা ও গান বহুকাল সমাদৃত হবে। বঙ্গ-কাব্য ধন্য হ'য়েছে নজরুলের দৌলতে। মধ্য-যুগের বৈষ্ণব-সাহিত্যে যারা মশ্‌গুল তারাও নজরুল-প্রেমে মতোআরা হ'তে শিখ্‌বে। রাবীন্দ্রিক প্রেম-

সাহিত্য তাদের হজম হ'য়েছে ইতিমধ্যে।

লেখক—বৈষ্ণব-কাব্যের ভেতর শরীর আর আত্মার যোগাযোগ কেমন মনে করেন?

সরকার—বৈষ্ণব-কবিদের কোনো-কোনো কবিতা জবরদস্ত শরীর-নিষ্ঠ। এত যে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায় না। ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে এক মজলিশে ব'সে অনেক বৈষ্ণব কবিতা চেঁচিয়ে প'ড়ে যাওয়া অসম্ভব। "ল্যভ ইন হিন্দু লিটারেচার" (তোকিও ১৯১৬) বইয়ের এক জায়গায় ব'লেছি যে, বিদ্যাপতির কোনো-কোনো কবিতা ঠিক যেন কামশাস্ত্রের রসদ বা মশলা জোগাবার জন্য লেখা হ'য়েছিল। শারীরিক সংযমের অভাব খুব বেশী।

লেখক—বৈষ্ণব সাহিত্যের সকল পদ্যগুলাই কি এইরূপ?

সরকার—না। তার ভেতর এমন এমন পদও আছে যাতে শরীরের গন্ধ মাত্র নাই। তার আবহাওয়ায় সবই আত্মা। এও আর এক রকমের অসংযম। নজরুলের "বুলবুল", 'ছায়ানট', "দোলন চাঁপা" আর "পূবের হাওয়া"য় এই দুই অসংযমের দৌরাত্ম্য নাই বল্‌লেই চলে। আছে শরীরে আত্মায় হামদর্দি আর কোলাকুলি।

"দোলন-চাঁপা"য় নজরুলি প্রেম

লেখক—"দোলন-চাঁপা"র দু একটি কবিতার নাম করুন।

সরকার—এই বইয়ের "বেলা শেষে" কবিতায় একটা শ্লোক নিম্নরূপ :—

"ক্রমে নিশীথিনী আসে ছড়াইয়া ধূলায় মলিন এলো চুল,
সন্ধ্যা তারা নিবে যায়, হারা হয় দিবসের কুল।
তারি মাঝে কেন যেন অকারণে হায়,
আমার দু চোখ পূরে বেদনার ম্লানিমা ঘনায়।
বুকে বাজে হাহাকার করতালি,
কে বিরহী কেঁদে যায় "খালি সব খালি।
ঐ নভ, এই ধরা, এই সন্ধ্যালোক,
নিখিলের করুণা যা কিছু, তোর তরে তাহাদের অশ্রুহীন চোখ।"

লেখক—এই কয় লাইনের মতলব কী?

সরকার—বুঝ্‌তে পার্‌ছিস্ না? নজরুল "হাহাকারের"ও কবি। "বিদ্রোহী"র চরম দাম্ভিক, ব্যক্তিত্বশীল দিগ্‌বিজয়ী কবি "করুণা"র ভিখারী। একেই বলে ফ্রয়েড্-পণ্ডিতের "কম্পেন্‌সেশ্যন" (ক্ষতিপূরণ)।

লেখক—সে আবার কী?

সরকার—অস্ট্রিয়ার চিকিৎসাশাস্ত্রী ও চিত্তশাস্ত্রী, ফ্রয়েড্‌কে লোকেরা যোনীশাস্ত্রী ব'লে জানে। তাঁর বিবেচনায় দুনিয়ার নরনারী, সংসারের জীব মাত্রেই গোঁজামিলে পরিপূর্ণ জানোআর। "মুখে বলো ভালবাসি, অন্তরে গরল মাখা"—ঠিক যেন সেই অবস্থা। ভালোবাসার ক্ষতিপূরণ হ'চ্ছে গরল। অর্থাৎ রক্তমাংসের মানুষে ভালবাসাও আছে আবার গরলও আছে। অনেক লোক চব্বিশ ঘণ্টা দয়া-দাক্ষিণ্য, মৈত্রী, অহিংসা, ভ্রাতৃত্ব, বিশ্বপ্রেম ব'কে বেড়ায়। ব্যক্তিগত জীবনে ভেতরে-ভেতরে হয়ত সে হিংসার অবতার,

অতিমাত্রায় নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, আর পরশ্রীকাতর। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিষ্ঠুরতা, হিংসুটে চরিত্র, স্বার্থপরতা হ'চ্ছে তার সাহিত্যিক বোলচাল বা দার্শনিক অহিংসার "ক্ষতিপূরণ"।

লেখক—নজরুলের বেলায় কথাটা খাট্‌ছে কী ক'রে?

সরকার—অতি সোজাভাবে। কবি লড়াই, বিদ্রোহ বা বিপ্লব বক্‌ছে মগজের বা হৃদয়ের এক কোণ থেকে—আর এক কোণ থেকে তার বেরোচ্ছে দীর্ঘশ্বাস, হা-হুতাশ, ব্যাথা, বেদনা। নজরুলের প্রেম-কবিতাগুলো "গাঢ় বেদনা"র প্রতিমূর্তি। "বেদনার ম্লানিমা"য় নজরুলচিত্ত অতি মধুর। নেহাৎ শান্তশিষ্ট মেষ-শিশুর মতন এই দুর্দান্ত বাঘা কবি কেঁদে-কেঁদে জীবন কাটাচ্ছে। বুঝ্‌লি "প্রকৃতির প্রতিশোধ" কাকে বলে?

লেখক—আশ্চর্যের কথা নয় কি?

সরকার—না। এইরূপই অনেক ক্ষেত্রে—বোধ হয় প্রায় সকল ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। এইখানে কিছু-কিছু মনে পড়্‌ছে রাবীন্দ্রিক "পলাতকা"র (১৯১৮) "মুক্তি" কবিতা।

লেখক—কী আছে তাতে?

সরকার—এই শোন ঃ—

"দ্বারে আমার প্রার্থী সে যে, নয় যে কেবল প্রভু,
হেলা আমায় করবে না সে কভু—
চায় আমার কাছে
আমার মাঝে গভীর গোপন যে সুধারস আছে।"

'প্রভু'র পক্ষে 'প্রার্থী' হওয়াটা ফ্রয়েড্‌-পন্থী ক্ষতিপূরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

লেখক—এই ধরণের "ক্ষতিপূরণ" নজরুলের প্রেম-কাব্যে আরও আছে?

সরকার—শোন্‌, "উপেক্ষিত" থেকে পড়্‌ছি'—

"কান্না-হাঁসির খেলার মোহে অনেক আমার কাট্‌লো বেলা।
আজ্‌কে বড় শ্রান্ত আমি আশার আশায় মিথ্যা ঘুরে।" ইত্যাদি।

এই হ'লো অভিজ্ঞতা। "কান্না"হীন নয় "বিদ্রোহী"-জীবন। শেষ পর্যন্ত "বড় শ্রান্ত"। অন্যান্য অভিজ্ঞতা কিরূপ? কবি কারু হৃদয় 'জিন্‌তে'(দখল কর্‌তে) গিয়েছিল বলে (গায়ের জোরে বা তুক্‌মুকের জোরে বোধ হয়?)। কী ঘট্‌লো?

"খেয়ে এনু পায়ের ঠেলা—
আর সহে না মাগো এখন আমায় নিয়ে হেলা ফেলা।"

লেখক—এ ঘটনার মানে কী?

সরকার—"বিদ্রোহী" স্বীকার করতে বাধ্য হ'চ্ছে—

"চাই যারে মা তায় দেখিনে
ফিরে এনু তাই একেলা
পরাজয়ের লজ্জা নিয়ে বক্ষে বিঁধে অবহেলা।"

মোটের উপর অবস্থা দাঁড়াচ্ছে কেমন?

"বিশ্ব-জয়ের গর্ব আমায় জয় ক'রেছে ঐ পরাজয়,
ছিন্ন আশা নেতিয়ে পড়ে ওমা এসে দাও বরাভয়।"

বিশ্বজয়ী শেষ পর্যন্ত "মা", "মা" ক'রে অস্থির। বিচিত্র অবস্থা।

লেখক—এই কবিতার ভেতর আপনি নতুনত্ব কী দেখ্‌ছেন?

সরকার—যে-লোকটা বাইরে দুনিয়া জুতিয়ে বেড়াচ্ছে সেই লোকটাই ঘরে খাচ্ছে

জুতো। এরই নাম ভালোবাসা। দুই ক্ষেত্রেই জুতোনোটা বুঝ্‌তে হবে অবশ্য আলঙ্কারিক ভাবে। হৃদয়ের জগতে নাই হাম্‌-বড়ামি। চাই এখানে নম্রতা, আমিত্বের ধ্বংস-সাধন, ব্যক্তিত্ব-লোপ। নিজের অস্তিত্ব বজায় বেখে সংসারের কোনো লোক ভালোবাসে নি। নজরুলের বস্তুনিষ্ঠা চিত্ত-দুনিয়াব গভীরতম বস্তুগুলাও পাক্‌ড়াও করতে পেরেছে। গজল-কবির কাছে হয়ত অনেকে এতখানি গভীরতা আশা করে না। আমার বিশ্বাস, —"উপেক্ষিত"র মতন কবিতা নজরুলকে একদিন না একদিন বাঙালীর সাহিত্য-সংসারে অতি গৌরবজনক ঠাঁই দেবে। বর্তমানে নজ্‌রুলের দর কী আমার জানা নাই। বেশী লোক পুছে কিনা বলা কঠিন।

নজরুল-কাব্যে করুণরসের দরিয়া

লেখক—আপনি নজরুল-কাব্যে কান্নাকাটির মাত্রা খুব অতিরঞ্জিত কর্‌ছেন না তো?

সরকার—একদম না। নজরুলের ভালোবাসা হ'চ্ছে হা-হুতাশের কারবার। এই কবিকে সকলেই আগুন-গিরি সম্‌ঝে রাখ্‌বে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই কবি অপর দিকে পূরাপূরি রোদনের দরিয়া। এই দরিয়াটা অদৃশ্য ফল্গু মাত্র নয়। নজরুলি রোদন অতি সরব, অতি খোলাখুলি। নজরুল করুণ-রসের সাগর।

লেখক—আপনি হেঁয়ালি চালাচ্ছেন নাকি?

সরকার—খাঁটি সত্যি কথা বল্‌ছি। নজরুলি ভালোবাসার কবিতাগুলা পড়্‌লে মনে হবে যেন, কোনো নারী এই কবিকে চরমভাবে শাপ দিয়েছে। আর সেই শাপ ফ'লেও গেছে। ছেলেবেলায় মালদহে রামের কান্নাকাটি দেখেছি যাত্রার পালায়। মনে পড়্‌ছে গানটা—

"যে অনলে প্রভু দহিছে হৃদয়,
সে অনলে তুম দহিবে নিশ্চয়,
জানকী পাইবে পুনঃ হারাইবে
কেঁদে কেঁদে হবে দিবা অবসান।"

লেখক—আপনি নজরুলেব প্রেম-সাহিত্যে এই গভীর বেদনা অনুভব কর্‌ছেন?

সরকার—নজরুল-কাব্যের ভালোবাসা "কেঁদে-কেঁদে হবে দিবা অবসান" ছাড়া আর কিছু নয়। এই আবহাওয়ায় সর্বদা আমি আমাদের যাত্রার করুণ-রস পেয়েছি। বাংলা যাত্রার রামচন্দ্র কাঁদ্‌ছে আর বল্‌ছে—

"হে বনজ তরুলতা, হে বিহঙ্গকুল,
আমি রাম সীতা-শোকে হ'য়েছি আকুল।"

ইত্যাদি—ইত্যাদি।

বিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বাচ্চা ভারতে আর ভারতের বাইরে নানা অভিজ্ঞতার অধিকারী হ'য়েছে। সেই সকল অভিজ্ঞতার সঙ্গে বঙ্গীয় পাঁচালী-যাত্রার পত্নী-পরায়ণ রামচন্দ্রের অভিজ্ঞতার কোনো মিল নাই।

লেখক—তাহ'লে মিল পাচ্ছেন কোথায়?

সরকার—দুঃখে। দুঃখ বস্তুটা এক। সে-দুঃখ যদি আন্তরিক হয়। নারী কর্তৃক অভিশপ্ত

পুরুষ পরবর্তী জীবনে যে-শোকে পেয়েছে সেই শোকের কবি নজরুল। এই শোক বাঙালী আমরা পেয়ে থাকি নারী-শপ্ত রামের জীবনে। রামায়ণের করুণ-রস রাঢ়-বঙ্গের কবি নজরুলের হৃদয়ে ছেলেবেলায় প্রবেশ করেনি কি? বোধ হয় সেই রসই নতুন অভিজ্ঞতার দরুণ নতুন গড়নে, নতুন তেজে দেখা দিয়েছে নজরুল প্রেমকাব্যে। হাজার হ'লেও নজরুল বাঙালীর বাচ্চা, যতই বিপ্লবের হাঁক সে হাঁকুক না কেন। সে রামকে দেখে কাঁদতে পারে, রামের মতনই কেঁদেছেও।

লেখক—আপনি "দোলন-চাঁপা"র ভেতর আরও অনেক কবিতা এই দরের পেয়েছেন?

সরকার—হাঁ। "সমর্পণ", "পূবের চাতক", "চপল সাথী", "কবি বাণী" ইত্যাদি ছোট কবিতাগুলার নাম করতে পারি। "অভিশাপ" আর "অবেলার ডাক" আকারে কিছু বড়। এই দুটাও উল্লেখযোগ্য। প্রত্যেকটায়ই কল্পনার ছোঁআচ কিছু-কিছু আছে। সবই বস্তুনিষ্ঠ তো বটেই। লম্বা-চওড়ায় খুবই বড় কবিতাটার নাম "পূজারিণী"। বহরে প্রকাণ্ড ব'লে অনেকে হয়তো এটা সহজে পড়তে চাইবে না। কিন্তু এটা সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা।

"পূজারিণী"র অমর কবি নজরুল

লেখক—কেন, "পূজারিণী"তে আছে কী?

সরকার—ভালোবাসার মিঠে-কড়া বা "কড়ি ও কোমল" এই কবিতার প্রাণ-বস্তু। "ভাঙা বুক" আর "কান্না-রাঙা মুখ" ছাড়া নজরুলের ভালোবাসা আত্মপ্রকাশ করে না বলা বাহুল্য। "আঁখিনীরে তিতি, আপনার মনে আনি তারি দূর-দূরান্তরের স্মৃতি" কবি কৈশোর হ'তে বর্তমান পর্যন্ত অভিজ্ঞতাগুলার ছবি দিয়ে যাচ্ছেন। কিছু-কিছু কল্পনার আঁচড় পাচ্ছি। মায় হেঁয়ালি একটু-আধটু আছে। "গ'র্জে ওঠা, "ব্যথা-উষ্ণ-উৎস-মুখে", "কানন-কাঁদানো", "যৌবন-জ্বালায়-জাগা", "বুক-ঢাকা" ইত্যাদি রাবীন্দ্রিক শব্দ ছড়ানো দেখতে পাচ্ছি। রবীন্দ্র-সাহিত্য হ'তে দু'এক লাইন উদ্ধৃত করাও হ'য়েছে। তাছাড়া ছন্দে আর ঝঙ্কারে খুবই পরিস্ফুট রাবীন্দ্রিক "বলাকা"র গাম্ভীর্য। কিন্তু অভিজ্ঞতাগুলা নজরুলের নিজস্ব।

লেখক—বেড়ে বলছেন। শুনতে লাগছে ভাল। আরও কিছু বলুন।

সরকার—এই কবিতার জন্য নজরুল প্রেম-সাহিত্য অমর। নজররুল "বিদ্রোহী"র কবি, আর "পূজারিণী"র কবি। একমাত্র এই দুই কবিতার জোরে বঙ্গ-সাহিত্যে নজরুলের ঠিকানা চিরস্থায়ী হ'য়ে রইলো। মজার কথা। আবার বলছি,—"পূজারিণী"র মুদ্দা হ'চ্ছে "বিদ্রোহী"র বিলকুল উল্টা। দু'য়ে মিলে নজরুল, দু'য়ে মিলে মানুষ। দু-মুখো মানুষের কাব্য-শিল্পী নজরুল। এই জীবন-শিল্পে বা দর্শনে লড়াইয়ের অপর পিঠ ভালোবাসা।

লেখক—"পূজারিণী"র এক-আধ কাচ্চা শুনিয়ে দিন না?

সরকার—ভালোবাসার দুনিয়ায় বায়ুতে আর অলিতে তফাৎ কী শুনবি? শোন্ নর কথায়ঃ—

"বায়ু শুধু ফোটায় কলিকা,
অলি এসে হ'রে নেয় ফুল।
বায়ু বলী তার করে প্রেম নহে প্রিয়া।
অলি শুধু জানে ভালো
কেমনে দলিতে হয় ফুল-কলি-হিয়া।"

এই হচ্ছে নজরুলি জীবন-শিল্পের গোড়ার কথা। লড়াইয়ের বীর প্রেমের বীর হ'তে পারে না। তাকে ভালোবাসার জগতে হারতে হয়ই হয়। বায়ু হারে অলির কাছে। মানুষের সনাতন দ্বন্দ্বই এখানে। ভালোবাসায় মানুষ হারে, হেরে ছট্‌ফট্ করে। এতেই নজরুলের বিষাদ-সিন্ধু।

লেখক—নজরুলের বিষাদ আরও কিছু বিশ্লেষণ করতে পারেন?

সরকার—নজরুলের বায়ু অলির কাছ কেন হারে? এই পরাজয় একটা বেদনা-মূলক নাটকের মস্ত কথা। বিষাদের নাটকটা নজরুল-সাহিত্যে দেখা দিয়েছে অতি নিষ্ঠুর ও অতি নিলর্জ ভাবে। নজরুল চরমরূপে সত্যনিষ্ঠ। এইজন্য তার হাতে অতি-কড়া, অতি-কেঠো, অতি তেতো নির্মম সত্য বেরিয়ে এসেছে।

লেখক— সেই অতি-কড়া, অতি-তেতো সত্যটা কী?

সরকার—অলি বায়ুকে হারায় কী ক'রে? "ফুল-কলি-হিয়া" সম্বন্ধে নজরুলের বজ্র-কঠোর বাণী নিম্নরূপ ঃ—

"আজ আমি মরণের বুক থেকে কাঁদি----
অকরুণা! প্রাণ নিয়ে একি মিথ্যা অকরুণ খেলা।
এত ভালবেসে শেষে এত অবহেলা
কেমনে সহিতে পার নারী!
এ আঘাত পুরুষের,
হানিতে এ নির্মম আঘাত জানিতাম মোরা
শুধু পুরুষেরা পারি।
ভাবিতাম দাগহীন অকলঙ্ক কুমারীর দান
একটি নিমেষ মাঝে চিরতরে আপনারে রিক্ত
করি দিয়া মনপ্রাণ লভে অবসান।"

লেখক—শুনাচ্ছে ভাল। কিন্তু ভাবার্থটা কী?

সরকার—এই ছিল কবির কল্পনা। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ কবি অভিজ্ঞতার ফলে আবিষ্কার করলেন ঃ—

"ভুল, তাহা ভুল।"

যাঁহা পুরুষ, তাঁহা নারী। নারী-জাতির পুরুষ-সাম্য (ম্যাস্‌কুলিনিজেশ্যন অব উওম্যান) প্রতিষ্ঠিত হ'লো আর এক তরফ হ'তে। নজরুলের সাহস আছে। বিনা হেঁয়ালিতে ঠোঁটকাটা ও খাতির-নদারৎ ভাবে কথা বলতো তিনি সুপটু। এই কবি স্পষ্টা-স্পষ্টি "ফুল-কলি-হিয়া"র ধরণ-ধারণ জগতের সম্মুখে খুলে ধ'রেছেন। মেয়েদেরকে দেবী ব'লে স্বর্গের আলমারিতে পুষবার মতন কবি নজরুল নন।

লেখক—"পূজারিণী" হ'তে আরও দুএকটা দৃশ্য দেখাবেন?

সরকার—ভালোবাসাগ্রস্ত মানুষ কী চায় শুনবি? আচ্ছা নজরুলের বাণী শোন্ ঃ—

"সব ব্যর্থ ফিরে চলে নিরাশায় প্রাণ
পথে পথে গেয়ে গান—
কোথা মোর ভিখারিণী পূজারিণী কই?
যে বলিবে 'ভালোবেসে সন্ন্যাসিনী আমি
ওগো মোর স্বামি!
রিক্তা আমি, আমি তব গরবিণী
বিজয়িনী নই।"

এইরূপ "পূজারিণী"-"গরবিণী" ক'জনের কপালে জুটেছে রে? দেখছিস্ নজরুলের কলমের জোর। কলমের জোর বল্‌বো না কলিজার জোর রে? ভাবুকতার চরম। কাজেই বিষাদে, কাজেই ভাঙা বুক। কাজেই "কাঁটা-বেঁধা রক্ত-মাখা প্রাণ।"

লেখক—নজরুলের "পূজারিণী" কি আগাগোড়া এইরূপ কান্না-কাটিতে ভরপূর?

সরকার—তাই মনে হবে। কিন্তু তবুও স'মে এসে ঠেকেছে ভালয়-ভালয়। শোন্ ঃ—

"পথিক দখিনা বায়ু আমি চলিলাম বসন্তের শেষে
মৃত্যুহীন চির রাত্রি নাহি-জানা দেশে।"

এই হ'চ্ছে বিদায়ের দৃশ্য। তার পরবর্তী অবস্থা আর কাহিল নয়।

লেখক—কিরূপ সেই অবস্থা?

সরকার—সম্বল তখন স্মৃতি!

"সেই প্রীতি, সেই রাঙা সুখ-স্মৃতি স্মরি'
মনে হয় এ জীবন. এ জনম ধন্য হ'ল, আমি
আজ তৃপ্ত হ'য়ে মরি।"

সুখে মর্‌বার কারণ কী শুন্‌বি?

লেখক—বলুন না শুনি।

সরকার—"না চাহিতে বেসেছিলে ভালো মোরে
তুমি শুধু তুমি,
সেই সুখে মৃত্যু-কৃষ্ণ অধর ভরিয়া
আজ আমি শতবার ক'রে
তব প্রিয় নাম চুমি।"

এই সুর রাবীন্দ্রিক।

লেখক—"পূজারিণী" সম্বন্ধে আর কিছু বল্‌বেন?

সরকার—দেখ্‌ছিস্ কাকে বলে ভালোবাসায় সংযমশীল শরীর নিষ্ঠা। আত্মাকে আত্মা, শরীরকে শরীর দুই নজরুলের কল্পনায় জ্বল্-জ্বল্ কর্‌ছে। আরও কিছু শুন্‌বি?

লেখক—শুনিয়ে যান।

সরকার—নজরুলের শেষ কথা ঃ—

"মরিয়াছে—অশান্ত অতৃপ্ত চির-স্বার্থপর লোভী,—
অমর হইয়া আছে রবে চিরদিন,
তব প্রেমে মৃত্যুঞ্জয়ী,
ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি।"

ভাবুকতার চূড়ান্ত। কোথায় বস্তুনিষ্ঠ গজলওয়ালা বাজারী নজরুল? আর কোথায় "পূজারিণী"র মৃত্যুঞ্জয়ী অমর কবি নজরুল?

একটা চরম কথা ব'লে রাখ্‌বো?

লেখক—বলুন না।

সরকার—হয়ত এমন একনি আস্‌তে পারে যখন "বিদ্রোহী"র পাঠক জুট্‌বে না। কিন্তু "পূজারিণী" টেঁকসই,—"পূজারিণীর"র পাঠক চিরকাল জুট্‌বে,—"পূজারিণী" অমর।

নজরুলের রবীন্দ্র-প্রশস্তি

লেখক—"পূজারিণী"র ভেতরকার একটা সুরকে রাবীন্দ্রিক ব'লেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোথায় পেলেন সেই সুর?

সরকার—"কৃতজ্ঞ" কবিতায়,—"পূরবী" বইয়ের ভেতর (১৯২৫)।

লেখক—শ্লোকটা মনে আছে?

সরকার—এই শোন্ ঃ—

"আজ তুমি আর নাই, দূর হ'তে গেছ তুমি দূরে
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা মুছে যাওয়া তোমার সিন্দুরে।
সঙ্গীহীন এ-জীবন, শূন্য ঘর হ'য়েছে শ্রীহীন,
সব মানি সব চেয়ে মানি তুমি ছিলে একদিন।"

লেখক—আপনি কি রবি-গ্রস্ত লোক? কাব্য-জগতে রবীন্দ্রনাথের ছায়া যেখানে-সেখানে দেখ্‌তে পান?

সরকার—কী কর্‌বো, ভায়া? রবিকে এড়িয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যেন দত্ত'র যুগে (১৯০৫-১৪) কবিরা "সন্ধ্যা সঙ্গীত" (১৮৮২), "প্রভাত সঙ্গীত" (১৮৮৩), "কড়ি ও কোমল" (১৮৮৬), "মানসী" (১৮৯০), "সোনার তরী" (১৮৯৪), "চিত্রা" (১৮৯৬), "কল্পনা" (১৯০০), "ক্ষণিকা" (১৯০০) এই কয়খানা রাবীন্দ্রিক বই খেয়ে মানুষ হ'য়েছিল।

লেখক—আর একালের কবিরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের কোন্-কোন্ বইয়ের নিকট বেশী ঋণী?

সরকার—১৯১৯-৪৩ সনের প্রায় সকল কবিই রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাল বেলাটা হ'তে কিছু-না-কিছু রসদ পেয়েছে। "বলাকা"'র (১৯১৬) তো কথাই নাই। "পলাতকা" (১৯১৮), পূরবী" (১৯২৫), "পুনশ্চ" (১৯৩২), "শেষ সপ্তক" (১৯৩৫), "প্রান্তিক" (১৯৩৮), "নবজাতক" (১৯৪০), "সানাই" (১৯৪০),—এই সব বইয়ের ছন্দ, ভাষা, আর ভাব একালের বাংলা কাব্যে কিছু-না-কিছু আছেই আছে। এমন কি বস্তি-গল্প আর কাস্তে-কাব্যের লেখকেরাও বস্তু-নিষ্ঠায় আর সমাজ-নিষ্ঠায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের "পলাতকা" হ'তে "সানাই" পর্যন্ত বইয়ের নিকট অল্প-বিস্তর হদিশ পেয়েছে। অপর দিকে "বলাকা", "পলাতকা" আর "পূরবী" নজরুল-কাব্যের আবহাওয়ায় ধর্‌তে পারা যায়। অবশ্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের সকাল বেলাটা সম্বন্ধেও একালের কবি-গাল্পিকেরা একদম নির্বিকার নন।

লেখক—একটা কথা জানতে ইচ্ছা ক'রছে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নজরুলের কোনো কবিতা নাই?

সরকার—আছে। "চক্রবাক' বইয়ের (১৯২৮) ভেতরকার "১৪০০ সাল" নামক একটা রচনা রবীন্দ্র-বিষয়ক। রবীন্দ্রনাথের "আজি হ'তে শত বর্ষ পরে" কবিতাটা সুপরিচিত। তার জবাবে পাই নজরুলের এই রবীন্দ্র-প্রশস্তি।

লেখক—শুনি দু-এক লাইন?

সরকার—নজরুল বল্‌ছেন :—

"তোমা হ'তে শতবর্ষ পরে—
তোমার কবিতাখানি পড়িতেছি,
হে কবীন্দ্র
অনুরাগ ভরে।
আজি এই মদালসা ফাল্গুন নিশীথে
তোমার ইঙ্গিত জাগে তোমার সঙ্গীতে।

তারপর বঙ্গ-সাহিত্যের উপর রাবীন্দ্রিক প্রভাব সম্বন্ধে নজরুলের মন্তব্য খোলাখুলি বলা আছে।

লেখক—কী সে সব?

সরকার—রবিকে বল্‌ছেন নজরুল—

"চতুরালি, ধরিয়াছি তোমার চাতুরী!
করি চুরি,
আসিয়াছ আমাদের দুরন্ত যৌবনে
কাব্য হ'য়ে, গান হ'য়ে সিক্ত-কণ্ঠে
রঙ্গীলা স্বপনে।
আজিকার যত ফুল-বিহঙ্গের যত গান
যত রক্ত-রাগ
তব অনুরাগ হ'তে হে চির কিশোর কবি—
আনিয়াছে ভাগ!
আজি নব বসন্তের প্রভাত বেলায়
গান হ'য়ে মাতিয়াছ আমাদের
যৌবন মেলায়।"

এই প্রশস্তি ভবিষ্য-পন্থী অভিযান-যৌবনের কবি নজরুলের পক্ষে মানন-সই হ'য়েছে।

ধর্ম ও অ-ধর্ম

১৯শে জুলাই ১৯৪৩

লেখক—নজরুলের ধর্মমত কিছু বুঝ্‌তে পারা যায়?

সরকার—মুসলমানরা বোধ হয় নজরুলকে হিন্দু প্রেমিক বলে,—এমন কি হয়ত "কাফের"ই বা বলে। আর হিন্দুদের কোনো-কোনো মহলে হয়ত নজরুলকে ইস্‌লাম-

প্রেমিক বলা হয়। আমার বিবেচনায় নজরুল কোনো তথা-কথিত ধর্মের তোআক্কা রাখে না। সাধারণতঃ যাকে ধর্ম বলা হয় নজরুল তার বিরোধী। ''সর্বহারা''র কবিতাগুলাতে যে মানব-নিষ্ঠা দেখ্‌তে পাই, তাই হচ্ছে নজরুলের আসল ধর্ম। সেই মানবিকতাই ''বিদ্রোহী'' কবিতার ও প্রাণ। এই ধর্মকে অধর্ম বলা সম্ভব, নাস্তিকতা বলা সম্ভব। এ-চিন্তা হিন্দুআনিও নয়, ইস্‌লাম-প্রচারও নয়।

লেখক—মুসলমান দেশ ও বীরদের সম্বন্ধে যে-সকল কবিতা আছে তার ভেতর নজরুলের ধর্মমত বুঝা যায় না?

সরকার—নজরুলের মুসলিম নামে চিহ্নিত কবিতাগুলার ভেতর পাওয়া যায় স্বদেশ-নিষ্ঠার তারিফ। জাতীয়তা ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা হ'চ্ছে আফ্রিকা ও এশিয়ার মুসলমান-বিষয়ক গানগুলার মুদ্দা। এই সব কবিতায় ইস্‌লাম-ভক্তি বা ইস্‌লাম-প্রচারের গন্ধমাত্র আছে কি না সন্দেহ। কোনো প্রকার ধর্মের গন্ধ যদি থাকে তা হ'চ্ছে মানব-ধর্ম, ব্যক্তি-নিষ্ঠা।

লেখক—ধর্ম-ঘেঁশা কবিতাগুলা বিশ্লেষণ ক'রে একথা বল্‌ছেন কি?

সরকার—আলবৎ। ''অগ্নিবীণা''র ''রক্তাম্বরধারিণী মা'' পড়লে কোনো-কোনো লোক হয়ত বল্‌বে নজরুল পৌরাণিক দেব-দেবীর প্রচারক। অন্যান্য কবিতার ভেতর ও পৌরাণিক দেব-দেবীর নাম পাওয়া যায়। উপমা, দৃষ্টান্ত ইত্যাদি চিজও পুরাণ-তন্ত্রের গল্প হ'তে গৃহীত। কিন্তু এই ধরণের বোলচাল দেখে লেখককে হিন্দু বলা চলে না। হিন্দুত্বের প্রচারকও নজরুলকে বলা উচিত হবে না।

লেখক—সেকি, একথা বল্‌ছেন কেন?

সরকার—কোনো খৃষ্টিয়ান কবি ওল্ড-টেস্টামেন্টের প্রাক্-খৃষ্টিয়ান ইহুদি গল্প নিয়ে কবিতা লেখে না কি? তাতে কি সে ইহুদি হ'য়ে পড়ে? নামজাদা মিল্টনের ''স্যামসন আগনিস্টেস্'' জগদ্-বিখ্যাত কাব্য। তার কথা-বস্তু অ-খৃষ্টিয়ান ইহুদি মাল। অথচ মিল্টন নিজে বাঘা খৃষ্টিয়ান। সেকেলে গ্রীক দেব-দেবীর গল্প বাদ দিলে ইয়োরোপের আধুনিক সাহিত্যগুলা ফোঁপরা হ'য়ে যায়। অথচ লেখকেরা সবই খৃষ্টিয়ান। ধর্মের কাহিনী যে-কোনো সাহিত্যের কথা-বস্তু।

লেখক—হিন্দু গল্পের কাহিনী-প্রচাবককে আপনি হিন্দু বল্‌তে রাজি নন?

সরকার—না। এ সব হচ্ছে সাহিত্যের রসদ মাত্র। বল্‌বো শুধু একটা সোজা কথা। নজরুল একটা পণ্ডিত। অবশ্য পরীক্ষায় পাশ কটা আছে জানি না। কিন্তু হিন্দু কাহিনীগুলা তার মুখস্থ আছে। কোনো তথা-কথিত হিন্দু কবি আরবী-ফার্সী সাহিত্যের গল্প নিয়ে কবিতা, নাটক, উপন্যাস লিখুক। আরবী-ফার্সী শব্দ, উপমা, অনুপ্রাস চালাতে থাকুক। তাকে কোনো মুসলমান পাঠক মুসলমান বল্‌বে কি? হিন্দুরাও তাকে মুসলমান বল্‌বে না। বল্‌বে লেখকটা লেখা-পড়া জানে, মূখ্‌খু নয়। সত্যেন দত্ত আরবী-ফার্সী-চীনা মালের বেপারী ছিল। বিশ্বশক্তির সদ্‌ব্যবহার কর্‌তে পারে ব'লে তাকে আমরা সে-যুগে তারিফ ক'রেছি। আজ নজরুলকেও বিশ্বশক্তির বেপারীরূপে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্বর্দ্ধনা করা উচিত। তা হ'লে বুঝ্‌বো,—বাঙালীর বাচ্চারা লিখিয়ে-পড়িয়ে লোক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে বাঙালী জাত্‌কে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়।

লেখক—''অগ্নিবীণা''য় কোনো মুসলমান গল্প আছে?

সরকার—''কোরবাণী'' নামে একটা কবিতা আছে। তার ধুআ হ'চ্ছে নিম্নরূপ :—

"ওরে হত্যা নয় আজ সত্যগ্রহ
শক্তির উদ্বোধন।"

তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে "রক্তাম্বরধারিণী মা"র শেষ দুই লাইন ঃ—

"ধ্বংসের বুকে হাসুক মা তোর
সৃষ্টির নব পূর্ণিমা।"

লেখক—মুসলমান ধর্ম-বিষয়ক আর কোনো কবিতা আছে?

সরকার—মুসলমান "ধর্ম"-বিষয়ক কবিতা একটাও খুঁজে পাই নি। আছে কিনা জানি না। তবে মুসলমান-ধর্মের বা সংস্কৃতির কাহিনী দু একটা কবিতার ভেতর কিছু-কিছু পাওয়া যায়। "অগ্নিবীণা"র "মোহার্‌রম" পড়্‌লে যে-কোনো বাঙালীর বাচ্চা মুসলিম পার্বণের সরস ব্যাখ্যা পাবে। "জিঞ্জীর" বইয়ের "উমর ফারুক' কবিতা রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে-কোনো বৌদ্ধ বা প্রাচীন ভারতীয় কাহিনী-মূলক কবিতার জুড়িদার। কবিতাটার সুর কিরূপ দেখ্‌বি?

লেখক—পড়ুন শুনি।

সরকার—নজরুলের "উমর সম্বর্দ্ধনা"য় আছে ঃ—

"হে খলিফাতুল মুস্‌লেমিন
হে চীর-ধারী-সম্রাট্!
অপমান তব করিব না আজ
করিয়া নান্দী পাঠ।
মানুষেরে তুমি ব'লেছ বন্ধু
বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পাণিতে
স্মরি গো সর্বদাই।"

লেখক—তাহ'লে নজরুল ধর্মের কবি নন?

সরকার—এক কথায় জবাব চাস্? পারিভাষিক ধর্মের খাতায় নজরুল অ-ধর্মের কবি। "সর্বহারা"র ভেতর "ঈশ্বর" নামে একটা কবিতা আছে। এই দ্যাখ্ ঃ—

"সৃষ্টি র'য়েছে তোমা পানে চেয়ে
তুমি আছ চোখ বুঁজে,
স্রষ্টারে খোঁজা—আপনারে তুমি
আপনি ফিরিছ খুঁজে।
সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার
সকলের মাঝে তিনি।
আমাদের দেখিয়া আমার অদেখা
জন্মদাতারে—চিনি।"

এর ভেতর না আছে পুরাণ, না আছে কোরাণ, আর না আছে বাইবেল। অতএব পুরুত-মোল্লা-"বাবা"দের ফতোআয় এ চিজ বিলকুল অ-ধর্ম। আমি বল্‌বো এই হচ্ছে মানুষমাত্রের আসল ধর্ম। চোদ্দ-আঠার বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা নজরুলের অ-ধর্মে দীক্ষিত হ'তে থাকুক। বাঙ্‌লা দেশে মানুষ গ'ড়ে উঠ্‌বে।

নবেম্বর ১৯৪৩

রামানন্দ'র চার বাঙালী *

৪ঠা নবেম্বর ১৯৪৩

হরিদাস—রামানন্দবাবু মারা গেলেন (১লা অক্টোবর, ১৯৪৩)। তাঁর সম্বন্ধে আজ কিছু বল্‌বেন?

সরকার—কেন? তাঁর সম্বন্ধে তুই আমার কাছে কখনো কিছু শুনিস্ নি?

লেখক—আপনি ত অনেকবারই তাঁর নাম ক'রেছেন। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগের পনর-বিশ জন বাঙালী জন-নায়কের নাম যখনই ক'রেছেন তখনই রামানন্দ বাবুকে তার ভেতর দেখেছি।

সরকার—কিছু মনে অছে?

লেখক—এক জায়গায় ব'লেছেন,—"প্রবাসী" ও "মডার্ণ-রিভিউ" মাসিক দুটা ঠিক যেন দৈনিকের কাজ কর্‌তো। বঙ্গ-বিপ্লবের যুগে অন্যতম আদর্শ-নিষ্ঠ, চৌকোস ও কর্মদক্ষ স্বদেশ-সেবক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ("বিনয় সরকারের বৈঠকে' ১৯৪২, পৃঃ ৩২৩)।

সরকার—আর নতুন কী বল্‌বো? এর পরও বল্‌বার কিছু থাক্‌তে পারে কি?

লেখক—ঐ যে বল্‌লেন,—"সংহতি'-থেকে ডাক পড়েছে, রামানন্দ স্মৃতিসংখ্যার জন্য। তার জন্যেই কিছু বলুন না।

সরকার—দৈনিক পন্থী মাসিকের সম্পাদক হিসাবে রামানন্দবাবুর কাজ বাংলা দেশে অদ্বিতীয়। এঁর জুড়িদার মেলা অসম্ভব।

লেখক—কেন? এই কাজের ভেতর এত বিশেষত্ব দেখ্‌ছেন কী ক'রে?

সরকার—কোনো মাসিকওয়ালা রামানন্দবাবুর (১৮৬৫-১৯৪৩) সমাজ কাজ কর্‌তে পারেন নি, আর কোনো দৈনিকওয়ালাও পারেন নি। রামানন্দবাবুর সংবাদপত্র-সেবা অতুলনীয়। অবশ্য সকল চিন্তাক্ষেত্র সম্বন্ধে আমার মন্তব্যটা ঝাড়্‌ছি না। মাত্র কয়েকটা বিভাগ সম্বন্ধে বুঝ্‌তে হবে।

লেখক—আপনি এই মন্তব্য চালাচ্ছেন কিসের জোরে?

সরকার—রামানন্দবাবুর মারফৎ বাঙালীজাত্ কয়েকজন বাঙালীকে ঘরে ঘরে পূজা কর্‌বার সুযোগ পেয়েছে। এইসব বঙ্গ-সন্তানকে বাঙ্‌লার নরনারীর ভেতর রামানন্দবাবু সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। এঁদেরকে আমি রামানন্দবাবুর বিশিষ্ট দান সম্‌ঝে থাকি। রামানন্দবাবু না থাক্‌লে এই সব বঙ্গ-রত্নকে বাঙালী জাত্ এত শীগ্‌গির "বাপ্‌কো বেটা" ব'লে সম্বর্দ্ধনা কর্‌তে পার্‌তো না। নিয়মিতরূপে এঁদের সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর প্রচার চল্‌তো। এই প্রচারটাই ছিল তাঁর স্বদেশ-সেবার অন্যতম অঙ্গ।

লেখক—চব্বিশ-ঘণ্টা প্রচারের জোরে যে-সব লোক বঙ্গ-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত তাঁদের মূল্য এমন বেশী কি?

সরকার—খুবই বেশী। "প্রচারের জোরে সুপ্রতিষ্ঠিত" বল্‌লে বুঝ্‌তে হবে না যে,

* "সংহতি' মাসিকে প্রকাশিত, কার্ত্তিক ১৩৫০।

সেই লোকগুলা নকড়া-ছকড়া। মনে করা উচিত নয় যে, তাঁরা আপনা-আপনি বাজারে দাঁড়াবার উপযুক্ত নন। আমি বল্‌ছি বিলকুল উন্টা কথা। আপন পায়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা প্রসিদ্ধ। কিন্তু তবুও তাঁদের পেছনে প্রচারের ধাক্কা জরুরী ছিল। অমরগুলোকেও অলিতে-গলিতে ঘরোআ জীবনে পরিণত করা আবশ্যক হয়। অমরেরা আপনা-আপনি একমাত্র একমাত্র নিজগুণে, নিজ দৌলতে, নিজ কেরদানির জোরে ঘরে-ঘরে পূজা পায় না।

লেখক—আপনি বাস্তবিকই একটা কিম্ভূত-কিমাকার কথা বল্‌ছেন। অমর যাঁরা তাঁরা নিজগুণে সুপ্রতিষ্ঠিত হন না? তাঁরা প্রচারকদের গুণ কীর্তনের প্রভাবে লোকমান্য হন? অতিমাত্রায় আজগুবি মনে হচ্ছে।

সরকার—আচ্ছা, ধর্‌ শাক্যসিংহ নামক বুদ্ধদেব অথবা বুদ্ধ-উপাধি-ওয়ালা শাক্যসিংহ্‌। "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর।" যে-সে লোকের দৃষ্টান্ত পাড়্‌ছি না। শাক্যসিংহ গুণী লোক সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি "বুদ্ধ" উপাধিটা পেলেন কী ক'রে? উপাধি চিজটা দেয় বাইরের লোকে। কেহ নিজে নিজেকে উপাধি, পদবী বা আর কোনো সার্টিফিকেট দেয় না। তাঁকে "বুদ্ধ" ক'রেছিল কে বা কারা? তাঁর দেশের লোক, বিহারীরা। একজন, দু'জন, দশজন? শ'য়ে-শ'য়ে, হাজারে-হাজারে, লাখে-লাখে। "বুদ্ধ"-উপাধিশীল শাক্যসিংহকে এই সব হাজার-হাজারে, বাজারে খাড়া করলে কোন্‌ কোন্‌ লোকেরা? গুণগ্রাহীরাই সার্টিফিকেট দেয়। বুদ্ধকে দিয়েছিল পেটোআরা, চেলারা, শিষ্যেরা, ভক্তেরা, সেকালের "সাংবাদিকেরা"। বুঝ্‌লি? মনে কর্‌, শাক্যসিংহের একটাও পেটোআ নাই, একটাও চেলা নাই। তা হ'লে কী হ'ত জানিস্‌? শাক্যসিংহ বুদ্ধ নামে পরিচিতও হতেন না। আর সেই শাক্যসিংহ এক বিহারেই কল্‌কে পেতেনও না। আর "আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর" বল্‌বার জন্য বাঙালী কবির মেজাজও খেল্‌তো না। লাখ-লাখ সাংবাদিক দেখ্‌তে পাচ্ছি শাক্যবুদ্ধের পেছনে।

লেখক—এই ব্যাখ্যা শুন্‌লে অমরদের সম্বন্ধে জনসাধারণের ভক্তি অনেকটা ক'মে আস্‌বে। আপনার মন্তব্য ঘোরতর ভক্তিবিরোধী।

সরকার—রাধামাধব! আমি অমরদের অমরতা আধ-কাঁচ্চাও কমাচ্ছি না। অমরগুলো অমরই বটে। তবে অমরটা যে অমর তা আমার মতন তোর মতন মামুলি লোকেরা বুঝ্‌বে কী করে? তা বুঝ্‌বার জন্য জহুরী চাই, গুণগ্রাহী চাই, সমঝ্‌দার চাই। জহরৎ বুঝে জহুরী। আর তার কিম্মৎ কষা হয় বাজারে ফেল্‌বার পর, আগে নয়। মানুষ অবতার হ'য়ে জন্মায় না, জন্মে মামুলি লোক হিসাবে। অবতার "সৃষ্টি" কর্‌তে হয়। অবতারের স্রষ্টা কে? পাড়ার লোক, দেশের লোক, জনসাধারণ।

লেখক—আপনি কি রামানন্দবাবুকে এই জহুরী আর সমঝ্‌দারের ইজ্জদ্‌ দিচ্ছেন? তিনি কয়েকজন বঙ্গরত্নকে বাজারে ফেলেছেন? আর তাঁদেরকে বাংলার পাঠক-পাঠিকার সাম্‌নে সর্বদা ধ'রেছেন? এই ধরণের ভক্ত না থাক্‌লে সেই সব অমর বাঙালী বাংলা দেশের জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত হ'তে পার্‌তেন না? এই আপনার যুক্তি?

সরকার—অবিকল তাই। প্রত্যেক অমরের জন্যই এইরূপ ভক্ত চাই। যীশুখৃষ্টের দিগ্বিজয় চ'লেছে ভক্তদের জোরে। পয়লা ভক্ত পিটার, পল্‌ ইত্যাদি। নেহাৎ চুনো পুঁটিরাই ভক্তের দৌলতে বেঁচে থাকে, আর রুই-কাৎলারা দিগ্বিজয় চালায় নিজ জুতোর জোরে—এইরূপ সমঝে রাখা ঠিক নয়। সব মিঞারই দিগ্বিজয় চলে প্রচারকদের বকাবকি, হাতাহাতি, লাঠালাঠি আর লেখালেকির জোরে। সার্বজনিক পূজা খাওয়ার মারপ্যাচ্‌

বিচিত্র। পূজারি না থাক্‌লে পূজা করে কে? একালের নোবেল প্রাইজের মামলায়ও প্রচারক-পূজারির প্রভাব জবরদস্ত্।

লেখক—কিন্তু তাতে অমরদেরকে আপনি খেলো ক'রে ছাড়্‌ছেন না কি?

সরকার—কোনো মতেই না। বাল্মীকি রামের সাংবাদিক ব'লে রাম তুচ্ছ কি? অমরদের ইজ্জদ আমার ব্যবস্থায় এক দামড়িও কম্‌ছে না। দিগ্বিজয়ীদের আসল গুণপনা প্রচারকদের বকাবকি আর লেখালেখির জোরে বাড়ে কি কমে সে বিষয়ে আমি কিছুই বল্‌ছি না। বল্‌ছি শুধু একটা সোজা কথা। হাজার-হাজার লোকের ভেতর পরিচিত হওয়াটা একমাত্র গুণপনার উপর নির্ভর করে না। ওস্তাদি, চরিত্র, স্বার্থত্যাগ ইত্যাদি থাক্‌লেই লোকটা বাজারে নামজাদা হয় না। দিগ্বিজয় করার মানেই হ'ল "অনেক দিকে" অনেকগুলো লোক একসঙ্গে গুণী, ওস্তাদ বা অমর ব্যক্তির ঢাক পিটোচ্ছে। কোনো অমর ব্যক্তি নিজে একসঙ্গে "দিকে-দিকে বিজয়-কেতন উড়াতে" পারে না। প্রত্যেক অমরেরই হাত-পায়ের আর চোখ-মুখের সীমানা আছে। বুদ্ধদেব আর যীশুদেব দরজা বন্ধ ক'রে কুঁড়ের লোকের চিন্তায় তাঁরা "অবতার" হ'য়ে উঠ্‌লেন। তাঁদের কীর্তি ছাওয়া হ'য়ে গেল, আপনা-আপনিই, "গান্ধার হ'তে জলধি শেষ।" এ রকম বুজরুকিপূর্ণ ঘটনা কখনো ঘাট্‌তি পারে না। ভায়া, দুনিয়ায় তুক্-মুখ্ চলে না। রামের জন্য চাই বাল্মীকি, চাই রামায়ণ। চাই ভক্ত, চাই চেলা, চাই সমঝ্‌দার, চাই প্রচারক, চাই সাংবাদিক, চাই স্বদেশ-সেবক।

লেখক—আচ্ছা, এইবার তা হ'লে বলুন রামানন্দ কোন্-কোন্ বাঙালী-রামচন্দ্রের বাল্মীকি?

সরকার—এইবার পদে এসেছিস্। এতক্ষণে প্রশ্নটা ঠিক হ'য়েছে। রামানন্দ-বাল্মীকির বড়-বড় চার রাম। যুবক-বাংলার লিখিয়ে-পড়িয়ে নরনারী রামানন্দ'র মারফৎ বিংশ শতাব্দীর চার বাঘা-বাঘা বাঙালীকে জগদ্‌বরেণ্য বঙ্গবীরের ইজ্জদ দিতে শিখেছে। শুধু কি ইজ্জদ দিয়েছে? এই চার বঙ্গবীরকে প্রতিদিনকার আটপৌরে কাজে লাগাতে-লাগাতে এগিয়ে চ'লেছে। রামানন্দ'র আবিষ্কৃত আর প্রচারিত এই রত্ন-চতুষ্টয়ের প্রভাব ছিল জবরদস্ত। বঙ্গ-বিপ্লবের করিৎকর্মা লোকেরা এই চার রামের দৌলতে নানা ক্ষেত্রে সাহস পেয়েছে, উদ্দীপনা পেয়েছে, আশা পেয়েছে।

এই চারজনের উপর ভর ক'রেই ১৯০৫-১৪ সনের যুবক-বাংলা অসাধ্য-সাধনের স্বপ্নে দেখ্‌তো আর দিগ্বিজয়ের পাঁয়তারা ভাজ্‌তো।

"মডার্ণ রিভিউ" আর "প্রবাসী" বগলদাবা ক'রে যুবক-বাংলা দেশ-বিদেশ টহল দিয়েছে আর রামানন্দ'র চার বাঙালীর গৌরবে নিজকে গৌরবান্বিত বোধ ক'রেছে। এশিয়ায় ও ইয়োরামেরিকায় "বৃহত্তর ভারত' প্রতিষ্ঠার কাজে যুবক-বাংলাকে রামানন্দ'র চার বাঙালীর মূর্তি সর্বদাই বস্তুনিষ্ঠ হদিশ জুগিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ

লেখক—রামানন্দ'র সেই বাঘা-বাঘা চার বাঙালী কে কে?

সরকার—রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র আর অবনীন্দ্রনাথ। এই রত্নচতুষ্টয়

রামানন্দ'র স্বদেশ-সাধনার ফলে বাঙালীর সার্বজনিক সম্পদে দাঁড়িয়ে গেছে। আর-কোনো বাঙালী বাংলা দেশকে এই ধরণের ও এই দরের চার বাঙালী দান ক'রে যেতে পারেনি। "প্রবাসী"-"মডার্ণ রিভিউ"র অদ্ভুত কৃতিত্ব। এই শ্রেণীর আবিষ্কার ও প্রচার সাধারণতঃ দেখা যায় না।

লেখক—আপনি এই চারজনকে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের "আবিষ্কার" বল্‌ছেন? এঁদেরকে কেউ জান্‌তো না? রামানন্দ'র পূর্বে আর রামানন্দ ছাড়া আর কেউ এই চার বাঙালীকে শ্রদ্ধা-সম্বর্দ্ধনা কর্‌তো না?

সরকার—দেখ্‌ছি তুই আমার কথা বিল্‌কুল, ভুল বুঝেছিস্‌। কেউ চিন্‌তো না কে বল্‌ছে? কেউ শ্রদ্ধা কর্‌তো না বল্‌ছি কি? যে-পাড়ায় তোর জন্ম, সে-পাড়ার ম্যাথ্‌রানিও তোকে চেনে। তাতে কি হ'য়েছে? জগদীশচন্দ্র আর প্রফুল্লচন্দ্র যে-ইস্কুলে মাষ্টারি কর্‌তেন, সেখানকার দ্বারওয়ানরাও তাঁদেরকে চিন্‌তো। অবনীন্দ্রনাথকে ছবি আঁকতে্‌ দেখেছে তাঁর বাড়ীর ঝী চাকরেরাও। আর রবীন্দ্রনাথের রচনা তাঁর নিজের সম্পাদিত "সাধনা", "ভারতী", "বঙ্গদর্শন" ইত্যাদি পত্রিকায় বেরুতো ঝুড়ি-ঝুড়ি। ঠিক যেন নিজে হরির লুট্‌ দিচ্ছি, নিজে বাতাসা ছিটাচ্ছি আর নিজে খাচ্ছি,— প্রায় এই অবস্থা। এতে সমসাময়িক হাজার হাজার নরনারীর কাছে বঙ্গবীর হওয়া যায় না। সমসাময়িক হাজার-হাজার ছোক্‌রারা এতে নিজ-নিজ আটপৌরে কাজের জন্য নয়া-নয়া হদিশ পায় না। ম'রে যাবার বিশ-পঞ্চাশ-পঁচাত্তর বছর পর হয়ত তাতে দেশে-বিদেশে গুণীর ইজ্জদ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বেঁচে থাক্‌তে-থাক্‌তে দেশের লোককে তাতাবার সুযোগ বা সৌভাগ্য তাতে জুটে না। তার জন্য দরকার হ'য়েছিল বাল্মীকি-রামানন্দ'র। "প্রবাসী" "মডার্ণ রিভিউ"ই এই চার বঙ্গ-সন্তানকে বাঙালীর সার্বজনিক সামগ্রী ক'রে ছেড়েছে।

লেখক—বড়ই আশ্চর্যের কথা। সেকালে রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র আর অবনীন্দ্রনাথের কাজ-কর্ম বাংলার জনসাধারণের ভেতর ছড়িয়ে পড়েনি?

সরকার—ভায়া, দুনিয়া বড় নির্দয়! ভেবে দেখ্‌তে হবে ১৯০১-১৯০৫ আর ১৯০৫-১৫ সনের যুগ। তখনকার দিনের দৈনিক. সাপ্তাহিক, মাসিকগুলোর ভেতর নাক গুঁজে চালা গবেষণা। খাঁটি ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা চালাতে বল্‌ছি। চিচিং ফাঁক হ'য়ে যাবে! প্রত্যেক লোকের জন্মের একটা নির্দিষ্ট সন-তারিখ আছে। তেম্‌নি সার্বজনিক সামগ্রী ব'নে যাবারও একটা নির্দিষ্ট দিনক্ষণ আছে।

লেখক—কেন? তখনকার দিনে পত্রিকাগুলোর ভেতর কি এঁদের সংবাদ পাওয়া যায় না?

সরকার—"বেঙ্গলী"তে আর "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় এই রত্নচতুষ্টয়ের সন্ধান রাখ্‌বার ব্যবস্থায় ছিল কি? দ্যাখ্‌ না খুঁজে কোন্‌ কোন্‌ মাসিকে এঁদের নাম শুনা যেত। ক'বার এঁদের ছবি বেরিয়েছে? সেকালে কোনো মিঞার ছবি-টবি একপ্রকার বেরুতো না। ছবি-ছাপার কারবারে বোধ হয় রামানন্দই অগ্রণী। কোন্‌ বাঙালী পাঠক-পাঠিকা কোন্‌-কোন্‌ পত্রিকার মারফৎ এই সকল বঙ্গবীরের কাজকর্মের সঙ্গে নিত্য-নৈমিত্তিক-রূপে সংস্পর্শে এসেছে? ১৯১৪ সন পর্যন্ত ফিরিস্তিটা নেওয়া ভাল। তারপর ১৯১৪-২৫ সনের বাঙালী দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের পাতাগুলো খতিয়ে দেখাও উচিত। খুঁটে খুঁটে খোঁজ চালাতে বল্‌ছি। মাথা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে।

লেখক—আপনি কি বল্‌তে চান যে, "মডার্ণ রিভিউ" আর "প্রবাসী" ছাড়া অন্য

কাগজে এই চার বঙ্গবীরের বৃত্তান্ত পাওয়া যেত না?

সরকার—কালে-ভদ্রে কেউ কখনও এদের নাম করেনি তা বল্‌ছি' না। তা ছাড়া এঁদের দেশে-বিদেশে চলাফেরার বৃত্তান্ত অথবা বক্তৃতাবলীর সারমর্ম, কিম্বা চিত্র প্রদর্শনীর তারিফ এখানে-ওখানে প্রকাশি হয় নি (বিশেষতঃ ১৯১৪-২৫ সনের যুগে) তাও বল্‌ছি না। জিজ্ঞাসা কর্‌ছি এই যে, বাঙালী জাতের লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের এই চারজনের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ কায়েম কর্‌বার সুযোগ পেয়েছে কোন্ কোন্ দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিকের মারফৎ? আর জবাব দিচ্ছি,—রামানন্দ-সম্পাদিত পত্রিকা দুটা হচ্ছে এই আত্মিক যোগাযোগের প্রায় একমাত্র বাহন। বাংলাদেশে পত্রিকার মালিক, পত্রিকার সম্পাদক, পত্রিকার সাংবাদিক ইত্যাদি শ্রেণীর লোক কম ছিল না। কিন্তু এক রামানন্দ ছাড়া আর কোনো বাঙালী এই রত্নচতুষ্টয়কে বাঙালীর পাতে-পাতে আটপৌরে খাবারের জন্য পরিবেষণ করেন নি। এইরূপ পরিবেষণ করাটা কর্তব্য বা স্বধর্ম ঠাওরানোই ছিল সম্পাদক রামানন্দ'র বিশেষত্ব। এইখানেই তাঁর স্বদেশ-সেবার অন্যতম উজ্জ্বল ক্ষেত্র।

লেখক—মনে করুন, রামানন্দ-প্রবর্তিত পথে আজকালকার কোনো পত্রিকা-সম্পাদক চল্‌তে চায়, তা হ'লে তাকে কী কী কর্‌তে হবে?

সরকার—বল্‌তে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে। শুধু "রাম-চতুষ্টয়ের" প্রচার বিষয়ক হদিশ দিচ্ছি। দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝাচ্ছি। চার কর্মক্ষেত্রে থেকে বাঘা বাঘা চারজন বাঙালী বেছে নিতে হবে। এইখানে জহুরিগিরি। আজকাল হয়ত দশ-বিশ জন বাছা যেতে পারে। যাক্ সে কথা। সেই চারজন বাঙালীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে বা নিয়মিতরূপে টাকাটা-সিকিটা-দোআনিটা পাবার আশা বা সম্ভাবনা যেন না থাকে। তা হ'লেই প'চে গেল। তারপর কোনো "দল"কে ঠুকবার চেষ্টা কর্‌লে বাজার সইবে না। আর নিজের "দল"কে বাড়াতে গেলেও বুজরুকি ধরা প'ড়ে যাবে। এই চারজনকে নিয়ে বছরে পাঁচ-সাত-দশবার ঝালে-ঝোলে-অম্বলে সম্পাদকের ডেক্‌চিতে নাড়া-চাড়া কর্‌তে হবে। ফি বছর চল্‌বে এই দস্তুর। এঁদের ছবি ছাপতে হবে যখন-তখন। যখন এঁদের নিজের লেখা বা আর-কোনো-কিছু বেরুবে না, তখন তাঁদের সম্বন্ধে অন্য লোকের লেখা প্রকাশ কর্‌তে হবে। সাধনা বিপুল।

লেখক—এ যে চরম প্রপাগাণ্ডা?

সরকার—একেই বলে ভক্তিযোগ। বিজ্ঞাপন-খেকো প্রচারকের হাড়ে এসব পোষাবে না। শয়নে স্বপনে নিশি-জাগরণে স্বদেশ-নিষ্ঠা এরই নাম। এইজন্য রামানন্দকে অ-বাঙালী ভারতীয় সুধীরা গাল দিয়ে বল্‌তো,—'লোকটা ভয়ানক বাঙালী শোভিনিস্ট্,' বাংলার প্রপাগাণ্ডিস্ট্, বঙ্গ-প্রচারক, পাঁড় বাঙালী। এই গালটাই হ'লো আমার বিচারে সব চেয়ে সেরা সুখ্যাতি। স্বদেশ-যোগী রামানন্দ বঙ্গ-সেবক, বাঙালী। ইহাই অবশ্য রামানন্দ'র একমাত্র মূর্তি নয়। তাঁর অন্যান্য মূর্তিও আছে।

ভারতে ইয়োরামেরিকার চোরাই মাল

১৭ই নভেম্বর ১৯৪৩

হরিদাস—বর্তমানে ভারতবর্ষের যত-কিছু বড় বড় আন্দোলন ও কর্ম-প্রচেষ্টা সকলের

মূলেই পাশ্চাত্য প্রেরণা আছে,—আপনি প্রায়ই একথা ব'লে থাকেন। আপনার এই মত যুক্তি-সঙ্গত কি?

("একালের বঙ্গ-সংস্কৃতি', এপ্রিল ১৯৪২, 'দার্শনিক সাম্য সম্বন্ধ' ৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৪২, পৃষ্ঠা ৪৮, ৫৮৬)।

সরকার—আলবৎ। রামমোহনের সময় আমাদের আধুনিক যুগের সূচনা। সে-সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে আন্দোলন চল্‌ছে রকমারি আর গণ্ডা-গণ্ডা। সেগুলো রাষ্ট্রিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক, সামাজিক, আত্মিক ইত্যাদি ধরণের। তার কোনোটাই একমাত্র প্রাচ্যের জোরে, একমাত্র ভারতীয় মুড়োর জোরে দেখা দেয় নি বা পুষ্ট হচ্ছে না। সবগুলার মূলেই আছে অথবা সবের সঙ্গে জড়ানো র'য়েছে পাশ্চাত্য প্রভাব, পাশ্চাত্য দৃষ্টান্ত, পাশ্চাত্য সহযোগ।

বর্তমান ভারতের আসল সংস্কৃতি ইয়োরামেকির "চোরাই মাল"।

লেখক—একথা কোনো লোক বিশ্বাস কর্‌বে কি? এই পাশ্চাত্য প্রভাব সব সময় প্রমাণ করা যায় কি?

সরকার—চেষ্টা কর্‌লেই যায়। ইয়োরামেকির প্রভাব অনেক সময়ই অজ্ঞাতসারে কাজ ক'রে চ'লেছে। ভারতের সর্বত্রই চ'লেছে পশ্চিম থেকে অনুকরণ, পরস্বাপহরণ, "চুরি"।

লেখক—দু-একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—ইয়োরোপের বাঘা-বাঘা পাঁচটা আন্দোলন আছে। জানিস তো? "রেণেসাঁস" (পুনর্জীবন), "রিফর্মেশ্যন" (ধর্ম-সংস্কার), শিল্প-বিপ্লব, ফরাসী-বিপ্লব এবং রোমাণ্টিক আন্দোলন। তা'ছাড়া সামাজ-তন্ত্র (সোশ্যালিজম, কমিউনিজম) আছে। যাক্‌। এ পাঁচটা শক্তির দ্বারা আধুনিক ভারত অতি ব্যাপকভাবে ও নিবিড়ভাবে প্রভাবিত। এমন কোনো নামজাদা ভারতীয় কর্মক্ষেত্রে আছে কিনা সন্দেহ যেখানে এই পাঁচটা শক্তির কমসে-কম একটাও কাজ করে না।

লেখক—এদেশের যারা প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-রাজ-নীতি-সমাজনীতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা, গবেষণা, লেখালেখি ক'রে থাকেন, তাঁদের সম্বন্ধেও একথা খাটে কি?

সরকার—নিশ্চয় সাড়ে ষোল আনা খাটে। এঁদের প্রায় সকলেই 'পুনর্জীবন", "নবাভ্যুদয়" বা রেণেসাঁসের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

লেখক—অন্যান্য ক্ষেত্রের ভারতীয় মনীষীদের কাজকর্মকেও পাশ্চাত্য প্রভাব ও সহযোগের ফল বিবেচনা করা উচিত কি?

সরকার—ভারতীয় সাহিত্যবীরদের সবাই কম-বেশী রোমাণ্টিক ধর্মে প্রভাবিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তো সোজাসুজি শিল্প-বিপ্লবের শক্তি ভারতে কাজ ক'রে চলেছেই। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা জীবন ঢেলেছেন তাঁর প্রায় সবাই ফরাসী-বিপ্লব ও তৎসংশ্লিষ্ট চিন্তায় ভরপুর। দুনিয়াখানাকে তলিয়ে মজিয়ে বুঝ্‌তে শেখ্‌। আমি সর্বদাই বলি যে, একালের ভারতবাসীদের প্রায় সবাই পাশ্চাত্য চিন্তাবীর ও কর্মবীরদের বাচ্চা, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সংস্কৃতি চুরি-করা মাল।

লেখক—সাহিত্য-জগতের চুরি ও চোর সম্বন্ধে আপনি বুদ্ধদেব বসুর বক্তৃতায় সভাপতি হিসাবে এই ধরণের কথাই ব'লেছিলেন মনে পড়ছে (২০ মার্চ ১৯৪৩)।

"সাহিত্যিকা"-সমিতির সভায় অনেকেই আপনার কথা শুনে চম্‌কে গিয়েছিল। আপনার "চোরাইমাল" শব্দটা বড় কড়া ও নিষ্ঠুর।

সরকার—আমার পারিভাষিকে "চুরি" বা "চোরাই মাল" খারাপ-কিছু নয়। তার মানে হচ্ছে বিদেশী "প্রভাব" ও বিদেশী সহযোগ। এতে নিন্দার কিছু নাই। ইংরেজরাও "চোর", ফরাসীরাও "চোর', জার্মানরাও "চোর", মার্কিণরাও "চোর", জাপানীরাও "চোর", রুশরাও "চোর"। বর্তমান ভারতের প্রায় সব-কিছুই দো-আঁস্‌লা। জগতের সকল সংস্কৃতিই "বর্ণসঙ্করে"র পুকুর বা সমুদ্র।

রেণেসাঁস ও "রিফর্মেশন"

লেখক—বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ'র মধ্যে পাশ্চাত্য "রিফর্মেশনের" (ধর্ম-সংস্কারের) শক্তি বেশী কাজ করেছে কি?

সরকার—ভায়া, বিচার-বিশ্লেষণের কথা। আমার মতে বিবেকানন্দ-অভেদানন্দও 'রেণেসাঁসের" দ্বারাই প্রধানতঃ প্রভাবান্বিত। তবে "রিফর্মেশ্‌নের" দু-এক ডোজও তাঁরা গিলেছিলেন। কিন্তু তার গর্তে তাঁরা বেশী পড়েছিলেন কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া ফরাসী বিপ্লবের পাল্লায়ও তাঁরা অন্যান্য অনেকের মতনই বেশ-কিছু পড়েছিলেন।

লেখক—রিফর্মেশনের প্রভাব ভারতের কোথায় পাবো?

সরকার—পাশ্চাত্য রিফর্মেশনের প্রভাব বিশেষভাবে দেখ্‌তে হবে ব্রাহ্মসমাজের চিন্তায় ও কাজে। বিবেকানন্দ-অভেদানন্দ শেষ পর্যন্ত ঐ পুরানো কালী-দুর্গা পূজাই সমর্থন ক'রে গেছেন। কিন্তু ইয়োরোপের "রিফর্মেশন" ভিন্ন জাতের চিজ।

লেখক—রেণেসাঁসে আর রিফর্মেশনে তফাৎ কী?

সরকার—"রেণেসাঁসের" আসল কথা প্রাচীনের নকল, প্রচার, চুরি। অবশ্য নয়া ঢঙে, নয়া গড়নে, নয়া আকার-প্রকারে। পুরনোর নতুন সংস্করণকে বলা যেতে পারে 'পুনর্জন্ম"। রামকৃষ্ণ মঠের ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কথা "ধর্ম-সংস্কার," বা "সমাজ-সংস্কার" নয়। এই দুই সংস্কার এঁদের কাছে বেশ-কিছু গৌণ জিনিষ। ধর্মমূলক বেদান্ত-প্রচার হ'চ্ছে আসল কাজ।

মিল-স্পেন্সার-হাক্‌স্‌লে

লেখক—আপনি অরবিন্দ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক সাম্য-সম্বন্ধ টেনেছেন। অভেদানন্দ সম্বন্ধে একটা ইকুয়েশন তৈরি করে দিন না?

সরকার—এটা তুই-ই কর্‌ দেখি। অভেদানন্দ'র বইগুলার ভেতর পাশ্চাত্য কোন্‌-কোন্‌ মনীষীদের বয়েৎ বেশী পরিমাণে পাওয়া যায়,—বল্‌ দেখি?

লেখক—মিল, স্পেন্‌সার ও হাক্‌স্‌লের কথা অভেদানন্দ'র বইয়ের যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। অভেদান্দ সম্বন্ধে যদি নিম্নরূপ ইকুয়েশন টানি, তবে কেমন হবে? যথা:—

অভেদানন্দ-দর্শন = প্রাচ্যদর্শন (যোগ-বেদান্ত-গীত) × পাশ্চাত্য-দর্শন মিল-স্পেন্‌সার-

হাক্‌স্‌লে)।

সরকার—মিল-স্পেন্‌সার-হাক্‌স্‌লে—এই যে তিনজন চিন্তাবীরের তুই নাম কর্‌লি, এঁদের প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতীয় জীবনে ছিল জবরদস্ত। বিশেষতঃ মিল গোটা ষাট-সত্তর বছর ধ'রে বিলাত, আমেরিকা ও ভারতকে শাসন ক'রেছে। জবরদস্ত বাহাদুরি সন্দেহ নাই। মিল যে-দরের পণ্ডিত, সে-দরের লোক বিলাতে খুব কম জ'ন্মেছে। প্রায় সত্তর বছর ধ'রে ভারতীয় ইস্কুল-কলেজের ছেলে-মাষ্টাররা মিলের মুড়োটা চিবিয়ে নিজেদের মগজটা পুষ্ট ক'রেছে। মিল যুবক ভারতের অন্যতম 'আধ্যাত্মিক' গুরু। এক জায়গায় ব'লেছি—

"শঙ্কর-কাণ্ট নয় জগদ্‌গুরু,
জগদ্‌গুরু জন স্টুয়ার্ট মিল।"

লেখক—আপনার মুখে "আধ্যাত্মিক" কথাটা শুন্‌তে যেন কেমন-কেমন লাগে। সেদিন আপনি অল-বেঙ্গল ইকনমিক কন্‌ফারেন্সের মহাবোধি সোসাইটি হলে বক্তৃতাকালে (১৪ই এপ্রিল) ব'লেছেন যে, "যন্ত্রনিষ্ঠ মজুর আমার কাছে নয়া আধ্যাত্মিকতার প্রতিমূর্তি।" আপনি আধ্যাত্মিকতাকে খুব উঁচুদরের জিনিষ বিবেচনা করেন না?

সরকার—এক হিসাবে মোটেই না। আর এক হিসাবে খুব বেশী। আমার বিচারে দুনিয়ার সব-কিছু আধ্যাত্মিক। মানুষের করা এমন জিনিষ আমি ত খুজেই পাই না, যা অনাধ্যাত্মিক। তথা-কথিত "আধ্যাত্মিকতা" হাতী ঘোড়া কিছু নয়।

চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা যদিও পড়ে ধরা

লেখক—সংস্কৃতি-বিষয়ক চোরাই মাল সম্বন্ধে আমার খট্‌কা র'য়ে গেল। জগতের কোথাও তা হ'লে মৌলিক চিন্তা বা স্বাধীন আবিষ্কার কি নাই?

সরকার—জবর প্রশ্ন। জবাব শুন্‌লে বুক ফেটে যাবে। সত্যি কথা, স্বাধীন চিন্তা আর স্বাধীন আবিষ্কার এক হিসাবে খুবই কম। আর এক হিসাবে খুবই বেশী।

লেখক—এ যে হেঁয়ালী। খুলে বুঝিয়ে বলুন।

সরকার—দুনিয়ার সাহিত্যে সব চেয়ে বড় "চোর" শেক্‌স্‌পীয়ার। আবার সেই শেক্‌স্‌পীয়ার দুনিয়ার সেরা নাট্য-শিল্পী।

লেখক—আপনি এমন কথা বল্‌তে সাহস করেন?

সরকার—লোকটা লিখেছে গোটা সাঁইত্রিশ নাটক। তার বোধ হয় একটা গল্পও নিজ মগজ থেকে ঢাল্‌তে পারে নি। প্রায় সব-কয়টা গল্পই "চোরাই মাল"।

লেখক—তা'হলে শেক্‌স্‌পীয়ারকে আবার সেরা নাট্যশিল্পী বল্‌ছেন কেন?

সরকার—তা'সত্ত্বেও ঘটনা সৃষ্টি ক'রেছে অদ্ভুত, অবস্থা তৈরী ক'রেছে অদ্ভুত, চরিত্র খাড়া ক'রেছে অদ্ভুত। জবরদস্ত স্রষ্টা। নাট্যকার ত নাট্যকার শেক্‌স্‌পীয়ার। এই হ'চ্ছে চোরাই মাল, চোর, চুরি ইত্যাদির আসল ব্যাখ্যা।

লেখক—বুঝ্‌তে পারছি না।

সরকার—নিজস্ব কিছু-না-কিছু আছেই। আগে চুরি বা পরস্বাপহরণ তারপর নিজস্ব, অথবা আগে নিজস্ব তারপর পরস্ব। শেক্‌স্‌পীয়ার-বিষয়ক সূত্রটা হচ্ছে আমার

দো-আঁস্‌লামির, বর্ণ-সঙ্করের, দেশী বিদেশী সম্মেলনের ফর্মূলা। পাঁড় অথবা বাঘা বাঘা শিল্পীরা একই সঙ্গে নিজস্ব আর পরস্বের মালিক। চোরকে চোরও বটে, স্বাধীনকে স্বাধীনও বটে।

লেখক—তাহ'লে বর্তমানে ভারতীয় সংস্কৃতির ভেতরও আপনি স্বাধীন সৃষ্টি দেখ্‌তে পান?

সরকার—কে বল্‌লে পাই না? ইয়োরামেরিকান্ প্রভাবটা দেখ্‌তে পাচ্ছি প্রায় সকলের মগজে, হৃদয়ে, হাত পায়ে। কিন্তু এই প্রভাবটা দিয়ে গুণ করাচ্ছি কাকে? নিজস্বকে, স্বাধীন খেয়ালকে, স্বকীয় সৃষ্টিশক্তিকে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে।

লেখক—একটা দৃষ্টান্ত দেবেন?

সরকার—একমাত্র কবিকঙ্কণ, বৈষ্ণব পদাবলী আর উপনিষদ্ খেয়ে-খেয়ে আমাদের রবীন্দ্রনাথ মানুষ কি? রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভেতর শেলী, বায়রণ, ব্রাউনিং, হুইট্‌ম্যান, মায়তালিঙ্ক্, কতটা রসদ জুগিয়েছে? তা ছাড়া স্কট, ডিকেন্স, শ, মোপাসাঁ, গল্‌সোআর্থির প্রভাবই বা কতখানি, শেক্‌স্‌পীয়ারকে চোর বল্‌তে শেখ্। তা হ'লে দুনিয়ার কোনো মিঞাকেই চোর বল্‌তে ভয় পাবি না। আমার বয়েৎ শুন্‌বি?

লেখক—বলুন। আর একটা নতুন-কিছু কানে ঢুকুক।

সরকার—চুরি-বিদ্যা বড়-বিদ্যা যদিও পড়ে ধরা। সাধারণতঃ লোকেরা বলে যে, ধরা না পড়া পর্যন্ত চুরি-বিদ্যা বড় বিদ্যা। "চুরি-বিদ্যা বড়-বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা",—এই হ'ল সার্বজনিক বচন। আর আমি বল্‌ছি উল্টা কথা অথবা চরম কথা। ধরা পড়্‌লেও কোনো ক্ষতি নাই। ধরা-পড়ার পরও চোরটা বীর, জবরদস্ত, বাজখাই, জগদ্‌বরেণ্য।

লেখক—চুরি ধরা পড়ার পরও কোনো শিল্পী জগদ্‌বরেণ্য রয়েছে কি?

সরকার—তা হ'লে আবার শোন্। শেক্‌স্‌পীয়ার ধরা-পড়া চোর। বাঘা-বাঘা লোকগুলো বাজারে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে চোর ব'ল্‌ছে। তবুও হাটুআরা, বাজারীরা ব'ল্‌ছে,—"বাঃ, স্রষ্টা বটে! দুনিয়াখানাকে জুতিয়ে বড় ক'রে দিলে রে। এমন কথা ত আর কেউ বলে নি? এ যে 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'।"

ডিসেম্বর ১৯৪৩

স্পেংলার বনাম সরকার

৩রা ডিসেম্বর ১৯৪৩

হরিদাস—আজ স্পেংলার সম্বন্ধে একটু আলোচনা চালাতে চাই।

সরকার—তোর মাথায় মাঝে মাঝে এক-একটা বাতিক চাগে। এক রাজ্যের লোক থাক্‌তে তুই বেছে নিলি স্পেংলারকে।

লেখক—তিনি কোন্ বিদ্যার পণ্ডিত?

সরকার—সভ্যতা, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে তাঁর লেখা-লেখি চলে। বত্রিশ বিদ্যা, চৌষট্টি কলা,—এসবের খতিয়ান করা তাঁর কারবার। তাঁর বড় বইয়ের

নাম হচ্ছে "ড্যর ভণ্টারগাঙ্ ভেস্ আবেগু লাগুেস।" ইংরেজি তর্জমা,—"পশ্চিমের সূর্যাস্ত" (ডিক্লাইন্ অব দি ওয়েস্ট) অর্থাৎ "পশ্চিমের অবসান।"

লেখক—আমি বইটার নাম অনেকদিন আগেই শুনেছি। বইটা দেখেছিও, পড়্বার চেষ্টাও ক'রেছি, কিন্তু বুঝ্তে পারিনি।

সরকার—বই পেলি কোথায়?

লেখক—পেলাম অধ্যাপক কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে। তাঁর ছেলে কালিদাস। বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক। তিনি দিয়েছিলেন। কালিদাসবাবুর মুখে বইটার খুব প্রশংসা শুনেছি। আচ্ছা, বইটা আমাদের দেশে চলে কেমন? এর প্রভাবই বা ভারতীয় পণ্ডিতমহলে কিরূপ?

সরকার—গোটা ভারতবর্ষের দিকে নজর ফেলেই বল্‌ছি যে, স্পেংলারের ঐ বইয়ে দন্তস্ফুট করার মতন পণ্ডিত এদেশে আছে খুবই কম। কারণ বইটা পড়্তে রীতিমত মেহনৎ লাগে—সময় লাগে। এক-একটা পৃষ্ঠার জন্য সময় দিতে হবে দেড়ঘণ্টা দুঘণ্টা। ছোট হরপে ছাপা। ধৈর্য চাই। পাতাগুলো লম্বা-লম্বা। তারপর মালগুলা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, সুকুমার শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্লেষণ। এই সকল বিশ্লেষণের ভেতর তথ্যের চেয়ে বেশী আছে মত-প্রকাশ।

লেখক—ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা নাই কি?

সরকার—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কথা এক প্রকার নেই বল্‌লেই চলে। ক্বচিৎ-কখনো একটু-আধটু পাটলিপুত্র, কামশাস্ত্র ইত্যাদির উল্লেখ আছে। আমাদের ভারতীয় পাঠকেরা ভারতবর্ষের উল্লেখ না থাক্‌লে কোনো বই সহজে বরদাস্ত কর্‌তে পারে না। এই সকল কারণে স্পেংলার ভারতীয় লিখিয়ে-পড়িয়ে মহলে বোধ হয় অনেক ক্ষেত্রে নামে মাত্র পরিচিত। স্পেংলারের নাম জানে না একথা সহজে কেউ স্বীকার কর্‌তে চাইবে না।

লেখক—বইটা প্রকাশিত হ'য়েছে কতবৎসর পূর্বে?

সরকার—বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্রের ভেতর (১৯১৪-১৮) লেখা প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়,—বোধ হয় ১৯১৭ সালে। বইটা দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২৩-এ প্রকাশিত হয়। যুদ্ধোত্তর জার্মান চিন্তাধারার এক মস্ত-বড় খুঁটা দেখ্‌তে পাই স্পেংলারের বইটার মধ্যে।

লেখক—বইটার মতামতগুলা আপনার কিরকম লাগে?

সরকার—বইয়ের যেটা মোটা সিদ্ধান্ত তাকে দিবারাত্র জুতোচ্ছি।

লেখক—স্পেংলারের সিদ্ধান্তটা কী? দু-এক কথায় বুঁঝিয়ে দেবেন?

সরকার—তাঁর সিদ্ধান্ত হ'চ্ছে যে, গ্রীস যথাসময়ে রোমে পরিণত হয়। অর্থাৎ পল্লী পরিণত হয় শহরে। অর্থাৎ ফুলটা পরিণত হয় ফলে। অর্থাৎ "কুল্‌টুর্" (সংস্কৃতি বা কৃষ্টি) "সিভিলেজেশনে" (সভ্যতায়) পরিণত হয়।

লেখক—এই পরিণতি সম্বন্ধে স্পেংলার-দর্শন কিরূপ?

সরকার—স্পেংলারের বিবেচনায় এই পরিণতির অবস্থাটা মানুষের বা সমাজের পতনের বা অবনতির অবস্থা। এই হ'চ্ছে স্পেংলারের সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্তটা তিনি যুগের পর যুগ ধ'রে প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা ক'রেছেন।

লেখক—আপনার স্পেংলার-সমালোচনাটা পাব কোন্ বইয়ে?

সরকার—নানা বইয়ের নানা জায়গায়ই ছড়িয়ে-ছড়িয়ে আছে। স্পেংলারের সিদ্ধান্তটা

বিশ্লেষণ ক'রেছি পোলিটিক্যাল ফিলজফিজ সিন্স্ ১৯০৫, প্রথম খণ্ডে (মাদ্রাজ, ১৯২৮)। সিদ্ধান্তের সমালোচনা ক'রেছি নানা জায়গায় ছোট-বড়-মাঝারি আকারে। "ভিলেজেস্ অ্যাণ্ড্ টাউনস্ অ্যাজ সোশ্যাল্ প্যাটার্নস্" অর্থাৎ 'পল্লী ও শহরের সামাজিক গড়ন" (কলিকাতা ১৯৪১) বইয়ে পাবি স্পেংলারের বুখ্‌নির প্রতিবাদ। নিজ সিদ্ধান্তের বিস্তৃত বিবরণও সেই সঙ্গে দেওয়া আছে।

লেখক—আপনার নিজ সিদ্ধান্তটা কিরূপ?

সরকার—আমার সিদ্ধান্ত হ'চ্ছে স্পেংলারের ঠিক উল্টো। প্রথমতঃ আমার বিচারে পল্লী যখন শহরে পরিণত হয়, তখন তার পতন হয় না। পল্লীটা উন্নতির এবং শহরটা পতনের সূত্রপাত নয়। আমার বুখ্‌নি হ'চ্ছে নিম্নরূপ। (তোকিও, ২২-৮-১৯১৬) ঃ—

"পল্লী নয় গো গুড় মাখানো, আস্তাকুড় নয় শহরগুলা
রাজধানী নয় সোনায় তৈরি, মফস্বল নয় পায়ের ধূলা।"

দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক জীবনে পল্লী ও শহরের গড়ন একই সঙ্গে থাক্‌তে পারে। তৃতীয়তঃ "সভ্যতা" আর "সংস্কৃতির" ভেতর আমি কোনো তফাৎ করি না। দুটোই আমার বিচারে একার্থক। এ-দুটা শব্দের মারপ্যাঁচ মাত্র। ইত্যাদি ইত্যাদি।

লেখক—আপনার বইও প্রবন্ধগুলা ঘাঁট্‌তে-ঘাঁট্‌তে অতি প্রচলিত কাণ্ট-ফিখ্‌টে-হেগেল-শোপেনহাওয়ার ইত্যাদির নাম ছাড়া আরও কয়েক জন জার্মান দার্শনিকের নামের সঙ্গে পরিচিত হ'য়েছি।

সরকার—কেন? জার্মান ছাড়া আর কোনো জাতের বেপারী কি এই অধমের হাটে সওদা করে না?

লেখক—হাঁ। আনেক নতুন ফরাসী নাম পেয়েছি। নতুন-নতুন ইতালিয়ান নামও পেয়েছি! তা ছাড়া মার্কিণ আর ইংরেজ তো আছেই। এমন কি নতুন-নতুন জাপানী নামের সঙ্গেও পরিচয় ঘ'টেছে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা জার্মান দার্শনিকদেরকে খুব বড় চোখে দেখে। সেইজন্য জার্মান নামগুলার সঙ্গে যোগাযোগ বেশী রেখেছি।

সরকার—কোন্ কোন নামের সঙ্গে?

লেখক—লিস্ট, মাইনেকে, হাউস্‌হোফার, ফোন্‌ভীজে, ক্যেলরয়ট্টার, বুর্গ্-ড্যের্ফার, ফাইহিংগার, ট্যেন্নীস্, ডিল্‌থাই, ভাগেমান, স্পান্, জেবিং, ইত্যাদি।

সরকার—এরা সবাই তোরা যাকে দার্শনিক বলিস্ সেরূপ দার্শনিক নয়। এরা নানা অখ্‌ড়ার বোষ্টম-বৈরাগী।

লেখক—আমাদের দেশে অনেকে আছেন যাঁরা ভারতবর্ষকে বড় কর্‌তে গিয়ে ইয়োরোপকে বর্বর, অসভ্য প্রভৃতি ব'লে ছোট ক'রে থাকেন। কিন্তু আপনার রচনাবলীতে দেখ্‌ছি ঠিক উল্টো। এসব যেমন ভারত-নিষ্ঠ, তেমনি আবার দুনিয়া-নিষ্ঠ, যেমন বর্তমান-নিষ্ঠ তেমনি আবার প্রাচীন-নিষ্ঠ।

সরকার—আরে, ভাই, আমি আহাম্মুকটা হচ্চি হনুমান। যেখানে যা-কিছু দেখি তাই লাগে ভাল। আর তা-ই উপ্‌ড়ে নিয়ে আন্‌তে চাই ভারতবর্ষে। হনুমান যেমন এনেছিল গন্ধমাদন পাহাড়কে।

ভারতবর্ষ, ভারতবাসীর দিগ্বিজয়, এসব নিয়ে আমি রাতদিন মেতে র'য়েছি বটে, কিন্তু ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির যথোচিত তারিফ করাও আমার এক পেশা বা নেশা। পাশ্চাত্য সভ্যতাকে কেউ অনর্থক নিন্দা কর্‌লে চলে তার সঙ্গে "যুদ্ধং দেহি।"

আধুনিক ভারত

লেখক—ভাল কথা, যোগেশ বাগলের "মুক্তির সন্ধানে ভারত' বইটা আপনার পড়া শেষ হলো? কী রকম আপনার মনে হচ্ছে?

সরকার—বেড়ে বই লিখেছে। ভারতীয় শতবর্ষের বিশেষতঃ বাঙালী জাতের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের তথ্য বইটার ভতের জ্বল্-জ্বল্ করছে। সন-তারিখও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক আছে মনে হচ্ছে। বইটা তারিফ-যোগ্য। পড়্বি, বন্ধুদেরও পড়াবি। এই ধরণের আর একটা বই হ'চ্ছে "ভারতের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের খসড়া"। লেখক প্রভাত গাঙ্গুলি। বাঙালীর কাজ-কর্মই প্রধান ঠাঁই পেয়েছে। যে-সব কথা লেখক ব্যক্তিগত হিসাবে বেশী জানে সেই সব কথা বেশী আছে। তাতে পাঠকের উপকার হবে।

লেখক—বই-সমালোচনার নিয়ম কি?

সরকার—প্রথমেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে যে, লেখক বইয়ের ভেতর যা-কিছু ব'লেছে, তার বাইরেও বহু জিনিষ বলার আছে। এই হবে গ্রন্থ-সমালোচনার প্রথম স্বীকার্য। তারপর দেখ্তে হবে বইটার ভেতর গ্রন্থকার যে সব মাল গুঁজেছে তাতে কোনো ভুল-চুক্ আছে কিনা। পাঠকের মতের সঙ্গে না মিল্লেই যে বইটা ফেলিতব্য চিজ্,—তা বুঝায় না। যে-লেখকের বা যে-পাঠকের মগজটা অত্যন্ত ছোট, সে-ই কেবল ব'কে বেড়ায় যে, এর পরে বল্বার আর কিছু নেই।

লেখক—আপনি চরম সত্য ব'লে কোনো-কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন? (২০শে এপ্রিল ১৯৪৩ দ্রষ্টব্য)।

সরকার—কোনো মতেই না। আমার কাছে দুনিয়ার সব-কিছুই আপেক্ষিক। প্রায় সব কটা লোকই হয় কিছু-কিছু কানা না হয় কিছু-কিছু এক-চোখো। দুনিয়ার অনেক জিনিষই প্রত্যেক লোকের নজরে বাদ প'ড়ে যায়। কাজেই প্রত্যেক লেখকের কাছে দুনিয়ার আংশিক সত্যমাত্র পাওয়া যেতে পারে। আর তাতেই পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সত্যের অন্যান্য অংশগুলো হয়তো অন্যান্য লেখক জোগাবে। সংসারে যতগুলি লোক, ততগুলি সত্য, যতগুলি মুড়ো ততগুলা সত্য। সত্য একটা নয়—সত্য বহু, বিচিত্র ধরণের ও বিচিত্র গড়নের। তোরা যখন-তখন সত্যদ্রষ্টা, পূর্ণদৃষ্টি, চরম সত্য প্রভৃতি বড়-বড় শব্দ নিয়ে লাফালাফি করিস্। সেগুলা আমার বিচারে কথার ফুলঝুরি মাত্র। সত্যদ্রষ্টা নয় এমন লোক পৃথিবীতে একজনও নেই। অপরদিকে দশাননী দৃষ্টিভঙ্গীওয়ালা চৌকোস্ লোকও দুনিয়ায় দুর্লভ। (পৃঃ ৩৬৬-৩৬৭)

"উদ্বোধন"-মাসিকের "শ্রীঅরবিন্দ'

লেখক—আধুনিক ভারত-বিষয়ক আর কোনো ঐতিহাসিক রচনা আপনার চোখে পড়েছে?

সরকার—বইয়ের কথা মনে পড়ছে না। একটা প্রবন্ধ পড়্ছি মাসিকে। কয়েক বছর ধ'রে ধারাবাহিক ভাবে বেরুচ্ছে লেখাটা।

লেখক—কোন্ প্রবন্ধ? কার লেখা?

সরকার—"উদ্বোধন"-মাসিকে ছাপা হ'চ্ছে "শ্রীঅরবিন্দ"। লেখকের নাম গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

লেখক—এই প্রবন্ধের বিশেষত্ব কী দেখ্ছেন?

সরকার—অরবিন্দ'র জীবন বৃত্তান্ত লেখা হ'চ্ছে। ফি বছরের ঘটনা গুলা দেখ্তে পাচ্ছি। প্রত্যেক মাসেই লেখক প্রায় বছর খানেকের খবর দিয়ে চ'লেছেন। জীবন-বৃত্তান্ত বা ইতিহাস লিখ্বার এই এক নতুন কায়দা। লেখকের মেহনৎ লাগে প্রচুর। তথ্য-সংগ্রহের আনন্দ আবশ্যক হয় খুবই বেশী। ঐতিহাসিক গবেষণার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নমুনা গিরিজা-শঙ্করের "শ্রীঅরবিন্দ"।

লেখক—আর কোনো বিশেষত্ব আছে?

সরকার—প্রত্যেক বছরকার বাঙালী জাতের বিভিন্ন আন্দোলন বিবৃত হ'চ্ছে। তার সঙ্গে এসে পড়্ছে বিভিন্ন কর্মবীর আর চিন্তাবীরের জীবন-বৃত্তান্ত। হরেক রকমের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান কব্জার ভেতর পাচ্ছি। গোটা বাঙালী জাতের ক্রমবিকাশ ধরা দিচ্ছে অরবিন্দ'র ক্রমবিকাশের আনুষঙ্গিক ভাবে। এই শ্রেণীর রচনা-প্রকাশে বাঙালীর ইজ্জদ বাড়্ছে ঐতিহাসিক গবেষক হিসাবে।

ডিসেম্বর ১৯৪৩

সমালোচনা-সাহিত্য

১০শে ডিসেম্বর ১৯৪৩

সুবোধ ঘোষাল—আপনার "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" দেখ্তে-দেখ্তে সেদিন একটা কথা মনে হচ্ছিল। কয়েকটা বিষয় আলোচনা কর্তে ইচ্ছা কর্ছে। আচ্ছা বলুন তো,—বাঙালী লেখকদের ভেতর সাহিত্য-সমালোচকদের ঠাঁই কিরূপ?

("সৌন্দর্যতত্ত্ব ও সমালোচনা", ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪২)

সরকার—সাহিত্য-সমালোচনার "বই" বাঙালীর হাতে আজকাল বেরুচ্ছে মন্দ নয়। ১৯০৫ সনের বঙ্গ-বিপ্লবের পূর্বে এমন কি ১৯৩০ সনের আগেও "বই" বেশী ছিল না। তবে সাহিত্য-সমালোচনায় বাঙালী জাত চিরকালই হাত দেখিয়ে চ'লেছে। রামমোহনের যুগে যেই সংবাদপত্র সুরু হ'ল অমনি সঙ্গে-সঙ্গে কিঞ্চিৎ-কিছু সাহিত্য-সমালোচনারও সূত্রপাত। সংবাদ-পত্রের সেই ধারা চল্ছে আজও। কবিরাও সমালোচক ছিলেন। সেকালের রঙ্গলাল আর একালের গিরিশ ইত্যাদি অনেক কবিই সমালোচক। তা ছাড়া মাসিক পত্রিকাগুলার ভেতর সাহিত্য-সমালোচনা সর্বদাই উল্লেখযোগ্য আকারে দেখা গিয়েছে। এই ক্ষেত্রের বিশেষত্বশীল মাসিক সেকালের সুরেশ সমাজপতির "সাহিত্য" আর একালের সজনী দাসের "শনিবারের চিঠি"। "বিশেষত্বশীল" মানে গালাগালি কর্তে ওস্তাদ। যারা গাল খায় না তাদের,—অর্থাৎ মামুলি পাঠকদের,—লাগে ভাল। গাল-খেকো লেখকও তাতে কিছু-কিছু দুরস্ত হয়। যারা গালাগালি করে তারা অনেক সময়েই হয়ত গালাগালি কর্তে অধিকারী নয়। যা'ক্, —সেকথা আলাদা।

লেখক—১৯৩০ সনের আগে বাংলায় সাহিত্য-সমালোচনার "বই" ছিল না বল্ছেন কেন?

সরকার—"বেশী" ছিল না বল্‌ছি। আসল কথা, অন্যান্য বিভাগেও "বই"-লেখালেখির কারবার হালের চিজ। যতদূর মনে প'ড়ছে,—সমালোচনার সংসারে সেকালে বঙ্কিম ছিলেন বাদশা আর রবি ছিলেন রাজা। তাঁদের নামডাক সর্বত্র। বিদ্যাসাগরের "শকুন্তলা-তত্ত্ব" সকলেই প'ড়েছে। বুড়ো অক্ষয় সরকার ছাড়া আর কারু লেখা সমালোচনায় "বই" চোখে দেখিনি। দীনেশ সেনের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" (১৮৯৬) আর যোগীন বসুর "মাইকেল"-বইকেও সমালোচনা-সাহিত্যের ভেতর ফেল্‌তে হবে। ব্রজেন শীলের "নিউ এসেজ্ ইন কৃটিসিজ্‌ম্"ও অবশ্য বই। তবে এটার নাম অনেকেই জান্‌তো না। আজও বোধ হয় মাত্র দু'চার জন লোক জানে। এই অধমের হাতে "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" বইয়ের আকারে বেরোয় ১৯১৪ সনে। ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বোধ হয় এইটাই দুনিয়ায় প্রথম গ্রন্থ। তখন শশাঙ্ক সেনের রচনাবলী ("বাণী পন্থাঃ") বেরুচ্ছে মাসিকে। "গৃহস্থ"-পত্রিকায় তাঁর কোনো-কোনো রচনা প্রকাশ ক'রেছিলেন মনে পড়্‌ছে। ব্যস। এই গেল ১৯১৪ সন পর্যন্ত ফিরিস্তি। সত্যি কথা—তখনকার দিনে সাহিত্য-সমালোচনার "বই" এক প্রকার ছিল না বলা চলে। সেকালে ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়ও সমালোচনায় হাত দেখাতেন। তাঁর "কপালকুণ্ডলা-তত্ত্ব" বেরোয় ১৯১৪ সনের পরে।

লেখক—আজকাল সমালোচনার বই অনেক কি?

সরকার—নিশ্চয়ই অনেক। তবে আরও বেশী হওয়া উচিত। ১৯২৫ সনের শেষে দেশে ফির্‌বার পর,—নানা সার্বজনিক-সভায় অতিথি-সভাপতি বা আর-কিছু হ'তে হ'য়েছে। সভায় যাওয়া আসা করা ঠিক যেন অনেকটা পেশা দাঁড়িয়ে গেছে। কাজটা অনেক সময়ই আমার পছন্দসই নয়। কিন্তু মোটের উপর তাতে আমার আত্মিক বা সাংস্কৃতিক লাভ মন্দ হয় নি। দেখেছি অনেককে সাহিত্য ও শিল্পের সমালোচনা-মূলক বক্তৃতা কর্‌তে। আলোচনাসমূহের ভেতর স্বাধীন চিন্তার পরিচয়ও পেয়েছি। এই সব বক্তারা "বইয়ের" লেখক হ'লে বাংলায় সমালোচনার ঘর বেশ পুরু হ'তে পারে। ১৯৩৫ সনের পর কয়েকখানা বই বেরিয়েছে। সে-সব উল্লেখযোগ্য।

লেখক—কোন্ শ্রেণীর বক্তারা সমালোচনায় নাম কর্‌ছেন?

সরকার—কতকগুলা বক্তা খাতির নদারৎ। এই সব ঠোঁটকাটা বক্তা-সমালোচকদের আমি প্রাণে-প্রাণে পছন্দ করি। এরা আমার মাস্‌তুতো ভাই। তা ছাড়া বাংলা দেশের বিভিন্ন কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক আছেন গণ্ডা-গণ্ডা। তাঁদের অনেকেই বেশ-পাকা সাহিত্য-সমালোচক। দরদী সমজদার। রসবিশ্লেষণের শক্তি আছে। ইংরেজির অধ্যাপকদের ভেতরও কেহ-কেহ এই দিকে ওস্তাদ। ক'দিন আগে (১৮ ডিসেম্বর ১৯৪৩) অমিয় চক্রবর্তীর বক্তৃতা হ'লো রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারের তদ্‌বিরে। স্বামী নিত্যস্বরূপানন্দ'র তলবে এই অধমকে সভাপতি হ'তে হ'য়েছিল। অমিয় চক্রবর্তীর মন্তব্যগুলা চিন্তাশীল আর প্রায়শ সমর্থনযোগ্য।

শশাঙ্ক সেনের পরবর্তী সমালোচকগণ

লেখক—একালে সমালোচনার বই লিখেছেন এমন কয়েকজন নাম করবেন?

সরকার—শশাঙ্কমোহন সেনের অন্যতম বই "বঙ্গবাণী" (১৯১৫)। সুপরিচিত বই

"বাণী-মন্দির" (১৯২৮)। মোহিতলাল মজুমদারকে বল্‌বো শশাঙ্ক সেনের পরবর্তী ধাপ। এই হাতে অনেকগুলা সমালোচনার বই বেরিয়েছে। সবই তারিফযোগ্য সাহিত্য। মোহিতলাল সমালোচক মাত্র নন। কবি হিসাবেও বেশ ক্ষমতাশালী লেখক। গাম্ভীর্য আছে। ছন্দের উপর দখল আছে। তবে ইনি লোকপ্রিয় সামলোচক বা কবি কিনা জানি না। আজকাল এসব জিনিষ দলে চলে। মোহিত মজুমদারকে আমি নির্দল ভাবে,—নজরুলের মতন, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতন,—সত্যেন দত্ত'র পরবর্তী যুগের কবি বল্‌তে পারি। দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি-সভায় মজুমদারের একটা প্রবন্ধ শুনেছি—আশুতোষ কলেজে। ভাল লেগেছিল। অবশ্য এটার ঠাঁই সমালোচনা-সাহিত্যে।

লেখক—মোহিত মজুমদার সুপরিচিত কি?

সরকার—যারা লেখা-পড়া করে তাদের নিকট সুপরিচিত নিশ্চয়ই। এঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য" (১৯৩৬) আগাগোড়া প'ড়ে দেখা উচিত সকলেরই। "বিচিত্র কথা" (১৯৪১)ও দেখা ভাল। তা ছাড়া আছে "বিবিধ কথা" (১৯৪১)। এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'চ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাত। বইটা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক।

লেখক—এক কথায় এই সমালোচকের সুরটা বুঝিয়ে দিতে পারেন?

সরকার—মোহিত মজুমদার স্বাদেশিকতার গুণগ্রাহী ও প্রচারক। ১৯০৫-১৪ সনের যুগে আমাদের যে-সুর ছিল ইনি প্রধানতঃ সেই সুরের গায়ক। বাঙালী জাত, ভারতধর্ম, হিন্দুত্ব, বঙ্গীয় বিশেষত্ব ইত্যাদি জাতীয়তার পরিপোষক শব্দ তাঁর আটপৌরে চিজ। এই অধমের "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী" (১৯১৩-১৪) বইয়ের মেজাজ মোহিতের রচনাবলীর ভেতর দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আজকাল অবশ্য এই সুর কোনো-কোনো মহলে পছন্দসই নয়।

লেখক—সেই সকল মহলে কোন্ সুর পছন্দসই?

সরকার—সোশ্যালিজ্‌ম্ বা সমাজতন্ত্রে শ্রেণী-বোধ ও শ্রেণী-লড়াই। তার অতিরিক্ত কমিউনিজ্‌মের সাম্য ধর্ম। জাতীয় বিশেষত্ব, স্বাদেশিকতা ইত্যাদি বুখ্‌নি এই মহলে সেকেলে মাল।

লেখক—আপনি তো মার্ক্‌স্-সাহিত্যের তর্জমাকারী। তা হ'লে মোহিতের রচনাবলী পছন্দ কর্‌ছেন কী ক'রে?

সরকার—তাই তো? এই অধম যে সর্বভুক্ রে। কোনো-কিছুতে বাদ-বিচার নাই। যা পাই তাই খাই। অতিমাত্রায় সুবোধ বালক। কাজেই তথাকথিত "ভারতের বাণী"কে মার্ক্‌স্-সংহিতা দিয়ে গুণ কর্‌তে আট্‌কায় না। তাতে যে মণ্ড তৈরী হয় সেটা হ'চ্ছে বিংশ শতাব্দীর দরকর-মাফিক মনু-স্মৃতি।

লেখক—মোহিতের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কিছু বল্‌বেন?

সরকার—মোহিতকে আমি "সাহিত্য-খোর" বিবেচনা করি। হপ্তায় একদিন যারা পাঁঠা খায় তাদের পাঁঠা খাওয়াটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

লেখক—কাদের পাঁঠা-খাওয়া উল্লেখযোগ্য?

সরকার—যারা রোজই পাঁঠা খায়। তাদেরকে বলি পাঁঠা-খোর।

লেখক—সাহিত্য-খোর বল্‌তে-বল্‌তে পাঁঠা-খোর বল্‌লেন কেন?

সরকার—অন্যান্য সাহিত্য-সমালোচকের জীবনে হাজার কাজকর্মের অন্যতম কাজ হ'চ্ছে সাহিত্যালোচনা। কিন্তু মোহিতের পেশায় সাহিত্য-সমালোচনা ছাড়া আর কিছু

নাই। তাঁর কাব্য-সৃষ্টির কথা বাদ দিয়ে যাচ্ছি। মোহিত সাহিত্য নিয়েই আছে। সকাল-বিকাল, সকল কালই তাঁর হাতে বেরিয়েছে সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ। এই জন্য "প্রাবন্ধিক' মোহিতকে বল্‌ছি সাহিত্য-খোর। "সাহিত্য-কথা" (১৯৩৮) নামক বইটা প'ড়ে দেখা ভাল। তার ভেতর ব্যক্তি, সমাজ, নীতি, শ্লীল-অশ্লীল, স্টাইল ইত্যাদি সাহিত্য-সংক্রান্ত মোহিত-দর্শন পাকড়াও কর্‌তে পার্‌বি সহজে। মোহিত বাস্তবিকই শশাঙ্ক'র পরবর্তী ধাপ।

লেখক—সাহিত্য-সমালোচকদের ভেতর আর কারু নাম কর্‌বেন?

সরকার—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালায়ের আবহাওয়ায় প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস যাঁরা লিখ্‌ছেন তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর সমালোচক সন্দেহ নাই। সুকুমার সেনের নাম শুনেছিস্‌ বোধ হয়? দীনেশ সেনের "বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্য"-বইয়ে যে-ধরণের মাল নাই তার অনেককিছু সুকুমার সেনের রচনাবলীর ভেতর পাবি। বিশ্ববিদ্যালয়ের তদবিরে বইয়ের সংখ্যা আস্তে-আস্তে বেড়ে চ'লেছে। ১৯২৬ সনের গোড়ায় নেহাৎ শৈশবাবস্থা মাত্র দেখেছি। আজ বাংলা-বিভাগের লেখালেখি অনেকটা উল্লেখযোগ্য।

লেখক—অন্যান্য সমালোচনা-বইয়ের কিছু খবর দেবেন?

সরকার—তুই কি ভেবেছিস্‌ আমি কোনো লাইব্রেরিতে চাকরি করি? সব কয়টা বইয়ের আমি সন্ধান রাখি? আচ্ছা বল্‌ছি—আব্দুল ওদুদের "সাহিত্য ও সমাজ", হেমেন দাশগুপ্ত'র "গিরিশ-প্রতিভা", প্রমথ বিশীর "রবীন্দ্রকাব্য-প্রবাহ", সুনীতি চ্যাটার্জির "জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য" হুমায়ুন কবিরের "বাঙলার কাব্য", নীহার রায়ের "রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভূমিকা", প্রমথ পালের "শরৎ-সাহিত্যে নারী" আর নন্দলাল সেনগুপ্তর "শতাব্দী ও সাহিত্য"। আবু সয়ীদ আইয়ুব আর হীরেন মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত "আধুনিক বাংলা কবিতা" বইয়ে (১৯৪০) দু-জনের দুটা ভূমিকা আছে। দুটাই সমালোচনার অন্তর্গত। এই সবের সঙ্গে ছোঁয়া-ছুঁয়ি চালাবি। সব বই হালের বছর আট দশেকের মাল। ক'দিন হ'লো হাতে এসে পৌঁছেছে বিমলচন্দ্র সিংহ-প্রণীত "সমাজ ও সাহিত্য" (১৯৩১) বিলকুল তাজা। এই দ্যাখ্‌।

লেখক—এই সকল বইয়ের মন্তব্যগুলা আপনার কেমন লাগে?

সরকার—সমালোচনা সাহিত্যকে আমি দর্শন-সাহিত্যের অন্তর্গত সমঝে থাকি। প্রত্যেক প্রাবন্ধিকের বা সমালোচকের দৃষ্টি-ভঙ্গী স্বতন্ত্র। সব-কটা দৃষ্টি-ভঙ্গীই আমার ভাল লাগে। আমার দৃষ্টি-ভঙ্গী, বিচার প্রণালী ও মন্তব্য হয়ত আলাদা। কিন্তু তাতে যায় আসে না। এই অধমের পেটে সবই হজম হয়। কপালের জোর,—পেটের অসুখের জন্য কখনো ডাক্তার ডাক্‌তে হয় নি। সেকালের "রবীন্দ্র-সাহিত্যে ভারতের বাণী", উদীয়মান বঙ্গ-সাহিত্য" (১৯১৪), "ল্যভ ইন হিন্দু লিট্‌রেচার" (১৯১৬), "হিন্দু আর্ট ইটস্‌ হিউম্যানিজম্‌ অ্যাণ্ড মডার্ণিজম"(১৯২০) আর "এস্‌থেটিক্‌স অব ইয়ং ইণ্ডিয়া" (১৯২২) হ'তে আজ পর্য্যন্ত নানা রসের কারবার চালাচ্ছি। অনেকেই এসব কিছু-কিছু চেখে দেখেছে। মাঝে-মাঝে খবর পাই পাঠকদের কাছ থেকে।

মার্ক্‌স্‌-পন্থী সমালোচনা

লেখক—এই সকল সমালোচনা-বইয়ের কোনো-নতুন বিশেষত্ব লক্ষ্য করছেন?

সরকার—হাঁ। নতুনের ভেতর দেখ্‌তে পাচ্ছি সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যাখ্যা। কোনো-কোনো ব্যাখ্যা পুরাপুরি মার্ক্‌সিস্ট,—কোনো-কোনোটা আধা-মার্ক্‌সিস্ট। এই চেষ্টাটা আমার পছন্দ-সই। সেকাল-একালে এই ধরণের মাল নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটি ক'রেছিও। তবে লেখকদের সিদ্ধান্তগুলার সঙ্গে আমার মিল হওয়া অনেক সময়েই কঠিন। গোপাল হালদারের "সংস্কৃতির রূপান্তর" (১৯৪১) পড়েছিস্‌ বোধ হয়? তার ভেতর পাবি এই অধমের "ধনদৌলতের রূপান্তর"-বইয়ের সুর। বিমল সিংহ'র রচনা খানিকটা এই সুরে গাঁথা। বিমলের নজর রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিকাল বেলাটার উপর বেশী। "সমাজ ও সাহিত্য" ইত্যাদি বই প্রাবন্ধিক মোহিত মজুমদারের রচনাবলীর পরবর্তী ধাপ।

লেখক—এই সকল রচনায় সাহিত্যই বা কতখানি আর সমাজই বা কতখানি?

সরকার—ভাল প্রশ্ন। বস্তুতঃ এই সমালোচনা-প্রণালীতে সাহিত্য ও শিল্প অনেক সময় চাপা প'ড়ে যায়। সকল সমালোচকই ষোল আনা শ্রেণী-সংগ্রাম-পন্থী মার্ক্‌সিস্ট নয়। তবে দেশের আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ভাঙা-গড়ার কথা বেশী থাকে এই সকল সমালোচনায়। ১৯১৫-১৬ সনে বিশ্ব সাহিত্য সামালোচনা উপলক্ষে এ সব কথা বলেছি। 'ইয়াঙ্কিস্থান বা অতি-রঞ্জিত ইয়োরোপ" বই ("বর্তমান জগৎ" গ্রন্থাবলীর চতুর্থ-খণ্ড, ১৯২২) দেখতে পারিস্‌। যাহ'ক গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, হুমায়ুন কবির, বিমল সিংহ ইত্যাদি লেখকদের রচনাগুলা মূল্যবান্‌। এই সবের দৌলতে বাঙালীর মাথা পরিষ্কার হ'তে বাধ্য। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের উপর নয়া-নয়া আলো এসে জুটবে। ১৯১৪ সনে বিলাত-প্রবাসের সময় দস্তয়েব্‌স্‌কি আর তুর্গেণেভ সম্বন্ধে "গৃহস্থ"-মাসিকে আলোচনার ব্যবস্থা করি। তাতে সাহিত্যে সমাজের ঠাঁই-বিশ্লেষণ ছিল।

লেখক—বিনয় ঘোষ-প্রণীত কোন্‌ বইয়ের কথা বল্‌ছেন?

সরকার—"শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ"। এই বইটা দুই-খণ্ডে বেরিয়েছে (১৯৪০)। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম "নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা*। গোপাল হালদারের বইয়ের চেয়ে এই বই দু'টায় সাহিত্যের মাল বেশী পাবি। মোটের উপর এই রচনা হচ্ছে বিদেশী মালের তর্জমা বা চুম্বক। ঘটনাচক্রে এই ধরণের তর্জমা ও সার-সংগ্রহ খুবই পছন্দ করি। এই বইয়ে মার্ক্‌স্‌-লেনিন-পন্থী ইংরেজি ব্যাখ্যাগুলা বাঙালীর পাতে পরিবেষণ করা হ'য়েছে। পরকীয় মতের উপর স্বাধীন মগজ বেশী ক্ষমতা দেখাতে পারেনি। তবে চেষ্টা আছে, সাধনা আছে। এই সাধনা তারিফ-যোগ্য। কিন্তু রচনার ভেতর ইংরেজি বাক্যের ছড়াছড়ি বড্ড বেশী। বই দু'টার অন্যতম প্রধান দোষ এইখানে। বাংলা বইয়ে আমি ইংরেজি পছন্দ করি না। সেকালের বইয়ে মাঝে-মাঝে ইংরেজি বুখ্‌নি থাক্‌তো।* সেসব একালে বর্জন ক'রেছি।

* "ইয়াঙ্কিস্থান" বইটার ভেতর দেখ্‌ছি প্রকাশকেরা ইংরেজি বাক্যগুলার বাংলা তর্জমা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তর্জমায় ভুল আছে বেশ। বই যখন বেরোয় আমি তখন বিদেশে।

লেখক—তর্জমা বা পরকীয় মতের চুম্বক-প্রচারককেও আপনি প্রশংসা করেন? তার ভেতরও সাধনা দেখ্‌ছেন?

সরকার—নিশ্চয়। তর্জমা-সাহিত্যের জন্য আমি জন্মাবধি প্রচার চালাচ্ছি। এই উদ্দেশ্যে সেকালে সাহিত্য-পরিষদের হাতে একটা ধন-ভাণ্ডারও কায়েম কর্‌তে ছাড়িনি (১৯১৩)। সেই ধন-ভাণ্ডারের তদ্‌বিরে একটা তর্জমা-বই বেরিয়েছে। রিপন কলেজের প্রিন্সিপাল, আমাদের ডন সোসাইটির গুরুভাই, রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষকে জান্‌তিস্‌ বোধ হয়? সেদিন মারা গেছেন (৬ ডিসেম্বর)। তাঁর "ইয়োরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস"-বইটা সাহিত্য-পরিষদের সেই বই। এটা ফরাসী রাষ্ট্রবীর গীজো-প্রণীত বইয়ের ইংরেজি তর্জমার বাংলার তর্জমা।

লেখক—আপনি নিজে কখনো তর্জমা-সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছেন?

সরকার—অনেকগুলা তর্জমা এই অধমের হাতে বেরিয়েছে। প্রথম হচ্ছে মার্কিণ বুকার ওয়াশিংটনের বই। নাম দিয়েছি "নিগ্রোজাতির কর্মবীর"। দ্বিতীয় জার্মান ফ্রীড্‌রিশ্‌ লিস্ট-প্রণীত বই। এটাকেও দাঁড় করিয়েছি "স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি" নামে। তৃতীয় বই হ'চ্ছে কমিউনিস্টদের বাইবেল-কোরাণ-গীতা। জার্মাণ মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেল্‌সের লেখা বই। "পরিবার, গোষ্ঠী ও রাষ্ট্র"রূপে সেটা বাংলায় দেখা দিয়েছে এই কলমেরই আগায়। আর একখানা কমিউনিস্ট গীতার নাম দিয়েছি "ধন-দৌলতের রূপান্তর"। ফরাসী সাম্যবাদী লাফার্গের বই। তাও এই অধমের তর্জমা। তা ছাড়া আছে রুশ-রাষ্ট্রবীর বোল্‌শেভিক নেতা ট্রট্‌স্‌কির জার্মান বই। তাও বেরিয়েছে এই হাতে "নবীন-রুশিয়ার জীবন-প্রভাত" নামে। অধিকন্তু আছে সংস্কৃত শুক্রনীতির ইংরেজি তর্জমা।

লেখক—আপনি গোপাল ইত্যাদি লেখকদের মার্ক্‌স্‌-লেনিন-পন্থী সাহিত্য-সমালোচনা, শিল্প-সমালোচনা ও সংস্কৃতি-সমালোচনা পছন্দ করেন?

সরকার—কেন কর্‌বো না? আগেই বলেছি। মার্ক্‌স্‌-প্রচারিত দু'খানা গীতা-কোরাণ-বাইবেল এই অধমের হাতে বাংলায় আত্মপ্রকাশ করেছে। সে ১৯২৩-২৬ সনের কথা। ১৯২৫ সন পর্যন্ত আমি বিদেশে। বই দুটা বাজারে চলেছেও বেশ। যবক বাঙলা তাজা-তাজা নয়া চিন্তা গিল্‌বার জন্য ওৎ পেতে ব'সে ছিল। এই অধমের লেখাগুলা মাসিকে বা সাপ্তাহিকে বেরুতো ১৯২৩-৩০ সনের "প্রগতি-পন্থী"রা সেই সবে ছোঁ মার্‌তো অতি সজোরে। দোকানদারেরা এই সব খবর দিয়েছে। আজকাল মার্ক্‌স্‌-লেনিন-পন্থী সমালোচনা-সাহিত্যের বাংলা বইগুলা বেরুচ্ছে বোধ হয় ১৯৩৫ সনের পরবর্তীকালে। সে-সবের সঙ্গে আমার হামদর্দি ষোল আনা। লেনিনকে আমি বিংশ শাতাব্দির যুগাবতার বল্‌ছি ১৯১৭-১৮ সন থেকে। তখন আমি আমেরিকায়। ("বাংলায় সোশ্যালিজম্‌ নিষ্ঠা" ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪২)।

লেখক—কেন? হামদর্দির কারণ কী?

সরকার—যদি কাণ্ট-হেগেলের প্রচার চল্‌তে পারে তাহ'লে মার্ক্‌স্‌-লেনিনের প্রচার চল্‌বে না কেন? ভারতের সমালোচক-মহলে অথবা ইস্কুলের আবহাওয়ায় এতদিন ছিল ম্যাথিউ আর্ণল্‌ড্‌, ডাউডেন আর সেইণ্টস্‌বেরি এই তিন ইংরেজ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের একচেটিয়া পশার। কাজেস মার্ক্‌স্‌-লেনিনকে কিছুদিন দুধ-কলা দিতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। অধিকন্তু ফরাসী তেইন ও শেরারের তর্জমা-চুম্বক কিছু কিছু চস্‌তো ভারতীয় পত্রিকার বাজারে বাজারে। চলুক না মার্কস্‌-লেনিনের তর্জমা-চুম্বক এক-আধ যুগ। ক্ষতি

কী? ভরত-বিশ্বনাথের রস-বিশ্লেষণে যাদের মগজ বা হৃদয় কুপিত হয় না তারা মার্কস্-লেনিনের রস-বিশ্লেষণে ব্যতিব্যস্ত হবে কেন? মায় আরিস্ততলের "কাথার্সিস্" জোলাপেও দেখ্‌ছি একালের বাঙালী রসজ্ঞ ও রসিকদের মেজাজ বেশ শরীফই থাকে। তা হ'লে কড্‌ওয়েলের ডোজ দেড়েক কড্‌লিভার তেল গিল্‌লে তাদের পেট গরম হবার কথা নয়।

নির্ঘণ্ট

অখিল চক্রবর্তী ১৬৮
অক্ষয় দত্ত ১৬০, ১৬২
অক্ষয় মৈত্র ১৫৯
অক্ষয় সরকার ৯৯, ১০০, ১০২, ৪৫১
অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ১০৮
অজিত চক্রবর্তী ২০২, ৩৭১
অডেন ৪২১
অতুল গুপ্ত ৫২, ৫৭, ৭০, ১০৩, ১১৫, ২৫৬
অতুল বসু ২৭৪, ৪০৪
অনিল চ্যাটার্জি ২৭৪
অন্নদাশঙ্কর রায় ১০৮, ২৩৬, ২৭৬,
অভিনব গুপ্ত ৫৭
অভেদানন্দ ৪৩-৪৮, ৬৭. ৭৩-৭৬, ৭৭, ৮০, ১১৭, ১১৮, ১২১, ১২৪, ১২৭, ১৩৯, ১৪৪, ১৬৬, ১৮১, ২২৪, ৪৪৪
অমর রায় ২৫৬
অমিয় চক্রবর্তী ৪০৫, ৪৫১
অমূল্য উকিল ২৭৪
অমূল্য বিদ্যাভূষণ ১৫৮, ২৪০
অম্বিকা উকিল ১১৯, ১৩১, ১৬৯, ২০৪-২০৫, ২১১, ২৬৪, ২৬৮, ২৮৪-২৮৬, ৩৬২
অরবিন্দ ৪৫, ৬৩-৬৮, ৮৬, ৯২, ১০৬, ১১৩, ১১৬, ১১৮-১২০, ১৯৫, ১৯৭, ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮,-২২০, ২২৩, ২৩০, ২৬৪, ২৭৮, ৩০৯, ৩৬২, ৪০৫, ৪২৩, ৪৪৪, ৪৪৯, ৪৫০,
অর্ধেন্দ্র গাঙ্গুলী ৬৯
অবনী মুখোপাধ্যায় ৩১৯
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২০৮, ২৭৪, ৪৪০-৪৪১
অব্যক্তানন্দ ১২৪
অশোকানন্দ ১২৪
অশ্বিনীকুমার দত্ত ১০৬, ১৮০. ২০৬, ২৬৪, ২৮০-২৮৬, ৪০৯
অহীন চ্যাটার্জি ২৬১
আকবর ৭১, ১৩৪, ৩৫৩
আজীজ ৪০৯
আনন্দমোহন বসু ২৬৪
আনন্দবর্ধন ৫৭
আমানুল্লাহ ৪১০
আর্নল্ড ৪৫৫
আর্যভট ৩৩৩
আরিস্টটল ৯২, ১২০, ২২৯,
আলেকজাণ্ডার ৫১, ৫৫, ৫৮, ৮৫, ১০২.
আবু সয়ীদ আইয়ুব ৪০৫, ৪২০, ৪৫৩
আব্দুল ওদুদ ৫৪, ২৮০, ৩৭২, ৩৯২, ৪৫৩
আব্দুল কাদির ১০৮, ৪০৫
আব্দুল রাউফ ১০৮
আব্দুল রসুল ১০৬, ২১১, ২১৩
আশুতোষ চৌধুরী ২১১, ২১৩, ৩৯
আশুতোষ ৪৬, ১০৫, ১৭২, ২২১-২২৩, ২৩৬, ২৪০, ২৬৪
আহম্মদ ৩৮৮
ইক্‌বাল ১১৭
ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭২
ঈট্‌স্ ৩৬৪, ৩৬৬
ঈভ-গিয়ো ১৩১
ঈস্কিলস্ ৩৬৮

উগো (হুগো) ৩২৯, ৩৭৯, ৩৮০
উদয়শঙ্কর ২৩৮, ৪০৪
উমেশ গুপ্ত ২০৯
এঙ্গেল্‌স্‌ ৪৮, ৪৫৫
এমেরী ৮৭
এলিঅট ৩০৬, ৪২১
এব্‌নে গোলাম নবী ১০৮
ওয়াজিদ্‌ আলি ১১৭
ওয়েবার ৩৩২
কড়্‌ওয়েল ৪৫৬
কঁৎ ৬৮, ৭৭, ৮০, ৮৭, ৯২, , .
৩৬১
কঁদর্সে ৩৬৭
কনফুশিয়াস ১১৭
করুণা ব্যানার্জি ৩৯৩, ৩৯৫, ৩৯৯
কাকাসু ওকাকুরা ২০৮
কান্ট ৫৫, ৫৮, ৬৭, ৬৮, ৭৬, ৭৮,
৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৬, ৮৮, ৯২-৯৫,
১১৭, ১২০, ২২৪, ২২৯, ৩৬২,
৪৪৫, ৪৪৮
কামাখ্যা বসু ২৫১
কামাল (কেমাল) পাশা ২৬৭, ২৮০
কায়কোবাদ ৩৮৮
কার্লাইল ৬৮, ৮০, ৯৪, ১৭৮, ১৮১,
১৮২, ৩৬১
কালিদাস ৪৯, ৬৯, ৯৩, ২৬২, ৩৩৩,
৩৭৪, ৩৭৮
কালিদাস ভট্টাচার্য ৪৪৭
কালিদাস রায় ৩৯৫, ৩৯৯
কিশোরী গুপ্ত ১৮৬, ২১৪
কীট্‌স্‌ ৩৭৮, ৪২৩
কুদ্‌রতি খোদা ২৬২
কুমুদ চৌধুরী ৩৯১
কুমুদ মল্লিক ৩৯৫, ৩৯৯
কুমুদ লাহিড়ী ১৫৯, ৩৯৫, ৩৯৯
কৃপ্‌স্‌ ২৭৪
কৃষ্ণ ১১৭
কৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৫২, ৬১, ৭৮-৮০, ৮৪-
৮৬, ৯২, ৯৫, ১১৫, ১১৮, ১১৯,
১২১, ৪৪৭
কৃষ্ণ মিত্র ১০৬, ২০৭, ২০৯, ২৬৪
কৃষ্ণদাস লাহা ১৯১, ২০৮
কৃষ্ণ সরকার ২০৪
কেমাল (কামাল পাশা) ২৯৬
কেশব গুপ্ত ১০৩
কেশব সেন ২৫৪
কেয়ার্ড ৯০
কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী ১১৫, ১১৬
কৌটিল্য ৪৯, ৮৪, ১১৩, ১৩৬, ২৮৯
কোল্‌রয়ট্রার ৯৬, ৪৪৮
ক্রচে ৫১, ৩৬৭
ক্লাইভ ৩৬১
ক্ষিতি মুখোপাধ্যায় ৩৪৮-৩৬৪
ক্ষিতীশ রায় ৪০৫
ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ ২০৮, ৩৯১
খগেন দাশগুপ্ত ১৬৮
গগন ঠাকুর ২০৮
গম্‌ ৩০৫
গল্‌সোআর্থি ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৮৫, ৪৪৬
গান্ধি ৮৭, ১৬৮, ১৭১, ১৭৭, ২৫৭,
২৬৩, ৪০৩, ৪৪২
গিবিজা রায়চৌধুরী ৪৫০
গিরিশ ঘোষ ২০৮, ৩৮৫, ৩৯১, ৪১১,
৪২১, ৪৫০, ৪৫৩
গিয়ের্কে ৭৭
গীজো ৪৫৫
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯, ১৮১,
২১১-১৩, ২২১, ২৪০, ২৬৪, ৩২৮
গুরুসদয় দত্ত ২৩৫-৩৯, ২৪১, ২৪৪
গোপালদাস চৌধুরী ১৩২
গোপাল হালদার ৩৮৬, ৪৫৪-৫৫
গোপেশ পাল ৪০৫
গোল্ড্‌ন্‌ভাইজার ১৭০, ৩০৫
গোলাম আলি চাগলা ৩৪১
গোলাম হোসেন ৩৬৩
গোবিন্দ দাস ১৫২, ৪১২, ৪২৪,

গ্যেটে ৮১, ৯৩, ৯৪, ২৮০, ৩২৯, ৩৬৬, ৩৮০, ৩৮৫, ৪১১, ৪২৩
গ্রীণ ৭৮, ৮৭, ৯০
চণ্ডীদাস ৩৫৯, ৩৮৭
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ৭১, ১৩৪, ৩৫২
চন্দ্র ভাদুড়ী ২৫৬
চরক ৪৯, ৩৩৩
চার্চিল ৮৭, ২৭০
চারু দত্ত ১৯৬
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৭
চিত্তরঞ্জন দাশ ১০৬, ১৩১, ২০৯, ২২০, ২৯৯, ৪০৫, ৪০৯
চেজ্ (স্টুয়ার্ট্) ২৭৯
চেম্বার্স ২৪০
চেল্‌ম্‌স্‌ফোর্ড ২৭৭
চৈতন্য ৩৬২, ৩৭৪
জগ্‌লুল ৪১০
জগৎ সিং ৩৩৮, ৩৮২
জগদিন্দ্রনারায়ণ রায় ৩৭১
জগদীশচন্দ্র ৫৩, ১৯৮, ২৩১. ২৩৬, ২৫৫-৬৪, ২৮৫, ৩৬২, ৪৪০-৪৪২
জগদীশ চট্টোপাধ্যায় ১১৫
জলধর সেন ১৫৯, ৩৩৬
জসিমুদ্দিন ১০৮, ৪০৫, ৪১৯, ৪২১
জাকারিয়া ৩৯২
জানসেদ মেতা ৩৪২
জানকীনাথ রায় ২০৭
জারাথুস্ট্রা ১১৭
জাহাঙ্গীর ৪১২
জিতেন দত্ত ২৬১
জুন্নারকার ৩৪১
জেফার্সন ৩২৩
জেম্‌স্ ৭৮, ১৪০, ১৪৩
জেরিং ৯৬, ৪৪৮
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ২৮২, ২৫৪
জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ ২৬২
জ্ঞানেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৬২
জ্ঞানেন্দ্র রায় ২৬২
জ্যোতিষ ঘোষ ৩৭৬
টমাস (নর্‌ম্যান) ২৭৯
টলস্টয় ৭৮
টাফ্‌ট্‌স্ ৩৩২
টেনিসন ৪১১
ট্যেন্নীস্ ৯৬, ৪৪৮
ট্রট্‌স্‌কি ২৬৮, ৪৫৫
ট্রাক্‌ল ৪১৯
ডাউডেন ৪৫৫
ডিকেন্স ৪৪৬
ডিভ্যালেরা ৩৬৬
ডিল্‌থাই ৫১, ৫২, ৯৬, ৪৪৮
ডুয়ী ৫১, ৫২, ৫৮
ড্যেব্‌লিন ৪১৯
তারক দাশ ১৬৮, ১৯৭, ৩৬৬
তারক পালিত ২১১, ২১৩. ২১৪, ২৫৪
তারক মুখোপাধ্যায় ১৩২
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৪, ২৭৬, ৩৬৮
তুর্গেনেভ ৪৫৪
তুলসী গোস্বামী ১৩২
তেইন ৩৯০, ৪৫৫
দবিরুদ্দিন আহম্মদ ২৫৬
দস্তয়েব্‌স্কি ১০৮, ৩৬২, ৪৫৪
দান্তে ৯৯, ২৬৮, ৩৬১, ৩৬৭, ৩৯০, ৩৯১, ৪১১
দাশরথি রায় ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৫৭
দিলীপ রায় ৩৯১-৩৯৩, ৪০৪, ৪০৯, ৪১২, ৪১৯, ৪২০
দীনেশ সেন ১৫৯, ১৮৩, ২৪০, ২৮৪-২৮৮, ৩৮৬, ৪৫১, ৪৫৩
দীপঙ্কর ৩৬৩
দুগুই ৭৭
দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ১৮৩
দেল্‌ভেক্কো ৫১, ৫২, ৫৮, ৩৪৯
দেবপ্রসাদ ঘোষ ২৬১
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ২১১

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ২২০
দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী ৪০৫
দেবেন বসু ২৬৩
দোদে ১০৮
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৬৯, ১৫৯, ২০৮, ২৩৬, ২৮৭, ৩৮৫, ৪০৮, ৪২১-৪২৩, ৪৫২
ধর্মপাল ৩৬২
ধর্মানন্দ কোসাম্বি ২১৭, ২১৮
ধাল্মা ৩৪১
ধীরেন চক্রবর্তী ২৬২
ধীরেন দত্ত ১১৫
ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় ৩৯২
নওরোজি (হাতেম) ৩৯২
নগেন ঘোষ ১৮২, ১৮৩
নগেন চৌধুরী ২৪০
নগেন নাগ ২৬৩
নগেন রক্ষিত ২১৭, ২১৮
নগেন বসু ১৫৯, ২৪০
নজরুল ইস্‌লাম ১০৮, ২৭৬, ৩৮৮, ৩৯১, ৪০৮, ৪৫২
নন্দলাল বসু ২৭৪
নন্দলাল সেনগুপ্ত ৪৫৩
নরেন খাঁ ২০৫, ২০৬, ২৩৪
নরেন দেব ৪০৫
নরেন ভট্টাচার্য (মানব রায়) ২৫১
নরেন লাহা ১০২, ১৩২, ২০৮, ৩১০
নরেন সেনগুপ্ত ৯৫
নরেশ ঘোষ ১৮৬, ২৫৬
নরেশ সেনগুপ্ত ১০৩
নলিনী রায়চৌধুরী ১৩২
নলিনী ব্রহ্ম ১১৬
নলিনাক্ষ দত্ত ১১৬
নলিনী পণ্ডিত ৩৩৬
নবীন সেন ৬৪, ৬৯, ২৪৬, ২৬৪, ৩৬২, ৩৯১, ৪১১, ৪১৯, ৪২১
নিউটন ৩৬৬
নিখিল মৈত্র ৮৯
নিখিলানন্দ ১২৪
নিত্যস্বরূপানন্দ ১৪৬, ৪৫১
নির্লেপানন্দ ১২৭
নিবেদিতা ৬৩, ১৮৩, ১৯৬, ১৯৮, ২৫৭
নীট্‌শে ৭৮
নীলকণ্ঠ ৩৯৪, ৩৯৬, ৩৯৭
নীলকণ্ঠ গোস্বামী ৯৪, ১৮২, ১৮৩
নীলরতন ধর ২৬২
নীলরতন সরকার ২০৫, ২১১, ২১৩, ২৬৪
নীহার রায় ১৩৯, ৩৭২, ৪২৪, ৪৫৩
নুরজাহান ৪১২
নেপোলিয়ন ৩২১, ৩৬৮, ৪১১,
নোবেল ২৫৮, ৩৬৪, ৩৭২, ৪৪০
পঙ্কজ মল্লিক ৩৯৩
পঙ্কজ মুখোপাধ্যায় ২৫১
পঞ্চানন নিয়োগী ২৬২
পবিত্র দত্ত ২৬১
পাউলসেন ৪৪
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯
পাণিনি ৪৯, ৩৩৩
পার্শরাম ৩৪১
পিথাগোরাস ২২৯
পুণ্যানন্দ ৩৩৮
পুলিন দাশ ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮
প্রদোষ দাশগুপ্ত ৪০৪
পোপোৎলাল শা ১৮৫
প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ২৭৪
প্রফুল্লচন্দ্র রায় ৫১, ৫৩, ২৩৬, ২৫৫-২৬৩, ৩৬২, ৪৪০-৪৪২
প্রফুল্ল বিশ্বাস ২৫১
প্রফুল্ল সরকার ১০৮, ১৮৬
প্রবোধ সান্যাল ১০৮
প্রভাত গাঙ্গুলি ৪৪৯
প্রভাত মুখোপাধ্যায় (গাল্পিক) ৩৯৫, ৪১২

প্রভাত মুখোপাধ্যায় ৩৭২, ৩৭৫, ৪২৫
প্রমথ চৌধুরী ১০৭, ৩৯১
প্রমথ বিশী ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৮, ৩৮১-৩৮৪, ৪২৫, ৪৫৩
প্রশান্ত মহালানবিশ ২৬৩
প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ২১১, ২১৩, ২৬৪
প্রেমেন মিত্র ১০৮, ৩৬৮, ৪০৫, ৪১৯-৪২১
প্লটিনুস ২২৯
প্লেটো ৮৪, ৯২, ১২০, ২২৯, ২৮৮
ফজলল হক ৩৯২
ফণী বসু ১৩৯
ফাইহিঙ্গার ৫১, ৫৫, ৫৮, ৯৬, ২২৯, ৪৪৮
ফিখ্‌টে ৬৮, ৭৮, ৯৪, ৯৫, ১২০, ২২৯, ৩৬২, ৪৪৮
ফিগিস্‌ ৭৭
ফোন্‌ ভীজে ৮৯, ৯৫, ৯৬, ৪৪৮
ফোণ্টানে ১০৮
ফ্রয়েড ৭০, ৮০, ৮৪, ৯৫, ৯৬, ১০৭, ১৭০, ২২৯, ৪২৫, ৪২৮, ৪২৯
ফ্রাঁস্‌ ১০৮, ২৯৫, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭১
ভবানী লাহা ২০৮, ২৭৪
ভরত ৪৫৬
ভাগবৎ ৩৪১
ভাগেমান ৯৬, ৪৪৮
ভার্জিল ৯৯, ২৬৮, ৪১১
ভিক্টোরিয়া ৩৬১
ভূদেব ৩২৮, ৩৯১
ভূপেন দত্ত ৪৪, ৪৬, ৯৫, ১৬৮, ২৫৪-২৫৫
ভের্ফেল ৪১৯
মণি গাঙ্গুলি ৩৭১, ৩৯৫
মণীন্দ্র নন্দী ১৯১, ২০৫, ২০৬, ২১২, ২৩৪
মতি ঘোষ ১০৬, ১৮১, ২০৭, ২১২, ২১৩, ৩০৯
মতি রায় ৩৯৪
মদনমোহন মালবীয় ৩০৬
মধুসূদন ৩৬১, ৩৮৯, ৩৯১, ৪১১, ৪১২, ৪২১, ৪৫১
মন্‌রো ১৪৪, ১৪৫
মন্‌সুর ৩৯২
মনু ৪৯, ৮৪, ১১৩, ১৩৬, ৩৮৮, ৪৫২
মনোমোহন ভট্টাচার্য ১৬৯, ২১১, ২৬৮
মনোরঞ্জন গুহ ১৮০, ২০৭, ২৬৪
মনোরঞ্জন মৈত্র ৫২, ২৫৬
মনোরঞ্জন হাজরা ১০৮
মণ্টেগু ২৭৭
মন্মথ রায় ১০৮
মন্মথ সরকার ২৫১
মর্লে ২৭৭
মলিয়েয়ার ১০৮
মহম্মদ ৩৮৮
মহাদেও রাণাডে ২০৫
মহাবীর ৩৮৮
মহেন্দ্র সরকার ১১৬
মাইনেকে ৮৯, ৯৫, ৯৬, ৪৪৮
মাক্যাভেল্লি ২৮৯
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৮, ২৭৬
মাৎসিনি ৪৬, ২৬৮, ৩৩৬, ৩৬২
মাধবানন্দ ১১৮, ১২৬, ১২৮
মান্‌ৎসোনি ১০৮
মানব রায় (নরেন ভট্টাচার্য) ২৫১-২৫২
মায়তার্লিঙ্ক ৪৪৬
মার্ক্‌স্‌ ৪৬, ৪৮, ৭৬, ৮০, ৮৪, ৮৬, ৯২, ৯৫, ১৭৪, ২৪৭-২৫৩, ২৯৫, ২৯৭, ৩৩৫, ৪৪৪-৪৪৬, ৩৬২, ৩৯০, ৪১৩, ৪৫২-৪৫৫
মার্লো ৪২৩
মিণ্টো ২৭৭
মিল ৭৮, ৮৪, ১৭৮, ১৮২, ৩৬২, ৪৪৪, ৪৪৫
মিল্টন ৩৬১, ৩৩৮-৩৬৯, ৩৮০, ৪১১, ৪৩৬

মুইয়ারহেড ৬০, ৮০, ৮৮, ১১৩, ১২১
মুকুন্দ চক্রবর্তী ২৬১
মুকুল দে ২৭৪, ৪০৪
মুজঃফর আহ্‌ম্মদ ২৫২
মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১, ১১৭
মুসলিনি ৩১১
মেঘনাদ সাহা ২৬২, ২৬৩
মোপাসাঁ ৪৪৬
মোহিতলাল ১০৮, ৩৭৩, ৪০৫, ৪১২, ৪২০, ৪৫২-৪৫৩, ৪৫৪
মোক্ষদা সামাধ্যায়ী ১৯৪, ২২১
ম্যাক্-টাগার্ট্ ৯০
ম্যাক্স্-ম্যিলার ৬১
ম্যারট্ ৩৮৫
যতীন বাগ্‌চি ৩৭১, ৩৯৩, ৩৯৪
যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ১৬২
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ৪০৫
যতীশ্বরানন্দ ১২৪
যদুনাথ রায় ২০৭
যদুনাথ সরকার ১৩৭-১৩৯, ১৮৩, ১৯৮, ৩৭১
যামিনী রায় ২৭৪, ৪০৪
যীশু ৩৮৮, ৪৩৯
যোগীন বসু ৪৫১
যোগেন ঘোষ ২৭৫
যোগেশ চৌধুরী ২০৪, ৩৯১
যোগেশ বাগল ৪৪৯
রঙ্গলাল ৩৬২, ৪১৯, ৪২১, ৪৫০
রজত রায় ১৯৬
রজনী দাশ ১৬৮, ২৫১
রফি আহ্‌ম্মদ ১৬৮
রণেন বসু ৩০৬
রমাকান্ত রায় ২৭৩
রমেন রায় ২০৭
রমেশ চক্রবর্তী ২০৫, ২৬১, ২৬৩
রমেশ দত্ত ৭৩, ১৩১, ১৯৬, ২০৩, ২০৫, ২৩৬
রমেশ মজুমদার ১৩৭, ১৩৯
রয়েস্ ৮৮, ১৪০
রলাঁ ২৯০-২৯৩, ৩৭০
রবীন্দ্রনাথ ৪৫, ৪৬, ৫৩, ৬৯-৭৩, ১০৬, ১১৮, ১৫২, ১৫৫-১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৮, ১৯৩, ১৯৫, ১৯৮, ২০২-২০৩, ২০৬, ২০৮, ২১১, ২২০, ২২৩, ২৩১, ২৩৪, ২৫৫, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬৪, ২৭৬, ২৮২, ২৮৫, ২৮৭, ২৯৪, ৩০৬, ৩২৮, ৩২৯, ৩৬২, ৩৬৬, ৩৬৭-৩৬৮, ৩৭১-৩৮৫, ৩৯০-৩৯১, ৩৯৩-৩৯৬, ৩৯৮-৪০০, ৪০১-৪০৪, ৪১২, ৪১৫, ৪১৮, ৪১৯, ৪২১-৪২৩, ৪২৪-৪২৫, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩৩-৪৩৫, ৪৩৭, ৪৪০-৪৪২, ৪৪৬, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫৩
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ২৫১
রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ১৮০, ১৮৪, ১৮৬, ১৯০, ১৯৪, ১৯৭, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৪, ৪৫৫
রসিক দত্ত ২৬২
রসিক চক্রবর্তী ৩৯৪
রসেটি ৪২৭
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৭-১৩৯, ২৪০
রাজেন্দ্র চোল ৩৩৩
রাজেন্দ্রপ্রসাদ ১৮৭, ১৯০
রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ২৪৮, ৪২১
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ৫১, ৭৮, ৯৫, ১০৬, ১৩৭-১৩৯, ১৭৭-১৮২, ১৮৪, ১৮৬, ১৯০, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৭, ২০৮, ২১১-২১২, ২১৪-২১৫, ২৬৮, ৩০৬
রাধাকৃষ্ণন্ ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৮০, ৮৮, ১১৩, ১২১
রাধারাণী ৪০৫
রাধেশ শেঠ ২২৩
রামকৃষ্ণ পরমহংস ২২-২৯, ১১৮, ১২১-১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১৪০-১৪২, ১৪৪-১৪৫, ১৪৭, ১৬৭, ১৬৯,

১৭২, ১৭৩, ১৭৮-১৭৯, ১৮১, ২৩২, ২৪৮, ২৮২, ২৮৪-২৮৭, ৩০৬, ৩৩৬-৩৩৭, ৩৩৮, ৩৪১-৩৪৮, ৪৪৪, ৪৫১
রামণ ২৩১, ২৬৩
রামপ্রসাদ ৩৯৩
রামমোহন ১০৭, ২৬৫, ৩৫৪, ৩৬১, ৪৪৩, ৪৫০
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১০৬, ২১৫, ২২৩, ২৪৯, ২৫৫, ২৬৪, ৪৩৮-৪৪২
রামেন্দ্র ত্রিবেদী ৯৯, ১০২, ১০৬, ২১৩, ২৪০, ২৬৪, ৩৭১
রাসবিহারী ঘোষ ২০৫, ২১১, ২১২, ২১৩, ২৬৪
রাসেল ৫১
রীফ সর্দার ৪০৮
রীড্ ৫৫, ৫৮, ৮৫
রুসো ১০৭
রেণুভিয়ে ৫০, ৫২
র‍্যামজে-ম্যাকডোন্যাল্ড ২৪৯, ৩০৮ ৩১০
লরেন্স ৪২১
ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫১
লাউট্‌সে ১১৭
লাজপত রায় ১৬৮, ২৫৯
লাফার্গ ৪৫৫
লালচাঁদ বড়াল ৩৯৩
লিস্ট ৮৯, ৯৫, ৪৪৮, ৪৫৫
লুইজ্ ৬৮৫
লেনিন ৮৪-৮৫, ৯২, ১০৭, ১৭৪, ২২৯, ২৪৯ ২৫০, ২৬৮, ২৯৬, ৩৩৫-৩৩৬, ৩৬২, ৪৫৪-৪৫৫
লের্ভি (রাফায়েল জর্জ) ১৩১
লেহার ২৪২
লোভি ১০২, ৩০৫
[illegible] ১০৯
[illegible] ৩৫২
[illegible] ৯৫, ৩৮, ১৬০, ১৬২,
২৩৬, ২৬৪, ২৮৭, ৩২৯, ৩৬১-৩৬২, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৮৫-৩৮৬, ৩৯০ ৩৯১, ৩৯২, ৪৪৪
বটকৃষ্ণ ঘোষ ১২৯
বন্দেআলী মিঞা ১০৮
বল্‌ড্উইন (রজার) ২৭৯
বশীশ্বর সেন ২৫৯
বসন্ত রায় ১৬৮, ৩৬৬
বাক্ (প্যর্ল) ২৭৯
বাগেশ্বর দাশ ১৬৮, ২০৫
বামনদাস বসু ১১৪, ১৫৫, ৩০৬
বায়রন ৪৪৬
বালগঙ্গাধর তিলক ২১৮
বাল্মীকি ৩৬৮, ৪৪০-৪৪১
বাবুরাও পাড়াডকার ২১৮
বিক্রমাদিত্য ৩৭৪
বিজন চট্টোপাধ্যায় ১৩৯
বিজয় গোস্বামী ১৮০, ২৬৪
বিজয় মজুমদার ৬৯, ১৫৮, ২৪০
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ১০৮, ৪০০
বিজয় চ্যাটার্জি ১৯৬
বিজয়ানন্দ ১২৪
বিজ্ঞানানন্দ ১১৮, ১২৮
বিদ্যাপতি ৪২৮
বিদ্যাসাগর ১৫৫, ১৬১, ১৬২, ১৮২, ৪৫১
বিধান রায় ২৪৮, ২৫৪, ২৭৪
বিনয় ঘোষ ৩৭৩, ৩৮৬, ৪৫৪
বিনয়বিজয়জি ৫৫১
বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ২৫৪
বিনোদ চক্রবর্তী ১০৮
বিপিন ঘোষ ২২৩
বিপিন পাল ৬৮, ১০৬, ১৮০, ১৯৫-১৯৯, ২০৩, ২০৭, ২১৩, ২১৬, ২১৮ ২২০, ২২৩ ২৬৪, ২৭৭-২৭৮, [illegible]
[illegible] ১০৮ [illegible]
[illegible] ১০৬

বিমল সিংহ ৪৫৩-৪৫৪
বিমলা লাহা ২০৮
বিমলেন্দু বসু ২৩৮, ৪০৪
বিমান দে ২৬২
বিরাজ দাশ ২৬২
বিবেকানন্দ ৪৩-৪৮, ৫২-৫৩, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮৭, ৮৮, ৯৪, ১০৩, ১১৮-১১৯, ১২১, ১২২, ১২৪, ১২৬-১২৭, ১৩৯-১৪৪, ১৪৬, ১৬২, ১৬৫-১৬৮, ১৭৬, ১৭৮, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৯০, ১৯২, ১৯৪, ১৯৬, ১৯৭, ২৩১, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৮, ২৬৪, ২৮৪-২৮৫, ২৮৯, ৩০৫, ৩৩০-৩৩১, ৩৪৬, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৭৪, ৩৯১, ৪৪৪, ৪৪৫
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ১০৮, ১৬৬, ৪০০
বিশ্বনাথ ৪৫৬
বিশ্বানন্দ ১২৪
বিস্‌মার্ক্ ৯৫, ৩২২
বিষ্ণু দে ৩৬৮, ৪০৫, ৪১৯-৪২১
বিহারী চক্রবর্তী ২৪৬, ২৬৪, ৩৬২, ৩৭৮, ৪১২, ৪১৯, ৪২১, ৪২৪
বীরেন দাশগুপ্ত ১৬৮
বীরেশ্বরানন্দ ১১৮, ১২৬, ১২৮
বুকার ওয়াশিংটন ৪৫৫
বুটানি ৩৪২
বুক্র ২২৯
বুদ্ধ ৪৯, ৭১, ৯৭, ৯৮, ১১৬, ১১৭, ২৮২, ২৮৯, ৩৪৩, ৩৫৪, ৪১৯-৪২১, ৪৩৯, ৪৪৩
বুদ্ধদেব বসু ১০৮, ৩৬৮, ৪০৫
বুর্গ্‌ড্যের্ফার ৯৬, ৪৪৮
বেণী বুড়ুয়া ৫০, ১১৬
বেদানন্দ ২২৪
বোআজ্ ১৭০
বেঠোফেন ২৪২
বোসোঙ্কে ৯০
ব্যর্গ্‌সঁ ৫০, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭৮, ৮৪, ৮৯, ৩৬৭
ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭১, ৩৭৯
ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১০৬, ২০৫, ২০৬, ২০৮, ২১১, ২১২
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ৫২-৫৪, ৭৭-৭৮, ৮০, ৮৮, ৮৯, ৯৫, ১১৭, ১৩০, ১৬৯, ১৭৬, ১৮১, ১৯৫-১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ২১১, ২২১, ২২৪, ২৩১, ২৩৪, ২৪০, ২৪১, ২৫৭, ২৫৮, ২৬৩, ২৮৫, ৪৫১
ব্রহ্মবান্ধব ৬২, ৯২, ১০৬, ১৮৩, ১৯২-১৯৫, ১৯৮, ২০৩, ২০৪, ২০৭, ২১২, ২৬৪
ব্রহ্মবিহারী সরকার ১৬৮
ব্রাউনিং ১০৮, ৩৬২, ৪১১, ৪২৩, ৪৪৬
ব্রাড্‌লে ৫১, ৫৮, ৮৫, ৮৮
ব্রিজেস ৩৬৪
ব্রাণ্ডেন ৪২১
শ’ ২৯৫, ৩৬৪, ৩৬৯, ৪৪৬
শঙ্কর ৪৪৫
শচীন বোস্ ২০২, ২০৯, ২৩৪
শচীন সেনগুপ্ত ৪১১
শর্বানন্দ ১১৬, ১১৮, ১২৮, ৩৩৮, ৩৪১
শরৎ চট্টোপাধ্যায় ১৬২, ২৭৬, ৩২৯, ৩৬২, ৩৬৮, ৩৮৫-৩৮৬, ৪০৯-৪১০, ৪১৩, ৪১৪-৪১৫
শরৎ রায় ২৪০, ২৪১
শশাঙ্ক সেন ৫৪, ৩৭২, ৩৮৬, ৪৫১-৪৫৩
শশীপদ ব্যানার্জি ২৫৩-২৫৪, ৩২৪
শা-জাহান ৪১২
শান্তিনিধান রায় ২৫৬
শান্তিসুধা ঘোষ ২৪৬
শিরিন ফৌজদার ৩৪১
শিলার ১০৮, ৪২৩
শিবচন্দ্র দত্ত ২৫১, ২৮২-৩১০, ৩১৯-

৩৩৬
শিবপ্রসাদ গুপ্ত ১০২, ২৪১, ২৫৯
শিবাজি ৭১, ১৩৪, ১৩৮, ৪১২
শিশির মৈত্র ৮৯, ৯৫, ১১৭,
শুক্র ৮৪, ১১৩, ১৩৬, ১৯৮, ৪৫৫
শুদ্ধানন্দ ১২৭
শুবার্ট্‌ ২৪২
শেক্‌স্‌পীয়ার ১৭৮, ৪১১, ৪২৩, ৪৪৫, ৪৪৬
শেরার ৪৫৫
শেলী ৩৭৮, ৪১১, ৪২৩, ৪৪৬
শৈলজা মুখোপাধ্যায় ১০৮, ২৭৬
শৈলেন ঘোষ ১৬৮
শোপেনহাওয়ার ৯৪, ৪১২, ৪৪৮
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৭৭, ২৭৮, ৪০৫
শ্রীশ বসু ৩০৬
শ্লেগেল ৯৪
সক্রেটিস ১২০, ২২৯, ২৮৮
সখারাম দেউস্কর ১৫৯, ২১৮
সজনী দাস ১০৮, ৩১৭, ৪০৫, ৪১৯, ৪২০, ৪৫০
সচ্চিদানন্দ সিংহ ৩০৬
সতীন দাশগুপ্ত ২৬১
সতীশ গুহ ২১৫
সতীশ চট্টোপাধ্যায় ১১৬
সতীশ দাশগুপ্ত ২৫৭
সতীশ মুখোপাধ্যায় ৫২, ৬৮, ৯৪, ৯৫, ১০৬, ১৩১, ১৩৯, ১৫৫, ১৬৯, ১৭৬-১৮৭, ১৮৯-১৯৯, ২০১-২০৫, ২০৭-২১৫, ২২৩, ২৩৩, ২৫৫, ২৬০, ২৬৪, ২৬৮, ২৮৪, ২৮৫, ৩০৯
সত্য লাহা ১৩২, ২০৮
সত্যানন্দ রায় ২৪৮, ২৫৪
সত্যেন দত্ত ১২৮, ১৪৩, ২৭৬, ৩৭১, ৩৯৫, ৩৯৯, ৪০৫, ৪০৯, ৪১১, ৪১২, ৪১৮, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪৩৪
সত্যেন রায় ২৫৬
সত্যেন বসু ২৬২, ২৬৩
সন্তোষ বসু ১৮৭
সমর সেন ১০৮, ৪০৫
সম্বুদ্ধানন্দ ৩৪৩
সরোজ দাশ ১১৬
সরোজ রায়চৌধুরী ১০৮
সরোজনলিনী ২৪৪
সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ১১৬
সাম্‌নার ৩০৫
সারদা মিত্র ১৮৫, ২৪০
সারদানন্দ ১২৭
সিজুইক ৭৮
সিন্‌ক্লেয়ার (আপ্‌টন) ২৭৯
সিরাজদ্দৌলা ৩৫৪
সুকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৭৯
সুকুমার সেন ৪৫৩
সুধাকান্ত দে ১০৮, ২৫১
সুধীন দত্ত ১০৩, ১০৮, ৪০৫, ৪২০
সুধীন বসু ১৬৮
সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ৪৫৩
সুন্দরীমোহন দাশ ২১১, ২৬৪
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১০৮, ৩৬৮, ৪০৫
সুভাষ বসু ১৩১, ২৭৭, ৪০৫
সুরেন কর ১৬৮
সুরেন দাশগুপ্ত ৪৯-৫১, ৫৬-৫৭, ১১৫, ১১৬
সুরেন লাহা ২০৮
সুরেন বসু ১৬৮
সুরেন ব্যানার্জি ১০৬, ১৮১, ২০৬-২০৭, ২১২, ২১৯, ২৩২, ২৬৪, ২৭৭-২৭৯, ৩০৯, ৪০৫
সুরেশ রায় ২৬১
সুরেশ রায় (ডাক্তার) ২৯৭
সুরেশ ব্যানার্জি ২৫১, ২৫৩
সুরেশ সমাজপতি ১৫৯, ৪৫০
সুবোধ ঘোষাল ৯৯, ৩৬৭, ৪৫০
সুবোধ মজুমদার ২৬৩

সুবোধ মল্লিক ৬৮, ১০৬, ১৯৫, ২১১, ২১৪
সুশীল দে ৫১
সুশীল মৈত্র ১১৫, ১১৬
সুহৃৎ মিত্র ৯৫
সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী ২১১
সেলিগ্ম্যান ১০৭, ১৮৪, ৩৩২
সেশু্য ৪১১
সেঁইণ্ট্সবেবি ৪৫৫
সোর্গে ৪১৯
সোফিয়া ওয়াডিয়া ১৮৫
সৌম্যেন ঠাকুর ২৫২
সৌরেন রায় ২৫৬
সৌরীন মুখোপাধ্যায় ৩৯৫, ৪১২
স্কট ৪৪৬
স্টাইন ৮৯
স্টার্লিং ৯০
স্ট্রাউস ২৪২
স্ট্রাম্ ৪১৯
স্পান ৯৬, ৪৪৮
স্পেংলার ৯৬, ৪৪৬-৪৪৮
স্পেগুার ৪২১
স্পেন্সার ৭৮, ১৭৮, ১৮২, ৪৪৪-৪৪৫
স্মিথ (ভিনসেন্ট) ৬১
হকিং ৫১, ৮৫, ১২০, ২৭৯
হরদয়াল ২৪৯, ২৫৩
হরপ্রসাদ ৯৯-১০২, ১৬০, ১৮৩
হরিদাস পালিত ২২৩, ২৩৯-২৪৩, ৩০৫, ৩৫৯
হরিদাস ভট্টাচার্য ১১৭
হরিদাস মুখোপাধ্যায় ৪৩-২৮১, ৩৬৪-৩৬৭, ৪৩৮-৪৪৬
হল ৩৩২
হবহাউস ৫১, ৫২, ২২৯, ৩০৫
হাউসহোফার ৮৯, ৯৫, ৯৬, ৪৪৮
হারাণ চাকলাদার ১৮৪, ১৮৬, ১৯০, ২১৪
হাক্স্লে ৪৪৪-৪৪৫
হার্ডার ৬৮, ৮০-৮১, ৯২-৯৪, ২৪০, ৩৪৫, ৩৬৭
হার্ডি ১০৮, ৩৬৮-৩৬৯
হিমাংশু সরকার ১৩৯
হিরণ্ময় ব্যানার্জি ৬১, ১৩৯
হীরালাল হালদার ৭৭, ৮০, ৮৭-৯২, ৯৫, ১১৭, ১৭১
হীরেন দত্ত ৬৩, ৯৫-১১০, ১১৩, ১১৮, ১৩৮, ১৫২, ১৫৫, ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৯৫, ১৯৬, ২০৭, ২১০-২১২, ২২৩, ২৪০, ২৬৪
হীরেন মুখোপাধ্যায় ৪০৫, ৪২০, ৪৫৩
হুইট্‌ম্যান ১০৮, ৩৬২, ৩৯৮, ৪০০-৪০২, ৪১১, ৪২৫, ৪৪৬
হুগো (উগো) ৩২৯, ৩৭৯, ৩৮০
হুমায়ুন কবির ৭১, ৯৫, ১০৮, ১১৭, ৩৭৩, ৩৮৬-৩৯১, ৪৫৩, ৪৫৪
হেগেল ৬৫, ৬৮, ৭৬-৮০, ৮৬-৯৪, ১২০, ১৯৩, ১৯৫, ২২৯, ৪৪৮
হেম রায় ১৩৭-১৩৯
হেম ব্যানার্জি ৬৯, ২৪৬, ২৬৪, ৩৬২, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৯১, ৪১১, ৪১৯, ৪২১
হেমেন দাশগুপ্ত ৪৫৩
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৫৯, ৩৩৬
হেমেন রক্ষিত ১৬৮
হেমেন্দ্রকুমার সেন ২৬২
হেমেন্দ্রবিজয় সেন ৭৮, ১০৮, ১৯৯, ২৭১, ৩১০-৩১৯, ৩৩৬-৩৪৮, ৪১৭
হোম্স্ ১৬৮
হ্যাস্কেল ৩৪১
হৃষীকেশ লাহা ২০৮

BENOY SARKARER BAITHAKE

(In Meetings with Benoy Sarkar)

Sceond Edition. Vol. 1. Pages 8. Price Rs. 6

The volume is a record of interviews with Professor Benoy Kumar Sarkar held by several scholars from November 1931 to December 1943. The conversations are reproduced in the form of questions and answers. They deal with the most diverse topics of Bengali culture, economy and politics as developed in the twentieth century.

The activities and ideas of some 360 Bengalis in literature, language, art, science, philosophy, education, religion, industry, commerce, politics, labour movement, feminism, Hindu-Muslim relations and international intercourse are exhibited in appreciative and critical estimates. Some of the observations are fairly large-sized and rich in detail. Suggestive remarks for progressive development are frequent. These interpretations of contemporary Bengali achivements have been placed in the perspective of contributions from nearly 200 Western and other foreign personalities.

Intimate personal reminiscences of men, institutions and movements since 1902,–the death of Vivekananda and the establishment of the Dawn Society by Satis Mukerjee,–form a special feature of this unique publication. The conception of the Ramakrishna Empire has been developed at length. A critical estimate of the poetry of Nazrul covers some 80 pages. Equally noteworthy is Sarkar's forecast about the trend of evolution among the people down to 1980. Considerable light has been thrown on the age of Tagore, the Bengali revolution, and socio-economic transformations.

Works about BENOY SARKAR

S. C. DUTT : **Conflicting Tendencies in Indian Economic Thought**. (Sarkarism in Economics). Pages 234. Rs. 5. (Royal)

N. N. CHAUDHURY : **Pragmatism and Pioneering in Benoy Sarkar's Sociology and Economics.** Pages 152. Rs. 3. (Royal).

S. K. GHOSHAL : **Sarkarism** (The Ideas and Ideals of Benoy Sarkar on Man and His Conquests). Pages 60. Re. 1. (Royal).

B. Dass (and fourteen collaborators). **The Social and Economic Ideas of Benoy Sarkar**. Pages 690. 12. (Royal).

Villages and Towns as Social Patterns

By Benoy Sarkar

704 Pages, Eight Charts, Rs. 15.

Ethics (University of Chicago) : "The volume under review is in

some respects cosmic in scope. Here erudition and rich stores of information are interspersed with brilliant insights which the student with social sciences may profitably explore. The factual illustrations and statistical data are from India, and the concrete examples from, the American, English, German, Italian, Japanese and Russian scene" (Prof. S. M. Strong).

Man (Royal Anthropological Institute, London) : "It is thoughtful and suggestive and worthy of attention by those who are interested in sociological method as well as by those who are specially concerned with India. He scorns Spengler's ideal peasant as a figment of wishful thinking" (Prof. H. J. Fleure).

American Sociological Review : "I am glad to commend his statement on 'The Scope of Sociology in Relation to Rural-Urban Studies.' He draws a sharp distinction between sociology as the 'analysis of sociation' and what is commonly called applied sociology.' I am making the same distinction between rural sociology and rural social organization in a book by that title to be published the coming summer(1942) Sarkar describes his book very well when he says : 'In this study villages and towns have been used as pegs on which to hang the topics relating to sociation.' It deals primarily with the socio-economics of rural life in terms of its improvements by various urban institutions, such as those of health, nutrition, etc. His recurring thesis is that there is no fundamental difference between the village and the city in patterns or processes of sociation except in quantity. His whole argument is that progress in rural life will come from its urbanization. Interspersed are long sections on problems from feminism to the Russian Soviet regime and and Indian political ideologies. Those who are interested in Indian social philosophy may find material of value in the book." (Prof. D. Sanderson).

The Equations of World-Economy
By Benoy Sarkar
Pages 435. Four Charts. Price Rupees 12.

Economic Journal (London, June-September 1944) : "This, like all of Sarkar's work, breaks right away from traditional patterns of economic writing, and tries to develop an original technique for the problems in hand. He seeks here to examine the limitations and possibilities for the expansion of the Indian economy. He lays down a curve of progress. India (1855)=England (1800-15)=Germany (1848). India (1905)=England (1815-30)=Germany (1850-60). India (1940)=England (1830-48)=Germany (1865-70). He then goes on to ask how far technical, political, economic trends are opening or closing the lag of India on the European industries, and what is the outlook for the future."

বিনয় সরকারের বৈঠকে
(বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতি)
প্রথম সংস্করণ সম্বন্ধে অভিমত

দেশ ঃ—"গ্রন্থকারের অনুলিখনে অধ্যাপক বিনয় সরকার মহাশয়ের ভাষার বিশিষ্টতা বেশ বজায় আছে। বাঙ্‌লা দেশের ঘরে ঘরে এমন পুস্তকের আদর হওয়া উচিত।"

Insurance World :-"We hold it important on account of the thousand and one intimate personal reminiscences it recalls of many of Bengal's great men and institutions. It is a book to read and re-read."

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ— "লেখকের বাহাদুরি এই যে, বিনয়বাবুর ভাব, ভাষা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বৈঠকের কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"

"ধনবিজ্ঞানে সাক্‌রেতি"-লেখক শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দত্ত এম-এ, বি-এল ঃ—"বিনয় সরকারের বৈঠকে বইখানি চমৎকার হইয়াছে। 'রামকৃষ্ণ-কথামৃত' ও 'স্বামি-শিষ্যসংবাদ' শ্রেণীরই পুস্তক হইয়াছে। নূতন-নূতন চিন্তাধারা ছোটাইবার প্রেরণা পাওয়া যাইবে।"

আজাদ ঃ—"অনাগত যুগে বাংলার সাহিত্য মুছলমান ও তপছীলভুক্ত লেখকগণের সাধনায় গরীয়ান হইয়া উঠিবে,—তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি যে ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার মুক্তবুদ্ধি সংস্কার-বর্জিত মনের পরিচয় পাওয়া যায়।"

Amrita Bazar Patrika :-"The book. may be best styled a pocket encyclopaedia of Bengali culture. Prof. Sarkar's valuable opinions have been presented in the form of catechism. Clear, simple and correct estimates of the distinguished sons of Bengal will read very pleasant. The catchy style of Prof. Sarkar has been maintained in almost every line"

Insurance and Finance :-"We recommend it to our young men for their self-culture and gradual development of manhood in the truest sense."

উদ্বোধন ঃ—"গ্রন্থখানি সুখ-পাঠ্য হইয়াছে। আধুনিক কালের নানা সমস্যা ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণকে অবলম্বন করিয়া চিত্তাকর্ষক ও বহু ব্যাপক অনেক বিষয় প্রশ্নোত্তরের আকারে এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানে, ধর্ম, স্বদেশী যুগ প্রভৃতি এবং এতৎসমুদয়ের সহিত সম্পর্কযুক্ত সুধীবৃন্দ সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকার মহাশয়ের মতামত যথাসম্ভব তাঁহারই বিচিত্র ভাষায় লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম-পদ্ধতি ও কর্ম-দর্শন এবং কর্মি-মণ্ডল সম্বন্ধেও তাঁহার আলোচনা ইহাতে

লিখিত হইয়াছে।"

আর্থিক উন্নতি ঃ—"বাংলার সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও চিত্রকলা হ'তে আরম্ভ ক'রে সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম-বিবর্তনের এত কথা "বিনয় সরকারের বৈঠকে' পাওয়া গেল যে তাকে ছোট-খাটো "বিশ্বকোষ" ব'লেই মনে হয়। অনেক কথা পাওয়া খুব বড় কথা নয়, অনেক "নূতন" কথা, "নূতন" চিন্তা এবং "নূতন" তথ্য পেলাম ব'লেই তাব এতো মূল্য। জিজ্ঞাসু মনের কাছে "বিনয় সরকারের বৈঠকে' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা ব'লে বিবেচিত হবে। যত কথা আলোচনা হ'য়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ডন সোসাইটির ও সতীশ মুখোপাধ্যায়। বিনয় সরকারের মতবাদ ও সমালোচনা হয়ত সকলে স্বীকার করবে না। একদিন হয়ত এ-সব মতবাদ ও আলোচনা নিতান্ত সেকেলে হ'য়ে যাবে। কিন্তু ডন সোসাইটির ইতিহাস বাংলার জাতীয় ইতিহাস হ'তে মুছে যেতে পারবে না। তাই মনে হয় অন্ততঃ এই অংশটুকুর জন্য 'বিনয় সরকারের বৈঠকে' বাংলা সাহিত্যে অমর হ'য়ে থাকবে।"

Indian P.E.N. (Bombay) : "Mr. Mukherjee deserves to be congratulated for having brought out the ideas and ideologies of Professor Sarkar in a convenient and readable form. The reader is struck by the originality and forcefulness of the views expressed by Professor Sarkar, who certainly does not hesitate to speak out even if it happens to be unpleasant, nor mind saying things which may at first sight sound odd and grotesque. The conversations cover a wide variety of subjects—aspects of social culture and political life in modern Bengal, her writers, philosophers and statesmen and even her beggars" (N. Das).

Industry (Calcutta) : "The book is full of illuminating reminiscences of 280 prominent contemporary Bengalis who have left their mark in literatry, art, science, philosophy, education, religion, industry, Hindu-Muslim relations etc. The book offers a critical estimate of their influences in moulding Bengal. A special feature of the book is Professor Sarkar's forecast about the trend of evolution among the people down to 1980. The book is in fact a most suggestive contribution treating of the varied aspects of Bengali culture in relation to a world-setting."

Navavidhan (Calcutta) : "Professor Sarkar has an emancipated mind, at once original, catholic and receptive. He is remarkably free from partisan spirit and eager to absorb truth wherever found. He is no respecter of persons nor even of himself. So his views are more to be enjoyed than criticised."

Journal of the Benares Hindu University : "More than half of the work is devoted to the important cultural and patriotic work inaugurated by the Dawn Society and its founders headed by Sri Satis Chandra Mukherji, who is fortunately still living, and faithfully executed by its young members. In the form of a catechism the book does not lose its importance at all as it reads like a novel. It will amply repay a perusal."

Calcutta Municipal Gazette : "Professor Sarkar has borne very handsome testimony to the value of the work done by the followers of Rammohun Roy popularly known as Brahmos. He has called them nationalist, modern-minded Hindus who anticipated by about 50 years what the modern Indian practises today. * * * He is some sort of image-breaker and a "no respecter" of men and matters. In the present book

we meet with the same quality of mind when he says that there has been no philosopher in India during recent times; most of those who are honoured as such amongst us are mere interpreters and annotatores of India's ancient philosophies as well as those of the West."

Maharaja Prabirendra Mohan Tagore : "I have found it a very interesting treaties, which proves the erudition and scholastic attainments of Professor Sarkar. The book contains a variety of most interesting subjects and will be useful reading to those who are interested in current topics of both literary and political nature."

Prabuddha Bharata : "Professor Sarkar is an encyclopaedia of knowledge. He starts from home, inspiration takes him abroad, and after a long peregrination through America, England, Germany, France, and Japan he comes back to his subject and concludes by giving out his own way of looking at things. A man is best known from his informal talks, and this *Vaithake* is no exception in revealing Sarkarism inreservedly."